বিদেশের নিষিদ্ধ উপন্যাস

দ্বিতীয় খণ্ড

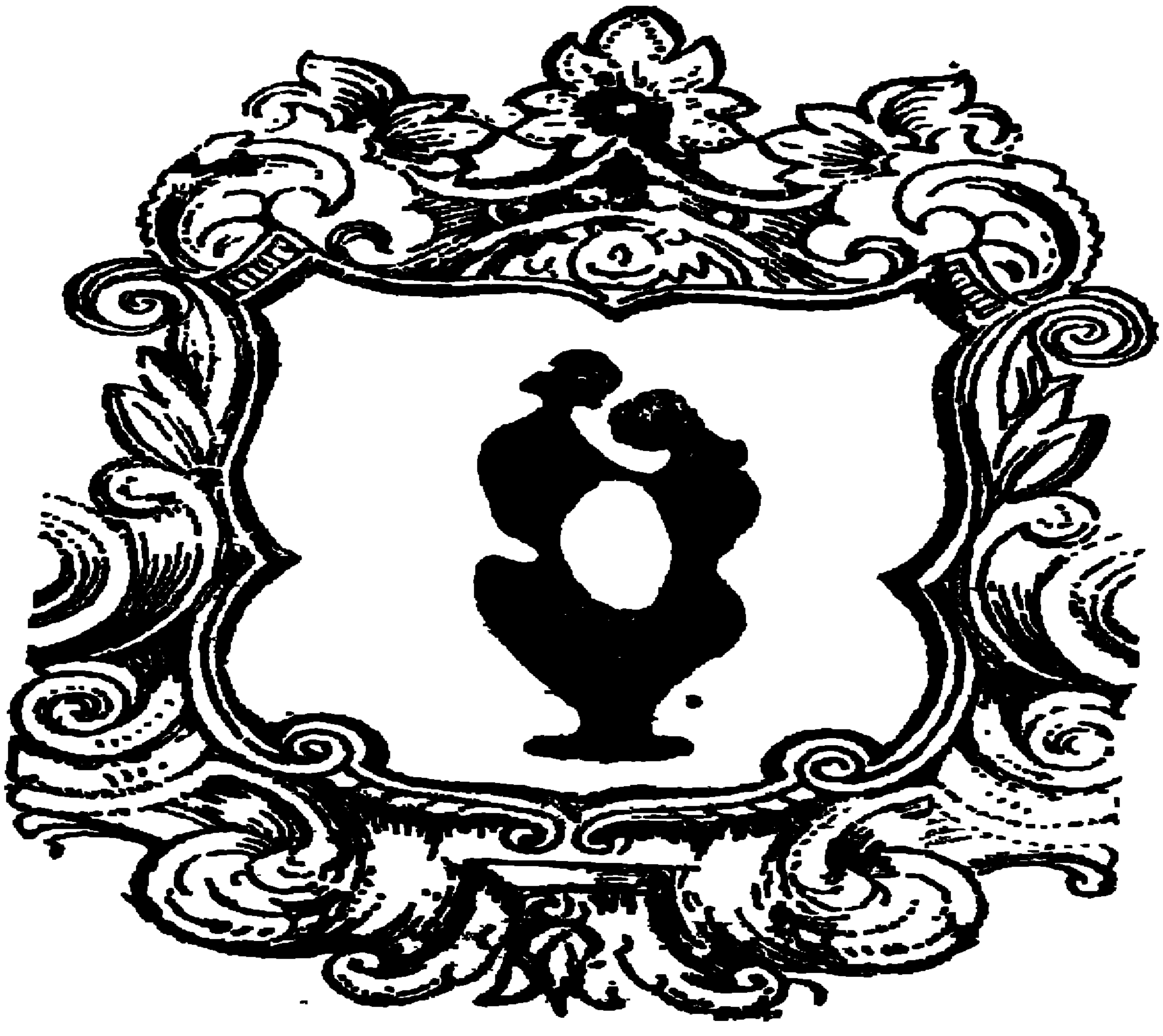

তুলি-কলম
১, কলেজ রো, কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : ১৩৬৩

প্রকাশক : কল্যাণব্রত দত্ত ॥ তুলি-কলম ॥ ১, কলেজ রো, কলকাতা-৯
মুদ্রক : প্রভাস অধিকারী, স্বপ্না প্রেস, ৩৫।২।১এ, বিডন স্ট্রীট, কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ : সত্য চক্রবর্তী

সূচীপত্র

এমিল জোলা		অনুবাদ		
অঙ্কুর	...	সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ	...	১
Germinal				
মাটি	...	ভৈরবপ্রসাদ হালদার	...	২৬১
The Earth				
আলেকজান্দার কুপরিণ				
ইয়ামা : একটি নরককুণ্ড	...	মণীন্দ্র দত্ত		৪১১
Yama : The Hell-Hole				

Bidesher Nishiddha Upanyas

Vol. II

Translated by :

Sudhansu Ranjan Ghose

Bhairabprasad Haldar

&

Manindra Dutta

॥ প্রকাশকের নিবেদন ॥

"বিদেশের নিষিদ্ধ উপন্যাস" সিরিজের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হল। ফরাসী সাহিত্যের দুঃসাহসী বাস্তববাদী লেখক এমিল জোলার দু'খানি উপন্যাস Germinal (অঙ্কুর) ও The Earth (মাটি) এবং রুশ সাহিত্যিক আলেকজান্দার কুপরিণ-এর বহু-বিতর্কিত উপন্যাস Yama, The Hell-Hole (ইয়ামা : একটি নরককুণ্ড) বিশ্ব-সাহিত্যের এই তিনখানি অতিনিন্দিত অথচ বহুল প্রচারিত উপন্যাসের সরল, মূলানুগ, বাংলা-ভাষান্তর দ্বিতীয় খণ্ডে সংযোজিত হল। লোড-শেডিং-রাক্ষসের দুরন্ত থাবা, মুদ্রণ শিল্পের নানাবিধ বিপর্যয় এবং কাগজের মূল্যবৃদ্ধি ও দুষ্প্রাপ্যতা প্রভৃতি নানা দুর্জয় বাধা-বিঘ্নের দরুণ এই খণ্ডটি প্রকাশে কিছুটা বিলম্ব ঘটল। সহৃদয় গ্রাহক ও পাঠকবর্গ নিজগুণেই আমাদের এই অনিবার্য ত্রুটিকে ক্ষমা করবেন, এ বিশ্বাস আমাদের আছে। তবু এই ফাঁকে তাদের কাছে এইটুকু প্রতিশ্রুতি দিতে পারি যে, এই সিরিজের তৃতীয় খণ্ডটি প্রকাশে অযথা বিলম্ব যাতে না ঘটে সে বিষয়ে আমরা কৃতসংকল্প।

অঙ্কুর

প্রসিদ্ধ ফরাসী ঔপন্যাসিক এমিল জোলা তাঁর সুদীর্ঘ পঁচিশ বছরের সাহিত্য জীবনে যে কুড়িখানি উপন্যাস রচনা করেছিলেন প্রকাশনার কালানুক্রমিক অনুসারে 'জার্মিনাল' বা অঙ্কুর হলো ত্রয়োদশ উপন্যাস। ১৮৮৫ সালে জার্মিনাল প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে পরস্পরবিরুদ্ধ দুটি বিপরীতমুখী ঝড় বয়ে যায় সারা ফরাসী দেশের সাহিত্যরসিকদের মধ্যে। একদল বলেন, তদানীন্তন ফ্রান্সের খনিশিল্পে শ্রমিক-মালিক বিরোধ, খনিশ্রমিকদের সীমাহীন দুঃখ-দারিদ্র্যের সঙ্গে সঙ্গে তাদের ব্যাপক যৌন ব্যভিচার ও উচ্ছৃংখল অসংযত জীবনযাত্রার যে চিত্র এঁকেছেন তা অতিবাস্তব। এ চিত্র অঙ্কনে তিনি বস্তুনিষ্ঠ সমাজচেতনার সঙ্গে শিল্পচেতনার এক সুষম সামঞ্জস্য ঘটিয়েছেন। এদিক দিয়ে তিনি সার্থক প্রকৃতিবাদী (Naturalist)। অন্যদল বলেন জোলার দ্বারা অঙ্কিত এ চিত্র অতি-সরলীকরণ ও অবাস্তবতাদোষে দুষ্ট। মাইগ্রাতের মৃতদেহ থেকে নারী শ্রমিকরা যেভাবে তার লিঙ্গটি বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে একটি কাঠির ডগায় বেঁধে ঘুরতে থাকে তার কিছু বীভৎস রসের (grotesque) আভাস পেলেও তা বাস্তব সম্ভাব্যতানীতিকে লঙ্ঘন করেছে।

বিরুদ্ধ সমালোচকরা যাই বলুন, জার্মিনাল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই এর জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। ক্রমশঃ ভূষিত হতে থাকে এক

যুগোত্তীর্ণ খ্যাতি আর সমাদরে। ১৯৩২ সালে সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী ঔপন্যাসিক আঁদ্রে জিদ বলেন, 'জার্মিনাল' বইখানি আমি তৃতীয়বার পড়ছি। তবু যতই পড়ছি ততই আগের থেকে বেশী প্রশংসনীয় মনে হচ্ছে।

এই উপন্যাসে যে শ্রমিক-মালিক বিরোধের তীব্রতা দেখানো হয় তার পিছনে এক বিশেষ ঔপন্যাসিক উদ্দেশ্য ছিল জোলার। তিনি বলেন, To get a broad effect I must have my two sides as clearly contrasted as possible and carried to the very extreme of intensity. আসলে মালিকরা শ্রমিকদের উপর কতদূর নিষ্ঠুর হতে পারে, আর শ্রমিকরাই বা প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে কতদূর ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে, এ বিরোধের পরিণতি কত ধ্বংসাত্মক হতে পারে তা দেখাবার জন্যই তিনি এর তীব্রতাকে এক চরম প্রত্যন্ত সীমায় নিয়ে যান।

এ উপন্যাসের অশ্লীলতার অভিযোগ সম্বন্ধে জোলা বলেন, ডাক্তাররা রোগ পরীক্ষার জন্য যেমন রোগীর দেহকে নগ্ন করে দেখেন তেমনি ঔপন্যাসিকরাও যদি তাঁর সৃষ্ট চরিত্রদের দেহ-মনের সব আবরণ উন্মোচিত করে জীবনসত্যের নগ্ন রূপটিকে প্রত্যক্ষ করতে চান তাহলে তাঁদের অবশ্যই অশ্লীলতার দোষে দুষ্ট ভাবা চলবে না।

জোলা Physiological determinism বা শারীরতাত্ত্বিক নিয়ন্ত্রণবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। জার্মিনাল উপন্যাসের নায়ক এতিয়েনের চরিত্র চিত্রণে এই তত্ত্বটিকে এক অনবদ্য শিল্পরূপ দান করেন তিনি। তিনি দেখান রক্তগত সূত্রের উত্তরাধিকার যে মানব চরিত্রের গতি প্রকৃতি নির্ধারণ করে চলে তা পরিবেশ ও শিক্ষা দীক্ষার দ্বারা কিছুটা পরিবর্তিত হলেও তা প্রধানতঃ অমোঘ ও অপরিহার্য এবং তা মানুষের প্রতিটি জীবকোষে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে তার জীবনকে এক অবশ্যম্ভাবী পরিণতির দিকে নিয়ে যায়।

মাটি

সেটা আঠার শো ছিয়াশী সাল।

এমিল জোলার উপন্যাস লা টেরি (দি আর্থ) প্রকাশিত হল। সঙ্গে সঙ্গে আলোড়ন সৃষ্টি হল ফরাসী সাহিত্য ও সমাজে। কৃষক জীবনের নগ্ন এবং অশ্লীল জীবন-বৈচিত্র্যের বিশদ বর্ণনা করেছেন জোলা। কাম-লালসা ও যৌন সঙ্গমের এবং দুঃখ-বঞ্চনা-আশা-আকাঙ্ক্ষার এমন সাবলীল প্রকাশভঙ্গী সমস্ত পাঠক সমাজকে বিস্মিত করে তুলল। সোরগোল পড়ে গেল।

একদল তরুণ সাহিত্যিক প্রকাশ্যে ঘোষণা করল যে, এমন অশ্লীল এবং যৌন-ভয়ঙ্করতা যে লেখক বর্ণনা করতে পারেন তিনি নিজেই একজন বিকৃত-যৌবন কামুক। বাস্তব-সাহিত্য রচনার নামে তিনি কেবল কৃষক নারী-

পুরুষের অবৈধ সঙ্গম ও কামুকতার বর্ণনা করেছেন। তাই ফরাসী সাহিত্যের ক্ষেত্রে এ উপন্যাস একখানা নিছক অশ্লীল ও দুর্বল রচনা বলেই চিহ্নিত হবে। এমিল জোলার প্রতিদ্বন্দ্বী লেখকরাও সোরগোল সৃষ্টি করলেন। নিষিদ্ধ করার জন্য রাজদরবারে অভিযোগ আনা হল। পাদরী-সমাজও অভিযোগ করল, সামাজিক ন্যায়-নীতি এবং স্নেহ-ভালবাসার মূল্যবোধে আঘাত হেনেছে এই উপন্যাস।

ইংলিশ চ্যানেলের ব্যবধান পার হয়ে জোলার এই উপন্যাস 'দি সয়েল' নামে অনূদিত হল ইংরাজী সাহিত্যে। প্রকাশনার সাথে সাথে লণ্ডন শহরেও তুমুল আলোড়ন সুরু হল। একদল সমালোচক বললেন, এ উপন্যাস ন্যাক্কারজনক অশ্লীল সাহিত্যের নমুনা, এবং সামাজিক আদর্শবোধকে সমূলে নষ্ট করার জন্যই এই উপন্যাস রচনা করা হয়েছে। একই পরিবারের ভাই-বোনের মধ্যে যে যৌন-সহবাস সে ত অবৈধ। সভ্য সমাজে এই আচরণবিধি অচল। আদালতে মামলা করা হল প্রকাশকের বিরুদ্ধে। আদালত প্রকাশকের বিরুদ্ধে জরিমানার আদেশ দিলেন। সমগ্র 'দি সয়েল' বইখানা নিষিদ্ধ না করে পরিমার্জিত করে এক সংক্ষিপ্ত খণ্ড প্রকাশ করা হল।

জোলা যখন 'দি আর্থ' রচনা করেন তখন তাঁর বয়স পঁয়তাল্লিশ বছর। এর আগেই খান চৌদ্দ উপন্যাস লিখে ফরাসী সাহিত্যে নামী এবং শক্তিধর লেখক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। তিনি বাস্তব এবং সামাজিক ইতিবৃত্ত রচনায় সিদ্ধহস্ত। ফরাসী সমাজ-এর নিখুঁত ছবি এঁকেছেন নগর-জীবন নিয়ে। সমাজের অবহেলিত অংশ হচ্ছে গ্রামের কৃষক জীবন। শোষণ এবং বঞ্চনার তীব্র রূপ এখানেই, শত শত ফরাসী গ্রামের বুকে। ধর্মই হোক আর সমাজই হোক, লালসা ছাড়া এখানে আর কোনও আদর্শ-বোধের অস্তিত্ব নেই। এই লালসার রূপও বিভিন্নমুখী। কখনও তা ধন-লালসা, কখনও বা যৌন-লালসা, আবার কখনও মাটির জন্য লালসা।

কৃষক জীবনের নিখুঁত আলেখ্য বর্ণনার জন্য জোলা বসি উপত্যকার বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন, খুঁটিনাটি তথ্য সংগ্রহ করেন, নিরীক্ষণ করেন কৃষকদের দৈনন্দিন জীবন। তাই তাঁর এই উপন্যাসে ফুটে উঠেছে গ্রাম-জীবনের দুঃখ দারিদ্র্য-নৃশংসতা ভরা জীবন-চিত্র।

প্রায় এক শতাব্দী পার হতে চলল···সেদিনকার নিষিদ্ধ, অশ্লীল উপন্যাস 'লা টেরি' আজও ফরাসী দেশের অন্যতম সেরা উপন্যাস।'

ইয়ামা : একটি নরককুণ্ড

উপন্যাস হিসাবে "ইয়ামা : একটি নরককুণ্ড" তুলনারহিত। পতিতাদের নিয়ে উপন্যাস লিখেছেন আরও অনেক কথাশিল্পী—বিদেশে এবং এদেশে। কিন্তু কুপরিণ তাঁর উপন্যাসে চরিত্র হিসাবে বেছে নিয়েছেন পতিতাবৃত্তির ভয়াবহতাকে, কোন পতিতাকে নয়। একটি রুশ শহরে একটি পতিতা-পল্লীর গড়ে ওঠা ও তার অবলুপ্তির কাহিনীই এ উপন্যাসের বিষয়-বস্তু হলেও এ উপন্যাসের আবেদন সর্বদেশের ও সর্বকালের। রুবলকে ডলারে বা টাকায় পরিণত করলেই ইয়ামার পরিবর্তে দেখা দেবে শিকাগোর কোন গণিকাপল্লী, অথবা ভারতবর্ষের যে কোন পুরনো শহরের কোন পল্লীবিশেষ। নাম-ধামের মুখোশ খুলে দিলেই ধরা দেবে নারী-দেহ-ব্যবসার সেই একই চিরন্তন জঘন্য নাটক।

বইটি যখন প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল তখন রুশ কর্তৃপক্ষের সেন্সরের কাঁচির নিরঙ্কুশ আঘাত এর সাহিত্য-দেহকে কেটে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলেছিল। যুবকদের চরিত্রহীন করে তোলার ইন্ধন যোগাবার অভিযোগ তোলা হয়েছিল কুপরিণ-এর বিরুদ্ধে; "ইয়ামা"-কে সাহিতক্ষেত্রে অপাংক্তেয় করার চেষ্টা হয়েছিল স্থূল যৌনতার অভিযোগ তুলে। কিন্তু মহাকালের আদালতে সে অভিযোগ খারিজ হয়ে গেছে; চিরন্তন সাহিত্যের গৌরব-তিলক আঁকা পড়েছে তার ললাটে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পনেরোটিরও বেশী ভাষায় অনূদিত হয়ে এ উপন্যাসের লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রি হয়েছে; সাহিত্য-রসিক উদার-হৃদয় পাঠক জানিয়েছে কুপরিণকে সাদর অভ্যর্থনা। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসসমূহের অন্যতম গ্রন্থ হিসাবে "ইয়ামা"-র স্বীকৃতি আজ নিঃসন্দেহে প্রমাণিত।

বাংলা ভাষায় এই বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাসের প্রথম পূর্ণাঙ্গ ভাষান্তর প্রকাশের সুযোগ লাভ করে আমরা গর্ববোধ করছি।

—কল্যাণব্রত দত্ত

অঙ্কুর

Germinal

এমিল জোলা

প্রথম খণ্ড

কোন এক নক্ষত্রহীন পিচের মত কালো অন্ধকার রাত্রিতে একটি লোক মার্সিয়েনে থেকে মঁতস্যুর পথে ক্লান্ত পায়ে একা একা হেঁটে চলেছিল। দশ মাইল দীর্ঘ এই পাথুরে পথটা সমতলভূমির উপর দিয়ে দুপাশের বীট চাষের জমির বুক চিরে সোজা চলে গেছে। অন্ধকারে সামনের পথটা দেখতে পাচ্ছিল না লোকটি। শুধু সামুদ্রিক ঝড়ের মত ঠাণ্ডা কনকনে বাতাসের দমকা আঘাত তাকে সামনের সীমাহীন সমতল দিগন্তটার কথা সচেতন করে তুলছিল। যে তরল অন্ধকার আকাশ ও পৃথিবীকে এক করে ব্যাপ্ত করে রেখেছিল সে অন্ধকারকে ঘন করে তোলার জন্য মাঠের মাঝে কোথাও একটা গাছও ছিল না। শুধু পাথুরে পথটা সমুদ্রের বুকে প্রসারিত জেটির মত অন্ধকার মাঠটার মধ্য দিয়ে সোজা চলে গেছে।

লোকটি মার্সিয়েনে থেকে রওনা হয়েছিল বেলা দুটোর সময়। তুলোর কোট আর সুতীর পায়জামা পরে লম্বা লম্বা পা ফেলে দ্রুত এগিয়ে চলেছিল লোকটি। অসুবিধা হচ্ছিল তার রুমালে বাঁধা একটা পুঁটলি নিয়ে। এই পুঁটলিটা একবার বাঁ বগলে ও একবার ডান বগলে রেখে কনকনে বাতাসের ভয়ে অসাড় হাতদুটো পকেটে ঢুকিয়ে রেখেছিল সে। লোকটি ছিল বেকার এবং গৃহহারা; তাই তখন তার একমাত্র চিন্তা ছিল কখন রাত্রি শেষ হবে, কখন রাত্রিশেষে এই হিমেল বাতাসের তীক্ষ্ণতার অবসান ঘটবে এবং দিনের আলো ফুটে উঠবে। এমনি করে দ্রুত পথ চলতে চলতে সে যখন মঁতস্যু থেকে দুই কিলোমিটারের মধ্যে এসে গেল, তখন সে দেখল তার পথের বাঁদিকে তিন জায়গায় আগুন জ্বলছে। আগুনের লাল শিখাগুলো দূর থেকে দেখা যাচ্ছে। প্রথমে ভয় পেয়ে গেল লোকটি। কিন্তু কিছুক্ষণের জন্য ঠাণ্ডা অসাড় হাতদুটো গরম করে নেবার এক দেহগত তাড়না কিছুতেই দমন করে উঠতে পারল না সে।

রাস্তাটা হঠাৎ বাঁ দিকে মোড় ঘুরতেই আগুনটা আর দেখা গেল না। তার ডান দিকের পথটা ঘন কাঠের বেড়া দিয়ে ঘেরা ছিল ঠিক যেমন রেলপথের ধারে থাকে। আর বাঁ দিকে কতকগুলো একই ধরনের লতাপাতার কিছু খুপরি দেখা গেল। দুশো গজ দূরে যেতেই আবার একটা মোড় ঘুরল লোকটি আর সঙ্গে সঙ্গে সেই আগুনটা পথের সমতল থেকে অনেক উপরে দেখা গেল। মনে হল আগুনটা যেন শূন্যে অন্ধকার আকাশে ঝুলছে।

প্রথমে কিছু বুঝতে পারছিল না লোকটি। পরে দেখল আসলে ওটা একটা কারখানা। একটা পাকা বাড়ির উপরে চিমনি দেখা যাচ্ছিল। এখানে

সেখানে জানালা থেকে আলো দেখা যাচ্ছিল। যেখানে যেখানে কাঠের কাজ হচ্ছিল সেখানে পাঁচ ছ'টা লম্ফ ঝোলানো ছিল।

পরে লোকটি বুঝল এটা এক কয়লাখনি। কিন্তু তার মনটা আবার খারাপ হয়ে গেল। কারণ কোন খনিতেই কাজ হচ্ছে না। সে কোন ঘর বাড়ির দিকে না গিয়ে যে তিন জায়গায় আগুন জ্বলছিল সেইখানে গেল। প্রবল শীতে এবং অন্ধকারে শ্রমিকদের কিছু তাপ ও আলো দেবার জন্যই এ আগুন জ্বালানো হয়েছিল। কিছু শ্রমিক কয়েকটা পাত্রে করে আগুনগুলোর কাছে কিছু কয়লার গুঁড়ো এনে ফেলল।

লোকটি 'সুপ্রভাত' বলে এগিয়ে গেল শ্রমিকদের কাছে। জার্সি পরা একটা বুড়ো লোক আগুনের দিকে পিঠ করে দাঁড়িয়েছিল। তার পাশে ক্রীম রঙের একটা বলিষ্ঠ ঘোড়া দাঁড়িয়ে তার দ্বারা টেনে আনা ছটা কয়লার টব খালি হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল। মাথায় বরফের মত ঠাণ্ডা বাতাস কাস্তের ধারাল দাঁতের মত এক তীক্ষ্ণতায় তীব্র হয়ে উঠল।

তার দিকে আগন্তুক ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে দেখে বুড়ো শ্রমিকটি তাকে জিজ্ঞাসা করল সে কে ও কোথা থেকে আসছে?

আগন্তুক লোকটি বলল, আমার নাম এতিয়েন ল্যান্তিয়ের। আমি একজন মিস্ত্রী। এখানে কোন কাজ খালি আছে?

জ্বলন্ত আগুনের আভায় দেখা গেল এতিয়েনের বয়স প্রায় একুশ, গায়ের রং ময়লা, দেখতে ভাল, তার চেহারা বলিষ্ঠ।

বুড়ো লোকটি মাথা নেড়ে বলল, মিস্ত্রীর কাজ? না, এখানে খালি নেই। গতকাল দুজন পরীক্ষা দিয়েছিল।

হঠাৎ একটা দমকা বাতাস এসে তাদের কথাবার্তায় বাধা দিল। এর পর নিচের দিকে অন্ধকারে কয়েকটা বাড়ির দিকে লক্ষ্য করে এতিয়েন বলল, ওটা কি একটা খাদ?

জোরে কাশি আসায় বুড়ো লোকটি কথাটার উত্তর দিতে পারল না। পরে সে থুথু ফেলে বলল, হাঁ। ওটা একটা খাদ। নাম লে ভোরো, খাদটার উপরেই গাঁ।

বুড়ো লোকটি যে থুথু ফেলল তাতে এক চাপ রক্ত ছিল। সে অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে গাঁটাকে দেখাল এতিয়েনকে। এতিয়েন গাঁয়ের বাড়ির ছাদগুলো দেখতে পাচ্ছিল দূর থেকে। এদিকে টব থেকে কয়লা বার করা হয়ে গেলে খালি ছয়টা টব সেই অপেক্ষমান ঘোড়াটা টেনে নিয়ে যেতে লাগল আর তার চালক হয়ে চলে গেল বুড়ো লোকটি। ধীর ক্লান্ত পায়ে এগিয়ে চলল ঘোড়াটি; চাবুক মারার দরকার হলো না।

এদিকে আগুনের পাশে বসে তার পাগুলো গরম করে নিতে লাগল এতিয়েন। এবার ফর্সা হয়ে আসায় লে ভোরো খাদ ও গাঁটা যেন স্বপ্নের কুয়াশা থেকে জেগে

উঠতে লাগল ধীরে ধীরে। এবার সে একে একে খনির প্রতিটি অংশ চিনতে পারল। তার মুখটা দেখে মনে হলো যেন একটা বিরাট পশু তার মুখ হাঁ করে সারা পৃথিবীটাকে গ্রাস করতে চাইছে। সেই দিকে তাকিয়ে তার নিজের কথা ভাবতে লাগল এতিয়েন। ভাবতে লাগল সারা সপ্তাটা সে কিভাবে কাটিয়েছে কাজের খোঁজে। একদিন সে কথা কাটাকাটি করতে গিয়ে রেলের এক ফোরম্যানকে আঘাত করে। তাকে লিল নামে একটা জায়গা থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। যেখানেই যায় সেখানেই সে তাড়া খায়। গত শনিবার সে গিয়েছিল মার্সিয়েনে। সেখানকার লোকে বলে ফোর্জেতে কাজ খালি আছে। কিন্তু ফোর্জেতে গিয়ে সেখানে কোন কাজ না পেয়ে যায় সোনভিলে। রবিবার রাতে সে একটা কাঠের গাদায় শীতের প্রকোপ থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু পাহারাদার তাকে রাত্রি দুটোর সময় তাড়িয়ে দেয় সেখান থেকে। এখন তার হাতে একটা পেনিও নেই। কোথাও যাবার জায়গা নেই। সামনে শুধু অন্তহীন লক্ষ্যহীন পথ প্রসারিত হয়ে আছে। এখন সে কোথায় যাবে? কোন জায়গায় আশ্রয় পাবার কোন সম্ভাবনাও নেই।

এবার এতক্ষণে সে একটা খনি দেখতে পেল। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ঘূর্ণায়মান খনিলণ্ঠনের আলো, ফার্ণেসের জ্বলন্ত আগুন, পাম্প চলার একটা ঘর্ঘর আওয়াজ সব মিলিয়ে এটা যে একটা খনি তা বেশ বোঝা যায়। একটা লোক কাজ করছিল একমনে। সে এতিয়েনের পানে একবার তাকালও না। হঠাৎ জোর কাশির শব্দ হতে এতিয়েন দেখল আবার ছ'টা ভর্তি টব নিয়ে সেই বুড়ো লোকটা আসছে ঘোড়া চালিয়ে।

আগন্তুক যুবকটি তাকে জিজ্ঞাসা করল, মঁতসুতে কি কোন কারখানা আছে?

বুড়ো লোকটি আবার একবার থুতু ফেলে বলল, সেখানে অনেক কারখানা আছে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তিন বছর আগে সেখানে অবস্থা অনেক ভাল ছিল। তখন লোক কম ছিল, লাভ বেশী হত। আর এখন সব জায়গাতেই অবস্থা খারাপ। এখন সব জায়গাতেই বড় কষ্ট যাচ্ছে। একে একে সব কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। লোক ছাঁটাই হচ্ছে। আমার মনে হয় সম্রাটের কোন দোষ নেই। কিন্তু আমেরিকায় যুদ্ধ করতে গেলেন কেন?

তখন জোরে তীক্ষ্ণ কনকনে হাওয়া বইছিল। সেই সশব্দ হাওয়ার মাঝে ওরা দুজনে কথা বলছিল। এতিয়েন তাকে তার সারা সন্ধ্যার ব্যর্থ ঘোরাঘুরির কথা বলল। এবার হয়ত ক্ষুধার তাড়নায় তাকে ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে পথে ভিক্ষা করতে বেরোতে হবে। বুড়ো লোকটি বলল, একটা জোর গোলমাল হবে, কারণ এত লোক ত আর পথে ভিক্ষে করতে বার হতে পারে না।

এতিয়েন বলল, তোমরা রোজ মাংস খাও না?

বুড়ো লোকটি বলল, তা বটে, রুটিই পাওয়া যায় না রোজ।

এতিয়েন বলল, তা বটে, রুটিই পাওয়া যায় না রোজ।

কিন্তু বাতাসের বেগ বাড়তে থাকায় বাতাসের গর্জনে তাদের কথা শোনা যাচ্ছিল না।

বুড়ো লোকটি দক্ষিণ দিকে চিৎকার করে বলল, ঐ দেখ মঁতসু দেখা যাচ্ছে।

অন্ধকারে হাতটা বাড়িয়ে সে দূরে অদৃশ্য কতকগুলো জায়গার নাম করল। তারপর বলল, ফডেনের চিনির কারখানাটা এখনো চলছে বটে, কিন্তু সেখানে লোক ছাঁটাই চলছে। একমাত্র বাতিনিউলের ময়দার কল আর ব্লিউজের কেবল কারখানা চালু আছে। তারপর উত্তর দিগন্তে হাত বাড়িয়ে বলল, সোনভিলের বিল্ডিং তৈরির কারখানা সাধারণতঃ যে অর্ডার পায় তার দুই-এর তিন অংশও পাচ্ছে না। মার্সিয়েনে ও কোর্জের তিনটি কারখানার মধ্যে দুটির চুল্লী এখনো জ্বলছে। গ্যাজেবয়ের কাচের কারখানায় শ্রমিকদের বেতন কমানোর জন্য সেখানে ধর্মঘটের কথা হচ্ছে।

যুবকটি তার কথায় সায় দিয়ে বলল, আমি তা জানি। সব জানি। আমি ত ঐ সব জায়গা থেকেই ঘুরে আসছি।

বুড়ো বলল, আমাদের খনিতে এখনো অবশ্য কাজ হচ্ছে, এখনো ঠিক আছে। তবু খনিতে উৎপাদন কমে গেছে। লা ভিক্তোরিতে কোক ওভেন কারখানাগুলোর মাত্র দুটো ব্যাটারী চালু আছে।

এই কথা বলার পর আবার থুতু ফেলে তার কাজে চলে গেল বুড়ো। খালি হয়ে যাওয়া টবগুলো নিয়ে যাবার জন্য তার ক্লান্ত ও তন্দ্রাচ্ছন্ন ঘোড়াটাকে জুড়ল।

গোটা জেলাটাকে সব চোখে দেখতে পেল এতিয়েন। তখনো চারদিকে অন্ধকার থাকলেও অসংখ্য মানুষের দুঃখ কষ্টের কথা বলে সেই মূক অন্ধকারকে ব্যথা বেদনায় সোচ্চার করে তুলেছে বুড়ো লোকটি। সে যেন মার্চের এই শীতের বাতাসে দুর্ভিক্ষের কান্না শুনতে পাচ্ছে। তার উপর বইছে হিমশীতল তুষার ঝড়। দুদিন পর শত শত যে সব শ্রমিক ক্ষুধায় পীড়িত হয়ে মারা যাবে এ ঝড়ের শৈত্যপ্রবাহের আঘাত যেন তাদের তার আগেই মারতে চায়। দেখার এক তীব্র বাসনা নিয়ে সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে অন্ধকারের মাঝে কি সব দেখার চেষ্টা করল এতিয়েন। কিন্তু দেখার এই বাসনার সঙ্গে সঙ্গে ভয় হচ্ছিল তার। যা কিছু সে দেখার চেষ্টা করছিল সব বিলীন হয়ে যাচ্ছিল এক অন্ধকার অজানার মধ্যে। সেই অন্ধকার অজানার মধ্যে যা তার চোখে পড়েছিল তা হলো কোক ওভেনের ফার্নেসের জ্বলন্ত আগুন আর সাজানো দীপশিখার মত অসংখ্য চিমনির ধূমায়িত আলো। বাঁদিকে বিরাটাকার দুটো মশালের মত দুটো ফার্নেসের আগুন জ্বলছিল। দূর অন্ধকার দিগন্তে যতদূর

দৃষ্টি যায় মাটির পৃথিবীতে জ্বালানো কয়লার আগুন ছাড়া কোন নক্ষত্রের আলো দেখা যাচ্ছে না।

হঠাৎ আবার সেই বুড়ো লোকটির কণ্ঠস্বর শুনতে পেল এতিয়েন। সে ফিরে এসে তাকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি বেলজিয়াম থেকে এসেছ?

এবার বুড়ো লোকটি ছ'টার মধ্যে এনেছে তিনটি টব। কি একটা ছোটখাটো দুর্ঘটনা ঘটেছে। তার ফলে বেশ কিছুক্ষণ কাজ বন্ধ থাকবে। হঠাৎ শ্রমরত কর্মীদের সব হৈ চৈ ও চিৎকার স্তব্ধ হয়ে গেল। শুধু একটা লোহার বস্তুর উপর হাতুড়ি ঠোকার আওয়াজ কানে আসতে লাগল।

এতিয়েন উত্তর করল, না, আমি আসছি দক্ষিণ থেকে।

বুড়ো লোকটি টবগুলি খালি করল। দুর্ঘটনা ঘটায় সে যেন খুশি হয়েছে, কারণ সে একটু সময় পেয়েছে। এমনিতে সে বড় একটা কথা বলে না। কিন্তু আগন্তুক যুবকের মধ্যে এমন একটা কিছু দেখেছে যার জন্য তার সঙ্গে কথা বলতে তার প্রায়ই ইচ্ছা করছে।

বুড়ো বলল, আমি মঁতস্যুর লোক। নাম বনিমোর।

এতিয়েন আশ্চয হয়ে জিজ্ঞাসা করল, তাই নাকি?

বুড়ো তৃপ্তির হাসি হেসে লে ভোরোর দিকে তাকিয়ে বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ। সঙ্গে সঙ্গে কাশিতে গলাটা আটকে গেল তার। অদূরে কয়লার যে আগুন জ্বলছিল তার আলোয় বুড়ো লোকটির চেহারাটা দেখা যাচ্ছিল। তার মাথায় ছিল অল্প সাদা চুল। বেঁটে ধরনের। ঘাড় দুটো শক্ত। হাত দুটো হাঁটু পর্যন্ত লম্বা। ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়ার যে ঝড় বয়ে যাচ্ছিল, সেই ঝড়ের মাঝে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা তার ঘোড়াটার মতই বুড়ো লোকটিকে দেখে মনে হচ্ছিল সে যেন পাথর দিয়ে তৈরি। তার দেহের মধ্যে কোন প্রাণ বা অনুভূতি শক্তি নেই বলেই সে এই দুঃসহ শৈত্যপ্রবাহের মধ্যেও দাঁড়িয়ে আছে। সে আবার কাশল। মনে হলো, একটা শকুনি তার বুকের ভিতরটা কুরে কুরে ছিঁড়ে খাচ্ছে। যেখানটায় সে থুতু ফেলল সেটা কালো হয়ে গেল।

সে জায়গাটার পানে তাকিয়ে এতিয়েন বলল, তুমি এখানে কতদিন কাজ করছ?

বনিমোর বলল, অনেক দিন। আমার বয়স তখন বোধ হয় আট বছর পুরো হয়নি যখন আমি প্রথম খাদে ঢুকি। সেটা হলো লে ভোরোর খাদ। আজ আমার বয়স আটান্ন। খনির যাবতীয় কাজ আমি নিজে হাতেকলমে শিখেছি। আমার পঞ্চাশ বছরের কর্মজীবনের মধ্যে পঁয়তাল্লিশ বছর খাদের ভিতরেই কেটে যায়। সেখানে বিভিন্ন ধরনের কাজ একের পর এক আমাকে করতে দেয়। তারপর আমার পায়ের জোর কমে যায়, আমার শরীর খারাপ হতে থাকে। তখন আজ হতে পাঁচ বছর আগে ওরা আমাকে খাদের উপরে নিয়ে এসে এই কাজ দেয়। কারণ ডাক্তার বলেছিল আমাকে খাদের বাইরে

নিয়ে না এলে চিরদিনের মত সেইখানেই থাকতে হবে। এখন দেখছি এ কাজটা এমন কিছু খারাপ নয়।

সে যখন কথা বলছিল জলন্ত কয়লার আগুনে তার লাল মলিন মুখখানা আলোকিত হয়ে উঠছিল।

বুড়ো লোকটি আবার বলতে শুরু করল, লোকে বলে আমার এখন বিশ্রাম দরকার। কিন্তু আমি কোন বিশ্রাম পাচ্ছি না। যে যাই বলুক, আমি আরো দুবছর কাজ করে যাব। তারপর আমার বয়স যখন ষাট পূর্ণ হবে তখন আমি একশো আশী ফ্রাঁ বৃত্তি পাব। কিন্তু আমি যদি আজ কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে যাই তাহলে ওরা আমাকে দেড়শো ফ্রাঁ দেবে। তাতে আমার চলবে না। তাছাড়া আমার পা দুটো অশক্ত অদর হলেও মোটের উপর আমি বেশ শক্ত আছি। আমি যখন খাদের তলায় কাজ করতাম তখন আমাকে সর্বক্ষণ জলের উপর দাঁড়িয়ে কাজ করতে হত। সেই জল যেন চামড়া ভেদ করে আমার পায়ের মধ্যে ঢুকে যায়। আমি পা তুলতেই পারতাম না।

আবার কাশি এসে পড়ায় কথাটা আটকে গেল তার মুখে।

এতিয়েন বলল, এই জন্যই তোমার এত কাশি হচ্ছে।

কিন্তু বুড়ো বনিমোর জোরে ঘাড় নাড়ল। তারপর কথা বলতে পারলে বলল, না, না, কাশিটা আবার শুরু হয়েছে গত মাসে। এর আগে আমার কাশি হত না। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো আমার খুব থুতু উঠছে আর আমার থুতুতে…

এতিয়েন এবার সাহস করে বলল, রক্ত?

বনিমোর তার হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে মুখটা মুছে নিয়ে বলল, না, না, কয়লা। আমার বাকি জীবনটা কাটাবার মত এখনো আমার দেহে অনেক শক্তি আছে। আমি পাচ বছর খাদের ভিতর যাইনি। কিন্তু মনে হচ্ছে কয়লা যেন আমার মধ্যেই ঢুকে আছে আমার অজানিতে।

এরপর দুজনেই চুপ করে রইল। দূরে খাদের ভিতর হাতুরী পেটার ক্রমাগত আওয়াজ হচ্ছিল। তার সঙ্গে শোনা যাচ্ছিল বাতাসের শব্দ। আর সেই শব্দটাকে রাত্রির গভীর হতে উঠে আসা নিবিড় অবসাদ আর ক্ষুধার আর্তনাদের মত মনে হচ্ছিল। আলোর দিকে মুখ করে বনিমোর যেন তার স্মৃতিটাকে চিবোচ্ছিল। অতীতের অনেক কথা মনে পড়ল তার। খনির সঙ্গে পরিচয় তার একদিনের নয়। তার বাবা মা মঁতস্যু খনিতে দীর্ঘদিন কাজ করে। তারও আগে আজ হতে একশো ছয় বছর আগে তার পিতামহ গিলম মাহিউ মাত্র পনের বছর বয়সে রেকিলার্ত নামে এক খনিতে কাজ করতে ঢোকে। সে খনি আর আজ নেই। পনের থেকে ষাট বছর পর্যন্ত কাজ করে তারপর মারা যায় গিলম। বাবার বাবাকে চোখে দেখেনি বনিমোর। তবে শুনেছে তার চেহারা বেশ বলিষ্ঠ ও শক্ত সমর্থ ছিল। তারপর বাবা নিকোলাস

মাহিউ তার বয়স চল্লিশ পূর্ণ হতে না হতে খাদের ভিতর কয়লা কাটতে কাটতে পাথর চাপা পড়ে যায়। তার মৃতদেহটা পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। সেই পাথরই তার দেহের সব রক্ত শোষণ করে হাড়গুলো পর্যন্ত গিলে খায়। তারপর তার দুই কাকা আর তিন ভাইও খনি দুর্ঘটনাতে মারা যায়। সে নিজে ভিনসেন্ট মাহিউ অক্ষত দেহে খনি থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছে এটাই যথেষ্ট। শুধু তার পা দুটো অশক্ত হয়ে গেছে। এখন সে কাজ করে যাবে না ত কি করবে? একশো দু বছর ধরে বংশানুক্রমে ছেলের ছেলে, তার ছেলে যে কাজ করে আসছে সে কাজ হঠাৎ সে ছাড়তে পারে না। তার ছেলে তুসঁা মাহিউ এই ভাবে এই কাজ করেই শরীর ক্ষয় করছে। আবার তার ছেলের ছেলেরাও সব এই কাজই করছে। তারা সব গাঁয়েই থাকে।

এতিয়েন বলল, দেখ, যতদিন পেটে কিছু খেতে পাওয়া যায় ততদিন সব সওয়া যায়, সব করা যায়।

বনিমোর বলল, আমিও তাই বলি। পেটে কিছু খেতে যতদিন পাবে তত দিন তোমাকে কাজ করে যেতেই হবে।

কথাটা বলেই বনিমোর নীরব হয়ে সামনে গাঁটার পানে তাকাল। চার্চের ঘড়িতে তখন চারটে বাজল। গাঁয়ের মধ্যে অনেক জানালা খোলা হয়েছে এবং তাই দিয়ে আলো আসছে। কিন্তু আগের থেকে আরো বেশী করে শীত লাগছিল।

এতিয়েন জিজ্ঞাসা করল, তোমাদের কোম্পানী কি ধনী ও সঙ্গতিসম্পন্ন?

বনিমোর সঙ্গে সঙ্গে বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ। তবে আমাদের পাশের খনি আঞ্জিন কোম্পানীর মত অতবড় ধনী নয়। ও কোম্পানীর লক্ষ লক্ষ টাকা। তার উনিশটা খনির মধ্যে তেরটা খনিতে কাজ চলছে। প্রত্যেকটা খনি রেলপথ ও কলকারখানার সঙ্গে যুক্ত। হ্যাঁ ওর মালিকের অনেক টাকা, প্রচুর টাকা আছে।

এতক্ষণে মেরামতের কাজ শেষ হয়ে যাওয়ায় শ্রমিকরা আবার কাজে যোগ দিয়েছে। বনিমোর কয়লা আনার জন্য আবার ঘোড়াটাকে জুড়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হলে চালক বলল, এইভাবে গল্প করে সময় কাটানো উচিত নয়। কুঁড়ে লোক কোথাকার। তুমি এভাবে সময় নষ্ট করছ মঁসিয়ে হানিবো জানতে পারলে কি হবে জান?

এতিয়েন অন্ধকারের মাঝে চারদিকে একবার তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, তা হলে এই সব মঁসিয়ে হানিবোর সম্পত্তি?

বুড়ো বনিমোর বলল, আরে না না। হানিবো হচ্ছে ম্যানেজার। আমাদের মতই এক বেতনভোগী কর্মচারি।

অন্ধকারের মধ্যে হাত বাড়িয়ে এতিয়েন বলল, তাহলে এসব সম্পত্তি কার?

এমন সময় বনিমোর এত জোরে কাশতে লাগল যে তার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। কাশি থামলে হাত দিয়ে মুখ থেকে থুতুর সঙ্গে বেরিয়ে আসা

কালো রক্ত মুছে বলল, কি? এ সব সম্পত্তি কার? ভগবান জানেন।

অদৃশ্য কোন দূর অজানার দিকে হাত বাড়াল এতিয়েন। সে হয়ত দেখাতে চাইছিল যে সব মালিকদের জন্য মাহিউ পরিবারের লোকেরা একশো ছয় বছর ধরে নিজেদের জীবন বিপন্ন করে শ্রমদান করে আসছে তারা কোথায় থাকে। তার কণ্ঠে কেমন যেন ধর্মীয় ভয় ফুটে উঠছিল, মনে হচ্ছিল যাদের কথা সে বলতে চাইছে তারা যেন সর্বগ্রাসী অপদেবতা যাদের তৃপ্ত করার জন্য তারা তাদের দেহের মাংস দান করে চলেছে। কিন্তু যাদের এখনো চোখে দেখতে পায়নি।

এতিয়েন বলল, শুধু যদি পেট ভরে খেতে পাওয়া যেত।

বনিমোর বলল, হ্যাঁ, ঘরে খাবার থাকলে অভিযোগের আর কিছুই ছিল না।

ঘোড়াটা টবগুলো আবার টেনে নিয়ে যেতে লাগল। বনিমোর গাড়ির হাঁটুর ভিতর মাথা রেখে কুঁকড়ে গোল হয়ে বসে রইল স্থির হয়ে। তার শূন্য দৃষ্টি তখনো ছড়িয়ে ছিল সামনের অন্ধকারে।

তার পুঁটলিটা তুলে নিল এতিয়েন। কিন্তু চলে গেল না। তার পিঠে কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস তীক্ষ্ণ হুল ফোটালেও তার বুকটা আগুনের আঁচে যেন পুড়ে যাচ্ছিল। এতিয়েন ভাবল, যাই হোক, এই খনিতেই চাকরির জন্য চেষ্টা করতে হবে। হয়ত বুড়ো বনিমোর সব খবর জানে না। সে যে কোন একটা কাজ পেলেই তা করবে। সারা দেশ যখন বেকারত্বে ভরে গিয়েছে, তখন কোথায় কার কাছে যাবে? তবে পথের কুকুরের মত পথেই তাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে আর তার মৃতদেহটাকে পথের ধারে কোথাও ফেলে যেতে হবে। এই উন্মুক্ত অন্ধকার প্রান্তরে কিসের একটা দ্বিধা, একটা ভয় পেয়ে বসেছিল এতিয়েনকে। লে ভোরোকে সত্যিই তার ভয় লাগছিল। দূর দিগন্ত থেকে ছুটে আসা শীতের বাতাস তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর হয়ে উঠতে লাগল। ভোরের আলোর কোন চিহ্ন নেই, আকাশ তেমনি অন্ধকার। ফার্নেস আর কোক-ওভেনের আগুনের আলো রাত্রির সেই সর্বব্যাপী অন্ধকারকে কিছুটা লালাভ করে তুলেছে শুধু, রাত্রির অপরিমেয় রহস্যের গভীরতায় প্রবেশ করতে পারেনি কিছুমাত্র। সেই অন্ধকারের মাঝে লে ভোরোর খনিটা তার শ্বাসপ্রশ্বাসকে বিলম্বিত ও গভীরতর করে মানুষের দেহ গ্রাস করার জন্য এক সর্বগ্রাসী ক্ষুধায় হাঁপাচ্ছে।

চারদিকে ফসলভরা মাঠ দিয়ে ঘেরা দুশো চল্লিশ নম্বর ছোট্ট গাঁটা রাত্রির ঘনকৃষ্ণ আবরণে গা ঢাকা দিয়ে ঘুমোচ্ছিল। চারটি ব্লকে বিভক্ত গাঁটা হাস-পাতালে বা ব্যারাক বাড়ির মত করে সাজানো। দুটো ব্লকের মাঝখানে সম পরিমাণ জায়গা জুড়ে গড়ে তোলা হয়েছে বাগান। একমাত্র বাতাসের শাঁ

শাঁ শাঁ শব্দ ছাড়া এখন আর কোন শব্দ নেই এ গাঁয়ে।

এই গাঁয়ের মধ্যে দ্বিতীয় ব্লকের অন্তর্গত ষোল নম্বর বাড়িটা মাহিউদের। এই বাড়ির উপরতলার ঘরে কয়েকজন ক্লান্ত মানুষ গভীরভাবে ঘুমোতে থাকায় ঘরখানা স্তব্ধ হয়ে ছিল। বাইরে দারুণ শীত ও ঠাণ্ডা থাকা সত্ত্বেও এ বাড়ির শোবার ঘরগুলো ঘুমন্ত মানুষের শ্বাস প্রশ্বাসের নিবিড়তায় গরম হয়ে ছিল। নিচের তলায় কোকিলওয়ালা বড় ঘড়িটায় চারটে বাজল। ঘুমন্ত মানুষগুলোর মধ্যে তুজনের নাক ডাকছিল।

ঘুমন্তদের মধ্যে ক্যাথারিন সবচেয়ে আগে উঠে পড়ল। সে ঘুমের মধ্যেই ঘড়িতে চারটে বাজার শব্দ শুনতে পায়। সে শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গে বিছানা থেকে কোনরকমে পা টেনে টেনে উঠে একটা দেশলাই খুঁজে তাই দিয়ে একটা বাতি জ্বালাল। জ্বালিয়ে সেখানে বসল। কিন্তু ঘুমের ঘোরে তার মাথাটা ঘাড়ের উপর ঢুলে ঢুলে পড়তে লাগল। অবশেষে এক অপ্রতিরোধ্য আবেগে বালিশের উপর ঢলে পড়ল।

তুটো জানালাওয়ালা ঘরখানা বাতির আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল। ঘরের দেওয়ালগুলো ছিল ক্রীম রঙের। সে ঘরে ছিল তিনটে বিছানা, একটা কাপবোর্ড, একটা টেবিল আর তুটো চেয়ার। বাঁদিকের প্রথম বিছানাটায় বাড়ির প্রথম সন্তান একুশ বছরের জ্যাকারি ঘুমোচ্ছিল। তার পাশে শুয়েছিল তার এগার বছরের ভাই জঁালিন। মাঝখানের বিছানাটায় শুয়েছিল লেনোর ও হেনরি নামে তুটি ছেলে; তাদের বয়স ছয় আর চার। ডানদিকের বিছানাটায় সে শোয় তার ন' বছরের বোন আলজিরের সঙ্গে। কিন্তু আলজিরের শরীরটা বিকৃত হওয়ার জন্য তার স্বাভাবিক বৃদ্ধি অবরুদ্ধ হয়ে আছে, তাই তাকে খুব ছোট দেখায় বয়স অনুপাতে। পাশের একটা ঘরে ওদের বাবা মা শোয়। মাঝখানে একটা কাচের দরজা। বাবা মার বিছানার পাশে একটা দোলনা আছে। সে দোলনায় শুয়ে ছিল তাদের শেষ সন্তান এস্তেলে।

জোর করে উঠে পা ছড়িয়ে বসল ক্যাথারিন। তার কপাল ও ঘাড়ের উপর ছড়িয়ে পড়া অবিন্যস্ত লাল চুলগুলোর উপর হাত বোলাতে লাগল। বয়স অনুপাতে একটু রোগা আর বেঁটে ক্যাথারিন, তার গায়ের রংটা তামাটে। তার সারা শরীরটা তখন একটা নাইট গাউনে এমনভাবে ঢাকা ছিল যে শুধু তার ফর্সা পায়ের পাতাতুটো ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছিল না। উঠে বসে মুখ হাঁ করে তার সাদা ঝকঝকে দাঁতগুলো বার করে হাই তুলছিল ক্যাথারিন। অকালে ঘুমটাকে জোর করে চোখ থেকে ঝেড়ে ফেলায় নিবিড় ক্লান্তিতে তার চোখগুলো কান্নার মত ভিজে ভিজে দেখাচ্ছিল।

এমন সময় বাড়ির বাইরে থেকে এক কণ্ঠস্বর শোনা গেল। তা হলো মাহিউর ঘুম-ভিজে কণ্ঠস্বর। মাহিউ বলছিল, সময় হয়ে গেছে, আলো জ্বালাও ক্যাথারিন।

ক্যাথারিন ব্যস্ত হয়ে বলল, যাই বাবা, এইমাত্র ঘড়িতে চারটে বাজল।

মাহিউ বলল, ভাল করে তাকা কুঁড়ে মেয়ে কোথাকার। গতকাল রবিবার বলে অনেকক্ষণ ধরে নেচেছিলি। তা না হলে আরো আগে উঠতিস। তুই কিন্তু কুঁড়ে হয়ে যাচ্ছিস।

অভিযোগের ভঙ্গিতে আরো কি সব বলতে যাচ্ছিল মাহিউ। কিন্তু মুখে চোখে জড়িয়ে আসছিল তার এবং শোবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমে কথাগুলো জড়িয়ে গেল। তৎক্ষণাৎ নাক ডাকতে লাগল।

ঘরের মধ্যে খালি পায়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল ক্যাথারিন। সে তার ছোট ভাই দুটির বিছানার কাছে গিয়ে তাদের গা থেকে সরে যাওয়া চাদরটা টেনে দিল। তারপর জ্যাকারি ও জাঁলিনকে ওঠাবার জন্য ডাকতে লাগল। বারবার বলতে লাগল, ওঠ জ্যাকারি, জাঁলিন তুইও ওঠ।

কিন্তু ওরা কেউ উঠল না দেখে জ্যাকারির ঘাড় ধরে নাড়া দিতে লাগল ক্যাথারিন। তাকে জ্যাকারি ঘুমের ঘোরে বকাবকি করতে থাকায় ক্যাথারিন তাদের গায়ের উপর থেকে চাদরটা টেনে সরিয়ে নিল। তখন তারা হঠাৎ গায়ে শীত লাগায় পা ছুঁড়তে লাগল। তা দেখে হাসিতে ফেটে পড়ল ক্যাথারিন।

জ্যাকারি উঠে বসে গালাগালি করতে লাগল ক্যাথারিনকে। বলল, বোকা বদমাস মেয়ে কোথাকার, আমাকে একা থাকতে দাও। আমি এসব পছন্দ করি না। হা ভগবান, এ সময় ওঠা এক অসম্ভব ব্যাপার।

জ্যাকারির চেহারাটা রোগা-রোগা। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল সে বাড়ির অন্যান্যদের মত রক্তাল্পতায় ভুগছে। তবে তার মাথার চুলগুলো বড় সুন্দর। তার মুখে দাড়ি গজানোর জন্য লম্বা মুখটা ময়লা দেখায়। তার ছোট শার্টটা গায়ের উপর উঠে পড়ছিল। আর শীতের জন্য সে তা জোর করে নামাবার চেষ্টা করছিল।

ক্যাথারিন জ্যাকারিকে বলল, ঘড়িতে চারটে বেজে গেছে। উঠে পড়। বাবা রাগ করছে।

জাঁলিন আবার বিছানায় শুয়ে পড়ে চোখ বন্ধ করে বলল, তুমি জাহান্নামে যাও। আমি ঘুমিয়ে পড়েছি।

ক্যাথারিন হাসতে হাসতে জাঁলিনের রোগা দেহটা দুহাতে তুলে ফেলল। জাঁলিন তার পা দুটো ছুঁড়তে লাগল। তার পা গুলো ছিল সরু সরু আর পায়ের গাঁটগুলো ফোলা ফোলা। তার মুখটা ছিল বাঁদরের মত আর চোখ-গুলো সবুজ। ক্যাথারিন তাকে না ছাড়ায় সে ক্যাথারিনের বুকে কামড় দিল। একটা জোর চিৎকার করে তাকে মেঝের উপর ফেলে দিল ক্যাথারিন। বলল, তুই একটা জন্তু।

আলজিরে আর ঘুমোয়নি। সে শুয়ে শুয়ে সব দেখছিল। দেখছিল

তার দুই ভাই ও এক বোন মুখ হাত ধুয়ে পোষাক পরছে। মুখ ধোয়ার সময় আবার ভাইবোনে ঝগড়া করতে লাগল। এক সঙ্গে বেড়ে ওঠা একদল কুকুরের মত ওরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি করে রাত্রির স্তব্ধতাটাকে খান খান করে ভেঙ্গে দিতে লাগল। ওদের তিনজনের মধ্যে ক্যাথারিনই সবচেয়ে আগে তৈরি হয়ে উঠল। খনিতে নামার জন্য একটা পায়জামা, মোটা লিনেনের জ্যাকেট আর মাথায় নীল টুপী পরার পর তাকে পুরুষের মত লাগছিল। তার মুখের ঠোঁট নাড়া ছাড়া আর কোন কিছুতেই বোঝা যাচ্ছিল না যে সে মেয়েছেলে।

জ্যাকারি বলল, বুড়ো কাজ থেকে এসে আবার বিছানাটা পেয়ে খুশি হবে।

বুড়ো মানে তাদের বাবার বাবা বনিমোর। সে সারারাত কাজ করে বলে সকালের দিকে বাড়ি ফিরে ঘুমোয়।

ওদের পাশের বাসা থেকেও লোকজনের ওঠানামার শব্দ হতে লাগল। ব্যারাক বাড়ির এই সব বাসাগুলোর দেওয়াল কোম্পানী এমন পাতলা করে বানিয়েছে যে পাশের বাসার সব কথাবার্তা শোনা যায়। সেখানে কি হচ্ছে না হচ্ছে সব জানা যায়। কেউ কোন গোপনতা রক্ষা করে চলতে পারে না। ওরা বেশ শুনতে পেল পাশের বাসা হতে সিঁড়ি দিয়ে কে একজন নেমে গেল এবং কে একজন উঠে এল।

ক্যাথারিন বলে উঠল, আমরা যাচ্ছি। পাশের বাসার লেভাকও কাজে যাচ্ছিল। বুতলুপ আসছে লা লেভাককে সঙ্গ দান করার জন্য।

লেভাক নামে কলিয়ারির এক কর্মচারি বুতলুপ নামে আর এক কর্মচারিকে বাড়িতে রেখেছে। তার ফলে লেভাকের স্ত্রী দুজন পুরুষ পেয়েছে। একজন দিনে ও একজন রাতে পালা করে সঙ্গ দান করে তাকে। এই নিয়ে ক্যাথারিনরা রোজ সকালে হাসাহাসি করে। ঠাট্টা করে।

ক্যাথারিন বলল, ফিলোমেন কাশছে।

ক্যাথারিন বলছিল লেভাকের বড় মেয়ে ফিলোমেনের কথা। তার বয়স উনিশ, জ্যাকারির সঙ্গে তার ভাব আছে। ওদের মধ্যে নাকি দেহসংসর্গও হয়েছে। লোকে বলে, ইতিমধ্যেই তার নাকি দুটি বাচ্চাও হয়েছে। কিন্তু ফিলোমেনের চেহারাটা খারাপ হয়ে গেছে। তারপর থেকে তার বুকের অবস্থা খারাপ, তাই খনির ভিতরের কোন কাজ পারে না। তাই ছাদের উপরে হাল্কা কাজ করে।

জ্যাকারি বলল, ও এখনো ঘুমোচ্ছে। এখন ছ'টা বাজে। তবু একটা কুঁড়ে শূয়োরের মত এখনো ঘুমোচ্ছে। ওর দ্বারা কোন কাজ হবে না।

পায়জামা পরে তৈরি হতে হতে ঘরের একটা জানালা খুলে বাইরে কি দেখল জ্যাকারি। বাইরে তখনো ঘন অন্ধকার। তবে অনেকে জেগে উঠেছে। তাদের ঘরের জানালাগুলো খুলে দিয়েছে।

প্রায় সব বাড়ির খোলা জানালা দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে। সে দেখার চেষ্টা করছিল লে ভোরো নামে খনির ওভারম্যান পিয়েরনের বাসা থেকে বেরিয়ে আসছে কি না। কারণ সে জানে ওভারম্যান মাদাম পিয়েরনের কাছে রাত কাটায়। কিন্তু ক্যাথারিন বলল, আজ রাতে পিয়েরন বাসায় নেই, ডিউটিতে আছে, তাই ওভারম্যান ভানসার্ত আজ রাতে পিয়েরনের বাসায় শোয়নি। এই নিয়ে ওরা যখন তর্ক করছিল তখন পরপর কয়েকটা বরফের মত ঠাণ্ডা দমকা বাতাস এসে ওদের বিব্রত করে তুলল। জোর ঠাণ্ডা লাগায় তিন মাসের বাচ্চা এস্তেলেও জোরে কেঁদে উঠল।

সে কান্নায় মাহিউ জেগে উঠল। এবার জেগে উঠে তার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায় জোর চেঁচামেচি করে আবার ঘুমিয়ে পড়ল। তার চিৎকার শুনে পাশের ঘরের ছেলেমেয়েরা সব ভয় পেয়ে গেল। জ্যাকারি ও জাঁলিনের মুখ ধোয়া তখন হয়ে গেছে। লেনোর ও হেনরি জেগে উঠলেও উঠল না বিছানা থেকে। ভয়ে ভয়ে নীরবে শুয়ে রইল বিছানায়।

মাহিউ চিৎকার করে বলল, ক্যাথারিন আমাকে বাতিটা দিয়ে যা ত। তার জ্যাকেটে বোতাম লাগিয়ে জলন্ত বাতিটা হাতে নিয়ে পাশের ছোট্ট ঘরটায় চলে গেল ক্যাথারিন। মাহিউ তখন বিছানা থেকে সবেমাত্র উঠছিল।

এদিকে এস্তেলে তখনো কেঁদে চলেছিল বলে রাগে গর্জন করে উঠল মাহিউ, তুমি চুপ করবে কি না।

মাহিউ ছিল বুড়ো বনিমোরের এক বলিষ্ঠ সংস্করণ। বেঁটে খাটো চেহারা। পেশীবহুল বলিষ্ঠ হাত। মাথাটা ছোট। মুখটা থ্যাবরা। মাথার চুলগুলো খুব ছোট করে ছাঁটা। মাহিউ তার পেশীবহুল হাত দুটো বাচ্চার সামনে নাড়তে থাকায় সে আরো জোরে কেঁদে উঠল।

এদিকে ওদের মাও তখন জেগে উঠেছে। ওদের মা খালি বিছানাটায় টান হয়ে শুয়ে মাহিউকে বলল, ওকে বকো না। যা করে করুক। তুমি ত জান ও থামবে না। বকলে কখনই চুপ করবে না।

এস্তেলের জন্য ওর মাও অস্বস্তি অনুভব করছিল। বাচ্চাটার কান্নার জন্য তারও সারারাত ভাল ঘুমই হয় না। লেপের মধ্য থেকে তার মুখটা শুধু বেরিয়ে ছিল। একদিন মুখটা তার সুন্দর ছিল। কিন্তু দারিদ্র্য আর পর পর সাতটি সন্তান প্রসব করার ফলে তার মুখের সব সৌন্দর্য সব লালিত্য মাত্র উনচল্লিশ বছর বয়সেই হারিয়ে ফেলেছে সে।

মাহিউ পোষাক পরতে পরতে কথা বলছিল। মাহিউর স্ত্রী বলল, আজ সোমবার, অথচ আমার হাতে একটি পয়সাও নেই। এখনো ছ'টা দিন কাটাতে হবে। তারপর মাইনের দিন। এভাবে আর চলতে পারে না। মাত্র নয় ফ্রাঁ দিয়ে দশজন লোকের সংসার এক সপ্তা চালানো যায় না।

মাহিউ বলল, নয় ফ্রাঁ? আমার ও জ্যাকারির তিন ফ্রাঁ করে ছয় ফ্রাঁ,

ক্যাথারিন ও আমার বুড়ো বাবার দু ফ্রাঁ করে চার ফ্রাঁ আর জাঁলিনের এক ফ্রাঁ—সব নিয়ে এগার।

মাহিউর স্ত্রী বলল, কিন্তু রবিবার ও ছুটির দিন আছে যেদিন কোন রোজগার থাকে না। তার মানে গড়ে নয় ফ্রাঁ দাঁড়ায়।

মাহিউ কোন কথা বলল না। সে শুধু অন্ধকার মেঝের উপর তার চামড়ার বেল্টটার খোঁজ করতে লাগল। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, গজগজ করো না। আমি এখনো শক্ত আছি। বিয়াল্লিশ বছর বয়সেই লোকে বুড়ো হয়ে যায়। রোগে ভোগে।

তার স্ত্রী বলল, তা অবশ্য বটে। কিন্তু তাতে ত আর পয়সা আসে না। তাতে রুটি জোটে না। আমি কি করে চালাব? আমার মনে হয় তোমার কাছেও কিছু নেই?

মাহিউ বলল, আছে কিছু তামার পয়সা।

তার স্ত্রী বলল, ওটা তোমার মদ খাবার জন্য রেখে দাও। হা ভগবান, আমি কি করব? এখনো ছ টা দিন। দিন শেষ হতেই চাইবে না। মাইগ্রাতের কাছে ষাট ফ্রাঁ ধার আছে। গত পরশু দিন সে আমাকে ধার দেয়নি, তাড়িয়ে দিয়েছিল। অবশ্য আবার আমি যাব। কিন্তু সে যদি ধার দিতে না চায়···

বিছানায় শুয়ে শুয়ে সকরুণ কণ্ঠে অভাবের কথা বলতে লাগল মাহিউর স্ত্রী। সে বলল, তার ভাঁড়ার ঘর একেবারে খালি। ছেলেমেয়েরা রুটি মাখন চেয়ে পায় না। সারা দিন শুধু বাঁধাকপির পাতা সিদ্ধ করে তাই খেয়ে ক্ষুধা নিবৃত্তি করতে হয়।

কিন্তু তার সব কথা এস্তেলের কান্নায় ডুবে যাচ্ছিল। মেয়েটা ক্রমশই বেয়াড়া হয়ে উঠছে। এস্তেলেকে দোলনা থেকে কোলে তুলে নিয়েছিল মাহিউ। কিন্তু তাতেও জোর কাঁদতে থাকায় তার মার বিছানায় ফেলে দিয়ে বলল, এই নাও, আমি ওর মাথাটাকে ফাটিয়ে দিতাম। ও যখন চাইছে মায়ের দুধ পাচ্ছে। তবু ওর চিৎকার ক্রমশ বেড়েই উঠছে। অসহ্য হয়ে উঠছে।

বিছানায় গরম কাপড়ের আচ্ছাদন আর মায়ের স্তনের দুধ পেয়ে সত্যিই চুপ করল এস্তেলে। তার ঠোঁট থেকে চকচক শব্দ হতে লাগল শুধু।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মাহিউ বলল, তোমাকে পাইওলেনে যেতে বলেছিল না।

তার স্ত্রী সন্দেহের সঙ্গে বলল, হ্যাঁ দেখা করতে বলেছে বটে। ওরা গরীব ছেলেমেয়েদের জন্য পুরনো পোষাক বিলোবে বলেছে। আমি আজই লেনোর ও হেনরিকে নিয়ে যাব। ওরা যদি একশো স্যু দেয় তাহলেও যা হোক কিছু হয়।

আবার নীরবতা নেমে এল ঘরে। সবাই চুপচাপ। মাহিউ এবার যাবার জন্য তৈরি হয়ে বলল, আর কি আশা করতে পার? এইভাবেই চালাতে হবে। যা হোক করে একটু সুপের ব্যবস্থা করো। এভাবে বকে ত কোন লাভ হবে

না। তার থেকে কাজে যাওয়াই ভাল।

তার স্ত্রী বলল, হ্যাঁ তা ত বটেই। বাতিটা নিভিয়ে দাও। আমার চিন্তা ভাবনার রংগুলো ও আলোয় আমি আর দেখতে চাই না।

প্রথমে জ্যাকারি ও জাঁলিন বেরিয়ে পড়ল। তারপর মাহিউ নিজে। ওদের পায়ের জুতোর চাপে কাঠের সিঁড়িতে ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ হতে লাগল। ওদের চলে যাওয়ার পর আবার শেষরাত্রির অন্ধকার স্তব্ধতা নেমে এল ঘরগুলোয়। মাহিউর স্ত্রীর শিথিল স্তন দুটো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে চকচক শব্দ করে সমানে দুধ খেয়ে যেতে লাগল এস্তেলে নামে বাচ্চা মেয়েটা।

ক্যাথারিন প্রথমে সোজা নিচের তলার ঘরে চলে এল। রান্নাঘরে একটা উঠোনে সারা দিনরাত আগুন জ্বলে। ক্যাথারিন গিয়ে নিভিয়ে আসা সেই আগুনটা জাগিয়ে তার উপর কেটলিটা চাপিয়ে দিল।

ঘরখানা বড় এবং সমস্ত নিচের তলাটা জুড়ে আছে। দেওয়ালগুলো আপেলের মত সবুজ রঙের। ঘরের মধ্যে আসবাব বলতে মাত্র একটা টেবিল আর ক'টা চেয়ার। দেওয়ালে দুটো রঙীন ছবি—সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর এই ছবি দুটো কোম্পানী সব কর্মচারিদের উপহার দেয়। আসবাবপত্রহীন শূন্যতায় ঘরখানা আর খালি দেওয়ালগুলোর মাঝে চড়া রঙের দামী ছবিদুটো বেমানান লাগছিল। ঘরখানা মোটামুটি পরিষ্কার হলেও পিঁয়াজের উগ্র গন্ধ ভারী করে তুলেছিল ঘরের বাতাসটাকে। ঘরের মধ্যে একট কাপবোর্ড বাক্স আর একটা দেওয়াল ঘড়ি, আর কোন আসবাব ছিল না।

কাপবোর্ড খুলেই ভাবতে লাগল ক্যাথারিন। রুটি কম আছে। তবে চীজ ও মাখন ভালই আছে। রুটিটাকে পাতলা করে কেটে তাতে মাখন লাগিয়ে চারজনের মত করে টেবিলে সাজাল। এখনকার মত প্রাতরাশ করবে তার বাবা, জ্যাকারি, জাঁলিন আর সে নিজে।

ঘরসংসারের কাজে ব্যস্ত থাকলেও জ্যাকারির কথাটা মন থেকে যায়নি ক্যাথারিনের। সামনের দরজাটা খুলে পিয়েরেনের বাসাটার দিকে তাকাল। তখন সারা গাঁটা একে একে জেগে উঠছে। জানালায় আরো অনেক আলো দেখা যাচ্ছে। তবে কনকনে বাতাসের বেগটা তেমনিই আছে। ক্যাথারিন দেখল পিয়েরেনের ঘরের দরজা দিয়ে তার এক ছেলে লিডি বেরিয়ে এল। ওভারম্যান ভানসার্তকে দেখতে পেল না। ছেলেটা হয়ত কাজে যাচ্ছে। তখন অনেকেই কাজে যেতে শুরু করেছে।

কিন্তু হঠাৎ চৈতন্য হলো ক্যাথারিনের। সে বোকার মত দরজার কাছে এই শীতে দাঁড়িয়ে কষ্ট দিচ্ছে নিজেকে অথচ যে ভানসার্তকে সে পিয়েরেনের ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখতে চাইছে সেই ভানসার্ত হয়ত এখনো ঘুমোচ্ছে; কারণ তার ডিউটি ছ'টায়। কানে জল ফোটার শাঁ শাঁ শব্দ আসতেই দরজাটা বন্ধ করে ছুটে রান্নাঘরে চলে গেল ক্যাথারিন। কেটলি থেকে ফুটন্ত জল গড়িয়ে

পড়ে আগুনটা নিবিয়ে দিচ্ছে।

কফি হয়ে গেলে ওর বাবা ও ভাইরা ঘরে এল। ওরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই তাড়াতাড়ি করে কফি খেয়ে নিল। উপর থেকে ওর মা হেঁকে বলল, তোমরা সব রুটি নিয়ে যাও। আমার কাছে ছেলেদের রুটি আছে।

ক্যাথারিনও হেঁকে বলল, ঠিক আছে।

মাহিউ বলল, নাও সব হলো? তা না হলে লোকে বলবে আমরা কুঁড়ে। সকলে আপন আপন জায়গায় কফি ও স্যাণ্ডউইস সঙ্গে নিয়ে কাজে রওনা হলো। ক্যাথারিন গেল সব শেষে। বাতিটা নিভিয়ে দিয়ে ঘরের দরজায় তালা দিয়ে তবে সে বেরোল। ওর ঠাকুর্দা বুড়ো বনিমোর আসবে ঠিক ছ'টায়। তার প্রাতরাশের সব যোগাড় ঠিক করে রেখে দিয়েছে। ওরা বাড়ি থেকে বেরোতেই পাশের বাসার দরজা থেকে কে একজন ডাকল। বলল, আমরাও যাচ্ছি।

ওরা দেখল লেভাকের সঙ্গে তার বারো বছরের ছেলে রেবার্ত বেরিয়ে আসছে বাড়ি থেকে। ওরাও কাজে যাচ্ছে।

ক্যাথারিন হাসি চেপে জ্যাকারিকে চুপি চুপি বলল, সেকি, আজকাল বুত-লুপ কি ওর স্বামী বাড়ি থেকে বেরিয়ে না যেতেই চলে আসে লেভাকের স্ত্রীর কাছে? এইটুকু সময় আর তর সয় না।

পাশের ঘরে যে সব আলোগুলো জ্বলে উঠেছিল সে সব আলো আবার নিবে গেল। প্রতিটি বাড়ির দরজা সব বন্ধ হয়ে গেল। সে বাড়ির ভিতর নারী ও শিশুরা কিছুক্ষণের জন্য জেগে উঠে আবার ঘুমিয়ে পড়ল আর এদিকে গাঁ থেকে লে ভোরো পর্যন্ত যে পথটা চলে গেছে সেই পথ দিয়ে ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়া আর ভোরের কুয়াশায় ভরা ছায়ার মধ্যে দিয়ে সার বেঁধে এক দল লোক এগিয়ে যেতে লাগল। দেখে মনে হবে ওরা যেন মানুষ নয়, ক্লান্ত পায়ে এগিয়ে চলা একদল ছায়ামূর্তি।

৩

কাঠের গাদা হতে এবার বেরিয়ে এল এতিয়েন। যেখানে কাজ হচ্ছিল সেখানে গিয়ে সে কয়েকজন লোকের কাছে চাকরির খোঁজ করল। কিন্তু তারা তাকে ওভারম্যান না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলল।

তবু এধার ওধার ঘুরে বেড়াতে লাগল এতিয়েন। খনির উপরে অফিস ঘরগুলোর এধার সেধার ঘুরতে ঘুরতে খনির মুখটার কাছে চলে গেল। সেখানে রিকোমে নামে একজন কর্মকর্তার সঙ্গে তার দেখা হলো। এতিয়েন তাকে জিজ্ঞাসা করল, এখানে যে কোন রকমের কোন কাজ খালি আছে? রিকোমে এক কথায় জবাব দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু কি ভেবে বলল, মঁসিয়ে ভানসার্তের জন্য অপেক্ষা করো। তাঁকে আসতে দাও; উনি হচ্ছেন ওভারম্যান।

চারটে লণ্ঠনের আলো সেখানে নামানো ছিল। খনির মুখে দুটো লোকই সব সময় ওঠা নামা করছিল। ওদিকে টবের উপর কয়লা বোঝাই আর খালি করার শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

এতিয়েন হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল এই সব শব্দ শুনে। তার চোখে ধাঁধা আর কানে যেন তালা লেগে গিয়েছিল। তার সামনে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছিল। তার মনে হচ্ছিল ঠাণ্ডায় তার পা দুটো যেন জমে যাবে। এরপর এতিয়েনের লিফটের এঞ্জিনের দিকে চোখ পড়ল। এঞ্জিনম্যান সব সময় সংকেতের দিকে তাকিয়ে আছে। নিচের থেকে সংকেত আসা মাত্র নিচে লিফট নিয়ে যেতে হবে। লিফট দুটোর একটা যখন উঠছিল বা নামছিল তখন তার উপরের স্টীলের চাকাগুলো এত জোরে ঘুরছিল যে তা চোখে দেখাই যাচ্ছিল না। এতিয়েন তা তন্ময় হয়ে দেখছিল।

হঠাৎ একদল চিৎকার করে সাবধান করে দিয়ে এতিয়েনকে বলল, তাকিয়ে দেখ।

এতিয়েনকে দেখল একজন শ্রমিক একটা বিরাট মই বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এতিয়েন তখনো অবাক বিস্ময়ে তার মাথার অনেক উপরে লিফটের ঘূর্ণায়মান চাকাগুলোর পানে তাকিয়েছিল। মইওয়ালা লোকগুলো আবার চিৎকার করে সাবধান করে দিল এতিয়েনকে। সে তখন খনির মুখে লিফটের কাছে চলে গেল।

একদল লোক খাদের ভিতরে যাবার জন্য লিফটের কাছে ল্যাম্প হাতে একে একে জমা হচ্ছিল। এঞ্জিনম্যান সংকেতের আশায় অপেক্ষা করছিল। সংকেত পাওয়া মাত্র এঞ্জিনম্যান লিফট ছেড়ে দিল। মুহূর্ত মধ্যে লিফটটা নেমে গেল, তলিয়ে গেল খাদের অদৃশ্য গভীরে। উপরে শুধু ঘূর্ণায়মান চাকা আর কোন বা মোটা তার ছাড়া আর কোন চিহ্ন অবশিষ্ট রইল না। এতিয়েনের মনে হলো একটা লোহার খাঁচার মধ্যে একদল পশু রাতের অন্ধকারে পাতালে নেমে গেল।

এতিয়েন উপরে একজন শ্রমিককে জিজ্ঞাসা করল, খাদটা কি খুব গভীর? ওরা কতটা নিচেয় গেল?

লোকটি উত্তর করল, পাচশো চুয়ান্ন মিটার। কিন্তু এর মধ্যে চারটে স্তর আছে। প্রথম স্তরের গভীরতা হলো তিনশো কুড়ি মিটার।

দেখতে দেখতে সেই খাঁচাটা লোকগুলোকে খাদের তলায় নামিয়ে তলা থেকে উঠে এল। কত সহজে ক্লান্তিহীনভাবে ওঠানামা করছিল সেটা।

এতিয়েন হঠাৎ সেই লোকটিকে আবার জিজ্ঞাসা করল, হঠাৎ যদি যে তারের উপর ঝোলানো রয়েছে ডুলিটাকে সে তার যদি ছিঁড়ে যায়?

লোকটি বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, ছিঁড়ে যায়—

কথাটা বলেই নিচে যাবার জন্য তৈরি হলো লোকটি। এবার তার নিচে

নামার পালা।

একবারে সব লোক নিচে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই বারবার ওঠানামা করতে হয় এই যান্ত্রিক ডুলিটাকে। যেন অতলগর্ভ অন্ধকার খাদটার অতৃপ্ত অমিত ক্ষুধা মেটাবার জন্য ডুলি এক একবারে একদল করে নিয়ে যাচ্ছে আর তাদের নামিয়ে দিয়ে চার মিনিটের মধ্যে উঠে এসে আবার একদল লোক নিয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ ভয় পেয়ে গেল এতিয়েন। কি হবে এখানে দাঁড়িয়ে থেকে। ওভারম্যান ভানসার্ত এসে কি করবে? যদিই বা সে তাকে একটা চাকরি দেয় তাহলে তাকেও ত ঐসব অসহায় খনিশ্রমিকদের মত ঐ যান্ত্রিক ডুলিটাতে করে নেমে যেতে হবে সর্বগ্রাসী খাদটার গভীরে। ভয় পেয়ে একরকম ছুটে সেখান থেকে দূরে সরে গেল এতিয়েন। এদিক সেদিক চলতে চলতে সে চলে গেল বয়লার হাউসের কাছে। সেখানে তুটো চুল্লী জ্বলছিল আর কতকগুলো লোক কাজ করছিল।

জ্বলন্ত চুল্লীর আঁচে ঠাণ্ডার মধ্যেও বেশ কিছুটা গরম লাগল এতিয়েনের। হঠাৎ সে দেখল বাইরে থেকে একদল খনিশ্রমিক কাজে যোগদান করতে আসছে।

আসলে তারা হলো মাহিউ ও লেভাকের দল। তাদের মধ্যে ক্যাথারিনও ছিল। পুরুষের পোষাক পরা ক্যাথারিনকে এক সুদর্শন যুবক ভেবেছিল এতিয়েন। তাই কি মনে হতে তার দিকে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা ভাই, এখানে কোন কাজ খালি আছে? যে কোন একটা কাজ?

মাহিউ ছিল পিছনে। সে এতক্ষণে কাছে এসে গেছে। কথাটা তার কানে যেতে সে তার উত্তর দিল। বলল, না, কোন কাজ খালি নেই।

তবু এতিয়েনের জন্য মায়া হলো মাহিউর। এই সাত সকালে এক তরুণ বেকার যুবক চাকরির খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখে তার মনে কিছুটা কষ্ট হলো। সে তার সঙ্গীদের বলল, তোমরা জান, আমাদেরও যে কোন সময়ে ওর মত অবস্থা হতে পারে। সবাই চাকরি পায় না। এই কাজই অনেকে পায় না।

ওরা সবাই লকার ঘরে চলে গেল। ঘরের মাঝখানে একটা লোহার স্টোভ জ্বলছিল। ওরা গিয়ে দেখল প্রায় তিরিশ জন লোক স্টোভের দিকে পিছন ফিরে খাদে নামার আগে গাটাকে গরম করে নিচ্ছে যাতে খাদের তলায় গিয়ে সেখানকার কনকনে ঠাণ্ডাটাকে সহজে সহ্য করতে পারে।

বাইরে দারুণ শীত থেকে গরম ঘরখানায় এসে সবাই বেশ আরাম উপভোগ করছিল। অনেকে হাসাহাসি ও রসিকতা করছিল নিজেদের মধ্যে। আজকের সকালে ওদের রসিকতাটা অন্যদিনকার থেকে আরো উচ্ছল হয়ে উঠল। তার কারণ হলো মুকেত্তে নামে আঠারো বছরের একটা মেয়ে ওদের সঙ্গে আজ প্রথম খাদে নামছে। মেয়েটির বাবা ও ভাই এইখানেই কাজ করে। কিন্তু তাদের

কাজের সময় ভিন্ন বলে ওকে একাই আসতে হয়েছে।

কিন্তু একা আসতে হয়েছে বলে বিন্দুমাত্র মুষড়ে পড়েনি মুকেত্তে। সে সমানে সকলের সঙ্গে রসিকতা করে যাচ্ছে। বুকটা স্ফীত আর কোমরটা খুব সরু। সে তার বাবা ও তার ভাইএর সঙ্গে রেকিলার্তে থাকে।

খনিশ্রমিকদের মধ্যে একটি রীতি প্রচলিত আছে। তাদের মেয়েরা খনিশ্রমিকদের কাউকে ভালবাসলে বা তার সঙ্গে ঘুরে বেড়ালে কেউ কিছু মনে করবে না। কেউ কিছু বলবে না। কিন্তু বাইরের কোন লোকের সঙ্গে তাদের কোন মেয়ে মেলামেশা করলেই তারা ক্ষেপে যাবে। একদিন মুকেত্তেকে কে নাকি মাঠে মার্সিয়েনের এক পেরেক ব্যবসায়ীর ছেলের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে দেখেছিল। এই নিয়ে কথা হয়। তখন মুকেত্তে রেগে যায়। রেগে গিয়ে প্রতিবাদ করে। এবার থেকে কেউ যদি তাকে বাইরের কোন ছেলের সঙ্গে মিশতে দেখে তাহলে সে তার নিজের হাতে নিজের একটা হাত কেটে ফেলবে।

আজ এই ঘরের মধ্যে মুকেত্তেকে পেয়ে একদল খনিশ্রমিক রসিকতা করে বলল, তুমি তাহলে ছোঁড়াটাকে ছেড়ে দিলে? তাকে ছেড়ে আবার ঐ ধনী বেঁটেটাকে ধরেছ। আমি সেদিন তাকে দেখেছি। ও এত বেঁটে যে তোমার নাগাল পেতে হলে ওকে একটা মইএর সাহায্য নিতে হবে।

লোকটার কথায় সবাই হেসে উঠল। গরম ঘরখানার মধ্যে দাঁড়িয়ে এই ধরনের মিষ্টি রসিকতা ওদের বেশ ভাল লাগছিল। ওরা বেশ হাসাহাসি করছিল।

মুকেত্তেও হারবার মেয়ে নয়। সে সঙ্গে সঙ্গে বলল, তোমার তাতে কি? আমি যার সঙ্গে মিশি তোমার তাতে কি? তোমাকে কি তাকে ঠেলা দেবার জন্য ডাকা হয়েছে?

কথাটা বলে মুকেত্তেও খিল খিল করে হাসতে লাগল। ঘরখানার মধ্যে নড়েচড়ে বেড়াতে লাগল। কিন্তু তার পরনের পোষাকটা বড় বিশ্রী ছিল। সে পোষাকে তার বুকটাকে বিশ্রী রকমের স্ফীত দেখাচ্ছিল। তাকে দেখে একই সঙ্গে হাসি পাচ্ছিল সকলের আবার উত্তেজনাও জাগছিল তাদের মধ্যে।

কিন্তু সে হাসি সকলের থামিয়ে মুকেত্তে তাদের বলল, ফ্লোরেন্স নামে একটি মেয়ে আর কোনদিন কাজে আসবে না। গতকাল বিছানায় তাকে মৃত দেখা যায়। কেউ বলে হৃদ্‌রোগের ফলে মৃত্যু হয়েছে; আবার কেউ বলে বিষ খেয়েছে।

তার মৃত্যু যেভাবেই হোক, একজন খনিশ্রমিকের অভাব ঘটল। একটা কাজ খালি হলো। এতে উৎপাদন কম হবে। কথাটা শুনে মাহিউ এগিয়ে এল। বলল, যে যুবকটি কাজের খোঁজ করছিল সে কোথায়?

এমন সময় সেইদিকে ওভারম্যান ভানসার্ত যাচ্ছিল। মাহিউ তার কাছে গিয়ে ব্যাপারটা সব বলল। এতিয়েনের চাকরির খোঁজের কথাটাও বলল।

ওদের কোম্পানীর নূতন নীতির কথাটাও স্মরণ করিয়ে দিল। আজকাল কোম্পানীতে নূতন নিয়ম হয়েছে কোন মেয়ের পদ খালি হলেই তাতে কোন পুরুষকে নিযুক্ত করতে হবে। আঞ্জিন কোম্পানীও এই নীতির প্রবর্তন করে। তবে খনিশ্রমিকরা কোম্পানীর এই নূতন সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করে নিজেদের স্বার্থের কথা ভেবে। তারা স্ত্রী পুরুষের একসঙ্গে কাজ করার পক্ষপাতী। এই নীতি প্রচলিত থাকলে তারা তাদের মেয়েদের ঢোকাতে পারবে চাকরিতে। কিন্তু ওভারম্যান যখন দেখল মাহিউর মত একজন বয়স্ক খনিশ্রমিক একজন মেয়ের খালি পদে একজন পুরুষ শ্রমিককে ঢোকাতে চাইছে তখন সে হাসিমুখে মাহিউকে সম্মতি দিল লোকটিকে নিযুক্ত করার জন্য। তবে একটা শর্ত। এই নিয়োগ এঞ্জিনীয়ার নিগ্রেলের দ্বারা সমর্থিত করিয়ে নিতে হবে।

জ্যাকারি বলল, এখন সে ছুটে গেলেও এক মাইলের বেশী পথ যেতে পারবে না।

ক্যাথারিন বলল, না, আমি তাকে বয়লারের পাশে দেখেছি।

মাহিউ বলল, যাও তাড়াতাড়ি, দেখ তাকে।

ক্যাথারিন ছুটে চলে গেল এতিয়েনের খোঁজে। ইতিমধ্যে সেই গরম ঘর থেকে অনেক শ্রমিক খাদে নামার জন্য লিফটে গিয়ে উঠেছে। জাঁলিন তার বাবার জন্য অপেক্ষা না করে লেভাকের ছেলে বেবার্ত আর পিয়েরেনের দশ বছরের মেয়ে লিভির সঙ্গে খাদে নেমে গেল। মুকেত্তে তাদের সামনে গিয়ে লিফটে উঠল। মুকেত্তে তাদের সাবধান করে দিল, যদি আমার পিছনে চিমটি কাটিস ত আমি তোদের ফেলে দেব ডুলি থেকে বলে দিচ্ছি।

এদিকে এতিয়েন শীতের ভয়ে বয়লার ঘর থেকে বেরোতে চাইছিল না। যে লোকটি বয়লারের মধ্যে কয়লা ঢালে এতিয়েন তার সঙ্গে কথা বলছিল। বাইরে ভোরের কনকনে ঠাণ্ডা আর হিমের মধ্যে যেতে হবে একথা ভাবতে তার দেহের হাড়গুলো কেঁপে উঠছিল। এমন সময় তার পিছন থেকে কে তার কাঁধে হাত দিয়ে আশ্বাসের ভঙ্গিতে বলল, এদিকে এস, তোমার জন্য যা হোক একটা কাজ যোগাড় হয়েছে।

প্রথমে কথাটার মানে ভাল করে বুঝতে পারেনি এতিয়েন। তারপর বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের আতিশয্যে ক্যাথারিনের হাতটা জড়িয়ে ধরল। বলল, ধন্যবাদ বন্ধু। তুমি সত্যিই খুব ভাল।

ফার্নেসের আগুনের আভায় এতিয়েনের মুখখানা আলোকিত হয়ে উঠেছিল। ক্যাথারিন সে মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল। তাকে এতিয়েন পুরুষ ভেবেছে-এটা ভাবতে সত্যিই মজা হচ্ছিল তার। তার চুলগুলো নীল টুপীটাতে ঢাকা পড়েছে বলে তাকে মেয়ে বলে বুঝতে পারেনি এতিয়েন।

একটা বিপদ থেকে মুক্ত হওয়ার ফলে খুশি মনে হাসছিল এতিয়েন। কিছু-ক্ষণের জন্য দাঁড়িয়ে পরস্পরের মুখপানে তাকিয়ে হাসতে লাগল তারা।

ওরা এসে দেখল মাহিউ তখনো লকার রুমে ছিল। এতিয়েন তার কাছে যেতেই কয়েকটা কথায় সব ঠিক হয়ে গেল। এতিয়েন চাকরিতে নিযুক্ত হলো। সে পাবে প্রতিদিন তিরিশ স্যু। তার কাজটা কঠিন হলেও সে সহজেই শিখে নিতে পারবে। তাকে মাথায় পরার জন্য একটা গোল চামড়ার টুপী দেওয়া হলো। ফ্লোরেন্সের কোদাল আর যন্ত্রপাতিগুলো নিল এতিয়েন।

মাহিউ হঠাৎ চিৎকার করে বলল, আবার শ্যাভেলের কি হলো? সেও মরল নাকি? আমার ত মনে হচ্ছে আমাদের আধ ঘণ্টা দেরী হয়ে গেছে এরই মধ্যে।

জ্যাকারি বলল, তুমি শ্যাভেলের জন্য অপেক্ষা করছ? সে ত আমাদের আগেই খনিতে ঢুকে গেছে।

মাহিউ বলল, তুমি দেখেছ অথচ বলনি। যাই হোক, চলে এস।

ক্যাথারিন তার হাত দুটো সেঁকছিল। সে পিছিয়ে পড়ল। বাকি সবাই চলে গেছে। এতিয়েন ক্যাথারিনের পিছনে পিছনে যেতে লাগল। খালি পায়ে তারা ল্যাম্প নেবার জন্য অন্ধকার গলিপথ পার হয়ে একটা ঘরে গেল। সেই কাচের ঘরটাতে বিভিন্ন তাকের উপর অসংখ্য ডেভি ল্যাম্প সাজানো আছে সারবন্দীভাবে। সেগুলিকে পরিষ্কার করে গতকাল পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে।

প্রতিটি ল্যাম্পের উপর এক একটি শ্রমিকের নম্বর দেওয়া আছে। সকলেই আপন আপন নম্বর মিলিয়ে এক একটা ল্যাম্প নিয়ে সেটা বন্ধ করে চেকারের কাছে নিয়ে গেল। চেকার আবার পরীক্ষা করে দেখতে লাগল ঠিকমত ল্যাম্প-গুলো বন্ধ করা হয়েছে কি না। এতিয়েনের জন্য একটা দরখাস্ত লিখে জমা দিতে হলো মাহিউকে। তার একটা ল্যাম্প চাই; সে নতুন লোক।

ক্যাথারিন বলল, এখানে দারুণ শীত; একটুও তাপ নেই।

ঘাড় নেড়ে তার কথায় সম্মতি জানাল এতিয়েন।

খাদে নামার জন্য চালাটায় গিয়ে ওরা দাঁড়াল। এতিয়েনের একবার মনে হলো তার আর কোন ভয় নেই। কিন্তু ভয় না থাকলেও চারদিকের ঘর্ঘর আওয়াজ আর স্যাঁতসেঁতে ঠাণ্ডায় কেমন একটা অস্বস্তি অনুভব করছিল সে। ডুলিটা রাত্রির পশুর মত এক একদল লোক গ্রাস করে নিচে নেমে যাচ্ছিল। এতিয়েনের পালা এলে সেও ওদের সঙ্গে এগিয়ে গেল। তার খুব শীত লাগছিল। তার নীরব মুখের উপর এক নিরুচ্চার অস্বস্তি ফুটে উঠছিল। লেভাক আর জ্যাকারি দুজনেই নাক সেঁটকাল। লেভাক ও জ্যাকারি দুজনেই এতিয়েনের নিয়োগে সন্তুষ্ট হতে পারেনি। কারণ তার নিয়োগের ব্যাপারে মাহিউ তাদের সঙ্গে কোন আলোচনা করেনি। তাছাড়া এতিয়েন একজন অপরিচিত ব্যক্তি।

কিন্তু ক্যাথারিন এতে খুশি হয়েছে। সে যখন দেখল তার বাবা মাহিউ এতিয়েনকে তার কাজ সম্বন্ধে কি সব বোঝাচ্ছে তখন সে আরও খুশি হলো।

মাহিউ বলল, এত দেরি হচ্ছে কেন? এখানে আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে

কি করছি ?

ডেপুটি রিকোমে কাছে ছিল। সে কথাটা শুনতে পেয়ে বলল, দাঁড়াও, কাজ ঠিকই চলছে। সময় হলে লিফট ছাড়বে।

ডুলির গাগুলো তারের জাল আর লোহার পাত দিয়ে তৈরি। ওরা পাঁচজন এক জায়গায় দাঁড়াল, জ্যাকারি, মাহিউ, লেভাক, ক্যাথারিন আর এতিয়েন। জায়গার অভাবে ক্যাথারিনের কনুইটা এতিয়েনের তলপেটে লাগছিল। ওরা এতিয়েনকে বলল, তার ল্যাম্পটা যেন সে তার বোতামের হুকে ঝুলিয়ে নেয়। কিন্তু সে কথাটা শুনতে না পাওয়ায় ল্যাম্পটা তার হাতেই রেখেছিল।

হঠাৎ একটা প্রবল ঝাঁকুনি অনুভব করল এতিয়েন। সঙ্গে সঙ্গে তার চোখের উপর থেকে সব জিনিসগুলো যেন উড়ে পালাল। ও বেশ বুঝতে পারল ও যেন কোথায় পড়ে যাচ্ছে। অদ্ভুত একটা অনুভূতি ওর পেটের ভিতর থেকে যেন উঠে আসছিল। কিন্তু এতক্ষণ আলো ছিল। কিন্তু এতিয়েনের চোখের সামনে থেকে যখন সব আলো সরে গেল, সব অন্ধকার হয়ে গেল তখন তার সব চেতনা ও অনুভূতি একাকার হয়ে গেল। সে বুঝতে পারল না সত্যি সত্যিই সে কি অনুভব করছে।

মাহিউ বলল, আমরা তাহলে যাচ্ছি।

ওরা সবাই চুপচাপ আপন আপন জায়গায় দাঁড়িয়েছিল। এতিয়েন বুঝতেই পারছিল না সে নীচে যাচ্ছে না উপরে উঠছে। চারদিক অন্ধকার বলেই এমন হচ্ছিল। এক সময় মনে হচ্ছিল ডুলিটা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, নড়ছে না। ওদের ল্যাম্পের আলোগুলো এতই অস্পষ্ট যে কোলের মানুষকেও দেখা যাচ্ছিল না।

হঠাৎ কিসের একটা শব্দ শুনতে পেল এতিয়েন। ঠিক যেন বৃষ্টি পড়ার শব্দ। মনে হচ্ছিল ডুলিটার ছাদে বৃষ্টি পড়ছে। জলের ফোঁটাগুলো ক্রমশই জোরে পড়ছিল। ছাদটা ফুটো থাকার জন্য দুই একটা ফোঁটা এতিয়েনের ঘাড়ের উপর পড়ল। দারুণ ঠাণ্ডায় জলের ফোঁটা লাগায় আরো বেশী শীত করছিল এতিয়েনের। হিমশীতল অন্ধকারে তলিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ এক ঝলক আলো দেখতে পেল ওরা। লোকজনদের শব্দ শোনা যাচ্ছিল। তারপর আবার সেই হিমশীতল অন্ধকার আর শূন্যতা।

মাহিউ বলল, আমরা প্রথম স্তরটা পার হলাম। আমরা এখন তিনশো কুড়ি মিটার তলায় আছি। আরো তিনটে স্তর আছে।

মাহিউ তার হাতের ল্যাম্পটা নাড়তে লাগল। হঠাৎ আলোর এক একটা ঝলকানি দিয়ে আরো তিনটে স্তর দেখতে দেখতে পার হয়ে গেল।

এতিয়েন অস্ফুট স্বরে বলল, আর কত গভীর !

আবার তেমনি বৃষ্টির মত জল পড়ছিল। এতিয়েনের মনে হচ্ছিল ওরা যেন

ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে নামছিল। কোন রকমে অল্প একটু জায়গায় দাঁড়িয়েছিল এতিয়েন। একবার নড়তে পর্যন্ত পারছিল না। ক্যাথারিনের কনুইটা তার পেটের উপর লাগছিল। অবশেষে ডুলিটা তাদের গন্তব্যস্থলে থামল। পাঁচশো চুয়াল্ল মিটার গভীরে ওরা এসে পড়েছে।

এতিয়েন যখন শুনল এখানে আসতে ওদের মাত্র এক মিনিট সময় লেগেছে তখন সে অবাক হয়ে গেল। অথচ ওর মনে হচ্ছিল ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে ওরা নামছে। ডুলি থেকে শক্ত মাটির উপর পা দিয়ে চারদিকে আলো ও লোকজন দেখে মনে সাহস পেল এতিয়েন। সে খুশি হয়ে ক্যাথারিনের পিঠটা চাপড়ে দিল। তখনো বুঝতে পারেনি ক্যাথারিন মেয়েছেলে।

এতিয়েন হালকাভাবে ক্যাথারিনকে বলল, তোমার চামড়ার তলায় কি আছে? তোমার গা-টা এত গরম কেন? তোমার কনুইটা আমার পাকস্থলীর উপর চাপ দিচ্ছিল।

ক্যাথারিন ভাবল, এতিয়েন একটা গাধা, এখনো সে তাকে বেটাছেলে ভাবছে। সে বলল, চল তোমাকে আমি বলছি আমার কনুইটা তোমার কোথায় লেগেছিল।

কথাটা শুনে হেসে উঠল সবাই। কিন্তু সে হাসির কোন অর্থ খুঁজে পেল না এতিয়েন।

ওরা সবাই নেমে এবার যেখানে কয়লা কাটা হচ্ছে সেখানে যাবার জন্য তৈরি হলো। মাহিউ বলল, এখান থেকে আমাদের দু কিলোমিটার যেতে হবে।

উপরে পাথরের ছাদ। একটা সুড়ঙ্গ পথ ধরে এগিয়ে চলেছিল ওরা। ওদের প্রত্যেকের হাতে যে একটা করে ল্যাম্প ছিল তার আলোটুকুকে সম্বল করে ওরা এগিয়ে চলেছিল। নিচেতে লাইন পাতা ছিল। তাতে মাঝে মাঝে এতিয়েনের পাটা লাগছিল। মাহিউ বলছিল, আমরা অভ্যস্ত; তুমি এখানে নতুন আসছ।

জ্যাকারি, ক্যাথারিন ও লেভাকের পর মাহিউ ছিল। এতিয়েন ছিল মাহিউর পিছনে।

হঠাৎ একটা শব্দ শুনতে পেল এতিয়েন। মনে হলো কোথায় যেন বজ্রপাত হচ্ছে। মনে হলো একটা চাপা বজ্রগর্জন মাটির গভীর হতে উঠে আসছে। কিছুক্ষণ পর ওরা দেখল একটা বড় সাদা ঘোড়া কয়েকটা টব টেনে আনছে নিচের পাতা লাইনের উপর দিয়ে। ওরা দেওয়ালের গায়ে পিঠ দিয়ে পথ থেকে সরে দাঁড়াল। সে টবের উপর বেবার্ত ও জাঁলিনকে দেখা গেল। ওরা এরই মধ্যে কাজে লেগে গেছে।

টবগুলো চলে গেলে ওরা আবার ওদের যাত্রা শুরু করল। এবার ওরা কতকগুলো পথের মুখের কাছে এসে পড়ে গেল। ওদের সামনে আরও দুটো পথ,

এখানে ওরা আবার ভাগ হয়ে গেল।

এতিয়েন দেখল এখানে ঘোড়ায় টানা টবের সংখ্যা বেশী। প্রায়ই খালি বা ভর্তি টবগুলো ঘোড়ায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে এদিক ওদিক। আর তার সঙ্গে সঙ্গে একটা করে বজ্রগর্জন অন্ধকার সুড়ঙ্গ পথে কোথায় মিলিয়ে যাচ্ছে। সেই অন্ধকারের ভিতর ঘোড়াগুলোকে ভূতুড়ে প্রাণী বলে মনে হচ্ছে।

এতিয়েন যে পথে যেতে শুরু করল সে পথটা এবার ক্রমশই সরু হয়ে আসছিল। মাথার ছাদটাও নিচু হয়ে আসছিল। জায়গায় জায়গায় ওদের মাথাটা নিচু করতে হচ্ছিল। মাঝে মাঝে ওদের মাথা ছাদে ঠেকছিল। এতিয়েন দেখল তার মাথায় চামড়ার টুপী না থাকলে তার মাথাটা এতক্ষণে ফেটে যেত।

এতিয়েনের সামনে ছিল মাহিউ। ল্যাম্পের স্বল্প আলোয় তার চেহারাটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না। এখানে মাঝে মাঝে কাঠ দিয়ে মাথার উপর ছাদ দিয়ে আটকানো হয়েছে। সেই কাঠে এতিয়েনের মাঝে মাঝে ঠোকর লাগছিল। এখানে পায়ের নিচের মাটিটা জলে পিচ্ছিল থাকার জন্য এতিয়েনের পা ছুটো প্রায়ই পিছলে পড়ছিল। চারদিকে শুধু কাদা।

শুধু এবার আর একটা নতুন অসুবিধা দেখা দিল। প্রথমে যখন ওরা খাদের ভিতর নেমেছিল তখন ওদের শীত-শীত করছিল। কারণ তখন বায়ু-সঞ্চালনের ব্যবস্থা ছিল। তারপর ছাদের ভিতর যে প্রধান পথটা দিয়ে তারা হাঁটছিল তাতেও বায়ু সঞ্চালনের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু এখন যে সরু পথটা ধরে ওরা হাঁটছে সে পথে বায়ু সঞ্চালনের ভাল কোন ব্যবস্থা না থাকার জন্য দারুণ গরম লাগছে। এখানে যে বাতাস আসে তা খুবই কম। তাই বাইরে ও খাদের অন্যান্য জায়গায় দারুণ শীত থাকা সত্ত্বেও এখানে অসহ্য গরম অনুভূত হচ্ছে। গরমে শ্বাস রোধ হয়ে আসছিল এতিয়েনের।

মাহিউ একটা কথাও বলল না। সে আর একটা পথ পেয়ে তাতে মোড় ফিরল। এখানে ছাদটা এত নিচু যে চলতে গিয়ে এতিয়েনের মাথা ও বগলের এক জায়গায় ছিঁড়ে গেল। একেবারে কুঁজো হয়ে হাঁটতে হচ্ছিল ওদের। তার উপর হাঁটুভোর জল। এইভাবে ছশো মিটার যেতে হবে ওদের।

এইভাবে যেতে যেতে জ্যাকারি, ক্যাথারিন ও লেভাক অদৃশ্য হয়ে গেল।

এতিয়েনের মনে হলো ওদের সামনের একটা ফাটল দিয়ে কোথায় ঢুকে গেল তারা।

মাহিউ বলল, এবার আমাদের উপরে উঠতে হবে। এই বলে সেও অদৃশ্য হয়ে গেল। অথচ তাকেই অনুসরণ করে যেতে হবে এতিয়েনকে। মাহিউ বলল, তোমার ল্যাম্পটা বোতামের হুকে রাখ। তারপর ছাদের কাঠগুলোকে শক্ত করে ধরে ধরে এস।

এতিয়েন অতি কষ্টে যে পথটা ধরে উপরে উঠছিল সেটা পনের মিটার দীর্ঘ।

সেখান থেকে আরও উপরে যেতে হবে। তবে যেখানে কয়লা কাটা হচ্ছে সে জায়গায় পৌঁছতে পারবে। সেইখানে মাহিউর দলের সবাই কাজ করছে অর্থাৎ কয়লা কাটছে।

কিন্তু সেখানে যাবে কি করে? সরু ফাটল দিয়ে যেতে গিয়ে তার পিঠ ও বুকের চামড়া ছিঁড়ে যাচ্ছিল। কোন বাতাস না থাকার জন্য শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল এতিয়েনের। মনে হচ্ছিল দেহের সব রক্ত চামড়া ফেটে বেরিয়ে আসবে এখনি। যেতে যেতে এক জায়গায় লিভি ও মুকেত্তেকে কাজ করতে দেখল।

ঘামে সারা শরীর ভিজে গিয়েছিল এতিয়েনের। তবু আপ্রাণ চেষ্টা করে সঙ্গীদের সঙ্গ নেবার চেষ্টা করছিল সে। ক্যাথারিন এক জায়গা থেকে তাকে উৎসাহ দিয়ে বলল, ভয় নেই। এখানে আমরা আছি।

আর একজনের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল এতিয়েন। সে কণ্ঠস্বর শ্যাভেলের। শ্যাভেল বলছিল, আমাকে মঁতসু হতে দুমাইল হেঁটে আসতে হয়েছে, তবু আমি সবচেয়ে আগে এসে পৌঁছেছি।

এতিয়েনকে দেখে বিরক্তি ও বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল, এ কাকে দেখছি?

মাহিউ সব কথা বুঝিয়ে বললে শ্যাভেল বলল, মেয়েদের সঙ্গে পুরুষরা তাহলে ভাগ বসাচ্ছে।

শ্যাভেলের মুখপানে তাকাল এতিয়েন। অস্বস্তি বোধ করছিল। দুজনে দুজনের পানে তাকাতেই এক অব্যক্ত নিরুচ্চার ঘৃণা ফুটে উঠল তাদের দৃষ্টির মধ্যে। এতিয়েন বেশ বুঝতে পারল শ্যাভেলের দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে ঘৃণা আর অপমান। যাই হোক, ওরা সবাই কাজ করতে লাগল। সব সুড়ঙ্গগুলো যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে সেই প্রান্তে সকলে কয়লা কাটতে শুরু করে দিয়েছে। সব মিলিয়ে সাতশো লোক কাজ করছে। লোভী খাদটা সারা দিনের খোরাকের মত এই সাতশো লোককে সাতসকালে গলাধঃকরণ করে নিয়েছে। অসংখ্য উইপোকা যেমন একটা বিরাট কাঠকে সকলের অলক্ষ্যে অগোচরে কুড়ে কুড়ে খেতে থাকে তেমনি এই সাতশো মানুষের পৃথিবীর গর্ভস্থ একটা গোপন পাথুরে অংশকে সকলের অলক্ষ্যে কেটে চলেছে। উপর থেকে তাদের দেখা না গেলেও তাদের সমবেত কর্মতৎপরতায় একটা বিরাট স্পন্দন উপর থেকে কান পেতে শোনা যাবে, অনুভব করা যাবে। তাদের সেই কাজের প্রমাণস্বরূপ মাঝে মাঝে কাটা কয়লাগুলো টবে ভর্তি হয়ে উঠে যায়।

কাজ করতে করতে এতিয়েন এক সময় মুখ ঘুরিয়ে দেখল তার পাশেই ক্যাথারিন কাজ করছে। এবার ভাল করে দেখে সে। তার বুকের উঁচু অংশ দেখে বুঝল সে মেয়েছেলে। তাই আশ্চর্য হয়ে বলল, তুমি মেয়ে?

ক্যাথারিন খুশি হয়ে সরাসরি উত্তর দিল, হ্যাঁ। কিন্তু এই সহজ কথাটা বুঝতে তোমার কত সময় লাগল?

৪

চারজন খনিশ্রমিক কয়লা কাটার মুখটায় কাজ করছিল। তাদের প্রত্যেকের হাতে ছিল একটা করে গাঁইতি। প্রত্যেকটি শ্রমিক তার আশেপাশে চার মিটার জায়গা নিয়ে কাজ করছিল। কয়লা কাটার গোটা জায়গাটা পঞ্চাশ সেন্টিমিটার জুড়ে ছড়িয়ে আছে। কিন্তু এখানে ছাদ নিচু বলে ওদের গুড়ি মেরে অর্থাৎ মাথা নিচু করে ও হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে গাঁইতি চালিয়ে কয়লা কাটতে হয়। এক একবার ওদের শুয়ে পড়তে হচ্ছিল।

মাহিউ ছিল সবচেয়ে উপরে। জ্যাকারি, লেভাক আর শ্যাভেল ছিল তলার দিকে। ওদের হাত দিয়ে সঞ্চালিত গাঁইতির আঘাতে কয়লার বড় বড় চাংগুলো নেমে আসছিল। কিন্তু সে কয়লা নরম বলে চাংগুলো নিচেতে পড়েই টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ছিল। সেই টুকরোগুলো ওদের তলপেটে ও জানুতে এসে লাগছিল। সেই কয়লাগুলোতে টবগুলো ভর্তি হতেই তা বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গে তা অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল।

সবচেয়ে কষ্ট হচ্ছিল মাহিউর। সে ছিল সবচেয়ে উপরে। সেখানে একেবারে বাতাস নেই। সেখানে তাপমাত্রার পরিমাণ পঁয়ত্রিশ সেন্টিগ্রেড। গরমে দম বন্ধ হয়ে আসছিল তার। দেখার সুবিধার জন্য মাহিউ তার ল্যাম্পটা মাথার উপর একটা হুকে ঝুলিয়ে রেখেছিল। তাতে তার মাথাটা আরও গরম হয়ে উঠছিল।

কিন্তু মাহিউর সবচেয়ে কষ্ট হচ্ছিল জলে। উপর থেকে ক্রমাগত ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছিল নির্দিষ্ট কতকগুলো জায়গায়। মাহিউ তার মাথা ও ঘাড়টা জলের ফোঁটা এড়াবার জন্য পিছনে ফেরাচ্ছিল ও সরিয়ে নিচ্ছিল। জলের ফোঁটাগুলো তার মুখচোখের উপর পড়ছিল। তবু মাহিউ সমানে কয়লা কেটে চলেছিল। কোন বাধা সে মানবে না। তবে আজ সে জলের ফোঁটাগুলোকে ক্ষুব্ধ হয়ে বেশী করে গালাগালি দিচ্ছিল, তার কারণ একটা জলের ফোঁটা তার চোখের উপর ঝড়ে পড়ছিল বারবার। তাতে কাজের ভীষণ অসুবিধা হচ্ছিল। তবু এক মুহূর্তের জন্য কাজ থামায় নি মাহিউ। বইএর দুটো পাতার মাঝখানে আটকে পড়া মাছির মত দুটো বড় পাথরের মাঝখানে কোন রকমে দাঁড়িয়ে কয়লা কেটে চলেছিল সে।

কেউ একটা কথাও বলছিল না। নীরবে তারা কাজ করে যাচ্ছিল আর তাদের কয়লা কাটার একটানা নীরস শব্দটা বাতাসের অভাবে কোন প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করতে না পেরে একটা নির্দিষ্ট জায়গার মধ্যেই ঘুরপাক খাচ্ছিল।

কিন্তু ঠিক কোথায় কোনখানে কয়লা কাটা হচ্ছিল তা মোটেই দেখা যাচ্ছিল না। কারণ গুঁড়ো কয়লার ধূলোয় অন্ধকারটা এখানে দারুণ জটিল হয়ে উঠেছিল। সেই অন্ধকারের মাঝে শুধু ওদের ল্যাম্পের অস্পষ্ট লাল আলোগুলো দেখা যাচ্ছিল। সে আলোয় শুধু দুটো করে পেশীবহুল হাত,

মানুষের এক একটা পিঠ আর সামরিকভাবে কুটিল হয়ে ওঠা এক একটা বিকৃত মুখ দেখা যাচ্ছিল অস্পষ্টভাবে। নিস্তরঙ্গ ভারী বাতাস আর ক্রমাগত ঝরে পড়া ফোঁটা ফোঁটা জলে হাঁপিয়ে পড়া ক্লান্ত কর্মরত কতকগুলি মানুষের হাঁপানির শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

প্রায় তিন মিটার জায়গা জুড়ে কয়লা কাটা হয়ে গেছে এরই মধ্যে। আজ জ্যাকারির হাতে ব্যথা করছিল। সে ঠিক করে গাঁইতি চালাতে পারছিল না। তাই কিছু কাঠের কাজ বাকি থাকায় সে সেইদিকে মন দিল। সে এতিয়েনকে হেঁকে কিছু কাঠ আনতে বলল। ওরা শুধু কয়লা কেটে চলেছে; যেখানে সতর্কতা অবলম্বনের জন্য কাঠের ঠেকা দেওয়া হয়নি জ্যাকারিকে এখন সেই কাজটা করতে হবে।

ক্যাথারিন তখন এতিয়েনকে কিভাবে গাঁইতি ধরে চালাতে হয় তা শেখাচ্ছিল। এমন সময় জ্যাকারি তাকে কিছু কাঠ আনার জন্য ডাকল। কিন্তু কাঠের পরিমাণ বেশী নেই। রোজ সকালে বিভিন্ন আকারের কাঠ উপর থেকে খাদের নিচে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু গতকাল খরচ হওয়ার পর কাঠের স্টক বেশী ছিল না।

জ্যাকারি দেখল কয়লার খাদ থেকে কোনরকমে উঠে দু হাতে চারটে ওক কাঠ নিয়ে ধীর পায়ে আসছে এতিয়েন। তার দেরি হচ্ছে দেখে সে চিৎকার করে উঠল, এদিকে তাকাও, কুঁড়ের হদ্দ কোথাকার। একটু তাড়াতাড়ি করো।

জ্যাকারি তার হাতের একটা যন্ত্র দিয়ে একটা ছাদের গায়ে আর একটা দেওয়ালের গায়ে গর্ত করল কাঠ লাগাবার জন্য। রোজ বিকালে শ্রমিকরা সারা দিন কাজকর্ম সারার পর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে কাঠের কাজগুলো করে রেখে যায়। শুধু একেবারে উপরে যেখানে কয়লা কাটা হয় আর নিচের দিকটায় কোন কাঠ লাগানো হয় না।

মাহিউর ক্ষোভ এখন অনেকটা কমেছে। সে যে কয়লা কাটছিল তা এবার নরম হয়ে ঝরে পড়ছে। সে একবার পিছন ফিরে দেখে নিল, জ্যাকারি এখন কি করছে। তাকে কাঠের কাজ করতে দেখে মাহিউ বলল, এখন ওসব থাক। আমরা লাঞ্চ খাওয়ার পর ওসব দেখব। এখন কয়লা কেটে যাও, কারণ টবগুলো সব ভর্তি করতে হবে।

জ্যাকারি বলল, দেখ ফাট ধরেছে, এখন না আটকে দিলে ভেঙ্গে পড়বে।

কিন্তু মাহিউ সে যুক্তি মানল না। সে বলল, ও সব পরে করা হবে। আমরা যা করে হোক বেরিয়ে যাব।

জ্যাকারি ইতস্ততঃ করছিল দেখে মাহিউ রেগে গিয়ে গালমন্দ করতেই জ্যাকারি আবার কয়লা কাটার কাজে চলে গেল।

আসলে তখন ওরা ক্ষণিকের জন্য কাজ বন্ধ করে বিশ্রাম করছিল। লেভাক চিৎ হয়ে শুয়েছিল। তার বাঁদিকের জানুতে এক জায়গায় ছিঁড়ে গিয়ে রক্ত

পড়ছিল। সে তাই রাগে গজগজ করছিল। শ্যাভেল তার শার্টটা ছিঁড়ে তাই ধরে হাওয়া করছিল তার শরীরটাকে ঠাণ্ডা করার জন্য।

কয়লার গুঁড়োয় তাদের সারা দেহ কালো হয়ে গেছে। ঘামেতে কয়লার কালি চিটিয়ে লেগে গেছে তাদের গায়ে।

মাহিউ আবার কয়লা কাটা শুরু করল। এবার সে একটু নিচু স্তরে দাঁড়িয়েছিল। তার মাথাটা ছাদের পাথরে ঠেকছিল। এবার কিন্তু জলের ফোঁটা আরো জোরে তার মাথায় পড়ছিল। মনে হচ্ছিল তার ক্রমাগত আঘাতে ফুটো হয়ে যাবে তার মাথাটা।

এই সব অসুবিধার দিকে এতিয়েন এক বিপন্ন আগ্রহের সঙ্গে তাকাচ্ছিল। তাই ক্যাথারিন তাকে বলল, ওসব দিকে তাকিও না। খনিশ্রমিকদের এসব সহ্য করতে হয়।

ক্যাথারিন আবার বলতে লাগল, প্রতিটি টব এখানে যেভাবে যে নম্বর দিয়ে ভর্তি করে ছাড়া হবে ঠিক সেইভাবে উপরে গিয়ে পৌছতে হবে। উপরে চেকার আছে; পরীক্ষা করে দেখবে। যে দল যত কয়লা পাঠাতে পারবে তাদের সেইমত নাম হবে। তবে টবে কয়লা ভর্তি করার সময় দেখবে কয়লা যেন ভাল হয়। কয়লা ভাল না হলে চেকার তা বাতিল করে দেবে।

এতিয়েনের চোখ এখন অন্ধকারে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এখন সে অন্ধকারে অনেক জিনিস দেখতে পাচ্ছে কিছু কিছু। এখন সে দেখল ক্যাথারিনের গায়ের রংটা সাদা ফ্যাকাশে। তার বয়স কত ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না। তার আকারটা ছোট বলে একবার মনে হলো তার বয়স মাত্র বারো। কিন্তু পরে তার হাবভাব কাজকর্ম দেখে মনে হলো তার বয়স নিশ্চয় বেশী হবে। তবে তার মাথায় টুপী আর মুখে কালি থাকার জন্য তাকে মোটেই দেখতে ভাল লাগছিল না।

কিন্তু ক্যাথারিনের আকারটা ছোট হলেও তার আশ্চর্য শক্তি দেখে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল এতিয়েন। শুধু শক্তি নয়। তার কাজ করার কৌশলও অসাধারণ। সে কত সহজে টবে কয়লা ভর্তি করে সেই টব অবলীলাক্রমে পাতা লাইনের উপর দিয়ে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল। অথচ সে নিজে ঠিকমত টবে কয়লা ভর্তি করতে পারছিল না আর সেই ভর্তি টব লাইনের উপর দিয়ে ঠেলে নিয়ে যেতে পারছিল না। প্রায়ই লাইন থেকে তার টব পড়ে যাচ্ছিল।

রাস্তাটা অবশ্য খুবই খারাপ। যেখান থেকে কয়লা কাটা হচ্ছিল আর টবে ভরা হচ্ছিল আর যেখানে টবগুলো নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, এই দুই জায়গার দূরত্ব ষাট মিটার। সুড়ঙ্গ পথটা চওড়া করা হয়নি, তার উপর মাথার ছাদটা এবড়ো-খেবড়ো ও খুব নিচু। কোনরকমে একটা ভর্তি টব যেতে পারে পথটায় আর তার পিছনে টবটাকে ঠেলে চালায় যে তাকে মাথাটা নিচু করে যেতে হয়। তা না হলে ছাদের পাথরে তার মাথা কেটে যাবে। তাছাড়া আশেপাশে যে সব

কাঠের ঠেকা দেওয়া ছিল সেই সব কাঠেও গায়ের চামড়া ছিঁড়ে যাওয়ার ভয় ছিল যে কোন মুহূর্তে।

'আবার গেল?' ক্যাথারিন হেসে উঠল।

তার হাসির কারণ ছিল। এতিয়েনের কয়লা ভর্তি টবটা আবার পড়ে গিয়েছিল লাইন থেকে। সে সেটা তুলে লাইনে বসাতে পারছিল না কিছুতেই। তার উপর লাইনের আশে পাশে কাদা থাকার জন্য আরো অসুবিধা হচ্ছিল। রাগে এতিয়েন বিড় বিড় করে কি সব বকছিল। টবের চাকাগুলো শত চেষ্টাতেও নড়াতে পারছিল না।

ক্যাথারিন বলল, একটু থাম। মাথা গরম করলে সব কাজ পণ্ড হয়ে যাবে।

এই বলে সে তার পিঠটা টবের পিছনে লাগিয়ে সেটাকে একটু তুলে তার চাকাগুলো লাইনের উপর বসিয়ে দিল। এই ভর্তি টবের ওজন সাতশো কিলোগ্রাম। অবাক বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে ক্যাথারিনের পানে তাকিয়ে রইল এতিয়েন। পরে আমতা আমতা করে ক্ষমা চাইল।

এরপর ক্যাথারিন এতিয়েনকে আবার শেখাতে লাগল, কিভাবে শক্ত করে পা রেখে টবের পিছনে বুক নিয়ে হাত দুটোকে টবের উপর শক্ত করে ধরে চলতে হয়। হাত দুটো জড়ো করে এমন ভাবে হাঁটতে হবে যাতে পাশের কাঠগুলোতে হাত না ঠেকে।

ক্যাথারিন পথ দেখিয়ে দিলেও এতিয়েন ঠিকমত যেতে পারছিল না। অথচ ক্যাথারিন কত সহজে টব নিয়ে হেঁটে চলেছিল। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল সে যেন সার্কাসের এক কুশলী পশু। তার গা ঘামে ভিজে গিয়েছিল। সে হাঁপাচ্ছিল, তবু মুখে কোন অভিযোগ অনুযোগ করল না ক্যাথারিন। মানব জীবনের এক অতি সাধারণ দুঃখ কষ্ট হিসাবে নীরবে সহ্য করে যাচ্ছিল সে।

কিন্তু ক্যাথারিন যা পারছিল এতিয়েন তা পারছিল না। সে প্রায়ই দাঁড়াচ্ছিল আর যন্ত্রণায় কাতর হয়ে হাঁপাচ্ছিল।

যেখানে টবগুলো জমা দিতে হয়, যেখান থেকে টবগুলো ঘোড়ায় টেনে নিয়ে যায় সেইখানে কিভাবে তাড়াতাড়ি টব জমা দিতে হয় তা শিখিয়ে দিল ক্যাথারিন। টবগুলো সেখানে দুটো ছেলে জমা নিচ্ছিল। একটা বারো বছরের আর একটা ছেলে পনের বছরের। দুজনে অনবরত নোংরা কথা বলে গালাগালি দিচ্ছিল আর চিৎকার করছিল। তাদের কোন কথা বলতে হলে তাদের থেকে জোরে চেঁচাতে হবে।

ক্যাথারিন জোরে চিৎকার করে উঠল, শুনছিস এই পাজী বদমাস কোথাকার?

ছেলে দুটো তখন সত্যিই বসেছিল। কেউ কোন কাজ করছিল না বা কথা বলছিল না।

তখন খাদের মধ্যে হয়ত কোথাও কোন স্তরেই কাজ হচ্ছিল না। হঠাৎ

একটা মেয়ে চিৎকার করে বলে উঠল, আমি জোর করে বাজী রেখে বলতে পারি ওদের দুজনের একজন মুকেত্তের উপর চেপেছে।

সহসা এক হাসির ঝড় ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে পাগল খাদের ভিতরটায়। মেয়ে শ্রমিকরা খিলখিল করে হাসতে লাগল।

এতিয়েন ক্যাথারিনকে জিজ্ঞাসা করল, একথা কে বলল?

ক্যাথারিন বলল, একথা লিডি বলল। লিডির হাত দুটো পুতুলের মত হলেও সে বড় মানুষের মতই টব ভর্তি করতে পারে। আর মুকেত্তে মেয়েমানুষ হলেও ঐ দুটো ছেলেকে শায়েস্তা করতে পারে।

উপর থেকে ফোনে হঠাৎ খবর এল। কোন ডেপুটি হুকুম দিয়েছে তাড়াতাড়ি টব পাঠাও উপরে।

হুকুম আসার সঙ্গে সঙ্গে আবার খাদের ভিতর সব জায়গায় কাজ শুরু হয়ে গেল। খাদের মধ্যে মাঝে মাঝে এই ধরনের এক একটা রসিকতার ঢেউ বয়ে যায়। কোন মেয়ে শ্রমিককে দেখে কখনো কোন সময় হয়ত কোন পুরুষের মধ্যে জেগে ওঠে পাশবিক প্রবৃত্তি। তারপর পরমুহূর্তেই আবার সব ঠিক হয়ে যায়।

টব জমা দিয়ে কয়লাকাটার জায়গায় প্রতিবার ফিরে যাবার সময় এতিয়েন দেখল খাদের সর্বত্রই সেই একই শ্বাসরোধকারী ভয়ঙ্কর গরম। সেই এক শব্দ, ক্লান্ত অবসন্ন শ্রমিকদের সেই হাঁপানি।

কাজ করতে করতে ওরা চারজন কিম্ভূত কিমাকার হয়ে গেছে। ওদের সারা দেহ এমন কালো হয়ে উঠেছে যে কয়লা থেকে ওদের আলাদা করে চেনা যাচ্ছিল না। মাথা হতে পা পর্যন্ত সমস্ত শরীর কালো কালিতে ভরে গেছে। মাহিউ ক্লান্তিতে এক জায়গায় শুয়ে পড়ে হাঁপাচ্ছিল। লেভাক ও জ্যাকারি রাগে আগুন হয়ে উঠেছিল। কারণ কয়লাকাটার জায়গা এবার শক্ত হয়ে উঠেছে।

শ্যাভেলের যত রাগ এতিয়েনের উপর। এতিয়েনকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে রাগে আগুন হয়ে উঠছিল সে। এক সময় বলল, পোকার মত এই জীবটা একেবারে অপদার্থ। একটা মেয়ের গায়ে যে শক্তি আছে তাও তোমার নেই। কি, টব ভরতে যাচ্ছ? না, না যেও না, তাতে ক্লান্ত হয়ে পড়বে তোমার হাত। যদি একটা টবও বাতিল হয়ে যায় তাহলে আমি তোমার দশ স্যু মাইনে বন্ধ করে দেব।

এতিয়েন কোন উত্তর করল না। কারণ প্রথমতঃ সে কাজটা পেয়ে খুশি। যাই হোক, একটা কিছু পেয়েছে, যত কষ্টকরই হোক এ কাজে কোনরকমে তার গ্রাসাচ্ছাদন চলে যাবে। তার উপর সে জানে যারা কাজ জানা সুদক্ষ শ্রমিক তারা নতুন শ্রমিকদের শাসন করবেই। এতে তারই ভাল হবে, সে কাজ শেখার চেষ্টা করবে। কিন্তু কোনমতেই আর কাজ করতে পারছিল না

এতিয়েন। তার পা দিয়ে রক্ত পড়ছিল। তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো মোচড় দিয়ে উঠছিল। তার শূন্য পাকস্থলীর ভিতর কিসে যেন আঁচড় কাটছিল।

ভাগ্যক্রমে ঘড়িতে বেলা দশটা বাজল। অর্থাৎ ওদের লাঞ্চ খাবার সময়।

মাহিউর একটা ঘড়ি ছিল। কিন্তু সে ঘড়ির দিকে ও তাকাল না। ওরা সবাই কয়লাকাটার জায়গা থেকে সরে এসে এক জায়গায় বসল। ওরা ওদের আপন আপন খাবার বার করল। সকলেই তাদের স্যাণ্ডউইচের উপর কামড় দিতে লাগল। একা শুধু ক্যাথারিন দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর সে সোজা চলে গেল এতিয়েনের কাছে।

এতিয়েনের কাছে কোন খাবার ছিল না। সে তাই ওদের কাছ থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে একটা শুকনো জায়গা দেখে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়েছিল। কথাটা ক্যাথারিনের প্রথমে মনে পড়েনি। সে তাই তার পুরু রুটিতে একটা কামড় বসিয়ে দিয়েছিল।

প্রথমে না বুঝেই এতিয়েনের কাছে গিয়ে ক্যাথারিন বলল, তুমি খাবে না ?

তারপর সঙ্গে সঙ্গে কথাটা মনে পড়ে তার। মনে পড়ে গেল নিঃস্ব অবস্থায় চাকরি খুঁজতে খুঁজতে এই কাজটা পেয়ে সোজা খাদে নেমে এসেছে এতিয়েন। তার কাছে কোন খাবার বা খাবার কেনার মত পয়সাও নেই। একথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লজ্জা পেয়ে সে এতিয়েনকে বলল, আমার কাছে যা খাবার আছে তুমি তারই অংশ নিতে পার।

এতিয়েন আপত্তি জানাল। সে বলল, তার খিদে নেই। অথচ ক্ষুধার যন্ত্রণায় তার গলাটা কাঁপছিল।

কিন্তু তার আপত্তি মানল না ক্যাথারিন। সে সহজভাবে বলল, এই দেখ আমি মাত্র একদিকে কামড় দিয়েছি। আমি রুটিটাকে দু ভাগ করেছি। তুমি একটা নিতে পার।

এমন আন্তরিকতা ও সহজ বন্ধুত্বের ভাব নিয়ে কথাটা বলল ক্যাথারিন যে এতিয়েন সেকথা প্রত্যাখ্যান করতে পারল না।

এদিকে কথাটা বলেই এতিয়েনের উত্তরের অপেক্ষা না করেই তার রুটিটাকে দুভাগ করে একটা ভাগ দিয়ে দিল এতিয়েনকে।

রুটিটাকে ক্ষুধার তাড়নায় একটা গ্রাসেই খেয়ে ফেলতে পারত। কিন্তু লজ্জায় সেভাবে খেল না। তার উরুগুলো কাঁপছিল।

ক্যাথারিন এতিয়েনের কাছেই শুয়ে পড়ল। তাদের দুজনের মাঝখানে ল্যাম্পদুটো নামানো ছিল। হঠাৎ এতিয়েনের মনে হলো, ক্যাথারিনকে মোটেই কুৎসিত বলা চলে না। এতক্ষণে সে ভাল করে খুঁটিয়ে দেখল ক্যাথারিনকে। দেখে তাকে অনেক সুন্দর মনে হলো। কয়লার গুঁড়োতে সারা অঙ্গ ও মুখ ভরে আছে। তবু তার ভিতর থেকে তার গায়ের ফর্সা রং, বড় মুখ, লীলায়িত চোখ, মাথার টুপীর ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা বাদামী চুল,

সব মিলিয়ে তাকে সত্যিই বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল।

খাওয়ার ফ্লাস্ক থেকে কফি বার করে এক পাত্র এতিয়েনকে দিল ক্যাথারিন। সেটা খেয়ে তৃপ্তিসূচক একটা শব্দ করে খালি পাত্রটা ক্যাথারিনকে ফিরিয়ে দিল এতিয়েন।

ক্যাথারিন নিজে আর একপাত্র খেয়ে এতিয়েনকেও আর এক পাত্র দিল।

ক্যাথারিনও নীরবে এতিয়েনের পানে তাকিয়ে তাকে দেখল। মৃদু মিষ্টি একটা হাসি ছড়িয়ে ছিল এতিয়েনের মুখে। তার ছিপছিপে চেহারা, কালো মোটা হাসি হাসি মুখ, সব মিলিয়ে তাকে সুন্দর দেখাচ্ছিল ক্যাথারিনের চোখে।

ক্যাথারিনই প্রথমে কথা বলল, তুমি তাহলে একজন মিস্ত্রী, রেলে কাজ করতে। কিন্তু রেল কেন তোমায় ছাঁটাই করল ?

এতিয়েন বলল, কারণ আমি আমার ওপরওয়ালাকে মেরেছিলাম।

ক্যাথারিনের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত কুণ্ঠাহীন বশ্যতা ও আনুগত্যের নীতিটা কেমন যেন অকস্মাৎ ওলট পালট হয়ে গেল।

এতিয়েন বলল, ধরে নাও আমি, একবার মদ খেয়েছিলাম। মদ খেলে মাথার কিছু ঠিক থাকত না। আগে মদ খেলে পাগলের মত হয়ে যেতাম। দুদিন অসুস্থ থাকতাম।

ক্যাথারিন গম্ভীবভাবে বলল, তাহলে তোমার মদ খাওয়া উচিত না।

এতিয়েন বলল, আর ভয় নেই। আমি নিজের ওজন বুঝি।

মদের কথায় ঘৃণায় মনটা ভরে উঠল তার। অতীতের কথা ভেবে তার বাবার মাতাল অবস্থার কথা ভেবে মদের প্রতি নতুন করে ঘৃণা জাগল তার। মদকে বিষের মত মনে হলো।

এতিয়েন বলল, আমার মার জন্যই আমাকে এইভাবে চাকরির খোঁজে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে।

এক কামড় রুটি খেয়ে এতিয়েন আবার বলতে লাগল, মার সময়টা এখন খারাপ যাচ্ছে। আমি তাঁকে মাঝে মাঝে পাঁচ ফ্রাঁ করে পাঠিয়ে দিতাম।

ক্যাথারিন বলল, তোমার মা কোথায় থাকেন ?

এতিয়েন বলল, প্যারিসে রু ছ লা গুত্তে অঞ্চলে। লণ্ড্রী আছে একটা। এই সব কথা মনে করার সঙ্গে সঙ্গে এক ম্লান আলো ফুটে উঠল তার কালো চোখে। তার যৌবনসুলভ শক্তি সামর্থ্যের মধ্যে সে যেন দেখতে পেল এক গোপন দুর্বলতা। অন্ধকার পরিবেশটার পানে একবার তাকাল এতিয়েন। সঙ্গে সঙ্গে ভূগর্ভস্থ এই খনির নিবিড় অন্ধকারে তার গোটা অতীতটাকে যেন স্পষ্ট দেখতে পেল এতিয়েন। মনে পড়ল তার মাকে। যৌবনে তার মা বেশ সুন্দরী ও স্বাস্থ্যবতী ছিল। কিন্তু তার বাবা কেন যে সেই মাকে ত্যাগ করে, পরে মা আবার অন্য একটি লোককে বিয়ে করলে তার বাবা আবার গ্রহণ করে মাকে

তা সে আজও ভুলতে পারেনি। তখন মা বাধ্য হয়ে দুজন স্বামীকে নিয়েই ঘর করতে থাকে। তাদের পাল্লায় পড়ে মাও খারাপ হয়ে যায়। তাদের সঙ্গে তার মাও মদ খেত। এতিয়েনের মনে আছে দুটো খারাপ লোক দুর্গন্ধভরা নোংরা বাড়িখানায় ঘুরে বেড়াত আর মাঝে মাঝে ঘুঁষোঘুঁষি মারামারি করে একে অন্যের চোয়াল ভেঙে দিত। রাত্রিবেলা মার কাছে কে শোবে তাই নিয়ে ঝগড়া হত দুজনের মধ্যে। নারীঘটিত এক আদিম ঈর্ষায় ফেটে পড়ত দুটি মদোন্মত্ত মানুষ। এতিয়েন তখন ছোট। তবু তার সে সব কথা মনে আছে আজও।··· অবশ্য সে আজ অনেক দিনের কথা। এখন তারা কেউ নেই।

এতিয়েন একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, কিন্তু আমি ভাবছি মাত্র তিরিশ স্যুতে আমি মাকে কোন জিনিস কিনে পাঠাতে পারব না। অভাবে অনটনে মরে যাবে মা।

রুটিটায় আর একটা কামড় দিল এতিয়েন। ক্যাথারিন তার ফ্লাস্ক খুলে বলল, একটু পান করো। এটা কফি, এতে তোমার কোন ক্ষতি হবে না।

এতিয়েন আপত্তি জানাল। ভাবল সে তার রুটির অর্ধেকটায় ভাগ বসিয়েছে, তার পক্ষে কফি খাওয়া আর ঠিক হবে না।

কিন্তু ক্যাথারিন জেদ ধরল। সে না দিয়ে খাবে না। এতিয়েন দেখল তার সামনে খুব কাছে নতজানু হয়ে বসে ক্যাথারিন ফ্ল্যাস্ক খুলে কফি ঢালছে পাত্রে। ওরা দুজনে কফি খেতে খেতে হাসতে লাগল। খুব কাছে থেকে দেখে ক্যাথারিনকে সত্যিই সুন্দর দেখাচ্ছিল। তার কয়লার কালি লাগা ঠোঁটগুলো দেখে তাকে চুম্বন করতে ইচ্ছা হলো এতিয়েনের। তাকে হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা জাগল। কিন্তু কিসের কুণ্ঠাবোধ করল। তার ভয় হতে লাগল। ভাবল হয়ত সে শোভন হবে না।

এতিয়েন বলল, তোমার বয়স বোধ হয় চোদ্দ হবে?

ক্যাথারিন বলল, না, আমার বয়স পনের। এখানে মেয়েরা বয়স অনুপাতে ঠিক বাড়ে না।

এতিয়েনের মনে হলো, ক্যাথারিন এখনো শিশুর মত সরল রয়ে গেছে। হয়ত সে এখনো রজঃস্বলা হয়নি। তার কৌমার্য অক্ষত রয়ে গেছে। এখানকার জলহাওয়া ও কঠোর শ্রমের জন্য রজঃস্রাব ব্যাহত হয়েছে। এতিয়েন নানা-রকমের প্রশ্ন করতে লাগল আর ক্যাথারিন তার উত্তর দিয়ে যেতে লাগল। এতিয়েনের মনে হলো সে অনেক কিছু জানে। একে একে বহু লোকের কথা জিজ্ঞাসা করার পর মুকেত্তের কথাটা তুলল এতিয়েন। যার তার সঙ্গে প্রেম করার সব ঘটনা বলল ক্যাথারিন। বলল তার চটুল চপল স্বভাবের কথা। শান্ত কণ্ঠে সব বলল সে। তারপর এতিয়েন তাকে সরাসরি প্রশ্ন করল তার নিজের কোন প্রেমিক আছে কি না।

তার উত্তরে ক্যাথারিন বলল তার কোন প্রেমিক নেই। এ বিষয়ে সে তার

যাকে আপাততঃ বিব্রত করতে চায় না। তবে ভবিষ্যতে একদিন না একদিন যা হোক কিছু একটা ত করতে হবে।

ঘামে তার জামা ভিজে যাওয়ায় শীত লাগছিল ক্যাথারিনের। সে কাঁধগুলো বাঁকিয়ে কুঁকড়ে উঠছিল শীতে। এতিয়েনের মনে হলো পরিবেশের সঙ্গে বাস্তব অবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে চলার অদ্ভুত একটা ক্ষমতা আছে ক্যাথারিনের।

এতিয়েন বলল, তোমরা সবাই যখন ছেলে মেয়ে একসঙ্গে কাজ করো তখন স্বাভাবিকভাবেই প্রেমিক জুটে যেতে পারে। তাই নয় কি?

তা অবশ্য পারে।

এতিয়েন বলল, তাতে কারো কিছু যায় আসে না। সে প্রেমের কথা যাজকদের না বললেই হলো।

ক্যাথারিন বলল, যাজক? যাজকদের আমি গ্রাহ্য করি না। আমি ভয় করি সেই অদৃশ্য কালো মানুষটাকে।

এতিয়েন আশ্চর্য হয়ে বলল, কালো মানুষ!

হ্যাঁ, সেই কালো মানুষ যে মাঝে মাঝে খনির ভিতর নেমে এসে অসতী কুমারী মেয়েদের ঘাড় মটকে দেয়।

ক্যাথারিনের মুখপানে তাকাল এতিয়েন। তার মনে হলো ক্যাথারিন তাকে ভয় দেখাচ্ছে।

ক্যাথারিন বলল, তুমি রূপকথায় বিশ্বাস কর না? তুমি কি এ বিষয়ে কিছু জান না?

এতিয়েন বলল, হাঁা জানি, আমি লিখতে পড়তে পারি। বাড়িতে এটা অনেক কাজে লাগে। আগে আমাদের বাবা মা-রা এসব শেখাত না।

ক্যাথারিনের তখনো খাওয়া হয়নি। সে একটু একটু রুটি আর এক ঢোক করে কফি খাচ্ছিল। সে বলছিল তা না হলে তার গলায় রুটিটা আটকে যাবে। এতিয়েন ঠিক করল মনে মনে, ক্যাথারিনের খাওয়া হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে জড়িয়ে ধরে তার গোলাপী ঠোঁটদুটোয় চুম্বন করবে। উদ্ভিন্নযৌবনা ক্যাথারিনের পুরুষের পোষাক ও তার জ্যাকেটের ভিতর থেকে তার নারীদেহের যে সব অংশ দেখা যাচ্ছিল তাতে উত্তেজনা বেড়ে যাচ্ছিল এতিয়েনের। তার সংকল্প দৃঢ় হয়ে উঠছিল। তবু সে জানত সে হয়ত জোর করে ক্যাথারিনকে আলিঙ্গন বা চুম্বন করতে পারবে না। তার ভীরুমনের একটা ফাঁকা প্রয়াস সহসা সংকল্পের রূপ ধারণ করলেও কুণ্ঠার কাঁটায় ও দ্বিধায় অবরুদ্ধ হয়ে যাবে সে সংকল্প।

ক্যাথারিনের খাওয়া হয়ে গেল। এবার এতিয়েনের সংকল্প পূরণের পালা। এবার সে ক্যাথারিনকে জোর করে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করবে। কিন্তু তা করতে গিয়ে পথপানে তাকাল এতিয়েন। দেখতে লাগল কোন খনিশ্রমিক আসছে কি না।

ওদের অলক্ষ্যে শ্যাভেল ওদের পিছনে কোথায় দাঁড়িয়ে ছিল। সে দেখল

ক্যাথারিন বসে রয়েছে মাটিতে এবং 'এখন মাহিউর আসার সম্ভাবনা নেই। তাই ক্যাথারিনের পিছনে গিয়ে হঠাৎ তার মুখটা ঘুরিয়ে নত হয়ে দাঁড়িয়ে জোর করে তার মুখে চুম্বন করল। তারপর মুখটাকে দুহাতে ধরে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

এতিয়েন দেখল শ্যাভেলের কালো মুখে তার মোচ আর ছাগলের মত দাঁড়িটা লালচে দেখাচ্ছিল। শ্যাভেল যেন এতিয়েনকে দেখেও দেখল না। এই চুম্বনের মাধ্যমে শ্যাভেল যেন এতিয়েনের সামনে ক্যাথারিনের উপর তার প্রভুত্বকে অবিসম্বাদিতভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছিল।

কিন্তু ক্যাথারিন আপত্তি করল সে চুম্বনে। সে নির্বিবাদে মেনে নিল না সে চুম্বন। বলল, চলে যাও তুমি। আমাকে ছেড়ে দাও। অবশেষে শ্যাভেল তাকে ছেড়ে দিয়ে কোন কথা না বলে নীরবে সেখান থেকে চলে গেল।

এতিয়েনের গাটা শিউরে উঠল। সে ভাবল সে বোকার মত না জেনে ক্যাথারিনকে চুম্বন করার সংকল্প করেছিল। আর সে কোনদিন তাকে আলিঙ্গন বা চুম্বন করবে না। তা যদি করে তাহলে আর পাঁচজন খনি-শ্রমিকদের সঙ্গে তার কোন পার্থক্য থাকবে না। তার পৌরুষে আর অহং-বোধে আঘাত লাগায় একটা নিবিড় হতাশা অনুভব করছিল এতিয়েন। সে চুপি চুপি ক্যাথারিনকে বলল, কেন তুমি আমায় মিথ্যা কথা বললে? ওই হচ্ছে তোমার প্রেমিক।

এতিয়েন ঘাড় নেড়ে বলল, না না, বিশ্বাস করো, ও আমার প্রেমিক নয়। আমি শপথ করে বলছি, ওর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। তাছাড়া ও এখানে থাকেও না। ও পাস ভ্ ক্যালে থেকে আসে। এখানে মাস ছয় হলো কাজ করছে।

এবার কাজ শুরু হয়ে গেল। ওরা উঠে দাঁড়াল। এতিয়েনকে চুপ করে থাকতে দেখে ক্যাথারিন বিচলিত হয়ে পড়ল। এতিয়েন আর পাঁচজনের থেকে দেখতে সুন্দর ছিল বলে তাকে ভাল লেগেছিল ক্যাথারিনের। সে তাই তাকে নানা ভাবে খুশি করতে চাইছিল। এতিয়েন যখন এক মনে শূন্য দৃষ্টিতে তার ল্যাম্পটার পানে তাকিয়ে তার সামনে নীলচে আলোকবৃত্তটা দেখছিল তখন তার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছিল ক্যাথারিন। এক সময় বলল, এস, তোমাকে একটা মজার জিনিস দেখাই।

কয়লাকাটার জায়গার কাছে এতিয়েনকে নিয়ে গিয়ে একটা ফাটলের পানে হাত বাড়াল ক্যাথারিন। সেই ফাটল দিয়ে পাখির শীষের মত একটা শব্দ আসছিল।

ক্যাথারিন বলল, ঐ ফাটলটার উপর হাত রাখ। কেমন ভিজে ভিজে দেখ। এটাকে বলে ফায়ার-ড্যাম্প।

এতিয়েন আশ্চর্য হয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইল। ওটার মধ্যে কি এমন ভয়ঙ্কর শক্তি আছে যা সব কিছু উড়িয়ে কাটিয়ে দিতে পারে? অথচ ক্যাথারিন সহজভাবে হাসছিল। হাসতে হাসতে একবার বলল, আজ ওর থেকে বোধহয় কিছু গ্যাস আসছে বলেই বাতিগুলোর আলোটা নীল হচ্ছে।

এমন সময় হঠাৎ মাহিউর গলা শোনা গেল, কি তোমাদের গল্প শেষ হলো?

ক্যাথারিন ও এতিয়েন দুজনেই আবার কাজে লেগে গেল। তারা টবে কয়লা ভর্তি করে আবার সে টব জমা দিতে গেল। নিচু ছাদের ভিতর গুড়ি মেরে দুবার যাওয়া আসা করতেই আবার ওদের দেহ ঘামে ভিজে গেল। আবার ওদের দেহের হাড়গুলো কনকন করতে লাগল।

খনিশ্রমিকরা সকলেই যে যার কাজে লেগে গেছে। আবার সেই মুখটায় গিয়ে কয়লা কাটতে শুরু করে দিয়েছে। ওদের লাঞ্চ টাইম শেষ হবার আগেই ওরা কাজ শুরু করেছে যাতে সন্ধ্যের আগে তাড়াতাড়ি ওদের কাজ শেষ হয়ে যায়। যাতে ওদের শীতে খুব কষ্ট পেতে না হয়। তাই কোন রকমে খাওয়াটা শেষ করেছে। তাদের পেটে স্যাণ্ডউইচগুলো এখনো ভারী হয়ে জমে আছে। এখন তারা শুধু কাজ ছাড়া আর কিছু জানে না। কোন কিছু চিন্তা করে না। এখন ওদের একমাত্র ভাবনা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কি করে সব টব ভর্তি করবে। এই ভাবনার কাছে অন্য সব কথা, অন্য সব ভাবনা ম্লান হয়ে গেল। সারাদিনের শ্রমকে সার্থকতার একটি প্রান্ত সীমায় নিয়ে যাবার জন্য মরীয়া হয়ে কাটতে লাগল তারা। কোথায় কিভাবে জল পড়ছে তা আর লক্ষ্য করল না তারা, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কোথায় ব্যথা করছে, ফুলে উঠছে সেদিকে কারো খেয়াল নেই। শ্বাসরোধকারী গুমোট অন্ধকার কিভাবে ঘন হয়ে উঠছে তাও একবার কেউ তাকিয়ে দেখছে না। খাদের ভিতরকার গুমোট গরম, ওদের ল্যাম্প থেকে বেরোন এক ধরনের নীলচে ধোঁয়া, তাদের সমবেত নিঃশ্বাসের গন্ধ সব যোগ হয়ে ভারী করে তুলেছিল খাদের বাতাসটাকে। তাদের চোখের সামনে একটা কুয়াশার জাল যেন ভাসছিল। রাত্রি না আসা পর্যন্ত খাদের ভিতর সমানে এই রকম অবস্থা চলবে। মাটির গভীর গর্ত খুঁড়তে থাকা বড় বড় ইঁদুর ও ছুঁচোর মত এক অলক্ষ্য গোপন তৎপরতায় নীরবে কাজ করে যেতে লাগল অক্লান্তভাবে।

৫

মাহিউ তার ঘড়িটা তার কোট থেকে বার না করেই কাজ থামিয়ে বলল, জ্যাকারি, শেষ হলো?

কি একটা কাঠের কাজ করছিল জ্যাকারি। কিন্তু মাঝপথেই কাজটা

থামিয়ে ক্লান্ত হয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে বলল, হ্যাঁ, আগামী কাল ঠিক হয়ে যাবে।

কাঠের কাজ ছেড়ে জ্যাকারি আবার কয়লা কাটার জায়গায় ফিরে গেল। লেভাক ও শ্যাভেল দুজনেই কয়লা কাটতে কাটতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তারা সবাই কাজ থামিয়ে হাত দিয়ে ঘাম মুছছিল। ছাদের চারদিকে কাটলগুলোর দিকে তাকাচ্ছিল। কিন্তু একমাত্র কাজ ছাড়া আর কোন কিছুর কথা বলছিল না।

শ্যাভেল বলল, তারা শুধু নিজেদের লাভটাই বোঝে। আমাদের সুখ সুবিধার দিকে মোটেই নজর দেয় না।

লেভাক বলল, ওরা এক একটা হাঙ্গর, আমাদের গ্রাস করতে চায়। আমাদের এখানে জীবন্ত কবর দিতে চায়।

জ্যাকারি হাসতে লাগল। তার অন্য কোন দিকে খেয়াল ছিল না। তবে মালিকদের গাল দিতে দেখে মনে মনে খুশি হয়েছিল সে। মাহিউ শান্তভাবে বলল, প্রতি কুড়ি মিটার অন্তর ভূমির প্রকৃতি আলাদা। ওরা আগে থেকে দেখে সব সময় বুঝতে পারে কোথায় কখন ভূমির প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটবে। কিন্তু তবু যখন লেভাক ও শ্যাভেল কোম্পানির মালিকদের গাল দিয়ে যাচ্ছিল তখন মাহিউ তাদের চুপ করতে নির্দেশ দিল। বলল, চুপ করো, অনেক হয়েছে।

লেভাক শ্যাভেলকে বলল, তুমি ঠিক বলেছ সাথী, এ জায়গা মোটেই স্বাস্থ্যসম্মত নয়।

কারণ যতই থাক বেশী সমালোচনা করা চলবে না। এই খাদের গভীরেও মালিকের চরের অভাব নেই। সেই ভয়ে আর বেশী কথা বলতে সাহস করল না ওরা। এখানেও ভয় আছে। মালিকদের মাঝে মাঝে মুখে গাল দিলেও এক অব্যক্ত গোপন আশঙ্কায় শিউরে ওঠে ওরা। ওদের মনে হয় এই প্রাণহীন কয়লাগুলোরও কান আছে; দরকার হলে এই কয়লাগুলোই এক সময় তাদের বিরুদ্ধে কথা বলবে মালিকদের কাছে।

শ্যাভেল বলল, তুমি যাই বল, আমি ঐ শূয়োর ভানসার্তটার পেটে একটা ইট ছুঁড়ে মারবই। কেউ আমাকে আটকাতে পারবে না। ও আবার যদি আমার সঙ্গে কথা বলে তাহলে আমি ওকে মারবই। সেদিন তার কথা বলার ধরনটা খুব খারাপ ছিল। ওর কথা বলার ধরনটা এমন ছিল যাতে মনে হবে, সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে ওর মেলামেশার পথে আমি বাধা সৃষ্টি করছি।

কথাটা শুনে হেসে উঠল জ্যাকারি। কারণ ওভারম্যান ভানসার্তের সঙ্গে পিয়েরনের স্ত্রীর অবৈধ সম্পর্কটা নিয়ে ওরা আগে হতেই হাসাহাসি করে আসছে। এটা একরকম সবাই জানে। এ নিয়ে খনির সবাই ঠাট্টা তামাশা করে। ক্যাথারিন এতিয়েনকে সতর্ক করে দিয়ে কথাটা শুনতে লাগল।

কিন্তু মাহিউ এবার রেগে উঠল, চুপ করবে কি না। না করলে নিজেই মরবে।

মাহিউর কথা শেষ হতে না হতেই কাদের পায়ের শব্দ শোনা গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই এঞ্জিনীয়ার মঁসিয়ে নিগ্রেল ওভারম্যান ভানসার্তকে সঙ্গে করে এসে হাজির হলো। নিগ্রেল হচ্ছে কোম্পানির ম্যানেজার হনিবোর ভাইপো। বছর ছাব্বিশ বয়স। রোগা ছিপছিপে চেহারা, টিকল নাক। সে বুদ্ধিমান, কিন্তু সন্দিগ্ধমনা। শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে হঠাৎ সে গম্ভীর হয়ে ওঠে। প্রভূত্বমূলক মনোভাব ফুটে ওঠে তার কণ্ঠে। সে শ্রমিকদের মতই তেলকালিমাখা পোষাক পরে থাকে এবং শ্রমিকদের কাছ থেকে বাহবা পাবার জন্য যে কোন বিপজ্জনক জায়গা অর্থাৎ কোন ফাটল বা ফায়ার-ড্যাম্প দেখা দিলে সে এগিয়ে গিয়ে তা পরীক্ষা করে।

ভানসার্ত নিগ্রেলকে বলল, আজ সকালে এই লোকটিকে কাজে নেওয়া হয়েছে মঁসিয়ে নিগ্রেল।

এতিয়েনকে ডাকা হলো। সে কাছে এলে নিগ্রেল তার ল্যাম্পটা তুলে এতিয়েনের মুখটা একবার দেখে নিল। কিন্তু কোন কথা জিজ্ঞাসা করল না।

নিগ্রেল মাহিউকে লক্ষ্য করে বলল, ঠিক আছে, এবার আমি কিছু বললাম না। কিন্তু এর পর থেকে যে কোন অপরিচিত লোককে ধরে এনে কাজে ঢুকিও না।

কিন্তু লোক ঢোকানোর সপক্ষে যে সব যুক্তি ছিল, যেমন হঠাৎ পদ খালি হওয়া, কোম্পানির নতুন নীতি প্রভৃতি কোন কিছুই শুনতে চাইল না নিগ্রেল।

নিগ্রেল ছাদটার দিকে লক্ষ্য করে বলল, হা ভগবান! আচ্ছা মাহিউ, তুমি কি কিছু খেয়াল কর না? তোমরা যে সবাই জীবন্ত সমাহিত হবে ও পুড়ে মরবে এখানে।

মাহিউ বলল, না না, ও ঠিক আছে। এখনো শক্ত আছে।

নিগ্রেল বলল, কি বলছ? শক্ত আছে? ফাটল দেখা যাচ্ছে। দেখতে পাচ্ছি না? এখনি যে ভেঙ্গে পড়বে। তোমরা দু মিটার অন্তর ঠেকা দিয়েছ। তাতে কি হয়? আরো দ্বিগুণ করে ঠেকা দিতে হবে। এখনি কাঠের ঠেকা দেওয়ার ব্যবস্থা করো। তা না হলে তোমাদের মাথা সব গুঁড়ো হয়ে যাবে।

এদিকে শ্রমিকরা নিজেদের মধ্যে রাগে গুঞ্জন করছিল। তারা বলাবলি করছিল তারা তাদের নিরাপত্তা বোঝে। একথায় নিগ্রেল আরো রেগে গেল। বলল, খুব হয়েছে। তোমাদের মাথাগুলো ভেঙ্গে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেলে তার ফল শুধু তোমাদের ভোগ করতে হবে না, কোম্পানিকেও তার ফল ভোগ করতে হবে। তোমাদের স্ত্রীদের বৃত্তি দিতে হবে কোম্পানিকে। আমি তোমাদের আবার বলছি সন্ধ্যার আগে দু টব বেশী কয়লা তোলার জন্য তোমাদের মৃত্যুকে ডেকে এনো না।

মাহিউর রাগ হচ্ছিল। কিন্তু সে সামলে নিয়ে শান্তভাবে বলল, আমাদের

বেতন খুবই কম। ঠিকমত বেতন পেলে আমরা ঠেকা দেওয়ার কাজ ভাল ভাবে করতে পারি।

নিগ্রেল তার পরিদর্শনের কাজ শেষ করে যাবার সময় শেষ কথা বলে গেল। বলল, কাজ শেষ হতে আর এক ঘণ্টা বাকি আছে। এই সময়ের মধ্যে তোমরা সবাই মিলে কাঠের ঠেকা দেওয়ার কাজটা সেরে ফেল।

কিন্তু এ কথায় প্রতিবাদের গুঞ্জনধ্বনি উঠল শ্রমিকদের মধ্যে। কিন্তু তারা মালিকপক্ষের ভয়ে, তাদের শক্তির বহরের কথা ভেবে তাদের সে প্রতিবাদকে সোচ্ছার করে তুলল না। তারা জানে পুলিশ ও সেনাবাহিনী সব সময় মালিকদের পক্ষে। কিন্তু শ্যাভেল আর লেভাক তাদের ক্ষোভের কথা বলে চলেছিল নির্ভয়ে। মাহিউ তাদের দিকে কড়াভাবে তাকিয়ে শান্ত করল, জ্যাকারি হালকাভাবে বিদ্রূপ করছিল ব্যাপারটাকে নিয়ে।

ওদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী বিচলিত, বেশী ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল এতিয়েন। মাত্র একদিনের অভিজ্ঞতাতেই এতিয়েন গোটা ব্যাপারটাকে অদ্ভুতভাবে বুঝে ফেলেছে। বুঝতে পেরেছে এই ভয়ঙ্কর অন্ধকার আর বিপদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হাড়ভাঙ্গা খাটুনির মধ্য দিয়ে নিজেদের তিলে তিলে হত্যা করেও তারা পেটভরে খেতে পায় না।

এদিকে নিগ্রেল ভানসার্তের সঙ্গে চলে যেতে যেতে কাঠের ঠেকাগুলো পরীক্ষা করে দেখার জন্য থামল। তাদের গলার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। ওটা শ্রমিকদের দায়িত্ব।

নিগ্রেল ভানসার্তকে বলল, আমি তোমাকে বলিনি, ওরা কোন কথা গ্রাহ্য করে না? কিন্তু তুমি কি করছিলে, কেন তুমি নজর রাখনি এদিকে?

ওভারম্যান ভানসার্তের কাজ হলো নিগ্রেলের কথায় সায় দিয়ে চলা। সে আমতা আমতা করে বলল, হ্যাঁ, আমি নজর রাখি, কিন্তু ওদের বলে বলে আমি বিরক্ত হয়ে পড়েছি।

নিগ্রেল জোর গলায় মাহিউকে ডাকল। ওরা সকলে কাছে এসে দাঁড়াল। নিগ্রেল মাহিউকে বলল, এটা কাঠের ঠেকা দেওয়া হয়েছে? সম্পূর্ণ ফাঁকি। আমি এবার বুঝতে পেরেছি মেরামতের কাজে কেন এত খরচ হয়। এরকম করলে ত কোম্পানিকে অনেক লোক লাগাতে হবে মেরামতের কাজে। একবার ভাল করে দেখ, তোমরা কি করেছ।

শ্যাভেল কি বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু নিগ্রেল তাকে থামিয়ে দিল। নিগ্রেল বলল, থাক। আমি জানি তোমরা কি বলতে চাইছ। তোমরা চাইছ বেশী বেতন। কিন্তু আমি বলে দিচ্ছি, তোমাদের সাবধান করে দিচ্ছি, এর দ্বারা তোমরা কোম্পানিকে বাধ্য করছ যাতে কোম্পানি টবের রেট কমিয়ে কাঠের কাজের জন্য টাকার ব্যবস্থা করে। তখন দেখব তোমরা কতখানি লাভবান হও। এখন ইতিমধ্যে তোমরা এই কাঠের কাজগুলো সব সেরে ফেল।

নতুন করে কাঠ লাগাও, আগামীকাল আবার আমি এসে দেখব।

শ্রমিকদের মধ্যে আবার অস্ফুট প্রতিবাদের কলগুঞ্জন উঠল। কিন্তু নিগ্রেল আর দাঁড়াল না। সে চলে গেল কথাটা বলেই। ভানসার্ত দাঁড়িয়ে রইল। নিগ্রেল চলে যাওয়ামাত্র ভানসার্ত শ্রমিকদের বলল, তোমরা আমাকে বিপদে ফেলেছ। তোমরা তিন ফ্রাঁর থেকে বেশী পাবে। একবার ভাল করে দেখে কাজ করো।

ভানসার্ত চলে গেলে মাহিউ বলতে লাগল, কোনমতে কাজ চালিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আমি শান্তিপূর্ণভাবে সব সহ্য করে যেতে চাই। কিন্তু ওরা আমাকে পাগল করে দেবে। ওরা বলছে টবের রেট কমিয়ে কাঠের কাজের জন্য আলাদা টাকা দেবে। তার মানেই মাইনে কমিয়ে দেওয়া। হে ভগবান!

মাহিউ তার পাশে তাকিয়ে দেখল ক্যাথারিন আর এতিয়েন দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে বলল, আমাকে কিছু কাঠ এনে দেবে?

সঙ্গে সঙ্গে এতিয়েন এগিয়ে গিয়ে এক বোঝা কাঠ নিয়ে এল। মালিক পক্ষের অন্যায় দেখে এতিয়েনের মনে দারুণ ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছিল। তার মনে হচ্ছিল মালিকরা যেভাবে অন্যায় অবিচার করে চলেছে তাতে মাথা ঠিক রাখা যায় না। তবু খনিশ্রমিকরা খুব ভাল, স্বভাবতঃ শান্ত প্রকৃতির বলে এখনো চুপ করে সব সহ্য করে যাচ্ছে। একমাত্র লেভাক আর শ্যাভেল আপনমনে গালমন্দ করে যাচ্ছিল। তারা এবার সকলে মিলে একযোগে কাঠের কাজে মন দিল। অন্য কোন কাজ নয়। কোন কথা নয়। তাদের মধ্যে কেউ একটা কথাও বলল না। পুরো আধ ঘণ্টা ধরে একমাত্র কাঠের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ শোনা গেল না। মনে হচ্ছিল তারা যেন কাঠের হাতিয়ার দিয়ে পাথরের সঙ্গে যুদ্ধ করে চলেছে।

অবশেষে ক্লান্তি আর রাগে ফেটে পড়ল মাহিউ। বলে উঠল, আজ থাক। আজ খুব ভাল দিন। এখন আড়াইটা বাজে। আজ পঞ্চাশ স্যু'ও হবে না। আমার বিরক্তি লাগছে।

এখনো ওদের ছুটি হতে আধ ঘণ্টা বাকি আছে। তবু মাহিউকে জামা পরতে দেখে ওরাও সবাই কাজ থামিয়ে যাবার জন্য তৈরি হতে লাগল। কয়লা কাটার জায়গা দেখতেও তাদের রাগ হচ্ছিল। ক্যাথারিন কয়লার টব জমা দিতে গিয়েছিল। সে ফিরে আসা পর্যন্ত তাদের অপেক্ষা করতে হচ্ছিল। ক্যাথারিন ফিরে এলে ওরা মোট ছয় জন মিলে ফিরে যাবার জন্য রওনা হলো। এখান থেকে আবার দুই কিলোমিটার পথ পার হয়ে সেই ডুলির কাছে যেতে হবে। সেখান থেকে তারা উপরে উঠবে। পৃথিবীর আলো দেখবে।

ওরা আগে আগে যাচ্ছিল। শুধু ক্যাথারিন আর এতিয়েন ওদের থেকে আলাদা হয়ে পিছিয়ে পড়েছিল। পথে এক জায়গায় ওদের লিডির সঙ্গে দেখা হলো। লিডি একটা টব নিয়ে যাচ্ছিল। ওদের দেখে দাঁড়াল। লিডি

ক্যাথারিনকে বলল, মুকেত্তের নাক দিয়ে রক্ত পড়ার জন্ত সে এক ঘণ্টা আগেই চলে গেছে কোথাও মুখটা ধোবার জন্ত। লিভি যখন আবার কাজে মন দিল, জলে কাদায় ও কয়লার কালিতে লিভিকে একটা কালো পিঁপড়ের মত দেখাচ্ছিল। এক জায়গায় ওদের গুড়ি মেরে এতখানি মাথা নিচু হয়ে চলতে হচ্ছিল যে ওদের দিকটা ছাদের পাথরে লাগছিল। শ্রমিকদের পিঠে পিঠে পাথরটা মসৃণ হয়ে উঠেছে।

ক্লান্ত পায়ে এক মনে নীরবে হেঁটে চলেছিল ওরা দুজনে। কথাবার্তা কিছুই বলছিল না। এতিয়েন এক এক সময় ক্যাথারিনকে চোখে দেখতেই পাচ্ছিল না। ক্যাথারিন তার আগে আগে পথ হাঁটতে হাঁটতে অন্ধকারে কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছিল। ল্যাম্পের ক্ষীণ অস্পষ্ট আলোয় তাকে দেখতে পাচ্ছিল না এতিয়েন।

ক্যাথারিন মেয়েমানুষ। তাকে সে একা পেয়েও চুম্বন করছে না এটা ভাবতে খুব খারাপ লাগছিল এতিয়েনের। কিন্তু শ্যাভেলের কথা ভেবে সে চুম্বনের কথাটা আর মোটেই ভাবতে পারছিল না। ক্যাথারিন নিশ্চয় মিথ্যা কথা বলেছে। নিশ্চয় শ্যাভেলই তার প্রেমিক। এই সব কথাগুলো যতই ভাবছিল এতিয়েন ততই ভারী হয়ে উঠছিল তার মন আর মুখটা। সে সহজ ভাবে মিশতে বা কথা বলতে পারছিল না ক্যাথারিনের সঙ্গে। অথচ ক্যাথারিন আগে যেতে যেতে মাঝে মাঝে থেমে পথে কোথায় কি বাধা আছে তা বলে দিচ্ছিল। তারা এক জায়গায় একটু দাঁড়িয়ে একটু সময় হাসিখুশিতে ভরিয়ে তুলতে পারত। একটু সুখ ক্ষণিকের জন্য উপভোগ করতে পারত। কিন্তু এতিয়েনের জন্য তা হলো না।

একটা বেদনার্ত কুণ্ঠার কাঁটা সারাক্ষণ সারা পথ ধরে বিঁধছিল এতিয়েনের মনটাকে। অবশেষে সে কাঁটা অপসারিত হলো। ওরা খাদের প্রধান রাস্তায় এসে পড়ল। ক্যাথারিন একবার করুণ দৃষ্টিতে তাকাল এতিয়েনের মুখপানে। এখানে অনেক লোকজনের ভিড়। অনেক আলো। ঘোড়ায় টানা গাড়ির আনাগোনা।

সকালে কোন কোন পথ দিয়ে এসেছিল তা ভুলে গিয়েছিল এতিয়েন। ক্যাথারিন নীরবে তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। তা না হলে পথ চিনতে পারছিল না। পথ না জানার দরুণ এক একবার তার মনে হচ্ছিল ওরা ঘুরপথে যাচ্ছে, অথবা পথ হারিয়ে ফেলেছে।

কিন্তু খাদের মুখের কাছে যতই এগিয়ে যাচ্ছিল ওরা ততই খুব শীত লাগছিল এতিয়েনের। এখানে বায়ুসঞ্চালন যন্ত্র থাকার জন্ত হাওয়ার জোর খুব বেশী। এতিয়েনের মনে হচ্ছিল ও বুঝি বা আর যেতে পারবে না।

যাই হোক, এইভাবে নিদারুণ হতাশার মধ্য দিয়ে ওরা ডুলির কাছে পৌছল।

ওরা দেখল ততক্ষণে আর সবাই এসে পৌঁছেছে। শ্যাভেল ওদের পানে তাকাচ্ছিল। তার চোখে মুখে সন্দেহ ও ঈর্ষার ভাব ছিল। ফোঁটা ফোঁটা জলে ভিজে গিয়েছিল ওরা সবাই। এতিয়েনের মতই একটা নিষ্ফল-রাগকে চেপে রেখেছিল মনের ভিতর।

ওরা আধ ঘন্টা আগে এসে পড়েছে। তাছাড়া ডুলিতে তখন ঘোড়া নামানোর কাজ হচ্ছিল। সুতরাং ওদের অপেক্ষা করতে হবে। পিয়েরেন কাজে আসায় মাহিউ তার কাছে গিয়ে বলল, তুমি আমাদের ওঠার ব্যবস্থা করে দিতে পার।

পিয়েরেনের চেহারাটা বেশ বলিষ্ঠ এবং মুখটাও শান্ত প্রকৃতির। কিন্তু পিয়েরেন বলল, আমি তা পারি না। ডেপুটি তাহলে আমাকে জরিমানা করবে।

এমন সময় ক্যাথারিন এতিয়েনকে চুপি চুপি বলল, চল আস্তাবলটা দেখে আসি।

এই বলে ক্যাথারিন এতিয়েনকে নিয়ে আস্তাবল দেখাতে গেল। সেখানে দেখল চার মিটার উঁচু আর পঁচিশ মিটার লম্বা ইটের ছাদওয়ালা এক লম্বা চালা ঘোড়া থাকার জন্য তৈরি হয়েছে। একটা খোলা বাতি সেখানে জ্বলছে। যে সব ঘোড়ার এখন কাজ নেই তারা বিশ্রাম করছে। ঘরখানা বেশ গরম। ঘোড়াদের খাবার গামলার উপর এক একটা ঘোড়ার নাম লেখা আছে।

ক্যাথারিন সেই নামের তালিকাটা পড়ছিল এমন সময় খড়ের গাদা থেকে কে একজন হঠাৎ উঠে পড়ল তার সামনে। ক্যাথারিন অবাক হয়ে দেখল মুকেত্তে। প্রতি সোমবার এইভাবে এই আস্তাবলের খড়ের গাদায় নাকে রক্ত পড়ার অজুহাত দেখিয়ে ঘুমোতে আসে মুকেত্তে। কারণ রবিবার গোটা দিনটা ফূর্তি করে কাটায়।

ক্যাথারিন দেখল মুকেত্তের বাবা বুড়ো মুকেত্তে এসে হাজির হলো। সে সব জানে, সে তার মেয়েকে ডাকতে এসেছে। বাড়ি ফিরে যাবার সময় হয়েছে। বুড়ো মুকেত্তের চেহারাটা বেঁটেখাটো, মাথায় টাক। তবে চেহারাটা মোটা সোটা, আগে সে খনিতে কাজ করত। এখন সে আস্তাবলে ঘোড়াদের দেখাশোনা করে। এখন সে পনিম্যান। মুকেত্তে জানত তার মেয়ে এইভাবে কাজে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে আসে। এতে তার বিপদের ঝুঁকি ছিল। তবু সে চুপচাপ গোপন রেখে গিয়েছিল ব্যাপারটা। ক্যাথারিন ও এতিয়েনকে আস্তাবলে দেখতে পেয়ে বিরক্তবোধ করল বুড়ো মুকেত্তে।

এতিয়েনকে দেখে মুকেত্তে বলে উঠল, কি সব করছ তোমরা? বেটাছেলে নিয়ে খড়ের গাদায় ফূর্তি হচ্ছে?

মুকেত্তে উঠে এসে এতিয়েনকে কি একটা ঠাট্টার কথা বলল। কিন্তু এতিয়েন তার সে রসিকতায় সাড়া দিল না। ক্যাথারিন এতিয়েনের মুখপানে তাকিয়ে

হাসল।

ওরা তিনজনে খাদের মুখের কাছে এসে দেখল বেবার্ত ও জাঁলিন এসে পড়েছে।

এসে দেখল তখনো ডুলির কাজ শেষ হয়নি। তাই দেখে ক্যাথারিন আস্তাবলে এতিয়েনকে নিয়ে গিয়ে বাতেল নামে একটা ঘোড়াকে দেখতে লাগল। তার সম্বন্ধে অনেক কথা বলল এতিয়েনকে। এই ঘোড়াটা আজ হতে দশ বছর আগে এখানে আসে। এই দশ বছরের মধ্যে বাতেল সেই এক জায়গায় বাস করে আসছে, এই আস্তাবলের একটি জায়গা নির্দিষ্ট আছে তার জন্য। সেই এক কাজ করে আসছে। এই দশ বছর সে এই পাতালপুরী থেকে উঠে সূর্যের মুখ দেখেনি একবারও। এই পাতালপুরীর অন্ধকার পথগুলো দিয়ে যেতে যেতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে, অদ্ভুতভাবে কুশলী হয়ে উঠেছে সে। তার দেহটা হয়ে উঠেছে মেদবহুল, গায়ের চামড়াটা বেশ চকচকে। এখন তার বয়স হয়েছে, বিষণ্ণ দৃষ্টিতে প্রায়ই তাকিয়ে থাকে বাতেল। কুয়াশাচ্ছন্ন স্বপ্নের মধ্য দিয়ে দূরে দৃষ্টি ছড়িয়ে সে হয়ত তার জন্মভূমি মার্সিয়েনেকে দেখার চেষ্টা করে। সেখানে স্কার্গে নদীর ধারে বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মাঝে একটা বনে তার জন্ম হয়। তখন সেই উন্মুক্ত প্রান্তরের মাথার উপরে নীল আকাশে একটা উজ্জ্বল বাতি জ্বলত সারাদিন। সে বাতি এখানকার বাতিগুলোর মত এমন মিটমিটে নয়। আজ বৃদ্ধ বয়সে অশক্ত পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে সেই উজ্জ্বল বাতিটাকে মনে করার চেষ্টা করে।

ডুলিতে তখন ট্রম্পেত নামে একটা তিন বছরের ঘোড়াকে নামানো হচ্ছিল।

বুড়ো মুকেত্তে নামে একজন ট্রম্পেতকে নেবার জন্য নিচে দাঁড়িয়েছিল। সে বলল, ওকে এইখানে নামাও। কিন্তু এখন গলার বাঁধন খুলো না।

ট্রম্পেত চুপচাপ স্থির হয়ে দাঁড়াল। সে এই স্বল্পালোকিত অন্ধকারে ভরা খাদে এই অজানা রাজ্যে কি করবে তা খুঁজে পাচ্ছিল না। এমন সময় বাতেল নামে সেই বুড়ো ঘোড়াটাকে ছেড়ে দেওয়া হলো এবং সে এই নতুন অতিথির কাছে এসে তার গাটা শুঁকতে লাগল তার ঘাড়টা বাড়িয়ে। কয়েকজন শ্রমিক ঠাট্টা করতে করতে ওদের এই মজা দেখতে লাগল। বাতেল কিন্তু সে ঠাট্টায় কান না দিয়ে তার নতুন বন্ধুর গাটা শুঁকে যেতে লাগল। তারপর চিঁ হিঁ শব্দ করে তাকে অভ্যর্থনা জানাল। সে হয়ত তার এই নতুন অতিথি বন্ধুর গায়ে ফেলে আসা পৃথিবীর মুক্ত বাতাসের গন্ধ পেয়েছিল, পেয়েছিল সূর্যালোক পরিচুম্বিত বিস্মৃত ঘাসের সুবাস। তাই তার হ্রেষারবের মধ্যে ছিল এক অব্যক্ত আনন্দের ধ্বনি। কিন্তু সে আনন্দ অবিমিশ্র ছিল না। সুদূর অতীতের ফেলে আসা বহু বিস্মৃত বস্তুর গন্ধের সঙ্গে সে ধ্বনিতে ছিল একটা দুঃখ আর বিষাদ। দুঃখ এই জন্য যে তার কাছে আর একটি নতুন বন্দী এই অন্ধকার কারাজীবন যাপন করতে এল যে কোনদিন জীবিত অবস্থায় পৃথিবীর

আলো হাওয়ার রাজ্যে ফিরে যেতে পারবে না।

একজন শ্রমিক ঠাট্টা করে বলল, বুড়ো বাতেল সঙ্গী পেয়েছে। সে কথা বলছে তার নতুন সঙ্গীর সঙ্গে।

ট্রম্পেতের তখনো ভয় যায় নি। সে ভয়ে ভয়ে ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল। মুকেত্তে তাদের দুজনকে আস্তাবলের দিকে নিয়ে গেল।

মাহিউ বলল, আমরা এবার প্রস্তুত।

কিন্তু ওরা প্রস্তুত হলেও এখনো দশ মিনিট সময় আছে। কয়লাকাটার বিভিন্ন জায়গা থেকে দলে দলে শ্রমিকরা আসতে শুরু করেছে। সবাই ফিরে যাবার জন্য ব্যস্ত। পিয়েরেন তার মেয়ে লিডিকে কিছু আগে চলে আসার জন্য বকছিল। জ্যাকারি মুকেত্তেকে কাছে পেয়ে চিমটি কাটছিল। সে তাকে নিয়ে মঁতস্যুতে নাচগান দেখতে যাবার কথা বলছিল।

কিন্তু এদিকে সমবেত খনিশ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ ও ক্ষোভ ক্রমশই বেশী করে গুঞ্জরিত হয়ে উঠছিল। শ্যাভেল ও লেভাক সবাইকে ধরে ধরে বলছিল মালিকপক্ষ তাদের টবের রেট কমিয়ে কাঠের কাজের জন্য আলাদা বেতন দিতে চাইছিল। তাতে তাদের ক্ষতি হবে। এটা মাইনে কাটার সমান। এ ব্যবস্থা তারা মানবে না। কয়লার কালি মাখা শীতে কাঁপতে থাকা ক্লান্ত শ্রমিকের দল একবাক্যে সকলে কোম্পানিকে গাল দিচ্ছিল। তারা সবাই বলাবলি করতে লাগল কোম্পানির মালিকরা তাদের তিলে তিলে হত্যা করার নীতি অবলম্বন করেছে। এ নীতি তারা মানবে না।

সব কিছু শুনে বিশেষভাবে বিচলিত হয়ে পড়ল এতিয়েন। ডেপুটি রিকোমি কাছে ছিল। সে শ্রমিকদের বিক্ষোভের কথা সব শুনেও না শোনার ভান করছিল। সে তখন শ্রমিকদের ডুলিতে করে উপরে পাঠাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। বলল, সব চলে যাও একে একে।

রিকোমি মাহিউকে ডেকে বলল, ওদের চুপ করতে বল। তোমাদের যখন শক্তি নেই ওদের সঙ্গে লড়াই করার মত তখন চুপ করে সহ্য করতে হবে সব। তুমি ঠাণ্ডা মাথার লোক। তোমার যুক্তিবোধ আছে।

কিন্তু সব যুক্তি ও চিন্তাভাবনার সব শীতলতা ক্রমশই হারিয়ে ফেলছিল মাহিউ। সে কি করবে কিছু খুঁজে পাচ্ছিল না। তবু সে ওদের শান্ত করার ও বোঝাবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু মাহিউকে কিছু করতে হলো না। শ্রমিকদের সমস্ত ক্ষুব্ধ কলগুঞ্জন আপনা থেকেই মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল। কারণ খাদের সব কিছু পরিদর্শন করার পর কালিঝুলি মেখে ও ভিজে গিয়ে নিগ্রেল ও ভানসার্ত এসে ডুলিতে চাপল।

ডুলি ছেড়ে দিল। ডুলির মধ্যে ক্রুদ্ধ নীরবতা বিরাজ করছিল।

৬

ডুলিতে ওঠার সময় এতিয়েন নীরবে ভাবতে লাগল সে আর এ চাকরি করবে না। তার বেকার ভবঘুরে জীবনে আবার ফিরে যাবে সে। কারণ সে যদি এইভাবে রোজ খনির কাজ করতে থাকে তাহলে সে মরে যাবে। তাছাড়া এত খেটেও সে তার জীবিকা ঠিকমত অর্জন করতে পারবে না। তার থেকে পথে পথে ঘুরে বেড়িয়ে না খেয়ে শুকিয়ে মরাও ভাল।

এবার ক্যাথারিন তার ডুলিতে ছিল না। ওবেলাকার মত সে তার এই ডুলিতে থাকলে তার স্পর্শে কিছুটা উত্তাপ পেত। এতিয়েন আবার ভাবল, তার সরে পড়াই ভাল। কারণ সে কিছু লেখাপড়া শিখেছে এবং তাতে মালিকপক্ষের এই সব অন্যায় এই সব শ্রমিকদের মত নির্বিবাদে সহ্য করে যাওয়া সম্ভব হবে না তার পক্ষে।

ডুলিটা খুব তাড়াতাড়ি উঠে এল উপরে। জ্যাকারি মুকেত্তেকে আবার মনে পড়িয়ে দিল তার কথাটা। এতিয়েন যেন কিছু চিনতেই পারছিল না। কারণ সে যখন এখান থেকে নিচে নামে তখন ভোরের অস্পষ্ট আলোয় কোন কিছুই ভাল করে চিনতে পারেনি সে।

শ্যাভেল সোজা টব জমার হিসাবঘরে চলে যায়। কিন্তু যখন সে বেরিয়ে এল দেখা গেল প্রচণ্ডভাবে রেগে গেছে সে। সে দেখে এসেছে তাদের পাঠানো দুটো টব বাতিল হয়ে গেছে। একটা টবে নির্দিষ্ট পরিমাণ কয়লার থেকে কম ছিল আর একটা টবে খারাপ কয়লা ছিল।

সে বাইরে এসে বলল, আজকের দিনটা বেশ ভালই গেল। কুড়ি স্যু কাটা গেল। যাবে না? যত সব বাজে লোককে কাজে নিলে ত এই রকম হবেই। যার হাতে শূয়োরের লেজের থেকে বেশী বল নেই সে কি কাজ করবে?

এই বলে এতিয়েনের মুখপানে একটা কটাক্ষ হেনে কড়াভাবে তাকাল। এতিয়েনের একবার মনে হলো শ্যাভেলের মুখের উপর একটা ঘুঁষি মেরে তার কথার জবাব দেয়। কিন্তু নিজেকে এই ভেবে সামলে নিল সে যে এ কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে। যখন তখন ঝগড়া করে লাভ কি।

মাহিউ এসে শান্ত করল শ্যাভেলকে, একদিনেই সব কাজ শিখতে পারে না কেউ। কাল থেকে ও সব ঠিক পারবে।

এর পর ওরা ল্যাম্প রুমে গেল ল্যাম্প জমা দেবার জন্য। লেভাক গিয়ে বাতিওয়ালার সঙ্গে ঝগড়া করতে লাগল। তার বাতি ঠিকমত পরিষ্কার করা হয়নি।

ওরা লকার রুমে গিয়ে ওদের যন্ত্রপাতি জমা দিল। ঘরখানায় ঢুকে ওরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। ঘরখানা বেশ গরম এবং একটা স্টোভ জ্বলছিল। ওরা ওদের ঠাণ্ডা গাগুলো সেকে নিচ্ছিল। মুকেত্তে তার জামা খুলে শুকোচ্ছিল।

তা দেখে জনকতক তরুণ যুবক হাসাহাসি করছিল। মুকেত্তে তখন তার হাত দুটো তুলে তার বগল বুক দেখিয়ে দিল। এইভাবে তার চরম ঘৃণা প্রকাশ করে সে।

শ্যাভেল তার যন্ত্রপাতি লকারঘরে জমা দিয়ে বলল, আমি যাচ্ছি।

শ্যাভেলের সঙ্গে সঙ্গে মুকেত্তেও বেরিয়ে গেল। আর সবাই দাঁড়িয়ে রইল। কেউ কিছু মনে করল না। ওরা দুজনেই মঁতস্যুর পথে যাবে। ওরা সবাই জানে এখন শ্যাভেলের সঙ্গে মুকেত্তের ভাব ভালবাসা কিছু নেই।

এদিকে ক্যাথারিন কি যেন ভাবছিল। সে তার বাবার কানে কানে কি বলল। সে কথা শুনে মাহিউ কিছুটা বিস্মিত হলো প্রথমে, তারপর মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো। সে এতিয়েনকে ডেকে বলল, দেখ, তোমার হাতে ত একটা পয়সাও নেই। মাইনের দিন না আসা পর্যন্ত তোমার যাতে চলে তার জন্য কোথাও কিছু টাকা ধারের ব্যবস্থা করব?

এতিয়েন প্রথমে বিমূঢ় হয়ে পড়ল। সে কি বলবে কিছু খুঁজে পেল না। কারণ সে ভাবছিল সে তিরিশ স্যু অর্থাৎ তার আজকের দিনের বেতনটা তুলে নিয়ে চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে। কিন্তু ক্যাথারিন তার কাছে দাঁড়িয়ে থাকায় তাকে দেখে সে চাকরি ছাড়ার কথা ভাবতে পারছিল না। তার লজ্জা হচ্ছিল। সে দেখল ক্যাথারিন স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার পানে।

মাহিউ বলল, আমি কিন্তু কথা দিতে পারছি না। তবে চেষ্টা করে দেখি। ওরা হয়ত কেউ টাকা দিতে চাইবে না।

অবশেষে এতিয়েন অনিচ্ছাসত্ত্বেও মত দিল। সে ভাবল হয়ত টাকা ধার পাওয়া যাবে না। সুতরাং কিছু খেয়ে সে এখান থেকে চলে যাবে। কিন্তু এতিয়েন দেখল ক্যাথারিনের মুখে হাসি ফুটে উঠেছে। সে হাসছে, সে তার পানে হাসিমুখে তাকাচ্ছে। হঠাৎ এতিয়েনের মনে হলো এতে মত দেওয়া উচিত হয়নি তার। নিজের উপর বিরক্তি জাগল তার। সব কিছু ছেড়ে এখান থেকে চলে যাওয়াই উচিত ছিল তার। কি প্রয়োজন ছিল এই সব কিছুতে?

লকারঘরে গাটা একটু গরম করে যন্ত্রপাতি জমা দিয়ে এবার সবাই বাড়ির পথে রওনা হলো। মাহিউ ক্যাথারিন জ্যাকারি লেভাক তার ছেলে ও এতিয়েন একটা দলে ছিল। ওরা যখন দল বেঁধে যাচ্ছিল তখন কয়লা বাছাইএর চালাঘরটায় একটা ঘটনা ঘটল। ওরা সবাই দাঁড়িয়ে পড়ল।

লেভাকের আঠারো বছরের মেয়ে ফিলোমেন লেভাক ঝুড়িতে করে কয়লা ভরছিল। কয়লা ভরতে ভরতে কি হওয়ায় সে পিয়েরেনের বুড়ীমার সঙ্গে ঝগড়া করছিল।

জ্যাকারি এসে তার প্রেমিকার সপক্ষে কি বলতেই পিয়েরেনের মা মারুল

রাগে চিৎকার করতে করতে উঠে এসে জ্যাকারিকে বলল, তুই আর কথা বলিস না। যে দুটো ছেলের জন্ম দিয়েছিস মেয়েটার গর্ভে তাদের মানুষ করবে কে? মেয়েটা নিজের ভার নিজেই নিতে পারে না ত দুটো ছেলের।

মাহিউ তার ছেলেকে বুড়ীটার সঙ্গে ঝগড়া করতে নিষেধ করল। তবু হয়ত ঝগড়া আরো চলত। অনেক দূর গড়াত। কিন্তু একজন ফোরম্যান এসে পড়ায় সবাই চুপ হয়ে গেল

বাইরে তখনও ঝড়ো হাওয়াটা রয়েছে। কিন্তু ধূসর আকাশটা থেকে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছিল। শীতে হাত দুটো বুকের উপর জড়ো করে সার দিয়ে আপন আপন বাড়ির পথে এগিয়ে চলেছিল শ্রমিকরা। তাদের দেখে মনে হচ্ছিল যেন একদল নিগ্রো যাচ্ছে।

জ্যাকারি বলল, ঐ দেখ বুতলুপ।

লেভাক যেতে যেতে বুতলুপের সঙ্গে দু একটা কথা বলল। বুতলুপ তার ঘরে টাকা দিয়ে খাওয়া থাকা করে। তার বয়স পঁয়ত্রিশ। মোটাসোটা চেহারা, রংটা একটু ময়লা। মুখটা শান্ত প্রকৃতির।

লেভাক বুতলুপকে জিজ্ঞাসা করল, সুপ তৈরি হয়েছে?

বুতলুপ বলল, হ্যাঁ বোধ হয়।

লেভাক আবার জিজ্ঞাসা করল, তাহলে মিসিনএর মেজাজটা ভালই আছে?

বুতলুপ বলল, মনে হয় আছে।

বেলা তখন তিনটে বাজে। তিনটের শিফটে কাজে যোগদানের জন্য অনেক শ্রমিক খাদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। জাঁলিন ব্রেবাত আর লিভি একসঙ্গে ছিল। জ্যাকারি, ক্যাথারিন আর এতিয়েন একসঙ্গে ছিল।

এক জায়গায় এসে মাহিউ বলল, এইখানে আমাদের ছাড়াছাড়ি হবে। ওরা যাবে ওদের গাঁয়ের ব্যারাক বাড়িতে। আর এতিয়েন বোধ হয় থাকবে র‍্যাসেনোর বাড়িতে। বাড়িটা মানে একটা মদের দোকান খাদ আর গাঁটার মাঝখানে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আছে। চুনকামকরা একটা দোতলা বাড়ি। নিচের তলায় দোকান। উপরে থাকার ঘর।

ক্যাথারিন বিদায় নেবার সময় সকরুণ দৃষ্টিতে তাকাল এতিয়েনের মুখপানে। তার কালিমাখা দেহটার ভিতর থেকে স্ফটিকস্বচ্ছ হৃদয়ের গভীরতা স্পষ্ট যেন দেখতে পাচ্ছিল এতিয়েন।

বাড়িটার পিছন দিকটায় একটা ঝোপ। লে ভোরো আর খনির মাঝখানে ফাঁকা মাঠটার সব জমি, এখানকার সব সম্পত্তি কিনে নিয়েছে র‍্যাসেনো। মদের দোকানের সঙ্গে হোটেলও করেছে।

মাহিউ এতিয়েনকে সঙ্গে করে র‍্যাসেনোর কাছে নিয়ে গেল। র‍্যাসেনোর বয়স আটত্রিশ। বলিষ্ঠ চেহারা। দাড়ি কামানো চকচকে মুখ। র‍্যাসেনো আগে লে ভোরোর খনিতেই কাজ করত। শ্রমিক হিসাবে সে সুদক্ষ ছিল বলে

যে কোন ব্যাপারে শ্রমিকদের নেতৃত্ব দান করত সে। তার স্ত্রী একটা মদের দোকান চালাত। একবার এক ধর্মঘটের ব্যাপারে কোম্পানির মালিক তাকে ছাড়িয়ে দেয়। তখন কিছু টাকা ধার করে দোকানটাকে বড় করে র‍্যাসেনো। ক্রমে দোকানটা বড় হয়, উন্নতি করে তারা।

মাহিউ র‍্যাসেনোকে বলল, এই লোকটিকে সকালে আমি খনির কাজে ভর্তি করেছি। তোমার যদি একটি ঘর থাকে তাহলে একে দিতে পার। আর পনের দিন ধারে খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

র‍্যাসেনো বলল, ঘর ত হবে না।

এতিয়েনও তাই ভাবছিল। সে ভাবল কোন কিছু ব্যবস্থা না হলে তাকে তিরিশ স্যু তুলে নিয়ে চলে যেতে হবে। কিন্তু আগে সে যতই চলে যাবার কথা ভাবুক, এখন চলে যাবার মত ক্ষেত্র উপস্থিত হলে তার মনে কষ্ট হতে লাগল।

মাহিউ দেখল .দোকানঘরে যে ক'জন লোক মদ খাচ্ছিল টেবিলে বসে তারা সবাই চলে গেছে একে একে। এতিয়েন ছাড়া অন্য লোক নেই।

কাঠের কাজ নিয়ে যে গোলমাল শুরু হয়েছে কোম্পানির সঙ্গে মাহিউ তার কথা সব বলল র‍্যাসেনোকে।

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে রক্তলাল একটা আবেগ উত্তাল হয়ে উঠল র‍্যাসেনোর দেহে। মনে হচ্ছিল তার চামড়াটা ফেটে যাবে। সে বলল, যদি ওরা এইভাবে বেতন কাটে তাহলে ওরা মরবে। র‍্যাসেনো এবার ম্যানেজার হানিবো নিগ্রেল প্রভৃতির নাম করে অনেক কথা বলল। সে প্রায়ই এতিয়েনের পানে তাকাচ্ছিল। র‍্যাসেনো বলল, আজকাল সময় দারুণ খারাপ যাচ্ছে। চারদিকের কল-কারখানা ও খনিতে ধর্মঘট চলছে। পাশের খনির মালিক ভেনোলিন বুঝতে পারছে না কিভাবে সে খনির কাজ চালাবে।

র‍্যাসেনো আরো কি বলতে যাচ্ছিল এমন সময় তার স্ত্রী এসে ঘরে ঢুকল। তার চেহারাটা লম্বা আর রোগা। নাকটা বড়। রাজনৈতিক মতবাদের দিক থেকে র‍্যাসেনোর স্ত্রী আরো বৈপ্লবিক।

র‍্যাসেনো বলল, আমি প্লুসার্তের একটা চিঠি পেয়েছি।

তার স্ত্রী বলল, প্লুসার্তের মত লোক যদি মালিক হত তাহলে সব কিছুর উন্নতি হত।

এতিয়েন এতক্ষণ ধরে সব শুনছিল। শুনছিল মানুষের দুঃখকষ্ট, অত্যাচার আর প্রতিশোধবাসনার কাহিনী। এ কাহিনী শুনে বিশেষভাবে বিচলিত হয়ে উঠল তার মন। তবে প্লুসার্তের নামটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সে খুশি মনে বলে উঠল, প্লুসার্ত! আমি তাঁকে চিনি। আমি তাঁর অধীনে মিস্ত্রীর কাজ করতাম। উনি আমাদের ফোরম্যান ছিলেন। বড় কাজের লোক, বড় ভাল লোক। আমি ওঁর সঙ্গে প্রায়ই কথা বলতাম।

সকলে এতিয়েনের পানে তাকাল। র‍্যাসেনো নতুন করে এতিয়েনকে ভাল করে একবার দেখে নিল। তার প্রতি হঠাৎ তার সহানুভূতি জাগল। সে তার স্ত্রীকে বলল, মাহিউ এই লোকটিকে আজ সকালে কাজে নিয়েছে। এর একটা ঘর আর পনের দিনের খাওয়ার ব্যবস্থার দরকার।

র‍্যাসেনোর স্ত্রী বলল, একটা ঘর আজ সকালেই খালি হয়েছে। একটা ভাড়াটে চলে গেছে।

র‍্যাসেনো খুশি হলো। এতিয়েনের সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। মাহিউ বলল, আমি তাহলে উঠি। যত অসুবিধা যত কষ্টই হোক শ্রমিকরা এইভাবে কাজে যাবে, দলে দলে মরবে। তুমি খনি থেকে বেরিয়ে এসে ভাল করেছ। সুখে আছ।

র‍্যাসেনো বলল, হ্যাঁ, সত্যিই ভাল আছি।

মাহিউর সঙ্গে দরজার কাছ পর্যন্ত এগিয়ে গেল এতিয়েন। মাহিউকে ধন্যবাদ দেবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছিল না সে। মাহিউ কিন্তু বেশী কিছু না বলে তার গাঁয়ের পথে পা চালিয়ে দিল।

মাহিউকে বিদায় দিয়ে দোকান ঘরে ফিরে এল এতিয়েন। মাদাম র‍্যাসেনো তখন খরিদ্দারদের মদ পরিবেশন করছিল। মাদাম বলল, তুমি একটু দাঁড়াও। আমি তোমাকে মুখ হাত ধোবার জন্য ওপরে নিয়ে যাব।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এতিয়েন ভাবতে লাগল সে ভুল করেছে এখানে থাকতে চেয়ে। এর থেকে স্বাধীনভাবে মাঠে প্রান্তরে, পথে ঘাটে, গাঁয়ে গঞ্জে ভবঘুরে জীবন যাপন করা অনেক ভাল ছিল। সে যখন ভাবল কাল থেকে আবার তাকে খনিতে নামতে হবে, আবার ভারবাহী পশুর মত গুড়ি মেরে অন্ধকার সুড়ঙ্গ পথে অসংখ্যবার আনাগোনা করতে হবে তখন তার সত্যিই বড় অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল।

ভাবতে ভাবতে একবার বাইরে ফাঁকা মাঠটার দিকে তাকাল এতিয়েন। তারপর মাঠের ওপারে দিগন্তে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিল। লে ভোরোর খাদ ও গাঁটার উপরও চোখ পড়ল। গতকাল শেষ রাতে বুড়ো বনিমোর যখন ঐ অন্ধকার দিগন্তটার পানে হাত বাড়িয়ে দেখায় তখন কিছুই দেখতে-পায়নি সে। কিন্তু এখন সে দিগন্তটাকে কত সুন্দর কত উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। একদিকে শুধু কয়লার তরঙ্গায়িত কালো কালো স্তূপ। আর একদিকে শুধু কাঠের স্তূপ। আর এক জায়গায় কিছু উইলো আর পপলার গাছের ভিড়। উত্তরে মার্সিয়েন, দক্ষিণে মঁতসু। পূব দিকে ভাদেমের অরণ্যের কুহেলিঘেরা নীল বনরেখা।

সবচেয়ে এতিয়েনের ভাল লাগল স্কার্পে নদীটাকে। এটাকে ঠিক নদী না বলে একটা খাল বলা উচিত। লে ভোরো থেকে মার্সিয়েনে পর্যন্ত বিস্তৃত এই নদীটার দৈর্ঘ্য মাত্র দুই মাইল। এর দুদিকে সারবন্দী গাছের ভিড়টাকে বেশ ভাল লাগে। নদীতে কত নৌকো নোঙর করা রয়েছে, দূর থেকে মনে হয়,

নদী নয়, যেন কোন রূপোর একটা ফিতে।

এরপর এতিয়েনের চোখদুটো আবার লে ভোরোর উপর ছড়িয়ে পড়ল। একটা রেলপথ লে ভোরোর খনির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এখন হয়ত দিনের শেষ সিফটের শ্রমিকরা খনিতে নামছে।

এতিয়েন ভাল করে খুঁটিয়ে দেখল সব। রাত্রির অন্ধকারে যা কিছু ছিল রহস্যময়, যা কিছু ছিল অনির্বচনীয়, আকাশের কুহেলিঘেরা প্রতিটি নক্ষত্র যে অনির্বচনীয় রহস্যকে আরো বাড়িয়ে দেয় আজ দিনের উজ্জ্বল আলোয় সে রহস্য আজ সহজ সত্যে পরিণত। রাত্রির নিবিড় নিরন্ধ্র অন্ধকারে ফার্নেস আর কোক ওভেনের যে আলোগুলো অস্বাভাবিকভাবে উজ্জ্বল মনে হচ্ছিল আজ তারা দিনের আলোর কাছে তাদের সব উজ্জ্বলতা হারিয়ে ফেলেছে। এখন শুধু লে ভোরোর কয়লার খাদটাকে এক জীবন্ত দানবের মত মনে হচ্ছিল।

সহসা মনস্থির করে ফেলল এতিয়েন। দূরে ক্যাথারিনের সকরুণ দৃষ্টির কথা ভেবে অথবা লে ভোরোর দিগন্ত থেকে ছুটে আসা বিপ্লবের হাওয়ার আভাস পেয়ে সে তার মনের পরিবর্তন করল তা সে বলতে পারবে না। তবে এটা তার দৃঢ় সংকল্প যে সে আগামী কাল থেকে নিয়মিত খাদে যাবে। আর পাঁচজন শ্রমিকের সঙ্গে দুঃখকষ্ট সহ্য করবে। তাদের সঙ্গে লড়াই করবে একযোগে। এতিয়েনের চিন্তা এখন সেই দশ হাজার অসহায় খনিশ্রমিকদের উপর গিয়ে পড়ল যাদের কথা গতরাতে বুড়ো বনিমোরের কাছে অনেক শুনেছে। সে বনিমোরের মুখ থেকে শোনা সেই অদ্ভুত চির-অতৃপ্ত দেবতার কথাটাও ভাবল যাকে দশ হাজার বুভুক্ষু অনশনক্লিষ্ট মানুষ তাদের গায়ের মাংস পূজার অঞ্জলি হিসাবে দান করে আসছে যুগ যুগ ধরে।

দ্বিতীয় খণ্ড

১

লা পাওলেন নামে গ্রেগরীদের যে ভূ-সম্পত্তি আছে তা মঁতস্যুর দু কিলো মিটার পূর্বে অবস্থিত। সম্পত্তি বলতে গত শতাব্দীতে তৈরি চারকোণা একটা বড় বাড়ি আর তার আশেপাশে কিছু জমি। সে জমির কিছুটা জুড়ে আছে একটা ফুলবাগান আর কিছুটাতে আছে শাক সব্জীর বাগান। সে বাগানে বেশ কিছু ফল আর তরি-তরকারি হয়। বাকি জমিটা জুড়ে আছে বন।

গ্রেগরিরা সাধারণতঃ দেরী করে অর্থাৎ বেলা নটার সময় ওঠে, কিন্তু আজ তারা বেলা আটটার সময় উঠেছে। তাদের দেহগুলো মেদবহুল এবং বেলা পর্যন্ত ঘুমোতে তারা অভ্যস্ত। তবে গতকাল রাতে প্রবল ঝড় হওয়ার জন্য ওদের ভাল ঘুম হয়নি। ঘুম থেকে উঠেই গ্রেগরি চারদিকে ঘুরে দেখতে গেল ঝড়ের আঘাতে কোন কিছু ক্ষতি হয়েছে কি না আর মাদাম গ্রেগরি রান্নাঘরে চলে গেল। মাদামের মাথার চুলগুলো সব সাদা হয়ে গেলেও তার মুখখানা পুতুলের মত বেশ গোলগাল আছে।

মাদাম গ্রেগরি রান্নাঘরে গিয়ে রাঁধুনি মেলানিকে প্রাতরাশ তৈরির জন্য তাগাদা দিলেন। মেলানি বলল, শীগগির হয়ে যাবে। স্টোভ ও উনুন দুটোই জ্বলছে। তাছাড়া অনোরিন তাকে সাহায্য করবে।

মেলানি এবাড়িতে রাঁধুনির কাজ করতে করতে বুড়ী হয়ে গেছে। অনোরিনের বয়স কুড়ি। অনোরিনকে খুব ছেলেবেলায় এ বাড়িতে আনা হয় এবং এখন বড় হয়ে সে বাড়িতে ঝি-এর কাজ করছে। অনোরিন ও মেলানি ছাড়া আর একজন ফ্রাঁসোয়া নামে এক কোচম্যান বা ঘোড়ার গাড়ি চালাবার লোক আছে। আর আছে বাগানের মালী আর তার স্ত্রী। তারা বাগানের ফল ফুল শাকসব্জী, আর মুরগীর ছানাগুলোকে দেখাশোনা করে।

রান্নাঘরটা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও ঝকঝকে বাসনপত্রে ভরা বলে বেশ দেখাচ্ছিল। মাদাম রাঁধুনিদের কাজের কথা বুঝিয়ে দিয়ে আবার ঘরে চলে গেলেন। খাবার ঘরে সব সময়ের জন্য কয়লার আগুন জলছিল। ঘরে এমন কিছু আসবাবপত্র ছিল না। একটা খাবার টেবিল, কতকগুলো চেয়ার আর দুটো আর্মচেয়ার ছিল সারা ঘরখানার মধ্যে। বৈঠকখানা ঘরটা ওঁরা ব্যবহার করত না। খাবার পর অনেকক্ষণ করে এই ঘরটাতেই বসে থাকত।

মঁসিয়ে গ্রেগরি এবার ঘরে এসে ঢুকলেন। তাঁর বয়স ষাট হলেও বয়স অনুপাতে তাকে ছোকরা দেখাচ্ছিল। তাঁর চেহারাটা বেশ বলিষ্ঠ, মাথায়

কোঁকড়ানো সাদা চুল, গায়ের রং গোলাপী আর পরনে পুরু জ্যাকেট। তিনি বাগানে গিয়ে মালী আর কোচম্যানের কাছে গিয়ে খবর নিয়ে এসেছেন সকালে উঠেই। দেখে এসেছেন কোন ক্ষতি হয়েছে কি না। কিন্তু ঝড়ে সত্যি সত্যিই কোন ক্ষতি হয়নি। আজ বলে নয়, প্রতিদিন সকালে উঠে গোটা বাড়িটার চারদিক ঘুরে দেখাটা তাঁর স্বভাব। মালিকানার আনন্দটার আস্বাদ রোজ একবার পেতে চান দিনের প্রথমেই।

মঁসিয়ে গ্রেগরি স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, মিসিন কোথায়? এখনো ওঠেনি?

মাদাম গ্রেগরি বললেন, আমি বুঝতে পারছি না। আমার মনে হয় ওর শব্দ পাচ্ছি ওর ঘরে।

খাবার টেবিলের উপর সাদা কাপড় পাতা হয়েছে। তার উপর কয়েকটা পাত্র রাখা হয়েছে। অনোরিনকে পাঠানো হলো সিসিলের কাছে। দেখতে বলা হলো উঠেছে কিনা।

অনোরিন হাসতে হাসতে এসে বলল, মঁসিয়ে ও মাদাম একবার গিয়ে যদি দেখতেন। মাদমোজেল এখনো তাঁর বিছানায় ঘুমোচ্ছেন। ছবিতে দেখা ঠিক যীশুর মত। আপনি না দেখে বুঝতে পারবেন না। দেখে আনন্দ পাবেন।

স্বামী স্ত্রী তুজনে তুজনের পানে তাকালেন।

মঁসিয়ে গ্রেগরি হেসে বলল, চল একবার দেখে আসি।

তাঁরা তুজনে উপরতলায় সিসিলের শোবার ঘরটায় চলে গেলেন। সারা বাড়িটার মধ্যে এই ঘরটাই সবচেয়ে বিলাসব্যসনে ভরা। সিল্কের পর্দা আর দামী আসবাবে ঘরখানা সাজানো। বাড়ির আত্নরে ও বকাটে মেয়ে যখন যা চেয়েছে বাপ মার কাছে তাই পেয়েছে। পর্দার ফাঁক দিয়ে আলো এসে সাদা ধবধবে বিছানায় পড়েছিল। নগ্ন হাতের উপর গাল রেখে ঘুমোচ্ছিল সিসিল। সে দেখতে এমন কিছু সুন্দরী নয়। কারণ মাত্র আঠারো বছর বয়সেই তার দেহটা মেদবহুল হয়ে পড়ায় তাকে বয়স অনুপাতে বড় দেখাচ্ছে। তবে তার গায়ের রংটা খুবই সাদা, মাথাব চুলগুলো কালো। মুখখানা গোল।

মাদাম গ্রেগরি বললেন, গতকাল রাতে জোর ঝড় বইতে থাকায় একটুও ঘুমোতে পারেনি।

মঁসিয়ে গ্রেগরি তখন ইশারায় চুপ করতে বললেন। তখন বাপ মা তুজনেই ঘুমন্ত মেয়ের উপর ঝুঁকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন মেয়ের দিকে। বিয়ের দীর্ঘকাল পরেও কোন সন্তান না হওয়ায় তাঁরা সন্তানের আশা ত্যাগ করেছিলেন। অবশেষে বহু আকাঙ্ক্ষিত এই সন্তানের জন্ম হয়। মেয়ের চেহারা মেদবহুল হলেও তাঁদের চোখে সে চেহারা সব দিক দিয়ে আদর্শ। সে অনেক খেলেও তাঁদের মনে হয় সে ঠিকমত খাওয়া দাওয়া করছে না। ঘুমন্ত সিসিল কিন্তু বুঝতে পারল না তার বাবা মা তাকে একদৃষ্টিতে দেখছে। পাছে

তাদের মেয়ের ঘুম ভেঙ্গে যায় সেই ভয়ে দেখতে দেখতে বাবা মা তাঁদের দৃষ্টি সরিয়ে নিলেন।

মঁসিয়ে গ্রেগরি দরজার কাছে গিয়ে বললেন, রাত্রে যদি তার ঘুম না হয় তাহলে তাকে ঘুমোতে দেওয়া উচিত।

মাদাম গ্রেগরি বললেন, যতক্ষণ সে চায় ঘুমোক।

এর পর ওঁরা দুজনে খাবার ঘরে এসে দুটি আর্মচেয়ারে বসল। কারো মুখে কোন কথা নেই। ভৃত্যেরা খাবার পরিবেশন করে গেল নীরবে।

গ্রেগরি পরিবারের এখন বাৎসরিক আয় চল্লিশ হাজার ফ্রাঁ। তাদের সব টাকা মঁতসু কোম্পানিতে লগ্নী করা আছে। কিভাবে এই খনি গড়ে উঠল, কিভাবে তারা পুরুষানুক্রমে জড়িয়ে পড়লেন এই খনির সঙ্গে একথা তাঁরা আজ কাল গল্প করে বলেন লোকের কাছে।

সে আজ একশো বছরের ইতিহাস। তখন এ অঞ্চলে প্রথমে লিল আর ভ্যালেনসিয়েন এই দুই কোম্পানি মিলে পরে আঞ্জিন নামে এক খনিকোম্পানি গড়ে ওঠে। তখন এ অঞ্চলে কয়লার খনি আবিষ্কৃত হওয়ায় অনেক বড় ব্যবসায়ীর দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়। অনেকে খনি গড়ে তোলার কাজে আত্ম-নিয়োগ করেন। কিন্তু তখন সকলের সব চেষ্টাকে ছাড়িয়ে ব্যারণ দেসরুময় নামে এক ব্যবসায়ীর নাম বড় হয়ে ওঠে। চল্লিশ বছর ধরে তিনি প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতি সহ্য করে অক্লান্তভাবে কাজ করে যান তাঁর মনোমত এক কোম্পানিকে গড়ে তোলার জন্য। তাঁর কত টাকা যে খনির গর্ভে চাপা পড়ে যায় তার শেষ নেই। অনেক সময় একটা খনি চালু করার পর হয় ধস নামার জন্য অথবা খনিতে জল ঢোকার জন্য বহু শ্রমিক মারা যাওয়ায় সে খনি বন্ধ করে দিতে হয়। তারপর অতিকষ্টে দেসরুময় যখন দেসরুময়, ফকেনয় এ্যাণ্ড কোম্পানি গড়ে তুললেন তখন দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর পার্শ্ববর্তী কুনানি ও জয়সেল এই দুটি কোম্পানি জোর প্রতিযোগিতা শুরু করে দিল। অবশেষে ১৭৫০ সালের ২৫শে আগস্ট তারিখে তিনটি কোম্পানির মধ্যে এক চুক্তি সম্পাদনের ফলে তিনটি কোম্পানি মিলে একটি কোম্পানিতে পরিণত হয় আর তার নাম হয় মঁতসু মাইনিং কোম্পানি। সেই কোম্পানি আজও কাজ করে যাচ্ছে। দেসরুময়ের মৃত্যুকালে তাঁর বাৎসরিক আয় প্রায় ষাট হাজারের মত হয়।

ব্যারণ দেসরুময় সেই সময় লা পাওলেনের এই বাড়ি আর তার সংলগ্ন তিনশো হেকটেয়ার মত জমি কেনেন। এই সব ভূসম্পত্তি তখন অনোরি গ্রেগরি নামে একজন ম্যানেজার দেখাশোনা করতেন। এই অনোরি গ্রেগরি হলেন বর্তমানের সিসিলের বাবা-লিঁয় গ্রেগরির প্রপিতামহ। অনোরি গ্রেগরির ছেলে ইউগেন গ্রেগরির সময়টা খারাপ যায়। তারপর তার ছেলে ফেলিসিনে গ্রেগরির আমলে আবার সময়টার পরিবর্তন হয়। আয় বাড়তে থাকে। পাও-লেনের সব ভূসম্পত্তি গ্রেগরিদের অধিকারে চলে আসে এবং বর্তমানে লিঁয়

গ্রেগরির সময়ে তাদের বাৎসরিক আয় সব মিলিয়ে প্রায় পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁতে উঠে যায়।

মাঝখানে একবার লিয়ঁ গ্রেগরিকে তাঁর কোম্পানির অংশ বিক্রি করে দিতে বলা হয়, কিন্তু খনির উপর গ্রেগরিদের অগাধ অটল বিশ্বাস। তাঁদের মতে এই খনিতে তাঁদের পূর্বপুরুষরা মাত্র দশ হাজার ফ্রাঁ লগ্নী করেছিলেন। সেই অর্থ বাড়তে বাড়তে আজ কত গুণ বেড়েছে। সুতরাং খনিটা সামান্য মাটির জিনিস হলেও তা ঈশ্বরের থেকেও বেশী নির্ভরযোগ্য। খনিটাকে তারা বিগ্রহ দেবতার মত জ্ঞান করে যে দেবতা তাদের সংসারকে যুগ যুগ ধরে খাওয়া থাকার নিরঙ্কুশ সুখস্বাচ্ছন্দ্য যুগিয়ে চলেছে। বংশপরম্পরায় ঐশ্বর্য দান করে আসছে। তাদের আজ মাঝে মাঝে ভয় হয় সেই দশ হাজার টাকা তাদের পূর্ব-পুরুষ যদি খনিতে না ঢেলে ঘরের ড্রয়ারে রেখে দিত তাহলে কবে সে টাকা সব খরচ হয়ে যেত বুঝতেও পারত না। সেই টাকা সেদিন ঢেলেছিল বলেই আজও খনিতে বংশানুক্রমে কত অসংখ্য শ্রমিক তাদের জন্য সমানে কয়লা কেটে চলেছে।

সব দিক দিয়েই ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন লিয়ঁ গ্রেগরি। আজ হতে চল্লিশ বছর আগে তিনি মার্সিয়েনের এক গরীবের মেয়েকে বিবাহ করেন। কিন্তু সেই মেয়ে অকুণ্ঠ আনুগত্য, বিশ্বস্ততা আর ভালবাসায় তাঁকে সুখী করে আসছে। বিবাহিত জীবনে সুখী তারা। দেরিতে হলেও তাঁদের কন্যাসন্তানের আবির্ভাব আকাঙ্ক্ষিত পূর্ণতা লাভ করে। এখন তাঁদের যত কিছু সঞ্চয় শুধু সিসিলের জন্য। মেয়ের প্রতিটি খেয়াল নির্বিবাদে চরিতার্থ করে চলেন তাঁরা। তার জন্য দুটো ঘোড়া কিনে দিয়েছেন, আরো দুটো গাড়ি কেনা হয়েছে, প্যারিস থেকে পোষাক কিনে আনা হয় তার জন্য। একমাত্র মেয়ে ছাড়া নিজেদের জন্য তাঁরা বেশী কিছু খরচ করেন না। সব বাজে খরচ বন্ধ করে দিয়েছেন।

হঠাৎ খাবার ঘরের দরজা খুলে সিসিল ঘরে ঢুকেই বলল; কি হচ্ছে এখানে? আমাকে ছাড়াই প্রাতরাশ!

বিছানা থেকে উঠেই সোজা এখানে চলে এসেছে সিসিল। তার চোখে তখনো ঘুম জড়িয়েছিল। সে শুধু তার মাথার চুলটা জড়িয়ে নিয়ে একটা সাদা ড্রেসিং গাউন পরে চলে এসেছে।

মাদাম গ্রেগরি বললেন, হায়, হায়, তুমি দেখছ আমরা তোমার জন্য কত অপেক্ষা করেছিলাম। কিন্তু তুমি ঘুমোচ্ছিলে। বোধ হয় ঝড়ের জন্য রাতে ঘুম হয়নি।

সিসিল তার মার মুখপানে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল। আশ্চর্য হয়ে বলল, গতকাল রাতে ঝড় হয়েছে? আমি ত কিছু জানি না। আমি ত সারা রাত বেশ ঘুমিয়েছি। একবারও নড়িনি।

সিসিলের একথা শুনে সবাই হাসতে লাগল। এমন কি বুড়ী মেলানি আর

অনোরিন তাদের প্রাতরাশ পরিবেশন করতে এসে কথাটা শুনে না হেসে পারে না।

খাবার সব গরম দেখে সিসিল খুশি হয়ে বলল, বাঃ বেশ গরম আছে ত ! আমাকে একটা চমক দেওয়া হয়েছে। চকোলেটটা বেশ গরম আছে।

এবার তারা তিনজনে মিলে খাবার টেবিলে বসল। চকোলেটের কাপ থেকে ধোঁয়া বার হচ্ছিল। খাওয়ার নানা খুঁটিনাটি নিয়ে নানা কথাবার্তা হতে লাগল। রাঁধুনি বলল, মঁসিয়ে মাদাম ও মাদমোজেল কোন জিনিস খেতে চাইলে বা তৃপ্তির সঙ্গে খেলে সে জিনিস তৈরি করে লাভ আছে।

এমন সময় বাড়ির কুকুরগুলো একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল। মঁসিয়ে গ্রেগরি ভাবলেন, নিশ্চয় সিসিলের পিয়ানো শেখাবার মাষ্টার এসেছে অথবা তার পড়ানোর মাষ্টার এসেছে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই ঝি এসে জানাল মঁসিয়ে দেনুলিন এসেছেন।

দেনুলিন হলো মঁসিয়ে গ্রেগরির খুড়তুতো ভাই। অনোরিনের পিছু পিছু এসে ঘরে ঢুকল। সে খুব জোরে কথা বলে এবং তাড়াতাড়ি হাঁটে ও হাত নাড়ে কথা বলার সময়। তার বয়স পঞ্চাশ পার হয়ে গেলেও মাথায় ছোট করে ছাঁটা চুলগুলো ও মোচ একেবারে কালির মতই কালো।

দেনুলিন ঘরে ঢুকেই বলল, হ্যাঁ আমি। তোমাদের খাওয়ায় যেন কোনরূপ ব্যাঘাত না ঘটে।

পরিবারের সকলে তাকে অভ্যর্থনা জানাতে দেনুলিন বসল। তখন আবার ওরা চকোলেটের আলোচনায় ফিরে গেল। দেনুলিন বলল, না না আমাকে কিছু দিতে হবে না। আমি ঘোড়ায় চেপে তোমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে যেতে যেতে সদর দরজার কাছে একবার নেমে পড়লাম। দেখতে এলাম কেমন আছ তোমরা।

সিসিল দেনুলিনকে তার মেয়েদের কথা জিজ্ঞাসা করল। দেনুলিন তার উত্তরে জানাল ছোট মেয়ে জিয়ান সব সময় ছবি আঁকায় ব্যস্ত আর বড় মেয়ে লুসি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত শুধু পিয়ানো বাজিয়ে গান গাইছে। কথাটা শেষ করার সময় দেনুলিনের ঠোঁট দুটো কি এক অজানা উদ্বেগে কেঁপে উঠল। কিন্তু দেনুলিন হাসি দিয়ে তা ঢেকে দিল।

মঁসিয়ে গ্রেগরির মত অত না হলেও ছ সাত হাজার ফ্রাঁর একটা বাৎসরিক আয় উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিল দেনুলিন। কিন্তু তার সে আয় বেড়ে লক্ষের ঘরে পৌছতেই সে তা তাড়াহুড়ো করে বিক্রি করে দেয়। অবশ্য এর একটা উদ্দেশ্যও ছিল। তার স্ত্রী তার এক কাকার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে ভাঁদেমে দুটো কলিয়ারি পায়। কিন্তু দুটোর যা অব্যবস্থা তাতে যা আয় হত তাতে উৎপাদন ব্যয় চলত না। তাই দেনুলিন তার কোম্পানির শেয়ার সব বিক্রি করে সেই টাকা দিয়ে একটা খনি মেরামৎ করে আধুনিক যন্ত্রপাতির

ব্যবস্থা করো। আর একটাতে বায়ু সঞ্চালন ব্যবস্থার উন্নতি করে। কিন্তু খনি মেরামতের পর যখন দেম্‌লিনের আশানুরূপ লাভ হতে শুরু করেছিল ঠিক তখনি শুরু হলো শিল্পসংকট। তার উপর তার পরিচালনার কাজে ক্ষমতা নেই মোটেই। স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকে সে কেমন যেন বোকার মত হয়ে যায়। তখন তাকে সকলেই ঠকাতে থাকে। তার মেয়েদের উপরেও তার কোন নিয়ন্ত্রণক্ষমতা নেই। বড় মেয়ে মঞ্চে নামার কথা বলে প্রায়ই আর ছোট ছবি এঁকে সময় নষ্ট করে। সে ছবি সে যেখানেই পাঠায় তা প্রত্যাখ্যাত হয়। এখন তাদের সংসারে দারিদ্র্য সমুপস্থিত।

মঁসিয়ে গ্রেগরি বললেন, তোমার খনি কেমন চলছে?

দেম্‌লিন বলল, ভালই চলছিল, কিন্তু চারদিকে প্রচুর কারখানা গড়ে উঠেছে। দারুণ শিল্পসংকট দেখা দিয়েছে। বেশী লাভের জন্য প্রচুর টাকা লগ্নী করে বসে আছি। এখন সব টাকা আটকে পড়েছে। এখনো অবস্থা খুব একটা সংকটজনক হয়নি। আশা করি, আমি কাটিয়ে উঠতে পারব এই সব সংকট।

গ্রেগরি চুপ করে শুনলেন।

দেম্‌লিন বলল, তুমিও তোমার শেয়ারটা বিক্রি করতে পারতে তখন। তুমি আমার ভাঁদেম খনিতেও টাকাটা লগ্নী করতে পারতে এখান থেকে তুলে নিয়ে।

মঁসিয়ে গ্রেগরি তাঁর চকোলেটের কাপটা শেষ করে বললেন, কখনই না। তুমি জান আমি ফাটকাবাজি পছন্দ করি না। আমি শান্ত নিরুদ্বিগ্ন জীবনযাপন পছন্দ করি। আশঙ্কা নিয়ে অনবরত উদ্বেগ নিয়ে দিন কাটাতে চাই না। মঁতসুর অবস্থা যাই হোক, তার আয় থেকেই আমাদের চলে যাবে। আমাদের বেশী লোভ নেই। মঁতসুর অবস্থা আরও ভাল হবে এবং তার আয় থেকেই সিসিলের ছেলের ছেলেদের চলে যাবে ভালভাবে।

মুখে অস্বস্তিকর এক ফালি হাসি ফুটিয়ে রেখে সব কথা শুনল দেম্‌লিন। তারপর সে বলল, সে যাই হোক এক লক্ষ ফ্রাঁ আমার কারবারে ত লগ্নী করতে পার।

কিন্তু গ্রেগরির মুখে আশঙ্কার চিহ্ন ফুটে উঠতে দেখে দেম্‌লিন ভাবল, এখন একথাটা আর তুলবে না। এখনকার মত একথা চাপা দিয়ে ও বরং পরে এক লক্ষ ফ্রাঁ ধার হিসাবে চাইবে।

গ্রেগরি দেম্‌লিনের আগের কথাটার উত্তরে বলল, আমার অত টাকা নেই।

ওরা প্রসঙ্গটার পরিবর্তন করল। সিসিল তার বোনদের কথা আবার তুলল। তাদের রুচি ওর পছন্দ হয়। সিসিলের মা বললেন, একদিন ওদের বাড়িতে তাকে নিয়ে যাবেন।

মঁসিয়ে গ্রেগরি সে কথায় যোগ না দিয়ে কি একটা জিনিস ভাবতে ভাবতে

বললেন, আমার যদি তোমার মত অবস্থা হত তা হলে এভাবে চালাতে পারতাম না। আমি মঁতস্থ কোম্পানির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতাম। তুমি এসে যদি যোগদান করো তাহলে তোমার টাকা একদিন সব ফেরৎ পাবে সুদে আসলে।

মঁতস্থ আর ভাঁদেমের ঝগড়া আজকের নয়। ভাঁদেমের খনি দুটো কোনদিনই বড় ছিল না। আর তাদের প্রতিবেশী শক্তিশালী মঁতস্থ এই দুটি খনিকে বার বার কিনে নিতে চেয়েছে। উপরে উপরে এই দুই কোম্পানির মালিক ও ম্যানেজারদের এক কৃত্রিম সদ্ভাব থাকলেও ভিতরে ভিতরে সুদূর অতীত হতে আজ পর্যন্ত এক ঠাণ্ডা লড়াই সমানে চলে আসছে।

দেনুলিনের চোখ দুটো হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে বলল, না, আমি যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন ভাঁদেম কলিয়ারি কেউ নিতে পারবে না। সেদিন গত বৃহস্পতিবার আমি হানিবোর বাড়িতে ডিনার খাবার সময় ওরা তাই আবার চারপাশে ঘুরঘুর করছিল। ওরা যত বড় বড় লোকই হোক, লর্ড ডিউক মন্ত্রী সেনাপতি আমি ওদের গ্রাহ্য করি না।

গ্রেগরি বললেন, তিনি এমনি কথাটা বললেন পরামর্শ হিসাবে। তিনি মঁতস্থ কোম্পানির ডিরেক্টরদের মুখপাত্র হিসাবে কোন কথা বলছেন না। এ ব্যাপারে চূড়ান্ত ক্ষমতা কোম্পানির ছয়জন পরিচালকদের হাতে। এই পরিচালকমণ্ডলীর একজন কেউ গত হলে অর্থশালী ও প্রভাবশালী এক অংশীদারকে তার জায়গায় নেওয়া হয়। তবে গ্রেগরির মতে বর্তমানে মঁতস্থর পরিচালকমণ্ডলীর অর্থলোভ খুব বেড়ে গেছে।

আবার কুকুর ডেকে উঠল। আবার কেউ এসেছে এ বাড়িতে। অনোরিন দরজা খুলতে গেল।

সিসিল উঠে পড়ল। দেনুলিনকে বলে গেল, ভাববেন না, আমার বিশেষ অনুরোধ।

দেনুলিনও উঠে পড়ল। যাবার সময় মাদাম গ্রেগরিকে জিজ্ঞাসা করল, তারপর, নিগ্রেলের সঙ্গে সিসিলের ব্যাপার কি হলো?

মাদাম গ্রেগরি বললেন, এখনো ঠিক কিছু হয়নি। ভেবে দেখতে হবে।

এক অর্থপূর্ণ হাসি হেসে দেনুলিন বলল, অবশ্যই ভেবে দেখতে হবে। আমার ভাবতে খুবই খারাপ লাগছে যে এ বিয়ে হলে মাদাম হানিবো সিসিলের ঘাড়ের উপর পড়বে।

মাদাম গ্রেগরি রাগে আগুন হয়ে উঠলেন। এটা কখনো সম্ভব? এত নামকরা বাড়ির ভদ্রমহিলা যিনি নিগ্রেলের থেকে চৌদ্দ বছরের বড়। এ নিয়ে কখনো দেনুলিনের ঠাট্টা তামাশা করা উচিত নয়। দেনুলিন কিন্তু তেমনি হাসতে হাসতে করমর্দন করে বিদায় নিল।

সিসিল আবার ঘরে ফিরে এসে বলল, মা, দুটো ছেলে কোলে সেই খনি

শ্রমিকের স্ত্রী। তাঁকে কি ভিতরে আনা হবে?

মঁসিয়ে ও মাদাম গ্রেগরি খাবার ঘরের আর্মচেয়ারে আবার বসলেন আরাম করে। প্রথমটায় কিছু ইতস্ততঃ করলেন। ওরা কি খুব নোংরা? অবশেষে বললেন, যাও ওদের নিয়ে এস এখানে।

মাহিউর স্ত্রী আর তার ছেলেমেয়ে এসে ঘরে ঢুকল।

২

মাহিউর স্ত্রী তখনো ঘুমোচ্ছিল। বেলা তখন আটটা বাজে। তিন মাসের বাচ্চা মেয়ে এস্তেলে তার মায়ের স্তন থেকে দুধ খেতে খেতে ঘুমোচ্ছিল। এমন সময় আলজিরে এসে তার মাকে জাগাল।

মাহিউর স্ত্রী উঠে আলজিরেকে বলল, আমি পাওলেন যাব লেনোর আর হেনরিকে নিয়ে। এস্তেলে থাকবে তোর কাছে। সে উঠে দেখল ক্যাথারিন যে রুটি ও সুপ রেখে গিয়েছিল বুড়ো বনিমোর তা সব খেয়ে জ্যাকারি আর জাঁলিনের বিছানায় ঘুমোচ্ছে নাক ডাকিয়ে।

আলজিরে এই বয়সেই সব শিখে গেছে। তার দেহটা বয়স অনুপাতে না বাড়লেও সংসারের কাজকর্ম প্রায় সব করতে ও ছেলে ভুলোতে শিখে গেছে। সে তার মাকে জিজ্ঞাসা করল, আমি সুপ করে রাখব?

তার মা বলল, না, আমি এসে করব।

মাহিউর স্ত্রী ভাবতে লাগল ঘরে টাকাপয়সা কিছুই নেই। আজ পাওলেনে পাঁচ ফ্রাঁ ধার করতে যাবে। যদি ওরা তা না দেয়, যদি মাইগ্রাত তার দোকানে ধার না দেয় তাহলে লোকগুলো কাজ থেকে বাড়ি ফিরে এসে কি খাবে তার কিছুই সে বুঝতে পারল না।

মাহিউর স্ত্রী ছেলে দুটোর হাত ধরে বাড়ির বার হতেই লেভাকের স্ত্রী তাকে ডাকল। মাহিউর স্ত্রী বলল, না, আমার কাজ আছে।

মাহিউর স্ত্রী বাইরে রাস্তায় বেরিয়ে দেখল বাতাসটা থেমে গেছে। কিন্তু রাস্তায় কাদা। আকাশের রংটা মাটির মত। হেনরি আর লেনোরকে দুদিকে দু হাতে নিয়ে হাঁটতে লাগল। ছেলে দুটো একটু ফাঁক পেলেই হাতে কাদা তুলে নিয়ে বল বানিয়ে তাই দিয়ে খেলা করতে লাগল।

এবার রাস্তা ছেড়ে কোম্পানির সীমানায় ঢুকল মাহিউর স্ত্রী। বাঁ দিকে কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টার হানিবোদের বাড়ি দেখল। মাদাম হানিবো দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। কোন অতিথি এসেছে বাইরে থেকে। হেনরি লেনোর হাঁ করে দাঁড়িয়ে কি দেখছিল। তাদের হাত ধরে টেনে আবার এগিয়ে চলল মাহিউর স্ত্রী।

ও যাবে প্রথমে দোকানদার মাইগ্রাতের কাছে। তার কাছে কিছু পাউরুটি

ধার চাইবে। তারপর যাবে পাওলেনের গ্রেগরিদের বাড়িতে।

মাইগ্রাতের বাড়িটা কোম্পানির ম্যানেজারের বাড়িটার উল্টোদিকে। এক তলা বাড়িটার সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল মাইগ্রাত। মাহিউর স্ত্রী তার কাছে ভনিতা না করেই বলে ফেলল কথাটা। বলল, গতকালকার মত আমাকে তাড়িয়ে দেবেন না মঁসিয়ে মাইগ্রাত। জানি আপনি অনেক দিন থেকে আমাদের কাছে ষাট ফ্রাঁ পাবেন। কিন্তু বিশ্বাস করুন অনেক চেষ্টা করেও শোধ দিতে পারিনি। আজ বেশী কিছু না, শুধু এক পাউণ্ড ওজনের দু তিনটে রুটি দিন। কোন কফি নয়।

মাইগ্রাত চিৎকার করে জবাব দিল, না।

মাইগ্রাতের স্ত্রী একবার এসে মাহিউর স্ত্রীর কাতর অনুরোধ দেখে চলে গেল।

মাইগ্রাতের দোকানটা এখন খুব চলতি। লে ভোরোর ছোট ছোট দোকানগুলো সব কানা পড়ে গেছে। মাইগ্রাত আগে কোম্পানিতে কাজ করত। পরে কাজ ছেড়ে দিয়ে এই মুদিখানার দোকানটা করে। তারপর থেকে ক্রমশই উন্নতি হতে থাকে। আশেপাশে খনি ও কলকারখানার সব কর্মচারি ও শ্রমিকরা এ দোকানের খরিদ্দার।

তবে যদি মাইগ্রাতের কাছে কিছু জিনিস ধার করতে হয় তাহলে কোন শ্রমিক বা কর্মচারি নিজে যায় না। নিজে না গিয়ে তার মেয়ে বা স্ত্রীকে পাঠিয়ে দেয়। সুন্দরী অসুন্দরী যাই হোক সে মেয়ের একটু স্বাস্থ্য ভাল থাকলেই মাইগ্রাত তাকে ধারে জিনিস দেবে।

মাইগ্রাত এবার মাহিউর স্ত্রীর সারা দেহটার পানে এমনভাবে তাকাতে-লাগল যাতে তার মনে হলো তাকে যেন কে উলঙ্গ করে চাবুক মারছে। লজ্জায় মুখটা নত করে নিল মাহিউর স্ত্রী। বলল, এতে আপনার কোন লাভ হবে না মঁসিয়ে মাইগ্রাত।

ছেলেদের হাত ধরে আবার যাত্রা শুরু করল মাহিউর স্ত্রী। ভাবল, লোকটা কী নির্লজ্জ! তার যখন দেহে যৌবন ছিল যখন তার সাতটি সন্তান হয়নি তখন যদি এইভাবে লুব্ধদৃষ্টিতে তার পানে তাকিয়ে থাকত মাইগ্রাত তাহলে তার তবু একটা মানে হত।

সে আরও ভাবতে লাগল পাওলেনে যদি পাঁচ ফ্রাঁ না পায় তাহলে তাদের শুকিয়ে মরতে হবে। এখন এইটাই একমাত্র তাদের ভরসা।

জয়সেল রোডটা ছেড়ে মোড় ঘুরল মাহিউর স্ত্রী। দুপাশে শুধু মাঠ আর মাঠ। মাঠ নয় যেন তামাটে রঙের এক বিরাট সমুদ্র। সে মাঠে একটা কোন গাছপালা নেই। ছেলে দুটো এবার ক্লান্ত হয়ে পড়ল। বলল, মা আমাকে কোলে নাও।

পালা করে একবার করে ওদের কোলে নিচ্ছিল মাহিউর স্ত্রী। মনে মনে

ভাবছিল যদি সে পাঁচ ফ্রাঁ পায় তাহলে তা দিয়ে রুটি, মাখন, আলু আর কফি কিনবে।

অতি কষ্টে পাওলেনের বাড়ির বাইরে গিয়ে দাঁড়াল মাহিউর স্ত্রী। বাড়ির ঝি অনোরিন এসে বলল, কাঠের কাদামাখা জুতোগুলো খুলে ভিতরে এস।

ওদের খাবার ঘরের ভিতরে ঢুকে গরমে বেশ আরাম বোধ হচ্ছিল ওদের। সিসিলকে ডেকে মাদাম গ্রেগরি কিছু ছেলেদের জামাপ্যাণ্ট দান করতে বললেন। এইভাবে মাঝে মাঝে ওঁরা ওঁদের মেয়েকে দান করতে শেখান। দান করা পুণ্যের কাজ।

সিসিল অনোরিনকে তার পুরনো কিছু ফ্রক আর প্যাণ্ট আনতে বলল। মঁসিয়ে গ্রেগরি মাহিউর স্ত্রীকে তার সাতটি ছেলে হওয়ার জন্য বকতে লাগলেন। বললেন মানুষ বোঝে না বলেই কষ্ট পায়। তাদের তার স্বামীর কথা জিজ্ঞাসা করলেন।

মাহিউর স্ত্রী বলল, সে নিজে কুড়ি বছর পর্যন্ত খনির ভিতর কাজ করত। তার দ্বিতীয় সন্তান পেটে আসার পর ডাক্তার তাকে খনিতে নামতে নিষেধ করে। এখন তার স্বামী আর ছেলেমেয়েরা কাজ করে।

মাহিউর স্ত্রী সিসিলের দেওয়া জামা প্যাণ্ট নেবার পর পাঁচ ফ্রাঁ চাইল। কিন্তু মঁসিয়ে গ্রেগরি সরাসরি তার আবেদন প্রত্যাখ্যান করলেন। বললেন, এটা আমাদের রীতি ও নীতির বাইরে। আমরা মানুষকে কিছু জিনিস দিই। কিন্তু পয়সা দিই না। পয়সা দিলেই তারা মদ খেয়ে তার অপব্যবহার করে।

সিসিল দু টুকরো রুটি দিল ছেলেদুটোর হাতে।

মাহিউর স্ত্রী উঠতে চাইছিল না। সিসিল তাকে বুঝিয়ে বাড়ির বাইরে নিয়ে গেল।

মাহিউর স্ত্রী ফেরার পথে সাহস করে আবার মাইগ্রাতের দোকানে গেল। সাহস করে ধার চাইল। মাইগ্রাত বলল, তোমার মেয়েকে পাঠাতে পার না?

এবার মাহিউর স্ত্রী বুঝল মাইগ্রাত তাকে চায় না, চায় তার মেয়ে ক্যাথারিনকে। সে তখন মাইগ্রাতকে আশা দিয়ে বলল, ঠিক আছে। ঠিক আছে। তাকে পাঠাবার চেষ্টা করব। পরে ভাবল ক্যাথারিন যা মেয়ে মাইগ্রাত বেশীদূর তার কাছে এগোলে তার কান মলে দেবে।

তবে এবার মাইগ্রাত তাকে রুটি মাখন, কফি আলু ও পাঁচ ফ্রাঁ ধার দিল। তাকে প্রত্যাখ্যান করল না।

৩

দুশো চল্লিশ নম্বর গাঁয়ের চার্চের ইটের দেওয়ালঘড়িতে বেলা এগারোটা বাজল। এই চার্চের যাজক লে কুরে প্রতি রবিবার এসে প্রার্থনাসভা পরিচালনা করেন। এখানকার বাড়িগুলোর সব জানালা ঠাণ্ডার ভয়ে বন্ধ থাকলেও স্কুল

থেকে ছেলেদের কলরব ভেসে আসছিল। তখন বৃষ্টি না পড়লেও বাতাসটা জলকণায় ভারী ছিল।

বাড়ি ফেরার পথে মাহিউর স্ত্রী মাঝখানে একবার থামল এক জায়গায় কিছু আলু কেনার জন্য। বিরাট এক ফাঁকা প্রান্তরের মধ্যে এক রাশ পপলার গাছের মধ্যে কতকগুলো বড় পাকা বাড়ি গড়ে উঠেছিল। বাড়িগুলি কোম্পানি ডেপুটিদের বাসার জন্য তৈরি করেছে।

জিনিসপত্র যা কিছু কেনার সব কিনে তা সঙ্গে নিয়ে মাহিউর স্ত্রী অবশেষে বাড়ির দরজার কাছে এসে পৌছল। বলল, আমরা এসে গেছি। হেনরি আর লেনোরের সারা গা কাদায় জলে ভিজে গেছে।

মাহিউর স্ত্রী বাড়িতে গিয়ে দেখল এস্তেলে তখন আগুনের পাশে বসে থাকা আলজিরের কোলে কাঁদছে। এস্তেলেকে চুপ করাতে না পেরে আলজিরে জামা খুলে তার বুকের উপর এস্তেলের মুখটা চেপে ধরে স্তন দুধ দেবার ভান করছিল। কিন্তু সে বুকে শুধু চামড়া ঢাকা হাড ছাড়া আর কিছু না পাওয়ায় এস্তেলে রাগে চিৎকার করছিল।

এবার মাহিউর স্ত্রী আলজিরেকে বলল, আমাকে দে ওকে। জিনিসপত্রগুলি হাত থেকে নামিয়ে মাহিউর স্ত্রী বলল, ও আমাদের একটা কথাও বলতে দেবে না ভালভাবে।

এস্তেলেকে কোলে নিয়ে তার একটা বড স্তনে তার মুখটা গুঁজে দিল মাহিউর স্ত্রীর। সঙ্গে সঙ্গে চুপ করে দুধ খেতে লাগল এস্তেলে। তখন তারা কথা বলতে পারল। মাহিউর স্ত্রী দেখল পাকা গিন্নীর মত আট নয় বছরের মেয়ে আলজিরে সব ব্যবস্থা করে ফেলেছে। সে এস্তেলেকে ভুলিয়ে রাখেনি শুধু, ঘরে আগুনটা জালিয়ে রেখেছে, ঘর পরিষ্কার করেছে। বুড়ো বনিমোর তখনো নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিল।

মাহিউর স্ত্রী টেবিলের উপর জিনিসপত্রগুলো সব ছড়িয়ে রাখল। তার মধ্যে ছিল পাওলেনদের দেওয়া জামাকাপড়, দুটো পাঁউরুটি, আলু, কফি, আর আধ পাউণ্ড শূয়োরের মাংস। এত সব জিনিস দেখে আলজিরে আশ্চর্য হয়ে বলল, কত জিনিস! স্যুপ তৈরি করব?

তার মা বলল, না না, আমি পড়ে করব। তুমি বরং কিছু আলু সিদ্ধ করতে দাও। আমরা তা মাখন দিয়ে কফির সঙ্গে খাব।

এরপর হঠাৎ মাহিউর স্ত্রীর মনে পড়ে গেল পাওলেনে গ্রেগরিদের মেয়ে সিসিল পাঁউরুটি দিয়ে তৈরি ব্রিয়োক নামে একটা খাবার দিয়েছিল। হেনরি লেনোর ছাড়াও বাড়ির ছেলেমেয়েদের জন্য আরো কিছু বেশী দেয়। কিন্তু হেনরি ও লেনোর তা খেয়ে ফেলায় মাহিউর স্ত্রী তাদের মারতে গেল। তখন আলজিরে বলল, ওদের মেরো না মা, আমার চাই না। আমার জন্য দিয়েছিল ত? ওরা অনেক পথ হেঁটে ক্ষিদেয় কাতর হয়ে পড়েছিল। খেয়েছে বেশ করেছে।

বেলা বারোটা বাজতে ওদের কফি ও আলুসিদ্ধ হয়ে গেল। মাহিউর স্ত্রী যখন হাত দুটো গরম করার জন্য দু হাতে কফির গ্লাসটা ধরে এক চুমুক এক চুমুক করে খাচ্ছিল তখন উপরতলা থেকে নেমে এল বুড়ো বনিমোর। সাধারণতঃ অন্যদিন আরো দেরি করে আসে বনিমোর। এসে স্যুপ খায়।

কিন্তু আজ স্যুপ না পেয়ে রাগে গজগজ করতে লাগল। মাহিউর স্ত্রী বলল, সব দিন যখন যা চাওয়া হয় তা পাওয়া যায় না। যা পাওয়া যায় তাই খেতে হয়।

কথা শুনে চুপ করল বনিমোর। সে একমনে তার পুত্রবধূর দেওয়া আলু-সিদ্ধ খেতে লাগল। মাঝে মাঝে চেয়ার থেকে উঠে আগুনের কাছে যাচ্ছিল আবার নিজের চেয়ারে এসে বসছিল।

হঠাৎ আলজিরে বলল, আমি ভুলে গিয়েছিলাম মা। পাশের বাড়ি থেকে— আর বলতে হলো না। তার মা বুঝতে পারল, লা লেভাক যে জিনিস ধার দিয়েছে তা চাইতে এসেছিল।

মাহিউর স্ত্রী লা লেভাকের উপর তার একটা চাপা রাগ ছিল অনেকদিন ধরে। কিছুদিন আগেও ওরা নিদারুণ দারিদ্র্যে কষ্ট পেত। ওদের মত ভুগত কিন্তু বুতলুপকে ওদের বাড়িতে রাখার পর থেকে ওদের অবস্থা ফিরে গেছে একেবারে। বুতলুপ তার খাওয়া থাকার জন্য টাকাটা একপক্ষ কাল আগেই দিয়ে দেয়। তার ফলে স্বচ্ছলতা এসেছে সংসারে। দেমাক বেড়েছে লা লেভাকের।

মাহিউর স্ত্রী আলজিরেকে বলল, কিছু কফি কাগজে রেখে দাও। আমি এখনি তা পিয়েরেনকে দিতে যাব। গত পরশু থেকে এটা ধার আছে। শোধ দেওয়া হয়নি। আমি এসে ওদের জন্য স্যুপ তৈরি করে রাখব।

এস্তেলেকে বগলে চেপে কপির প্যাকেটটা নিয়ে বেড়িয়ে পড়ল মাহিউর স্ত্রী। এদিকে হেনরি ও লেনোর দুই ভাই বুড়ো বনিমোরের ফেলে দেওয়া আলুর খোসাগুলো কে আগে খাবে তাই নিয়ে ঝগড়া করছিল।

লা লেভাক পাছে দেখে ফেলে তাই সোজা রাস্তা দিয়ে না গিয়ে বাড়ির পিছনের দিকের বাগানের ভিতর দিয়ে পিয়েরেনদের বাড়ি গেল মাহিউর স্ত্রী। উল্টোদিকের ব্লকটায় গিয়ে অবাক হয়ে দেখল সে, হানিবোর স্ত্রী একজন ভদ্রলোক ও একজন মহিলাকে তাদের গাঁটা ঘুরে দেখাতে নিয়ে এসেছে।

পিয়েরেনদের বাড়ি পৌঁছতেই ব্যস্ত হয়ে পিয়েরেন বলল, এত ব্যস্ততা কিসের? দু দিন পরে দিলেও চলত।

পিয়েরেনের বয়স মাত্র আঠাশ। তার মাথার চুল কালো, কপালটা সরু। মুখের হাঁটা ছোট। এই সারা গাঁটার মধ্যে সুন্দরী হিসাবে খ্যাতি আছে পিয়েরেনের। সে তার দেহসৌন্দর্যকে ঠিক অক্ষত রাখতে পেরেছে কারণ আজও পর্যন্ত তার কোন সন্তান হয়নি। তার মা মাক্রল তাদের কাছেই থাকে। মা-

রুলের স্বামী অর্থাৎ পিয়েরেনের বাবা খনিতে কাজ করতে করতে অকালে মারা যায়। তাই মারুল আজও খনির মালিকদের গালাগালি দেয়। সে পিয়েরেনকে তাই কোন খনি শ্রমিককে বিয়ে করতে নিষেধ করেছিল। তার থেকে কারখানার শ্রমিককে বিয়ে করতে পারত সে। কিন্তু পিয়েরেন শেষে একজন খনিশ্রমিককেই বিয়ে করে। পিয়েরেন নামে এই খনিশ্রমিক বিপত্নীক। তার আগের স্ত্রীর লিভি নামে এক মেয়ে ছিল।

পিয়েরেনদের নামে গাঁয়ের লোকেরা যতই কুৎসা রটনা করুক ওদের সংসার ভালই চলছে। তাদের স্বামী স্ত্রীতে খুব মিল। তাদের সংসার সুখী। প্রতিটি ঘর ও জিনিসপত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তাদের সংসারের স্বচ্ছলতার একটা কারণ ছিল। কোম্পানির কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে পিয়েরেন তার ঘরের জানালার ধারে কিছু মিষ্টি ও বিস্কুট বিক্রি করে।

মাহিউর স্ত্রী গিয়ে দেখল পিয়েরেন কফি খাচ্ছে। তার স্বামী তখন খনিতে কাজ করতে গেছে। পিয়েরেন তাকে দেখেই বলল, এক গ্লাস কফি খাও আমার সঙ্গে।

মাহিউর স্ত্রী বলল, আমি এই মাত্র কফি খেয়ে আসছি।

পিয়েরেন বলল, খেয়েছ ত কি হয়েছে। আবার খাও।

তারা দুজনে কফি খেতে খেতে গল্প করতে লাগল। মাহিউর স্ত্রীর মনে পড়ল পিয়েরেনদের তুলনায় লেভাকদের ঘরবাড়ি কত অপরিষ্কার।

লেভাকদের বাড়ির কথা উঠতেই পিয়েরেন বলল, আমরা কখনই ওরকম নোংরার মধ্যে থাকতেই পারব না।

মাহিউর স্ত্রী লেভাকদের উপর তার পুঞ্জীভূত ঘৃণার গরল সমানে ঢেলে যেতে লাগল। বলল, বুতলুপের মত লজার পেলে আমরাও বেশ সচ্ছলতার সঙ্গে সংসার চালাতে পারতাম। আজকাল বাড়িতে লজার রাখা বেশ একটা লাভের ব্যাপার। তবে তার সঙ্গে এক বিছানায় শুতে হবে। লা লেভাক তাই করে আর তার স্বামী মদ খেয়ে তাকে মারধোর করে আর মঁতসুর ভাটিখানায় নাচিয়ে মেয়েদের পছনে ছুটে বেড়ায়।

গভীর ঘৃণার ভাব ফুটে উঠল পিয়েরেনের মুখে। সে বলল, হ্যাঁ ঐ মেয়েগুলোই রোগ ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে। জয়সেলে ঐ ধরনের একটা মেয়ে আছে যে সারা খনিটাকে সংক্রামিত করে তুলেছে।

মাহিউর স্ত্রী বলল, কিন্তু আমি বুঝতে পারি না তোমাদের বাড়ির ছেলেমেয়েকে লেভাকদের ছেলেমেয়ের সঙ্গে কেন মিশতে দাও।

পিয়েরেন বলল, ছেলেমেয়েকে যেতে কি দিতে হয়? ওদের তুমি কোনমতেই আটকাতে পারবে না। আমাদের বাড়ির পিছনের ঐ বাগানে জ্যাকারি আর ফিলোমেন সন্ধ্যের পর সব সময় বসে থাকে।

এইটাই হচ্ছে এ গাঁয়ের রীতি। সন্ধ্যে হবার সঙ্গে সঙ্গে গাঁয়ের তরুণী ও

যুবতী মেয়েরা তাদের আপন আপন প্রেমিকদের নিয়ে বাগানের আনাচে কানাচে ও চালাঘরে বসে থাকে রাত পর্যন্ত। বিয়ের আগেই অনেক মেয়ের সন্তান হয়। এতে কেউ কিছু মনে করে না। কারো কিছু ক্ষতি হয় না।

পিয়েরেন বলল, আমার মত মা হলে জ্যাকারিকে জব্দ করে ফেলতাম। আমার মনে হয় জ্যাকারি ফিলোমেনকে নিয়ে আলাদা কোথাও বাসা করে থাকবে। এরই মধ্যে ত ওর দুটো ছেলে হয়ে গেছে।

মাহিউর স্ত্রী রেগে বলে উঠল, যদি তারা তা করে তাহলে আমি তাদের অভিশাপ দেব। তার পিছনে আমাদের অনেক টাকা খরচ হয়েছে। আলাদা বাসা করার আগে আমাদের টাকা শোধ দিয়ে যাক। এইভাবে আমাদের ছেলেরা যদি টাকা রোজগার করে পরকে দেয় পরকে খাওয়ায় তাহলে আমাদের কি হবে, আমাদের কি করে চলবে?

এবার কফি ও কথা শেষ করে যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল মাহিউর স্ত্রী। পিয়েরেন তার কোলে এস্তেলেকে দেখে বলল, এ যে বেশ বড় হয়েছে তোমার মেয়ে।

মাহিউর স্ত্রী বলল, আর বলো না। ছেলেগুলো যা জ্বালাতন করে। তুমি বেশ আছ। যাই, পরে আবার কথা হবে। আমাকে গিয়ে আবার ওদের জন্য স্যুপ করতে হবে।

মাহিউর স্ত্রী বাইরে বেড়িয়ে গিয়ে দেখল হানিবোর স্ত্রী মাদাম হানিবো তার দুজন অতিথিকে নিয়ে দেখিয়ে বেড়াচ্ছে। গোটা গাঁটা তখনো ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা। সারা গাঁয়ে একটা উত্তেজনা পড়ে গেছে। বাড়ির মেয়েরা ঘরের দরজায় বেরিয়ে দেখছিল।

বাড়িতে না ঢুকেই লা লেভাকের কাছে মাহিউর স্ত্রী দাঁড়াল। গাঁয়ের ডাক্তার ভাঁদারহ্যামেন সেদিকে যাচ্ছিল দেখে তার উপর একরকম ঝাঁপিয়ে পড়ে লা লেভাক। ডাক্তারকে কাতরভাবে বলতে থাকে, আমাকে একটু ওষুধ দিন ডাক্তারবাবু। রাত্রে আমার একেবারেই ঘুম হয় না। সারা গায়ে ব্যথা।

ডাক্তার বলল, খুব করে কফি খাও। ঠিক হয়ে যাবে।

মাহিউর স্ত্রী বলল, আমার স্বামীর পায়ের ব্যথাটা কমছে না ডাক্তারবাবু। তাকে একবার দেখবেন না?

ডাক্তার বলল, তাকে বাইরে অত করে খাটালে পায়ে ত ব্যথা হবেই।

ডাক্তার আর সেখানে না দাঁড়িয়ে চলে গেল। লা লেভাক আর মাহিউর স্ত্রী দুজনে দাঁড়িয়ে পরস্পরের মুখপানে তাকিয়ে রইল।

লা লেভাক বলল, বাড়িতে এস, কফি হয়ে গেছে। একটু খেয়ে যাবে। তোমাকে নতুন খবর দেব।

মাহিউর স্ত্রীর ইচ্ছা না থাকলেও বাধা দিতে পারল না। ভিতরে গেল। বলল, সামান্য এক ফোঁটা দাও।

লেভাকদের ঘরে ঢুকেই মাহিউর স্ত্রী দেখল ঘরটা দারুণ নোংরা। ঘরের মেঝেয় দাগ দেওয়ালে দাগ, বিছানার চাদরটা এলোমেলো হয়ে আছে। বুতলুপ একটা চেয়ারে বসে সুপ খাচ্ছিল। ফিলোমেনের দু বছরের বড় ছেলেটা তার মুখপানে বুভুক্ষুর মত তাকিয়েছিল। বুতলুপের মনটা বড় দয়ালু। সে তাই মাঝে মাঝে এক টুকরো করে মাংস ছেলেটার মুখে ফেলে দিচ্ছিল।

বুতলুপের বয়স পঁয়ত্রিশ। কিন্তু বয়স অনুপাতে তার চেহারাটা বলিষ্ঠ এবং তাকে কমবয়সী মনে হয়। তার মুখে কালো দাড়ি আছে। লেভাকের স্ত্রী লা লেভাক বুতলুপের থেকে ছয় বছরের বড়। তার উপর তার চেহারাটা কুৎসিত। তার বুকের স্তনগুলো ঝুলে তলপেট পর্যন্ত নেমে এসেছে আর তার তলপেটের ভুঁড়ীটা নেমে এসেছে জানু পর্যন্ত। তার মুখেরও বাহার নেই। মাথার চুলগুলো কখনো বিন্যস্ত থাকে না। তবু বুতলুপ তাকে গ্রহণ করেছে। তার খাওয়া থাকার অন্যান্য উপাদানের মত বিগতযৌবনা লা লেভাকের দেহটাকেও এক আবশ্যকীয় উপাদান হিসাবে দেখে বুতলুপ। তাকে নিয়ে এক বিছানায় না শুয়ে পারে না।

লা লেভাক বলল, যে কথা তোমায় বলব বলে ডেকেছি। গতকাল মাদাম পিয়েরেনকে র‍্যাসেনোরের মদের দোকান ও হোটেলের পিছনটায় একসঙ্গে দেখা গিয়েছিল। কার সঙ্গে তা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ। বিবাহিত মেয়ের এই বেলেল্লাপনা সহ্য করা যায় না।

মাহিউর স্ত্রী বলল, যেমন তার স্বামী। এর থেকে কি তুমি আশা করতে পার?

বুতলুপ তখনো খাচ্ছিল। ফিলোমেনের বাচ্চাটাকে এক টুকরো রুটি দিল সে।

মাহিউর স্ত্রী বলল, কি বলব বল, ওর স্বামী যদি এসব মেনে নেয় তাহলে আমি তুমি কি করতে পারি? কতকগুলো লোক এমন উচ্চাভিলাষী যে তারা মালিকদের গা মালিশ করে দেবে।

এমন সময় একজন ফিলোমেনের ছোট ছেলেটাকে খনি থেকে নিয়ে এল। ছেলেটাকে একবার খনিতে নিয়ে যাওয়া যায়। ফিলোমেন বাইরে এসে তাকে স্তন দিয়ে যায়।

মাহিউর স্ত্রীর কোলে এস্তেলে ঘুমিয়ে পড়েছিল। তাই সে রেগে গিয়ে বলল, এই ছেলের জ্বালায় কি কোথাও বেরোন যাবে?

কিন্তু সেকথায় কান না দিয়ে লা লেভাক বলল, এখন এর একটা হেস্তনেস্ত করা দরকার। যা হোক একটা কিছু করতে হবে।

কয়েক মাস ধরে লা লেভাকের মুখে একটা দুশ্চিন্তার ভাব ফুটে উঠেছিল। এ কথাটা সে অপর পক্ষকে বলতে পারছিল না।

লা লেভাক বলছিল জ্যাকারির বিয়ের কথাটা।

এতদিন দু পক্ষে দুই মা-ই চুপ করে ছিল। তাদের মধ্যে যেন এক অলিখিত চুক্তি ছিল সম্পাদিত। কেউ কোনদিন বিয়ের কথাটা তুলত না। বিয়েটা হোক এটা চাইত না। তার কারণ উভয়ের স্বার্থ। জ্যাকারির মা যেমন ছেলের মাইনের টাকাটা ছাড়তে পারছিল না তেমনি ফিলোমেনের মাও মেয়ের রোজগারের টাকাটা ছাড়তে চাইছিল না। মাদাম লেভাক তার মেয়ের রোজগারের কথা ভেবেই তার ছেলেটাকে মানুষ করার দায়িত্ব নীরবে বহন করে যাচ্ছিল। কিন্তু এখন অসুবিধা হচ্ছে লা লেভাকের। এতদিন ফিলোমেনের একটা বাচ্চা ছিল, কিন্তু এখন দুটো হয়েছে। একদিন যা সম্ভব ছিল আজ তা আর হচ্ছে না। তাছাড়া ছেলে ক্রমশই বড় হচ্ছে, খরচ বাড়ছে, তার খাওয়া বাড়ছে। লা লেভাক তাই চায় ওদের বিয়েটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হয়ে যাক। জ্যাকারি বিয়ে করে তার ছেলে পরিবারের ভার নিক।

সব কথা শুনে মাদাম মাহিউ বলল, ঠিক আছে, এখন বর্ষা ও শীতটা কাটুক না। ভাল দিন আসুক। তারপর হবে। এই জিনিসগুলো কিন্তু বড় খারাপ। বিশেষ করে মেয়েদের এভাবে এগোন উচিত নয়। আমার ক্যাথারিন যদি এই ধরনের কাজ করে তাহলে আমি তার গলা টিপে মারব।

লা লেভাক বলল, মেয়েরা সবাই যা করে একদিন সেও তাই করবে। সুতরাং ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই।

ওরা দুজনেই মুখ বাড়িয়ে দেখল মাদাম হানিবো তার অতিথিদের নিয়ে পিয়েরেনের বাড়িতে গেল। এই দেখে আবার পিয়েরেনের কথাটা উঠল ওদের মধ্যে। মাদাম লেভাক বলল, যতবারই কোম্পানির তরফ থেকে কোন অতিথি বা পরিদর্শক আসুক তাকে পিয়েরেনের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়, কারণ ওদের বাড়িটা এ গাঁয়ের মধ্যে সবচেয়ে বেশী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আর তা কেন হবে না, কোন প্রেমিক যদি মাসে তিন হাজার ফ্রাঁ করে দেয় তাহলে কেন তাতে এই স্বাচ্ছন্দ্য বা সচ্ছলতা হবে না। তবে উপরটাই দেখতে ওদের এত চকচকে। ওদের ভিতরটা ওদের মনটা কত নোংরা তা নিশ্চয় ওদের বলা হয়নি।

হঠাৎ লা লেভাক বলে উঠল, একি, ওরা তোমাদের বাড়ির দিকে আসছে।

মাদাম মাহিউ দেখল সত্যিই তাই। 'মাদাম হানিবো তাদের বাড়ির দিকেই আসছে। আর কোন কথা না বলে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ল মাহিউর স্ত্রী। তার ঘর সব অপরিষ্কার আছে। এখনো সুপ তৈরি হয়নি। কিন্তু ঘরে গিয়ে অবাক হয়ে গেল মাদাম মাহিউ। আলজিরে সব গুছিয়ে পরিষ্কার করে রেখেছে। এক কড়াই জল গরম করেছে ওদের স্নানের জন্য। ছেলেদুটোও চুপচাপ খেলা করছে ঘরের মেঝের উপর।

হানিবো এসে ঠিক দরজায় কড়া নাড়ল।

মাহিউর স্ত্রী দরজা খুলে দিল। মাদাম হানিবো বলল, আমি তোমাদের

বিরক্ত করছি না ত?

মাহিউর স্ত্রী বলল, আপনারা ভিতরে আসুন। ঘরটা আর নোংরা নেই।

মাদাম হানিবো অতিথিদের বলল, এই সেই মেয়েটি যে সাতটি সন্তানের জননী; আমাদের খনিশ্রমিক মাহিউর স্ত্রী। আমাদের কোম্পানি মাসে মাত্র ছ ফ্রাঁ নিয়ে শ্রমিকদের এই বাড়িগুলোতে থাকতে দেয়। নিচের তলায় একটা বিরাট ঘর আর উপরতলায় দুটো করে ঘর। তাছাড়া আছে একটা করে বাগান।

অতিথি দুজন প্রায়ই মাদাম হানিবোর পানে তাকিয়ে থাকছিল। তাদের দেখে বেশ বোঝা গেল, তারা আজই সবেমাত্র প্যারিস থেকে এসেছে। এসেছে এক নতুন জগতে বেড়াতে। নতুন অভিজ্ঞতার কথা সঞ্চয় করতে।

মাহিউর স্ত্রী দেখল মাদাম হানিবোর বয়স প্রায় চল্লিশ। তার চেহারাটায় স্থূলতার দিকে একটা ঝোঁক রয়েছে। মাদাম হানিবো অতিথিদের পানে তাকিয়ে এক কৃত্রিম হাসি হাসছিলেন। কারণ তিনি ভদ্রতা ও আতিথেয়তার খাতিরে এইভাবে গাঁয়ের ভিতর ঘুরে বেড়াতে বিরক্ত বোধ করছিলেন, তাছাড়া তার দামী পোষাক ময়লা হয়ে যাচ্ছিল।

অতিথিদের মধ্যে ভদ্রমহিলাটি বললেন, তার উপর আবার বাগান? বাঃ চমৎকার। যে কেউ এখানে বাস করতে পারে।

মাদাম হানিবো বলল, আমরা ওদের এত কয়লা বিনা পয়সায় দিই যে ওরা তা পুড়িয়ে শেষ করতে পারে না। একজন ডাক্তার বিনা পয়সায় সপ্তায় ওদের দুবার দেখে। ওরা বৃদ্ধ হলে ওরা একটা করে বৃত্তি পায়। অথচ এতকিছুর জন্য ওদের মাইনে থেকে কিছুই কাটা হয় না।

ভদ্রলোক এতক্ষণে বলে উঠল, তাহলে ত আর্কেডিয়া। ছন্দ ও মধুবিধৌত এক দেশ।

মাহিউর স্ত্রী তাদের বসার জন্য চেয়ার আনতে গেল। কিন্তু ওরা বসতে চাইল না। এই সব দারিদ্র্যের চিহ্ন, এই নতুন পরিবেশ মাদাম হানিবোর এক-ঘেঁয়ে জীবনে একটা বৈচিত্র্যের আনন্দ এনে দিয়েছিল। একাকীত্ব আর দুঃসহ নিঃসঙ্গতা হতে মনটাকে মুক্ত করে নিয়ে গিয়েছিল বেশ কিছুক্ষণের জন্য। তবে যদিও বাছা বাছা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাড়িগুলো নিয়ে যাচ্ছিল মাদাম হানিবো তবু আশপাশের নোংরা অনভ্যস্ত পরিবেশে অস্বস্তি বোধ করছিল সে।

অতিথি ভদ্রমহিলা একবার বলল, কি সুন্দর ছেলেমেয়ে!

মুখে যাই বলুক ভদ্রমহিলা ছেলেগুলোর বড় বড় মাথা, রোগা শরীর, নোংরা পোষাক দেখে মনে মনে বিরক্ত হচ্ছিল। চলে যেতে চাইছিল। কিন্তু পারছিল না।

ছেলেদের দেখে ছেলেদের মাকে প্রায়ই ছেলেদের সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছিল ওরা। প্রথমে তারা এস্তেলের কথা জানতে চাইল। বুড়ো বনিমোর বসে একমনে পাইপ খেয়ে যাচ্ছিল। চল্লিশ বছর খনিতে থাকার পর তার

দেহটা একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে। চেহারাটা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে। পা দুটো শক্ত কাঠ হয়ে পড়েছে আর মুখখানা সাদা রক্তহীন দেখাচ্ছে।

ওরা সবাই আলজিরের প্রশংসা করতে লাগল। এই আট বছরের মেয়েটি ঝাড়ন হাতে ঘরসংসারের সব কাজ করছে পাকা গৃহিণীর মত। কিন্তু ওরা কেউ আলজিরের পিঠের কুঁজের কথাটা বলল না, ওর বিকৃত দেহটার কথা বলল না।

মাদাম হানিবো অতিথিদের বলল, প্যারিসে যদি কেউ আপনাদের খনি সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করে তাহলে বলবেন এইসব খনিবস্তীতে কিভাবে ওরা সুখে শান্তিতে ঘর-সংসার করছে। ওদের নীতিবোধ কত প্রখর।

অতিথি ভদ্রলোক উৎসাহের সঙ্গে বলল, চমৎকার।

মাহিউদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল ওরা। ওদের দেখে পথে ভিড় জমে গেছে। এদিকে লা লেভাক, ওদিকে মাদাম পিয়েরেন প্রভৃতি সব বাড়ির মেয়েরা ওদের দেখার জন্য পথে ভিড় করেছে। লা লেভাক ও মাদাম পিয়েরেন দুজনেই ব্যাপারটা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেছে। মাহিউদের বাড়িতে মাদাম হানিবো কি তার অতিথিদের নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল? এতক্ষণ ধরে ওদের বাড়িতে কাটাবার কি আছে?

ওদের একজন অর্থাৎ পিয়েরেন বলল, ওরা যা রোজগার করে তাতে ওদের সংসারই চলে না।

লা লেভাক বলল, আমি ত এইমাত্র শুনলাম ওরা পাওলেনে ভিক্ষে করতে গিয়েছিল। মাইগ্রাত ওদের ধারে কোন জিনিস প্রথমে দিতে চায়নি। পরে দেয়। আমরা সবাই জানি মাইগ্রাত তার জিনিসের দাম কি করে আদায় করে।

পিয়েরেন বলল, তার উপর দিয়ে আদায় করবে না। তাহলে মাইগ্রাতের পক্ষ থেকে বেশ কিছু সাহসের দরকার হবে। মাইগ্রাত আদায় করবে ওর মেয়ের উপর দিয়ে।

লা লেভাক বলল, আমারও তাই মনে হয়। কিন্তু ও আমাকে একটু আগে বলল, ক্যাথারিন যদি কখনো বোকার মত কাজ করে তাহলে তার গলা টিপে মারবে। ও যেন জানে না শ্যাভেল ওকে কতদিন আগে সেই চালাঘরে চিৎ করে ফেলেছিল।

পিয়েরেন ওকে চুপ করতে বলল ইশারায়। ওরা আসছে।

মাদাম হানিবো তার অতিথিদের নিয়ে রাস্তা দিয়ে চলে যাচ্ছিল।

লেভাক আর পিয়েরেন নীরবে দাঁড়িয়ে রইল একপাশে। ওরা চলে গেলে লেভাক আর পিয়েরেন মাহিউর স্ত্রীকে ইশারায় ডাকল। তার কোলে তখনো এস্তেলে ছিল।

মাদাম হানিবোরা একটু দূরে চলে গেলে ওরা তিনজনে মিলে আবার কথা বলতে শুরু করল।

ওদের মধ্যে একজন বলল, ওদের পিঠের দিকটা দেখছ? কত টাকার

পোষাক ওদের গায়ে আছে।

আর একজন বলল, তা অবশ্য বটে। দুজন মহিলার মধ্যে একজনকে চিনি না। তবে একজনকে চিনি। ওর চেহারাটা মোটা হয়ে যাচ্ছে। মাদাম হানিবোর কথা বলছি। ওর সম্বন্ধে এখন কত কি শোনা যাচ্ছে।

আর একজন বলল, কি, কি শোনা যাচ্ছে?

কি আবার, পরপুরুষ ধরেছে। সবচেয়ে বড় কথা এঞ্জিনীয়ার হলো ওর পেয়ারের লোক।

সেকি ঐ বেঁটে বেঁটে রোগা লোকটা? তা কি করে হবে? সে ত ওর বিছানার চাদরের তলায় হারিয়ে যাবে।

তাতে কি হয়েছে। যে যাকে চায়। ও তাকেই চায়। দেখছ না ওর চোখের দৃষ্টিটা কেমন সব সময় এধার ওধার ঘুরছে। কেমন সব সময় ছটফট করছে। সব সময় সব জায়গাতেই চঞ্চল। ওর চলার ঢংটা দেখ। আমাদের দেখে ওর পিছনটা দোলাচ্ছে।

মাদাম হানিবো ও তার অতিথিরা কথা বলতে বলতে ধীর গতিতে চলে যাচ্ছিল ওদের দিকে পিছন ফিরে। ওরা তিনজনে যখন চার্চের সামনে গিয়ে পৌছল তখন রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে থাকা একটা ঘোড়ার গাড়ি থেকে একজন ভদ্রলোক কালো কোট পরে নেমে এল। তার মুখে চোখে স্পষ্ট ফুটে উঠেছিল এক প্রভুত্বের ছাপ।

লা লেভাক বলল, উনিই হচ্ছেন স্বামী। মঁসিয়ে হানিবো।

গলাটা নিচু করে এমনভাবে কথাটা বলল যাতে মনে হবে ওর কথাটা মঁসিয়ে হানিবো অতদূর থেকে শুনতে পাবে। যে লোকের মুখপানে তাকিয়ে দশহাজার খনিশ্রমিক ভয় পায় তার ভয়ে লা লেভাকও কম ভীত নয়।

তবু লা লেভাক বলল, যতই হোক, ওর চোখের দৃষ্টি থেকে বোঝা যায় ওর স্ত্রী ওকে বোকা বানিয়ে বেড়াচ্ছে।

লা লেভাকের বাড়ির সামনে প্রথমে যেখানে তিনজন মেয়ে দাঁড়িয়েছিল এখন সেখানে প্রায় তিরিশজন মেয়ে এসে হাজির হয়েছে। ময়লা মুখ ও হাত পা নিয়ে অসংখ্য ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলো ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে তার মাদের চারদিকে। বাগানে কাজ করতে থাকা লোকগুলো কোদাল থামিয়ে চুপ করে দেখছে। স্কুলমাস্টার স্কুলের বেড়ার ধারে এসে মুখ বাড়িয়ে দেখছে। এস্তেলে কাঁদতে থাকায় সকলের সামনেই বুক খুলে তার স্তন বার করে মেয়েটাকে দুধ খাওয়াতে লাগল মাহিউর স্ত্রী। আবার ওরা ফিসফিস করতে লাগল। দমকা হাওয়ার আঘাতে উড়তে থাকা শুকনো ঝরা পাতার মত খস খস শব্দ হতে লাগল ওদের কথার। কিন্তু মাদাম পিয়েরেন আর মাহিউর স্ত্রী দুজনেই চুপ করে রইল। অনেক মেয়ে জড়ো হয়েছে। এদের সামনে বেশী কথা ঠিক নয়।

ওদিকে মঁসিয়ে হানিবো সকলকে গাড়িতে তুলে বসিয়ে দিতেই ওদের গাড়ি

ছেড়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে এখানে সমবেত জনতা প্রাণ খুলে জোরে কথা বলতে লাগল। চাপা গুঞ্জন পরিণত হলো স্পষ্ট কলরবে। মনে হলো শান্ত নীরব এক বিরাট উইঢিবি হঠাৎ ফেটে পড়েছে এক সোচ্চার বিদ্রোহে।

দেখতে দেখতে তিনটে বেজে গেল। বুতলুপ ও একজন খনিশ্রমিক খনিতে যাবার জন্য তৈরি হয়ে বেরিয়ে গেল। সকালে যারা গিয়েছিল তারা এবার দলে দলে ফিরে আসছে। মেয়েরা সবাই ঘরে ঘরে ফিরে গেল। ক্লান্ত শ্রমিকরা বাড়ি ঢুকেই সবাই স্যুপের জন্য চিৎকার করতে লাগল।

৪

মাহিউ র‍্যাসেনোরের কাছে এতিয়েনকে রেখে বাড়িতে ফিরে এসে দেখল, ক্যাথারিন, জ্যাকারি ও জ্যাঁলিন বসে বসে স্যুপ খাচ্ছে। শ্রমিকরা কাজ থেকে এত ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত হয়ে বাড়ি ফেরে যে তারা জামাকাপড় না ছেড়ে বা মুখ হাত না ধুয়েই স্যুপ খেতে থাকে।

খাবার ঘরের দরজা খুলেই টেবিলের উপর খাবার সাজানো রয়েছে দেখতে পেল মাহিউ। দেখে অবাক হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ থেকে সমস্ত উদ্বেগ চলে গেল মুহূর্তে। আজ খনির ভিতর সারাক্ষণ শুধু বাড়ির কথা ভেবেছে। ভেবেছে বাড়িতে একটা পয়সাও নেই, কোথা হতে খাবার আসবে, বিকালে গিয়ে ওরা কি খাবে—এই সব কত কথা। এসে দেখল তার স্ত্রী সব যোগাড় করেছে। কোথা থেকে কিভাবে এ সব যোগাড় করেছে তা সে জানে না, পরে জানবে। কিন্তু যদি সে এই সব জিনিস সেখান থেকে না পেত, যদি সে শূন্য হাতে ফিরে আসত তাহলে কি হত এ কথা ভাবতে ভয়ে শিউরে ওঠে মাহিউর বুকটা। যাই হোক, সব কিছু দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল মাহিউ। মুখে হাসি ফুটে উঠল তার।

ক্যাথারিন ও জ্যাঁলিনের খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কফি খাচ্ছিল। জ্যাকারি রুটিতে মাখন লাগাচ্ছিল। প্লেটে কিছু মাংস ছিল। সেটা তার বাবার।

মাহিউর স্ত্রী বলল, মদের পয়সা কুলোয়নি। আমি অল্প সামান্য কিছু টাকা পেয়েছি। যদি আরো কিছু চাও তাহলে তোমার মেয়েকে পাঠাতে পার।

মাহিউর মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তার স্ত্রী এত জিনিস ছাড়া কিছু টাকাও এনেছে।

মাহিউ বলল, না না, আর দরকার নেই। আমিও কিছু টাকা পেয়েছি।

এই বলে চামচে করে স্যুপ খেয়ে যেতে লাগল মাহিউ। যা কিছু খাবার সব খেল একে একে। তার স্ত্রী এস্তেলেকে কোলে নিয়েই আলজিরেকে দিয়ে পরিবেশন করাতে লাগল। তার স্বামীর কি দরকার হয় তা তদারক করতে

আগুন।

এদিকে স্নানের পর্ব শুরু হয়ে গেছে। প্রথমেই ক্যাথারিন জামাকাপড় ছেড়ে আগুনের ধারে গরম জলে স্নান করতে শুরু করেছে। আগুনের ধারে ঘরের মধ্যে সকলের সামনে স্নান করতে লাগল উলঙ্গ হয়ে। কেউ তার দিকে তাকাল না। এটা একটা সহজ সাধারণ ব্যাপার তাদের কাছে। স্নান হয়ে গেলে ক্যাথারিন উলঙ্গ হয়ে উপরতলায় চলে গেল। সেখানে গিয়ে সে শুকনো পরিষ্কার পোষাক পরবে।

ক্যাথারিনের পর জাঁলিন স্নান করতে গেলে জ্যাকারি প্রতিবাদ করল। তার খাওয়া তখনো শেষ হয়নি বলেই জাঁলিন গিয়েছিল। পরে দুজনেই এক সঙ্গে স্নান করে উপরতলায় পোষাক পরতে লাগল উলঙ্গ হয়ে। এইটাই তাদের রীতি। এদিকে হেনরি ও লেনোর মাংসের গন্ধ পেয়ে তার বাবার দুপাশে গিয়ে দাঁড়াল।

মাহিউ বলল, ছেলেরা মাংস পায়নি ?

তার স্ত্রী বলল, হ্যাঁ ওরা পেয়েছে।

মাহিউ বলল, দেখ, এই হই-হই ভাব ভাল লাগে না। সকলকে সমানভাবে ভাগ করে দিতে হয়।

তার স্ত্রী আলজিরেকে সাক্ষী মানল। আলজিরে মিথ্যা করে বলল, হ্যাঁ মাংস ওরা পেয়েছে।

আলজিরে এই সব ক্ষেত্রে তার মার কাছ থেকে মিথ্যা কথা বলতে শিখেছে। কিন্তু লেনোর আর হেনরি স্পষ্ট বলল, তারা একটুও মাংস পায়নি। মাহিউ তখন তাদের তার দুটো জানুর উপর বসিয়ে মাংসের কয়েকটা টুকরো তাদের খেতে দিল।

খাওয়া শেষ হলে মাহিউ তার স্ত্রীকে বলল, আমার কফিটা গরম রেখে দেবে। আমি স্নান সেরে খাব।

তার স্ত্রী তখন হেনরি ও লেনোরকে বকছিল। বলছিল, যদি তোদের বাবা একাই সব মাংস খায় ত হয়েছে কি ? ও খনিতে গিয়ে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটে না ? আর তোরা কুঁড়ের হদ্দ কোথাকার ! তোরা খাওয়া ছাড়া আর কি করিস ?

এবার মাহিউর স্নানের পালা। খালি টবটা গরম জলে আবার ভর্তি করা হলো। ছেলেমেয়েদের একে একে ঘর থেকে সরিয়ে দেওয়া হলো। জ্যাকারি ও জাঁলিন ফর্সা পোষাক পরে বাইরে বেড়াতে গেছে। আলজিরে হেনরি ও লেনোরকে বাইরে পাঠানো হয়েছে। ক্যাথারিন উপরে কি সেলাই করছিল। তার মা হেঁকে তাকে বলল, নিচে নামিস না, তোর বাবা স্নান করছে। মাহিউ ছেলেমেয়েদের সামনে স্নান করে না। তার স্নানের সময় তার স্ত্রী ছাড়া ঘরে আর কেউ থাকে না।

মাহিউ জামা প্যান্ট সব খুলে উলঙ্গ হয়ে টবে গাটা ডোবাতে তার স্ত্রী সাবান

দিয়ে তার সর্বাঙ্গ ঘষতে থাকল। মাহিউ এটাই চায়।

তার স্ত্রী যখন তার গায়ে সাবান মাখিয়ে ও পরে তোয়ালে দিয়ে গা মুছিয়ে দেয় তখন তার খুব আরাম হয়।

সাবান মাখাতে মাখাতে তার স্ত্রী আজ সকালকার কথাটা বলল। কিভাবে জিনিসপত্র ও পাঁচ ফ্রাঁ পেয়েছে তা সব একে একে বলল। বলল, মাইগ্রাত দিল বটে, তবে আমাদের নিয়ে ও একটু ঠাট্টা করতে চায়। ক্যাথারিনকে পাঠাবার কথাটা বলল না।

ওসব কথা শুনতে চায় না মাহিউ। জলে কাদায় সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর গরম জলে স্নানের যে আরাম নিবিড়ভাবে উপভোগ করছিল ও কোন কথা বা চিন্তা দিয়ে সে আরামের নিবিড়তাটাকে ব্যাহত করতে চাইছিল না সে।

মাহিউর নগ্ন দেহের এমন কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বাদ রইল না যেখানে তার স্ত্রী সাবান ঘষল না। সাবান মাখানো হয়ে গেলে গা ধুইয়ে তোয়ালে দিয়ে তার সর্বাঙ্গ মুছিয়ে দিল। প্রতিটি গোপনাঙ্গও ভাল করে মুছিয়ে দিল।

এইভাবে তার স্ত্রী যখন তার সর্বাঙ্গে সাবান মাখাচ্ছিল ও তোয়ালে দিয়ে গা মোছাচ্ছিল তখন তার মাথার চুল তার বুক মাহিউর গায়ে ঠেকছিল। স্ত্রীর দেহের স্পর্শের নিবিড়তায় একটা জারজ উত্তেজনা অনুভব করতে লাগল মাহিউ। রোজ এমনিই হয়। সব খনিশ্রমিকরাই তাই করে।

স্নান সেরে ঘরের মাঝখানে এসে তার স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরল সে। তাকে একটা চেয়ারে জোর করে বসাল। বাচ্চা এস্তেলেকে এক জায়গায় বসিয়ে দিয়েছিল তার মা।

মাহিউর স্ত্রী বলল, তুমি বড় দুষ্টু। দেখছ না এস্তেলে আমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। আমি অন্ততঃ মুখটা ঘুরিয়ে দিই অন্য দিকে।

মাহিউ বলল, ও তিন মাসের ছেলে, কি বুঝবে?

এই বলে মাহিউ তার স্ত্রীকে টেবিলে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিল। এবার সে তাকে এমনভাবে জড়িয়ে ধরল যে আর ছাড়ল না। শুধু একা মাহিউ নয়, এ গাঁয়ের সব খনিশ্রমিকরাই স্নানের পর এইভাবে তাদের সারা অঙ্গে এক জারজ উত্তেজনার শিহরণ নিয়ে তাদের স্ত্রীদের সঙ্গে সহবাস করে। অনেক অবাঞ্ছিত সন্তানের জন্ম দেয়। রাত্রিতে তারা এক বিছানায় স্ত্রীদের নিয়ে শুলেও তাদের ঘরে ছেলেমেয়েরা থাকায় তাদের সে সহবাস নিবিড় ও নিরুদ্বিগ্ন হয় না।

মাহিউর স্ত্রী তার স্থূলদেহ আর শিথিল স্তনযুগল নিয়ে নীরবে শুয়ে রইল। একবার ক্ষীণ প্রতিবাদ করল। কিন্তু মাহিউ তা শুনল না।

ওদের সঙ্গমকার্য হয়ে গেলে মাহিউ উঠে শুধু একটা পায়জামা পরল। এই ভাবে কিছুক্ষণ জামা না পরেই রইল সে। এমনি করে খালি গায়ে বিস্তৃত বুকটা ফুলিয়ে পেশীবহুল হাত দুটো ছড়িয়ে থাকতে ভাল লাগে মাহিউর।

ছেলেগুলো বাড়ির বাইরে রাস্তার ফুটপাথে খেলা করছিল।

শুধু পায়জামা পরে খালি গায়ে দাঁড়িয়ে কফি খেতে লাগল মাহিউ। কফি খেতে খেতে কাঠের কাজ সম্বন্ধে তাদের এঞ্জিনীয়ারের আদেশের কথাটা তার স্ত্রীকে বলল সে। এ বিষয়ে তার স্ত্রীর মতামতগুলো সে আগ্রহ সহকারে শুনছিল আর সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ছিল।

তার স্ত্রী বলল, কোম্পানির বিরুদ্ধে মাথা গরম করে বা বিদ্রোহ করে কোন লাভ হবে না তাদের। তারপর তার স্ত্রী মাদাম হানিবোর আসার কথাটা বলল মাহিউকে।

ক্যাথারিন উপর থেকে হেঁকে বলল, এবার আমি নিচে যেতে পারি?

তার মা বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার বাবা গা শুকোচ্ছে।

ক্যাথারিন তার রবিবারের কালোয় নীলে মেশানো পপলিনের জামা আর কালো বনেট পরে নেমে এল। পোষাকটা পরিষ্কার হলেও পুরনো। এক এক জায়গায় একটু করে ছিঁড়ে গিয়েছিল।

ক্যাথারিন পোষাক পরে নিচে নেমে আসতেই তার মা বলল, কোথায় যাচ্ছিস?

ক্যাথারিন বলল, আমি মঁতসু যাচ্ছি একটা ফিতে কিনতে।

মা বলল, তোর কাছে কিছু টাকা আছে?

ক্যাথারিন বলল, না, মুকেত্তে দশ স্যু ধার দেবে বলেছে।

তার মা বলল, কিন্তু দেখো যেন মাইগ্রাতের দোকানে ফিতে কিনতে যেও না। নগদ পয়সা দেখলেই ভাববে আমাদের অনেক টাকা আছে।

মাহিউ আগুনের ধারে বসেছিল। বলল. দেখো, সন্ধ্যের পর যেন রাস্তায় ঘুরে বেড়িও না।

সারা বিকেলটা তার বাগানে কাজ করে কাটাল মাহিউ। সে তার বাগানে নিজের হাতে আলু, কড়াইশুঁটি, কলাই প্রভৃতি বসিয়েছে। এখন সে কিছু বাঁধাকপির বীজ বসাচ্ছিল। এ বাগানে অনেক শাক সবজী ও তরিতরকারি হয়। শুধু আলুটা বেশী হয় না।

মাহিউ যখন তার বাগানে কাজ করছিল তখন লেভাক বেড়ার কাছে এসে দাঁড়াল। সে আজ বাড়ি ফিরেই স্যুপ না পেয়ে রাগের মাথায় স্ত্রীকে মার-ধোর করে। মাহিউ ও তাদের বাড়ির সকলেই লেভাকের চেঁচামিচিতে সচকিত হয়ে ওঠে। তখন মাহিউ বলে, নিশ্চয় ও স্যুপ পায়নি।

তার স্ত্রী তখন বলে, পাবে কি করে, আমি এইমাত্র দেখে এলাম এখনো তর-কারিই কাটা হয়নি।

মাহিউ বলে, তাহলে ও মারবেই।

সেই লেভাক শান্ত হয়ে পাইপ খেতে এসেছে। সে বলল তার লজার বুতলুপ খুব খাটে। খোন্তা দিয়ে মাটিটাকে নরম না করলে তাদের কোন

কিছুই হত না।

অবশেষে লেভাক মাহিউকে নিয়ে র‍্যাসেনোরের হোটেলে যেতে চাইল। কিন্তু মাহিউ রাজী হলো না। বলল, আমাকে আজ বাগানে গাছে জল দিতে হবে। তা না হলে গাছপালা সব মরে যাবে।

আসলে মাহিউ ভাবছিল পয়সার কথা। র‍্যাসেনোর হোটেলে যেতে হলে তার স্ত্রীর কাছে পয়সা চাইতে হবে। লেভাক বলল, তারা স্কিটন খেলবে। তবু মাহিউ গেল না।

এমন সময় পিয়েরেনের স্ত্রী মাদাম পিয়েরেন এসে তাদের জিজ্ঞাসা করল তাদের মেয়ে লিভি জাঁলিনের সঙ্গে বেড়াতে গেছে কিনা। লেভাক বলল, আমাদের বেবার্তও বাড়ি নেই। এইত তাদের কাজ। ওরা একসঙ্গে সব সময় দল বেঁধে থাকবে।

মাহিউ বলল, জাঁলিনকে চাটনির আনাজ আনতে বলা হয়েছে।

যত সব অশ্লীল কথা বলে পিয়েরেনের সঙ্গে ওরা ঠাট্টা করতে লাগল। পিয়েরেন তা শুনে লজ্জা পেলেও চলে যাচ্ছিল না; উপভোগ করছিল। এমন সময় স্কুলের ছুটি হলো। ছেলেরা কলরব করতে করতে বাড়ি ফিরতে লাগল। লেভাক পিয়েরেনের কাছে এগিয়ে গিয়ে তার উরুগুলো সুন্দর আর শক্ত কিনা দেখতে চাইল। তখন পিয়েরেন পালিয়ে গেল। লেভাক একাই চলে গেল মঁতসু। মাহিউ তার বাগানে গাছ বসানোর কাজ করে যেতে লাগল।

সন্ধ্যে হয়ে আসছে। মাহিউর স্ত্রী বাতি জেলে এসে তার স্বামীকে জানাল ছেলেমেয়েরা কেউ বাড়ি ফেরেনি। জাঁলিন এখনো চাটনির কোন ব্যবস্থা করল না। মাহিউর স্ত্রী কিছু আলু পিঁয়াজ ভাজল। পিঁয়াজ ভাজার তীব্র গন্ধ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। এ গন্ধ দূর থেকে পেয়ে যে কোন বাইরের লোক বলে উঠবে এটা হচ্ছে এক গরীব শ্রমিক বস্তী।

সন্ধ্যার অন্ধকারটা ঘন হয়ে উঠলে মাহিউ বাগান থেকে বাড়ির ভিতরে চলে এল। একটা চেয়ারে বসে পড়তেই তার ঘুম আসতে লাগল। হেনরি ও লেনোর আলজিরেকে খাবার টেবিল সাজাতে সাহায্য করতে গিয়ে একটা প্লেট ভেঙ্গে ফেলেছে। বনিমোর এসে রাতের খাবার চাইল। সে রাতের সিফটে কাজে যাবে।

মাহিউর স্ত্রী তার স্বামীকে জাগাল। মাহিউ বলল, ঠিক আছে। ওরা যখন আসে আসবে। এখন আমাদের শুরু করা যাক।

৫

র‍্যাসেনোর হোটেলে তাকে রেখে মাহিউ চলে গেলে কিছু স্যুপ খেয়ে শুয়ে পড়েছিল এতিয়েন। স্যুপ খেয়ে সে সোজা চলে গিয়েছিল তার নির্দিষ্ট ছাদের

ঘরে। এ ঘর থেকে লে ভোরোর সব কিছু দেখা যায়।

ঘরে ঢুকেই ক্লান্ত দেহে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিল এতিয়েন। যখন তার ঘুম ভাঙল তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। ঘুমজড়ানো চোখে প্রথমটায় সে বুঝতেই পারছিল না সে কোথায় আছে। দুটি দিনের মধ্যে সে চার ঘণ্টাও ঘুমোয়নি। ঘুম থেকে উঠে শরীরটাকে তার খুব ভারী আর পাগুলো খুব শক্ত মনে হচ্ছিল।

সে বিছানায় বসে ঠিক করল ফাঁকা জায়গায় একটু বেড়াবে সে।

বাইরে বেরিয়ে এতিয়েন দেখল ধূসর ছাই-এর মত আকাশটা তামাটে হয়ে উঠলেও বাতাসটা একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। একটা গুমোট ভাব চারদিকে। এর অর্থ হলো উত্তর থেকে বৃষ্টি আসবে। গাছের একটি পাতাও নড়ছে না। সমাধিভূমির এক বিষাদগ্রস্ত স্তব্ধতা বিরাজ করছে এই প্রাকসন্ধ্যার আকাশে বাতাসে।

তখন অন্ধকার হয়ে এলেও কোথাও কোন আলো জ্বলতে দেখা গেল না। এতিয়েন লে ভোরো পার হয়ে এগিয়ে চলল। তখন ছটা বাজে। দিনের সিফটে কাজ সেরে অনেকে ফিরে আসছে। সন্ধ্যায় ছায়া-ছায়া অন্ধকারে এতিয়েন দেখল পিয়েরেন তার শাশুড়ী মা ক্রলের সঙ্গে ঝগড়া করতে করতে আসছে। মা ক্রলের মাথাটার যেন বেশ ঠিক নেই। সে সব সময় তার স্বামীর অকালমৃত্যুর জন্য কোম্পানির মালিকদের গাল দেয়। এখনো সে সামান্য এক অজুহাতেই গাল দিচ্ছিল। তার সাদা চুলগুলো মাথায় উড়ছিল। তার গায়ের চামড়াগুলো জড়ো জড়ো হয়ে পড়েছিল। গায়ের হাড়-পাঁজড়া সব যেন বেরিয়ে পড়েছে।

এর পর কাঠের গাদার আড়ালে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে এতিয়েন বুঝল জ্যাকারি মুকেত্তের সঙ্গে কথা বলছে।

মুকেত্তেই প্রথমে তাকে বলল, চল ভলকানে যাই। সেখানে গিয়ে কিছু খাব।

জ্যাকারি বলল, পরে যাব, এখন নয়।

মুকেত্তে বলল, কেন নয়? কি কারণে?

জ্যাকারি দেখল ফিলোমেন আসছে এই পথে।

জ্যাকারি মুকেত্তেকে বলল, তুমি এখন যাও। আমি পরে যাব।

মুকেত্তে চলে গেল। বলে গেল, আমি তোমাকে ঠিক ধরে নেব।

ফিলোমেন কাছে এলে জ্যাকারি তার কোমরটা হাত দিয়ে জড়িয়ে কাঠের গাদার পাশে নিয়ে গেল। ফিলোমেন বাধা দিচ্ছিল। জ্যাকারি বলল, সেজন্যে নয়। কথা আছে। তোমার কাছে কিছু পয়সা আছে?

ফিলোমেন বলল, কি জন্য?

জ্যাকারি বলল, আমার ধার আছে ছ স্যু। এ নিয়ে গোলমাল হবে বাড়িতে।

ফিলোমেন বলল, মিছে কথা। আমি মুকেত্তেকে দেখেছি। ওর সঙ্গে তুমি ভলকান যাবে। মদ খেয়ে নোংরা মেয়েগুলোর সঙ্গে ফূর্তি করবে।

জ্যাকারি বলল, না বিশ্বাস করো। তুমিও আমাদের সঙ্গে আসতে পার। আমি তোমাকে এড়িয়ে যেতে চাইছি না।

ফিলোমেন বলল, আমার বাচ্চাদের অবস্থা কি হবে? আমাকে এখনি বাড়ি যেতে হবে।

কিন্তু জ্যাকারি তাকে যেতে দেবে না। অনেক অনুনয় বিনয় করল। সবশেষে ফিলোমেন কোনরকমে লুকিয়ে রাখা এক জায়গা থেকে দুই স্যু বার করে জ্যাকারিকে দিল। এটা তার ওভারটাইমের পয়সা। মাকে না দিয়ে লুকিয়ে রেখেছিল।

ফিলোমেন বলল, দুই কেন আমি তোমাকে তিন স্যু দিতে পারি। তুমি শুধু তোমার মাকে বলে বিয়েতে রাজী করাও। আমার মা আমার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে এ নিয়ে। আমি যখন খাই মা রোজ আমায় খোঁটা দিয়ে কথা বলে। তুমি এর ব্যবস্থা করো।

জ্যাকারি বলল, এ ত ভাল কথা। আমি বলব মাকে।

ফিলোমেন তিন স্যু তার হাতে দিতে জ্যাকারি তাকে খুশি হয়ে চুম্বন ও আদর করল। তাকে কাঠের গাদায় নিয়ে যাচ্ছিল। শীত আর বৃষ্টির সময় যখন পথঘাট ভিজে থাকে, যখন খড়ের গাদা পাওয়া যায় না তখন এই সব কাঠের গাদাতেই ছেলেমেয়েদের অবৈধ দেহসংসর্গ চলে। শৃঙ্গারের পর স্বাভাবিকভাবেই যে সহবাসপর্ব শুরু হবে সেকথা বুঝতে পেরেছিল ফিলোমেন।

কিন্তু ফিলোমেন বাধা দিল। সে বলল, এখন না। আমার মোটেই ভাল লাগছে না। আমি এতে একেবারে কোন আনন্দ পাব না।

অগত্যা তাকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল জ্যাকারি।

এদিকে এতিয়েন দেখল এক জায়গায় জাঁলিন, লিভি আর বেবার্ত বসে গল্প করছে।

জাঁলিন একটা পরিকল্পনা করেছিল। সে বেবার্ত আর লিভি মঁতস্যু গিয়ে এক জায়গায় প্রচুর চাটনির জন্য কামরাঙা ফল পাড়ে। বেবার্তকে পাহারা দেবার জন্য দাঁড় করিয়ে রাখে। তারপর সেই ফলগুলো লিভিকে দিয়ে বড়লোকদের বাড়িতে বিক্রি করতে পাঠায়। লিভি সেগুলো বিক্রি করে এগার স্যু পায়। সেই এগার স্যু সবটাই জাঁলিন নিতে চায়। বেবার্ত বলল, তুই সাত স্যু নে আর আমরা দুই স্যু করে ভাগ করে নিই।

জাঁলিন বলল, কেন দেব? আমি অনেক ফল বেশী দিয়েছিলাম। তাছাড়া এর জন্য বাড়িতে বকুনি খেতে হবে আমাকে।

বেবার্ত লিভিকে বলল, ঠিক আছে লিভি, ও যদি আমাদের না দেয় তাহলে ওর বাড়িতে বলে দেব।

বেবার্তের নাকের নিচে একটা ঘুঁষি বসিয়ে দিল জঁালিন। বলল, ফের যদি ওকথা বলবি আমি তোর বাড়িতে বলব আমার মার চাটনির ফল তুই বিক্রি করে দিয়েছিস। তাছাড়া এগার স্যু আমি তিনজনের মধ্যে কিভাবে ভাগ করব? তুই কর তো দেখি? এই নে তোদের ছ স্যু করে। না নিবি ত আমি পকেটে ভরে নেব।

বেবার্ত তাই নিল। লিভি জঁালিনকে একই সঙ্গে ভালবাসত ও ভয় করত। সে তাই নির্বিবাদে জঁালিনের কথা মেনে নিল। জঁালিন তাকে দুই স্যু দিতে গিয়েও দিল না। বলল, না, তোকে দিলে তোর মা কেড়ে নেবে। তার চেয়ে আমার কাছে থাক। দরকার হলে নিবি।

এরপর নয় স্যু পকেটে পুরে রেখে লিভিকে নিয়ে কাঠের উপর শুয়ে পড়ল জঁালিন। লিভিকে সে নিজের স্ত্রীর মতই মনে করে। মাঝে মাঝে তাকে এমনি নির্জনে কোন কাঠের গাদায় বা খড়ের গাদার আড়ালে আবডালে নিয়ে এসে তাকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করে। লিভিও তাকে স্বামীর মতই দেখে। সে তাকে কোন বাধা দেয় না। জঁালিন তাকে যেখানে নিয়ে যায় সেইখানেই যায়। ওরা ওদের বাড়িতে রাত্রিতে ঘরের পার্টিশানের ফাঁক দিয়ে অথবা দরজার ফুটো দিয়ে ওদের বাবা মার যে শৃঙ্গার ও সঙ্গমলীলা স্বচক্ষে দেখে তারই অনুকরণ করার চেষ্টা করে। জঁালিন বলে এটা হচ্ছে 'বাবা-মা খেলা'। বয়স কম বলে এ খেলা ওরা ঠিকমত পারে না। তবে এ খেলার সব রহস্য ও খুঁটিনাটি ওদের জানা হয়ে গেছে। তাই কোন সন্ধ্যার অন্ধকার নির্জনে ওরা যখন পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে পাশাপাশি শুয়ে নিবিড়ভাবে চুম্বন করতে থাকে তখন এ খেলার চরম তৃপ্তি বা আনন্দটুকু না পেলেও তবু একটা প্রাথমিক পূর্বাস্বাদে বিভোর হয়ে ওঠে।

জঁালিন ও লিভি যখন এই খেলা খেলে বেবার্ত তখন তাতে অংশ গ্রহণ করতে পারে না। সে ওদের পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। ওরা তাতে কিছুই মনে করে না। কিন্তু বেবার্ত এক চাপা রাগ আর অস্বস্তিতে জ্বলে পুড়ে যেতে থাকে। এক একবার তাই ওদের এই খেলা ভাঙ্গার জন্য কুবুদ্ধির আশ্রয় নেয় ও। হঠাৎ ও চিৎকার করে বলে ওঠে, লোক আসছে। উঠে পড়।

এবারও বেবার্ত এইভাবে ওদের খেলাটা ভেঙ্গে দিল। তবে এবার বেবার্তের কথাটা সত্যি। কারণ এতিয়েন ঐ পথ দিয়ে অর্থাৎ ক্যানেলটা ধরে বরাবর যাচ্ছিল। এতিয়েনকে দেখে ওরা উঠে পালিয়ে গেল। এতিয়েন ভাবল, এটাতে হয়ত ওদের ঠিক দোষ নেই, কারণ এই সব গোপন নর্মক্রীড়া ওরা এত দেখেছে, এত শুনেছে যে এ খেলা ওরা না খেলে পারে না। কিন্তু ওদের বয়স এত কম যে এ খেলা ওদের খেলতে দেওয়া মোটেই উচিৎ নয়। কিন্তু বন্ধ করাও অসম্ভব। একমাত্র বাড়িতে ওদের বেঁধে রাখা ছাড়া কেউ বন্ধ করতে পারবে না ওদের এ খেলা।

বেড়াতে বেড়াতে রেকিনার্তে চলে এল এতিয়েন। এখানে একটা পুরনো অচল খনি আছে। এই অচল অব্যবহৃত খাদটা অবিবাহিত তরুণ তরুণীদের প্রেমের লীলাভূমিতে পরিণত হয়েছে। এখানে প্রচুর জায়গা, প্রচুর সুযোগ। মঁতসুর অবিবাহিত যুবতী মেয়েরা তাদের প্রেমিকদের সঙ্গে এইখানেই মিলিত হয়ে কত অবৈধ সন্তান ধারণ করে তাদের গর্ভে। এখানে কতকগুলো পুরনো যন্ত্রপাতির আশেপাশে ঝোপঝাড় গজিয়ে উঠেছে। কয়েকটা গাছ বড় হয়ে উঠেছে। যে মৃত্যুর ধ্বংসলীলা সমস্ত প্রাণচঞ্চলতার অবসান ঘটিয়ে এই খাদটাকে মৃত্যুপুরীর মত স্তব্ধ করে রেখেছে, প্রাণশক্তির দেবতা সেই মৃত্যুপুরীতেই অসংখ্য সন্তানের জন্ম দান করে যেন সেই মৃত্যুর উপর চরম প্রতিশোধ গ্রহণ করছে।

এই অচল খাদটার দেখাশোনার জন্য একজন পাহারাদার আছে। সে হচ্ছে বুড়ো মুকে। এই খাদের ভিতর দুটো ঘর সে বাসা হিসাবে পেয়েছে। একটাতে সে আর তার ছেলে মুকেত থাকে আর একটাতে থাকে তার মেয়ে মুকেত্তে। পুরনো কাঠ দিয়ে মুকে দুখানা ঘর বানিয়ে নিয়েছে।

পাহারাদার মুকেকে কেউ মানে না। সন্ধ্যে হতে না হতেই অসংখ্য তরুণ তরুণীর প্রেমলীলার এক রঙ্গভূমিতে পরিণত হয় এই মৃত খাদটা। তাদের চাপা কলগুঞ্জনে মুখরিত হয়ে ওঠে বেশ কিছুক্ষণের জন্য। কিন্তু অন্য কেউ মুকেকে না মানলেও তার মেয়ে মুকেত্তে তাকে মানে। মুকেত্তে এখন বেশ বড় হয়ে উঠেছে। তবু তার কোন প্রেমিককে সে এখানে আনে না। সে যা কিছু করার বাইরেই করে। সন্ধ্যের পর মুকে যখনই তার বাসা থেকে লে ভোরোর দিকে যায় অথবা লে ভোরো থেকে বাসায় ফিরে আসে তখনই দেখে তার আসার পথে ঘাসের উপর পা ছড়িয়ে শুয়ে রয়েছে কত মেয়ে। এক এক জোড়া তরুণ তরুণী মেতে উঠেছে এক নীরব নর্মক্রীড়ায়। আজকাল এসব দেখে গা সওয়া হয়ে গেছে মুকের। বাড়ির বাগানের গাছের শাখায় পাখিদের মিথুনক্রিয়া দেখে যেমন কেউ কিছু মনে করে না বা বিচলিত হয় না, তেমনি মুকেকেও এসব মোটেই বিচলিত করে না। তবে তার একমাত্র দুঃখ এই যে ওরা ওর ঘরের বাইরে দেওয়ালের গা ঘেঁষে ওর এত কাছে শুয়ে থাকে কেন, ওরা কেন আর একটু দূরে সরে যায় না।

তবে বুড়ো মুকের খুব একটা খারাপও লাগে না। তার নীরস নিঃসঙ্গ সন্ধ্যাগুলো কোন দিকে কেটে যায় সে বুঝতেই পারে না। চারদিকে নব যৌবনের উত্তপ্ত প্রেমলীলার দ্বারা পরিবৃত হয়ে মুকের স্তিমিতেন্দ্রিয় হিমশীতল বার্ধক্যটা বেশই কেটে যেতে থাকে। তবে এই সব দেখে মাঝে মাঝে তার মনটা অবশ্য উদাস হয়ে সুদূর যৌবনের স্মৃতি রোমন্থনে ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

তার বন্ধু বুড়ো বনিমোরও এই সময় প্রায় দিনই আসে। বেশীক্ষণ নয়। দুই বন্ধুতে মাত্র আধঘণ্টা কাটায়। কিন্তু কি আশ্চর্য, দুজনের কেউ একটা কথাও বলে না। দুজনেই নীরবে পাইপ খেতে থাকে। দুজনেই চারদিকের

-প্রেমলীলার উচ্ছাসে উত্তাপে কেমন যেন এক কৃত্রিম উত্তেজনা অন্তরের গভীরে গোপনে অনুভব করতে থাকে আর সেই গোপন উত্তেজনার বশে দুজনেই দুটি বিশ্রামরত শ্রান্ত পশুর মত নিরুচ্চার এক স্মৃতি রোমন্থনের মাধ্যমে বিগত যৌবন-দিনের কতকগুলি কাল্পনিক সুখানুভূতিকে আস্বাদন করতে থাকে মনে মনে। ওদের দুজনের এই নীরব নিরুচ্চার মিলন এক গোপন অনুভবের অনাঘ্রাত সৌরভে ও অশ্রুত ভাষাময়তায় আশ্চর্যভাবে অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। ওদের চারপাশে যুবক যুবতীরা যখন পরস্পরকে চুম্বন করে আর পরস্পরকে আলিঙ্গন করে ফিসফিস করে কথা বলে আর সেই চুম্বন ও চাপা প্রেমালাপের শব্দ ওদের কানে আসে তখন ওদের হিমশীতল দেহের গভীরে ওরাও যৌবনের এক কৃত্রিম উত্তাপ অনুভব করে। বনিমোরের মনে পড়ে যায় আজ হতে তেতাল্লিশ বছর আগে ও নিজেও একদিন ওর স্ত্রীকে এই খাদের মধ্যে নিয়ে এসে প্রথম চুম্বন করে। ওর স্ত্রী তখন এত ছোট ছিল যে তাকে এক উঁচু কাঠের উপর বসিয়ে তাকে চুম্বন করতে পেরেছিল।

তারপর ওরা উঠে পড়ে। করমর্দন করে বুড়ো বনিমোর চলে যায়।

সেদিন বনিমোর মুকের করমর্দন করার পর তাকে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা মুকে, তুমি একদিন রুসি নামে একটি মেয়েকে চিনতে?

মুকে কোন উত্তর দিল না। বুড়ো বনিমোরও আর কোন কথা না বলে নিঃশব্দে চলে গেল সেখান থেকে।

একটা পুরনো কাঠের উপর বসে সব দেখছিল সব শুনছিল এতিয়েন। কেন তা জানে না। তবু এই সব দেখেশুনে ক্রমশই বিষণ্ণ হয়ে উঠছিল সে। তার মনে পড়ল এই বৃদ্ধ বনিমোরই তাকে প্রথম এই খনি অঞ্চলের সব খবরাখবর দেয়। তার সঙ্গে প্রথম সহানুভূতির সুরে কথা বলে। দেহটা ক্লান্ত হলেও মুখ থেকে কত কথা ঝরে পড়ে তার।

কিন্তু এতিয়েন খুঁজে পেল না তার দুঃখটা কিসের? তার কেবলি মনে হচ্ছিল কেন এই সব কর্মক্লান্ত অপরিণামদর্শিনী মেয়েরা রাত্রির অন্ধকারে এখানে এসে কত সন্তানের জন্ম দিয়ে শুধু হতভাগ্য শ্রমিকের সংখ্যা বাড়িয়ে যাচ্ছে? এর কি কোন শেষ নেই? কেন ওই সব মেয়েরা এক একটি দুরন্ত পুরুষদের সমস্ত অগ্রপ্রসারী উচ্ছ্বাসকে অগ্রাহ্য করে এক জারজ দুর্বলতায় সিক্ত তাদের জন্মাধারগুলিকে রুদ্ধ করে রেখে এই সব অন্যায় অবৈধ গর্ভধারণ বন্ধ করে দিতে পারে না?

কিন্তু এই ব্যাপারটাকে এত লোকের মধ্যে শুধু সে-ই বা কেন ভয়ঙ্কর ভাবছে? এত লোকের মধ্যে শুধু এতিয়েনেরই বা এতে এত দুঃখ কিসের? তবে কি সে একা এবং তার কোন সঙ্গী নেই বলেই ওদের মিলন আর সঙ্গম দেখে এক গোপন ঈর্ষা আর হতাশায় ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে মনে মনে? রক্তগত যে উত্তাল আবেগের বশবর্তী হয়ে ওরা এখানে জোড়ায় জোড়ায় আসে সে আবেগ

সমস্ত যুক্তি ও নীতিবোধের থেকে বেশী শক্তিশালী, সে আবেগ অপ্রতিরোধ্য।
এতিয়েন তখনও বসেছিল সেইখানে। বসেছিল নির্বাক দর্শক হিসাবে। নিঃসাড় নিস্পন্দভাবে। হঠাৎ দেখল মঁতস্থ থেকে একজোড়া প্রেমিক প্রেমিকা অন্ধকারে তার পাশ দিয়ে রেলিকার্তের পতিত জমিটার দিক হতে সেই একই অশুভ উদ্দেশ্যে একই আবেগের এক আদিম অপ্রতিরোধ্য উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে চলে গেল।
মেয়েটি চুপি চুপি এক সকাতর সকরুণ আবেদনে বাধা দিতে চাইছে। কিন্তু মেয়েটির সেই ক্ষীণ অশক্ত বাধার বালির বাঁধ ভেঙ্গে ছেলেটি মেয়েটির হাত ধরে জোর করে তাকে নিয়ে যাচ্ছে চালাটার শেষ প্রান্তে যেখানে একরাশ পুরনো মোটা মোটা দড়ি পড়ে আছে।
একবার ভাবল এতিয়েন ওরা হলো ক্যাথারিন আর শ্যাভেল। কিন্তু সে ঠিক বুঝতে পারল না। অন্ধকারে চিনতে পারেনি। না চিনেই সে এক ইন্দ্রিয়াসক্তিগত আগ্রহের সঙ্গে ওদের ব্যাপারটা কোথায় কতদূর গড়ায় তা দেখতে চাইছিল। মনে মনে ভাবল এবিষয়ে কেন সে বাধা দেবে? সে এটা না চাইলেও কেন হস্তক্ষেপ করবে তাদের ইচ্ছাপূরণে? কারণ এটা ঠিক বলাৎকার নয়। কারণ মেয়েরা যেখানে এক মৌননীরব সম্মতিতে আপন আপন শায়িত শান্ত অঙ্গের উপর সকাম আবেগের কলুষভরা পুরুষদের দেহগুলিকে বরণ করে নেয় সেখানে ধর্ষণ বা বলাৎকার বলা চলে না।
খাওয়ার পর পরিষ্কার পোষাক পরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ক্যাথারিন প্রথমে বড় রাস্তা ধরে মঁতস্থর পথে এগিয়ে চলে। সে দশ বছর ধরে খাদে কাজ করে টাকা রোজগার করছে। তাই অন্যান্য শ্রমিকমেয়েদের মত সেও স্বাধীনভাবে এখানে সেখানে যাওয়া আসা করতে পারে। আজ তার বয়স পনের পূর্ণ হলেও আজও তার কুমারীত্বটা অক্ষত আছে এবং আজও সে কোন অবৈধ সন্তান গর্ভে ধারণ করেনি, তার কারণ তার দেহটা এখনো ঠিক যৌবনপুষ্ট হয়ে ওঠেনি। এখনো সে নারীসুলভ গর্ভধারণক্ষমতা অর্জন করতে পারেনি।
ক্যাথারিন সোজা একটা লণ্ড্রীতে মুকেত্তের কাছে চলে গেল। কিন্তু মুকেত্তে একটু আগে কফির দাম শোধ করায় তার প্রতিশ্রুত দশ স্যু ক্যাথারিনকে ধার দিতে পারল না। তাকে দেবার জন্য মুকেত্তে অন্য কারো কাছে টাকা ধার করুক ক্যাথারিন এটাও চায় না। এ বিষয়ে তার একটা কুসংস্কারগত ভয় আছে। মুকেত্তে যদি অন্য কারো কাছ থেকে টাকা ধার করে তাকে দেয় তাহলে সে টাকায় ফিতে কিনলে সে ফিতে তার টিকবে না, সে ঠিকমত ভোগ করতে পারবে না।
তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে বাড়ির পথে রওনা হলো ক্যাথারিন। মঁতস্থর ভিতর ঢুকে বড় রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চলছিল সে। এমন সময় পিকেত্তের মদের দোকানের দরজা থেকে কে একজন তাকে ডাকল। বলল, এই ক্যাথারিন,

কোথায় এত তাড়াতাড়ি যাচ্ছ ?

ক্যাথারিন দেখল শ্যাভেল তাকে ডাকছে। সে আশ্চর্য হয়ে তার দিকে তাকাল। চিন্তা ও বিরক্তি দুটোই ছিল তার দৃষ্টিতে। সে যে শ্যাভেলকে পছন্দ করে না তা নয়, এখন তার মনের অবস্থা ভাল নয় বলেই সে তাকে এড়িয়ে যেতে চায়। সে এখন বাড়ি চলে যেতে চায়।

শ্যাভেল তাকে আবার ডাকল। একটু কিছু পান করে যাও।

আপত্তি জানাল ক্যাথারিন। এখন অন্ধকার ঘন হয়ে উঠেছে এবং তাকে এখুনি বাড়ি যেতে হবে।

কিন্তু শ্যাভেল তখন তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তার কানে কানে অনুরোধ করতে লাগল। অনেকদিন থেকে শ্যাভেল ক্যাথারিনকে তার ঘরে নিয়ে যেতে চেয়েছে। তাকে কত আদর করে টানাটানি করেছে। পিকেন্তের দোতলায় একটা ঘরে সে থাকে। ঘরখানা বেশ সাজানো গোছানো। কিন্তু বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে এড়িয়ে গেছে তাকে।

দুজনে একথা সেকথা বলতে বলতে ক্যাথারিন হঠাৎ তার নীল ফিতের কথাটা তুলল। আর সঙ্গে সঙ্গে শ্যাভেল লুফে নিল কথাটা। বলে উঠল, আমি তোমায় কিনে দেব ফিতে।

ক্যাথারিন ভাবল এটা নেওয়া ঠিক হবে না। শ্যাভেলের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করাই তার উচিত। কিন্তু ফিতের লোভটাও ছাড়তে পারল না একেবারে। তবে সে ভাবল ধার হিসেবে সে ফিতের দামটা নেবে শ্যাভেলের কাছে। সে বলল, নিতে পারি তবে আমি পয়সাটা শোধ দিয়ে দেব আর তোমাকে সে পয়সা নিতে হবে।

শ্যাভেল বলল, হাঁ নেব, যদি তুমি আমার কাছে কোনদিন না শোও।

শ্যাভেল তাকে মাইগ্রাতের দোকানে নিয়ে যেতে চাইল। মার কথা মনে করে সে আপত্তি জানাল। ক্যাথারিন বলল, ও দোকানে যাব না।

শ্যাভেল বলল, মাইগ্রাতের দোকানের ফিতে খুব ভাল। অনেক রকম আছে। দেখে নিতে পারা যাবে।

এদিকে তার দোকানে শ্যাভেল আর ক্যাথারিনকে ফিতে কিনতে আসতে দেখে রেগে গেল মাইগ্রাত। রাগের সঙ্গে ফিতের বাক্সটা এনে দিল তাদের কাছে। মাইগ্রাত পরিষ্কার বুঝে নিল শ্যাভেলই ক্যাথারিনের ভাবের লোক, পেয়ারের লোক। তারা যখন পিছন ফিরে ফিতে কিনে চলে গেল তখন তাদের পিছনে তাকিয়ে রইল মাইগ্রাত। তার স্ত্রী এসে তার কাছে কি একটা জিনিস চাইলে সে রেগে যায়। তারপর সে শপথ করল এই ধরনের অকৃতজ্ঞ লোকদের উপর কিভাবে প্রতিশোধ নিতে হয় সে তা জানে। এই ক্যাথারিনকে তার দোকানে পাঠিয়ে দিতে বলেছিল তার মাকে। অথচ তার কাছে না এসে অন্য একটা ছোকরার সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে।

শ্যাভেল ক্যাথারিনের গায়ে গা দিয়ে পথ হাঁটছিল। তার পাছাটা প্রায়ই ক্যাথারিনের পাছায় ঠেকছিল। ক্যাথারিনের হঠাৎ হুঁস হলো তারা গাঁয়ের বড় রাস্তা ছেড়ে রেলিকার্তের মরা খাদটার দিকে এগিয়ে চলেছে। সে বেশ বুঝল আর বাধা দেবার সময় নেই। শ্যাভেলের হাতটা তার কোমরটা জড়িয়ে আছে। সে তাকে ক্রমাগত নানা কথায় আদর করছে। তার তপ্ত নিঃশ্বাস-গুলো তার কাঁধ ও ঘাড়ের উপর ক্রমাগত পড়ছে। আসলে শ্যাভেল সত্যিই তাকে ভালবাসে। সে ত তাকে খেয়ে ফেলবে না, তবে তাকে এত ভয় কিসের? গত শনিবার রাতে বাতি নিবিয়ে শোবার সময় তার হঠাৎ মনে হয় শ্যাভেল যদি তাকে এই সময় এই নিবিড় অন্ধকারে জড়িয়ে ধরে তাহলে কি হবে? কিন্তু যতই তন্দ্রার মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছিল তার মনটা ততই স্বপ্নময় মনে হচ্ছিল সব কিছু আর তখন তার মনে হচ্ছিল এখন আর ভয় নয়, পুলকের রোমাঞ্চ জেগে উঠেছে শ্যাভেলের কল্পিত স্পর্শে। সে আর বাধা দেবে না শ্যাভেলকে।

একথা সেদিন যদি সে মনে করে থাকে তাহলে আজ তবে শ্যাভেলকে প্রত্যাখ্যান করতে যাচ্ছে কেন?

শ্যাভেলের মোচটা যখন চুম্বনকালে তার ঘাড়ের উপর ঠেকছিল তখন আপনা থেকে চোখগুলো মুদ্রিত হয়ে আসছিল ক্যাথারিনের। কিন্তু সেই মুদ্রিত দু চোখের অন্ধকার পটভূমিতে সহসা একটি মানুষের ছবি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। আজ সকালে দেখা সেই মানুষটা যেন এক শান্ত নিরুচ্চার অভিমানে তার চোখের সেই অন্ধকার পটভূমিটার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত চলে গেল।

সহসা মুখ ফিরিয়ে চোখ মেলে দেখল ক্যাথারিন। দেখল তারা রেলিকার্তের পতিত খাদটার জমিতে চলে এসেছে। এর অর্থ বুঝতে পেরে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে পিছিয়ে গেল ক্যাথারিন। বারবার বলতে লাগল, না না, আমাকে যেতে দাও। দয়া করে যেতে দাও।

কোন অগ্রপ্রসারী পুরুষের সর্বজয়ী সর্বগ্রাসী লালসার সচল মূর্তিটি দেখে যে স্বতস্ফূর্ত আত্মরক্ষার্থ ভয়ে নারীরা আত্মরক্ষার এক সলজ্জ আকুলতায় শিউরে ওঠে, কঠিন হয়ে ওঠে তাদের সর্বাঙ্গ, আজ এই মুহূর্তে ঠিক সেই ভয় অনুভব করল ক্যাথারিন। সে আজ এমন এক আঘাতের ভয় করছে যে আঘাতের বেদনার সঙ্গে তার কোন পরিচয় নেই।

ক্যাথারিন বলল, আমার এখনও সে বয়স হয়নি। আমি আর একটু বড় হই তারপর হবে। এখন থাক।

শ্যাভেল বলল, তাতে কি হয়েছে।

আর কোন কথা না বলে শ্যাভেল তার শক্ত হাত দিয়ে জোর করে ক্যাথারিনকে ধরে সেই অঙ্গিগুলোর খাদের উপর তাকে চিৎ করে ফেলে দিল।

আর কোন বাধা দিতে পারল না ক্যাথারিন। এক নীরব নিষ্ক্রিয়তায় সে শ্যাভেলের পুরুষাঙ্গটিকে গ্রহণ করল। তার কুণ্ঠিত কণ্ঠের সকল প্রতিবাদ স্তব্ধ হয়ে গেল। শুধু নর্মক্রিয়াজনিত এক দ্রুত ও দীর্ঘ নিঃশ্বাসের শব্দ বেরিয়ে আসছিল শ্যাভেলের নাক থেকে।

এতক্ষণ ধরে স্থির হয়ে বসে সব কিছু শুনে আসছিল এতিয়েন। এবার সে যখন সব দেখে ফেলেছে, সব শুনে ফেলেছে তখন এবার তার চলে যাওয়া উচিত। উঠে পড়ে কাঠের উপর দিয়ে এগিয়ে চলল। আর সে পা টিপে টিপে নিঃশব্দ হবার চেষ্টা করল না। সে অনেকটা এগিয়ে গিয়ে পিছন ফিরে দেখল, ওরা উঠে পড়েছে। এগিয়ে যাচ্ছে গাঁয়ের দিকে। ছেলেটি মেয়েটির কোমরটা জড়িয়ে ধরে আছে আর মেয়েটি বাড়ি যাবার জন্য তাড়াতাড়ি করছে।

এবার এতিয়েনের ইচ্ছা হলো ওদের মুখগুলোকে একবার দেখে। এতক্ষণ ও শুধু ওদের কথা শুনে এসেছে, কাজ দেখে এসেছে। কিন্তু অন্ধকারে ওদের মুখ দেখতে পায়নি।

কিন্তু এতিয়েন বুঝতে পারল এ কৌতূহল অসঙ্গত, অন্যায়। তাই সে এগিয়ে গেল। কিন্তু কয়েক পা এগিয়ে যাওয়ার পর সে একটা ল্যাম্পপোস্টের পাশে লুকিয়ে পড়ল ওদের দেখার জন্য। পথ দিয়ে ওরা যখন যাচ্ছিল তখন ল্যাম্পপোস্টের আলোতে ওদের মুখ দেখে চমকে উঠল এতিয়েন। ওরা হলো ক্যাথারিন আর শ্যাভেল। হ্যাঁ, এতিয়েন ভাল করে দেখল। প্রথমটা দেখে বিশ্বাস করতে পারেনি নিজের চোখকে। পরে দেখল সেই মুখ সেই চোখ। সেই মেয়েটা যে মেয়েটা পুরুষের বেশে পায়জামা পরে মাথার চুলগুলো ফিতেয় বেঁধে কাজ করেছিল তার সঙ্গে। এতিয়েন আবার দেখল, সেই ক্লান্তিনিবিড় সবুজ চোখ। ঝর্ণার জলের মত স্বচ্ছ ও গভীর। কিন্তু মেয়েটার মনটা কি নোংরা। ঠিক কুক্কুরীর মত। সে তাকে মিথ্যা কথা বলে ঠকিয়েছে। বলেছে তার কোন প্রেমিক নেই। সে মিথ্যার প্রতিশোধবাসনা প্রবল হয়ে উঠল এতিয়েনের মনে। তাকে ভয়ঙ্করী বলে মনে হলো তার।

ক্যাথারিন আর শ্যাভেল ধীর গতিতে হেঁটে গেল রাস্তা দিয়ে। এতিয়েন যে ওদের পানে তাকিয়ে আছে, ওদের লক্ষ্য করছে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওরা তার কিছুই টের পেল না। শ্যাভেল প্রায়ই থামছিল ক্যাথারিনকে চুম্বন করার জন্য। ক্যাথারিনও তার পায়ের গতি কমিয়ে শ্যাভেলের আদর ও চুম্বন উপভোগ করে যাচ্ছিল। এসব চোখ চেয়ে দেখতে ইচ্ছা করছিল না এতিয়েনের।

তবে ক্যাথারিন তাকে একটা সত্যি কথা বলেছিল। সে এতিয়েনকে বলেছিল সে কারো বাগ্‌দত্তা নয়। কারো সে নির্দিষ্ট প্রণয়িনী নয় এবং কারো সঙ্গে বিয়ের পাকা কথা হয়নি। অথচ এই ভয়েই এতিয়েন তাকে ও বেলায় সুযোগ পেয়েও চুম্বন করেনি। কথাটা ভেবে অনুশোচনা করতে লাগল এতিয়েন

মনে মনে। হাতদুটো আলগা থেকে মুষ্টিবদ্ধ হয়ে উঠল তার। মনে মনে বললো সে ঐ শ্যাভেল লোকটাকে খুন করবে।

এইভাবে আধঘণ্টা ধরে হেঁটে চলল ওরা। তারপর লে ভোরোর কাছে এসে ওরা অর্থাৎ ক্যাথারিন আর শ্যাভেল তার গতিবেগ কমিয়ে দিল আগে থেকে। এখন ওরা প্রেমিক প্রেমিকারূপে খুব সহজ হয়ে উঠেছে। সহজভাবে হাসিঠাট্টা করতে লাগল। এখন ক্যাথারিন হাসিমুখে শ্যাভেলের সব রঙ্গরস উপভোগ করছিল।

এতিয়েন এবার সহজেই বাসায় ফিরে রাতের খাওয়া খেয়ে শুয়ে পড়তে পারত। কিন্তু তা না করে ও ওদের অনুসরণ করতে করতে গাঁয়ের দিকে অনেকটা এগিয়ে গেল। তার মানে ওকে এরপর বাসায় আসতে হলে অনেকটা পথ হেঁটে আসতে হবে। তা হোক, ও দেখবে শ্যাভেল কখন ক্যাথারিনকে ছেড়ে দেয় এবং ক্যাথারিন কখন বাড়ি যায়।

অবশেষে ক্যাথারিনকে ছেড়ে দিয়ে শ্যাভেল চলে গেলে এতিয়েনও তার বাসার পথে পা চালিয়ে দিল। তাকে ভোর চারটের সময় উঠতে হবে। গাঁয়ের সবাই শুয়ে পড়েছে। তবে র‍্যাসেনোর হোটেলে তখনো আলো জ্বলছিল। শ্রমিকরা সবাই একে একে খাবার টেবিল থেকে শোবার বিছানায় চলে যাচ্ছিল।

নিজের ঘরে ঢোকার আগে একবার দোতলা থেকে লে ভোরোর দিকে তাকাল এতিয়েন। ওর মনে হলো ও সেই অন্ধকারের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে গতকাল শেষ রাতের যে অন্ধকারের মাঝে এখানে এসে পড়ছিল, যে অন্ধকার কয়লার আগুন আর ব্লাস্ট ফার্নেস ও কোক ওভেনের আগুনের দ্বারা বিদ্ধ হয়েছিল খনিটার কাছে, আর সেই আগুনের স্বল্প আলোয় বুড়ো বনিমোর আর তার পেয়ালা রঙের ঘোড়াটা লম্বা লম্বা ছায়া ফেলে আনাগোনা করছিল। এক মাত্র ঐ ফার্নেস আর কোক ওভেনের আগুন ছাড়া আর সব কিছু অর্থাৎ লে ভোরোর গ্রাম, মঁতসুর পথঘাট, ভাঁদেমেরে বন শস্যক্ষেত্র বন সব ডুবে গিয়েছিল সে অন্ধকারে।

বৃষ্টি এল। চারদিক নিস্তব্ধ। শুধু খাদের ড্রেনেজ পাম্পটা ক্রমাগত একটানা ঘর্ঘর আওয়াজ করে যাচ্ছিল।

তৃতীয় খণ্ড

১

এরপর কয়েকদিন এতিয়েন নিয়মিত খাদে যেতে লাগল। যে কাজ প্রথমে অসাধ্য ও কঠিন মনে হচ্ছিল আজ সে কাজে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে এতিয়েন। সে কাজ আজ সরল ও সহজ বলে মনে হচ্ছে তার। তবে একপক্ষকাল পার না হতেই তার একবার প্রবল জ্বর হয়। দুদিন শয্যাগত হয়ে ছিল। জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকছিল। তার মনে হচ্ছিল সে যেন অতি সংকীর্ণ এক সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে কয়লার টব নিয়ে যাচ্ছে।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কেটে যেতে লাগল। আজকাল সে রোজ রাত তিনটের সময় ওঠে। মুখ হাত ধুয়ে কফি খায়। তারপর মাদাম র‍্যাসেনোরের হাতে তৈরি ডবল স্যাণ্ডউইচ সঙ্গে নিয়ে খাদের পথে রওনা হয়। রোজ খাদে যাবার সময় বুড়ো বনিমোরকে বেরিয়ে আসতে দেখে আর রোজ খাদ থেকে বেরিয়ে বাসায় আসার পথে বুতলুপকে খাদের পথে যেতে দেখতে পায়। খাদ থেকে বেরিয়ে এসে লকার রুমে ভিজে গা পিঠ সেকে নেয় এতিয়েন। ঠাণ্ডা গা-টা গরম করে নেয়।

আজকাল খাদের ভিতর ডুলিতে করে নামার সময় যখন উপরকার পৃথিবীর আলোটা চোখ থেকে চলে যায়, খাদের গভীর অন্ধকারটা ঘন হয়ে বসে দুচোখের উপর তখন আর তার ভয় করে না। এখন খাদের এ অন্ধকার সহজ হয়ে গেছে তার কাছে। খাদের সব পথঘাট এখন তার চেনা। সে এখন ল্যাম্প না নিয়েও দুই কিলোমিটার পথ খাদের ভিতর অনায়াসে পার হয়ে কয়লা কাটার কাছে চলে যেতে পারবে। খাদের ভিতর যাওয়া আসার পথে সেই একই মানুষের সঙ্গে দেখা হয়। বুড়ো মুকে ঘোড়াগুলো আস্তাবল থেকে নিয়ে আসে অথবা সেখানে নিয়ে যায়। জাঁলিন আর বেবার্ত কয়লা বোঝাই ট্রেনের উপর উঠে ঘোড়া চালায়। মুকেত্তে আর লিভি কয়লার টব ঠেলে নিয়ে যায়।

আজ এতিয়েন কয়লা কাটার জায়গাটায় আর তৎখানি অস্বস্তি বোধ করে না আগের মত। চিমনির কাছটাও তার কাছে সহজ হয়ে গেছে। আজকাল কয়লা কাটার সময় তার দেহটা ঘামে ভিজে গেলেও তার কোন কষ্টবোধ হয় না। কয়লার গুঁড়োগুলো ধূলোর মত নাকে গেলেও তার কোন অসুবিধা হয় না। আজকাল কয়লার টব যত তাড়াতাড়ি ঠেলে নিয়ে যায় তার থেকে বেশী তাড়াতাড়ি আর কোন লোক নিয়ে যেতে পারে না। এখন সে টবের ভিতর কয়লাও নিখুঁতভাবে ভরতে পারে। আজকাল যখন কাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে হাঁপাতে থাকে তখনও সে কোন অভিযোগ করে না। তার মুখ থেকে

কেউ কখনো কোন অভিযোগ অনুযোগের বা অশ্লীলতার কথা শোনেনি। তবে তার একটা মাত্র দোষ ছিল। সে কোন ঠাট্টা তামাশা বা সমালোচনার কথা সহ্য করতে পারে না। এই ধরনের কোন কথা শুনলেই সে রেগে যেত। মোট কথা, সব দিক দিয়ে সে হয়ে উঠেছিল এক যোগ্য খনিশ্রমিক। অভ্যাসের ছাঁচ ক্রমাগত প্রতিটি দিন তার উপর চাপ দিতে দিতে তাকে যন্ত্রের মত যোগ্য করে তোলে।

অন্য সব শ্রমিকদের মধ্যে মাহিউই বিশেষ করে এতিয়েনকে খাতির ও শ্রদ্ধা করত। সে সব ভাল কর্মীদেরই শ্রদ্ধার চোখে দেখত। তাছাড়া সে জানত অন্য সব শ্রমিকদের মধ্যে একমাত্র এতিয়েনই শিক্ষিত। সে পড়তে লিখতে জানে। এতিয়েন এমন সব জিনিস আলোচনা করে যার কথা সে কখনো শোনেনি এর আগে। সে এসব কিছু জানত না বলে এতে এমন কিছু আশ্চর্য হত না। সে সবচেয়ে বেশী আশ্চর্য হত তার সাহস আর শক্তি দেখে। এতিয়েনের চেহারা রোগা রোগা; কিন্তু তার হাতদুটো এমন লোহার মত শক্ত যে তার কাজ চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। সব কঠিন কাজে তার এগিয়ে যাওয়ার সাহসও অসাধারণ। তাছাড়া যে কোন কঠিন ও কষ্টকর কাজ এমন হাসিমুখে করে এতিয়েন তা দেখে আশ্চর্য না হয়ে পারে না মাহিউ। এতিয়েনই একমাত্র অস্থায়ী এমন এক খনিশ্রমিক যে সব রকমের কাজ শিখে ফেলেছে। মাহিউ যখন দেখল কয়লা কাটার কাজ থেকে ছাড়িয়ে কোন শ্রমিককে কাঠের কাজে লাগানো চলবে না আর তাতে কাজ ভালও হবে না তখন সে এতিয়েনের উপরেই কাঠের ঠেকা দেওয়ার কাজের ভার দিল। তবু মাহিউ ভয় করত হয়ত বা যে কোন মুহূর্তে নিগ্রেল ডানসার্তকে নিয়ে হাঁক ডাক করতে করতে এসে পড়বে। কিন্তু কাজ শেষ হওয়ার আগে তারা কেউ এল না। কাজ শেষ হওয়ার পর নিগ্রেল একদিন এসে কাঠের কাজ দেখে প্রশংসা করল এতিয়েনের।

দিনে দিনে খনিশ্রমিকদের অসন্তোষ ও ক্ষোভ বেড়ে যেতে লাগল। উপরওয়ালারা শ্রমিকদের বুঝিয়ে দিল কোম্পানির মালিক এক কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করবে। এমন কি মাহিউর মত শান্তিপ্রিয় লোকও বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়েছে। তারও হাত দুটো আপনা থেকে মুষ্টিবদ্ধ হয়ে ওঠে মাঝে মাঝে।

প্রথম প্রথম জ্যাকারি আর এতিয়েনের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা যায়। একদিন সন্ধ্যের সময় তাদের মারামারি হবার উপক্রম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিল জ্যাকারি। আসলে সে একটু আমোদপ্রমোদপ্রিয়; ঝগড়াঝাঁটি ভালবাসে না। তাই নিজের ভুল বুঝতে পেরে এতিয়েনের সঙ্গে সব বিবাদ মিটিয়ে দুজনে দুপাত্র মদ খেল। এতিয়েনের যোগ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিল। আজকাল লেভাকও ভালভাবে এতিয়েনের সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করে। সে বলে এতিয়েনের এ বিষয়ে অনেক ভাল জ্ঞান

আছে। মোট কথা তার শ্রমিক সহকর্মীদের মধ্যে একমাত্র শ্যাভেল ছাড়া আর কারো প্রতি তার কোন গোপন বিদ্বেষ নেই। তবে উপরে সেটা বোঝা যায় না। উপরে দুজনে অনেক সময় কথা বলে, হাসিঠাট্টা করে। তবু যখন তারা উপরে হাসি তামাশা করে তখন তাদের চোখে এক অব্যক্ত বিতৃষ্ণা অস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। তাদের দুজনের মধ্যে এই মানসিক ব্যবধানের একমাত্র কারণ হলো ক্যাথারিন।

ক্যাথারিন অবশ্য এক মনে তার কাজ করে যায়। কুঁজো হয়ে কয়লাভরা টবগুলো ঠেলে নিয়ে যায়। তবে তার প্রেমাস্পদের ইচ্ছাপূরণের দিকে তার দৃষ্টি সজাগ থাকে সব সময়। আজকাল শ্যাভেলের সঙ্গে সম্পর্কের কথাটা সবাই জেনে গেছে। এখন শ্যাভেল তার বাবা মার সামনেই ক্যাথারিনকে সন্ধ্যের সময় বেড়াতে নিয়ে যায়। গাঁয়ের সকলের সামনেই সে তাকে চুম্বন করে।

এতিয়েন এ ঘটনাটা আজকাল অনেক সহজভাবে মেনে নিতে পারলেও এতিয়েন ক্যাথারিনকে সুযোগ পেলেই চিমটি কেটে কথা বলে। অন্যান্য খনি শ্রমিকদের মতই এ নিয়ে তার সঙ্গে অনেক সময় স্থূল রসিকতাও করে এবং ক্যাথারিনও তার উত্তর দেয়। কিন্তু মাঝে মাঝে ওরা কোন কথা বলে না। কেউ কাউকে কোন কথা না বলে দুজনে শুধু দুজনের মুখপানে এক নীরব ভাষাময়তায় তাকিয়ে থাকে। সে দৃষ্টির অর্থ ওরা বুঝতে পারে। বুঝতে পারে ওরা পরস্পরকে ঘৃণা করে। অথচ সে ঘৃণার কারণটি এমনই গভীর অন্তঃশায়ী যে তা কোনদিন ওরা ভাষায় ব্যক্ত করতে পারবে না।

দেখতে দেখতে বসন্তকাল এসে গেল। আজকাল এতিয়েন যখন খাদ থেকে বেরিয়ে আসে তখন এপ্রিলের মৃদুমন্দ বাতাসের একটা ঝলক তার মুখে চোখে এসে লাগে। কচি কচি ঘাসে ভরা পৃথিবীর বাদামী মাটির একটা সোঁদা সোঁদা গন্ধ এসে লাগে তার নাকে। অথচ খাদটার ভিতর সে বসন্তের হাওয়া ঢুকতে পারে না, সেখানে চিরশীত চিরসিক্ততা আরও নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার বিরাজ করতে থাকে যুগ যুগ ধরে।

আজকাল বেলা তিনটের সময় খাদ থেকে যখন উঠে আসে এতিয়েন তখন দিগন্তপ্রসারী সূর্যের উজ্জ্বল আলোয় তার চোখ দুটো ধাঁধিয়ে দেয়। দূর দিগন্ত থেকে এক ঝলক' গরম বাতাস সমস্ত প্রান্তরকে প্লাবিত করে ছুটে আসে। ক্যানেলটার দুধারের মাঠভরা সবুজ ফসলের উপর সে বাতাসের প্রতিটি আঘাতে ঢেউ জাগে। মনে হয় যেন এক বিরাট সবুজ সমুদ্র ছোট ছোট ঢেউ খেলিয়ে বয়ে যাচ্ছে। ক্যানেলের দুধারের পপলার গাছগুলোয় নতুন পাতা গজিয়েছে। বসন্তকালীন এই পৃথিবীতে যখন চারদিকের বনে প্রান্তরে জনপদে নবজীবনের বিচিত্র লীলারঙ্গ চলেছে তখন আলোবাতাসহীন সেই মৃত্যুর মত অন্ধকারে ভরা খাদের ভিতর কর্মক্লান্ত অসংখ্য মানুষ দুঃসহ যন্ত্রণায় ক্রমাগত দীর্ঘশ্বাস ফেলছে।

আজকাল এতিয়েন যখন বিকালে বেড়াতে যায় তখন তাকে দেখে কাঠের গাদায় প্রেম করতে থাকা প্রেমিক প্রেমিকারা কোন লজ্জা বা কুণ্ঠাবোধ করে না। তাদের মধ্যে অনেকেই কাঠের গাদা থেকে শস্যক্ষেত্রে নেমে যায়। কারণ মাঠে মাঠে কাঁচা শস্যগুলো এখন পাক ধরতে শুরু করেছে। সবুজ থেকে হলুদ হয়ে উঠেছে। আজকাল জ্যাকারি আর ফিলোমেন আসে। লিভি আর জাঁলিন আসে। বুড়ী মা ক্রুল লিভির পিছন পিছন তাকে শাসন করে ঘুরে বেড়ায়। এতিয়েন সবাইকে সহ্য করতে পারে। সব প্রেমিক প্রেমিকার প্রেমলীলাকে সহজভাবে মেনে নেয়। একমাত্র শ্যাভেলও ক্যাথারিনকে একসঙ্গে দেখলেই ওর মাথাটা গরম হয়ে ওঠে। আজকাল ওরা কাঠের গাদা ছেড়ে মাঠে নেমে যায়।

পাছে ওদের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, পাছে ওর মাথাটা গরম না হয়ে ওঠে তার জন্য এতিয়েন আজকাল বিকালে আর মাঠ দিয়ে বা রেলিকার্তের পোড়ো খাদটা দিয়ে বেড়াতে যায় না। ও র‍্যাসেনোরের হোটেলেই থেকে যায়। ও মাদাম র‍্যাসেনোরকে বিকালের দিকে প্রায়ই বলে, মাদাম র‍্যাসেনোর, আমাকে একপাত্র মদ দিন ত। আমি আর বেড়াতে যাব না কোথাও। আমি খুব ক্লান্ত।

ঘরের মধ্যে মুখ ফিরিয়ে এতিয়েন দেখে ঘরের এক কোণে একটা টেবিলের ধারে সুভারিন বসে রয়েছে। এতিয়েন বলে, সুভারিন, একপাত্র খাবে?

সুভারিন বলে, না, আমি কিছু খাব না।

সুভারিন জাতিতে রুশীয়। সে এতিয়েনের পাশের ঘরেই থাকে। ঘরখানা বেশ সাজানো। তবে সে ঘরে বই আর কাগজপত্রই বেশী। তার সঙ্গে এখন এতিয়েনের বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে পাশাপাশি থাকার জন্য। সুভারিনের বয়স তিরিশ। সে লে ভোরোর এক এঞ্জিনম্যান। তার চেহারা ছিপছিপে আর সাদা ধবধবে। মুখখানা বুদ্ধিদীপ্ত।

এখানকার খনিশ্রমিকরা বিদেশীদের সাধারণতঃ সন্দেহের চোখে দেখে। তাই প্রথম প্রথম ভেবেছিল সুভারিন নিশ্চয় কাউকে খুন করে দেশ থেকে পালিয়ে এসেছে। কিন্তু সুভারিনের সরল আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহারে সকলেই খুশি হয়ে সে ধারণা ত্যাগ করেছে। সে গাঁয়ের ছেলেমেয়েদের খুব ভালবাসে এবং তার উদ্বৃত্ত টাকা থেকে অনেক পয়সা করে ছেলেমেয়েদের ভাগ করে দেয়। আজকাল শ্রমিকরা তাকে তাদেরই একজন হিসাবে দেখে। ভাবে সে হয়ত রাজনৈতিক কারণে পালিয়ে এসেছে দেশ থেকে। সেও তাদের মত হয়ত সংগ্রাম করত সামাজিক বা রাষ্ট্রিক কোন অন্যায়ের বিরুদ্ধে। সেও বোধ হয় একদিন তাদের মত কষ্টভোগ করত।

এতিয়েন যখন এখানে এই হোটেলে থাকতে আসে তখন একটা সপ্তা সুভারিনকে খুব গম্ভীর দেখায়। তার সঙ্গে কোন কথা বলতে পারেনি। পরে

অবশ্য তার সঙ্গে তার আলাপ হয় এবং তার জীবনের সব কথা বলতে পারে। সুভারিন তুলা প্রদেশের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছোট ছেলে। সে সেন্ট পিটার্সবার্গে ডাক্তারি পড়ত। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক আদর্শে দীক্ষিত হয়ে সে কারিগরী বিদ্যার কাজ শেখে। তাহলে সে জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার সুযোগ পাবে। সেই সময় রাশিয়ার সব শিক্ষিত যুবকরাই এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়। বিপ্লবী হিসাবে সে বোমা তৈরি করত। একবার সম্রাটের জীবননাশের চেষ্টা করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে দেশ-ছাড়া হয়। সে সোজা পালিয়ে আসে মঁতস্যুতে। মঁতস্যু কোম্পানির শ্রমিকরা তাকে বিদেশী চর মনে করে বলে কোন সহযোগিতা করেনি। না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরতে বসে সে। এমন সময় ভাল কর্মীর অভাব দেখা দিলে মঁতস্যু কোম্পানি তাকে কাজে ভর্তি করে নেয়। এখন সে একজন সুদক্ষ ও সৎ কর্মী হিসাবে এমন নাম করেছে যে কোম্পানির কর্তৃপক্ষ কথায় কথায় তার দৃষ্টান্ত দেয় শ্রমিকদের।

এতিয়েন ঠাট্টা করে সুভারিনকে বলল, তোমার পিপাসা লাগেনি ?

সুভারিন উত্তর করল, একমাত্র খাবার সময় আমার পিপাসা লাগে।

এতিয়েন বলল, সে নাকি তাকে একদিন খনির একটা মেয়ের সঙ্গে মাঠে নেমে যেতে দেখেছে। কিন্তু সুভারিন কথাটা উড়িয়ে দিল। সে বলল কোন মেয়ের প্রতি কোন উৎসাহ বা আগ্রহ নেই তার। যতক্ষণ তার মধ্যে সাহস ও পৌরুষ আছে তার কোন প্রয়োজন নেই মেয়েদের। তারাও এক সাধারণ মানুষ মাত্র। তাছাড়া সে এমন কোন কাজ করতে চায় না যার জন্য পরে তাকে দুঃখ করতে হবে। সে কারো সঙ্গে কোন গভীর সম্পর্ক গড়ে তুলতে চায় না। সে স্বাধীনভাবে কাজ করে যেতে চায় শুধু।

রোজ রাতে র‍্যাসেনোর দোকান থেকে নটা বাজলে যখন সব খরিদ্দারেরা একে একে চলে যায় তখন সুভারিন আর এতিয়েন দুজনে বসে থাকে রাত পর্যন্ত। এতিয়েন মদের গ্লাস থেকে এক চুমুক করে খায় আর সুভারিন একটা করে সিগারেট খায়। তার আঙুলে সিগারেট ধরার জন্য দাগ ধরে গেছে। ডান হাতে সিগারেট ধরে থাকত আর বাঁ হাতে একটা খরগোস ধরে থাকত। খরগোসটা সুভারিনের এবং সে তাকে দারুণ ভালবাসত। সে তাকে কোলে তুলে না নিলে খরগোসটা তার পা দুটো শুঁকত ও আঁচড়াত। এক হাতে সিগারেট খেতে খেতে সিগারেটের উত্তপ্ত ধোঁয়ার পানে তাকিয়ে থাকত আর এক হাতে খরগোসটার পিঠে হাত বোলাত।

সেদিনও তাই করছিল সুভারিন এতিয়েনের সামনে।

এতিয়েন সুভারিনকে বলল, তুমি জান আমি প্লুশার্তের কাছ থেকে একখানা চিঠি পেয়েছি।

ওদের কাছে র‍্যাসেনোরও ছিল। দোকান থেকে শেষ খরিদ্দারও চলে গেছে।

র‍্যাসেনোর আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল, এখন সে কি করছে?

প্রায় দু মাস হলো এতিয়েন প্লুশার্তের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলেছে। প্লুশার্ত এখন নিজে ফোরম্যানের কাজ করে। এতিয়েন তাকে চিঠি মারফৎ জানায় সে মঁতস্যুতে একটা চাকরি পেয়েছে। একথা শুনে প্লুশার্ত এতিয়েনকে তার রাজনৈতিক মতবাদে ভাল করে দীক্ষিত করে তোলে যাতে করে সে খনিশ্রমিকদের মধ্যে সে মতবাদের কথা প্রচার করতে পারে।

এতিয়েন বলল, প্লুশার্তের দল এখন ভালই চলছে। চারদিক হতে লোক এসে ভর্তি হচ্ছে।

র‍্যাসেনোর একবার সুভারিনকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি এই দল সম্বন্ধে কি মনে করো?

সুভারিন খুব একটা উৎসাহ দেখাল না।

তখন এতিয়েন এক বৈপ্লবিক প্রেরণায় অনুপ্রাণিত ও উত্তপ্ত হয়ে সে তুলে ধরতে লাগল তাদের দলের যোগ্যতা ও গুরুত্বের কথা। এক বিরাট বৈপ্লবিক আবেগের সঙ্গে এতিয়েন শ্রমিকদের সপক্ষে মূলধনের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতে লাগল।

এর পর এতিয়েন আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা ওয়ার্কার্স ইণ্টারন্যাশনালএর কথা উল্লেখ করল। বলল, সারা দুনিয়ার শ্রমিক একযোগে তাদের শোষকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তাদের ন্যায়সঙ্গত পাওনা আদায় করে নেবে। এটা কি আশার কথা নয়? লণ্ডনের হেড অফিস ভালই কাজ করছে। এরপর এক জেনারেল কাউন্সিল বা সাধারণ পরিষদ হবে। তাতে পৃথিবীর সব দেশের শ্রমিকদের প্রতিনিধি থাকবে সদস্য হিসাবে। এইভাবে দু মাসের মধ্যে ওরা সারা বিশ্বকে জয় করবে। সব দেশে ছড়িয়ে পড়বে।

কিন্তু সুভারিন এতিয়েনের সঙ্গে একমত হতে পারল না এ বিষয়ে।

সুভারিন আবার বলল, সব ভেঙ্গে ফেল। তোমাদের বন্ধু কার্ল মার্কস সব জিনিস বিবর্তনের উপর ছেড়ে দিয়ে বসে থাকতে চান। তোমাদের একমাত্র লক্ষ্য হলো মাইনে বাড়ানো। এর মধ্যে কোন রাজনীতি নেই। ওসব বিবর্তনের কথা আমার কাছে বলো না। পার যদি চারদিকে আগুন লাগাও। সব পুড়িয়ে ফেল। পুরনো পচা জগতের সব কিছু পুড়িয়ে ছারখার করে দাও। সব ধ্বংস হয়ে গেলে দেখবে আবার এক নতুন পৃথিবী নতুন সমাজ জন্ম নেবে।

এতিয়েন হাসতে লাগল। সুভারিনের কথা সে কিছু বুঝতে পারে না। তার এই ধ্বংসের কথাটা এক অর্থহীন বাগাড়ম্বর বলে মনে হয় তার কাছে। তার থেকে র‍্যাসেনোর অনেক বাস্তববাদী লোক। র‍্যাসেনোর কখনো মাথা গরম করে না; সে সব সময় ঠাণ্ডা মাথায় শুধু খবরাখবর চায়।

র‍্যাসেনোর এতিয়েনকে শান্ত কণ্ঠে বলল, তুমি তাহলে মঁতস্যুতে দলের একটা শাখা গড়ে তুলতে চাও?

আসলে প্লুশার্ত তাই চায়। 'ফেডারেশান অব দি লর্জ' এই দলের সে সম্পাদক। খনিশ্রমিকরা যদিই ধর্মঘট করে বসে তাহলে তাদের সংস্থা শ্রমিকদের কতখানি সাহায্য দিতে পারবে সেই বিষয়েই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায় সে। এখন এতিয়েন বেশ বুঝতে পেরেছে খনিতে ধর্মঘট আসন্ন। কাঠের কাজের ঝগড়া মিটবে না এবং কোম্পানির পক্ষ থেকে একটা কিছু অন্যায় কথা বললেই সমস্ত খনির শ্রমিক বিদ্রোহ করবে। ধর্মঘট করবে।

র‍্যাসেনোর বলল, এখন সমস্যা হচ্ছে চাঁদা নিয়ে। কেন্দ্রীয় কমিটির ফাণ্ডের জন্য বছরে পঞ্চাশ সেন্তিমে আর স্থানীয় পার্টি ফাণ্ডে ছ ফ্রাঁ এমন কিছু বেশী নয়। তবু আমি জোর করে বলতে পারি অনেকেই তা দেবে না।

এতিয়েন বলল, আমরা প্রথমে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড দিয়ে শুরু করতে পারতাম। ওটাই হবে আমাদের লড়াইএর প্রেরণার উৎস।...তবু আমাদের ভেবে দেখতে হবে। আমি তৈরি, অবশ্য আর সবাই যদি রাজী থাকে।

কিছুক্ষণের জন্য সবাই চুপ করে রইল। কাউণ্টারে পুরনো তেলের প্রদীপটা জ্বলছিল। তার থেকে ধোঁয়া উঠছিল। লে ভোরোর ফার্ণেসে কয়লা ঢালার শব্দ আসছিল খোলা জানালা দিয়ে।

মাদাম র‍্যাসেনোর বলল, সব জিনিসের দাম অগ্নিমূল্য হয়ে পড়েছে।

মাদাম র‍্যাসেনোর দোকানের ভিতর ঢুকে চুপ করে বসে সব শুনছিল। মাদাম র‍্যাসেনোর বলল, যদি বলি কিসের জন্য আমি কুড়ি স্যু দিয়েছি তাহলে তোমরা সবাই লাফিয়ে উঠবে।

এবার ওরা তিনজনেই একমত হলো। এ ব্যাপারে ওদের কোন দ্বিমত নেই। একের পর এক করে তারা তাদের সকরুণ কাহিনী ব্যক্ত করল। শ্রমিকরা আর পেরে উঠছে না। বিপ্লবের পর থেকে অবস্থা আরো খারাপ হয়েছে। ১৭৮৯ সালের পর থেকে বুর্জোয়ারা জমির উপস্বত্ব ভোগ করত। তারা চাষী ও ক্ষেতমজুরদের এমনভাবে শোষণ করত যে তাদের ঘরে খাবার বলে কিছুই থাকত না। আবার এখন সেই বুর্জোয়ারা শ্রমিকদের শোষণ করছে। আজ কে একথা বলতে পারে যে একশো বছরের মধ্যে দেশে যে জাতীয় সম্পদ ও আয় বেড়েছে তার উপযুক্ত ফল পেয়েছে, তাদের জীবনযাত্রার মান বেড়েছে আগের থেকে? এই সব শ্রমিকদের স্বাধীন বলা যায় না কোনক্রমেই। তাদের স্বাধীন বলা এক প্রহসনমাত্র। তারা শুধু একটা বিষয়েই স্বাধীন—তা হলো তাদের শুকিয়ে মরার পথে কোন বাধা নেই। অভাবের তাড়নায় সব শ্রমিক নিজের নিয়ে ব্যস্ত। গরীবের কথা ভাবতে কেউ তাদের দু খানা রুটি বেশী দেবে না। এটা যেমন করে হোক বন্ধ করতেই হবে। হয় ভাল করে বুঝিয়ে শান্তভাবে, অথবা ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড আর ব্যাপক নরহত্যার মাধ্যমে। আজকের ছেলেরা অবশ্যই দেখতে পাবে একশো বছর যেতে না যেতে আর এক বিপ্লব ঘটবে। সে বিপ্লব হবে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লব—এক বিরাট ঘটনা যা গোটা সমাজের উপর থেকে

তলা পর্যন্ত ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দেবে। তারপর তার জায়গায় এক নতুন সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলবে।

মাদাম র‍্যাসেনোর বলল, ওরা ফেটে একদিন পড়বেই।

ওরা সকলেই একবাক্যে সমর্থন করল কথাটাকে।

সুভারিন তার খরগোসের কানে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, বেতন বৃদ্ধি? তা কি সম্ভব? তা যে লোহার ছাঁচে ঢেলে এমনভাবে নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে যাতে শ্রমিকরা কোন রকমে শুধু শুকনো রুটি খেয়ে শুধু সন্তান বৃদ্ধি করে যেতে পারে। বেতন যদি খুব কমে যায় তাহলে শ্রমিকরা ক্ষুধায় মরতে থাকে, শ্রমিকের অভাব দেখা দেয়। শ্রমিকের চাহিদা বাড়ে। আর যদি বেতন বাড়ে তাহলে শ্রমিকের যোগান বেড়ে যায়। আর শ্রমিকের যোগান বাড়লেই বেতন কমবে। এইভাবে শ্রম আর বেতনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা হয়। ক্ষুধার কারাগারে শ্রমিকরা চিরবন্দী, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত।

সুভারিন যখন এইভাবে আপন মনে আবেগের সঙ্গে তার বুদ্ধিবাদী সমাজতান্ত্রিক তত্ত্বের কথা বিশ্লেষণ করে তখন এতিয়েন আর র‍্যাসেনোর দুজনেই অস্বস্তি বোধ করে। কারণ সুভারিনের এই সব নৈরাশ্যজনক কথা তাদের ভাল লাগে না। কারণ তারা এই সব কথার কোন উত্তর খুঁজে পায় না।

মাদাম র‍্যাসেনোর বরাবর উগ্রপন্থী। সুভারিনকে সমর্থন করে বলল, ভদ্রলোক ঠিকই বলছে।

এতিয়েন কোন বিতর্কের মধ্যে যোগদান না করে বলল, এবার শুতে যাই। আমাকে আবার তিনটের সময় উঠতে হবে।

সুভারিন তার মুখের সিগারেটটা নিবিয়ে দিল। সে তখন তার খরগোসের পেটটায় হাত বোলাচ্ছিল। র‍্যাসেনোর দরজায় তালাবন্ধ করছিল। গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের ভারে তাদের মাথাগুলো ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল।

প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় এই ধরনের আলোচনা হয়। এতিয়েন মদ পান করতে করতে এই সব নিয়ে আলোচনা করে আর ভাবে। কত দুর্বোধ্য ঘুমন্ত ভাবাদর্শ তার মনটাকে আলোড়িত করতে থাকে। কিন্তু সে সব কিছু বুঝতে পারে না। এ বিষয়ে তার সবচেয়ে বড় বাধা হলো তার জ্ঞানের স্বল্পতা। র‍্যাসেনোরের কাছ থেকে সে আর কোন বই ধার করে না। তার কাছে কিছু জার্মান আর রুশীয় বই ছাড়া আর কিছু নেই। সুভারিনের কাছে সমবায় সম্বন্ধে লেখা একটা ফরাসী বই একবার নিয়েছিল। আর একটা 'লা কম্ব্যাট' নামে একটা পত্রিকা নিয়মিত পড়ে। সুভারিনের সঙ্গে নিয়মিত দেখা হলেও এতিয়েন দেখে সুভারিনকে সেই আগের মতই উদাসীন দেখায়। সে তেমনিই নিস্পৃহ, নিরাসক্ত ও আবেগহীনভাবে সব সময় মাঝখানে একটা ব্যবধান রেখে কথা বলে বা মেলামেশা করে সকলের সঙ্গে। তাকে দেখে মনে হয় সব যাত্রা

বন্ধ করে জীবনের মাঝখানে তাঁবু খাটিয়ে বসে আছে।

জুলাই মাসে এতিয়েনের পদোন্নতি ঘটল। একটা দুর্ঘটনা খনির বৈচিত্র্যহীন জীবনে একটা বৈচিত্র্যের আস্বাদ নিয়ে এল। 'গিলম সীম' নামে যে মুখটায় ওরা কয়লা কাটছিল সেখানে এক ফাটল দেখা দেয় ছাদে। তাতে খনি শ্রমিকদের দোষ ধরা পড়ে। তার সঙ্গে এঞ্জিনীয়ারদের গাফিলতিও ধরা পড়ে। তারা আগে থেকে সব কিছু জেনেশুনেও কোন ব্যবস্থা নেয়নি। সারা খনিতে সেই একই কথা। সেখানে যে টিম বা দল কাজ করছিল সে টিম বলল, দলের মধ্যে কুঁড়ে লোকের জায়গা হবে না।

একদিন মাহিউ এতিয়েনকে সঙ্গে করে কর্তৃপক্ষের কাছে গেল। সে তাকে লেভাকের পরিবর্তে যোগ্য কোলিয়ার হিসাবে মনোনীত করেছে। এতিয়েনের প্রতি কোম্পানির মালিকপক্ষ আগে থেকেই খুশি ছিল। তার পদোন্নতিতে সবাই খুশি। লেভাক অন্য টিমে গেল।

এদিকে কোম্পানি এক নোটিশ মারফৎ জানিয়ে দিল তারা শ্রমিকদের সঙ্গে নতুন চুক্তি করবে।

সেদিন সন্ধ্যের সময় মাহিউ এতিয়েনকে নিয়ে অফিসের সামনে নীলামের শর্তগুলো পরীক্ষা করতে গেল। এতিয়েন শর্তগুলো পড়ে শোনাল, তখন তার একটাও মনঃপূত হলো না মাহিউর। মাহিউ বলল, তবু যদি খেতে চাও তাহলে কাজ করতেই হবে।

পরদিন বিকালে সব টিম লকার রুমে গিয়ে দাঁড়াল। এক একটা টিমের অধীনে একদল করে শ্রমিক ছিল। যে টিম সবচেয়ে কম দরে কয়লা কাটতে ও ভরতে রাজী হবে কোম্পানি সেই টিমকেই নিযুক্ত করবে। এইভাবে একটা টিমকে আর একটা টিমের প্রতিযোগী হিসাবে দাঁড় করিয়ে কোম্পানি শ্রমিকদের একে অন্যের শত্রু করে তুলছে। মাহিউ জানে নীলামে নিগ্রেলের সামনে ডানসার্ত যে সব শর্তের কথা বলছে তা মানা সম্ভব নয়, তবু সে যদি না মানে তাহলে অন্য টিম তা মেনে নেবে। তার মানে তার টিমের অধীনস্থ সব লোক বেকার হয়ে যাবে। এই বেকারত্বের ভয়েই মাহিউ টব প্রতি খুব কম হারে কয়লা তোলার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কাজ বজায় রাখল। ডেপুটি রিকোমে মাহিউর কাছে দাঁড়িয়ে দেখছিল। সে মাহিউর গায়ে চিমটি কেটে তাকে সাবধান করে দিল। এ হারে রাজী হলে তাতে তাদের কাজই হবে। তাদের কোন অভাবই মিটবে না।

নীলাম থেকে ফেরার পথে রাগে গজগজ করছিল এতিয়েন। কোম্পানিকে গাল দিচ্ছিল। ফেরার পথে দেখল এত বড় একটা অঘটন ঘটে গেল মাহিউর উপর দিয়ে অথচ শ্যাভেলের সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। সে ক্যাথারিনকে নিয়ে রেলিকার্ত থেকে ফূর্তি করে ফিরছিল। তাদের দেখে এতিয়েনের রাগটা আরো বেড়ে গেল।

এতিয়েন বলল, হা ভগবান, কী সর্বনাশের কথা! একজন শ্রমিককে শ্রমিকের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হচ্ছে সামান্য জীবিকার জন্য।

কথাটা শুনে শ্যাভেল রেগে গেল। সে তার রেট কমাবে না। জ্যাকারিও এগিয়ে এসে বলল, সে এ ব্যবস্থা মানবে না। এতিয়েন তাদের শান্ত করল। সে জোর দিয়ে বলল, এভাবে চিরকাল চলতে পারে না। একদিন দেখবে আমরাই এ কোম্পানির মালিক হব।

নীলামের পর এতক্ষণ মাহিউ একটা কথাও বলেনি। এবার সে যেন স্বপ্নের ঘোর থেকে হঠাৎ জেগে উঠে বলল, হ্যাঁ মালিক হব···তবে তার জন্য অনেক রক্তপাত করতে হবে।

২

সেদিন ছিল জুলাই মাসের শেষ রবিবার। আজ মঁতস্থতে মেলা বসেছে। এই উৎসব দিনটির জন্য প্রতীক্ষা ও প্রস্তুতি চলছিল লে ভোরোর গাঁয়ের অধিবাসীদের মধ্যে। গতকাল অর্থাৎ শনিবার দিন প্রতিটি বাড়ির গিন্নীরা সমস্ত ঘর ঝেড়ে মুছে বালতি বালতি জল ঢেলে পরিষ্কার করে ধুয়েছে।

আজ দিনটাও বেশ ভাল। সকাল থেকে রোদ উঠেছে। আকাশ পরিষ্কার। দিনটা বেশ গরম।

রবিবার মাহিউদের বাড়ির সবাই দেরি করে ওঠে। মাহিউর ঘুমটা পাঁচটার সময় ভেঙ্গে গেলেও বিছানায় এপাশ ওপাশ করে এবং উঠতে ছটা বেজে যায়। মাহিউ বিছানা থেকে উঠে পোষাক পরেই একটা পাইপ মুখে দিয়ে বাগানে চলে যায়। সেখান থেকে এসে একা একা এক টুকরো রুটি খেয়ে প্রাতরাশ সারে। তারপর একে একে সবাই নেমে আসে উপর থেকে। বুড়ো বনিমোর চেয়ার বাড়ির বাইরে নিয়ে গিয়ে রোদে বসে। মাহিউর স্ত্রী আর আলজিরে ঘর সংসারের কাজ সারে। ক্যাথারিন হেনরি আর লেনোরকে বিছানা থেকে উঠিয়ে পোষাক পরিয়ে নিচে নামিয়ে আনে। সবশেষে নামে জ্যাকারি আর জাঁলিন। আজ মাংসরান্না আর পিঁয়াজ ভাজার গন্ধে আমোদিত হয়ে উঠেছে সমস্ত বাড়িটা।

সমস্ত গাঁটা উৎসবে মেতে উঠেছে। সবাই তাড়াতাড়ি মধ্যাহ্নভোজন সেরে নিচ্ছে কারণ তারা দলে দলে মেলা দেখতে যাবে খাওয়ার পর। প্রতিটি বাড়ি থেকেই মাংসরান্না আর ভাজা পিঁয়াজের গন্ধ আসছে। প্রতিটি বাড়ির ঘর দরজা খোলা। খোলা দরজা জানালা দিয়ে বাড়ির মেয়েরা অন্য বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে কথা বলাবলি করছে। পরিষ্কার অনুকূল আবহাওয়া ওদের উৎসবের আনন্দের মাত্রাকে অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে।

কিন্তু অন্য বাড়ির তুলনায় মাহিউদের বাড়িতে উৎসবের কোন মত্ততাই চোখে পড়ে না। কারো মধ্যে কোন হৈ চৈ নেই। মাহিউ দুপুরের খাওয়া খেতে বসল ঠিক বেলা বারোটায়।

আজ তিন সপ্তা হলো মাহিউদের সঙ্গে তাদের প্রতিবেশী পাশের বাড়ির লেভাক পরিবারের সঙ্গে ভাব নেই। কথা বলাবলি নেই। তাদের মধ্যে ঝগড়াটা বাধে জ্যাকারি আর ফিলোমেনের বিয়ের ব্যাপারটা নিয়ে।

লেভাকদের সঙ্গে ঝগড়া হওয়ার ফলে পিয়েরেনদের সঙ্গে মাহিউদের ভাব ভালোবাসাটা আরো গাঢ় হয়েছে আগের থেকে। কিন্তু আজ পিয়েরেন বাসায় নেই। সে আজ সাত সকালে তার মার উপর সংসারের ভার দিয়ে মাসিয়েনে তার এক জ্ঞাতিবোনের কাছে বেড়াতে গেছে। আজ সেখানে সারাদিন কাটিয়ে আসবে। কিন্তু এ গাঁয়ের প্রায় সবাই জানে তার সেই জ্ঞাতিবোনকে। সবাই বলাবলি করে তার এই জ্ঞাতিবোন হলো ওভারম্যান ডানসার্ত, তার পেয়ারের লোক।

আগের দিন ওদের মাইনে হয়। তাই এই উৎসবের দিনটি ওরা ভালভাবেই পালন করল। মাহিউরা একটা খরগোসকে একমাস ধরে পুষে রেখেছিল আজ তার মাংস খাবে বলে। তার সঙ্গে কিন্তু গোমাংসও ছিল। রাত্রে যদি কারো ক্ষিদে পায় তাহলে এক টুকরো রুটি দিয়ে সেই মাংস খাবে।

জাঁলিন প্রথমে সাজগোজ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। বেবার্ত তার জন্য অপেক্ষা করছিল। মা ব্রুলের দৃষ্টি এড়িয়ে সে বেরিয়ে পড়েছে বাড়ি থেকে।

তারপর বুড়ো বনিমোর বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে। এর পর মাহিউ। মাহিউ তার স্ত্রীকে তার সঙ্গে যেতে বলল। একসঙ্গে তারা রাস্তায় হাওয়া খেতে খেতে বেড়াতে বেড়াতে মেলায় যাবে। কিন্তু মাহিউর স্ত্রী আপত্তি করল। ছেলেদের সামনে এটা কখনই শোভা পায় না। মাহিউ রাস্তায় বেরিয়ে দেখল লেভাক যাবে কি না। দু বাড়ির মেয়েদের মধ্যে কথা বলাবলি না থাকলেও পুরুষদের মধ্যে আছে। কিন্তু লেভাকের বদলে মাহিউ দেখল ফিলোমেন বেরিয়ে আসছে লেভাকদের বাড়ি থেকে আর জ্যাকারি তার জন্য অপেক্ষা করছে বাইরে।

মাহিউকে দেখে লা লেভাক বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে আক্রমণ করল। জ্যাকারিও ছিল সেখানে। লা লেভাক তার মেয়েকে বলল, উনি প্রেমিকের সঙ্গে ফূর্তি করতে যাচ্ছেন আর ওঁর পিতৃহীন অনাথ সন্তানদের আমাকে মানুষ করতে হবে। আমি আর পারব না।

জ্যাকারি বলল, তার বিয়ে করতে আপত্তি নেই। বিয়ে করে ফিলোমেনকে বাড়ি নিয়ে যেতে রাজী আছে। কিন্তু তার মা যদি এতে রাজী থাকে। তাছাড়া নয়।

বুতলুপ খাওয়ার পর বলল, সে বাড়িতেই থাকবে। কোথাও যাবে না।

অনুগত নিরীহ স্বামীর মত সে বাড়িতে লা লেভাকের কাছেই রয়ে গেল।

মাহিউ কিন্তু মঁতসুর মেলায় গেল না। সে সোজা চলে গেল র‍্যাসেনোয়ের মদের দোকানে। সে যা ভেবেছিল ঠিক তাই হলো। লেভাক তার আগেই চলে এসেছে।

লেভাক মাহিউকে ডাকল। একদান খেলা হবে নাকি?

মাহিউ বলল, না, আমার বড় পিপাসা পেয়েছে। এখন খেলব না।

এতিয়েন দোকানের এককোণে বসে একপাত্র মদ খাচ্ছিল। তার মন-মেজাজ ভাল ছিল না। কারণ সুভারিন একটু আগে তাকে একা রেখে চলে গেছে। প্রতি রবিবার সুভারিন নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে বই পড়ে আর কি সব লেখে।

এতিয়েন্ মাহিউকে ডাকল। তারপর র‍্যাসেনোরকে একপাত্র মদ দিতে বলল, লেভাক তার এক সহকর্মীর সঙ্গে স্কিটন খেলছিল। বুড়ো বনিমোর আর তার বন্ধু মুকে তা দেখছিল।

মাহিউ এতিয়েনের কাছে বসল। র‍্যাসেনোর মাঝে মাঝে আসছিল তাদের কাছে।

এতিয়েন বলল, এখানে খাওয়া ভাল হচ্ছে না। তবে খনিটা কাছে বলেই সে এখানে আছে। তা না হলে সে অন্য কোথাও চলে যেত। সে বলল, লে ভোরোর গাঁয়ের কোন বাড়িতে খাওয়া থাকার সুযোগ পেলে তার ভাল হবে।

মাহিউ সঙ্গে সঙ্গে বলল, আমার মতেও সেটাই তোমার পক্ষে ভাল হবে। মুকেত্তে কোথা থেকে র‍্যাসেনোরের বাড়িটার পিছনে পোস্টের কাছে এসে দাঁড়িয়ে কি যেন খুঁজছিল।

লেভাক খেলতে খেলতে মুকেত্তেকে বলল, কি খবর, একা একা কেন? তোমার প্রেমিক কোথায়?

মুকেত্তে বলল, সে প্রেমিক খুঁজছে।

লেভাক বলল, এখানে এত লোক রয়েছে। একজনকে খুঁজে নাও।

মুকেত্তে হাসতে লাগল। বুড়ো ঘুরে লজ্জায় মুখটা স্থির করে রইল। মুকেত্তে এতিয়েনের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল তার পানে তাকিয়ে।

লেভাক সেদিকে একবার তাকিয়ে বলল, বুঝেছি, তুমি তোমার পেয়ারের লোক পেয়ে গেছ।

কথাটা শুনে এতিয়েনও হাসতে লাগল। কিন্তু মুকেত্তের সঙ্গে কোন কথা বলল না। তার সঙ্গে ভাব করার কোন উৎসাহ তার নেই। তার পানে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর মুকেত্তে মুখখানাকে গম্ভীর করে চলে গেল।

এতিয়েন মাহিউর কাছে চুপি চুপি বলল, তাদের একটা প্রভিডেন্ট ফাণ্ড

গঠন করা উচিত শ্রমিকদের জন্য। মাহিউ সমর্থন করে বলল, কোম্পানি যখন আমাদের কোন দায়িত্ব নিচ্ছে না, সব দায়িত্ব আমাদের উপর ছেড়ে দিয়েছে তখন আমরা তা করতে পারি।

এই নিয়ে ওরা ব্যাপারটার নানারকম খুঁটিনাটি বিষয়ে আলোচনা করতে লাগল। মাহিউ বলল, আমি তো রাজী আছি। ওদের রাজী করাও।

লেভাকের সঙ্গে মাহিউ কিছুক্ষণ খেলল। তারপর উঠে পিয়েরেনের খোঁজ করতে লাগল। দেখল এখনো দুপুর গড়ায়নি। মাহিউ উঠে পিয়েরেনের খোঁজে লেভাক আর এতিয়েনকে সঙ্গে করে বেরিয়ে পড়ল।

ওরা রাস্তা দিয়ে যখন এগিয়ে যাচ্ছিল তখন ওদের পরিচিত অনেকেই পথের ধারের মদের দোকানে বসেছিল। তারা ওদের দেখে ডাকতে লাগল। ওরা গিয়ে একপাত্র করে মদ খেল অনুরোধে পড়ে। তারপর ওরা লেফাঁতে গিয়ে পিয়েরেনের দেখা পেল। পিয়েরেনও তখন এক পাত্র মদ সবেমাত্র শেষ করছিল। পিয়েরেনের কাছে আবার একপাত্র করে মদ খেল। তারপর ওরা চারজনে মিলে জ্যাকারির খোঁজে টির্স নামে একটা দোকানে গেল। কিন্তু সেখানে পেল না। তখন ওরা সেণ্ট ইধনয়ে যাবার কথা ভাবল। ওরা আবার বেরিয়ে পড়ল। বিভিন্ন মদের দোকানে জ্যাকারির খোঁজ করতে লাগল।

অবশেষে লেভাক বলল, ভলকানে গিয়ে দেখ।

একথা শুনে অন্য সবাই হাসতে লাগল। তবু ওরা ভলকানের পথেই এগিয়ে চলল। এখানে পথের দুধারে মেলা বসেছে। লোকের দারুণ ভিড়। একটা লম্বা ঘরের একধারে একটা তক্তার উপর মঞ্চ তৈরি করে তার উপর পাঁচজন মেয়ে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করে নাচছিল। মেয়েগুলি লীনের বারবণিতা। তাদের কাউকে কেউ চাইলে তাকে ঘরের পিছনের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। যারা তাদের এইভাবে নিয়ে যেত তাদের মধ্যে তরুণ যুবকই বেশী। তারা সবাই খনিশ্রমিক। তাদের মধ্যে আবার চোদ্দ বছরের ছেলেও ছিল। আবার কিছু বিবাহিত শ্রমিকও ছিল। যারা বিবাহিত জীবনে অসুখী তারাই এই সব বারবণিতাদের কাছে যেত।

কিন্তু এতিয়েন বা মাহিউ নাচ দেখতে যায়নি। ওরা একটা টেবিলে বসে কথাটা আবার তুলল। এতিয়েন লেভাককে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের কথাটা বুঝিয়ে বলল। সে বলল, প্রতিটি সদস্য মাসে দশ স্যু করে জমা দেবে। এইভাবে যে ফাণ্ড বেড়ে উঠবে তা শ্রমিকদের অনেক বিপদ আপদে কাজ দেবে। শ্রমিকদের ফাণ্ডে টাকা থাকলে শ্রমিকরা মনে জোর পাবে। তুমি কি মনে করো?

লেভাক বলল, আমার কোন আপত্তি নেই। ঠিক আছে। তবে পরে এ বিষয়ে কথা বলব।

পিয়েরেন ও মাহিউ একপাত্র করে মদ খাচ্ছিল। তাদের মদ খাওয়া হয়ে গেলে যাবার জন্য উঠে পড়ল। লেভাক রয়ে গেল। মুকেত্তের সঙ্গে এখানে

আবার দেখা হলো এতিয়েনের। মুকেত্তে তার দিকে তেমনি অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল। সে দৃষ্টির অর্থ হলো, আমাকে তুমি চাও কি?

কিন্তু এতিয়েন রসিকতার স্বরে একটা কথা বলে মুকেত্তের আবেদনটা এড়িয়ে গেল। তার এই ব্যবহারে রেগে গিয়ে মুকেত্তে চলে গেল।

পিয়েরেন জিজ্ঞাসা করল, শ্যাভেল কোথায়?

মাহিউ বলল, হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। সে বোধ হয় পিকেত্তেতে আছে।

ওরা তিনজনে পিকেত্তেতে গিয়ে দেখল জ্যাকারি ঘরের সামনে পেরেকের এক কারবারীর সঙ্গে ঝগড়া করছিল। মাহিউ বলল, শ্যাভেল রয়েছে, ওর সঙ্গে ক্যাথারিনও রয়েছে।

শ্যাভেল আর ক্যাথারিন পাঁচ ঘণ্টা ধরে মেলায় ঘুরে বেরিয়েছে। শ্যাভেল ক্যাথারিনকে একটা আয়না আর ওড়না কিনে দিয়েছে। মেলার মধ্যে পথের দুদিকে খোলা বাজার বসেছে। তাতে নানারকমের মনিহারীর জিনিসপত্র যেমন আয়না, ছুরি, টুপী প্রভৃতি বিক্রি হচ্ছিল। মেলার মাঝে এক জায়গায় দুটো লাল মোরগের লড়াই হচ্ছিল। মাইগ্রাতের দোকানে এক বিলিয়ার্ড প্রতি-যোগিতার পুরস্কার হিসাবে এ্যাপ্রন আর কাপড় দেওয়া হচ্ছিল। মদের দোকানগুলোর সামনে চেয়ার ও বেঞ্চ পেতে বাড়ানো হয়েছিল।

শ্যাভেল আর ক্যাথারিন বেড়াতে বেড়াতে দেখল বুড়ো বনিমোর তার বন্ধু মুকের সঙ্গে বাতে ধরা খোঁড়া পায়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু সবচেয়ে খারাপ লাগছিল জঁালিনের ব্যাপার দেখে। জঁালিন বেবার্ত আর লিডিকে একটা দোকান থেকে খনিজ জলের বোতল চুরি করতে বলেছিল। ক্যাথারিন তা দেখে জঁালিনের কানটা মলে দিল। লিডি একটা বোতল নিয়ে ছুটে পালাচ্ছিল। তাকে ধরতে পারা গেল না।

হঠাৎ শ্যাভেল আর ক্যাথারিন দেখল জ্যাকারি আর ফিলোমেন তাদের দিকেই আসছে। ওরা পরস্পরের সঙ্গে করমর্দন করল। কিন্তু একজন পেরেকের কারবারী এসে যখন ক্যাথারিনের গায়ে চিমটি কাটল তখন জ্যাকারি রেগে গেল। ক্যাথারিন লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। কিন্তু জ্যাকারিকে শান্ত হতে বলল। কারণ সে জানে একজন কারবারীকে ধরে মারলে ওদের সবাই এক জোট হয়ে আক্রমণ করবে। শ্যাভেল বিরক্ত হলেও মুখে কিছু বলল না।

পিকেত্তের মদের দোকানে ওরা সবাই বসল মদ খেতে। তখন সেই পেরেকের কারবারীটা এসে ওদের লক্ষ্য করে গালাগালি করতে লাগল। তার কথাগুলি খুবই প্ররোচনামূলক।

তা দেখে জ্যাকারি দারুণ রেগে গিয়ে বলল, এই শুয়োর কোথাকার, ও আমার বোন। আমি তোমাকে ভদ্রতা শিখিয়ে দেব।

জনকতক লোক ওদের ছাড়িয়ে দিল। শ্যাভেল বলল, এটা আমার ব্যাপার। আমি ওদের কথা গ্রাহ্যই করি না।

এমন সময় মাহিউরা সেখানে এসে পড়ল। মারামারির ভয়ে ক্যাথারিন আর ফিলোমেন উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল। পেরেকের কারবারীটা তখন কোথায় পালিয়ে গেছে। ওরা সবাই একসঙ্গে বসল। ওরা একসঙ্গে সকলে মিলে বসে একপাত্র করে মদ পান করল। এতিয়েন তার গ্লাসটা ক্যাথারিনের গ্লাসে ঠেকিয়ে নিল। এখন জ্যাকারি তার বন্ধু মুকেকে দেখতে পেল। মুকেকে দেখে তার রাগটা আবার জেগে উঠল। সে বলল, আমরা আসছি।

এই বলে জ্যাকারি আর মুকে চলে গেল।

মাহিউ কিছু বলল না। জ্যাকারি যদি তার বোনের সম্মান রক্ষার জন্য কিছু করে ত করুক। সেটা এমন কিছু খারাপ নয়।

যে কোন উৎসবের দিনের শেষে রাত্রির দিকে মাদাম দেসিরের জন বয়ো নামে মদের দোকানে একবার সকলের না গেলে হয় না। তার প্রধান কারণ হলো এই যে দোকান সংলগ্ন দুটো ঘর আছে। অবিবাহিত প্রেমিক প্রেমিকারা তা ব্যবহার করতে পারে। এই দোকানের মালিক মাদাম দেসির বিধবা। তার বয়স পঞ্চাশ, কিন্তু এই বয়সেও চেহারার বাঁধন এমন বলিষ্ঠ যে তার ছয়জন প্রেমিক আছে। মাদাম দেসির তার ছয় জন প্রেমিককে প্রত্যেককে একজন করে সপ্তায় এক একদিন ডাকে আর রবিবার সবাইকে দিনের বেলায় ডেকে একসঙ্গে মদ খাওয়ায়। এ দোকানের নামডাক আছে। মাদাম দেসির গর্ব করে বলে ওর দোকানে এসে প্রথম গর্ভ হবার আগে সব মেয়েই এখানে এসে প্রথম কুমারীত্ব হারায়। দোকানের হলঘরটার চারদিকে চারটি বাতি জ্বলে। মাথার চালটা নিচু। চারদিকের দেওয়ালে বিভিন্ন সেণ্টদের ছবি।

রবিবার দিন এই দোকানে নাচের আসর বসে। পাঁচটা থেকে নাচ শুরু হয়। তবে তখনো দিনের আলো আসে জানালা দিয়ে। আসলে সন্ধ্যে সাতটা না বাজলে সে নাচের আসরটা জমে না।

অন্য রবিবারের মত আজও বেলা পাঁচটা থেকেই নাচ শুরু হয়েছে। বাইরে হঠাৎ ঝড়ো বাতাস বইতে শুরু করেছিল। ধুলোর মেঘ উড়ছিল। হঠাৎ ঘুরতে ঘুরতে মাহিউ এতিয়েন আর পিয়েরেন সেখানে এসে হাজির হলো। দোকানটার হলঘরে তখনো নাচ হচ্ছিল। যন্ত্রসঙ্গীত বাজিয়েরা জোর নাচের বাজনা বাজাচ্ছিল। তখন সন্ধ্যের অন্ধকার ক্রমশঃ ঘন হয়ে উঠছিল। বাতির আলোগুলো ঠিক জায়গায় বসিয়ে দিতেই দর্শকরা খুশি হলো।

মাহিউ দেখল শ্যাভেল ক্যাথারিনের সঙ্গে নাচছে। ফিলোমেন একা তা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে। লেভাক বা জ্যাকারির কারো পাত্তা নেই। তবে সন্ধ্যের আলো জ্বলে উঠতেই নাচের আসরটা বেশ জমে উঠল। জোড়ায় জোড়ায় ছেলেমেয়েরা নাচতে লাগল বাজনার তালে তালে। তাদের পায়ের আঘাতে ধুলো উঠতে লাগল হলঘরে। নাচতে নাচতে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল। তাদের গা থেকে ঘামের গন্ধ বার হচ্ছিল।

হঠাৎ মাহিউ এতিয়েনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সে তাকে দেখাল মুকেত্তে একটা লম্বা লোকের হাত ধরে নাচছে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর অবশেষে সে তার মনের মানুষ খুঁজে পেয়েছে।

এমন সময় হঠাৎ মাহিউর স্ত্রী এস্তেলেকে কোলে করে এসে হাজির হলো। সে তার স্বামীর খোঁজ করতে করতে ঠিক জায়গাতে এসেই হাজির হয়েছে। তার সঙ্গে ছিল লা লেভাক। ওদের পিছনে বুতলুপ ফিলোমেনের দুটো বাচ্চা ছেলের হাত ধরে ছিল। লা লেভাক আর বুতলুপকে দেখে সবাই কানে কানে ফিসফিস করতে লাগল। এখন হাতে কোন কাজ না থাকায় এতক্ষণে মেলা দেখতে এসেছে মাহিউর স্ত্রী।

মাহিউর স্ত্রী আর লা লেভাকের মধ্যে ভাব হয়ে গেছে। মাহিউর স্ত্রী হঠাৎ জ্যাকারির বিয়েতে রাজী হয়ে গেছে। অনেক ভাবনা চিন্তা করে অবশেষে এ সিদ্ধান্তে না এসে পারেনি মাহিউর স্ত্রী। যদিও তার সংসারের আয় কমে যাবে তবু এভাবে কতদিন চলতে পারে। ছেলেমেয়ে বড় হয়েছে, তাদের বিয়ে ত একদিন না একদিন দিতেই হবে। কথাটা শুনে মাহিউ ভাবতে লাগল। সে তার স্ত্রীর মুখপানে তাকাল। তার স্ত্রী অবশেষে সত্যিই তাহলে মত দিল।

তখনো নাচ হচ্ছিল। মাহিউ এতিয়েনের সঙ্গে একপাত্র মদ খাচ্ছিল। তার কাছে গিয়ে তার স্ত্রী বসল। লা লেভাক মাহিউকে জিজ্ঞাসা করল তার স্বামী কোথায়। এতিয়েন ও পিয়েরেন বলল সে এখনি আসবে। ওরা অর্থাৎ দুটি প্রতিবেশী পরিবারের প্রায় সব লোকেরা এক জায়গায় বসল। জ্যাকারি, ফিলোমেন, শ্যাভেল, ক্যাথারিন সকলে তাদের মা বাবার কাছে বসল।

হলঘরে তখন কোয়াড্রিল নাচ চলছিল। নাচিয়েদের পদভরে লাল ধুলো উড়ছিল। কতকগুলো ছেলে কোণ থেকে হাত দিয়ে হুইসল্ বাজাচ্ছিল।

লা লেভাক এক সময় মাহিউর স্ত্রীকে বলল, মনে আছে আমার কথাটা? আমি বলিনি? তুমি বলেছিলে ক্যাথারিন এ ভুল করলে তার গলা টিপে মারবে।

মাহিউর স্ত্রী আমতা আমতা করে বলল, তুমি বলছ বটে, তবে ক্যাথারিনের বাচ্চা হয়নি এখনো এবং হতে পারে না। ক্যাথারিনও যদি এই ভুল করে এবং সেও যদি বিয়ে করতে বাধ্য হয় তাহলে কি করে আমাদের চলবে?

তখনো নাচের আসর চলছিল। লোকজনের কথাবার্তা ও গোলমাল সমানে চলছিল। এই সুযোগে মাহিউ তার স্ত্রীর কানের কাছে মুখটা নিয়ে গিয়ে তার পরিকল্পনার কথাটা বলে ফেলল। বলল, এতিয়েন কারো বাড়িতে থাকতে চায়। ওকে আমাদের কাছে রাখো না কেন? জ্যাকারি চলে গেলে তার জায়গাটা খালি হবে এবং এতিয়েন সেখানে থাকতে পারবে। তাহলে যে আয় সংসার থেকে চলে যাবে অন্য দিক দিয়ে তা পূরণ হবে।

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে মাহিউর স্ত্রীর মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এ

অতি উত্তম প্রস্তাব।

এদিকে এতিয়েন তখন পিয়েরেনকে বোঝাচ্ছিল তার পরিকল্পনার কথাটা। সে বলছিল, মনে করো শ্রমিকরা ধর্মঘট করল। কিন্তু আমাদের যদি ফাণ্ড থাকে তাহলে আমরা কোম্পানির সঙ্গে লড়াই করতে পারব।

কিন্তু পিয়েরেনের মুখখানা ম্লান হয়ে গেল। সে আমতা আমতা করে বলল, কথাটা ঠিক, তবে আমাকে একটু ভেবে দেখতে দাও।

মাহিউর স্ত্রী খুশি হয়ে আর একপাত্র করে মদের অর্ডার দিল। এই অবসরে মাহিউ এতিয়েনকে ডেকে তাকে সোজাসুজি কথাটা বলে ফেলল। এতিয়েনও সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেল। তবে মাহিউর স্ত্রী বলল, জ্যাকারির বিয়েটা না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

লেভাক এসে গেল। তার জন্য অন্য চেয়ার না থাকায় বুতলুপ তার চেয়ারের অর্ধেকটা ছেড়ে দিয়ে তাকে বসতে দিল। জ্যাকারি তার বিয়ের কথা শুনে আনন্দে চিৎকার করতে লাগল। ফিলোমেনও খুব খুশি হলো। লেভাক সব বিবাদের অবসানে দুটো পরিবারকে এভাবে এক জায়গায় ঘনিষ্ঠ হতে দেখে বীয়ারের অর্ডার দিল।

ওরা রাত দশটা পর্যন্ত ওখানে রয়ে গেল। মোটামুটি ওদের ভালই লাগছিল। শুধু একটা বিষয়ে ওরা অস্বস্তি অনুভব করছিল। নাচতে নাচতে এক একটা মেয়ে এক একটা ছেলের সঙ্গে দোকানসংলগ্ন সেই ঘরটায় চলে যাচ্ছিল। যখন এক একটি মেয়ে এক একটি যুবককে বুকের ওপর চাপিয়ে সেই ঘরের মেঝেয় শুয়ে পড়ছিল তখন হয়ত সে একবার ক্ষণিকের জন্যে ভাবছিল নাচগানের এই সাময়িক মত্ততা তাকে এক জীবন্ত কবরে শায়িত করেছে।

একজন এসে পিয়েরেনকে খবর দিল লিডি পথের ধারে মদ খেয়ে বেহুঁস হয়ে পড়ে আছে। মদের বোতল চুরি করে সেই খেয়ে নেশায় মাতাল হয়ে উঠেছে। জাঁলিন আর বেবার্তও খেয়েছে। তবে তাদের মনটা অনেক শক্ত বলে তারা অতটা কায়দা হয়নি এবং তারা হেঁটে বাড়ি চলে গেছে।

ওরা সবাই উঠে গাঁয়ের পথে এগিয়ে চলল। পিয়েরেন লিডিকে কোলে করে বয়ে নিয়ে চলল। পথের ধারে মাঠের পাকা ফসলের উপরেও অনেক মেয়ে শুয়ে ছিল। কাণ্ডজ্ঞানহীনভাবে অনেক অবাঞ্ছিত সন্তানের জন্ম দিচ্ছিল।

তখনো ঝড় বইছিল বাইরে। বুড়ো বনিমোর ও মুকে স্মৃতির ভারে ভারাক্রান্ত এক স্তব্ধতার মধ্যে বুঁদ হয়ে ছিল ওরা দুজনেই। ওরাও ওদের সঙ্গে হেঁটে চলেছিল।

এদিকে এতিয়েন শ্যাভেলকে নিয়ে গেল র‍্যাসেনোরের দোকানে। সেখানে তাকে ভাল মদ খাইয়ে তার পরিকল্পনার কথাটা বোঝাল। সব শুনে সে বলল, খুব ভাল কথা। আমার নামটা লিখে নাও। আমি আছি এর মধ্যে। তুমি সত্যিই খুব ভাল কথা বলেছ। তুমি সত্যিই ভাল।

এতিয়েন বলল, আমরা এখন পরম বন্ধু দুজনে দুজনের। তুমি দেখছ আমি ন্যায়ের খাতিরে সব কিছু ত্যাগ করতে পারি। নারী, মদ, আমার যথাসর্বস্ব নয়। আমার মনের মধ্যে শুধু একটা চিন্তা। সেটা হচ্ছে এই যে আমরা বুর্জোয়াদের কবে তাড়াব।

৩

এতিয়েন মাহিউদের বাড়িতে চলে গেল আগস্টের মাঝামাঝি। ঐ সময়েই জ্যাকারির বিয়ে হয়ে যাওয়ায় সে একটা বাসা পেয়েছে। সে বাসায় সে ফিলোমেন আর দুটো ছেলে নিয়ে থাকে।

প্রথম প্রথম ক্যাথারিনের কাছে অস্বস্তি অনুভব করত এতিয়েন। তাদের এখন খুব কাছাকাছি থাকতে হয়। এতিয়েন জ্যাকারির খাটটায় জাঁলিনের পাশে শোয়। সে যেন একই পরিবারের লোক। জ্যাকারির সামনেই স্নানের সময় উলঙ্গ হয় ক্যাথারিন। আবার ক্যাথারিনকেও তাই হতে হয়। আবার শোবার সময় একই ঘরে কাছাকাছি থাকে ওরা। ক্যাথারিন শোবার সময় উলঙ্গ হয়ে বাতির আলোটা নিবিয়ে দেয়। অবশ্য ক্যাথারিনের অনাবৃত দেহটার প্রতি কোন কৌতূহল নেই তার। সে তার দিকে তখন মোটেই তাকায়না।

তবু ক্যাথারিনের পায়ের পাতা থেকে মাথা পর্যন্ত দেহের সমস্ত অংশ খুঁটিয়ে জানা হয়ে গেছে যেন এতিয়েনের। তবু বিশেষ কোন কামনা জাগে না তার মধ্যে। প্রথাগত অভ্যাসের বশবর্তী হয়ে পরস্পরের কাছে উলঙ্গ হওয়ার আত্মচেতনাটা ভুলে গিয়েছিল। ক্রমে তারা ভাবতে শুরু করল এইটাই স্বাভাবিক। কারণ এতে তাদের কোন অন্যায়বোধ নেই। তারা ত কারো প্রতি কোন অন্যায় করছে না। বাড়িতে যে বেশী ঘর নেই সেটা ত তাদের দোষ নয়।

তবু এক একসময় যখন কোন অসতর্ক মুহূর্তে পাপপ্রবৃত্তি ঢুকে পড়ে তাদের মনে, হঠাৎ ক্যাথারিনের নগ্ন দেহগাত্রের অত্যধিক শুভ্রতা শিহরণ জাগায় এতিয়েনের দেহের মধ্যে। তখন তার মনে হয় ক্যাথারিনের দেহটার পানে কখনো তাকানো তার মোটেই উচিত হয়নি।

আবার রাত্রিবেলায় শোবার সময় ক্যাথারিনেরও মনে হয় মাঝে মাঝে, বিশেষ করে নগ্নদেহে বাতিটা নিবিয়ে দিয়ে শোবার সময় মনে হয় সে হয়ত বা কোনদিন এই সময় কোন অসতর্ক মুহূর্তে এতিয়েনের বিছানায় গিয়ে ঢুকে পড়বে।

রাত্রিতে বাতির আলোটা নিবিয়ে দেওয়ার পর ঘরখানা অন্ধকার হয়ে

গেলে এতিয়েন বেশ বুঝতে পারে ওরা সারাদিন ধরে হাড়ভাঙা খাটুনির পর এত ক্লান্ত হয়েও ওদের দুজনের কেউ ঘুমোতে পারছে না। এইভাবে এক উত্তপ্ত অতৃপ্তি মনের মধ্যে জমতে থাকায় পরের দিন ওরা সহজ হতে পারে না পরস্পরের কাছে। অনেক সময় দুজনেই মুখটা অকারণে ভার করে থাকে ; এক অজানিত কারণে রুষ্ট থাকে পরস্পরের প্রতি।

যাই হোক, ক্যাথারিনকে নিয়ে জ্বালা নেই, সমস্যা নেই। ক্যাথারিন এক রকম গা-সওয়া হয়ে গেছে এতিয়েনের। এখন এতিয়েনের সমস্যা জাঁলিনকে নিয়ে। এক বিছানায় জাঁলিনকে নিয়ে শুতে হয় তাকে। কিন্তু জাঁলিনের শোয়াটা বড় খারাপ। সে এতিয়েনের পাশে কুঁকড়ে কুণ্ডলি পাকিয়ে শোয় বলে এতিয়েনের শুতে বড় কষ্ট হয়। তবু মোটের উপর র‍্যাসেনোরের হোটেল থেকে মাহিউদের বাড়িতে তার সুবিধা অনেক। প্রথম কথা সে এখানে গাঁয়ের শ্রমিকদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পায়। দ্বিতীয়তঃ এখানে সুপটা ভাল হয়। তার উপর মেয়েদের রান্না আর আদরযত্ন তার বড় ভাল লাগে। মাসে পঁয়তাল্লিশ ফ্রাঁ দিয়ে এর থেকে ভাল খাওয়া আশা করতে পারা যায় না। অথচ এই পঁয়তাল্লিশ ফ্রাঁ পেয়ে মাহিউ পরিবার বিশেষ উপকৃত। সব মিলিয়ে তাদের এখন যা আয় তাতে কোনরকমে তাদের দুবেলা খাওয়া চলে। চলে মানে মাসের শেষে কিছু ধারও হয়। তবে মাহিউ পরিবার তার প্রতি কৃতজ্ঞতাবশতঃ তার কাপড়জামা পরিষ্কার করে দেয়। তার জামাকাপড় কোথাও ছিঁড়ে গেলে তা সেলাই বা রিপু করে দেয়।

এই সময় এতিয়েনের মনে হলো তার অনেক কিছু জানার আছে। যে সব অস্পষ্ট রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ধারণা ও ভাবনাচিন্তা গুঞ্জরিত হয়ে আসছে তার মনের মধ্যে, তার হঠাৎ খেয়াল হলো সেই ধারণা ও ভাবনা চিন্তা এখন স্পষ্ট হওয়া দরকার। এজন্য তার পড়াশুনো করা দরকার। কিন্তু এ বিষয়ে তার সাধারণ অজ্ঞতাটা প্রকট হয়ে উঠল তার কাছে। পড়াশুনো করলেই হবে না। নিয়মিত প্রচুর পরিশ্রম করে পড়তে হবে। তবে সে সেই ভাবনা চিন্তা লোকের কাছে প্রকাশ করতে পারবে জোরাল ভাষায়। এখন প্লুশার্তের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে যেতে লাগল। প্রথমে সে এক বেলজিয়ান ডাক্তারের লেখা খনিশ্রমিকদের স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে একটা বই পড়ল।

এই সময় তার মনে প্রায়ই প্রশ্ন জাগত কেন কোন কোন মানুষ ধনী আর কোন কোন মানুষ গরীব হয়? কেন তাদের মাঝে বিরাজ করে এক অনতিক্রম্য ব্যবধান? কেন গরীবরা চেষ্টা করেও ধনী হতে পারে না?

সে নিজেকে বোঝায় সঙ্গে সঙ্গে এসব প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে তাকে অনেক কিছু পড়তে হবে। এখান সেখান থেকে কিছু রাষ্ট্রীক অর্থনীতির বই যোগাড় করল এতিয়েন। কিন্তু তাতে এমন অনেক বিশেষ শব্দবাক্য আছে যা বোঝা সম্ভব হয়ে ওঠে না তার পক্ষে। তবু সে নিয়মিত পড়াশুনো করে যায়।

স্ভারিনের কাছেও সে কিছু বই ধার করে। সে কিছু নৈরাজ্যবাদীদের দ্বারা প্রকাশিত ও প্রচারিত পুস্তিকাও পড়ে। তার মাঝে মাঝে মনে হয় সে এমন এক নতুন সমাজ গড়ে তুলবে যে সমাজ শুধু কাজ আর শ্রমের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে, যেখানে অর্থ বলে কোন জিনিস থাকবে না।

আজকাল এই সব কথা ভাবতে গিয়ে মনে হয় আজ সে এ সব কথা স্পষ্ট করে ভাবতে পারছে, অথচ দুদিন আগে ভাবতে পারত না। এতিয়েন এখন আরও বুঝতে পারল এবার থেকে শুধু একটা কাঁচা অর্থহীন উত্তেজনা অনুভব করলেই হবে না। এক সুনির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতি অনুসারে কাজ করে যেতে হবে। উৎপীড়কদের কবল থেকে উৎপীড়িতদের মুক্ত করতে হবে। শুধু আবেগের সঙ্গে হা হুতাশ করলেই চলবে না।

প্রথম কয়মাস শুধু প্রচারকার্যে কাটায় এতিয়েন। গাঁয়ের লোকদের মধ্যে একটা জনমত সৃষ্টি করে চলে। শোষক উৎপীড়ক মালিকপক্ষের প্রতি তার মনে ছিল এক ঘৃণামেশানো রাগ আর অন্তরে ছিল শোষিত শ্রমিকশ্রেণীর জয় সম্পর্কে এক অস্পষ্ট আশা। সে মনে মনে ভাবল র‍্যাসেনোরের বাস্তববাদ আর স্ভারিনের ধ্বংসাত্মক নৈরাজ্যবাদের মাঝামাঝি একটা নীতি খাড়া করতে হবে। কিন্তু সে নীতি কি হবে, কিভাবে সে কাজে এগোবে তা যখন ভাবতে যেত, যখন সে সত্যি সত্যিই সমাজ পুনর্গঠনের কোন বাস্তব নীতি ও কর্মপদ্ধতি খাড়া করতে যেত তখনই তার মাথাটা ঘুরত। প্রতিদিন রাতে শোবার আগে মাহিউদের বাড়িতে আধঘণ্টা ধরে তাদের সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা হত। কিন্তু সে আলোচনা থেকে কেউ কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারত না।

পড়াশুনোর মধ্য দিয়ে যতই মার্জিত ও সূক্ষ্ম হতে থাকে এতিয়েনের মনটা ততই তার বর্তমান জীবনযাত্রা ও পরিবেশ ক্রমশই অসহ্য হয়ে ওঠে তার কাছে। তার কেবলি মনে হয় এভাবে আর চলতে পারে না। এইভাবে নোংরা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে ছেলেমেয়ে একসঙ্গে বেড়ে উঠে দুর্নীতির শিকার হয়ে উঠছে। পরস্পর পরস্পরের কাছে নগ্ন হয়ে পোষাক খুলবে, এক ঘরে শোবে, তাদের মধ্যে কোন গোপনীয়তার ব্যবধান থাকবে না—এটা কিভাবে সহ্য করা যায় দিনের পর দিন।

মাহিউ বলল, হা ভগবান! আসল কথা ত হলো টাকা। টাকা থাকলেই ত ভালভাবে থাকার ব্যবস্থা করা যায়। তাহলে আর ভাবনা কি? টাকা হলেই যত পার আরাম স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করো।

এইভাবে একে একে কথা বলে যায়। ঘরের মধ্যে বাতির আলোটা জলতে থাকে। রান্নাঘর থেকে পিঁয়াজভাজার গন্ধ আসে। এতিয়েন বুঝতে পারে না এক অন্তহীন বোঝা পিঠে করে ভারবাহী পশুর মত যুগ যুগ ধরে অসংখ্য মানুষ কি ভাবে চলবে? যে কঠোর শ্রম অতীতে একদিন কারাগারের কয়েদীদের দিয়ে করানো হত সে কাজ আজ নিরীহ নিরপরাধ অসংখ্য খনিশ্রমিককে পেটের

দায়ে করতে বাধ্য করা হচ্ছে। তাও তাতে তাদের জীবিকা নির্বাহ হচ্ছে না। তারা পেটভরে দুবেলা খেতে পাচ্ছে না। ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ছে দুবেলা খাবার জোটাতে গিয়ে। রবিবার দিন ছুটি উপভোগ করা মানে ঘরে ঘুমোন অথবা মদ খাওয়া আর স্ত্রীর গর্ভে এক একটি অবাঞ্ছিত সন্তান উৎপাদন করা। একে জীবন বলে? মোটেই না।

মাহিউর স্ত্রী বড় একটা কথা বলে না। শুনে গেলেও ওদের আলোচনায় যোগদান করে না। আজ সে বলল, সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার কি জান? কোন পরিবর্তনের আশা বা সম্ভাবনা নেই। তোমাকে একভাবে সহ্য করে যেতে হবে সমানে। ছোটবেলায় মনে হত ভবিষ্যতে একদিন সুখ আসবে। কিন্তু এইভাবে বৃথা আশা করতে করতে জীবন কেটে যায়। সুখ বা সুদিন আর আসে না। কারো প্রতি আমার কোন বিদ্বেষ নেই। তবু এই অন্যায় অবিচারের কথা ভাবতে গেলে আমি পাগল হয়ে যাই।

এর পর নীরবতা নেমে আসে ঘরের মধ্যে। সেই অস্বস্তিকর নীরবতায় সকলেই যেন তাদের সব কথা হারিয়ে ফেলে। কিন্তু বুড়ো বনিমোর যদি সে ঘরে উপস্থিত থাকে তাহলে সে অপার বিস্ময়ে তার কোটরাগত চোখদুটো কপালে তুলে কিছু না বলে পারে না। সে ওদের কণ্ঠে এই বিদ্রোহের সুর, বা ওদের মুখের এই সব প্রতিবাদের ভাষার কিছুই বুঝতে পারে না। তাদের আমলে খনিশ্রমিকরা কয়লার মধ্যে জন্মাত আর সারা জীবন ধরে অপ্রতিবাদে কয়লার মধ্যেই কাটাত। কেউ একটা কথাও বলত না কারো বিরুদ্ধে। মুখ বুজে সব সহ্য করে যেত। মোট কথা, মালিক মালিকই থাকবে। সুতরাং এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কি লাভ?

কিন্তু এতিয়েন আবার মাহিউর কথার মাথামুণ্ড কিছু খুঁজে পায় না। কোন যুক্তি নেই এ কথায়। সে বলে, এখন যুগের পরিবর্তন হচ্ছে। আগে শ্রমিকরা কিছু ভাবত না বলেই মুখ বুজে নীরবে সব সহ্য করত। কিন্তু এখন তারা নিজেদের কথা ভাবতে শিখেছে, নিজেদের প্রকৃত অবস্থার কথা বুঝতে পারছে। আগেকার দিনে খনিশ্রমিকদের খনির মধ্যেই এখনকার কয়লাবাহী ঘোড়াগুলোর মত থাকতে হত। ক্রীতদাসের মত সারাজীবন সেই অন্তহীন অন্ধকারে ভরা হিমশীতল ভূগর্ভে কাটাতে হত। তারা পৃথিবীর আলো জীবনে আর একবারও দেখতে পেত না। উপরের জগতের কোন খবরই জানতে পারত না তারা। কিন্তু এখনকার খনিশ্রমিকদের সে অবস্থা আর নেই। কিন্তু সেই হিমশীতল অন্ধকার ভূগর্ভের মধ্যে খনিশ্রমিকরা অঙ্কুরোদ্গমাকুল বীজের অদম্য সবুজ প্রাণশক্তির মত জেগে উঠতে শুরু করেছে। এক প্রচণ্ড বিদ্রোহের উদ্দামতায় মাটির সব বাধা ছিন্ন করে অঙ্কুরিত হয়ে উঠবে পৃথিবীর উপরের আলো হাওয়া এসে, পাখা মেলে দেবে মুক্ত উদার আকাশের পথে।

আজকের খনিশ্রমিকরা যে জেগে উঠেছে তা গাঁয়ের দিকে নজর দিলেই

দেখতে পাওয়া যায়। আগেকার যুগে তাদের ঠাকুরদারা পড়তে লিখতে বা নাম সই করতে পারত না। তাদের বাবারা নাম সই করতে পারত। আজকের ছেলেরা পড়তে লিখতে দুটোই পারে। সারা জীবন মানুষের ত একইভাবে চলতে পারে না। আজ খনিশ্রমিকরা নবোদ্ভূরিত ফসলের মত সত্যের তপ্ত আলোয় শুকিয়ে উঠছে ধীরে ধীরে।

এতিয়েনের কথাগুলো শুনতে শুনতে মুগ্ধ হয়ে যায় মাহিউ। কথাগুলোর মধ্যে যেন যাদু আছে। তবু সন্দেহ জাগে তার মনে। তবু সন্দেহ ঝেড়ে ফেলতে পারে না মন থেকে। তারা তাদের সব অধিকার ত এতদিন ত্যাগ করেই আসছে। আজ আবার সে অধিকারের দাবি তুলে কি হবে?

এমন সময় মাহিউর স্ত্রী হঠাৎ স্বপ্নাবিষ্টের মত বলে ওঠে, তাহলে হয়ত পুরোহিতদের কথাই সত্যি। এ জন্মে যারা গরীব থাকে পরজন্মে তারা ধনী হয়ে জন্মায়।

একথায় সকলেই হেসে উঠল। এমন কি ছেলেরাও কথাটা হেসে উড়িয়ে দিতে চাইল। আজকের যুগে তারা খনির মধ্যে ভূতপ্রেতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, তাদের ভয় করে, কিন্তু স্বর্গে কোন ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না।

মাহিউ বলল, যাঃ, পুরোহিতদের কথার কোন দাম নেই। ওরা যদি একটু কম খেত আর একটু বেশী করে কাজ করত তাহলে স্বর্গে ওদের একটু করে আসন আগে হতে নির্দিষ্ট করা থাকত।

মাহিউর স্ত্রী তার কোলের উপর হাত দুটো নামিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, হায়, তাহলে কি হবে আমাদের? তাহলে কি আমাদের কোন আশা নেই?

তারা সকলেই চুপ করে বসে একে অন্যের মুখপানে তাকাতে লাগল। বুড়ো বনিমোর থুথু ফেলতে লাগল। মাহিউর মুখে কখন পাইপের আগুনটা নিবে গেছে সে বুঝতেই পারেনি। আলজিরে বসে বসে ওদের কথা শুনছে। হেনরি আর লেনোর দুজনেই ঘুমিয়ে গেছে। ক্যাথারিন এতিয়েনের মুখপানে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। গোটা গাঁটা যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। চারদিক নিঝুম নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে শুধু এক একটা কুকুরের ডাক অথবা মাতালের রুক্ষ চিৎকার শোনা যায়।

এতিয়েন মাহিউর স্ত্রীর কথাটার জের টেনে বলে, তোমাদের মাথায় যত সব বাজে চিন্তা গজগজ করছে। সুখের জন্য কেন তোমরা ঈশ্বর বা স্বর্গের প্রত্যাশা করো? কেন তোমরা এই জগতেই সুখ অর্জন করে নিতে পার না?

কথা বলতে বলতে কেমন যেন স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে পড়ে এতিয়েন। সহসা তার মনে হয় অন্তহীন দারিদ্র্য আর গভীর হতাশায় ভরা অন্ধকার দিগন্তটা ভেদ করে আলোভরা এক অবিমিশ্র সুখের জগৎ বেরিয়েছে। নিরবচ্ছিন্ন সুখ আর সাম্যে ভরা সে জগতে শুধু একটা শ্রেণীই আছে, তা হলো শ্রমিকশ্রেণী। পুরনো

জগৎ, পুরনো সমাজ ধ্বংস হয়ে গেছে আর তার জায়গায় গড়ে উঠেছে নতুন জগৎ, নতুন সমাজ। যেখানে প্রতিটি শ্রমিক তার যোগ্যতানুসারে বেতন পাবে।

প্রথম প্রথম মাহিউর স্ত্রী এসব কথা শুনতে চাইত না। অনির্বচনীয় ভয়ে আচ্ছন্ন হয়ে থাকত তার মনটা। ভাবত এত সুখ আশা করা উচিত না। এই সুখী জগতের যতই কল্পনা করবে ততই তাদের বর্তমান জীবন ও জগৎটাকে ঘৃণ্য বলে মনে হবে। সে তাই তার স্বামীকে প্রায়ই সাবধান করে দিত, এতিয়েনের কথা শুনো না। ও রূপকথার গল্প শোনাচ্ছে। বুর্জোয়ারা কখনো আমাদের মত কাজ করবে না আর আমরাও তাদের মত হব না কখনো।

কিন্তু পরে মাহিউর স্ত্রীও সে স্বপ্নের জগতের মোহে পড়ে গেল। অফুরন্ত সুখ আর স্বপ্নে ভরা সেই মায়াময় জগতের কথা যতক্ষণ ভাবে সে ততক্ষণ এ জগৎ ও জীবনের সব দুঃখ কষ্টের কথা সম্পূর্ণ ভুলে থাকে। যে সব সুখ ও ঐশ্বর্যের বস্তু জীবনে কখনো পাবে না তারা সেই সব অপ্রাপনীয় বস্তুর কি বিরাট প্রাচুর্য সেখানে। এতিয়েনকে তাই ভাল লাগে তার। সেই মায়াময় জগতের পথপ্রদর্শক ন্যায়বিচারের মূর্ত প্রতীক এতিয়েনকেই তাদের একমাত্র আশা ভরসা বলে মনে হয়।

মাহিউ বলে, মরার আগে যেন সেই নতুন জগৎটাকে একবার দেখে যেতে পারি। তার জন্য একশো স্যু যদি দিতে হয় দেব।

এতিয়েন আবার বলতে শুরু করল, পুরনো সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে। তার জায়গায় গড়ে উঠছে সাম্যভিত্তিক নতুন সমাজ। আসবে বিশ্বশান্তি।

এতিয়েনের কথা সবাই শোনে। এমন কি আলজিরেও শুনতে শুনতে আশা করে এমন একদিন আসবে যখন তাদের কোন অভাব অনটন থাকবে না, যখন তারা ইচ্ছামত পেট ভরে অনেক কিছু খেতে পাবে, ভালভাবে থাকতে পাবে। ক্যাথারিন তার হাতের তালুর উপর মাথা রেখে বসে বসে শুনতে থাকে।

মাহিউর স্ত্রী একবার দেওয়াল ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বলে, হা ভগবান! নটা বাজে। আমরা সময়ে উঠতে পারব না।

এবার মাহিউ ও তার স্ত্রী দুজনেই উঠে দাঁড়ায় টেবিল ছেড়ে। হঠাৎ যেন তারা স্বপ্নের জগৎ থেকে কঠিন বাস্তব জগতে ফিরে আসে। তাদের নানা-রকমের অভাব অভিযোগের প্রতি তাদের এই পরিবেশের প্রতি সহসা সচেতন হয়ে ওঠে।

প্রতিদিন সন্ধ্যের সময় মাহিউদের বাড়ির লোক ছাড়া প্রতিবেশীরাও আসে। লেভাক এতিয়েনের বড় সমর্থক। পিয়েরেন আসে। তবে কোম্পানির নিন্দা করলেই সে বাড়ি চলে যায়। জ্যাকারি আসে। তবে সে রাজনীতির কথা ভালবাসে না। তার থেকে র‍্যাসেনোরের দোকানে গিয়ে

একপাত্র মদ খাওয়া ভাল বলে মনে করে। শ্যাভেল রোজ সন্ধ্যেয় এক ঘণ্টা করে মাহিউদের বাড়িতে থাকে। ওদের কথা শোনে। তবে তার আসার আসল কারণ হলো ক্যাথারিন। ক্যাথারিনের প্রতি তার আগ্রহ আগের থেকে অনেক কমে গেলেও এতিয়েন তার কাছে থাকার জন্য ক্যাথারিনকে হারাবার ভয়। ভয় হয় পাছে এতিয়েন তাকে জয় করে নেয়, তার কাছ থেকে ক্যাথারিনকে ছিনিয়ে নেয়।

এদিকে দেখতে দেখতে এতিয়েনের প্রভাব সারা গাঁয়ে ক্রমশই বেড়ে যেতে থাকে। গাঁয়ের সব লোক তাকে শ্রদ্ধা করে। যে কোন আইন বা রাজনীতির ব্যাপারে তার কাছে এসে তার পরামর্শ নেয়। গাঁয়ের মেয়েরা তার কাছে চিঠি লেখাতে আসে।

সেপ্টেম্বর মাসে প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের সব ব্যবস্থা পাকা হয়ে যায়। ফাণ্ড চালু হয়ে যায়। সে সম্পাদক নির্বাচিত হয়। এতিয়েন অন্যান্য আশপাশের খনিগুলোর শ্রমিকদেরও সমর্থন লাভ করার চেষ্টা করে।

এতিয়েনের মনের মধ্যেও এক রূপান্তর আসে। সে তার পোষাকের প্রতি সচেতন হয়ে ওঠে। সে তার লেখালেখির জন্য পাঁচজনের কাছ থেকে অল্প করে যা ফী পায় তাই জমিয়ে তাই দিয়ে কিছু ভাল পোষাক-আশাক কিনল। একজোড়া ভাল জুতো কিনল। এবার নিজেকে নেতা বলে মনে হয়।

এবার শীত যেন একটু তাড়াতাড়ি পড়ে গেল। ঘরে ঘরে সারাদিন স্টোভ আর কয়লার আগুন জ্বলে। একদিন বরফপড়া এক শীতের রাতে বিছানায় শুয়ে ঘুম আসছিল না এতিয়েনের। আজ ক্যাথারিন নিচের তলা থেকে এসে বাতিটা না নিবিয়েই শুয়ে পড়ে। বিছানায় মরার মত স্তব্ধ অসার হয়ে পড়ে ছিল ক্যাথারিন। তবু এতিয়েনের মনে হলো সে শুধু তারই কথা ভাবছে। মনে হলো ক্যাথারিন আপাতদৃষ্টিতে মরার মত স্তব্ধ অসাড় হয়ে পড়ে থাকলেও তার অন্তরের মধ্যে চলছে এক বিরাট আলোড়ন। আরো মনে হল যে তার গায়ে একবার হাত দিলেই উঠে আসবে ক্যাথারিন। কারণ এখন ঘরের সবাই ঘুমিয়ে গেছে। ক্যাথারিন যেন তাকেই সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে প্রত্যাশা করছে।

পর পর দুবার শুতে থাকতে থাকতে বিছানা থেকে ক্যাথারিনকে জড়িয়ে ধরার জন্য উঠতে গেল। কিন্তু উঠতে গিয়ে পারল না। অথচ সে বেশ বুঝতে পারল ক্যাথারিন চাইছে সে তাকে জড়িয়ে ধরুক।

কিন্তু অন্তরে যে যাই চাক বাইরে তা প্রকাশ করতে পারল না কেউ। নীরবে শুয়ে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে গেল দুজনেই। এইভাবে এক ঘণ্টা কেটে গেল। এইভাবে যতই তারা তাদের অবদমিত ইচ্ছাকে বুকে নিয়ে দুজনে পাশাপাশি শুয়ে থাকে নিথর নিস্পন্দ হয়ে ততই ওদের ব্যবধানটা বড় হয়ে ওঠে। তাদের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম গোপন ঘৃণার ভাব গড়ে ওঠে। অথচ সে ঘৃণার ভাবটার মূল কারণ কি তা ওরা কেউ বুঝতে পারল না।

৪

মাহিউ তখন বেতন আনার জন্য মঁতস্যু যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিল। তার স্ত্রী বলল, এক পাউণ্ড কফি আর এক কিলো চিনি এনো।

মাহিউ পোষাক পরতে পরতে মুখ না তুলেই বলল, ঠিক আছে, আনব। তার স্ত্রী আবার বলল, একবার কশাইখানায় গিয়ে কিছু ভীলের মাংস এনো। অনেক দিন মাংস খাওয়া হয়নি।

এবার মাহিউ অসহিষ্ণু হয়ে বলল, তুমি কি ভেবেছ আমি হাজার টাকা বেতন আনতে যাচ্ছি। কোম্পানির যে কি অবস্থা তার ঠিক নেই।

দুজনেই চুপ করে রইল। তখন অক্টোবর মাসের শেষ। শনিবার। আজ মাইনের দিন বলে কোম্পানি সব খাদে কাজ বন্ধ রেখেছে। একদিকে সাধারণ শিল্পসংকট আর অন্য দিকে কয়লার স্টক বেড়ে যাওয়ায় কোম্পানি ইচ্ছা করে যে কোন সামান্য অজুহাতে কাজ বন্ধ করে উৎপাদন কমাতে চায়। দশ হাজার খনিশ্রমিককে অলস অকর্মণ্য করে রাখতে চায়।

মাহিউর স্ত্রী বলল, এতিয়েন র‍্যাসেনোরের দোকানে অপেক্ষা করবে তোমার জন্য। তুমি তাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে। ওরা তোমায় কাজের ঘণ্টার হিসাবে ভুল করতে পারে।

মাহিউ ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। তার স্ত্রী আবার বলল, ডাক্তারকে বলবে তোমার বাবার কথা। ম্যানেজারের সঙ্গে ডাক্তারের ভাব আছে। ওকে ওরা বসিয়ে দিয়েছে।

বুড়ো বনিমোর আজ দশদিন ধরে চেয়ারে সমানে বসে আছে বাড়িতে। তার পা দুটো অসাড় হয়ে গেছে। ডাক্তার তার পায়ের জন্য তাকে কাজের অযোগ্য বলে ঘোষণা করেছে। কিন্তু বনিমোর গর্জন করে উঠল। বলল, ওরা বললেই হলো। পা দুটো খারাপ হলেই মানুষ অযোগ্য হয়ে যাবে কাজের? আমি এখনো কাজ করতে পারি।

মাহিউর স্ত্রী বলল, এইভাবে চললে আমরা সবাই মরে যাব।

মাহিউ বলল, মরে গেলে আর ক্ষিদে লাগবে না। কেউ খেতে চাইবে না।

জুতোর উপর একটা পেরেক পিটিয়ে নিয়ে চলে গেল। দুশো চল্লিশ নম্বর এই গাঁয়ের শ্রমিকরা চারটের পর বেতন পাবে। তাই শ্রমিকরা একটু দেরি করে যাবে। তাদের স্ত্রীরা তাদের মাইনে পেয়ে যাতে সোজা বাড়ি চলে আসে, মদের দোকানে আড্ডা না মারে তার জন্য বারবার তাদের উপদেশ দিচ্ছে। অনেক স্ত্রী আবার কিছু জিনিস কেনার ভার দিচ্ছে।

এতিয়েন র‍্যাসেনোরের দোকানেই ছিল। সে একটা গুজব শুনেছিল। কিন্তু আসল ব্যাপারটা কি তা ঠিক কেউ বলতে পারেনি। একজন এসে বলল, ক্যাশিয়ারের অফিসের সামনে কোম্পানি একটা নোটিশ টাঙিয়ে দিয়েছে। গুজব

শোনা যাচ্ছে কোম্পানি কাঠের ঠেকা দেওয়ার ব্যাপারে শ্রমিকদের উপর অসন্তুষ্ট। তারা শ্রমিকদের জরিমানার বোঝা চাপিয়ে শাস্তি দিতে চায়। বিভিন্ন লোক বিভিন্ন ধরনের কথা বললেও এতিয়েন বুঝতে পারল কোম্পানি যাই হোক একটা কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সুভারিন দোকানেই ছিল। এতিয়েন সুভারিনের টেবিলে চলে গেল। তার মতামত চাইল এ ব্যাপারে। সুভারিন বলল, আসল কথা কোম্পানি সংকটে পড়েছে। অনেক কারখানা অচল হয়ে পড়ে আছে। ফলে সেই সব কারখানার জন্য যত কয়লা লাগত তা আর লাগছে না। ফলে কোম্পানির বিক্রি অনেক কমে গেছে। স্টক বেড়ে গেছে। কয়লা স্তূপাকৃত হয়ে পড়ে থাকছে। ফলে কোম্পানি খরচ কমাতে চাইছে। অন্য কোন পথ না পেয়ে তারা শ্রমিকদের উপর দিয়েই কার্যসিদ্ধি করতে চায়। কাজ বন্ধ করে বা তাদের বেতন কেটে তারা খরচ কমাতে চায়। সুতরাং শ্রমিকদের মরতেই হবে। কিন্তু কারখানা বা খনির মালিকরা একেবারে তাদের প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিতে পারছে না, কারণ তাহলে যন্ত্রপাতি সব খারাপ ও বিকল হয়ে যাবে। তার উপর প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড গঠন দেখে ওরা বিরক্ত হয়ে উঠেছে।

এতিয়েন ও র‍্যাসেনোর দুজনেই সুভারিনের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। দোকানঘরে তখন মাদাম র‍্যাসেনোর ছাড়া আর কেউ ছিল না। তাই সুভারিন প্রাণ খুলে কথা বলে যেতে পারছিল। র‍্যাসেনোর বলল, কি হাস্যাস্পদ ব্যাপার। যদি একান্তই ধর্মঘট হয় তাহলে তাতে মালিক বা শ্রমিক কোন পক্ষই লাভবান হবে না। তোমরা যদি একসঙ্গেই সব কিছু চাও তাহলে কোন কিছুই পাবে না।

তার স্ত্রী কথাটা শুনে বলল, তুমি তাহলে ধর্মঘটের বিরুদ্ধে?

র‍্যাসেনোর বলল, হ্যাঁ, তাই।

তার স্ত্রী বলল, তুমি বললেই ত হবে না। ওদের বলতে দাও।

এতিয়েন এবার মাথাটা তুলে বলতে শুরু করল। সে বলতে লাগল, আমার বন্ধু যা যা বলেছে তা সব ঠিক। ধর্মঘট যদি আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় জোর করে তাহলে আমারা তা মেনে নেব কি না আমাদের তা স্থির করতে হবে। প্লুশার্ত একটা চিঠি দিয়েছেন। উনিও ধর্মঘট চান না। কারণ তাতে কোন পক্ষেরই কিছু লাভ হবে না। এর একমাত্র ফল শ্রমিকরা নিজের পাওনা-গণ্ডার প্রতি সচেতন হয়ে উঠতে পারে।

মঁতসুর খনিশ্রমিকদের হাবভাব দেখে প্লুশার্ত রেগে গেছে। হতাশ হয়েছে। ভেবেছিল ধর্মঘটের ভয়ে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে কোম্পানির সঙ্গে লড়াই করার চেষ্টা করবে।

এতিয়েন বলল, অবশ্য আমি প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের জন্যই বেশী চেষ্টা করেছি। কোম্পানি আমাকে সেদিন ডেকেছিল। ওরা বাধা দিতে চায় না, শুধু এ ফাণ্ড

ওরা নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। যেদিকেই যাও, কোম্পানির সঙ্গে বিরোধ বাধবেই।

র‍্যাসেনোর এখন ধর্মঘট চায় না। মনেপ্রাণে শ্রমিকদের ভাল সে চায় না। তার কারণ সে ভোরোর শ্রমিকরা তার দোকানে মদ খেতে আসে না। তার সঙ্গে পরামর্শ করতেও আসে না। সুতরাং তারা মরে মরুক।

এতিয়েন শ্রমিকদের জন্য যে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড গড়ে তুলেছে তাতে খুব একটা বেশী টাকা জমেনি। সুভারিন বলে, এই টাকা ফুরিয়ে গেলেই শ্রমিকরা আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থায় যোগ দেবে। তাহলে অন্য সব দেশের শ্রমিকরা তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে।

র‍্যাসেনোর এক সময় জিজ্ঞাসা করল এতিয়েনকে, কত টাকা জমেছে?

এতিয়েন বলল, তিন হাজার ফ্রাঁর মত।

র‍্যাসেনোর ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে বলল, মাত্র তিন হাজার? এতে কি হবে? এতে শ্রমিকদের ছয় দিনের রুটিও হবে না। আর বিদেশীদের সাহায্য? তার উপর নির্ভর করলে তোমাদের শুয়ে শুয়ে নিজেদের জিবগুলো খেতে হবে। ধর্মঘটের সিদ্ধান্তটা হবে এক বিরাট বোকামি। ইংল্যাণ্ডের লোকেরা তোমাদের কথা মোটেই ভাববে না।

আজ প্রথম এতিয়েন আর র‍্যাসেনোরের মধ্যে কথা কাটাকাটি হলো। সাধারণতঃ ওরা এতদিন পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে বিতর্কে একমত হয়ে এসেছে।

এতিয়েন একবার সুভারিনকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি বল?

সুভারিন তার স্বাভাবিক উন্নাসিকতার সঙ্গে বলল, ধর্মঘট? তার থেকে সব কিছু ভেঙ্গে দাও, ধ্বংস করে দাও।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ করে রইল। এতিয়েন রেগে গিয়েছিল মনে মনে। সুভারিন আবার বলল, ধর্মঘটে যদি তোমরা মজা পাও তাহলে আমি নিষেধ করব না তাতে। তবে জেনে রেখো ধর্মঘট কিছু লোকের কিছু ক্ষতি করে ঠিক, তবে বেশীর ভাগ লোককে ধ্বংস করে। এই ধর্মঘটের পদ্ধতি অবলম্বন করে পৃথিবীকে বদলাতে এক হাজার বছর লাগবে সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন করতে। তার থেকে যে কারাগারে তোমরা মরছ তিলে তিলে সেই গোটা কারাগারটাকে উড়িয়ে দিচ্ছ না কেন?

সুভারিন তার হাতটা দরজার দিকে নাড়ল। খোলা দরজা দিয়ে সে ভোরোর খাদের অফিস বাড়িগুলো দেখা যাচ্ছিল। এমন সময় তার পোল্যাণ্ড খরগোসটা ছুটে এসে ঘরে ঢুকল। সে একবার বাইরে যেতে কতকগুলো ছেলে ঢেলা ছুঁড়ছিল তার দিকে। তাই পোল্যাণ্ড দারুণ ভয় পেয়ে কানদুটো নামিয়ে আর লেজটা উপরদিকে তুলে ছুটে এসে সুভারিনের পায়ে আঁচড় কাটতে লাগল। সুভারিন যাতে তাকে কোলে তুলে নেয় তার জন্য আবেদন জানাল। সুভারিন তাকে তুলে নিয়ে তার পিঠের নরম লোমে হাত বোলাতে লাগল। এইভাবে সুভারিন যখন তার পোল্যাণ্ডের গায়ের নরম লোমে হাত বোলায়

তখন কেমন যেন এক দিবাস্বপ্নের আবেশে তার চোখ দুটো বন্ধ হয়ে আসে।

ঠিক এই সময় মাহিউ এসে পড়ল। মাদাম র‍্যাসেনোর একপাত্র মদ খাবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল। কিন্তু মাহিউ খেল না। কিন্তু মাদাম র‍্যাসেনোরের রকম দেখে মনে হচ্ছিল সে যেন বিনা পয়সায় মদ খাবার জন্য অনুরোধ করছে। অথচ মাদাম র‍্যাসেনোর অন্যান্য খরিদ্দারের মত মাহিউকেও কিছু মদ বিক্রি করতে চাইছিল।

মাহিউ আসতেই এতিয়েন উঠে পড়ল। ওরা দুজনে মঁতস্যু চলে গেল।

মাইনের দিন মঁতস্যুতে মেলা বসে রবিবারের মত। ফেরিওয়ালাদের ভিড় দেখা যায় পথের ধারে। তবে কাফে ও মদের দোকানগুলোই এদিন লাভবান হয় বেশী। কারণ বেশীর ভাগ শ্রমিকই মাইনে পাবার সঙ্গে সঙ্গে মদের দোকানে চলে যায়। তবে কিছু লোক মাইনে নিয়ে সোজা বাড়ি চলে যায় ভলকানে না গিয়ে।

মাহিউ ও এতিয়েন ক্যাশিয়ারের অফিসে যাবার পথে দেখল অন্যান্য মাইনের দিনের মত আজ অবস্থাটা শান্ত বা স্বাভাবিক নেই। আজ শ্রমিকদের মধ্যে এক স্পষ্ট অসন্তোষ ও বিক্ষোভ দেখা যাচ্ছে। তাদের মধ্যে অনেকে ঘুঁষি পাকিয়ে গালাগালি দিচ্ছে কোম্পানিকে।

পিকেত্তের সামনে শ্যাভেলকে দেখতে পেয়ে মাহিউ তাকে জিজ্ঞাসা করল, কোম্পানি তাহলে অবশেষে আমাদের উপর সেই নোংরা আঘাতটা হানল।

শ্যাভেল কিন্তু কথাটার কোন উত্তর দিল না। শুধু রাগে গর্জন করতে করতে এতিয়েনের পানে কটাক্ষপাত করল।

আজকাল শ্যাভেল ক্যাথারিনের ব্যাপারে এতিয়েনকে ঈর্ষা করে। এতিয়েনের জন্যই সে মাহিউর টিম ছেড়ে অন্য টিমে যোগ দিয়েছে। ক্যাথারিনকে আজকাল সে সন্দেহের চোখে দেখে। দেখা হলেই তাকে বলে, তুই ঐ লোকটার কাছে রাত্রিতে শুস। ও আবার নিজেকে নেতা বানিয়েছে। গাঁয়ের লোক ওর পা চাটে। আজকাল শ্যাভেল তাই ক্যাথারিনকে রেলিকার্তে কাঠের গাদায় নিয়ে যায় না। দেখা হলেই নোংরা ভাষায় গালাগালি দেয়। তারপর অবশ্য তাকে জড়িয়ে ধরে আবেগের সঙ্গে চুম্বন করতে থাকে বারবার।

মাহিউ শ্যাভেলকে আবার জিজ্ঞাসা করল, এবার বোধ হয় লে ভোরোর পালা?

শ্যাভেল মাথা নেড়ে চলে গেল।

ক্যাশিয়ারের সামনে ওরা গিয়ে দেখল বাইরে বেঞ্চটায় পাঁচ ছয় জন লোক বসে রয়েছে। একজন টুপী হাতে মাইনে নিচ্ছে। বেঞ্চটার বাঁ দিকে ধোঁয়ায় কালো হয়ে যাওয়া দেওয়ালটার উপর একটা হলদে কাগজে ছাপা নোটিশ চিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। অনেকে নোটিশ দেখেও পড়তে পারছিল না। অনেকে আবার পড়তে পারলেও বুঝতে পারছিল না।

মাহিউ এতিয়েনকে বলল, পড়ে শুনিয়ে দাও। এতিয়েন পড়তে লাগল : সব খাদের শ্রমিকদের অবগতির জন্য কোম্পানি এক নোটিশ দিয়েছে। শ্রমিক-দের অবগতির জন্য জানানো হয়েছে, শ্রমিকরা আজকাল কাঠের ঠেকা দেওয়ার কাজে মোটেই মন দেয় না ; কোম্পানি তাদের উপর কোন জরিমানা বসাতে চায় না, কারণ তাতে কোন ফল হয় না। তাই কোম্পানি ঠিক করেছে তাদের বেতনব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করবে। তাদের কাঠের কাজের জন্য আলাদা টাকা দেওয়া হবে। কত কিউবিক মিটার কাঠ ব্যবহার করা হয়েছে সেই অনুসারে কাঠের কাজের পারিশ্রমিক দেওয়া হবে। আর কয়লার প্রতি টবের জন্য পঞ্চাশ সেন্তিমের পরিবর্তে চল্লিশ সেন্তিমে করে দেওয়া হবে। তবে দেখা হবে কয়লা কাটা ও তোলা আর কাঠের কাজ সব মিলিয়ে যা দেওয়া হবে তা যেন পুরাতন বেতনের সমান হয়। এই নতুন বেতন ব্যবস্থা ১লা ডিসেম্বর সোমবার থেকে চালু করা হবে।

এতিয়েন জোরে জোরে নোটিশটা পড়ছিল। ক্যাশিয়ার বলল, আস্তে পড়। আমি কথা শুনতে পাচ্ছি না। দলে দলে লোক এসে নোটিশটা পড়ে যাচ্ছিল। ওরা বলাবলি করতে লাগল কোম্পানি অন্যায় করেছে ওদের উপর। কাঠের কাজ ওরা যতই করুক তাতে দশ সেন্তিমের কাজ হবে না, হবে জোর আট সেন্তিমে। তাছাড়া ভাল করে কাঠের কাজ করতে হলে সময় বেশী লাগবে। তাতে কয়লা কম উঠবে। সুতরাং স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে কোম্পানি তাদের বেতন কমিয়ে দিচ্ছে। শ্রমিকদের পকেট মেরে কোম্পানি খরচ কমাচ্ছে।

মাহিউ বলল, হা ভগবান। এটা মেনে নিলে ত আমরা বোকামি করব।

এবার সে ক্যাশিয়ারের জানালায় এগিয়ে গেল। টিমের প্রধান অর্থাৎ কনট্রাকটারের হাতে প্রথমে মোট টাকাটা তুলে দেয় ক্যাশিয়ার। কনট্রাকটার তারপর টাকাটা তার টিমের অধীনস্থ লোকদের মধ্যে ভাগ করে দেয়। ক্যাশিয়ারের কেরাণী হাঁক দিল, মাহিউ আর টিম, ফিলোমিনের টিম, সাত নম্বর মুখ। মোট একশো পঞ্চান্ন ফ্রাঁ।

মাহিউ ক্যাশিয়ারকে বলল, মাপ করবেন স্যার, কোন ভুল হয়নি ত?

ক্যাশিয়ার তাকে টাকাটা দিলেও মাহিউ তা হাতে করে তুলে নিচ্ছিল না। মাহিউ অবশ্য এবার বেশি টাকা আশা করেনি, তবু এত কম ভাবতে পারেনি। এর থেকে জ্যাকারি এতিয়েন আর শ্যাভেলের বদলে যে লোকটা ঢুকেছে তাকে ভাগ করে দিলে কি থাকবে তার ? যা থাকবে সেটা তাদের তিনজনের অর্থাৎ তার নিজের, ক্যাথারিন আর জ্যাঁলিনের।

ক্যাশিয়ার বলল, না, না, কোন ভুল হয়নি। পনের দিনের মধ্যে দুটো রবিবার আর চারটে কাজবন্ধের দিন বাদ দিলে মোট ছয় দিনের বেতন পাও।

কেরাণী আবার বলল, তার উপর কুড়ি ফ্রাঁ জরিমানা কাটা হয়েছে।

এবার মাহিউ হিসাব করে দেখল ঠিক হয়েছে। কিন্তু তখনো তাকে কাউন্টারের সামনে ভাবতে দেখে ক্যাশিয়ার বলল, না নেবে ত বল। অন্য লোক অপেক্ষা করছে।

মাহিউ কম্পিত হাতে টাকাটা তুলে নিতেই কেরাণী বলল, তোমার নাম তুর্স্যাঁ মাহিউ ত? তোমাকে সেক্রেটারি ডেকেছেন। তুমি তাঁর ঘরে যাও।

সেক্রেটারি মাহিউকে তার বাবা বনিমোরের কথা বলল। বলল, তার বয়স এখন আটান্ন: সে পঞ্চাশ বছর কাজ করে আসছে। তাই কোম্পানি ঠিক করেছে তাকে দেড়শো ফ্রাঁ বৃত্তিসহ অবসর দেবে। সেক্রেটারি তাকে আরো বলল, সে যেন রাজনীতি না করে। তার ঘরে যে থাকে সে রাজনীতি করে। মাহিউ যেন তার মতে না চলে। প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের কথাটাও তুলল সেক্রেটারি।

মাহিউ বাইরে এল। এতিয়েন তার জন্য বাইরে দাঁড়িয়েছিল। মাহিউ বলল, যা মাইনে দিল তাতে রুটির দামও হবে না। তার উপর আবার অপমান। আমি একটা কাপুরুষ, তাই ওকে কোন কথা শোনাতে পারলাম না। তবে শোন, তোমার উপর ও খড়্গহস্ত। ও বলছে গোটা গাটা বিষিয়ে যাচ্ছে। বোধ হয় ঠিকই বলছে। আমরা কি করব এখন? তোমার কাছে মাথা নত করে তোমাকে ধন্যবাদ দেব?

এতিয়েন ভাবছিল গম্ভীর হয়ে। কোন কথা বলল না। মাহিউও আর কোন কথা বলল না। ওরা দুজনেই বাড়ির পথে এগিয়ে চলল। পথের ধারে দলে দলে শ্রমিকরা জটলা পাকিয়ে বেতন কাটার কথা, নোটিশের কথা আলোচনা করছিল। কথাটা মুখে মুখে উড়ে বেড়াচ্ছিল যেন। বেতনের দিন এমন এক ব্যাপক বিক্ষোভের বন্যা বয়ে যেতে এর আগে দেখেনি কেউ। অনেকের চিৎকার করতে করতে গলাটা এমনভাবে শুকিয়ে গেল যে তা মদের দোকানে গিয়ে ভিজিয়ে নিতে অনেক টাকা খরচ হয়ে গেল।

বাড়িতে এসে টেবিলের উপর পঞ্চাশ ফ্রাঁ রেখে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল মাহিউ। এতিয়েন হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মাহিউর স্ত্রী ছেলেদের ঘরেই ছিল। মাহিউকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে সে কফি, চিনি, আর ভীলের মাংসের কথাটা তুলেছিল। কিন্তু তার উত্তরে মাহিউ এইভাবে কাঁদতে থাকায় তার স্ত্রীও কাঁদতে লাগল। ছেলেরাও সব কাঁদতে লাগল ফুঁপিয়ে।

ওদিকে গোটা গাঁখানার এই একই অবস্থা। স্বামীরা মাইনে নিয়ে ঘরে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে তাদের স্ত্রীরা মাইনের টাকাটা নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে তা হাতে ধরে একে অন্যকে দেখাচ্ছে। সবাই বলছে একই কথা। বলছে, এতে কি হবে। এতে পনের দিনের রুটির দামই হবে না। আমাদের পোষাকগুলো পর্যন্ত বিক্রি করতে হবে।

মাদাম লেভাক সবচেয়ে বেশী চিৎকার করছিল। কারণ তার মাতাল স্বামী

মাইনের টাকা নিয়ে এখনো বাড়ি আসেনি। হয়ত মদের দোকানেই সব খরচ করে আসবে। গাঁয়ের মধ্যে একমাত্র পিয়েরেনরাই চুপ করে ছিল। ওরা কিভাবে সংসার চালায়, কিভাবে ডেপুটির বইয়ে পিয়েরেনের হাজরের সংখ্যা বেড়ে যায়, তা কেউ বুঝতে পারে না। মা ব্রুল বলল, আজ সকালে সে দেখেছে ম্যানেজারের গাড়িতে তার ঝি চাকর মার্সিয়েনে গেছে মাছ কিনতে।

একথা শুনে মেয়েরা আরো রেগে উঠল। বলল, শ্রমিকরা খেতে পাচ্ছে না আর বাবুরা মাছ খাচ্ছে। তবে তারা আর বেশীদিন তা খেতে পাবে না, শ্রমিকদের দিন আসবেই। আর ঠিক এই সময় ওদের মাথায় এতিয়েনের শেখানো কথাটা এসে গেল। এতিয়েন সুখ শান্তি সাম্য আর সমৃদ্ধিতে ভরা যে জগতের ছবি তুলে ধরেছিল ওদের সামনে সেই ছবিটা যেন ভাসতে লাগল ওদের চোখের সামনে। সেই প্রতিশ্রুত উন্নতি আর সমৃদ্ধির জন্য হাঁপিয়ে ওঠে ওদের সমস্ত মনপ্রাণ। ওরা অধৈর্য হয়ে এই মুহূর্তেই তা কামনা করে বসে।

সেই রাত্রিতেই র‍্যাসেনোরের দোকানে বসে শ্রমিকরা ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নিল। র‍্যাসেনোর এবার কোন বাধা দিল না। সুভারিন এটা বিপদের পথে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে সমর্থন করল। এতিয়েন বলল, কোম্পানি যদি ধর্মঘট চায় তাহলে তারা তা পাবেই।

৫

একটা সপ্তাহ কেটে গেল। কাজও ঠিক চলতে লাগল। তবু চারদিকে কেমন যেন থমথমে ভাব। মালিক শ্রমিকদের মধ্যে এক আসন্ন দ্বন্দ্বের আভাসের সঙ্গে সঙ্গে বিষাদ নেমে আসে সারা খনি অঞ্চলে।

এর পরের পক্ষকালেও মাহিউদের পরিবারে তেমনি টাকার টানাটানি চলতে লাগল। তার উপর একদিন ক্যাথারিনের কাজ বন্ধ হয়ে গেল। কারণ আগের দিন সন্ধ্যে থেকে বাড়ি ফেরেনি সে। সারারাত কাটিয়ে সেদিন সকালে বাড়ি ফিরে কান্নাকাটি করতে লাগল ক্যাথারিন। বলল, শ্যাভেল তাকে আটকে রেখেছিল জোর করে। আজকাল এতিয়েনের প্রতি ঈর্ষায় পাগল হয়ে উঠেছে সে। তাকে মারধোর পর্যন্ত করেছে। বলেছে সে নাকি এতিয়েনের বিছানায় শোয়। তার বাবা মা নাকি তাকে এতিয়েনের বিছানায় তুলে দেয়।

মাহিউর স্ত্রী শুনে বলল, শ্যাভেলের এত বড় সাহস। তুই ওর কাছে আর যাস না। আমি নিজে গিয়ে ওর কানটা আচ্ছা করে মলে দিয়ে আসব।

তবু ক্যাথারিন বেশী কিছু করতে সাহস পেল না শ্যাভেলের সঙ্গে। যতই হোক সে তাকে ভালবাসে। সে যা কিছু করে তার ভালবাসার বশেই করে।

বিপদের উপর বিপদ। জ্যাঁলিন আবার একদিন খনিতে কাজ করতে গিয়ে বেবার্ত আর লিডিকে নিয়ে পালিয়ে যায়। জলাশয় থেকে পানিফল তুলে

তা বিক্রি করে। জ্যাঁলিনকে তাই সকলের সামনে অপমান করে তার মা।

সেদিন সকালে কাজে যায়নি জ্যাঁলিন। তার মা বলল, আর যদি কোন দিন সে এই কাজ করে তাহলে সে তার গায়ের চামড়া টেনে ছাড়িয়ে নেবে।

মাহিউর টিম যেখানে কাজ করছিল সেখানে কাজ করা ক্রমশই কঠিন হয়ে উঠছিল। মুখটা খুব সরু হয়ে উঠেছিল। তার উপর জল খুব বেশী আসছিল। তারপর উপর থেকে ছাদ ধ্বসে যাওয়ার ভয় হচ্ছিল ওদের। ওরা বেশ বুঝতে পারছিল কাঠের ঠেকা দেওয়ার কাজ ঠিকমত হয়নি। আজ তাই মাহিউ তিনবার কাঠের ঠেকা দেওয়া করিয়েছে।

তখন বেলা আড়াইটে বাজে। আর আধ ঘণ্টা হলেই ওদের কাজ বন্ধ হবে। এমন সময় বজ্রগর্জনের এক বিকট শব্দে চমকে উঠল ওরা। মাহিউ চিৎকার করে বলে উঠল, কি ব্যাপার? ওদের মনে হলো ওদের পিছনে গোটা খনির ছাদটা ধসে গিয়ে ওদের রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে। ল্যাম্প হাতে সবাই ছোটাছুটি করতে লাগল। কোন বিপদ ঘটলে ওরা সাহায্য করবে ওদের শ্রমিক ভাইকে।

অবশেষে আসল কারণটা জানতে পারল তারা। খাদের মধ্যে যেখানে ঘোড়ায় কয়লার গাড়ি টেনে নিয়ে যায় সেইখানে ছাদ থেকে খুব জোরে জল পড়ছিল। সেখানে একটা লোক বাড়ি ফিরে যাবার পথে উপরে তাকিয়ে কাঠের ঠেকার কাজটা দেখছিল। এমন সময় খুব জোর শব্দে ছাদ থেকে একটা ধস নেমে পড়ে সেই লোকটা আর একটা ছেলের মাথায়। চারদিক থেকে খনি শ্রমিকরা ল্যাম্প হাতে ছোটাছুটি করতে করতে এসে হাজির হলো। ওরা এসে দেখল মাথার উপর ছাদের প্রায় বারো মিটার জায়গা জুড়ে ধস নেমেছে। পাথরের চাপের সঙ্গে সঙ্গে অনেক ধুলো ঝরে পড়েছিল। সে ধুলোয় চারদিকের সুড়ঙ্গ পথগুলো আরো বেশী অন্ধকার দেখাচ্ছিল।

এমন সময় ওয়াগন থেকে ছুটে এসে বেবার্ত হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, জ্যাঁলিন চাপা পড়েছে। ওকে বার করো।

পাথরের স্তূপের মধ্যে কে চাপা পড়েছে তা কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না। শুধু এক অস্ফুট আর্তনাদ কানে আসছিল। কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে 'ভগবান যীশুখৃস্ট' বলে চিৎকার করে উঠল। অনেকে তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগল। চার দিকে প্রায় পঞ্চাশ জন শ্রমিক জড়ো হয়েছিল। তারা গাঁইতি কোদাল প্রভৃতি যা যন্ত্রপাতি ছিল তাই দিয়ে পাথরের স্তূপ সরাতে শুরু করে দিল। তারা বার বার হেঁকে বলল, কে চাপা পড়েছ বল। কিন্তু একটা অস্ফুট আর্তনাদ ছাড়া আর কিছু শোনা গেল না। ওদিক থেকে ক্যাথারিন জ্যাকারি লেভাক শ্যাভেল সবাই এসে গেল। সবাই একযোগে তাড়াহুড়ো করে পাথরের বড় বড় চাইগুলো কেটে কেটে সরাতে লাগল। ডেপুটি রিকোমি এসে গেল। রিকোমি বলল, এখন এঞ্জিনীয়ার বা ওভারম্যান কেউ নেই। আমি একা কি করব? যাই হোক, তোমরা নিজেরাই এগুলো সরিয়ে ফেলে দেখ ভিতরে কে আছে।

সহকর্মীর প্রতি সমবেদনার তাড়নায় শ্রমিকরা কয়েক ঘণ্টার কাজ মাত্র আধ ঘণ্টার মধ্যে করে ফেলল। সকলের গা ঘেমে গিয়েছিল। আর্তনাদটা ক্ষীণ হতে হতে একেবারে নীরব হয়ে গেল। পাথর খণ্ডগুলো সরাতে সরাতে প্রথমে একটা লোকের পা দেখতে পেল। তারপর তার মুখ দেখে চিনল, লোকটা শিকত। দেহটা অসাড় নিস্পন্দ হলেও হয়ত এখনো কিছুটা তাপ আছে। কিন্তু জাঁলিন কোথায়। এরপর জাঁলিনের খোঁজ পড়ল। খাদের সেই অস্বস্তিকর অন্ধকারে হিমশীতল মৃত্যুর স্পর্শে শিউরে উঠল ওরা।

ডেপুটি হুকুম দিল শিকতের দেহটাকে কাপড়ে জড়িয়ে একটা টবে তুলে দাও।

তখন বেলা চারটে বাজে। মাহিউ এক কঠিন সংকল্পের মত্ততায় দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পাথর সরাচ্ছিল। অনেকে তাকে নিষেধ করলেও সে শুনছিল না। সে ভাবল জাঁলিন আর বেঁচে নেই।

অবশেষে আর কিছুক্ষণ খুঁড়তেই জাঁলিনকে পাওয়া গেল। তারও কোন চেতনা নেই, তবে তার নিয়মিত শ্বাসপ্রশ্বাস পড়ছিল অর্থাৎ সে বেঁচে আছে। তার পা দুটো ভেঙ্গে গেছে। মাহিউ সঙ্গে সঙ্গে তাকে কোলে করে অন্য একটা টবের উপর চাপাল।

দুটো টবের উপর দুটো ল্যাম্প তুলে দেওয়া হল। ল্যাম্পের লাল আলো দুটো লাল নক্ষত্রের মত দেখাচ্ছিল। টব দুটোর পিছনে খনি শ্রমিকরা এক বিষণ্ণ নীরব শোভাযাত্রায় ধীর গতিতে এগিয়ে গেল পিট-বটম অর্থাৎ উপরে ওঠার ডুলির কাছে।

পিট বটমে ওরা পৌছতেই নিগ্রেন আর ডানসার্ত এসে হাজির হলো। এঞ্জিনীয়ার নিগ্রেন এসেই বকাবকি শুরু করে দিল। বলল, আমি কতবার বলেছি ছাদে ঠিকমত ঠেকা দেওয়া হচ্ছে না। অথচ আমার কথায় কর্ণপাত করা হয়নি। এবার কে গেল!

ডেপুটি রিকোমি বলল, শিকত নামে এক শ্রমিক। খুব ভাল কর্মী।

নিগ্রেন বলল, তোমাদের নিজেদের দোষে তোমরা মরবে আর কোম্পানিকে তার জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

রিকোমি ওদের ওঠার ব্যবস্থা আগে থেকেই করে রেখেছিল। দুটো ডুলির একটাতে দুটো টব চাপানো হলো। জাঁলিনকে মাহিউ ধরে বসল আর শিকতের মৃতদেহটা ধরে রইল এতিয়েন। অন্য ডুলিটাতে অন্যান্য শ্রমিকরা চাপল।

দু মিনিটের মধ্যে ডুলি উপরে উঠে এল। ডেপুটির ঘরে আহতদের নিয়ে যাওয়া হলো। সে ঘরে মাহিউ আর এতিয়েন ছাড়া আর কাউকে ঢুকতে দেওয়া হলো না। খনির ডাক্তার ভাঁদার হাঘেনকে ডেকে পাঠানো হলো।

ডাক্তার এসে আহতদের পরীক্ষা করে বললেন, শিকত একেবারে মৃত। তবে জাঁলিন বেঁচে গেছে। ওর মুখ, মাথা, বুক সব ঠিক আছে। শুধু পা

ছুটো গেছে, এ্যাম্পুট করতে হবে।

পরে গরম জলে ওর কালিমাখা গা হাত ধুয়ে দিতে আহত স্থানগুলো ভাল করে পরীক্ষা করে দেখা গেল। ডাক্তার ভাল করে দেখে বলল, তুটো পায়ের তুটো জায়গার হাড় ভেঙে গেছে। তবে ডান পাটা একেবারে গেছে। ওটা এ্যাম্পুট করতে হবে।

জঁালিন তখনো মূৰ্ছিত অবস্থায় আর্তনাদ করছিল। মাহিউ কাঁদছিল। ডাক্তার তাকে সাহস দিয়ে বললেন, কাঁদবার কিছু নেই। তোমার ছেলে বেঁচে গেছে। এখন ওকে বাড়িতে নিয়ে চল। সেখান থেকেই যা কিছু করার করা হবে।

জঁালিনকে একটা স্ট্রেচারে চাপানো হলো। আর শিকতের মৃতদেহটাকে একটা ভ্যানে চাপানো হলো। এইভাবে একটি ভ্যান আর স্ট্রেচারের পিছু পিছু তুশো চল্লিশ নম্বর গাঁয়ের খনিশ্রমিকরা এক বিরাট তুঃসংবাদের বোঝা বহন করে বাড়ি ফিরল।

ক্যাথারিনকে আগে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। সে আগে গিয়ে তার মাকে বুঝিয়ে বলে শান্ত করে রাখবে। কিন্তু ক্যাথারিন বাড়ি পৌছবার আগেই ভ্যান দেখে তুঃসংবাদের আভাস পেয়ে বাড়ি থেকে সব মেয়েরা বেরিয়ে এসেছে রাস্তায়। মাহিউর স্ত্রী ভেবেছিল তার স্বামীর কিছু হয়েছে। পরে দেখল তার স্বামী স্ট্রেচারের পিছু পিছু আসছে। ভ্যানটা চলে গেল শিকতের বাড়ির দিকে। বাড়িতে তার স্ত্রী আর তিনটে ছেলেমেয়ে আছে।

জঁালিনকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হলে মাহিউর স্ত্রী চিৎকার করে বলতে লাগল, ওরা আমার ছেলেকে এবার পঙ্গু করে দিল। হা ভগবান, তুটো পা-ই গেল।

ডাক্তার ভাঁদার হাঘেন জঁালিনের পা ব্যাণ্ডেজ করতে এসে বলল, তুমি এখন নিচে যাও।

তবু চিৎকার করল মাহিউর স্ত্রী। আলজিরে, হেনরি, লেনোর সবাই কাঁদতে লাগল।

তখন অন্ধকার ঘন হয়ে উঠেছে। শিকতের মৃতদেহটার উপরে তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা কান্নায় ভেঙে পড়েছে। এক বিষাদময় স্তব্ধতা বিরাজ করছে সারা গাঁয়ে। কোম্পানি অবশ্য জঁালিনকে কাজ করতে করতে আহত হওয়ায় তাকে পঞ্চাশ ফ্রাঁ ক্ষতিপূরণ দিতে রাজী হয়েছে। সে সেরে উঠলে কোম্পানি তাকে খাদের উপরে কোন হালকা কাজে নিযুক্ত করবে।

এই তুর্ঘটনার পরেই প্রবল জ্বরে পড়ে গেল মাহিউ।

দেখতে দেখতে তিন সপ্তা কেটে গেল। সেদিন সন্ধ্যার সময় এতিয়েন ওদের স্মরণ করিয়ে দিল ১লা ডিসেম্বর আসতে আর দেরি নেই। কোম্পানি এখনো সমানে ভয় দেখিয়ে যাচ্ছে। তারা মতের কোন পরিবর্তন করেনি।

তারা তাদের এই সিদ্ধান্তের পরিবর্তন না করলে ধর্মঘট হবেই।

কথা বলতে বলতে রাত বাড়ল। কিন্তু ক্যাথারিন এখনো বাড়ি ঢুকল না। ওরা ভাবল সে শ্যাভেলের সঙ্গে কোথাও ফূর্তি করছে। কিন্তু রাত বেশী হলে ওরা সবাই খেয়ে শুয়ে পড়ল।

ওরা ভেবেছিল শ্যাভেলের ঘরে রাত্রিবাস করে পরদিন সকালেই চলে আসবে ক্যাথারিন। কিন্তু পরদিন সকালে অনেক বেলা হলেও বাড়ি এল না অথবা কাজে গেল না ক্যাথারিন। বিকালের দিকে খোঁজখবর নিয়ে মাহিউরা জানতে পারল শ্যাভেল তার ঘরে রেখে দিয়েছে ক্যাথারিনকে। ক্যাথারিন আর কখনো আসবে না তার বাপের বাড়িতে। পাছে কোন নিন্দা বা সমালোচনা সহ্য করতে হয় এই ভয়ে লে ভোরোর কাজ ছেড়ে দিয়ে মঁসিয়ে দেহুলিনের খাদে কাজ নিয়েছে শ্যাভেল। তবে বাসাটা তার সেই পিকেত্তের বাড়িতেই আছে।

কাজ থেকে এতিয়েন বাড়ি ফিরলে তাকে মাহিউর স্ত্রী যত সব দুঃখের কথা শোনাতে লাগল। বলল, এত অকৃতজ্ঞতা! এর পর আর কোন মার সন্তান ধারণ করা উচিত হবে না তার গর্ভে। আমরাও ত একদিন মেয়ে ছিলাম। বাবা মা বিয়ে দিয়েছে তবে বিয়ে করেছি। যতদিন পেরেছি তাদের সাহায্য করেছি। তারপর যখন তারা বলেছে তখন স্বামীর ঘর করতে গেছি। আর এই মেয়ের কাণ্ড দেখ। মেয়ে রোজ সন্ধ্যের সময় বেড়াতে যাবে। তখনই বুঝেছি কিছু একটা ঘটবে। তাও আমি কোনদিন তার মতের বিরোধিতা করিনি। তাকে কোন বাধা দিইনি। তবু তার এই প্রতিদান।

ছেলেমেয়েগুলো স্তব্ধ হয়ে বসে রইল ঘরের ভিতর। মাহিউর স্ত্রী তাদের দুঃখের একটা ফিরিস্তি দিয়ে চলল। প্রথমে জ্যাকারি বিয়ে করে চলে গেল। তারপর বুড়ো বনিমোর পায়ের সব শক্তি হারিয়ে বাড়িতে বসে রইল। তার পর একটা শক্ত সমর্থ ছেলে দুটো পা হারিয়ে বিছানা নিল। এরপর রোজগেরে মেয়ে চলে গেল বাড়ি থেকে স্বামীর ঘর করতে। ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল গোটা সংসারটা। এবার শুধু একটামাত্র লোক রোজগার করে সাতজনকে খাওয়াবে। এতগুলি লোকের পেট ভরাবে।

সব কিছু শুনে স্বপ্নাবিষ্টের মত এক অদৃশ্য অনাগত ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে বলল, হ্যাঁ সময় হয়ে গেছে। আর দেরি নেই।

চতুর্থ খণ্ড

১

সেদিন ছিল সোমবার। হানিবোর বাড়িতে দারুণ ধুম। সেদিন গ্রেগরিদের বাড়ির সবাইকে লাঞ্চের জন্য নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। সেদিন গ্রেগরিদের মেয়ে সিসিলের স্বাস্থ্যপান করবে ওরা। ঐদিন পল নিগ্রেন গ্রেগরিদের পরিবারের সকলকে বাড়ির কাছাকাছি সেন্ট টমাস খনিটা ঘুরিয়ে দেখাবে। এই সব কিছুর আসল উদ্দেশ্য কিন্তু পল আর সিসিলের বিয়েটা ত্বরান্বিত করা। মাদাম হানিবো তাই চান।

অথচ ঐদিন অর্থাৎ সোমবার ভোর চারটে হতেই লে ভোরোর খনিশ্রমিকরা ধর্মঘট শুরু করল। অথচ ১লা ডিসেম্বর যখন কোম্পানির নতুন বেতনব্যবস্থা চালু হয় তখন শ্রমিকরা কোন প্রতিবাদ করেনি। এরপর তারা এই নতুন ব্যবস্থা অনুসারেই বেতন নেয়, এবং তখন ম্যানেজার থেকে শুরু করে প্রতিটি ছোট কর্মচারি পর্যন্ত সকলেই ধরে নেয় শ্রমিকরা এ ব্যবস্থা নির্বিবাদে মেনে নিয়েছে। শ্রমিকরা তাদের এই ধর্মঘট অর্থাৎ কোম্পানির সঙ্গে চরম যুদ্ধঘোষণার এই সিদ্ধান্তটা এমনভাবে গোপন রেখেছিল যে কেউ আগে থেকে টের পায়নি এবং এমন ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে যে একযোগে আশপাশের প্রায় সব খনির শ্রমিকরাই ধর্মঘটে যোগ দেয়।

সকাল পাঁচটা বাজতেই ডানসার্ত গিয়ে ম্যানেজার হানিবোকে ওঠায় ঘুম থেকে। বলল, লে ভোরোর একটা শ্রমিকও কাজে যায়নি। দুশো চল্লিশ নম্বর গাঁয়ের সব লোক এখন ঘুমোচ্ছে। তাদের সব ঘরের দরজা জানালা বন্ধ।

ম্যানেজার হানিবো ঘুম থেকে উঠে খবরটা শুনেই হতবুদ্ধি হয়ে গেল। প্রতি পনের মিনিট অন্তর খবর আসতে লাগল। প্রথমে সে ভেবেছিল শুধু লে ভোরোর শ্রমিকরা ধর্মঘট করেছে। কিন্তু পরে খবর এল মিরৌ, ক্রেভিসোর প্রভৃতি খনিতেও ধর্মঘট চলছে। লা ভিকেতোরি আর ক্যাস্তেলের খনিতে শুধু ঘোড়ার সহিসরা যোগ দিয়েছে। একমাত্র সেন্ট টমাস খনিতে মোটেই ধর্মঘট হয়নি।

হানিবোর হঠাৎ মনে পড়ল গ্রেগরিদের নিমন্ত্রণের কথাটা। ওদের লাঞ্চের নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। একবার ভাবল এইমাত্র লোক পাঠিয়ে ওদের জানিয়ে দেয় ব্যাপারটা। আবার কি মনে হলো তার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করতে গেল।

মাদাম হানিবো কথাটা শুনে বলল, খনিতে ধর্মঘট হয়েছে ত কি হয়েছে? তাবলে আমরা খাব না? তাছাড়া রান্না হয়েছে। লাঞ্চের খাবার সব তৈরি।

হানিবো বলল, কিন্তু আজ খনিতে দেখাতে নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না।

মাদাম হানিবো বলল, বরং খনি দেখানোর ব্যাপারটা অবস্থা বুঝে স্থগিত রাখা যেতে পারে। পরে দেখা যাক কি হয়।

একজন ঝি মাথার চুল বিন্যাস করে দিচ্ছিল। ঝি চলে গেলে মাদাম হানিবো বলল, তুমি জান কেন আমি এটা চাই। আর তুমিও নিশ্চয় তোমাদের কারখানায় শ্রমিক ধর্মঘটের থেকে এই বিয়ের ব্যাপারে বেশী আগ্রহী হবে।

মাদাম হানিবোর অনাবৃত গ্রীবাদেশের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে গোপন কামনার এক ভীরু শিহরণ খেলে গেল মঁসিয়ে হানিবোর মধ্যে। তার মুখের উপর সব সময় ফুটে থাকা এক কঠোর কর্তব্যপরায়ণতার ফাঁকে ফাঁকে তার অশান্ত ভগ্ন হৃদয়ের এক সকরুণ বেদনা উঁকি মারছিল। মাদাম হানিবোর যৌবন পার হয়ে গেছে অনেক আগেই। তবু সোনার ফসলভরা শরতের মাঠের মত তার দেহের এক নিটোল পূর্ণতা আজও কামনা জাগায় পুরুষের মধ্যে। মঁসিয়ে হানিবোর ইচ্ছা হলো এখনি সে মাদাম হানিবোর দেহটাকে জড়িয়ে ধরে তার স্ফীত বুকের বিশাল স্তনযুগলের মাঝখানে তার মাথাটা গুঁজে দেয়। একজন বিলাসপ্রিয় মহিলার বিচিত্র ঐশ্বর্যসম্ভারে পূর্ণ এই উষ্ণ আরামঘন ঘরখানার নীরব নির্জন অবকাশে তীব্র হয়ে উঠল তার কামনা। তবু নিজেকে সামলে নিল মঁসিয়ে হানিবো। কারণ আজ হতে দশ বছর ধরে ওরা পৃথক ঘরে পৃথক বিছানায় শুয়ে আসছে। স্বামী স্ত্রীতে সহবাসই যখন নেই, দেহমনের মিল যখন নেই, তখন মুহূর্তের জন্য জোর করে দেহটা চেপে ধরে এক পাশবিক মত্ততার আবেগকে প্রশ্রয় দিয়ে কি লাভ?

মঁসিয়ে হানিবো হচ্ছে আর্জেনে অঞ্চলের লোক। ছেলেবেলায় বাবা মারা যায়। প্রথম জীবনে খুব কষ্ট করতে হয়। কপর্দকহীন অবস্থায় প্যারিসের পথে পথে ঘুরে বেড়াতে হয় একদিন। পরে অতি কষ্টে মাইনিং এঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে গ্রাঁস কুম্বের অন্তর্গত সেন্ট বার্নে খনিতে কাজ নিয়ে চলে যায়। তখন তার বয়স চব্বিশ। এর তিন বছর পর পাস দ্য ক্যালের অন্তর্গত মার্লে খনিতে ডিভিসনাল এঞ্জিনীয়ারের পদ পায়। এখানে থাকতেই কোন এক সুতাকলের মালিক এক ধনী ব্যবসায়ীর মেয়ে মাদাম হানিবোর সঙ্গে বিয়ে হয় তার। ধনী বাপেরা তাদের মেয়েদের জন্য খনি এঞ্জিনীয়ারদের বেশী পছন্দ করে।

পাস দ্য ক্যালের এই মফঃস্বল শহরে পনের বছর সপরিবারে বাস করে মঁসিয়ে হানিবো। বড় বৈচিত্র্যহীন একঘেঁয়ে সে জীবন। সে বৈচিত্র্যহীনতা কাটাবার জন্য কোন ঘটনাই ঘটেনি, এমন কি একটা সন্তানেরও জন্ম হয়নি। মাদাম হানিবো ছোট থেকে শুধু টাকা আর বিলাসদ্রব্য ছাড়া আর কিছুকে মূল্য দিতে শেখেনি। সে তার স্বামীকে ঘৃণা করত। কারণ সে তার স্বামীর রোজগারকে যথেষ্ট বলে মনে করত না। দ্বিতীয়তঃ তার মত উগ্রকামা বলিষ্ঠ চেহারার নারীর দেহের সঙ্গে মঁসিয়ে হানিবোর চেহারাটা মোটেই খাপ খায়নি।

যে দেহগত সংগতি ও তৃপ্তি স্বামী স্ত্রীর সব ব্যবধানকে অবলুপ্ত করে দিয়ে শান্তি আনে দাম্পত্য জীবনে সে দেহসঙ্গতি ঘটেনি তাদের জীবনে। মঁসিয়ে হানিবোর অজ্ঞাতসারে তার মনোমত এক মানুষকে বেছে নেয় মাদাম হানিবো। তারপর হঠাৎ পাস দ্য ক্যালে ছেড়ে প্যারিসে চলে যায় মঁসিয়ে হানিবো। খনির কাজ ছেড়ে সরকারী অফিসে সেক্রেটারির চাকরি নেয়। মফঃস্বল শহর ছেড়ে প্যারিসের মত বিরাট শহরে এসে আরো বেশী বিলাসপ্রিয় হয়ে ওঠে মাদাম হানিবো। বিলাসপ্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে আরো বেড়ে যায় তার অতৃপ্ত অদম্য প্রেমাবেগ। এবার প্রকাশ্যে একটি লোকের সঙ্গে তার প্রেমিক হিসাবে মেলামেশা করত মাদাম হানিবো। এবার এ ব্যাপারটা তার স্বামীর অজানা ছিল না। কিন্তু সব কিছু দেখে শুনেও স্ত্রীকে কিছু বলতে পারেনি মঁসিয়ে হানিবো। একই সঙ্গে অদম্য, প্রশান্ত ও কুণ্ঠাহীন যে আবেগের সঙ্গে তার সামনে ব্যভিচার করে যেত তার স্ত্রী সে আবেগের প্রচণ্ড বলিষ্ঠতার সামনে দাঁড়াবার সাহস পেত না মঁসিয়ে হানিবো। ভাবত তুচ্ছ তৃণের মত ভেসে যাবে সে। কিন্তু মাদাম হানিবোর সেই একান্তপ্রার্থিত প্রেমিক তাকে ছেড়ে চলে যায়। বিচ্ছেদের বেদনায় মুহ্যমান হয়ে পড়ে মাদাম হানিবো। আর ঠিক এই সময়ে মঁতস্য খনিতে ম্যানেজারের পদ নিয়ে চলে আসে মঁসিয়ে হানিবো। ভাবে নতুন অঞ্চলে এলে স্থান পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার মনেরও পরিবর্তন হবে।

আবার সেই বৈচিত্র্যহীন একঘেঁয়েমি যা তাদের প্রথম বিবাহিত জীবনে ক্যালেতে ভোগ করতে হয়েছিল। প্রথম প্রথম এখানকার উদার অবারিত গ্রাম্য প্রকৃতির নির্জন পরিবেশে কিছুটা শান্তি পেয়েছিল মাদাম হানিবো। ম্যানেজারের বাসার মধ্যে তার ঘরখানাকে মনের মত সাজাবার কাজে আত্ম-নিয়োগ করে দামী গালিচা, পর্দা, সৌখীন আসবাবপত্র ও কারুকার্যখচিত নানা রকম জিনিস দিয়ে ঘরখানাকে সাজিয়ে কিছুটা তৃপ্তি পায়। কিন্তু কিছুদিন পরেই জায়গাটাকে খারাপ লাগতে লাগল মাদাম হানিবোর। এখানে দিগন্ত জোড়া ফাঁকা মাঠগুলোর যেন শেষ নেই, তার মাঝে একটা গাছ পর্যন্ত নেই। শ্রমিকদের বস্তীগুলো ভয়ংকর, তাকানো যায় না। মানুষগুলো বিরক্তিকর। তার স্বামীর কাছে প্রায়ই অভিযোগ করতে থাকে মাদাম হানিবো, বাৎসরিক চল্লিশ হাজার মাইনের লোভে সে তার স্ত্রীকে নির্বাসনদণ্ড ভোগ করাচ্ছে এই বাজে জায়গাটায় নিয়ে এসে। সব আশা ভরসা ত্যাগ করে নিজেকে মৃতপ্রায় বলে মনে করে মাদাম হানিবো। ভাবে আশাহীন আনন্দহীন এ জীবনে আর কখনো কোন পরিবর্তন আসবে না।

এসব গঞ্জনা নীরবে সহ্য করে যায় মঁসিয়ে হানিবো। তবু তার আপাত-শান্ত ও আপাত-নীরব, কঠোর ও কর্তব্যপরায়ণ জীবনের অন্তরালে একটা কামনা এক অদম্য নিষ্ঠুরতায় আঁচড় কাটতে থাকে তার বুকের ভিতরে। মাঝে মাঝে

ভাবে সে শুধু তার স্ত্রীর স্বামীই হয়েছে লোকচক্ষে, তার প্রেমিক বা প্রিয়জন হতে পারেনি কখনো। স্বামী হিসাবে তার স্ত্রীর প্রেমহীন প্রীতিহীন দেহটাকে জড়িয়ে ধরেছে ঠিক, কিন্তু তার মনের ভালবাসাকে জয় করতে পারেনি কোন দিন। এসব সত্ত্বেও আজকাল রোজ সকালে তার মনে হয় আজ রাতে হয়ত সে তার স্ত্রীর মন পাবে, তার দেহমন একই সঙ্গে জয় করবে, কিন্তু তার স্ত্রীর মুখপানে তাকাতে তার প্রতি অব্যক্ত অথচ সুস্পষ্ট যে ঘৃণার ভাব ফুটে উঠতে থাকে তার স্ত্রীর মুখে চোখে তা দেখে তাকে আর স্পর্শ করতে মন চায় না। এক শান্তশীতল ঔদাসীন্যে ভরা তার স্বাভাবিক আচরণের অন্তরালে তার ভগ্ন হৃদয়ের এক আশাহত বেদনা নীরবে গুমরে মরে। এইভাবে ছ মাস কেটে গেলে যখন মাদাম হানিবোর হাতে আর কোন কাজ রইল না তখন আরো বেশী করে হতাশ হয়ে তার তথাকথিত নির্বাসিত জীবনের নিবিড়তম ক্লান্তিতে ঢলে পড়ল নূতন করে। তার স্বামীকে বলল, সে তাকে এখানে তিলে তিলে হত্যা করার জন্যই এনেছে।

এমন সময় মঁতসুতে এসে হাজির হলো পল নিগ্রেন। নিগ্রেনের বিধবা মা থাকত এ্যাডিগলনে। তার যথাসর্বস্ব খুইয়ে ছেলেকে পলিটেকনিক স্কুলে পাঠায়। সেখান থেকে খুব কম নম্বর পেয়ে পাশ করে নিগ্রেন। তখন তার কাকা মঁসিয়ে হানিবো তাকে মঁতসু খনির এঞ্জিনীয়ারের পদে চাকরি দিয়ে একটা সুযোগ দান করে। ঠিক হয় পল তাদের বাসাতেই থাকবে।

প্রথম কয়মাস মাদাম হানিবো কাকিমা হিসাবে স্নেহশীলা অভিভাবিকার মতই আচরণ করে। নিগ্রেনকে নানারকম উপদেশ দেয়। তার খাওয়া থাকার সব বিষয়ে বিশেষ যত্ন নেয়।

কিন্তু ক্রমে মাদাম হানিবোর খেয়াল হলো পল নিগ্রেনের বয়স কম হলেও যৌবনের উত্তপ্ত উদ্দামতা আছে তার দেহে। আর মনের দিক থেকে সে নিজেকে মৃতপ্রায় ভাবলেও তার সুস্থ সবল নারীদেহ এক বুভুক্ষিত উগ্রতায় আজও সজাগ হয়ে আছে। বাঁচার প্রবৃত্তি আজও দুর্মর হয়ে আছে সে দেহে। সন্ধ্যের দিকে নিগ্রেনের সঙ্গে গল্প করতে করতে প্রায়ই প্রেমের কথা তুলত মাদাম হানিবো। মেয়ে-প্রেমিকদের নিয়ে ঠাট্টা করত। কিন্তু নিগ্রেন প্রেম সম্বন্ধে তার দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলত। কিন্তু একথা ভাল লাগত না মাদাম হানিবোর। সে চাইত কাঁচা রসিকতার কথা।

একদিন সন্ধ্যেবেলায় হঠাৎ নিগ্রেন দেখল মাদাম হানিবো তাকে জড়িয়ে ধরেছে। মাদাম হানিবো অবশ্য বলল, তার মধ্যে প্যার প্রেম বলে কোন পদার্থ নেই; সে শুধু বন্ধুভাবে তাকে আলিঙ্গন করেছে। এমন একটা ভাব দেখাল যাতে মনে হবে সে যেন নিছক দয়া করে তার দেহটাকে তুলে দিতে চাইছে নিগ্রেনের হাতে। যাই হোক, এইভাবে এক দেহসংস্পর্শ গড়ে উঠল দুজনের মধ্যে। মাদাম হানিবোর কামনার নির্বাপিতপ্রায় স্তিমিত দীপ–

শিখাটা আবার জ্বলে উঠল।

রোজ রাতে মাদাম হানিবো আর নিগ্রেনের মধ্যে নিয়মিত দেহসংসর্গ ঘটলেও নিগ্রেনের বিয়ের জন্য চেষ্টা করতে লাগল মাদাম হানিবো। নিজের করায়ত্ত শিকারের বস্তু ও প্রেমাস্পদকে অপরের হাতে তুলে দিয়ে ত্যাগের শহীদ হতে চায় লোকচক্ষে।

দুবছর এইভাবে কেটে গেল। একদিন গভীর রাতে মঁসিয়ে হানিবোর মনে হলো কে যেন খালি পায়ে নিঃশব্দ পদক্ষেপে তার শোবার ঘরের সামনে দিয়ে মাদাম হানিবোর ঘরের দিকে চলে গেল। অথচ বাড়িতে পল নিগ্রেন ছাড়া দ্বিতীয় কোন পুরুষ নেই। এর আগে মাদাম হানিবো ইচ্ছামত যখন যাকে খুশি প্রেমিক হিসাবে গ্রহণ করে তার অবৈধ কামনা বাসনাকে চরিতার্থ করেছে। সে কিছুই বলেনি। সব কিছু জেনেশুনেও কোন প্রতিবাদ করেনি। নির্বিবাদে সব সহ্য করেছে। কিন্তু এবার অসহ্য ঠেকল তার কাছে। যে তাদের নিকট আত্মীয়, যার সঙ্গে তার স্ত্রীর মাতাপুত্রের সম্পর্ক, তার সঙ্গে নির্লজ্জ ভাবে প্রেমসম্পর্ক স্থাপন করার সাহস কোথা হতে পায় সে?

কিন্তু মঁসিয়ে হানিবোকে আশ্চর্য করে দিয়ে পরদিন সকালেই পল নিগ্রেনের বিয়ের কথাটা তুলল মাদাম হানিবো। বলল, গ্রেগরিদের মেয়ে সিসিলকে তার পছন্দ। ওর সঙ্গে পলের বিয়ের ব্যবস্থা করো।

এই সব কথা মনে করতে করতে মঁসিয়ে হানিবো স্ত্রীর উপরতলার ঘর থেকে নিচে নামতেই নিগ্রেনকে বাইরে থেকে আসতে দেখতে পেল। ধর্মঘটটা যেন এক মজার ব্যাপার তার কাছে।

নিগ্রেন বলল, আমি গাঁটা ঘুরে এলাম। এখন অনেকটা নত হয়েছে।··· তবে ওরা এক প্রতিনিধিদল পাঠাবে আপনার কাছে।

এমন সময় মাদাম হানিবো উপর থেকে ডাকতেই উপরে চলে গেল নিগ্রেন। মাদাম হানিবো পলকে ডেকে বলল, ওরা ত বেশ সুখেই আছে, তবে কেন ধর্মঘট করতে গেল?

মঁসিয়ে হানিবোর সব কথা শোনা হলো না। সে তার অফিসে এসে বসল।

গ্রেগরিরা এল বেলা এগারোটার সময়। সোজা ঘোড়ার গাড়ি থেকে নেমে মঁসিয়ে হানিবোর বৈঠকখানা ঘরে ঢুকতেই ঘরের পর্দাগুলো বন্ধ করে দিল মঁসিয়ে হানিবো। বৈঠকখানাটা রাস্তার উপরে।

হানিবো গ্রেগরিদের বলল, আপনারা কিছু শোনেননি?

ধর্মঘটের কথা শুনে মঁসিয়ে গ্রেগরি নাক সিটকে কাঁধ বাঁকিয়ে তুচ্ছভাবে উড়িয়ে দিল কথাটা। বলল, আসলে লোকগুলো নিরীহ শান্তিপ্রিয়। সব ঠিক হয়ে যাবে।

মাদাম গ্রেগরি স্বামীকে সমর্থন করল। কারণ খনিশ্রমিকদের যুগান্তব্যাপী নম্রনত আনুগত্য আর কুণ্ঠাহীন বশ্যতায় কোন সন্দেহ নেই তার। সিসিল

ভাবল, ভাল হলো। সে খনিশ্রমিকদের বস্তীতে এই সুযোগে গিয়ে তার দান-সামগ্রী বিতরণ করতে পারবে।

এমন সময় মাদাম হানিবো নিগ্রেলকে সঙ্গে করে ঘরে এসে ঢুকল। বলল, এরা যেন একটা দিন ধর্মঘটের জন্য অপেক্ষা করতে পারল না। আজ পল আপনাদের সেণ্ট টমাস খনিটা দেখাতে নিয়ে যেতে পারবে না।

মঁসিয়ে গ্রেগরি বলল, ঠিক আছে। আমরা বাড়িতেই বসে থাকব।

নিগ্রেন সিসিল আর তার মাকে অভ্যর্থনা জানাল। মাদাম হানিবো নিগ্রেনকে ইশারা করে সিসিলের সঙ্গে কথাবার্তা বলার জন্য নির্দেশ দিল। ওরা তখন দুজনে আলাপ করতে লাগল ঘন হয়ে বসে।

হঠাৎ পাশের খনির মালিক মঁসিয়ে দেহুলিন এসে হাজির হলো। ধর্মঘটের খবর পেয়ে ঘোড়ায় চেপে ব্যস্ত হয়ে জানতে এসেছে ব্যাপারটা কি। মঁসিয়ে হানিবোকে বলল, আমার খনিতে শ্রমিকরা অবশ্য কাজ করছে। তবে ধর্মঘটের ব্যাপারটা ত ছোঁয়াচে। কাজ বন্ধ হতে কতক্ষণ।

হানিবোদের চাকর খাবার ঘরের দরজাটা খুলতেই সব আয়োজন দেখা গেল। মঁসিয়ে হানিবো তখন বাধ্য হয়ে দেহুলিনকে লাঞ্চে আমন্ত্রণ জানাল। দেহুলিনও কোন আপত্তি না জানিয়ে রাজী হয়ে গেল।

মঁসিয়ে হানিবো জানালার পর্দাগুলো টেনে দিল। বলল, শ্রমিকরা যাতে এ সব না দেখে ফেলে তার ব্যবস্থা করা উচিত। আমরা অতিথিদের প্রীতিভোজে আপ্যায়িত করছি এটা ওদের না দেখানোই ভাল।

মাদাম হানিবো আজ কালো সিল্কের পোষাক পরেছিল। তাকে চমৎকার মানিয়েছিল। মঁসিয়ে দেহুলিন সৌজন্যমূলকভাবে মাথাটা নত করল। এতক্ষণ তাঁর সঙ্গে কথা না বলার জন্য ক্ষমা চাইল।

মাদাম হানিবো সবাইকে খাবার টেবিলে বসিয়ে দিল। নিগ্রেনকে বসাল সিসিল আর তার বাবার মাঝখানে। মাদাম হানিবো সবাই খেতে শুরু করলে বলল, আজ ভেবেছিলাম মার্সিয়েনের বাজারে মাছ আনতে পাঠাব আমাদের রাঁধুনিকে। কিন্তু ও ভয়ে যেতে চাইল না। বলল, ধর্মঘটি শ্রমিকরা নাকি ঢেলা ছুঁড়বে।

সকলে হাসতে লাগল জোরে। মঁসিয়ে হানিবো সাবধান করে দিল। আজকের দিনে বেশী জোরে হাসা ঠিক হবে না।

মাদাম হানিবো বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, জোরে হাস। ওরা এখানে কেউ শুনতে আসেনি।

মঁসিয়ে গ্রেগরির মতে কয়েক বছরের মধ্যে প্রচুর কলকারখানা বেড়ে গেছে। মানুষের হাতে টাকা এসেছে। তাই শ্রমিকদের এত অহঙ্কার।

মঁসিয়ে হানিবো পোষণ করে ভিন্ন মত। তার মতে চারদিকের কলকারখানা বন্ধ হতে থাকায় আমরা কয়লা বিক্রি করতে পারছি না। আমাদের

স্টক বেড়ে যাচ্ছে। ফলে আমরা দর কমাতে বাধ্য হচ্ছি কিন্তু দর কমাতে হলে তার ক্ষতি পূরণ করার জন্য উৎপাদন বাড়াতে হয়। কিন্তু তা না করে আমরা শ্রমিকদের বেতন কাটছি। কাজেই ওরা একথা বলবেই। কেন ওরা বারবার এই বেতন কমানোর নীতি সহ্য করবে?

মঁসিয়ে হানিবোর এই সরল স্বীকৃতি মঁসিয়ে গ্রেগরির পছন্দ হলো না। কোম্পানির ত্রুটি বিচ্যুতি এখন খোলাখুলি স্বীকার করা ঠিক নয়।

মেয়েরা এই সব নীরস ব্যবসাগত ব্যাপারের আলোচনা পছন্দ করল না।

এমন সময় চাকর এসে দরজার কাছে দাঁড়াল। মনে হলো সে কিছু বলবে। মঁসিয়ে হানিবো তাকে জিজ্ঞাসা করতেই সে বলল, ডানসার্ত দেখা করতে চায়। তবে আপনাদের খাওয়ার পর।

মঁসিয়ে হানিবো ডানসার্তকে ডেকে পাঠাল। সে এখনি সব বলতে চায়।

ডানসার্ত এসে অনেকটা দূরে দাঁড়াল। সে খবর এনেছে। সে গাঁটা ঘুরে এসেছে এইমাত্র। গাঁটা একেবারে চুপচাপ। তবে ওরা এক প্রতিনিধিদল পাঠাবে এখনই আপনার কাছে।

মঁসিয়ে হানিবো বলল, ঠিক আছে। ওরা আসুক। আমি সারাদিন ও রাত ধরে ঘটনার বিবরণ চাই।

ডানসার্ত চলে গেলে ওরা আবার রসিকতা শুরু করল।

খাওয়ার পর মঁসিয়ে হানিবো চিঠিপত্রগুলো খুলে দেখতে লাগল। চিঠি ঘাঁটতে ঘাঁটতে পিয়েরেনের একটা চিঠি দেখতে পেল। পিয়েরেন লিখেছে, তার ধর্মঘটে যোগ দেবার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। শ্রমিকদের দ্বারা লাঞ্ছিত হবার ভয়েই সে বাধ্য হয়েছে ধর্মঘটে যোগ দিতে।

হানিবো বলল, অথচ ওরাই চায় কাজ করার স্বাধীনতা।

ধর্মঘটের কথাটা আবার উঠল। মঁসিয়ে হানিবো বলল, আমরা এর আগে ওদের দৌড় অনেক দেখেছি। হয় এক সপ্তা, না হয় বড় জোর এক পক্ষকাল। মদের দোকানে বা এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াবে কুঁড়ে হয়ে। তারপর ক্ষুধার যন্ত্রণা অসহ্য হয়ে উঠলেই ফিরে আসবে। কাজে যোগ দিতে বাধ্য হবে।

মঁসিয়ে দেনুলিন অসম্মতি জানাল মাথা নেড়ে। বলল, এবার আমি তা মনে করি না। কারণ এবার ওদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে টাকা আছে।

মঁসিয়ে হানিবো বলল, টাকা বলতে ত মাত্র তিন হাজার ফ্রাঁ। তাতে কতদিন চলবে? আমার মনে হয় এতিয়েন বলে এক শ্রমিক ওদের নেতা। লোকটা কাজের লোক। যোগ্য লোক। তবু র‍্যাসেনোরের মতই ওকে ছাটাই করতে হবে। র‍্যাসেনোর এখন মদের দোকান করেছে। মদের সঙ্গে শ্রমিকদের মনে অসন্তোষের বিষ ঢুকিয়ে দিচ্ছে।

মঁসিয়ে হানিবো ধর্মঘটের জন্য ভয় করছিল না। তার একমাত্র ভয় কোম্পানির মালিকপক্ষকে। মালিকপক্ষ পাছে তাকে দায়ী করে বসে এই ধর্ম-

ঘটের জন্য এই ভয় সে মন থেকে দূর করতে পারছিল না। কারণ আজকাল মালিকপক্ষ তার উপর খুব একটা সন্তুষ্ট নেই।

মেয়েরাও একমত হতে পারছিল না ধর্মঘটি শ্রমিকদের ব্যাপারে। মাদাম গ্রেগরি বলল, শ্রমিকরা সত্যিই বড় গরীব। এই ধর্মঘটের ফলে ওদের ক্ষুধায় মরতে হবে। কিন্তু মাদাম হানিবো ভাবে অন্য কথা। সে বলল, ওরা ত বেশ সুখে আছে। ওদের বাড়িভাড়া লাগে না। কয়লা বা জ্বালানির দাম লাগে না। ডাক্তার বা ওষুধপত্রের জন্যও পয়সা লাগে না। ওরা ত আরামে আছে।

নিগ্রেন শ্রমিকদের প্রতি কঠোর ব্যবহার করলেও সে নিজেকে একজন প্রজাতন্ত্রবাদে বিশ্বাসী হিসাবে মনে করে। সিসিলকে বিয়ে করতে তার কোন আপত্তি নেই যদি তার কাকিমা তা চায়। তবে খুব একটা আগ্রহও নেই।

সে বলল, আমার কাকার মত আমি অবশ্য আশাবাদী নই। আমার মতে এই ধর্মঘট নিয়ে অনেক গোলমাল হবে। আমার অনুরোধ মঁসিয়ে গ্রেগরি, আপনি পাওলেনের বাড়িটার দিকে নজর রাখুন।

ধর্মঘটি শ্রমিকরা আপনার বাড়ি লুট করতে পারে।

মঁসিয়ে গ্রেগরি বলল, আমার বাড়ি লুট করবে? কেন আমি কি করেছি?

নিগ্রেন বলল, কেন, আপনি কোম্পানির অংশীদার। আপনি নিজে কোন পরিশ্রম করেন না। অপরের শ্রমের উপর বেঁচে থাকেন। বিপ্লব সফল হলে আপনাকে আপনার সম্পত্তির জন্য কৈফিয়ৎ দিতে হবে। ওরা বলবে এটা অপহৃত সম্পত্তি।

সব হাসি মিলিয়ে গেল মঁসিয়ে গ্রেগরির মুখ থেকে। আমতা আমতা করে বলল, অপহৃত সম্পত্তি? আমার প্রপিতামহ মাথার ঘাম পায়ে ফেলে টাকা রোজগার করে সেই টাকা গচ্ছিত রাখেন। আমিও আমার সব টাকা গচ্ছিত রাখি। এখন দেখছি ভুল করেছি। কত ঝুঁকি নিয়েছি আমরা।

মাদাম হানিবো লক্ষ্য করল সিসিল ও তার মার মুখ মলিন হয়ে গেছে ভয়ে। সে তাই তাদের সাহস দেবার জন্য বলল, পল ঠাট্টা করছিল। এতে ভয়ের কিছু নেই।

মঁসিয়ে গ্রেগরি বলল, আমরা মিতব্যয়ী। কোন অন্যায় করি না। কিন্তু কত অংশীদার, কত লর্ড ও মন্ত্রী টাকা নিয়ে কত বাজে খরচ করে, কত ফুর্তি করে।

মঁসিয়ে গ্রেগরি নিজেকে উদারনীতিবাদী বলে ঘোষণা করল। দেনুলিন চায় শক্ত সরকার। সম্রাট বড় নরমপন্থী।

মঁসিয়ে দেনুলিন বিপ্লব সম্বন্ধে কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু মেয়েরা সে প্রসঙ্গটা পাল্টে তার মেয়েদের কথা জিজ্ঞাসা করল।

মঁসিয়ে হানিবো অতিথিদের কথা একরকম ভুলে গিয়ে চিঠিপত্র ঘাঁটছিল। সে দেখল প্যারিস থেকে বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের চিঠি এসেছে। তাঁদেরই

নির্দেশ অনুসারে ধর্মঘটের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

দেমুলিন মঁসিয়ে হানিবোকে জিজ্ঞাসা করল, এখন কি করবে?

মঁসিয়ে হানিবো আনমনে বলল, দেখা যাক, কি হয়।

দেমুলিন বলল, তোমরা শক্ত হতে পার, তোমাদের লড়ার ক্ষমতা আছে। কিন্তু আমি যথাসর্বস্ব খুইয়ে খনিকে আধুনিক যন্ত্রপাতিতে সজ্জিত করে তুলেছি। উৎপাদন খুব বেশী দরকার আমার। উৎপাদন বন্ধ হলেই আমার সর্বনাশ। তোমাদের এখানকার ধর্মঘট আমার ওখানে ছড়িয়ে গেলেই বিপদ। মিটে গেলেই ভাল।

হঠাৎ মঁসিয়ে হানিবোর মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। সে ভাবল ধর্মঘট যদি ছড়িয়ে পড়ে চারদিকের খনিতে তাহলে দেমুলিনদের অবস্থা যত খারাপ হবে ততই ভাল হবে। কারণ তখন কম দরে ওদের খনিগুলো কিনে নিতে পারবে মঁতসু কোম্পানি। বিশেষ করে যে ভাদেমের খনিগুলো দিতে চাইছে না দেমুলিন সে সব খনি ওরা সহজেই তখন পাবে। তাহলে কোম্পানির মালিকরা তার উপর সন্তুষ্ট হবে। সুতরাং ধর্মঘট যত চলে ততই ভাল।

মঁসিয়ে হানিবো দেমুলিনকে বলল, যদি এতই ভয় পান তাহলে আমাদের সঙ্গে মিশে যান না কেন?

দেমুলিন বলল, না কখনই না। তোমার জীবনে তা হবে না।

দেমুলিনের কথা বলার ধরন দেখে হাসতে লাগল সবাই। তারপর নতুন নতুন খাবার পরিবেশিত হওয়ায় ওরা অন্য সব প্রসঙ্গ ভুলে গেল। খাওয়ার পর ভাল মদ এল।

এই শান্ত পরিবেশে পল সিসিলের বিয়ের কথাটা উঠল। মাদাম হানিবো পলের দিকে কটাক্ষ করল। এর অর্থ হলো পল যেন গ্রেগরীদের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করে। পল তাই করতেই গ্রেগরিয়া অনেকটা নরম হলো। তাদের সেই বাড়ি লুটের ভয়টা কেটে গেল। পলের কথা শুনে সত্যিই ভয় পেয়ে গিয়েছিল ওরা।

এদিকে ব্যাপারটা লক্ষ্য করে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল মঁসিয়ে হানিবো। তার স্ত্রীর প্রতিটি দৃষ্টি ও কটাক্ষের অর্থ এমনভাবে পল বুঝতে পারল যাতে বেশ বোঝা যায় ওদের মধ্যে বোঝাপড়া আছে এবং নিশ্চয় দেহসংসর্গ আছে। কিন্তু পরক্ষণেই মঁসিয়ে হানিবো পলের বিয়ের কথাটা ভেবে এ সন্দেহ অমূলক মনে করে ঝেড়ে ফেলে দিল।

চাকরে কফি নিয়ে আসতেই ঝি এসে খবর দিল ওরা এসে গেছে। মঁসিয়ে হানিবো উঠে পড়ল। বলল, ওদের বৈঠকখানা ঘরে বসতে বল। মাদাম হানিবো স্বামীকে বলল, তুমি কফিটা খাবে না?

মঁসিয়ে বলল, হ্যাঁ, কফিটা খেয়ে যাব। ওরা বসুক।

কফিটা খুব গরম থাকাতে তাড়াতাড়ি খেতে পারছিল না মঁসিয়ে হানিবো।

কফির কাপটা তার হাত থেকে মুখে বারবার উঠলেও তার কানটা পাশের ঘরের দিকে খাড়া হয়ে ছিল। মঁসিয়ে হানিবো বলল, আমি পরে খাব। খুব গরম।

এই বলে প্রতিনিধিদলের কাছে চলে গেল মঁসিয়ে হানিবো। যাবার সময় মুখে আঙুল দিয়ে ইশারায় ওদের আস্তে কথা বলতে বলে গেল।

মঁসিয়ে হানিবো চলে গেলে পল ও সিসিল দরজার ফাঁক দিয়ে প্রতিনিধিদলের পানে তাকিয়ে কি সব দেখতে লাগল। সিসিল বলল, ওদের দেখতে পাচ্ছ?

পল বলল, হ্যাঁ পাচ্ছি। একজন মোটা আর দুজন বেঁটে।

সিসিল বলল, ওদের মুখগুলো ভয়ঙ্কর নয়?

পল বলল, না না। মোটেই তা নয়। ওরা ত ভালো লোক।

মঁসিয়ে হানিবোর নির্দেশ সত্যিই ওরা মেনে চলল। সত্যিই ওরা ভয় পেয়ে গিয়েছিল। ওরা পাশের ঘরে কি কথা হচ্ছে তা শোনার জন্য উৎকর্ণ হয়ে রইল। পুরুষ কণ্ঠের জোর কথা বলার শব্দ আসছিল।

২

আগের দিন র‍্যাসেনোরের বাড়িতে শ্রমিকদের এক সভা হয়। সেই সভায় এতিয়েন আর জনকতক পুরোনো কর্মী মিলে ম্যানেজারের কাছে প্রতিনিধিদল পাঠাবার সিদ্ধান্তও গ্রহণ করে।

সেই সন্ধ্যাতেই মাহিউর স্ত্রী যখন শুনল প্রতিনিধিদলের মধ্যে তার স্বামী মাহিউ থাকবে তখন সে খুব রেগে গেল। সে মাহিউকে বলল, এসব কি হচ্ছে? তুমি কি আমাদের পথে দাঁড় করাতে চাও? মাহিউ নিজে এতিয়েনের কথায় বিরক্তি ও বিতৃষ্ণার সঙ্গে রাজী হয়েছিল প্রতিনিধিদলে যেতে। এদের নিয়মই হলো এটা। ওরা যত কষ্ট যত অবিচার অত্যাচার ভোগ করুক না কেন আসল প্রতিবাদ বা সংগ্রামের সময় এলে ওরা পিছিয়ে যায়। আবার সেই অন্যায় আর অবিচারের কাছে মাথা নত করে। সাধারণতঃ মাহিউ তার স্ত্রীর কথা মেনে চলে। তার পরামর্শ মেনে নেয়। কিন্তু এবার তা মানতে পারল না। বলল, চুপ করো। বিপদের সময় বন্ধুদের ছেড়ে আসাটা খুব ভাল দেখায় না।

তার স্ত্রী বলল, তুমি ঠিক বলেছ। তুমি যাও, তবে জেনে রেখো, আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেল।

দুপুরবেলায় ওরা শুধু আলুসিদ্ধ খেয়েছে। মাখন অল্প থাকায় তা কেউ ছোঁয়নি। রাত্রে একবার ওরা রুটি খাবে।

এতিয়েন হঠাৎ মাহিউকে তখন বলেছিল, আমরা চাই তুমিই আমাদের পক্ষ

থেকে কথাটা তুলে ধরবে।

আবেগে কণ্ঠটা অবরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল মাহিউর। কোন কথা বলতে পারে নি। কিন্তু তার স্ত্রী বলছিল, না না। এটা খুব বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। ও থাক। এতে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু ওকে নেতা বানিও না।

তখন এতিয়েন আবেগের সঙ্গে মাহিউকে নেতা বানানোর সপক্ষে যুক্তি খাড়া করেছিল। মাহিউ হচ্ছে সারা খাদটার সমস্ত শ্রমিকদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল কর্মী। ভদ্র ও শান্তস্বভাব আর আচরণের আদর্শস্বরূপ। সুতরাং মাহিউর মত লোক যদি শ্রমিকদের দাবিগুলো তুলে ধরে তাহলে তার গুরুত্ব বেড়ে যাবে। অবশ্য এতিয়েনেরই প্রথম বলা উচিত ছিল। কিন্তু সে নতুন এসেছে। কাজেই তারা সকলে মিলে সবচেয়ে ভাল ও যোগ্য লোককে তাদের নেতা হিসাবে পেতে চাইছে। তাদের এই চাওয়াকে প্রত্যাখ্যান করাটা মাহিউর পক্ষে কাপুরুষতার কাজ হবে।

মাহিউর স্ত্রী তখন বলল, ঠিক আছে তুমি যাও। আর পাঁচজনের জন্য নিজের সর্বনাশ করো। আমি তোমাকে বাধা দেব না।

মাহিউ বলল, কিন্তু আমি কি বলব? আমি ত বাজে কথা বলে ফেলব।

এতিয়েন খুশি হয়ে তার ঘাড়ের উপর হাত বোলাতে বোলাতে বলল, ঠিক আছে, তুমি যা অনুভব করো তাই বলবে।

বুড়ো বনিমোরের ফোলা পা দুটো শুকোতে শুরু করেছে। সে খেতে খেতে ওদের কথাবার্তাগুলো শুনছিল এক মনে। সব কিছু শুনে মুখের খাবার গিলে বলল, যা কিছু খুশি করবে, কিন্তু তাতে কোন কাজই হবে না। কোন কথা ওদের বলাও যা না বলাও তাই। আমরা অনেক দেখেছি। আজ হতে চল্লিশ বছর আগে একবার এমনি গোলমাল হয়। আমরা তখন এমনি করে ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিলাম। কিন্তু ওরা তখন আমাদের দরজা থেকে মারধোর করে তাড়িয়ে দিয়েছিল। আজ অবশ্য ওরা তোমাদের কথা শুনবে। তোমাদের ঢুকতে দেবে ঘরে। কিন্তু তাতে কোন কাজ হবে না। ওদের টাকা আছে। তাদের কিছুতেই কিছু যায় আসে না।

এর পর মাহিউ ও এতিয়েন খাবার টেবিল ছেড়ে উঠে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে। ওরা যাবার পথে লেভাক আর পিয়েরেনকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল। র‍্যাসেনোরের দোকানে গিয়ে দেখল অন্য সব গাঁয়ের শ্রমিকদের প্রতিনিধিরা দু তিন দল করে আসতে শুরু করেছে। এইভাবে কুড়িজন প্রতিনিধি জড়ো হয়ে সব ঠিক করে ফেলল। ঠিক করল মালিকপক্ষ কোন প্রস্তাব দিলে পাল্টা প্রস্তাব কি ওরা দেবে। এর পর ম্যানেজারের বাড়ির দিকে রওনা হয়ে গেল ওরা।

ম্যানেজারের বাড়িতে গিয়ে যখন ওরা পৌঁছল তখন বেলা দুটো বাজে। প্রথমে ওদের বাড়ির চাকর ওদের অপেক্ষা করতে বলল বাইরে। পরে একট ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল। ঘরের জানালাগুলোয় পর্দা টানা। পর্দার ফাঁক দিয়ে

স্বল্প আলো আসছিল ঘরে। ওরা সবাই ভাল পোষাক পরে গেলেও বসতে কুণ্ঠাবোধ করছিল। ঘরখানায় মেঝের উপর বিছানো দামী কার্পেটটা ওদের পাগুলো যেন জড়িয়ে ধরেছিল। কত সোনার কাজ করা জিনিস, কত বিচিত্র রঙের সিল্ক, কত ধর্মীয় জাঁকজমকপূর্ণ ছবি, সব মিলিয়ে ঘরখানার অদৃষ্টপূর্ব ঐশ্বর্য দেখে একটা বিস্ময়বিমিশ্রিত শ্রদ্ধা অনুভব করল ওরা। সবচেয়ে আশ্চর্য লাগল ওদের ঘরখানায় নিয়ন্ত্রিত তাপমাত্রায়। বাইরে যখন বরফের মত কনকনে ঠাণ্ডা হুল ফোটাচ্ছিল তখন ঘরের ভেতরটায় কতকগুলো জলন্ত ষ্টোভের আগুনে একটা মিষ্টি উষ্ণতা বিরাজ করছিল। ওদের খুব আরামবোধ হচ্ছিল।

এমন সময় মঁসিয়ে হানিবো এসে ঘরে ঢুকল। বলল, তোমরা তাহলে এসেছ। এ যে দেখছি বিদ্রোহ। বিদ্রোহ ঘোষণা করেছ তোমরা। তারপর নিজে বসে ওদের ভদ্র অথচ গম্ভীরভাবে বলল, বস তোমরা। তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করতে আমি বাধ্য। তোমরা বস।

কিন্তু অনেকেই বসতে কুণ্ঠাবোধ করল। কয়েকজন বসল। আর অনেকেই দাঁড়িয়ে রইল। মঁসিয়ে হানিবো ওদের সামনে একটা আর্মচেয়ার টেনে এনে বসল। তারপর ওদের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ওদের মুখগুলো চেনার চেষ্টা করল। ও দেখল পিয়েরেন শ্রমিকদের পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে মুখ লুকিয়ে। এতিয়েন ওর সামনে একটা চেয়ারে বসে রয়েছে।

হানিবো একবার সবাইকে চোখ বুলিয়ে দেখে নিয়ে বলল, বল এবার, তোমাদের কি বলার আছে।

হানিবো ভেবেছিল যা কিছু বলার এতিয়েন বলবে। কিন্তু সে যখন দেখল মাহিউ ওদের পক্ষ থেকে বলতে উঠেছে তখন সে আশ্চর্য হয়ে বলল, তুমি? যে একজন এ খাদের সবচেয়ে ভাল কর্মী, শান্ত প্রকৃতির ও যুক্তিবাদী, যার পূর্বপুরুষরা এই খনিতে প্রথম কয়লা কাটার দিন থেকে কাজ করে আসছে সেই তোমাকে এই বিক্ষুব্ধদের দলের সামনে দেখে সত্যিই আমি দুঃখিত।

মাহিউ মেঝের দিকে তাকিয়ে ম্যানেজারের কথা সব শুনে যেতে লাগল মন দিয়ে।

এবার মাহিউ বলল, আমি শান্ত প্রকৃতির মানুষ এবং আমার বিরুদ্ধে কারো কিছু বলার নেই ব'লেই আপনি তা মনে করেন। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে আজকের এই ধর্মঘট হঠকারীদের উত্তেজনার কাজ নয়। আমরা শুধু ন্যায়বিচার চাই। আমরা আর ক্ষুধা সহ্য করতে পারছি না। এখন সত্যিই একটা বোঝাপড়া করার সময় এসেছে যাতে করে আমরা রোজ রুটি পাই।

মাহিউ এবার কুণ্ঠার ভাবটা একেবারে কাটিয়ে উঠল। সে ম্যানেজারের মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে লাগল।

মাহিউ আবার বলতে লাগল, আপনি জানেন আপনাদের নতুন বেতন ব্যবস্থা আমরা মেনে নিতে পারিনি। আমাদের বিরুদ্ধে প্রায়ই অভিযোগ

করা হয় আমরা কাঠের ঠেকার কাজ ঠিকমত করি না। আমরা স্বীকার করছি, সত্যিই একাজ আমরা ঠিকমত করতে পারি না। যদি আমরা ঠিকমত একাজ করতাম, তাহলে আমাদের দিনের বেতন আরো কাটা যেত। তাহলে আমাদের দিনের খাওয়া জুটত না। আমাদের বেতন বাড়িয়ে দিন, আমরা কাঠের কাজ আরো ভাল করে করব। তা না করে আপনারা পৃথক বেতনব্যবস্থা চালু করলেন। কয়লা কাটা আর কাঠের ঠেকা দেওয়ার জন্য আলাদা আলাদা বেতন। এতে আমাদের সম্পূর্ণ ক্ষতি। তার মানে এতে আমাদের বেতন কম হলো। এতে টব প্রতি দু সেন্তিমে করে আমাদের লোকসান আর কোম্পানির হল লাভ।

'ঠিক ঠিক' বলে প্রতিনিধিরা সকলে মাহিউকে সমর্থন করল। হানিবো তাদের চুপ করার জন্য কড়া হুকুম দিল এবং হাত বাড়াল।

কিন্তু মাহিউ এবার তার কাজ বুঝে গেছে। তার দায়দায়িত্ব বুঝে গেছে। তার সব ভয় ভেঙ্গে গেছে। সে তাই ম্যানেজারের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও বলে যেতে লাগল, আমরা তাই পরিশেষে এই কথাটাই জানাতে এসেছি স্যার, আমরা যখন এমনিতে কাজ করে মরছি তখন এবার থেকে কাজ না করে কুঁড়ে হয়ে বসে থেকে মরব। তাই আমরা কাজ বন্ধ করে রেখেছি। এতে আমাদের অনশনে থাকতে হলেও তাতে অন্ততঃ খাটুনির জ্বালা থাকবে না। আপনারা যাই চান, আমরা চাই পুরনো ব্যবস্থা বজায় থাক। আর টব প্রতি পাঁচ সেন্তিমে বেশী চাই। এবার কোম্পানি কি করবে তা বেছে নেক।

শ্রমিকরা একবাক্যে বলল, ঠিক বলেছে, ঠিক ঠিক। যারা কোন কথা বলল না, তারা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। প্রশস্ত ঈষদুষ্ণ ও আরামঘন ঘরের সমস্ত ঐশ্বর্য, স্বর্ণ ও সূচিশিল্পখচিত যত সব আসবাবপত্রের জৌলুস মুহূর্তে ম্লান হয়ে গেল শ্রমিকদের চোখের সামনে। এমন কি তারা তাদের পায়ের নিচে কার্পেটটাও অনুভব করতে পারছিল না।

মঁসিয়ে হানিবো বলল, আমাকে কিছু বলার একটা সুযোগ দাও। প্রথম কথা, একথা মোটেই সত্য নয় যে কোম্পানি টব প্রতি দু সেন্তিমে করে লাভ করছে।

সবাই তখন ম্যানেজারের এ কথায় প্রতিবাদ জানাল একবাক্যে। হানিবো তখন শ্রমিকদের মধ্যে ভেদনীতি চালাবার জন্য পিয়েরেন ও লেভাককে ডাকল। পিয়েরেন বিড় বিড় করে কি বলল কিছু বোঝা গেল না। লেভাক বলল, সে এসব কিছু জানে না। বাকি সবাই একযোগে চিৎকার করতে লাগল।

হানিবো তখন বলল, তোমরা সবাই যদি এভাবে চিৎকার করো তাহলে কি করে আলোচনা হবে?

হানিবোর মেজাজটা প্রথমে গরম হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এবার তার মাথাটা ঠাণ্ডা হয়ে উঠল। এবার সে শান্ত হয়ে উঠল। এতক্ষণ ধরে কিন্তু এতিয়েনকে

নিবিড়ভাবে লক্ষ্য করছিল হানিবো। তার উপর থেকে সে দৃষ্টি সরিয়ে নেয়নি। এবার সে পরোক্ষ আঘাতের দ্বারা এতিয়েনের সম্ভ্রমসূচক নীরবতাটা ছিন্নভিন্ন করে দিতে চাইল।

হানিবো দু সেন্তিমের কথাটা ছেড়ে দিয়ে অন্য কথা তুলল। বলল, কেন তোমরা সত্য কথাটা স্বীকার করছ না? কেন স্বীকার করছ না যে তোমরা যত সব ঘৃণ্য প্ররোচকদের দ্বারা প্ররোচিত হয়েছ। এই প্ররোচনা বিষের মত ছড়িয়ে পড়ছে শ্রমিকদের মধ্যে। একথা কাউকে আমি মুখে স্বীকার করতে বলছি না। কিন্তু আসল কথা তোমাদের পরিবর্তন ঘটেছে। তোমাদের নিশ্চয় প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে যে রুটির থেকে মাখন বেশী দেওয়া হবে। বলা হয়েছে শ্রমিক থেকে তোমরা মালিক হবে। বিখ্যাত আন্তর্জাতিকের সদস্য হয়েছ। আন্তর্জাতিক মানে সেই সব দুর্বৃত্তদের সংস্থা যারা সমস্ত সমাজকে ধ্বংস করে দিতে চায়।

এবার এতিয়েন বলল, আপনি ভুল করেছেন স্যার, মঁতসু অঞ্চলের কোন খনিশ্রমিকই আন্তর্জাতিকে যোগদান করেনি। তবে তারা যদি কোম্পানির দ্বারা বাধ্য হয় তাহলে অবশ্যই যোগ দেবে।

এবার থেকে তর্কযুদ্ধ চলতে লাগল হানিবো আর এতিয়েনের মধ্যে।

হানিবো বলল, কোম্পানি ভাগ্যবিধাতার মতই প্রতিটি শ্রমিকের উপর লক্ষ্য রাখছে। তোমরা কোম্পানিকে ভয় দেখিয়ে ভুল করছ। এই বছর কোম্পানি শুধু বাড়ি তৈরির ব্যাপারে তিন লক্ষ ফ্রাঁ খরচ করেছে। কিন্তু তার থেকে শতকরা দু ফ্রাঁও লাভ হয়নি। তার উপর অনেককে বৃত্তি দিতে হয়, সেটা আমি ধরছি না। সমস্ত শ্রমিককে বিনা পয়সায় কয়লা, চিকিৎসার সুযোগ আর ওষুধপত্র দিতে হয়। তবু তোমরা যত সব নোংরা প্রকৃতির কুখ্যাত লোকদের সঙ্গে মিশবে। হ্যাঁ, আমি নাম ধরে বলছি। বলছি র‍্যাসেনোরের কথা। সমাজবাদের দুর্নীতি থেকে নিজেদের মুক্ত করার জন্য আমরা ওকে ছাড়িয়ে দিয়েছি। তোমরা প্রায়ই তার দোকানে থাক। সে-ই নিশ্চয় তোমাদের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড খোলার পরামর্শ দিয়েছে। আমরা বাধা দিইনি তাতে। ভেবেছিলাম শ্রমিকরা সঞ্চয় করবে বলেই এটা করছে। কিন্তু এখন দেখছি তারা মালিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে এটাকে ব্যবহার করতে চায়। তাই কোম্পানি এবার এই প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের অগ্রগতিকে বাধা দিতে পারে।

এতিয়েন এতক্ষণ শুনে যাচ্ছিল। শুনতে শুনতে তার মুখে হাসি ফুটে উঠল। বলল, এটা আবার কোম্পানির নতুন চাপ। কারণ এতদিন এ বিষয়ে কোম্পানি কোন বাধা দেয়নি। আমরা চাই কোম্পানি আমাদের উপর একটু কম লক্ষ্য রাখুক। আমাদের উপকার একটু কম করুক। আমরা চাই কোম্পানি শুধু আমাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করুক, আমাদের যা প্রাপ্য তা দিয়ে দিক। বর্তমানে সব লাভ কোম্পানিই করছে। যখনি কোন সংকট আসকে

তখনই শ্রমিকরা না খেয়ে শুকিয়ে মরে মালিকদের লাভ অক্ষুণ্ণ রেখে দেয়—এটা কি ন্যায়সঙ্গত কথা? আপনি যাই বলুন না কেন, আসলে নতুন বেতনব্যবস্থা শ্রমিকদের বেতন কমাবার এক ছলমাত্র। শ্রমিকদের কষ্ট দিয়ে তাদের বেতন কেটে খরচ কমানো কোম্পানির কখনই উচিত নয়।

মঁসিয়ে হানিবো বলল, বাঃ, বেশ বেশ। আমি এটাই আশা করছিলাম। কোম্পানি শ্রমিকদের শ্রমের উপযুক্ত বেতন না দিয়ে তাদের শুকিয়ে মারছে এই অভিযোগ তোমরা করবে আমি তা আগেই ভেবে রেখেছিলাম। কিন্তু এ ধরনের অবান্তর কথা কিভাবে বল তোমরা? খনিশিল্পে পুঁজিপতিদের কি বিরাট ঝুঁকি নিতে হয় সেটা কেন বুঝতে পার না তোমরা? আজকাল কোন একটা খনিকে আধুনিক উপকরণে ঠিকমত সজ্জিত করতে হলে পনের থেকে কুড়ি লাখ ফ্রাঁর দরকার। তার উপর দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ প্রভৃতি ত আছেই। অথচ এত টাকার সামান্যতম অংশও ফিরে আসতে কত সময় লাগে। ফ্রান্সের সমস্ত খনির মধ্যে অর্ধেক খনি দেউলিয়া হয়ে গেছে। যে সব খনি চলছে কোন রকমে তাদের বিরুদ্ধে নিষ্ঠুরতার অভিযোগ করা উচিত নয়। তাদের শ্রমিক-দের যেমন কষ্ট হচ্ছে তেমনি মালিকদেরও কষ্ট হচ্ছে। তোমরা কি করে ভাবছ যে একা শুধু তোমরাই কষ্ট করছ? দোষ যদি দিতে হয় তাহলে বাস্তব তথ্যের উপর দোষ দিতে হয়। কিন্তু তা না দিয়ে তোমরা শুধু কোম্পানির উপর দোষারোপ করছ। কিন্তু তোমরা তা বুঝবে না, বুঝতে চাইবে না। যত দিন এ অবস্থা চলবে উন্নতির কোন আশা নেই।

এক বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে নিচু কাঁপা কাঁপা গলায় কথাগুলো এমনভাবে বলল হানিবো যাতে সকলেই চুপ হয়ে গেল। কথাগুলোর মধ্যে এক চাপা ভীতিপ্রদর্শনও মিশিয়ে ছিল।

যে সব প্রতিনিধি কোন কথা বলেনি তারা ভেবেছিল তাদের সহকর্মীরা সেই সব সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের অংশ চাইছে যা ম্যানেজার ও মালিকপক্ষের লোকেরা ভোগ করছে। তাই তারা স্তব্ধ ঘরখানার মধ্যে দামী আসবাবপত্রের পানে একবার তাকাল।

মঁসিয়ে হানিবো কিছুক্ষণ চুপ করে বসে বসে চিন্তা করার পর উঠে দাঁড়াল। ওদের পথ দেখিয়ে দরজার দিকে নিয়ে গেল। হানিবো কোন শেষ কথা বলল না দেখে এতিয়েন মাহিউর গায়ে চিমটি কাটল। তখন মাহিউ থমকে দাঁড়িয়ে হানিবোকে বলল, তাহলে স্যার, আমরা গিয়ে অন্যান্য শ্রমিকদের এই কথাই বলব যে আপনারা আমাদের দাবি প্রত্যাখ্যান করেছেন।

ম্যানেজার হানিবো বলল, আমি কিছু প্রত্যাখ্যান করছি না। আমিও তোমাদের মতই এক বেতনভোগী কর্মচারি মাত্র। খনির বালকশ্রমিকের থেকে আমার ক্ষমতা বেশী নেই। আমাকে যা আদেশ দেওয়া হয় তা আমি শুধু পালন করে যাই। আমার যা বলা দরকার বলে মনে করেছি আমি শুধু

তাই বলেছি। কিন্তু সিদ্ধান্ত নেবে মালিকরা। তোমরা তোমাদের যে সব দাবি জানিয়েছ আমি ডিরেক্টর বোর্ডকে তা জানাব। পরে তাদের সিদ্ধান্তের কথাও তোমাদের জানাব। একজন যোগ্য প্রশাসক ও মালিকপক্ষের প্রবক্তা হিসাবে যা বলা দরকার হানিবো তাই বলল।

তবু শ্রমিকরা কেমন সন্দেহের চোখে দেখতে লাগল। তারা বুঝতে পারল না হানিবোর প্রকৃত ক্ষমতা কতখানি, মালিকপক্ষ ও শ্রমিকপক্ষের যোগসূত্র হিসাবে তার ভূমিকার প্রকৃত অর্থ কি। বুঝতে পারল না তার কোন ক্ষমতা না থাকলেও সে কেন এত সুখ ভোগ করে এবং তার জীবনযাত্রার মান এত উন্নত কেন।

এতিয়েন সাহস করে বলল, দেখুন স্যার, এটা খুবই দুঃখের বিষয় যে আমরা সরাসরি মালিকপক্ষের সামনে গিয়ে আমাদের সব কথা বুঝিয়ে বলতে পারছি না। আমরা যদি জানতাম কাকে আমাদের কথা জানাতে হবে।

একথায় কোন দোষ ধরল না বা কিছু মনে করল না হানিবো। মৃদু হেসে বলল, তোমরা যদি আমার উপর আস্থা স্থাপন করতে না পার তাহলে ব্যাপারটা খুবই খারাপ হয়ে উঠবে। তাহলে তোমাদের আরো দূরে যেতে হবে।

খোলা জানালা দিয়ে দূরে একটা জায়গার দিকে হাতটা বাড়াল। কিন্তু প্রতিনিধি-দলের লোকেরা তা দেখে বুঝতে পারল না সে জায়গাটা কোথায়। সে জায়গা কি প্যারিসে? অথবা সেটা হয়ত সুদূরবর্তী কোন ভয়ংকর অলীক জায়গা যেখানে এক অজানা দেবতা কোন এক অপরিদৃশ্য গভীরে সিংহাসন পেতে বসে আছে। সে দেবতাকে তারা কোনদিন দেখেনি জীবনে; তবু সে দেবতার যে অদৃশ্য অমোঘ শক্তি দশ হাজার মঁতসু খনিশ্রমিকদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করছে সে শক্তিকে তারা অনুভব করছে। তাদের মনে হলো সেই গোপন শক্তির বলেই ম্যানেজার এমন কথা বলতে পারল। ম্যানেজার যেন সেই দেবতারই দৈববাণীগুলো উচ্চারণ করতে লাগল।

ওরা এক গভীর হতাশা অনুভব করতে লাগল। ওরা সত্যিই নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ল। এতিয়েন তার কাঁধ নাড়িয়ে এমন একটা ভাব দেখাল যাতে সে বলতে চাইল আর এখানে অপেক্ষা না করে চলে যাওয়াই উচিত। মঁসিয়ে হানিবো মাহিউর হাতের উপর বন্ধুভাবে চাপ দিয়ে জাঁলিন কেমন আছে তা জানতে চাইল। তারপর বলল, এতে তোমাদের ভয়ঙ্করভাবে শিক্ষা পাওয়া উচিত। তবু তোমরা তোমাদের এই কাঠের কাজের ভুল পদ্ধতিটাকে সমর্থন করে যাচ্ছ। আবার ভাল করে ভেবে দেখ, বন্ধুগণ, আশা করি ধর্মঘট সকলের পক্ষেই কত বিপজ্জনক একথা তোমরা বুঝতে পারবে। এক সপ্তা যেতে না যেতেই তোমরা না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরবে। কেমন করে তোমরা সংসার চালাবে? তোমাদের সুমতির উপর আমার আস্থা আছে এবং আমার বিশ্বাস সোমবারের মধ্যেই তোমরা খনিতে গিয়ে কাজে যোগদান করবে।

মাথা নত করে এবার ওরা একপাল শান্ত পশুর মত বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। ওরা একটা কথাও বলল না। ম্যানেজার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সংক্ষেপে গোটা ব্যাপারটা আর একবার ভেবে দেখল মনে মনে। কোম্পানি চায় বেতন কমাতে, শ্রমিকরা চায় টবপ্রতি পাঁচ সেন্তিমে বেতন বাড়াতে। সুতরাং মিথ্যা আশার মধ্যে ওদের ঝুলিয়ে রেখে লাভ নেই। সুতরাং এটা তাদের বলে দেওয়া উচিত কোম্পানি ওদের দাবি মেনে নেবে না।

এবার ম্যানেজার শেষবারের মত ওদের বলল, হঠকারীর মত কিছু করে বসো না। কিছু করার আগে আর একবার ভেবে দেখ।

যাবার সময় পিয়েরেন বিনয়ের সঙ্গে মাথা নত করল। লেভাক ইচ্ছা করে টুপী পড়ল উদ্ধত ভঙ্গিতে। মাহিউ কি বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু এতিয়েন তাকে চিমটি কেটে নিষেধ করল।' ওরা নিঃশব্দে চলে গেল। শুধু ওদের পিছনে দরজা বন্ধ করার শব্দ হলো।

মঁসিয়ে হানিবো আবার খাবার ঘরে ফিরে এল। দেখল ওরা মুখ গম্ভীর করে নীরবে বসে রয়েছে। বিশেষ করে দেনুলিনকে চিন্তান্বিত দেখাচ্ছিল। হানিবো এসে যখন তার ঠাণ্ডা কফি খেতে শুরু করল তখন ওরা প্রসঙ্গটা পাল্টে আবার আলোচনা শুরু করল। কিন্তু গ্রেগরিরা ঘুরে ফিরে আবার সেই ধর্মঘটের কথাটাই তুলল। তারা বলল, এমন কোন আইন নেই যার দ[illegible] ধর্মঘট একেবারে নিষিদ্ধ হয়ে উঠতে পারে?

পল সিসিলকে বলল, আশা করি পুলিস হস্তক্ষেপ করবে।

মাদাম হানিবো বলল, আমরা অবশ্য বসার ঘরে যাচ্ছি। কিন্তু তার আগে জানালার পর্দাগুলো সব সরিয়ে দাও।

৩

একপক্ষকাল কেটে গেল। তৃতীয় সপ্তার প্রথমেই সোমবার ম্যানেজার কর্মরত খনিশ্রমিকদের যে তালিকা পাঠাল তাতে দেখা গেল আগের থেকে কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা আবো কমে গেছে। দেখা গেল ধর্মঘট আরো অনেক খনিতে ছড়িয়ে পড়েছে। আগে শুধু লে ভোরো, ক্রীভেসোর, মিরৌ ও ম্যাদলেন খনিতে ধর্মঘট সীমাবদ্ধ ছিল। পরে দেখা গেল লে ভিক্তোরি, কান্তেল ও এমন কি সেন্ট টমাস খনিতেও ছড়িয়ে পড়েছে।

ডিসেম্বরের ধূসর আকাশের তলায় লে ভোরোর খনিটা মৃত্যুপুরীর মত স্তব্ধ হয়ে আছে। খনির উপরে খালি টবগুলো পড়ে আছে। খনির ভিতর একমাত্র পনিম্যানরা তাদের ঘোড়ার খাবার যোগাড় করার জন্য ব্যস্ত ছিল। ডেপুটিরা ঘোরাঘুরি করছিল। খনির মধ্য থেকে জল বার করে দেবার জন্য পাম্পগুলো

সমানে চলছিল। মৃত খনিটার মাঝে পাম্পগুলোর একটানা ঘর্ঘর আওয়াজটাকে একমাত্র জীবনের স্পন্দন বলে মনে হচ্ছিল। এ পাম্প একবার বন্ধ হয়ে গেলেই জলে সমস্ত খনিটা ডুবে যাবে। তাই ডেপুটিরা সাধারণ শ্রমিকদের মত পাম্প চালাচ্ছিল।

খনির উল্টো দিকে দুশো চল্লিশ নম্বর গাঁটাও স্তব্ধ হয়ে আছে একেবারে। শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় লিল থেকে পুলিস এসেছে গাঁয়ে পাহারা দেবার জন্য। কিন্তু একদিনের জন্যও কোথাও শান্তি ভঙ্গ না হওয়ায় পুলিস ও তাদের কর্তারা চলে গেছে। ধর্মঘটী শ্রমিকরা সারাদিন ঘুমোয় পড়ে পড়ে আর সন্ধ্যে হলেই মদের দোকানে যায়। মেয়েরা অতি কমে সংসার চালালেও মুখে কোন কথা বলে না। কারো সঙ্গে কোন ঝগড়া করে না। এমন কি ছেলেমেয়েরাও তাদের স্বাভাবিক চঞ্চলতার কথা ভুলে গেছে। তারা খালি পায়ে যতদূর সম্ভব কম শব্দ করে ঘোরাফেরা করে।

গাঁয়ের মধ্যে একমাত্র মাহিউদের বাড়িতেই সব সময় লোকের ভিড় লেগে আছে। এতিয়েন যে শ্রমিক ইউনিয়নের সেক্রেটারি হয়েছে তার হেড কোয়ার্টার হয়েছে মাহিউদের ঘরে। তাদের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডে যে তিন হাজার ফ্রাঁ জমা ছিল তা এখান থেকেই শ্রমিকদের প্রয়োজন অনুসারে ভাগ করে দেওয়া হয়। সেই তিন হাজার ফ্রাঁ ছাড়াও ওরা বিভিন্ন জায়গা থেকে কিছু চাঁদা স্বরূপ আ[illegible] করেছে। কিন্তু সব টাকা ফুরিয়ে আসছে। ধর্মঘট চালাবার মত আর টাকা নেই। অতৃপ্ত ক্ষুধার ছাপ ফুটে উঠতে শুরু করেছে শ্রমিকদের চোখে মুখে। মাইগ্রাত প্রথমে বলেছিল গাঁয়ের প্রত্যেক শ্রমিককে সে এক পক্ষকালের মত খাদ্যসামগ্রী ধার হিসাবে দেবে। কিন্তু পরে সে তার মতের পরিবর্তন করে। আসলে কোম্পানি তাকে এই ধরনের হুকুম দিয়েছে। ধর্মঘটী শ্রমিকদের ধার দিতে নিষেধ করেছে তাকে, কারণ কোম্পানি শ্রমিকদের অনশনে শুকিয়ে মারতে চায়।

কোম্পানি হুকুম যাই দিক মাইগ্রাত আসলে এক স্বেচ্ছাচারী খামখেয়ালী দেবতার মত ব্যবহার করত শ্রমিকদের সঙ্গে। শ্রমিকদের বাড়ি থেকে যে সব মেয়েদের মাইগ্রাতের দোকানে ধার চাইতে পাঠানো হত তাদের মধ্যে যাদের মুখ যত দেখতে ভাল তারা তত বেশী জিনিস ধার পেত। মাইগ্রাত বিশেষ করে মাহিউদের উপর চটে গিয়েছিল, কারণ তার স্ত্রী ক্যাথারিনকে তার কাছে পাঠায়নি। এর উপর আবার এক আশঙ্কা দেখা দিল। মেয়েরা দেখল মজুত কয়লা ক্রমশই কমে আসছে। এই কয়লা ফুরিয়ে গেলে আর নতুন সরবরাহ আসবে বলে মনে হয় না, আর তা না হলে ওদের শীতে জমে যেতে হবে।

মাহিউদের বাড়িতে সব জিনিসই ফুরিয়ে গেছে। লেভাক বুতলুপের কাছ থেকে কুড়ি ফ্রাঁ ধার পেয়েছে। পিয়েরেনের বাড়িতেও কিছু টাকা ও জিনিস আছে। কিন্তু পাছে তাদের কাছ থেকে কেউ ধার চায় এই ভয়ে তারা বাইরে

অভাবের ভান করত। মাইগ্রাতের দোকানে জিনিস ধার করে আনত। পিয়েরেনের স্ত্রী যদি একবার তার স্কার্টটা মাইগ্রাতের সামনে তুলত তাহলে মাইগ্রাত হয়ত তার দোকানের সব জিনিস দিয়ে দিত। গত শনিবার গাঁয়ের শ্রমিকরা সবাই রাতের খাওয়া না খেয়েই বিছানায় শুতে যায়।

কিন্তু এত কষ্ট সত্ত্বেও কারো মুখে কোন অভিযোগ নেই। সকলের সুখের জন্য তারা এই দুঃখ ভোগ করতে রাজী। কারণ এক নতুন জগতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। দিনে দিনে ওদের ক্ষুধা যত বাড়তে থাকে ততই তীব্র হয়ে উঠতে থাকে এক অপার্থিব অতীন্দ্রিয় অনুভূতি। ওদের চোখের সামনে এক নতুন দিগন্ত খুলে যায় আর সে দিগন্ত হতে স্বর্ণযুগের এক উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতি হাতছানি দিয়ে ডাকতে থাকে। প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের পুঁজি ওদের ফুরিয়ে গেছে। কোম্পানি ওদের দাবি মেনে নেবে না। দিনে দিনে অবস্থা ক্রমশঃ খারাপের দিকে যাচ্ছে, তবু স্বর্ণযুগের নিশ্চিত সম্ভাবনা ও প্রতিশ্রুতিতে উজ্জ্বল এক নতুন পৃথিবীর বিশ্বাস দিনে দিনে গাঢ় হয়ে উঠতে থাকে ওদের। কোন কিছুই টলাতে পারে না সে বিশ্বাসকে। মাহিউর পরিবারের সকলে জলসর্বস্ব তরল স্যুপটা যখন গলাধঃকরণ করতে থাকে ধীরে ধীরে তখন ওরা যেন এক স্বপ্নের আকাশে ভাসতে ভাসতে সেই নতুন পৃথিবীটাতে চলে যায় যে, পৃথিবীতে যাবার জন্য ওদের পূর্বপুরুষেরা বন্য পশুর মত যুগ যুগ ধরে হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে এসেছে অথচ যে পৃথিবীর মাটি তারা ছুঁতে পারেনি কোনদিন।

এতিয়েন আজ লে ভোরোর খনিশ্রমিকদের অবিসম্বাদিত নেতা। সে আজ কাল অনেক রাত পর্যন্ত পড়াশুনো করে। আজকাল সে অনেক চিন্তা করে। লে ভেঞ্জু পত্রিকার গ্রাহক হয়েছে। তাকে আজকাল সবাই শ্রদ্ধা করে। সন্ধ্যের সময় সে রোজ শ্রমিকদের সামনে ভাষণ দেয় আর তার কথা শ্রমিকরা অভ্রান্ত ভাবে বিশ্বাস করে। আসলে এতিয়েন যেন মইএর এক একটা ধাপের মত তার এই জনপ্রিয়তার এক একটি স্তরকে অতিক্রম করে নেতৃত্বের তুঙ্গে উঠে যেতে চায়। সে শুধু একটা ব্যাপারে অস্বস্তি বোধ করে—সেটা হলো তার শিক্ষার স্বল্পতা। ফ্রক কোটপরা কোন শিক্ষিত লোকের সঙ্গে ধর্মঘটের ব্যাপারে কথা বলতে গিয়ে একটা হীনতাবোধে ভুগতে থাকে। বেশ বুঝতে পারে সে অনেক পড়াশুনো করলেও অনেক জিনিস এখনো বুঝতে পারেনি। বার বার পড়ে বা নিষ্ঠার সঙ্গে পড়াশুনো করে এখন অনেক জিনিস মুখস্থ করে ফেলেছে যা সে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনি। বেশ বুঝতে পারে সে এলোমেলো ভাবে পড়াশুনো করেছে। শিক্ষার বিষয়ে কোন পদ্ধতি বা ক্রমপর্যায় মেনে চলেনি। তার ধারণা উকীলরাই ভাল জননেতা হতে পারে। সে ওকালতি পাশ করলে সহজেই নেতার পদে উন্নীত হতে পারত। কিন্তু পরে ভাবল, জনগণ উকীলদের চায় না তাদের নেতা হিসাবে। সব উকীলরা জনগণের উপর তাদের প্রভাবকে ভিত্তি করে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে চলে। তাই সে নতুন

করে স্বপ্ন দেখে এক জনপ্রিয় নেতা হবার। সে ঠিক করে ফেলে প্রথমে মঁতসুকে কেন্দ্র করে তার যে জনপ্রিয়তা গড়ে উঠবে ক্রমে তা প্যারিস পর্যন্ত প্রসারিত হবে এবং নির্বাচনে জনগণের প্রতিনিধিরূপে পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হবে। সেই পার্লামেন্টে শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিনিধি হিসাবে প্রথম ভাষণ দেবার কালেই সে বুর্জোয়াশ্রেণীর উপর তীব্র আক্রমণ চালাবে।

গত কয়েকদিন ধরে প্লুশার্ত পর পর কয়েকখানি চিঠিতে এতিয়েনকে প্রায়ই লিখছে যে সে মঁতসুতে আসবে। সে এখানে এসে এতিয়েনের নেতৃত্বে শ্রমিকদের কিছু প্রতিনিধি নিয়ে একটা ঘরোয়া সভায় মিলিত হতে চায়। আসলে সে এই ধর্মঘটের সুযোগ নিয়ে এখানকার শ্রমিকদের তার 'আন্তর্জাতিকের' সদস্যভুক্ত করতে চায়। কিন্তু এতিয়েন সাহস করে প্লুশার্তকে আসতে বলতে পারছিল না। কারণ র‍্যাসেনোর এটা চায় না। তাই এতিয়েন ভেবেছিল গোলমাল হবে। র‍্যাসেনোরের এখনো অনেক সমর্থক আছে খনি শ্রমিকদের মধ্যে। তাই প্লুশার্তের চিঠির কি উত্তর দেবে তা ভেবে পাচ্ছিল না।

সেদিন সোমবার বেলা চারটার সময় আর একখানা চিঠি পেল এতিয়েন। ও তখন মাহিউর ঘরে বসেছিল। তার স্ত্রী বসে বসে বুক খুলে এস্তেলেকে দুধ দিচ্ছিল। মাহিউ মাছ ধরতে গেছে। কোন মাছ পেলে সেই মাছ বিক্রি করে যা পাবে তাতে তাদের রাতের খাওয়া চলবে। বনিমোর আর জঁালিনের পা কিছুটা ভাল হয়েছে। তারা অল্প অল্প হাঁটতে পারছে।

এতিয়েন চিঠিটা ভাঁজ করে রেখে দিলে মাহিউর স্ত্রী বলল, ভাল খবর ত? কিছু টাকাকড়ি ওরা পাঠাচ্ছে?

এতিয়েন মাথা নেড়ে জানাল, না এটা টাকাকড়ির ব্যাপার নয়।

মাহিউর স্ত্রী তখন বলতে লাগল, জানি না, এ সপ্তা কি করে চালাব।

এতিয়েন বলল, যেমন করে হোক চালাতে হবেই। তোমার যেখানে ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে, তখন জয় হবেই। এই অধিকারবোধই সংগ্রামে শক্তি যোগাবে তোমাকে।

আগে আগে ধর্মঘটের কোন মানে বুঝতে পারত না মাহিউর স্ত্রী। কিন্তু আজকাল সে ধর্মঘটকে সমর্থন করে। কোম্পানি যখন এখনো তাদের দাবি মেনে নেয়নি তখন তারা কিছুতেই কাজে যোগদান করবে না। মরবে, তবু অন্যায়ের কাছে মাথা নত করবে না।

এতিয়েন একবার বলল, যদি কোন মহামারী বা কলেরায় কোম্পানির মালিকরা সব মারা যেত তাহলে আমরা নিষ্কৃতি পেতাম।

মাহিউর স্ত্রী বলল, তাতে কোন ফল হবে? আমরা কারো মৃত্যু চাই না। তাছাড়া তাতে কোন ফলও হবে না। একজন মালিক মরলে তার জায়গায় আর একজন মালিক এসে জুটবে। আমরা চাই ওদের সুমতি হোক, ওরা যেন নিজেদের ভুল বুঝতে পারে। সব শ্রেণীর মধ্যেই কিছু ভাল লোক আছে।

তুমি জান আমি রাজনীতি কিছু বুঝি না বা পছন্দ করি না।

আসলে মাহিউর স্ত্রী কোন উগ্রতা পছন্দ করে না। মালিকদের প্রতি কোন কঠোর মন্তব্য বা তীক্ষ্ণ আক্রমণ পছন্দ করে না। তার মতে শ্রমিকরা অবশ্যই নিজেদের দাবি জানাতে পারে। কিন্তু সেই সব দাবির সঙ্গে বুর্জোয়া, শ্রেণীসংগ্রাম, সরকার, রাষ্ট্র প্রভৃতি কথাগুলো জুড়ে দেওয়ায় মানে বুঝতে পারে না সে। তবু সে এতিয়েনকে শ্রদ্ধা করে। কারণ এতিয়েন মদ খায় না। সে প্রতি মাসে নির্দিষ্ট সময়ে তার দেয় পঁয়তাল্লিশ ফ্রাঁ দিয়ে দেয়।

এতিয়েন কথায় কথায় এক সময় প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কথা বলে। যে রাষ্ট্রের মধ্যে সব শ্রমিক তাদের প্রয়োজনানুসারে বেতন পাবে, যেখানে বেতনের হার শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মানের সঙ্গে সঙ্গে সব সময় সঙ্গতি রেখে চলবে। কিন্তু মাহিউর স্ত্রী এ সব কথায় বিশ্বাস করে না। সে ১৮৪৮ সালের কথা স্মরণ করে। সেই সব ভয়ঙ্কর কথা আজও মনে আছে তার। তখন সে ও তার স্বামী কী নিদারুণ কষ্টই না ভোগ করেছে। খাদ্য ও বস্ত্রহীন অবস্থায় তাদের দীর্ঘদিন কাটাতে হয়। মাহিউর স্ত্রী বলল, তখন সব খাদেই কাজ বন্ধ হয়ে যায়। আমাদের হাতে একটা কপর্দকও ছিল না। কতদিন আমাদের খাওয়া হত না।

মাহিউর স্ত্রীর কথা শেষ না হতেই হঠাৎ দরজা ঠেলে ক্যাথারিন ঘরে ঢুকল। এতিয়েনকে ঘরের মধ্যে দেখে কিছুটা বিব্রতবোধ করল ক্যাথারিন। সে তার মাকে কিছু বলবে বলে তাকে একা আশা করেছিল।

মাহিউর স্ত্রী ক্যাথারিনকে দেখেই চটে গেল। বলল, তুমি এখানে? তোমার সঙ্গে আমাদের সব সম্পর্ক ত চুকে গেছে।

ক্যাথারিন তখন আমতা আমতা করে বলল, মা, আমি কিছু কফি আর চিনি ছেলেদের জন্য এনেছি। আমি ওভারটাইম করে কিছু জমিয়েছিলাম।

ক্যাথারিন তার পকেট থেকে এক পাউণ্ড কফি আর এক পাউণ্ড চিনি বার করে ভয়ে ভয়ে টেবিলের উপর রাখল। সে শ্যাভেলের সঙ্গে জাঁ বার্ত খনিতে কাজ করে। সে খনিতে ধর্মঘট হয়নি। লে ভোরোর খনিতে দীর্ঘদিন ধরে ধর্মঘট চলছে বলে সে বিব্রত।

কিন্তু তার মা তাতে কিছুমাত্র শান্ত হলো না। উল্টে তাকে তীব্র ভাষায় ভর্ৎসনা করে যেতে লাগল। বলল, তুমি যা করেছ তা কোন মা সহ্য করতে পারে না।

ক্যাথারিন বলল, আমি কি করব বল? তার মতেই আমাকে চলতে হয়। ওর গায়ে জোর বেশী। এটা কি করে হলো তা কেমন করে তোমায় বোঝাব? যেমন করেই হোক, হয়ে যখন গেছে তখন ত আর ফিরবে না। অতএব তা মেনে নেওয়াই ভাল। তাছাড়া ও যখন আমাকে বিয়ে করবে তখন অন্য কোন কথাই ওঠে না।

ক্যাথারিন এইভাবে যুক্তি দিয়ে তার নির্দোষিতা প্রমাণ করার চেষ্টা করছিল। সে বোঝাতে চাইছিল সে দারিদ্র্যপীড়িতা এমনই এক ষোড়শী তরুণী যে বিয়ের আগেই তার প্রেমিকের দ্বারা ধর্ষিতা হয়। তার কোন দোষ নেই। অথচ তার মা তাকে পর লোকের সামনে তাকে কুলটা নারী হিসাবে গণ্য করছে, অপমান করছে। তার দুঃখ সেইখানে।

এতিয়েন উঠে গিয়ে ঘরের মধ্যে জ্বলন্ত আগুনটায় কিছু কাঠ ফেলে দিল। ক্যাথারিন তখনো দাঁড়িয়ে ছিল। এতিয়েনের চোখের উপর ক্যাথারিনের চোখ পড়ল এক সময়। এতিয়েন দেখল ক্যাথারিনের চোখ দুটো খুবই ম্লান। তবু তা সুন্দর। তার প্রতি এতদিন যে অভিযোগ অনুযোগ জমে ছিল তা সব দূরীভূত হয়ে গেল মুহূর্তে। ক্যাথারিনের প্রতি তার মায়া হলো। তার দুঃখের কথা শুনে সহানুভূতি জাগল মনে। এতিয়েনের মনে হলো সে তাদের বাসায় গিয়ে শ্যাভেলকে তার প্রতি সদয় ও ভদ্র ব্যবহার করতে বলে আসবে।

মাহিউর স্ত্রী শেষ কথা বলে দিল তার মেয়েকে। বলল, যদি আসতে হয়, তাহলে চিরদিনের মত এ বাড়িতে চলে আসতে হবে। আগের মতই এ সংসারের জন্য রোজগার করতে হবে। আর তা যদি না পার তবে আর এখানে আসবে না কোনদিন।

হঠাৎ ক্যাথারিন একটা জোর লাথি খেয়ে পিছন ফিরে তাকাল। দেখল শ্যাভেল এসে ঘরের মধ্যে ঢুকে তাকে লাথি মেরে তার কাছে এসে বন্য পশুর মত দাঁড়িয়েছে।

শ্যাভেল বলল, এই কুত্তী কোথাকার। আমি সব দেখেছি। আমি এতক্ষন দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমি জানতাম তুই ওকে সঙ্গদান করতে, দেহদান করতে এসেছিস। তা আবার শুধু হাতে নয়। সঙ্গে আবার পয়সা খরচ করে কফি এনেছিস। জানি ওর ছেলে পেটে ধরতে চাস তুই।

ক্যাথারিনের হাত ধরে তাকে নির্মমভাবে দরজার দিকে টানতে লাগল শ্যাভেল। তারপর দরজার কাছে গিয়ে পিছন ফিরে ক্যাথারিনের মাকে লক্ষ্য করে বলতে লাগল, খুব ভাল ব্যবসা হয়েছে। চোখের সামনে ওর মেয়ে একটা পর-পুরুষের সামনে ঠ্যাং তুলে দিচ্ছে আর উনি তা নিজের চোখে দেখছেন।

ক্যাথারিনকে ঘরের বাইরে নিয়ে গিয়ে শ্যাভেল আবার চিৎকার করে বলতে লাগল, আর ত মেয়ে নেই। মেয়ে যখন নেই তখন নিজেই লোকটাকে দেহ দিয়ে খুশি কর। ঘরে যখন রেখেছিলে তখন ত তাকে খুশি করতেই হবে।

এতিয়েন আর চুপ করে থাকতে পারল না। ছুটে গিয়ে শ্যাভেলের সামনে দাঁড়াল। বলল, মুখ সামলে কথা বলবি।

শ্যাভেলও গর্জন করতে করতে বলল, যা যা, কি করবি তুই ?

দুজনে সামনাসামনি দাঁড়িয়ে রাগে ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। ওদের মধ্যে যাতে মারামারি না বাধে তার জন্য ক্যাথারিন বুদ্ধি করে শ্যাভেলকে টানতে

টানতে নিয়ে গেল সেখান থেকে।

এতিয়েন ফিরে এসে দরজাটা বন্ধ করে বলল, অসভ্য পিশাচ একটা।

এতিয়েন ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখল মাহিউর স্ত্রী স্তব্ধ হয়ে তার মুখের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। রাগে দুঃখে তার মুখ থেকে কোন কথা পরছে না। তার বুকটা তখনো খোলা। এস্তেলে তার কোলে ঘুমিয়ে পড়েছে। এতিয়েনের চোখদুটো তার অনিচ্ছাসত্ত্বেও সেই বিশাল বুকের শিথিল স্তনযুগলের উপর নিবদ্ধ হলো আবার। সেখান থেকে চোখ দুটো সরিয়ে নিতে পারছিল না। মাহিউর স্ত্রীর বয়স চল্লিশ। তার মুখটা হলদে ফ্যাকাশে এবং তাতে বয়সের ছাপ পড়লেও বুকের কাছটা সাদা দুধের মত। এই বয়সেও তার দেহের গঠন প্রশংসা করার মত। তার মুখটা আজ লম্বাটে দেখালেও একদিন তা সুন্দর ছিল।

এবার মাহিউর স্ত্রী ঘুমন্ত এস্তেলেকে শুইয়ে দিয়ে স্তনদুটো জামার মধ্যে ভরে দিল। বলল, শ্যাভেলটা একটা আস্ত শূয়োর। শূয়োর ছাড়া কেউ কখনো এ ধরনের কথা বলতে পারে না। তবেআমার অবশ্য যে দোষ বা কলঙ্ক একেবারে নেই তা বলতে পারি না। আমার বিয়ের আগে আর একজন লোক আমায় স্পর্শ করেছিল। মাহিউর সঙ্গে আমার বিয়ের পর হতে আমি তার প্রতি বিশ্বস্ত আছি ঠিক। তবে এটাও ঠিক যে আমি অবিশ্বস্ত হবার মত কোন সুযোগ পাইনি। অনেক সময় দেখবে অবস্থাই মানুষকে খারাপ করে।

এতিয়েন সমর্থনের স্বরে বলল, তা বটে।

এই কথা বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল এতিয়েন। বাইরে থেকে ঘন হয়ে উঠেছে শীতের রাত্রি। বরফ পড়ছে। ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়া বইছে। মাহিউ মাছ ধরতে গেছে, এখনো ফেরেনি। শ্যাভেলের প্রতি ঘৃণা আর ক্যাথারিনের জন্য দুঃখ জাগছিল এতিয়েনের মনে। কিন্তু সে ঘৃণা ও দুঃখকে ছাড়িয়ে গাঁয়ের সমস্ত খনিশ্রমিকদের জন্য দুঃখ হচ্ছিল। আজ সারা গাঁয়ে কি অবস্থা যাচ্ছে। কোন ঘরে খাবার নেই। কারো মুখে ক্ষুধার অন্ন নেই। আর এই সব কিছুর জন্য নিজেকেই দায়ী করল এতিয়েন। আজ তার জন্যই এই অবস্থা। হঠাৎ এর থেকেও এক ঘোরতর বিপর্যয়ের ছবি ফুটে উঠল তার চোখের সামনে। ক্ষুধার জ্বালায় শিশুরা মারা যাচ্ছে মায়ের কোলে। মারা কাঁদছে। কোম্পানি শেষ পর্যন্ত তাদের দাবি না মানায় শ্রমিকরা কাজে যেতে বাধ্য হচ্ছে।

ঘুরতে ঘুরতে লে ভোরের খনির কাছে গিয়ে হাজির হলো এতিয়েন। সমস্ত খনিটা প্রেতপুরীর মত দেখাচ্ছে। কোন জনমানবের চিহ্ন নেই সেখানে। হঠাৎ মাহিউর সঙ্গে দেখা হলো এতিয়েনের। মাহিউ একটা বড় মাছ পেয়েছিল। সেটা বিক্রি করে তিন ফ্রাঁ পেয়েছিল। যাই হোক, তাতে ওদের রাতের খাওয়াটা কোন রকমে হবে। মাহিউ ওকে বাড়ি ফিরতে বলল ওর সঙ্গে। কিন্তু এতিয়েন বলল, সে একবার র‍্যাসেনোরের সঙ্গে দেখা করতে যাবে।

হঠাৎ এতিয়েনের মনে আবার একটা আশা জাগল। এই ধর্মঘটে শ্রমিকরা যেমন কষ্ট পাচ্ছে তেমনি মালিকরাও তাদের পুঁজি ভেঙে খাচ্ছে। তাদেরও লাভের পথ আয়ের পথ বন্ধ একেবারে। তার মনে হলো, ক্ষুধার যন্ত্রণা ও তাড়নাকে অগ্রাহ্য করে শ্রমিকরা সংগ্রাম চালিয়ে যাবে পুঁজিবাদী মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে। তার নেতৃত্ব মেনে চলবে তারা। হঠাৎ তার মনে পড়ল সে কোথায় যেন পড়েছে আক্রান্ত নাগরিকরা শত্রুদের বাধা দিতে না পেরে তাদের নগর নিজেদের হাতে পুড়িয়ে দিয়েছে। খেতে দিতে না পেরে মায়েরা তাদের শিশুদের মাথা পাথরের উপর নিজেদের হাতে ভেঙে দিয়েছে।

ভাবতে ভাবতে এতিয়েনের মনে কৃষ্ণকুটিল এক বিষাদের পরিবর্তে এক রক্তরাঙা স্বপ্ন মাথা তুলে উঠতে লাগল ক্রমশ। ব্যাপকভাবে তা ছড়িয়ে পড়তে লাগল তার সারা মন জুড়ে। সঙ্গে সঙ্গে নেতৃত্বের এক আনন্দ আর অহঙ্কার প্রবল হয়ে উঠল মনের মধ্যে।

আভাস্তেঙ্গে গিয়ে এতিয়েন কোন ভনিতা না করে র‍্যাসেনোরকে বলল, আমি প্লুশার্তকে লিখে দিচ্ছি, ও আসুক। আমরা একটা ঘরোয়া মিটিং করতে চাই। কারণ শ্রমিকরা যদি তার আন্তর্জাতিকে যোগদান করে তাহলে আমাদের জয় অনিবার্য।

৪

প্লুশার্ত এসে যে ঘরোয়া সভা করবে তার দিন ধার্য হলো আগামী বৃহস্পতিবার। সভা হবে বঁ জয়োতে বিধবা দেসিরের বাড়িতে। ধর্মঘটী শ্রমিকদের দুঃখকষ্ট দেখে দেসির রেগে গেছে। এখানকার শ্রমিকরা তার সন্তানতুল্য। আবার তারাই তার খরিদ্দার।

দেসির এর আগে আরো ধর্মঘট দেখেছে। কিন্তু এমন ধর্মঘট কখনো দেখেনি। আগে ধর্মঘট চলাকালে শ্রমিকরা মদ খেত। কিন্তু এবার কোন শ্রমিক নেতার আদেশ অমান্য করে ফেলার ভয়ে মদ খায় না। ফলে তার মদের দোকান চলে না। কোন খরিদ্দার নেই কাউন্টারে। শুধু দেসিরের দোকান নয়, কোন মদের দোকানই চলছে না। সমস্ত মঁতসু অঞ্চলটা স্তব্ধ হয়ে আছে। তার রাস্তাঘাটগুলো অন্তহীন নির্জনতায় শূন্য খাঁ খাঁ করছে। একমাত্র সেন্ট ইলয় নামে মদের দোকানটা খোলা আছে, কারণ সেখানে খনির ডেপুটিরা গিয়ে মদ খায়। তারা ধর্মঘটের বাইরে।

ধর্মঘটের এই প্রভাব ধীরে ধীরে প্রসারিত হতে হতে ভলকান নামে মদের দোকানটাকেও গ্রাস করেছে। ভলকানে মদ খেতে খেতে মেয়েদের নাচ দেখার জন্য আজকাল আর ভিড় হয় না। কোন শ্রমিক সেখানে একবারও যায় না। দরকার হলে অর্থাৎ খরিদ্দারেরা চাইলে নাচিয়ে মেয়েরা তাদের কী দশ স্যু

থেকে পাঁচ স্যুতে কমিয়ে আনত। মোট কথা এই সারা অঞ্চলটায় সকল শ্রেণীর মানুষরাই ক্ষতিগ্রস্ত এ ধর্মঘটে। সারা অঞ্চলের অধিবাসীরাই এক বিষণ্ণ হতাশায় ডুবে আছে।

মাদাম দেসির একবার তার জানুর উপর হাতটা চাপড়ে বলল, সব হচ্ছে পুলিসের দোষ। ওরা ইচ্ছা করলেই আমাকে কারাগারে নিয়ে গিয়ে ভরে রাখতে পারে। তবু আমাদের সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।

মাদাম দেসির মালিকপক্ষের লোকদের পুলিস বলে থাকে। পুলিস বলতে সে তার যে কোন শত্রুকে বোঝায়। এই পুলিসদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে এ অঞ্চলের খনিশ্রমিকরা এই কথা ভেবে দেসির তার বাড়িতে মিটিং করতে দিতে রাজী হয়ে যায় এতিয়েনের প্রস্তাবে। দেসির সঙ্গে সঙ্গে বলে সে তার সব দোকান ঘরবাড়ি নাচঘর সব ছেড়ে দেবে। এ অঞ্চলের খনিশ্রমিকদের সে সন্তানের মত ভালবাসে। সে নিজের হাতে নিমন্ত্রণপত্র লিখবে। তাই এতিয়েন প্রতিনিধিদের যে নিমন্ত্রণপত্র পাঠাল তাতে দেসিরের সই করিয়ে নিল।

সভার আলোচ্য বিষয় ধর্মঘটের স্থায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা হলেও আসলে প্লুশার্তের আক্রমণ এবং তার আন্তর্জাতিকে খনিশ্রমিকদের যোগদানের কথাটা আলোচনা করাই হবে আসল লক্ষ্য।

কিন্তু বৃহস্পতিবার এল না প্লুশার্ত। তার বদলে টেলিগ্রাফ করে এতিয়েনকে জানাল সে আগামী বুধবার আসবে। এতবড় একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্লুশার্তের সঙ্গে এখনো খোলাখুলিভাবে আলোচনা করতে না পারায় অস্বস্তিবোধ করতে লাগল এতিয়েন। সে প্লুশার্তের আশায় ঐদিন বেলা নটার সময় মঁতস্যুতে দেসিরের বাড়িতে হাজির হয়। কিন্তু দেসির বলে তার বন্ধু আসেনি। অথচ সে সব সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছে।

এতিয়েন ঘুরে ঘুরে সব কিছু দেখে সত্যিই বিস্ময়ে অবাক হয়ে যায়। প্রস্তুতির ব্যাপারে কোন ত্রুটি করেনি দেসির। গোটা নাচ ঘরটা সভার উপযুক্ত করে সাজানো হয়েছে। কাগজের ফুল আর শিকল করে ঘরখানার চারদিকে টাঙ্গানো হয়েছে। যেখানে বাজিয়েরা বসত সেই প্ল্যাটফরমের উপর একটা টেবিল আর তিনটে চেয়ার পাতা হয়েছে। দেওয়ালে বিভিন্ন সেন্টদের নাম লেখা হয়েছে।

সব কিছু দেখে এতিয়েন বলল, চমৎকার আয়োজন হয়েছে।

দেসির বলল, তোমাদের কোন চিন্তা নেই। কোন কারণে যদি পুলিস আসে তাহলে আমাদের গা মাড়িয়ে যেতে হবে।

এতিয়েন দেসিরের পানে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। তার চেহারাটা বিশেষ করে অতিস্ফীত বুকের উপর সুবিশাল ও সুবর্তুল স্তনযুগল দেখে হাসি পাচ্ছিল তার। শোনা যায় আজকাল রোজ রাতে দেসির তার দুজন প্রেমিকের সঙ্গে সহবাস করে। তাছাড়া তৃপ্ত হয় না সে।

হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে সুভারিন আর র‍্যাসেনোর এসে হাজির হলো। ওদের এ সভায় আসার কথা ছিল না বলে এতিয়েন তাদের দেখে খুবই অবাক হয়ে গেল।

সুভারিনের রাতে ডিউটি ছিল। সে এঞ্জিনম্যান, এবং এঞ্জিনম্যানরা ধর্মঘটের আওতার বাইরে বলে সে নিয়মিত কাজে যায়। সে এ মিটিং দেখতে এসেছে নিছক কৌতূহলের বশবর্তী হয়েই দেখতে এসেছে। কিন্তু র‍্যাসেনোরের চোখ-মুখ দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছিল সে উদ্বিগ্ন।

এতিয়েন বলল, প্লুশার্ত এল না, আমি বড় চিন্তিত।

র‍্যাসেনোর বলল, আমি মোটেই চিন্তিত নই। কারণ আমি জানতাম সে এখন আসবে না।

এতিয়েন বলল, তার মানে ?

র‍্যাসেনোর বলল, হ্যাঁ, তুমি যেমন চিঠি দিয়েছিলে আমিও তেমনি তাকে আসতে নিষেধ করে চিঠি দিয়েছিলাম। আমি মনে করি বাইরের কারো কোন সাহায্য না নিয়েই এ ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করা উচিত আমাদের।

রাগে কাঁপতে কাঁপতে এতিয়েন বলল, তুমি এটা করতে পারলে? র‍্যাসেনোর বলল, হ্যাঁ আমি তা করেছি। তবু তুমি জান প্লুশার্তের উপর অগাধ বিশ্বাস আছে। সে চতুর, বুদ্ধিমান, নির্ভরযোগ্য। কিন্তু তোমার ভাবাদর্শ আমি কিছুই বুঝি না। রাজনীতি, সরকার, ও সব আমার ভাল লাগে না। নিজে একদিন খাদের ভিতর কাজ করেছি। কঠোর শ্রমের ঘাম ঝরে পড়েছে আমার গা থেকে। খনিশ্রমিক হিসাবে দারিদ্র্যের পীড়ন আমিও একদিন সহ্য করেছি। আমি তখন প্রতিজ্ঞা করি আপন মনে যে এই সব খনি শ্রমিকদের সুখ একদিন আমি নিজের চোখে দেখব। তারা যাতে বাঁচার আনন্দ ঠিকমত পায় তার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করব। কিন্তু আমি বেশ জানি তোমাদের ঐ সব বৈঠক আর আলোচনার দ্বারা খনিশ্রমিকরা কোনভাবেই লাভবান হবে না। কোন ফলই হবে না তাতে। বুভুক্ষু শ্রমিকরা ব্যর্থ হয়ে কাজে যোগদান করলে মালিকপক্ষ তাদের রক্ত আরো বেশী করে শোষণ করবে। কোন কুকুর তার মালিকের শিকল ছিঁড়ে পালিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এলে তার যেমন অবস্থা হয় তোমাদেরও তেমনি অবস্থা হবে।

এতিয়েনের সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে কথাগুলো বলে যাচ্ছিল র‍্যাসেনোর। কথাগুলো বিনা আয়াসে সহজভাবে বেরিয়ে আসছিল তার মুখ থেকে। শ্রমিকরা অদূর ভবিষ্যতে একদিন মালিক হয়ে যাবে আর গাছ থেকে ঝরে পড়া আপেলের মত টাকা ঝড়ে পড়বে তাদের হাতে এটা মনে ভাবা চরম বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয়। সেদিন আসতে হয়ত এখনো হাজার হাজার বছর সময় লাগবে। অতএব এখন বুদ্ধিমানের কাজ হলো মালিকদের কাছে সরাসরি গিয়ে উগ্রতা পরিহার করে যুক্তিসঙ্গত কিছু দাবি উপস্থাপিত করা।

র‍্যাসেনোর আপাততঃ শ্রমিকদের উন্নতির ভার মালিকদের উপর ছেড়ে দিতে চায়। তার কথা যদি মাথামোটা শ্রমিকরা না মানে তাহলে মরবে তারা।

এতক্ষণ চুপ করে এতিয়েন সব কথা শুনে গেল র‍্যাসেনোরের। তারপর বলল, হা ভগবান, তোমার দেহের শিরায় যদি আমার রক্ত বইত।

র‍্যাসেনোরের কথা শুনতে শুনতে একসময় এতিয়েনের মনে হচ্ছিল সে তার মুখে একটা ঘুঁষি বসিয়ে দেয়। কিন্তু নিজেকে কোন রকমে সামলে নেয়।

সুভারিন একসময় বলল, দরজাটা অন্ততঃ বন্ধ করে দাও। আর কেউ যেন এসব কথা শুনতে না পায়।

সুভারিন নিজেই দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ঘরের এক জায়গায় ধীরস্থিরভাবে বসল। তার মুখে এক ফালি ম্লান হাসি ছড়িয়ে ছিল।

র‍্যাসেনোর বলল, তুমি মাথা গরম করে যা খুশি বলতে পার, করতে পার, কিন্তু তাতে কোন ফল হবে না। আগে আমি তোমার সঙ্গে প্রায়ই আলোচনা করতাম, কারণ আমার ধারণা ছিল তোমার কিছু বোধশক্তি আছে। তুমি প্রথমে শ্রমিকদের বুঝিয়ে তাদের শান্ত রেখেছিলে। বাড়ি থেকে বার হতে দাওনি। কিন্তু এখন বুঝছি তুমি তা করেছ তাদের উপর তোমার প্রভাব বিস্তার করার জন্য।

এবার এতিয়েন র‍্যাসেনোরের সামনে দাঁড়িয়ে তার ঘাড় দুটোকে ধরে হাত নেড়ে তার মুখের সামনে বলতে লাগল, হ্যাঁ, আমি এখনো শান্ত আছি। আমি এখনো তাদের শান্ত থাকার উপদেশ দিচ্ছি। কিন্তু যারা তাদের অন্যায়ভাবে রক্ত শোষণ করতে চায় আমি তাদের কিছুতেই তা করতে দেব না। তুমি ভাগ্যবান, তুমি ঠাণ্ডা মাথায় চুপ করে থাকতে পার। কিন্তু আমি তা মাঝে মাঝে পারি না। আমাব মাথায় অনেক চিন্তা। আমার ঘাড়ে অনেক দায়িত্ব।

একথা আজ মনে মনে স্বীকার না করে পারে না এতিয়েন, একদিন সে ধর্মগত সমাধানে বিশ্বাস করত। সে বিশ্বাস করত ধর্মই মানুষকে একদিন বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে বাঁধতে পারবে। চমৎকার এক মোহময় ভ্রান্তি। মানুষ মানুষকে গ্রাস করবে, ধনীরা গরীবদের শোষণ করে যাবে। অথচ হাত গুটিয়ে চুপচাপ বসে বসে তা দেখে যেতে হবে। তখন সে ছিল একেবারে অজ্ঞ এ সব ব্যাপারে। কিন্তু আজকাল সে অনেক পড়াশুনো করেছে। এ বিষয়ে সে একটা নীতি খাড়া করে তুলেছে। তবে সে নীতিটা উপযুক্ত ভাষা দিয়ে গুছিয়ে বুঝিয়ে বলতে পারে না। সবচেয়ে বড় কথা কার্ল মার্কসের তত্ত্ব পড়েছে। সে বুঝতে পেরেছে, পুঁজিপতিদের সব পুঁজি শ্রমিকদের অপহৃত ধন। এ ধন বঞ্চনার ধন। শ্রমিকরা তাদের সেই অপহৃত ধন ফিরে পেতে চায়। অবশ্য এই তত্ত্ব প্রয়োগের ব্যাপারে সে প্রধঁ ও ল্যাসেলের মত নরমপন্থী হয়ে পড়ে। তবে প্রকৃতপক্ষে সে সবরকম ব্যক্তিগত মালিকানার

উচ্ছেদে বিশ্বাসী। সে চায় সমষ্টিগত সামাজিক মালিকানার প্রতিষ্ঠা। তবে অবশ্য এ বিষয়ে তার ধারণাটা খুব স্পষ্ট নয় বলেই এ বিষয়ে সে জোর করে কিছু বলতে পারে না। স্বপ্নের মতই এ ধারণা এখনো কুহেলিকাময়। তবে সে এটা বুঝতে পেরেছে শ্রমিক শ্রেণীর হাতে রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনার ক্ষমতা আনা দরকার।

এতিয়েন আবার চিৎকার করে র‍্যাসেনোরকে বলতে লাগল, কিন্তু তোমার এ পরিবর্তন কেন? কেন তুমি বুর্জোয়াদের দিকে চলছ? তুমি না একদিন বলেছিলে শ্রমিক-মালিকের সংঘাতটা প্রকাশ্যে ফেটে বেরোনই উচিত?

র‍্যাসেনোর বলল, হ্যাঁ বলেছিলাম। আর সে সংঘাত বাধলে দেখবে আমি কাপুরুষের মত লুকিয়ে বসে থাকব না ঘরে। কিন্তু আমি সেই সব সুবিধাবাদী লোকদের কিছুতেই সহ্য করব না যারা জল ঘোলা করে নিজেরা প্রভুত্ব অর্জন করতে চায়।

এবার এতিয়েনের উত্তর দেবার পালা। এবার ওরা চেঁচামিচি আর অহেতুক উত্তাপ ছেড়ে অনেকখানি শান্ত হয়ে উঠেছে। আসলে দুজনেই এক অনমনীয় গোঁড়ামির সঙ্গে আপন আপন মত আঁকড়ে ধরেছিল। একজন চাইছিল আপোষহীন বিপ্লব আর একজন চাইছিল অন্যায় আপোষ আর নরম পন্থা। ওদের এই তর্ক বিতর্ক শান্তভাবে শুনে যাচ্ছিল স্থভারিন। তার মুখে অদ্ভুত শান্ত হাসি ফুটে উঠেছিল।

এতিয়েন বলল, আসল কথা তুমি আমায় ঈর্ষা করো।

র‍্যাসেনোর বলল, কিসের ঈর্ষা? আমি ত আর মহান নেতা বা মহাপুরুষ হতে চাই না। আমি ত আর মঁতসুতে এক সংস্থা খুলে নিজে তার সম্পাদক হতে চাই না।

এতিয়েন তাকে বাধা দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু সে দিকে কান না দিয়ে র‍্যাসেনোর বলে যেতে লাগল, কেন তুমি সৎ হতে পারছ না। তুমি ত আর আন্তর্জাতিকের লোক নও। তুমি চাও শুধু আমাদের নেতা হতে আর পত্রিকায় কিছু চিঠিপত্র লিখতে।

এতিয়েন শান্তভাবে বলল, আমি জানতাম না। এতদিন বুঝতাম না তুমি এসব চাও না। না বুঝেই তোমার সঙ্গে সব বিষয়ে আলোচনা করেছি, তোমার মতামত নিয়েছি। এবার বুঝলাম। এবার আমি যা করার নিজের বুদ্ধিতেই করব। তবে তোমায় জানিয়ে দিচ্ছি এ মিটিং হবে। প্লুশার্ত না এলেও হবে এবং শ্রমিকরা তুমি না চাইলেও সে মিটিং-এ যোগদান করবে।

র‍্যাসেনোর বলল, যোগদান? এটা বলা যতটা সহজ করা ততটা সহজ নয়। তুমি তাদের কাছ থেকে চাও আন্তর্জাতিকের চাঁদা আদায় করতে।

এতিয়েন বলল, না, আন্তর্জাতিক ধর্মঘটী শ্রমিকদের কাছ থেকে এখন চাঁদা চায় না। তবে আন্তর্জাতিকে ঢুকলে শ্রমিকদেরই মঙ্গল হবে।

র‍্যাসেনোর বলল, ঠিক আছে, দেখা যাবে। আমিও তোমার সভার বক্তাদের একজন এবং আমার বলার অধিকার আছে। আমি কিছুতেই তোমাকে আর শ্রমিকদের মাথাগুলো ঘুরিয়ে দিতে দেব না। এবার আমি দেখব তারা আমাদের দুজনের মধ্যে কাকে সমর্থন করে, কাকে চায়—তোমাকে না আমাকে। আমাকে তিরিশ বছর ধরে তারা দেখে আসছে আর তুমি মাত্র এক বছরের মধ্যেই সব ওলট পালট করে দিয়েছ।

এই বলে র‍্যাসেনোর দরজাটা জোরে বন্ধ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কাগজের ফুল ও শিকলগুলো কাঁপতে লাগল।

এতিয়েন এবার ব্যস্ত ও উত্তপ্তভাবে পায়চারি করতে লাগল ঘরের মধ্যে। আপন মনে বলতে লাগল, গাঁয়ের লোকরা যদি র‍্যাসেনোরের পরিবর্তে তাকে সমর্থন করে তাহলে সেটা কি তার দোষ? সে জনপ্রিয়তার কাঙাল একথা সে স্বীকার করল না। আসলে সে জানেই না কি করে গাঁয়ের সব লোক এত তাড়াতাড়ি তাকে ভালবেসে তাদের নেতা বানিয়ে বসল। গাঁয়ের সব লোকের বন্ধুত্ব ও ভালবাসা কি করে সে পেল তা বুঝতে পারে না। সুতরাং যদি তাকে উচ্চাভিলাষের অভিযোগে অভিযুক্ত করে তাহলে সে কিছুতেই তা মানবে না।

হঠাৎ এতিয়েন সুভারিনের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, তুমি দেখছ না, আমার কোন বন্ধুর এক ফোঁটা রক্ত যদি পাত করতে দিতে পারতাম তাহলে আমি আর এখানে থাকতাম না, সোজা আমেরিকা চলে যেতাম।

এঞ্জিনীয়ার সুভারিন মুখে তেমনি ক্ষীণ হাসি নিয়ে তাচ্ছিল্যভরে বলল, রক্ত? তাতে কি হবে? পৃথিবী এখন অনেক রক্ত চায়।

এতিয়েন টেবিলে তার দুটো হাত রেখে একটা চেয়ারে বসল। সে সুভারিনের মুখপানে তাকাল। এতিয়েনের মনে হলো সুভারিনের নীরব স্বপ্নাবিষ্ট দু চোখের একটা লাল আভার মধ্যে এক অদম্য ইচ্ছাশক্তি লুকিয়ে আছে। সে কোন কথা না বললেও তার নীরবতাটার মধ্যে অদ্ভুত ভাষাময়তা আছে আর সে নীরবতা ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করছে তার উপর।

এতিয়েন বলল, তুমি যদি আমার মত এই অবস্থায় পড়তে তাহলে কি করতে? আমি চাই যা হোক কিছু একটা করতে,এবং এখন আমাদের সবচেয়ে ভাল কাজ হবে ঐ সংস্থায় যোগদান করা।

সুভারিন সিগারেট খেতে খেতে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে তার সেই প্রিয় কথাটা বলে উঠল, ধ্বংস! কিন্তু যতদিন তা না হয় ওদের আন্তর্জাতিক কাজ করে যাবে। সে তা চায়।

এতিয়েন জিজ্ঞাসা করল, কে?

সুভারিন সংক্ষেপে শুধু বলল, সে।

সুভারিন চাপা গলায় বলল কথাটা। সে তার গুরু বাকুনিনের কথা বলতে চাইছিল। সে বলল, তিনিই একমাত্র লোক যিনি এই ধ্বংসকার্য ঘটাতে পারেন।

তোমার যে সব বুদ্ধিজীবীরা, চিন্তাশীলরা বিবর্তনের কথা বলে তারা সব কাপুরুষ। মাত্র তিন বছরের মধ্যে তাঁর নেতৃত্বে এই আন্তর্জাতিক পুরনো সমাজব্যবস্থাটাকে একেবারে ভেঙ্গে দেবে।

এতিয়েন মন দিয়ে সুডারিনের এ সব কথা শুনল। কোন ধর্মীয় মতবাদের মত এই ধ্বংসের নীতিকথাটা বোঝার চেষ্টা করল। কিন্তু এ কথার অর্থ ঠিক বুঝতে পারল না, কারণ এ বিষয়ে সুডারিন কিছুই বলে না শুধু সংকেতপূর্ণ হেঁয়ালিভরা একটা শব্দ উচ্চারণ করে তার রহস্যটা বাড়িয়ে দিয়ে যায়।

এতিয়েন বলল, কিন্তু তুমি কথাটা বুঝিয়ে বলছ না কেন? কেন তুমি বলছ না তুমি কি চাও?

সুডারিন বলল, আমি চাই সব কিছু ধ্বংস করে ফেলতে। আমি চাই কোন জাতি থাকবে না, সরকার থাকবে না। কোন সম্পত্তি, ধর্ম, ঈশ্বর কিছুই থাকবে না।

এতিয়েন বলল, বুঝেছি তোমরা কোথায় যেতে চাও।

সুডারিন বলল, যেতে চাই সমাজহীন, রাষ্ট্রহীন, শ্রেণীহীন এক আদিম জগতে। চাই সব কিছু নতুন করে শুরু করতে।

এতিয়েন বলল, কিন্তু কেমন করে তুমি তোমার উদ্দেশ্য পূরণ করবে? কি ভাবে কোন পদ্ধতির মধ্য দিয়ে তোমার কাজ শুরু করবে?

আমি কাজ শুরু করব আগুন, বিষ আর ছুরি দিয়ে। আমাদের নায়ক হবে বিরাট নরঘাতক, এক বিরাট বিপ্লবী। সে নায়ক কোন বইপড়া বিদ্যার কথা মুখে বলে সময় নষ্ট করবে না। আমরা এমন কতকগুলো ধ্বংসকার্য ঘটাতে চাই যা দেখে বিভিন্ন রাষ্ট্রের শাসকগণ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠবে, যা জনগণকে জাগিয়ে তুলবে।

সুডারিন যখন এই সব কথা বলছিল তখন তার মুখ চোখ কেমন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছিল। তার গোটা দেহটা কেমন যেন শক্ত হয়ে উঠছিল। সে উঠে দাঁড়িয়ে টেবিলের একটা কোণ তার হাত দিয়ে শক্ত করে ধরে ছিল। এতিয়েন সভয়ে তার মুখপানে শুধু তাকিয়ে রইল আর সুডারিন সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলোর কথা বলে চলল যেদিন জারের প্রাসাদ উড়িয়ে দেবার জন্য মাইন পাতা হয় সেখানে, যেদিন পুলিস প্রধানদের পশুর মত ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়, যেদিন জারের এক প্রণয়িনীকে মস্কোর এক প্রকাশ্য রাজপথে ফাঁসি দেওয়া হয় আর জার জনতার মধ্যে দাঁড়িয়ে তা বিহ্বল চোখে দেখতে থাকে।

প্রতিবাদের সুরে এতিয়েন বলল, না না, আমরা তা চাই না। এখনো সে সময় এখানে আসেনি। নরহত্যা, অগ্নিকাণ্ড—এসব অন্যায়, ভয়ঙ্কর কাজ। আমাদের সহকর্মীরা তাতে বাধা দেবে।

এসব কথার অর্থ ঠিক বোঝে না এতিয়েন। এই ব্যাপক ধ্বংসকার্যের কথা শুনে তার নিগূঢ় বাঁচার প্রবৃত্তিটা শিউরে উঠল ভয়ে। সব কিছু ধ্বংস করে

ফেলার পর তারা কি করবে ? কি করে নতুন সমাজ, নতুন জাতি আবার গড়ে উঠবে ?

এতিয়েন বলল, তোমাদের কর্মপদ্ধতি বা কার্যসূচীর কথা কিছু বল। আমরা কোথায় কিভাবে যাচ্ছি তা জানতে চাই।

সুভারিন তখন তার রহস্যময় দুচোখের ঝাপসা দৃষ্টি দূরে ছড়িয়ে দিয়ে বলতে লাগল, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন যুক্তির জাল বোনা আমি অপরাধ বলে মনে করি। কারণ সে যুক্তির জাল বিপ্লবের পথে, অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করে।

একথা শুনে হাসি পেল এতিয়েনের। তবু তার মনে হলো, সুভারিনের সব কথা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এ সব কথার মধ্যে অনেক সত্য আছে। তবে এর বিপদও আছে। এই নীতি এই আদর্শ তার সহকর্মীদের মধ্যে প্রচার হলে তারা র‍্যাসেনোরের খপ্পরে গিয়ে পড়বে। তাছাড়া তাদের এখন বাস্তববোধের পরিচয় দিতে হবে।

দেসির এসে তাদের লাঞ্চ খাবার জন্য অনুরোধ করল। সুভারিন ও এতিয়েন দুজনেই উঠে গেল। অমলেট আর চীজ খেয়ে সুভারিন উঠে পড়ল। এতিয়েন তাকে থাকতে বলল। সুভারিন তখন বলল, কিজন্য থাকব ? তোমার যত সব বাজে কথা শোনার জন্য ? ওসব কথা অনেক শুনেছি।

এই বলে সিগারেট হাতে করে চলে গেল সুভারিন।

এতিয়েন এবার ক্রমশঃই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। তখন বেলা একটা বাজে। প্লুশার্তের আসার সময় হয়ে গেছে। দেড়টা বাজতেই প্রতিনিধিরা একে একে আসতে লাগল। পাছে তাদের মধ্যে কোম্পানির কোন চর থাকে তার জন্য প্রতিনিধিদের নিমন্ত্রণপত্রগুলো ভাল করে পরীক্ষা করে দেখতে লাগল এতিয়েন। যাদের হাতে নিমন্ত্রণপত্র ছিল না তারা তার পরিচিত হলে তাদের ঢুকতে দিচ্ছিল হলঘরে। দুটো বাজতেই র‍্যাসেনোর পাইপ খেতে খেতে এসে হাজির হলো। র‍্যাসেনোরের আপাতশান্ত ভাব দেখে রাগ হলো এতিয়েনের। দেখতে দেখতে জ্যাকারি মুকেত প্রভৃতি র‍্যাসেনোরের অনেক ভক্তও এসে জুটল। ওরা ধর্মঘট সম্বন্ধে মোটেই আগ্রহী নয়, কিছু বোঝে না বা খবর রাখে না। তবে কোন কাজকর্ম করতে হয় না, কুঁড়েমি করে ঘুরে বেড়াতে পায় বলে ধর্মঘট ওদের খারাপ লাগে না। ওরা মদ খেয়ে খেয়ে সব টাকা উড়িয়ে দিয়েছে।

মিনিট পনের পরেই হঠাৎ দেসির এসে খবর দিল এতিয়েনকে। বলল, তোমার বন্ধু এসে গেছে।

এতিয়েন দেখল সত্যিই প্লুশার্ত এসে গেছে। সে ত আশা ছেড়েই দিয়েছিল।

একটা বুড়ো ঘোড়ায় টানা গাড়ি থেকে নামল প্লুশার্ত। তার মাথাটা ছিল দেহের তুলনায় মোটা, তার পরনে ছিল একটা চকচকে ফ্রক কোট। একজন ভাল বক্তা বলে অহঙ্কার আছে প্লুশার্তের। তার চুলের খুব যত্ন। সে

উচ্চাভিলাষী। তার এই উচ্চাভিলাষ পূরণের জন্য সে সব সময় প্রদেশের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ায়, বক্তৃতা দিয়ে বেড়ায়।

প্লুশার্ত বলল, রাগ করো না তোমরা। কোন প্রশ্নের দ্বারা বিব্রত করো না। গতকাল সকালে ক্রেলিতে সভা ছিল, বিকালে ভ্যালিনেতে সভা ছিল। আজ সভাগনাতের সঙ্গে মার্সিয়েনে লাঞ্চ খেয়েছি। তারপর কোন রকমে একটা গাড়ি যোগাড় করে এসেছি। আমি দারুণ ক্লান্ত। যাই হোক, আমার বক্তৃতা শুনবে। আমি ঠিকই বলব।

এতিয়েন প্লুশার্তকে নিয়ে হলঘরে ঢুকল। র‍্যাসেনোর লজ্জায় পড়ে গিয়েছিল। সে প্লুশার্তকে আসতে নিষেধ করে চিঠি লিখেছিল বলে তার সঙ্গে কথা বলতে বা করমর্দন করতে সাহস পাচ্ছিল না। কিন্তু প্লুশার্ত নিজেই র‍্যাসেনোরের একটা হাত ধরে বলল, তোমরা মিটিং করতে চাও না কেন? প্রায়ই মিটিং করে সব আলোচনা করবে।

দেসির এসে প্লুশার্তকে কিছু খাবার জন্য অনুরোধ করল। কিন্তু প্লুশার্ত কিছু খেল না। বলল, তাড়াতাড়ি করো। আমার সময় নেই। এখান থেকে আমাকে জয়সেল যেতে হবে। লেগুজোর সঙ্গে কথা বলতে হবে। মাহিউ ও লেভাকের আসতে দেরি হয়ে গিয়েছিল। ওরা সবাই ঘরে ঢুকে দরজায় তালা দিয়ে দিল, যাতে কেউ কোন গোলমাল করতে না পারে। বাইরে জ্যাকারি মুকেত প্রভৃতি কিছু ছোকরা দরজা বন্ধ করতে দেখে হাসাহাসি করতে লাগল। ঠাট্টা করে বলল, ওরা যেন মেয়েদের মত গোপনে গর্ভ ধারণ করতে চলেছে।

সভায় প্রায় একশো মত খনিশ্রমিক যোগদান করল। এই হলঘরটা নাচঘর হিসাবে ব্যবহাব করা হয়। সকলেই প্লুশার্তের দিকে তাকিয়ে রইল এক দৃষ্টিতে। তার কালো কোটটা সত্যিই দেখার মত।

এতিয়েন প্রথমে বলল, একটা কমিটি গঠন করা উচিত। প্রতিনিধিরা এ কথা সমর্থন করল একবাক্যে। ঠিক হলো প্লুশার্ত সে কমিটির চেয়ারম্যান হবে। মাহিউ ও এতিয়েন সে কমিটির সদস্য নির্বাচিত হলো।

প্লুশার্ত চেয়ারম্যান হিসাবে কি বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু ভিতরের দিকের ছোট একটা দরজা খুলে দেসির একটা ট্রে হাতে ঘরে ঢুকল। তাতে ছয় গ্লাস বীয়ার ছিল। দেসির বিনয়ের সঙ্গে বলল, গলাটা ভিজিয়ে নিন। বক্তৃতা দিতে গলা শুকিয়ে যাবে।

মাহিউ ট্রেটা সরিয়ে মদ পরিবেশন করে দিল। প্লুশার্তের কিছু বলার আগেই র‍্যাসেনোর কিছু বলতে চাইল। প্লুশার্তের অনুমতি নিয়ে বলতে উঠল র‍্যাসেনোর। 'সহকর্মীবৃন্দ' বলে সম্বোধন করে তার বক্তৃতা শুরু করল। র‍্যাসেনোর অনেকক্ষণ ধরে ভালভাবে গুছিয়ে বলতে পারে বলে খনিশ্রমিকদের উপর তার একটা প্রভাব আছে। সে যখন কিছু বলতে যায় শ্রমিকরা তাতে 'ঠিক' 'ঠিক' বলে সমর্থন করে। কিন্তু আজ বলতে উঠে র‍্যাসেনোর শ্রোতাদের

মধ্যে এক বিরুদ্ধ ভাব লক্ষ্য করে নিজেকে সামলে নিল র‍্যাসেনোর। আন্তর্জাতিক সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করার আগে সে শুধু ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়ার যৌক্তিকতা নিয়ে আলোচনা করতে লাগল। আত্মসম্মানের খাতিরে তারা অবশ্য কোম্পানির কাছে নতি স্বীকার করতে পারছে না। কিন্তু এইভাবে ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়ার শেষ পরিণতি কী ভয়ঙ্কর সেটাও ভেবে দেখতে হবে। সে বলল, এর পরেও ধর্মঘট চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে গাঁয়ের সব লোক না খেয়ে শুকিয়ে মরবে। র‍্যাসেনোরের তিন চার জন ভক্ত লোক তাকে সমর্থন করল। কিন্তু দর্শকদের মধ্যে আর কেউ তাকে সমর্থন করল না। সবাই স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। তারা বেশ বুঝতে পারল র‍্যাসেনোর সরাসরি প্রত্যক্ষভাবে ধর্মঘটের বিরোধিতা না করলেও প্রকারান্তরে সে ধর্মঘটী শ্রমিকদের মনোবল ভেঙ্গে যেতে দিতে চাইছে। তারপর র‍্যাসেনোর যখন বলল ধর্মঘটী শ্রমিকরা বাইরের বিক্ষোভকারীদের দ্বারা যেন চালিত না হয় তখন সভার দর্শকদের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ লোক উঠে দাঁড়িয়ে র‍্যাসেনোরের কথার প্রতিবাদ করল; র‍্যাসেনোরের বক্তৃতা দেওয়া আর হলো না। সে মদের গ্লাসটা হাতে নিয়ে এক ঢোক এক ঢোক করে গিলতে লাগল। গোলমালের মধ্যেই সে বলতে লাগল, এমন কোন লোকের জন্ম হয়নি এখনো যে তাকে তার কর্তব্যকর্ম থেকে বিচ্যুত করতে পারে ভয় দেখিয়ে।

এবার প্লুশার্ত উঠে দাঁড়াল। টেবিল চাপড়ে সকলকে শান্ত হতে বলল। অনেক ক্ষুধার্ত শ্রমিক যারা অন্যান্য খনি থেকে এসেছিল তারা র‍্যাসেনোরের কথায় রেগে গিয়েছিল। লেভাক তার মুখের উপর ঘুঁষি পাকিয়ে বলল, তোমার ঘরে খাবার আছে, তুমি বড বড় কথা বলতে পার। মাহিউও দারুণ রেগে গিয়েছিল। এতিয়েন তাকে কোন রকমে শান্ত করল।

প্লুশার্ত এবার বলল, হে নাগরিকবৃন্দ, আমি তাহলে এবার বলতে পারি? সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সভা শান্ত হয়ে গেল। প্লুশার্তের গলার স্বরটা মোটা। সে ধীরে ধীরে তার গলার স্বরটা বাড়াতে, লাগল। সে প্রথমে কিছু ভূমিকাস্বরূপ বলে সোজা তার আন্তর্জাতিকে চলে গেল। বলল, এই আন্তর্জাতিক প্রথমে সামান্য প্রদেশ থেকে শুরু করে সমগ্র জাতি ও সারা বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে পড়বে। তার বিভিন্ন স্তরগুলো হাত দিয়ে দেখাতে লাগল প্লুশার্ত। তারপর এই আন্তর্জাতিক যখন দেশে দেশে দানা বেঁধে উঠবে তখন আর সমাজ বা রাষ্ট্র বলে কিছু থাকবে না এবং তখন সারা পৃথিবীর শ্রমিকরা একই ক্ষুধার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে উঠবে। এইভাবে দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণী ঐক্যবদ্ধ হয়ে পুরনো পচা বুর্জোয়াসমাজকে ধ্বংস করে দেবে নিঃশেষে। এইভাবে সারা বিশ্ব জুড়ে গড়ে উঠবে এক স্বাধীন সমাজ যেখানে প্রতিটি মানুষকে শ্রমের বিনিময়ে জীবিকা অর্জন করতে হবে। এবার একসঙ্গে অনেক কথা বলার পর হাঁপাতে লাগল আর তার নিশ্বাসের হাওয়ায় সামনের কাগজের শিকলটা নড়তে লাগল।

দর্শকরা খুশি হয়ে বলল, আপনি ঠিক বলেছেন, আমরা আছি আপনার সঙ্গে।

প্লুশার্ত আবার বলতে লাগল, এইভাবে সারা জগৎ মাত্র তিন বছরের মধ্যে জয় করে ফেলব আমরা। এখন বিভিন্ন দেশ থেকে আমরা সাহায্য পাচ্ছি। এই তিন বছর পরে আমরা যে আইন পাশ করব তা মালিকদের মেনে চলতে হবে। তখন তারা খনিতে নেমে যাবে কাজ করতে।

প্লুশার্ত এবার ধর্মঘট প্রসঙ্গের অবতারণা করল। বলল, যদিও নীতিগত-ভাবে আমরা ধর্মঘট সমর্থন করি না, কারণ তাতে মূল সমস্যার কোন সমাধান হয় না এবং তাতে শ্রমিকদের অবস্থা আরও খারাপ হয়ে ওঠে শুধু, তথাপি যতদিন এর থেকে ভাল কোন উপায় না পাওয়া যায় ততদিন একটা পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। শ্রমিকদের ভাবনা চিন্তা করে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। ধর্মঘট একটা কাজ করে, মূলধনকে আঘাত করে। দরকার হলে আমাদের আন্তর্জাতিক ধর্মঘটী শ্রমিকদের সাহায্য করবে এবং এর অনেক পূর্ব দৃষ্টান্ত আছে। একবার প্যারিসে ব্রোঞ্জ কারখানার শ্রমিকদের ধর্মঘটকালে মালিকরা যখন জানতে পারে আন্তর্জাতিক ধর্মঘটী শ্রমিকদের সাহায্য করছে তখন তারা মনোবল হারিয়ে শ্রমিকদের দাবি মেনে নিয়ে ধর্মঘট মিটিয়ে ফেলে। আর একবার লণ্ডনের খনি শ্রমিকদের ধর্মঘটকালে সাহায্য করে আন্তর্জাতিক। আপনারাও আন্তর্জাতিকে যোগদান করুন। আপনারা যোগদান করেছেন একথা মালিকরা শুনলেই ভয়ে কাঁপবে। পুঁজিবাদী সমাজের দাসত্ব করার থেকে আপনারা শ্রমিকদের এই বিরাট সৈন্যদলে যোগদান করুন। শ্রমিকদের স্বার্থের খাতিরে সেনাদল যে কোন সময়ে মৃত্যুবরণ করতে প্রস্তুত।

দর্শকরা এবার স্বতস্ফূর্তভাবে হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানাল প্লুশার্ত। প্লুশার্তকে তখন নিচু গলায় এতিয়েনকে বলল, সব ঠিক হয়ে গেছে। ওরা প্রস্তুত। কার্ডগুলো নিয়ে এস।

টেবিলের তলায় প্লুশার্ত তার একটা ছোট কাঠের বাক্স রেখেছিল। তার মধ্যে অনেক কার্ড ছিল।

প্লুশার্ত বলল, যে সব প্রতিনিধি আন্তর্জাতিকে যোগদান করতে ইচ্ছুক তাঁদের আমি কার্ড দিচ্ছি। পরে সব ঠিক হবে।

এমন সময় র‍্যাসেনোর প্রতিবাদ জানাল উঠে। তার বক্তব্য ছিল, বহু শ্রমিক আসেনি। তাদের সংখ্যা দশ হাজার। তার উপর যারা প্রতিনিধি হিসাবে এসেছে তাদের মধ্যে ভোটগ্রহণ করা হয়নি। আন্তর্জাতিকে যোগদান বা ধর্মঘট চালিয়ে যাবার অনুকূলে তাদের মত আছে কি না এ এবিষয়ে তাদের ভোট নিতে হবে।

কিন্তু মাহিউ, এতিয়েন, লেভাক প্রভৃতি সকলেই র‍্যাসেনোরের কথায় রেগে উঠল। সকলেই তাকে বাধা দিতে লাগল। এমন সময় সেই ছোট্ট দরজাটা

দিয়ে দেসির এসে বলল, পুলিস এসেছে। তারা সকলে যেন এই ছোট দরজাটা দিয়ে রান্নাঘরের ভিতর দিয়ে বাগানবাড়ির পাশ দিয়ে চলে যায় নিরাপদে। প্রথমে দেসির পুলিসকে বলে, তার ব্যক্তিগত কিছু বন্ধু এমনি মিলিত হয়েছে। কিন্তু পুলিস সে কথা মানেনি। তারা বলেছে তারা খবর পেয়েছে এখানে খনিশ্রমিকদের এক সভা হচ্ছে এবং এ সভা অবৈধ কারণ সব শ্রমিক নিমন্ত্রণ পায়নি। পুলিস তাই সোজা এই হলঘরের বাইরে এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়েছে। তাদের মধ্যে আছে একজন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আর চারজন অফিসার ও কিছু কনস্টেবল।

এদিকে পুলিসের কথা শুনেও সভার লোকরা পালাল না। সভার কাজ চলতে লাগল। প্লুশার্ত অবশেষে ভোট নিল। কিন্তু তাতে দেখা গেল সমস্ত প্রতিনিধিরা এ অঞ্চলের দশ হাজার খনিশ্রমিকের পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিকে যোগদান করার সিদ্ধান্ত নিল।

এমন সময় দেখা গেল বাইরে থেকে পুলিস দরজায় ঘা দিচ্ছে। বলছে দরজা খোলা না হলে তারা দরজা ভেঙ্গে ভিতরে ঢুকবে।

এদিকে সভার কাজ সব শেষ হয়ে যাওয়ায় তারা একে একে দেসিরের কথামত পিছনের দরজা দিয়ে চলে গেল। সবশেষে গেল প্লুশার্ত, এতিয়েন আর মাহিউ।

ওরা সবাই চলে গেলে পুলিস সত্যি সত্যিই দরজা ভেঙ্গে ভিতরে ঢুকল। কিন্তু দেখল সেই হলঘরে বিধবা দেসির ছাড়া আর কোন জনমানব নেই। দেসির বলল, দেখুন বলিনি, এখানে কেউ নেই।

কিন্তু সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট দেসিরকে ভয় দেখিয়ে বলল, তাকে থানায় ধরে নিয়ে যাবে তারা কারণ সে খনিশ্রমিকদের অবৈধ সভা অনুষ্ঠানের ব্যাপারে সাহায্য করেছে।

এদিকে দেসিরের বাগানবাড়ি দিয়ে বাইরের রাস্তায় এসে এতিয়েন আর সকলের মত ছুটতে লাগল। প্লুশার্তও ছুটছিল। এতিয়েন একসময় মাহিউকে বলল, পিয়েরেনকে দেখছি না, আসেনি কেন?

মাহিউ বলল, ও অসুস্থ।

মাহিউ ও এতিয়েনের মধ্যে কিছু কথা হলো। মাহিউ এখন শ্রমিকদের জয় সম্পর্কে আশান্বিত। আন্তর্জাতিক যখন সাহায্য পাঠিয়েছে তখন শ্রমিকদের জয় অবশ্যম্ভাবী এবং কোম্পানিই নত হয়ে তাদের কাজে যোগদানের জন্য অনুরোধ জানাবে। তাদের সব দাবি মেনে নেবে। তবু সারা খনি অঞ্চল জুড়ে এক ব্যাপক সন্ত্রাসের অশুভ আভাস দেখতে পেল মাহিউ। তার হঠাৎ মনে হলো, দমকা হাওয়ার মত হঠাৎ এক অগ্নিপ্রবাহ এসে খনি অঞ্চলের সব গ্রামগুলোকে পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে।

৫

আরও এক পক্ষকাল কেটে গেল। তখন জানুয়ারির প্রথম। দারুণ ঠাণ্ডা। কুয়াশায় চারদিক ঢাকা। খনি-অঞ্চলের গ্রামবাসীদের দুঃখকষ্ট আরও বেড়ে গেছে। প্রতিটি ঘণ্টায় সে কষ্ট বেড়ে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিকের লণ্ডন সংস্থা চার হাজার ফ্রাঁ পাঠিয়েছিল। কিন্তু তাতে এখানকার শ্রমিকদের তিন দিনের রুটির যোগাড় হয়নি। তার পর থেকে আর কোন সংস্থান নেই। আন্তর্জাতিকের মত শ্রমিকসংস্থার কাছ থেকে আর কোন সাহায্য না পেয়ে শ্রমিকদের মনোবল ভেঙে যায়। আর কার উপর তারা নির্ভর করবে, কাকে বিশ্বাস করবে? প্রবল শীতে তাদের মনে হলো তারা বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

বৃহস্পতিবার দুশো চল্লিশ নম্বর গাঁ একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়ল। পুঁজি খেয়ে ফেলেছে। এতিয়েন ও অন্যান্য প্রতিনিধিরা বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রাণপণ চেষ্টায় চাঁদা আদায় করতে লাগল। পাশাপাশি শহর ছাড়াও তারা প্যারিসে গিয়েও কিছু চাঁদা আদায় করল। তবে এ বিষয়ে প্রচুর চেষ্টা করা সত্ত্বেও তাতে বিশেষ কোন ফল হলো না। কারণ প্রথম প্রথম জনমত ধর্মঘটের অনুকূলে থাকলেও ধর্মঘটকালে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটায় ধর্মঘট সম্বন্ধে জনগণের সব উৎসাহ ও আগ্রহ ফুরিয়ে যায়। মাইগ্রাত ছাড়া যে সব ছোট খাটো দোকানদারেরা শ্রমিকদের ধার দিত তারা তাদের উপরওয়ালা মহাজনদের কাছ থেকে কোন ধার না পাওয়ায় তারা দোকান বন্ধ করে দেয়। দুটো রুটি তৈরির দোকানও বন্ধ হয়ে যায়। ফলে খাদ্যের উৎস সব রুদ্ধ হয়ে যায়। শ্রমিকরা একে একে তাদের পুরনো পোষাক আশাক ও আসবাবপত্র বিক্রি করতে থাকে। পরে আশা ভরসা সব একে একে হারিয়ে খালি পেটে বিছানায় শুয়ে ক্ষুধাকে দমন করে চলতে থাকে শ্রমিকরা।

অভাবের তাড়নায় এতিয়েনও একে একে তার পরনের কোট ও পায়জামা বিক্রি করে ফেলে। সম্ভব হলে সে মাহিউদের সাহায্য করার জন্য তার গায়ের মাংস পর্যন্ত বিক্রি করতে পারত। আর বাকি আছে শুধু জুতো জোড়াটা। আজকাল একটা বিষয়ে প্রায়ই আক্ষেপ করে এতিয়েন। সে বেশ বুঝতে পেরেছে ধর্মঘটটা আর কিছুকাল পরে ডাকা উচিত ছিল। কাজটা তাড়াহুড়ো করে করা হয়েছে। তাদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা আরো বেশ কিছু বাড়লে তবে ধর্মঘট ডাকা উচিত ছিল। তাহলে তারা আরো বেশীদিন ধরে মালিকদের সঙ্গে লড়াই করতে পারত। সুভারিন তখন ঠিকই বলেছিল কোম্পানি প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা বেশী না বাড়তেই শ্রমিকদের ধর্মঘটে প্ররোচিত করবে।

গাঁয়ে কোন খাবার নেই, জ্বালানি নেই। এই সব শোচনীয় অবস্থা চোখে দেখতে পারে না এতিয়েন। তাই সে প্রায়ই বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ায়। একদিন সন্ধ্যের সময় রেকিলার্তের পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখল পথের ধারে

একটা বুড়ী মেয়েমানুষ মূৰ্চ্ছিত হয়ে পড়ে রয়েছে। হঠাৎ এক তরুণীকে দেখতে পেয়ে এতিয়েন বলল, একবার এস ত, একে তুলে ধরি। ওকে কিছু পান করতে দিতে হবে।

পরে এতিয়েন দেখল তরুণীটি হলো মুকেত্তে। সে বলল, ও তুমি!

মুকেত্তে ছুটে গিয়ে তার ঘর থেকে কিছু মদ আর রুটি এনে খাইয়ে দিল বুড়ীকে। বুড়ীর জ্ঞান হলে জানা গেল বুড়ী কোন এক খনিশ্রমিকের মা, কুগনির এক গাঁয়ে থাকে। ও জয়সেলে ওর এক বোনের কাছ থেকে দশ স্যু ধার করতে গিয়েছিল। কিন্তু টাকা না পেয়ে ফিরে আসার সময় ক্ষুধার জ্বালায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে।

জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বুড়ী রুটিটা গোগ্রাসে গিলতে লাগল। তারপর একটু সুস্থ হয়ে চলে গেল। মুকেত্তে তখন এতিয়েনকে বলল, এবার আমার অনুরোধ, তুমি আমার ঘরে এসে কিছু খেয়ে যাও।

এতিয়েন ইতস্ততঃ করছে দেখে মুকেত্তে হেসে বলল, তুমি এখনো আমাকে ভয় করছ?

এতিয়েন এবার নীরবে মুকেত্তের পিছু পিছু তার ঘরে গিয়ে উঠল। মুকেত্তে এতিয়েনকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল তার নিজের ঘরে। মুকেত্তের ঘরটা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তার মুখে হাসি লেগেই আছে। আজ তাকে সত্যিই বেশ ভাল লাগছিল এতিয়েনের। তার দেওয়া রুটি তৃপ্তির সঙ্গে খেল এতিয়েন। তারপর গ্লাসে মদ ঢেলে দিল। ওদের ঘরে কোন অভাব নেই। কারণ ওর বাবা বুড়ো মুকে পনিম্যান বলে সে নিয়মিত কাজে যায়; ধর্মঘটের আওতায় পড়েনি। তাছাড়া মুকেত্তেও চুপ করে বসে থাকে না। সে একটা লণ্ড্রীর দোকান খুলেছে। তাতে রোজ সে তিরিশ স্যু করে পায়।

মুকেত্তে হঠাৎ এতিয়েনের কোমরটা জড়িয়ে অনুনয়ের সুরে বলল, বল, কেন তুমি আমাকে পছন্দ করো না।

মুকেত্তের কথা শুনে হাসতে লাগল এতিয়েন। বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, পছন্দ করি বৈকি।

মুকেত্তে বলল, কিন্তু আমি যেভাবে চাই সেভাবে পছন্দ করো না। তুমি আমাকে চাও না। তুমি জান, তোমার জন্য আমি মরে যাচ্ছি।

কথাটা সত্যি। আজ নয়, আজ প্রায় ছ মাস ধরে এতিয়েনের ভালবাসা ভিক্ষে করে আসছে মুকেত্তে। যখন যেখানে দেখা হয়েছে মুকেত্তে কত কাতর অনুনয় বিনয়ে এতিয়েনের অনুগ্রহ চেয়েছে। এতিয়েন তাকে প্রত্যাখ্যান করা সত্ত্বেও সে হতাশ হয়নি।

আজ যখন মুকেত্তে তার কোমরটা জড়িয়ে তার মুখপানে মুখ তুলে করুণ দৃষ্টিতে তাকাল, তার কম্পিত হাত দিয়ে চাপ দিতে লাগল এতিয়েনের গায়ের উপর তখন এতিয়েনের বড় মায়া হলো। মুকেত্তের গোল মুখ আর হলুদ গাত্র-

বর্ণের মধ্যে এমন কোন সৌন্দর্য নেই। কিন্তু তবু তার দেহের মধ্যে এমন একটা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আবেদন আছে, তার চোখের মধ্যে এমন একটা কামনার জ্বালাময়ী উত্তাপ আছে যাতে তাকে এক প্রাণবন্ত যৌবনে সজীব মনে হয় সব সময়। মুকেত্তের আবেদনে সাড়া না দিয়ে পারল না এতিয়েন।

এতিয়েনের সম্মতি দেখে খুশি হলো মুকেত্তে।

মুকেত্তে আবেগের সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে ধরল এতিয়েনকে যাতে মনে হবে সে জীবনে এই প্রথম একজন পুরুষকে স্পর্শ করছে। তার কুমারী জীবনের সব সঞ্চিত কামাবেগ আজ যেন প্রথম তার বহু আকাঙ্খিত পুরুষের উপর ঢেলে দিল মুকেত্তে। ঢেলে দিয়ে কৃতার্থ বোধ করল।

এতিয়েন যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালে সে কৃতজ্ঞতা জানাল। যেন এতিয়েন তার একটা বড় উপকার করেছে।

গাঁয়ে ফিরে যাবার পথে এতিয়েন কথাটা ভাবতে গিয়ে লজ্জাবোধ করতে লাগল। ভাবল মুকেত্তের মত সহজলভ্যা বহুবল্লভা মেয়েকে লাভ করায় কোন গৌরব নেই, গর্বের কিছু নেই। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, আর সে কখনো যাবে না মুকেত্তের কাছে। তবু এটাও সে কোনমতে অস্বীকার করতে পারল না যে মুকেত্তের অন্তরটা সত্যিই ভাল। তার প্রতি তার অন্ততঃ কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

কিন্তু গাঁয়ে ঢুকেই একটা নতুন খবর শুনল এতিয়েন। সে খবর শোনার সঙ্গে সঙ্গে মন থেকে মুকেত্তের কথা একেবারে কোথায় উবে গেল। শোনা গেল কোম্পানি নাকি শ্রমিকদের দাবি কিছুটা মেনে নেবে যদি তাদেব প্রতিনিধিরা আবার একবার ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করে। ডেপুটিদের কাছ থেকে এ খবর শোনা যায়। আসল কথা, ধর্মঘটের ফলে খনির অবস্থা ক্রমশই খারাপ হয়ে যাচ্ছে এবং মালিকরাও কম ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে না। উভয়পক্ষের গোঁড়ামিতে অবস্থাটা ক্রমশই সংকটজনক হয়ে উঠছে। শ্রমিকরা যেমন না খেতে পেয়ে মরছে শুকিয়ে, মালিকদের পুঁজিও ভাঙ্গা পড়ছে।

খনিতে একদিন কাজ বন্ধ মানেই মালিকদের শত শত ফ্রাঁ ক্ষতি। তাছাড়া যন্ত্রপাতি দীর্ঘদিন অচল হয়ে পড়ে থাকলে তা খারাপ হয়ে যায়। তার উপর খাদের উপর যে কয়লার স্টক ছিল তা সব প্রায় ফুরিয়ে গেছে। যে সব খরিদ্দাব নিয়মিত খাদ থেকে কয়লা নিত তারা অন্যত্র চলে যাচ্ছে। ভবিষ্যতে সেই সব খরিদ্দারদের আর পাওয়া যাবে না। খাদের ভিতর এখন কাঠের ঠেকা দেওয়াব কাজ ঠিকমত হচ্ছে না বলে প্রায়ই ছাদ থেকে ধস নামছে। তার ফলে খাদের ভিতর রাস্তাগুলো বন্ধ হয়ে যাবে। ডেপুটিরা সব এখনো রোজ দেখাশোনা করলেও তারা ঠিকমত মেরামতের কাজ করতে পারে না। খনিতে কাজ শুরু করতে গেলে আগে ছ মাস ধরে মেরামতের কাজ করতে হবে। গুজব রটেছে ক্রীভেসোরের কাছে তিনশো মিটারব্যাপী এক জায়গা

ধসে গেছে উপর থেকে। ফলে রাস্তাঘাট সব বন্ধ হয়ে গেছে। সেখানে লা পাওলেনের কাছে মিরৌ খাদের উপরেও প্রথমে এক বিরাট ফাটল দেখা যায়। পরে তা ধসে যায়। তার পরের দিন আবার সে ভোরের কাছে একটা জায়গা ধসে যায় আর তার ফলে সারা গাঁটা এমনভাবে কেঁপে ওঠে যে দুটো পুরনো বাড়ি ভেঙ্গে পড়ে যায়।

কথাটা শোনার পর এতিয়েন ও তার প্রতিনিধিরা ভেবে পেল না কি করবে। একবার ভাবল ম্যানেজারের কাছে তাদের যাওয়া দরকার। কিন্তু পরিচালকমণ্ডলীর প্রকৃত মনোভাব কি, তারা কি চায়, তা না জেনে ম্যানেজারের সঙ্গে তাদের দেখা করা ঠিক হবে কি না তা ভেবে পেল না। তাই তারা প্রথমে ডানসার্তের সঙ্গে দেখা করল। কিন্তু ডানসার্ত ওদের স্পষ্ট করে কিছু বলতে পারল না। তাই ওরা মঁসিয়ে হানিবোর সঙ্গে দেখা করার সিদ্ধান্তই গ্রহণ করল। ওরা বলল, একবার গিয়ে দেখা করা উচিত। তা না হলে কোম্পানি বলবে তাদের একবার সুযোগ দিল না শ্রমিকরা। তবে এটাও ঠিক করল যে ওরা কোম্পানির কাছে মাথা নত করবে না, তারা যে সব দাবি উত্থাপন করেছে তার কোনটা ছেড়ে দেবে না। যুক্তিসঙ্গত না হলে কোম্পানির কোন শর্ত ওরা কিছুতেই মেনে নেবে না।

মঁসিয়ে হানিবোর বাড়িতে ওরা গেল মঙ্গলবার। তবে আগের সেই সাক্ষাৎকারের তুলনায় এবারকার সাক্ষাৎকার কম বন্ধুত্বপূর্ণ এবং নীরস মনে হলো। এবারও মাহিউ শ্রমিকদের প্রতিনিধি হিসাবে কথা বলতে লাগল। মাহিউ বলল শ্রমিকরা তাদের পাঠিয়েছে মালিকদের কিছু বলার আছে কি না তা জানতে। মঁসিয়ে হানিবো বলল, কোম্পানির পক্ষ থেকে নতুন খবর দেবার মত কিছুই নেই। মালিকরা তাকে কোন নির্দেশ দেয়নি। হানিবো শ্রমিক প্রতিনিধিদের প্রথমে দেখে ত বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল। মালিকপক্ষের এই মনোভাব দেখে প্রতিনিধিরা তাদের সব উৎসাহ হারিয়ে ফেলল।

কিছুক্ষণ পর হানিবো বলল, মালিকরা কিছু না বললেও সে তার নিজের দায়িত্বে মিটমাটের এক প্রস্তাব দিতে পারে। শ্রমিকরা আগের মত কয়লা কাটা আর কাঠের কাজের জন্য আলাদা বেতন পাবে। আর টব প্রতি দু সেন্তিমে বেশী পাবে। কিন্তু প্রতিনিধিরা বলল, তারা পাঁচ সেন্তিমের কম নেবে না। তাঁরা হানিবোর এ প্রস্তাব মানবে না। হানিবো তবু তাদের অনশন-ক্লিষ্ট ছেলে পরিবারের কথা ভেবে এ প্রস্তাবে রাজী হবার জন্য আবার অনুরোধ করল। কিন্তু ওরা অসহিষ্ণু হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ওরা ওদের মূল দাবি থেকে এক চুলও নড়বে না।

ঐদিন ঠিক বেলা দুটোর সময় গাঁয়ের সমস্ত মেয়েদের এক প্রতিনিধিদল মাইগ্রাতের দোকানে যায়। তাদের উদ্দেশ্য ছিল লোকটার অন্তরটাকে কোন-রকমে স্পর্শ করে আর এক সপ্তা চলার মত জিনিস ধার চাওয়া। এই প্রতি-

নিষিদ্দলের নেতৃত্ব করতে লাগল মাহিউর স্ত্রী। তার সঙ্গে মা ক্রল আর লা লেভাকও গেল। পিয়েরেন গেল না তার স্বামীর অসুখের অজুহাতে। ওরা সংখ্যায় ছিল কুড়িজন। ওদের একসঙ্গে এভাবে পথ দিয়ে এগিয়ে যেতে দেখে মঁতস্যুর লোকেরা ভয় পেয়ে গেল। ভাবল তারা বুঝি বা মরীয়া হয়ে লুটপাট করতে আসছে। তাই তারা সব ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল। একটি মেয়ে তার রূপোর গয়নাগুলো লুকিয়ে ফেলল।

এদিকে মাইগ্রাত ওদের দেখে ভাবল অন্য কথা। ভাবল একসঙ্গে ওরা ধারের টাকা মেটাতে এসেছে। তাই না জেনে ওদের খাতির করে দোকানের ভিতর নিয়ে গেল। কিন্তু মাহিউর স্ত্রী যখন এক সপ্তার জিনিস ধার চাইল তখন রেগে গেল মাইগ্রাত। ওরা কি ওকে পথে বসাতে চায়? না, আর একটা আলু বা এক টুকরো রুটিও দেবে না। মেয়েরা চুপ করে বিনয়ের সঙ্গে মাইগ্রাতের কথা সব শুনে আবার কাতর অনুরোধ জানাল। তার অন্তরে দয়া মায়া জাগানোর চেষ্টা করল বিভিন্নভাবে। মাইগ্রাত ওদের কারো কোন কথা শুনল না। শুধু মা ক্রলকে বলল, সে তার মেয়েকে তার কাছে পাঠালে তাব দোকানের সব জিনিস দিয়ে দেবে। লা লেভাক বলল, সে তার দেহ দান করতে এখনি রাজী আছে। কিন্তু মাইগ্রাত সে কথা শুনেও শুনল না। সে ওদের দোকান থেকে একরকম বার করে দিল। ওরা রাস্তায় এসে বলতে লাগল, জিনিস দেবে কি, মাইগ্রাত আসলে কোম্পানির চর। কোম্পানি তাকে টাকা দেয়। মাহিউর স্ত্রী আকাশের পানে তাকিয়ে মাইগ্রাতের মৃত্যু কামনা করল ঈশ্বরের কাছে। বলল, এই ধরনের নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোকের বেঁচে থাকার কোন অর্থ হয় না।

তাদের ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসতে দেখে বাড়ির পুরুষরা একেবারে হতাশায় ভেঙ্গে পড়ল। আর কোন উপায় নেই, আশা নেই। শুধু আজ নয়, তাদের সামনে এইভাবে ঠিক এমনি করে এক হিমশীতল অন্ধকারে জমাট বেঁধে আছে অজস্র দিন। তবু যতই দুঃখ আর হতাশা বেড়ে যায় ততই ওরা কঠোর ও অনমনীয় হয়ে ওঠে আরও। আত্মসমর্পণের কথা বলতে সাহস পায় না কেউ। ওরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে সকলে শেষ পযন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাবে, শত দুঃখ-কষ্ট ও বিপদে সংঘবদ্ধ হয়ে থাকবে এই মর্মে ওরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে পরস্পরের কাছে। ওদের সেই প্রতিজ্ঞাপালনে এক সামরিক বীরত্বের গর্ব অনুভব করে ওরা। কে কত কষ্ট সহ্য করতে পারে, কে কত ত্যাগ করতে পারে সে বিষয়ে যেন এক অঘোষিত প্রতিযোগিতা চলেছে ওদের মধ্যে।

সেইদিন সন্ধ্যায় মাহিউদের বাড়িতেও অবস্থা খুব শোচনীয় হয়ে উঠেছিল। সুপ করার মত কিছুই নেই, রুটির একটা টুকরো নেই। তার উপর জ্বালানির কোন কাঠ নেই। ঘরে আগুন জ্বালাবার কোন কিছুই নেই। আজ আলজিরেকে খাদের মুখে কিছু কয়লা কুড়িয়ে আনাব জন্য পাঠানো হয়েছিল।

কিন্তু সে ফিরে এসেছিল। কোম্পানির একটা লোক মারতে এসেছিল তাকে। তাই শুধু হাতে ফিরে এসেছে সে। ঘরের আসবাবপত্র সব একে একে বিক্রি করে ফেলায় ঘরখানা একেবারে শূন্য। যে ঘড়িটা অনবরত টিক টিক করত সে ঘড়ি না থাকায় ঘরখানার অনভ্যস্ত নীরবতা অসহ্য ঠেকে ওদের কাছে। কোন তোষকের মধ্যে একটুও তুলো নেই।

এখন ঘরের মধ্যে থাকার মধ্যে আছে শুধু একটা গোলাপী রঙের কাঠের বাক্স। মাহিউ তার স্ত্রীকে একবার উপহারস্বরূপ দিয়েছিল। মাহিউর স্ত্রী সেটা বিক্রি করতে চাইলে মাহিউ তাতে প্রবল আপত্তি জানাল।

মাহিউর স্ত্রী বলল, বদমাস জাঁলিনটা গেল কোথায়? তাকে চাটনির জন্য কিছু আনাজ আনতে বললাম। আব সে এলই না। যাই হোক, গরুর মত আমরা তা চিবোতাম কিছুক্ষণ। গতকাল রাতে সে বাড়ি ফেরেনি। অথচ ওর মুখ দেখে ক্ষুধার্ত বলে মনেই হয় না।

এতিয়েন বলল, ও বোধ হয় রাস্তায় পয়সা ভিক্ষা করে।

একথা শুনে আরও রেগে গেল মাহিউর স্ত্রী। বলল, আমার ছেলেরা যদি ভিক্ষা কবে তাহলে তাদের খুন কবে তারপর আমি নিজেকে খুন করব।

হেনরি আব লেনোব আশ্চর্য হয়ে ভাবতে লাগল আজ রাতে কোন খাবার ব্যবস্থা হলো না দেখে। মাহিউ টেবিলটার উপর শুয়ে রইল। বুড়ো বনিমোর জিবটাকে মুখেব ভিতর নাড়াচাড়া করে ক্ষুধা দমন করছিল। মাঝে মাঝে কাশছিল আর কালো রক্ত উঠছিল মুখ দিয়ে। তার পায়ে বাতের ব্যথাটাও বেড়েছিল। মাহিউর হাঁপানিটা বেড়েছে। ছেলেদের রক্তহীনতাটা বেড়েছে। তার উপর এইভাবে তাদের শুকিয়ে মরতে হবে।

হঠাৎ এতিয়েন এই সব দেখতে দেখতে কি একবার ভাবল। তারপর বেবিয়ে গেল ঘর থেকে। ভাবল মুকেত্তের কাছে গিয়ে একটা রুটি চাইবে। সে গেলে মুকেত্তে হয়ত প্রেমবিধুরা কোন নারীর মত তার হাতটা চুম্বন করবে। তা করুক। দরকার হলে সে তার দেহটা মুকেত্তের হাতে তুলে দেবে। তবু সে সব কিছুর বিনিময়ে তার বন্ধুদের কিছু সাহায্য করতে চায়।

এদিকে মাহিউর স্ত্রীও বেরিয়ে পড়ল ঘর থেকে। সে গেল লা লেভাকের কাছে। দিনকতক আগে একটা রুটি ধার দিয়েছিল ওদের। আজ তা চাইতে যাচ্ছে।

মাহিউর স্ত্রী লেভাকদের বাড়িতে গিয়েই সরাসরি লা লেভাককে বলল, আমি তোমাকে একদিন একটা রুটি ধার দিয়েছিলাম। আজ সেটা দাও।

লা লেভাক কোন কথা বলল না। কিন্তু কিছু না বললেও ঘরের অবস্থা দেখে বুঝতে কিছু বাকি রইল না মাহিউর স্ত্রীর। করুণা জাগল তার মনে। লা লেভাক শূন্য হতাশ দৃষ্টিতে নির্বাপিতপ্রায় আগুনটার দিকে তাকিয়ে ছিল। তার স্বামী লেভাক খালি পেটে মদ খেয়ে মাতাল হয়ে ঘুমোচ্ছে। বুতলুপ এক

জায়গায় বসে ঝিমোচ্ছে। একদিন সে অনেক খরচ করে আজ সে সতর্ক হয়েছে।

লা লেভাক বলল, একটা রুটি আমি নিজেই ধার করতে বেরোচ্ছিলাম।

ঘুমের ঘোরে লেভাক একবার ক্ষুধার যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠতেই লা লেভাক রাগে আগুন হয়ে বলে উঠল, মদ না গিলে কারো কাছে কিছু টাকা ধার চাইতে পারতে ত।

অপরিচ্ছন্ন অগোছালো ঘরখানা হতে একটা উৎকট দুর্গন্ধ বার হচ্ছিল। ওদের ছেলে বেবার্ত আজ সকাল থেকে বেরিয়ে কোথায় গেছে এখনো ফেরেনি। লা লেভাক বলতে লাগল আর যেন কোনদিন না ফেরে সে। তারপর লা লেভাক বুতলুপের গায়ে চাপ দিয়ে বলল সে বিছানায় শুতে যাচ্ছে।

তার সঙ্গে এক বিছানায় শুতে যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে লা লেভাক বলল, চলে এস, আমরা উপরতলায় শোবার ঘরে যাই। আগুন নিবিয়ে গেছে। আর বাতি জ্বালাবার প্রয়োজন নেই। খালি প্লেটগুলো দেখে কোন লাভ নেই। চল লুই, আমরা শুতে যাই। তুমি ত একসঙ্গে শুতে ভালবাস। ওই মাতালটা মরুক ওখানে।

লেভাকদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে মাহিউর স্ত্রী বাগান পার হয়ে পিয়েরেনদের বাডি চলে গেল। ভিতর থেকে হাসির শব্দ আসছিল। এক মিনিট পরে ওরা দরজা খুলল। খুলেই বলল, ও তুমি! আমি ভেবেছিলাম ডাক্তার।

তারপর মাহিউর স্ত্রীকে কিছু বলতে না দিয়েই পিয়েরেনকে দেখিয়ে বলল, উপর থেকে ওকে দেখতে ভাল মনে হচ্ছে; কিন্তু ওর পাকস্থলীটা এখনো ভাল হয়নি। মা মঁতসু গেছে যদি কোন রকমে একটা রুটি পায়। ডাক্তার ওকে খেতে বলেছে।

মাহিউর স্ত্রী বুঝতে পারল মিথ্যা কথা বলছে পিয়েরেন। ঘরের মাঝখানে একটা টেবিলে মদের বোতল আর কিছু রুটির টুকরো পড়ে রয়েছে। খরগোশের মাংস রান্না হচ্ছে আর তার গন্ধ আসছে।

পিয়েরেন বলল, লা পাওলেনের সেই দানশীলা মেয়েটি বড় দয়ালু। সে ঐ বোতলটা আমার স্বামীকে দিয়ে গেছে। মেয়েটা বড় দয়ালু। এত ধনী ঘরের মেয়ে হয়েও গরীব শ্রমিকদের বাড়ি এসে দানসামগ্রী দিয়ে যায়।

মাহিউর স্ত্রী ভাবল ওরা তেলা মাথাতেই তেল দেয়। যারা অপেক্ষাকৃত কম গরীব তাদের ঘরেতেই দানসামগ্রী পৌঁছে দেয়। গাঁয়ের আর কাউকে দেয়নি।

মাহিউর স্ত্রী পিয়েরেনের কাছে কিছু আটা চাইল: পিয়েরেন বলল, তার ঘরে কিছু গম, বা সুজি বা আটার ভুষি পর্যন্ত একমুঠোও নেই।

এমন সময় একটা ঘর থেকে কান্নার শব্দ এল। মাহিউর স্ত্রী দেখল লিডি বাইরে আসার জন্য ছটফট করছে। লিডি আজ সকাল পাঁচটার সময় বাইরে গিয়ে

সারাদিন বাইরে বাইরে কাটায় বলে তাঁকে চাবি দিয়ে ভরে রেখেছে। মেয়েটা অত্যন্ত বদমাস হয়ে গেছে।

বিদায় জানিয়ে চলে এল মাহিউর স্ত্রী। তখন সন্ধ্যে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। আকাশে মেঘ থাকলেও আকাশের এক জায়গায় চাঁদ দেখা যাচ্ছে। বাড়ি যাবার প্রবৃত্তি হলো না তার। গভীর দুঃখে গাঁয়ের নির্জন পথটা ধরে অন্য দিকে হাঁটতে লাগল। কোথায় যাবে তা সে নিজেই জানে না। আগে এই ভর সন্ধ্যার সময় প্রতিটা বাড়ি আনন্দোচ্ছল কলকোলাহলে পূর্ণ হয়ে থাকত। প্রতিটি বাড়ি থেকে পিঁয়াজভাজার গন্ধ আসত দূর থেকে। কিন্তু আজ পথের দুধারের প্রতিটি বাড়ির দরজা বন্ধ। প্রতিটি বাড়ি অন্ধকার, নিঝুম নিস্তব্ধ। কোন বাড়িতে গিয়ে কি হবে? কোন কিছু সাহায্য পাওয়া যাবে না। এখন ঘরে ঘরে প্রতিটি মানুষ ক্ষুধার্ত উদরে বিছানায় নীরবে নিস্তব্ধ অবস্থায় ঘুমের প্রতীক্ষা করছে।

চার্চটা পার হতেই গ্রামের যাজককে দেখতে পেল মাহিউর স্ত্রী। যাজককে দেখে আশা হলো তার। যাজক হয়ত রাতের অন্ধকারে গাঁয়ে গিয়ে তাঁর কর্তব্য পালন করছেন। কারণ দিনের বেলায় এ কাজ করলে কোম্পানি হয়ত ভাববে শ্রমিকদের সঙ্গে তার অশুভ আঁতাত আছে।

মাহিউর স্ত্রী একবার যাজককে ডাকল, বাবাসাহেব।

যাজক যেতে যেতে বলল, শুভ নৈশ নমস্কার ভদ্রে।

কিন্তু যাজকেব কাছে কিছু চাইতে পারল না মাহিউর স্ত্রী। ওরা দুজনে কথা বলতে বলতে গাঁয়েব পথে যাচ্ছিল। মাহিউর স্ত্রী একসময় দেখল সে তাদেব বাড়ির দরজার কাছে চলে এসেছে।

বাড়িব ভিতর ঢুকে সে দেখল, সকলে এক শুষ্ক নীরব নৈরাশ্যে জমাট বেঁধে বসে আছে। সকলেই তার খালি হাতদুটোর পানে তাকাচ্ছে। হাত-দুটো খালি দেখে তারা আরও হতাশ হলো। এখন তাদের একমাত্র ভরসা এতিয়েন। সে যদি কিছু আনে কোনভাবে।

এমন সময় এতিয়েন এসে ঘরে ঢুকল। তার হাতে রুমালে বাঁধা বারোটা আলুসিদ্ধ ছিল। সেইগুলো খুলে রেখে সে বলল, এছাড়া আর কিছু পেলাম না। কোথাও কারো কাছে রুটি নেই।

মুকেত্তের কাছে গিয়ে সত্যিই রুটি চায় এতিয়েন। কিন্তু মুকেত্তের ঘরেও রুটি ছিল না। মুকেত্তে তখন তার খাবার থেকে এই সিদ্ধ আলুগুলো তুলে দেয় এতিয়েনের হাতে। তারপর তাকে চুম্বন করে।

মাহিউর স্ত্রী সকলকে সে আলু ভাগ করে দেবার সময় এতিয়েনকেও তার ভাগ দিতে গেলে এতিয়েন তা নিল না। বলল, আমি কিছু খেয়ে এসেছি।

এতিয়েন বলল, সে একটা খবর শুনেছে। কোম্পানি নাকি ধর্মঘটী শ্রমিকদের গোঁড়ামি আর অবাধ্যতায় বিরক্ত হয়ে অন্য শ্রমিক নিয়োগ

করতে চায়। তার মানে শ্রমিকদের ঐক্যের মধ্যে ফাটল ধরাতে চায়। তার মানে শ্রমিকদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। কোম্পানি নাকি বড়াই করে বলছে বহু খনিশ্রমিক খাদে গিয়ে কাজ করতে রাজী হয়েছে। আশপাশের খনির-অনেক শ্রমিক কাজে যোগ দেবে।

মাহিউ বলল, এটা বিশ্বাসঘাতকতা। তাহলে এর ব্যবস্থা করতে হবে। তাহলে আমাদের কাল রাতে ভাঁদেমের বনে যেতে হবে। এই ভাঁদেমের বনেই অতীতে একবার ধর্মঘটী খনিশ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধ রাজার সৈন্যদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সিদ্ধান্ত নেয়। সেই ভাঁদেমের বনে আগামী কাল রাতে ওরা গিয়ে মিলিত হবে নিজেদের মধ্যে।

বনিমোর বলল, আমাকেও নিয়ে যাবে। আমিও যাব।

মাহিউর স্ত্রী বলল, আমরা সকলেই যাব। এই ধরনের বিশ্বাসঘাতকতার অবসান ঘটাতে হবে।

এতিয়েন বলল, সমস্ত খনিশ্রমিকদের কাছে কার্ড পাঠাতে হবে। এমন সময় ঘরের আগুন কাঠ না থাকায় নিবে গেল। কাঠ বা তেল ঘরে কিছুই নেই। বাতিও নিবে গেছে। ওরা তাই একে একে অন্ধকারের মধ্যেই বিছানায় চলে গেল

৬

জাঁলিন এখন ভাল হয়ে গেছে। সে এখন হাঁটতে পারে। কিন্তু তার পাগুলো ঠিকমত লাগানো হয়নি বলে সে খুঁড়িয়ে চলে পাতিহাঁসের মত।

একদিন সন্ধ্যার সময় জাঁলিন তার দুজন অনুচর বেবার্ত আর লিডিকে নিয়ে রেকিলার্তের কাছে একটা দোকানের উল্টোদিকে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল। তার লক্ষ্য ছিল দোকানের সামনে ঝোলানো একটা শুকনো কডমাছ। মাছটা আনার জন্য দুবার বেবার্তকে সে পাঠায়। কিন্তু দুবারই হঠাৎ পথ দিয়ে লোক এসে পড়ায় তা আনা হয়নি। জাঁলিন তাই সর্বক্ষণ পাহারায় আছে।

এবার ঘোড়ায় চেপে এক ভদ্রলোক এল। ওরা দেখল মঁসিয়ে হানিবো ঘোড়ায় চড়ে এইদিকেই আসছে। হানিবোকে দেখে বেড়ার কাছে ওরা শুয়ে পড়ল। ধর্মঘট শুরু হওয়ার পর থেকে রোজ হানিবো এইভাবে ঘোড়ায় চেপে একা একা ধর্মঘটী শ্রমিকদের গাঁগুলো ঘুরে বেড়ায়। সৈনিকদের মত বড একটা কোট পরে একা একা নির্ভয়ে গাঁগুলোর অবস্থা নিজের চোখে পর্যবেক্ষণ করতে করতে ঘুরে বেড়ায় হানিবো। কিন্তু একদিনের জন্যও কোথাও কোন গোলমাল দেখেনি। কেউ তাকে লক্ষ্য করে কোনদিন ঢিল ছোঁড়েনি। শুধু দেখেছে সন্ত্রস্ত শান্ত জনগণ তাকে দেখেও কোন অভিনন্দন জানায়নি।

রেস্কিলার্তের কাছে আর একটা জিনিস দেখেছে হানিবো। ধর্মঘটের অভাব অভিযোগ সত্ত্বেও যুবক যুবতীরা এমন কি অপরিণতবয়স্ক ছেলেমেয়েরাও অবাধে মিলিত হচ্ছে। মেতে উঠছে এক নির্লজ্জ প্রেমলীলায়। কত শায়িতা যুবতীর বুকের উপর চেপে আছে কত যুবক। অবাধ রতিলীলায় এই অতিব্যাপক মত্ততা যতই দেখে হানিবো ততই তার বুকের মধ্যে জেগে ওঠে অতৃপ্ত কামনার এক অবদমিত উচ্ছ্বাস। তার চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে আসে। সব কিছু দেখেও কিছু না দেখার ভাণ করে সামনের দিকে দৃষ্টি রেখে সোজা চলে যায়।

জাঁলিন রেগে বলল, আমাদেব ভাগ্যটাই অতি খারাপ। বেবার্ত, যা ত, মাছটার লেজ ধরে টেনে নিয়ে আয়। এই নিয়ে চারবার হলো।

এর পর দেখল আবাব দুজন লোক আসছে। জাঁলিন দেখল তার দাদা জ্যাকারি আর মুকেত কথা বলতে বলতে এই দিকে এল। জ্যাকাবি মুকেতকে বলল, সে তাব স্ত্রীব জামার মধ্যে চল্লিশ স্যু সেলাই করা অবস্থায় দেখতে পেয়েছে। মুকেত জ্যাকারিকে বলল, আগামী কাল তাবা দুজনে মার্সিয়েনেব কাছে মন্তোবি নামে একটা জায়গায় ফূর্তি কবতে যাবে। ধর্মঘটের ব্যাপার নিয়ে ওবা মাথা ঘামাতে চায় না। এমন সময় এতিয়েনও এসে পড়ল এবং ওদের সঙ্গে কিছু কথা বলতে লাগল।

জ্যাকারি আর মুকেত চলে গেলে আর একজন খনিশ্রমিক এসে পড়ল সেইখানে। জাঁলিন শুনতে পেল এতিয়েন সেই শ্রমিককে বনের কথা বলল। এতিয়েন বলল, ভাঁদেমেব বনে ওদেব যে মিটিং হবার কথা ছিল তা একদিন পিছিয়ে দিতে হবে। কাবণ সকলকে খবর দেওয়া হয়নি। আগামী কাল সন্ধ্যার সময় ওবা জমায়েৎ হবে এবং তখনি যা হোক একটা ফয়সালা হবে।

ওরা চলে গেলে জায়গাটা এবার নির্জন হয়ে উঠল। জাঁলিন এবার নিশ্চিন্ত হয়ে বেবার্তকে যেতে বলল। এখন অন্ধকার হয়ে গেছে এবং দোকানের বুড়ীটা ঘুমিয়ে পড়েছে। জাঁলিন বলল, দড়িটা খুলে মাছের লেজটা ধরে টেনে আনবি।

বেবার্ত তাই করল। সে মাছটা নিয়ে চলে আসার পর বুড়ী জেগে উঠল। সে বুঝতে পারল না অন্ধকারের মধ্যে কার একটা হাত এসে দড়ি ছিঁড়ে মাছটা কোথায় নিয়ে পালিয়ে গেল এক নিমেষে।

এইভাবে চুরি করে করে ওরা এই গোটা অঞ্চলটাতে ত্রাসের সৃষ্টি করেছে। প্রথমে ওরা থাকত লে ভোরোর খাদের উপরে যেখানে কয়লা গাদা করা থাকত সেইখানে। তারপর ওরা যেত মাঠের গাদার কাছে। স্তূপাকৃত কাঠের মাঝে ওরা তিনজনে লুকোচুরি খেলত। তারপর ওরা সারা মাঠে ঘুরে বেড়িয়ে জাম বনকুল প্রভৃতি খেয়ে বেড়াত। যার যা পায় চুরি করে। এক একদিন ওরা মাইলের পর মাইল ছুটে গিয়ে ভাঁদেমের বন পর্যন্ত চলে যায়। সেই বনে কোন ফল মাকড় পেলে তা খায়। এইভাবে ওরা সারাদিন ধরে ঘুরে বেড়ায়।

কিন্তু এভাবে যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়ালে কোন ক্ষতি ছিল না। ওদের সবচেয়ে বড় দোষ এই যে ওরা মঁতসু আর মার্সিয়েনের মাঝখানের গাঁগুলোয় যখন যেখানে যা পায় তাই চুরি করে। জমিতে পিঁয়াজ দেখলেই তা তুলে নেয়। কারো ফুল বা ফলের বাগান দেখলে তা নষ্ট করে। দোকানের 'শোকেসে' কোন জিনিস সাজানো থাকলে তা সুযোগ বুঝে চুরি করে।

এই সব গাঁয়ের লোকেরা ভাবে ধর্মঘটী শ্রমিকদের মধ্য থেকে একটা চোরের দল গড়ে উঠেছে। তারাই সুপরিকল্পিতভাবে চুরি করে বেড়ায়। কিন্তু আসলে এ চোরের দল হলো মাত্র তিনজনের—জঁালিন, বেবার্ত আর লিভি। ওদের মধ্যে জঁালিনই হলো দলপতি। জঁালিন যাকে যা হুকুম করে সে তাই নির্বিবাদে করে। জঁালিন লিভিকে তাদের বাড়িতে চুরি করতেও বলে। ঘরেতে জারের ভিতর পিয়েরেন কোন খাবার জিনিস রাখলেই জঁালিনের নির্দেশমত লিভি তা এনে তাকে দেয়। জঁালিন নিজে বেশী অংশ নিয়ে বাকিটা ওদের দেয়। এর জন্য লিভি বাড়িতে দারুণ শাস্তি পায়। সে মার খায়, তাকে ঘরে আটক করে রাখা হয়। তবু সে জঁালিনের সংশ্রব ছাড়তে পারেনি।

কিছুদিন হলো জঁালিন বড় বাড়াবাড়ি করছে। সে লিভিকে প্রায়ই মারে। আর বেবার্ত তার থেকে বেশী বলবান বলে তাকে ভয় দেখিয়ে ভেড়া বানিয়ে রাখে। তাকে এইভাবে ঠকিয়ে মজা পায়। আজকাল জঁালিন ওদের একটা অদ্ভুত কথা বলে প্রায়ই ঠকায়। আজকাল জঁালিন থাকতে থাকতে হঠাৎ কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায়। বলে কোথায় এক রাজকন্যা আছে। সেখানে ওদের নিয়ে যাওয়া চলবে না। তাকে দেখার যোগ্যতা ওদের নেই। এক এক সময় ওদের দাঁড় করিয়ে রেখে যায়। এক একসময় ওদের গাঁয়ে ফিরে যেতে বলে চুরির জিনিসগুলো সব নিজে কুক্ষিগত করে ওদের কৌশলে তাড়িয়ে দেয়।

সেদিন সন্ধ্যার সময় চুরি করা কডমাছটার বেলাতেও তাই হলো। বেবার্ত মাছটা চুরি করে আনার সঙ্গে সঙ্গে ওরা তিনজনেই অন্ধকারে ছুটতে লাগল। ছুটতে ছুটতে এক সময় পথের উপর জঁালিন বেবার্তের হাত থেকে মাছটা নিয়ে নিল। বেবার্ত বলল, একি, আমাকে কিছুটা দে। আমি এটা কষ্ট করে এনেছি।

জঁালিন বলল, দেব, আজ নয়, কাল।

এবপর সে লিভি আর বেবার্ত দুজনকে দাঁড় করিয়ে বলল, তোরা দুজনে এইভাবে পাঁচ মিনিট কোন দিকে না ঘুরে দাঁড়িয়ে থাকবি। তারপর সোজা বাড়ি চলে যাবি। যদি তোরা কোনদিকে ঘুরিস তাহলে বুনো জন্তু এসে তোদের গিলে ফেলবে। আর যখন বাড়ি যাবি তখন কেউ কাউকে ছুঁবি না। বেবার্ত, তুই যদি লিভিকে ছুঁস তাহলে আমি ঠিক দেখতে পাব আর একটা ঘুঁষিতে তোর নাক ফাটিয়ে দেব।

এই বলে বনের মধ্যে অন্ধকারে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল জঁালিন। বেবার্ত

আর লিভি দুজনে সেইভাবে পাঁচ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকার পর বাড়ি চলে গেল অন্ধকার পথ দিয়ে। একই ভয়ে দুজনেই ভীত থাকাব জন্ত আজকাল ওদের দুজনের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে লিভিকে জড়িয়ে ধরার ইচ্ছা যায় তার। কিন্তু জঁালিন তার মনে এমন একটা ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছে যে সে তা পারে না। সারাটা অন্ধকার পথ তারা দুজনে পাশাপাশি হাঁটলেও কেউ কাউকে স্পর্শ করতে পারল না।

এতিয়েন হাঁটতে হাঁটতে এতক্ষণে বেকিলার্তে এসে পৌঁছল। আগের দিন মুকেত্তে তাকে বাববার আসতে বলেছিল এই সময়। তাই ও এসেছে। মুকেত্তে তাকে অন্তরের সঙ্গে চায়, সে তাকে তার একমাত্র আনন্দপ্রতিমার মত দেখে একথা জেনেও এতিয়েন তাকে এড়িয়ে চলতে চায়। সে মুকেত্তের মত আজ ওখানে এসে পড়েছে এটা ভাবতেও লজ্জা লাগছিল তার। সে তাকে বলে দেবে এখন ফূর্তি করাব সময় নয়। মানুষ ক্ষুধায় মারা যাচ্ছে। মুকেত্তে তখন বাসাতে না থাকায় তার জন্ত অপেক্ষা কবতে লাগল।

ধৈর্য সহকারে মুকেত্তের ঘবেব পিছনে বনটায় অপেক্ষা করতে লাগল এতিয়েন। হঠাৎ বনেব মধ্যে অন্ধকাবে একটা দেশলাইএর কাঠি জ্বলে উঠল। এতিয়েন আশ্চর্য হয়ে দেখল জঁালিন একটা বাতি ধরিয়ে বনের মধ্যে একটা গর্তেব মধ্যে নেমে গেল।

এতিয়েন দেখল জঁালিন একটা মরা খাদের গর্তের মুখের কাছে গিয়ে কিনাবায় বসে পা দিয়ে কি একবার দেখে নিল। তাবপর হাতের বাতি আর একটা শুকনো মাছ ধবে মই দিয়ে নেমে যেতে লাগল। জঁালিন কোথায় যাচ্ছে তা দেখাব জন্ত কৌতূহল হলো এতিয়েনের। সে এসে অন্ধকাবে খাদে মুখ বাড়িয়ে দেখল জঁালিন জ্বলন্ত বাতি হাতে লোহার মই বেয়ে অনেক নিচে নেমে যাচ্ছে। এতিয়েনও অন্ধকারে নামতে লাগল সেইভাবে। অবশেষে নিচে নেমে একটা জায়গায় গিয়ে থামল জঁালিন। এতিয়েন গণে দেখল তিরিশটা আংটা অর্থাৎ দুশো দশ মিটার সে পার হয়েছে।

এতিয়েন দেখল জঁালিন এক জায়গায় খড় বিছিয়ে বিছানাব মত করেছে। এক জায়গায় সে বাতি আর হাতের শুকনো মাছটা নামাল। এতিয়েন অবাক হয়ে গেল। এইটা তার গোপন বাসা। এখানে রুটি, আপেল, মদ প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সব জিনিসই রয়েছে। এসব জিনিস বিভিন্ন জায়গা থেকে চুরি করে এনেছে।

জঁালিন তার বাসায় এসে নিশ্চিন্ত হয়ে বসল। সে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। সারাদিনের খাটুনি আব উদ্বেগের অবসানে সে এবার বিশ্রাম করবে। এতিয়েন হাঁপাচ্ছিল।

এতিয়েন সরাসরি জঁালিনের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, তাহলে তুমি এখানে বেশ আছ। আমরা যখন সবাই না খেয়ে শুকিয়ে মরছি তুমি কারো

কথা না ভেবে এখানে একা একা বেশ আছ।

জঁালিন প্রথমে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। পরে সে এতিয়েনকে চিনতে পেরে বলল, ঠিক আছে, আমার সঙ্গে তুমিও নৈশভোজনে বসে যাও।

এতিয়েন দেখল, জায়গাটা বাইরে ডিসেম্বরের কনকনে ঠাণ্ডার তুলনায় অনেক গরম। গ্রীষ্মের সময় আবার ঠাণ্ডা। ঠিক যেন শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। শুধু কিছু পচা কাঠের ভাপসা একটা গন্ধ ছাড়া আর কোন অসুবিধা নেই।

জঁালিনকে এতিয়েন এবার জিজ্ঞাসা করল, তোমার এখানে ভয় পায় না ?

জঁালিন বলল, ভয় পাবে কেন ? আমি ত আমার বাসায় আছি।

এই বলে কড মাছটা ছুরি দিয়ে কেটে ছাড়াতে লাগল জঁালিন। বলল, এ ছুরিটা লিভি আমাকে উপহার দিয়েছে। এতিয়েন বলল, উপহার নয়, লিভিকে দিয়ে সে মঁতসুর একটা দোকান থেকে চুরি করে আনা করিয়েছে।

এরপর খড় আর কাঠ দিয়ে আগুন ধরিয়ে মাছটা সেকে নিল। একটা রুটি কেটে দুজনের জন্য দু টুকরো করল। মোটের উপর ওদের খাওয়াটা মন্দ হলো না।

এতিয়েন একবার বলল, আচ্ছা তুমি অপর কারো কথা ভাব না ?

জঁালিন বলল, কার কথা ভাবব ? সব মানুষই স্বার্থপর।

এতিয়েন বলল, তুমি চুরি করো তোমাব বাবা যদি তা জানতে পারে তাহলে কি করবে জান ?

জঁালিন বলল, কিন্তু ধনী লোকেরা চুরি করে না ? তুমি শুধু আমাদের চুরি করাকেই বড করে দেখ। আমি এই পাউরুটিটা মাইগ্রাতের দোকান থেকে চুরি করে এনেছি। কিন্তু ও আমাদের ঠকিয়ে পয়সা করে।

এতিয়েন তখনো খাচ্ছিল আর জঁালিনকে লক্ষ্য করছিল। তার কেবলি মনে হচ্ছিল জঁালিন যেন মানুষ থেকে ক্রমশঃ পশুব স্তরে নেমে যাচ্ছে। এই খাদেই ওর কর্মজীবন শুরু হয়, আবাব এই খাদেই তার ধস চাপা পড়ে পা ভেঙে যায়। এখনো সে খুঁড়িয়ে চলে।

এতিয়েন বলল, তুমি এখানে লিভিকে মাঝে মাঝে আন না ?

কথাটার মানে বুঝতে পেরে জঁালিন হেসে বলল, না।

এরপর জঁালিন বেবার্ত আর লিভির নাম করে ওদের প্রতি অপরিসীম ঘৃণা আর তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হাসতে লাগল। বলল, ওদের মত বোকা মেয়েছেলে তুমি আর কোথাও পাবে না। আমি ওদের যে সব কথা বলে ভয় দেখাই ওরা তা সব বিশ্বাস করে আর বোকার মত শুধু হাতে চলে যায়।

পরে জঁালিন বিজ্ঞ দার্শনিকের মত বলল, একা থাকা সবচেয়ে ভাল। তাহলে কারো সঙ্গে কোনদিন ঝগড়া হবার ভয় থাকে না।

রুটি খাওয়া শেষ হলে এতিয়েন একটু মদ খেল। একবার সে ভাবল জঁালিন তাকে ভালভাবে খাওয়ালেও সে তাকে কান ধরে উপরে নিয়ে যাবে

আর বলবে আর কোনদিন এখানে এলে সে তার বাবাকে বলে দেবে। কিন্তু পরে সে ভাবল এভাবে জাঁলিনকে চটানো ঠিক হবে না। কারণ এ বাসাটা ভবিষ্যতে তারও প্রয়োজন হতে পারে। ধর্মঘটের ব্যাপারে উপরে কোন গোলমাল বাধলে ও নিজে বা ওর দলের কোন লোক এখানে এসে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারবে।

জাঁলিনের কাছ থেকে একটা বাতি নিয়ে ধরিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে এল এতিয়েন।

এদিকে মুকেত্তে এতিয়েনের জন্য ঠাণ্ডার মধ্যে বসে থেকে অপেক্ষা করছিল। এতিয়েনকে দেখতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার কাছে গিয়ে তার গলাটা জড়িয়ে ধরল মুকেত্তে। এতিয়েন যখন বলল সে আর তার কাছে আসবে না বলে ঠিক করেছে, মুকেত্তে তখন একটা তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করল অন্তরে। সে বলল, ঈশ্বরের নামে বল, কেন আসবে না? আমি কি তোমাকে ভালবাসি না?

পাছে মুকেত্তে তাকে তার ঘরে নিয়ে যায় তার জন্য এতিয়েন তাকে রাস্তায় টেনে নিয়ে গিয়ে মঁতস্যুর দিকে এগিয়ে যেতে লাগল দুজনে কথা বলতে বলতে। যথাসম্ভব নরম হয়ে এতিয়েন তাকে বুঝিয়ে বলল, তার সঙ্গে এভাবে মেলামেশা করলে জনগণের কাছে তার ভাবমূর্তি নষ্ট হয়ে যাবে, তার রাজনৈতিক জীবনের ক্ষতি হবে।

মুকেত্তে বুঝতে পারল না এর সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক কোথায় আছে। সে বলল, তুমি বাইরে পাঁচজনের কাছে আমাকে গাল দেবে, ধরে মারবে। তাহলে তারা ত তোমাকে খারাপ বলবে না। তবু তুমি আসবে আমার কাছে।

কথা বলতে বলতে ওরা মঁতস্যুর কাছে চলে এসেছিল। মুকেত্তে অনুনয় বিনয় করে বলল, তুমি আর একটু থাক, আমি তোমাকে মাত্র পাঁচ মিনিট রেখে দেব।

ওরা এবার জ্যোৎস্নাভরা ফাঁকা জায়গায় এসে পড়েছে। ওরা দুজনে হাত ধরাধরি করে হাঁটছিল। হঠাৎ একটি মেয়ে ওদের পাশ দিয়ে হনহন করে মাথা নিচু করে চলে গেল। যেতে যেতে এক জায়গায় কোন কিছুতে পাটা লেগে যাওয়ায় হোঁচট খেয়ে লাফিয়ে উঠল। মনে হলো ও যেন খুব ক্লান্ত।

এতিয়েন মুকেত্তেকে জিজ্ঞাসা করল, মেয়েটি কে?

মুকেত্তে বলল, ও ক্যাথারিন।

ক্যাথারিনের চলে যাওয়ার পানে দৃষ্টি ছড়িয়ে যতক্ষণ পারল তাকিয়ে রইল এতিয়েন। ক্যাথারিন তাকে মুকেত্তের সঙ্গে দেখে ফেলেছে একথা ভেবে সত্যিই লজ্জাবোধ করছিল সে। কিন্তু আবার ভাবল, এতে আবার লজ্জা কিসের? সে নিজেও ত একটা লোককে নিয়ে আছে। তাছাড়া সে যেদিন এমনি এক সন্ধ্যায় রেকিলার্তে শ্যাভেলকে দেহদান করে সেদিন তা আড়াল থেকে দেখে দারুণ মনোকষ্ট পেয়েছিল এতিয়েন।

এতিয়েন তাকে ছেড়ে চলে যেতে চাইলে মুকেত্তে বলল, আমি জানি কেন তুমি এমন করছ। তুমি অন্য একজনকে চাও বলেই আমাকে চাও না।

পরের দিন আবহাওয়াটা ভালই ছিল। সেদিন জাঁলিন তার বাসা থেকে বার হলো বেলা একটার সময়। বেরিয়ে বেবার্ত আর লিডির জন্য যথাস্থানে অপেক্ষা করতে লাগল। ঐ দিনই লিডিকে ঘরে আটক রাখার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। তাকে একটা ঝুরি দিয়ে বলা হয় এক ঝুরি ডাণ্ডিলিয়ন পাতা যেন তুলে আনে চাটনির জন্য। যাই হোক, ঝুরি নিয়ে বেবার্তের সঙ্গে যথাস্থানে এসে জাঁলিনের সঙ্গে মিলিত হলো লিডি।

ওরা তিনজনে এবার বার হলো ওদের ধান্দায়। আজ প্রথমেই ওরা অনায়াসে একটা জিনিস পেয়ে গেল। ওরা যখন র‍্যাসেনোরের হোটেলটার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল তখন হঠাৎ দেখতে পায় পোষা খরগোশটা ছেড়ে রাখা হয়েছে এবং রাস্তায় ঘোরাফেরা করছে। হঠাৎ কি মনে হলো, জাঁলিন সেটাকে ধরে লিডির ঝুরির মধ্যে ভরে দিল। তারপর ওরা পা চালিয়ে যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি যেতে লাগল।

যেতে যেতে ওবা দেখল বড রাস্তায় জ্যাকারি আর মুকেত কি একটা রেস খেলা নিয়ে ব্যস্ত। ওবা তাই বড রাস্তাটা ছেড়ে দিয়ে মাঠের পথ ধবল। হঠাৎ জাঁলিন মজা করার জন্য খবগোশটাকে ঝুরি থেকে ছেড়ে দিল। বলল, এবার ওটাকে আমরা তাড়া দিয়ে ছুটিয়ে ধরব। জাঁলিন ভেবেছিল ওরা তিনজনে ছুটে ঠিক ধরবে খরগোশটাকে। কিন্তু পরে দেখল তা কোনক্রমেই সম্ভব না। জাঁলিন দু তিনবার খরগোশটাব কাছাকাছি গিয়েও ধরতে পারল না সেটাকে। পরে বুঝল তারা আর কিছুতেই ধরতে পারবে না তাকে এবং তাকে ছেডে দেওয়া ভুল হয়েছে তার।

জাঁলিনবা খরগোশটাকে ধরে পায়ে দডি বেঁধে দিয়েছিল। মজা করার জন্য তাকে আবার ছেড়ে দিয়ে ঢিল ছুঁড়ে তাডিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল জাঁলিন। তখন প্রায় পাঁচটা বাজে। এরই মধ্যে সন্ধ্যার ছায়া ঘন হয়ে উঠছিল। ভাঁদেমের বনের দিকে খনিশ্রমিকদের অনেকেই যেতে শুরু করেছে।

এদিকে জাঁলিন পোল্যাণ্ডকে তাড়া করে করে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াতে লাগল। তার আসল উদ্দেশ্য হলো যে কোন প্রকারে খরগোশটাকে ছুটিয়ে ছুটিয়ে মেরে ফেলা। তাহলে ও তাকে তার সেই গোপন ডেরায় নিয়ে গিয়ে তার মাংস খাবে।

ওদিকে জ্যাকারি ও মুকেত্ত এসে রেস খেলছিল। তাদের খেলা শেষ হয়ে আসছিল। হঠাৎ জাঁলিন দেখল তার বাবা মাহিউ এতিয়েনের সঙ্গে ভাঁদেমের দিকে আসছে। ওদের দেখার সঙ্গে সঙ্গে খরগোশটাকে তুলে নিয়ে লিডির ঝুরিটার মধ্যে ভরে রাখল। লিডি বলল, তাকে চাটনির পাতা তুলতে বলেছে তার বাড়ির লোক। তাই চলে যাবে। কিন্তু জাঁলিন প্রভুত্বের ভঙ্গিতে এমন-

ভাবে তাকে ভয় দেখাল যে চলে যেতে সাহস পেল না লিডি। জাঁভলিন ওদের সঙ্গে করে ভাঁদেমের বনে যেতে চায়। সেখানে সভায় কি হয় তা দেখবে।

সন্ধ্যে থেকেই আশপাশের গাঁ থেকে দলে দলে বা এককভাবে বহু লোক অর্থাৎ নারী পুরুষ শিশু সকলে ভাঁদেমের বনের পথে সার দিয়ে যেতে লাগল। পথে অন্ধকার নেমে এলেও বনভূমির মাঝে এক নির্দিষ্ট জায়গার দিকে নীরবে এগিয়ে চলেছিল ওরা। ঝরা পাতায় পা লাগার জন্য ক্রমাগত খসখস শব্দ হচ্ছিল।

এদিকে মঁসিয়ে হানিবো তার বিকালের ভ্রমণ শেষ করে ঘোড়ায় চড়ে বাড়ি ফিরে যাবার পথে পথের ধারে খসখস শব্দ শুনে তাকিয়ে দেখল রেকিলার্তের পথে প্রেমিক প্রেমিকরা যুগলমূর্তিতে এগিয়ে চলেছে সেই নির্দিষ্ট মিলনকুঞ্জের দিকে। দিনের পর দিন সেই একই শৃঙ্গার ও সঙ্গমসম্বলিত প্রেমলীলা। তাদের পেটে কিছু থাক বা নাই থাক তারা এখানে আসবে। মেয়েরা চিৎ হয়ে তাদের প্রেমিকদের বুকে নিয়ে শোবে। নিবিড় চুম্বনে আবদ্ধ থাকবে তাদের ঠোঁটগুলো। এইভাবে দেহমিলনের মধ্য দিয়ে চরম আনন্দ লাভ করবে ওরা। হানিবোর হঠাৎ মনে হলো সে যদি ওদের মত মনোমত এক প্রেমিকা পেত তাহলে ওদের মতই হাসিমুখে ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য করতে পারত। এই সব তথাকথিত হতভাগ্য লোকগুলোর প্রতি ঈর্ষা বোধ করতে লাগল হানিবো। সে ধীর গতিতে বাড়ির দিকে এগিয়ে যেতে যেতে যতই পথের দুপাশের নীরব অন্ধকারের ভিতর থেকে চুম্বনেব শব্দ শুনছিল ততই তার মনটা পীড়িত হচ্ছিল। ততই তার দুঃখ সমস্ত সান্ত্বনার স্তর পার হয়ে তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠছিল।

৭

ভাঁদেমের বিরাট বনের মাঝখানে পাস-দে-দাম নামে জায়গাটায় কিছু গাছ কাটার জন্য বেশ কিছুটা ফাঁকা হয়ে উঠেছে। জায়গাটা ঢালু আর তার চারদিকে লম্বা লম্বা বড় গাছ। কয়েকটা কাটা গাছের গুঁড়ি এখনো পড়ে আছে। প্রায় তিন হাজার খনিশ্রমিক এই জায়গাটায় এসে মিলিত হয়েছে। তাছাড়া আরও অনেকে আসছে। শীতের জন্য সকলের মাথায় কাপড় অথবা টুপী।

এতিয়েন, র‍্যাসেনোর, মাহিউ সকলে সামনের ঢালু মুখটার উপর দাঁড়িয়েছিল। সমবেত জনতার মধ্য থেকে একটা চাপা গুঞ্জনধ্বনি উঠছিল। র‍্যাসেনোর আর এতিয়েনের মধ্যে মতভেদ হওয়ায় তাদের গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। লেভাক তার হাতের ঘুঁষি পাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল। পিয়েরোন এসেছে। কিন্তু সে আসতে চায়নি তাই অস্বস্তিবোধ করছিল। বুড়ো বনিমোর

ও মুকে এসেছে। জ্যাকারি আর মুকেত এসেছে মজা দেখতে। কিন্তু মাহিউর স্ত্রীর নেতৃত্বে মেয়েরা এসে গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে আছে। মুকেত্তে মা ব্রুলের কথায় হাসছিল খিল খিল করে। জাঁলিন লিভি আর বেবার্তের সঙ্গে কাটা গাছের গাদার উপর দাঁড়িয়ে সব দেখতে পাচ্ছিল।

র‍্যাসেনোরের সঙ্গে এতিয়েনের মতভেদের কারণ এই যে, র‍্যাসেনোর বলছিল আজই এইখানে সভার আগে কার্যকরী সমিতি গঠন করা হোক। এতিয়েন বলছিল, আজ সমিতি গঠন করতে ওরা আসেনি আর তার সময়ও এটা নয়। আজ তাদের মালিক পক্ষের দ্বারা লাগানো পুলিস তাদের নেকড়ের মত খুঁজে বেড়াচ্ছে।

আসল কথা, র‍্যাসেনোর সেদিন দেসিরের বাড়ির সভাতে এতিয়েনের কাছে কার্যতঃ হেরে যায়। তাই আজ সে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করতে চায়। খনিশ্রমিকদের উপর তার হারানো প্রভুত্ব আবার ফিরে পেতে চায় সে।

আর সময় নষ্ট না করে এতিয়েন একটা কাঠের উপর উঠে দাঁড়িয়ে জনতাকে সম্বোধন করে শান্ত হতে বলল। সঙ্গে সঙ্গে শান্ত হয়ে উঠল জনতা, স্তব্ধ হয়ে গেল তাদের কণ্ঠের গুঞ্জন। র‍্যাসেনোর তাকে বাধা দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু মাহিউ তাকে থামিয়ে দিল।

এতিয়েন বলল, হে সহকর্মীবৃন্দ,

আমাদের কথা বলার অধিকার ওরা কেড়ে নিয়েছে। আমাদের পিছনে পুলিস লেলিয়ে দিয়েছে। তাই আমরা এই দূর বনে চলে এসেছি। এটা আমাদের বাড়ির মত। এখানে আমরা স্বাধীন। বনের পশুপাখিদের মতই আমরা স্বাধীন।

সমবেত জনতা একবাক্যে সমর্থন জানাল এতিয়েনকে। বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। এখানে আমরা স্বাধীন।

এতিয়েন একবার চুপ করল। আকাশে চাঁদ উঠেছে। চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে বনভূমির উপর। কিন্তু সে আলোয় গাছের মাথাগুলোই চকচক করছিল। এতিয়েনের মুখের উপর গাছের ডালের একটা ছায়া পড়েছিল বলে তাকে একটা কালো স্তম্ভের মত দেখাচ্ছিল।

আবার বলতে শুরু করল এতিয়েন। কিন্তু এবার সে বেশী জোরে চিৎকার করল না। জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে যেন সে তার দলগত কার্যের বিবরণ দিতে লাগল ঠাণ্ডা মাথায়। এতিয়েন প্রথমে ধর্মঘটের পুরো ইতিহাসটা বলল। বলল, প্রথমে তাদের ধর্মঘট করার ইচ্ছা ছিল না! কিন্তু কোম্পানিই কাঠের কাজের জন্য আলাদা বেতন দেবার কথা বলে শ্রমিকদের প্ররোচিত করেছে। তারপর সে ম্যানেজারের কাছে দুবার যে শ্রমিক প্রতিনিধিদল গিয়েছিল তার বিবরণ দিল। কোম্পানি তখন তাদের কথায় কর্ণপাত করেনি। এরপর প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের কথা তুলে হিসাব দিয়ে দেখিয়ে দিল ফাণ্ডের সব টাকা

ফুরিয়ে গেছে। এই সঙ্গে 'আন্তর্জাতিক' থেকে পাঠানো সাহায্যের কথাও বলল। আরও বলল প্লুশার্ত ও তার আন্তর্জাতিক বিশ্বের শ্রমিকদের জন্য কিছু করতে গিয়ে তাদের ধর্মঘটের জন্য বিশেষ কিছু করতে পারছে না। তারপর এতিয়েন শ্রমিকদের সাবধান করে দিল, কোম্পানি এখন তাদের কার্ড ফেরৎ দিয়ে বেলজিয়াম থেকে লোক নেবার কথা বলছে। তাছাড়া শ্রমিকদের মধ্যে যারা দুর্বলপ্রকৃতির তাদের ভয় দেখিয়ে কাজে যোগদান করতে বাধ্য করছে। সে বলল, একে একে তারা দুর্ভিক্ষ ও সব হতাশা জয় করেছে।

সবশেষে এতিয়েন বলল, বন্ধুগণ, এমত অবস্থায় আজই রাত্রিতে আপনাদের এক স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে আপনারা এই ধর্মঘট চালিয়ে যাবেন কিনা এবং যদি তা চালিয়ে যান তাহলে কোম্পানির চক্রান্ত ব্যর্থ করবেন কিভাবে।

এতিয়েনের সব কথা বলা শেষ হয়নি। এক বিরাট নেতা হিসাবে সে যেন সত্যের বাণী শোনাচ্ছে তার অসংখ্য ভাবশিষ্যদের মধ্যে। এতিয়েন বলল, তাদের মধ্যে এমন কি কোন কাপুরুষ আছে যে তার অন্যায়ভাবে তার শপথ ভঙ্গ করবে? তারা যদি আবার সেই অন্তহীন দুঃখকষ্টকে বরণ করে খাদে ফিরে যায় তাহলে একমাস ধরে এত কষ্ট সহ্য করল কেন? যে পুঁজিপতিরা শ্রমিকদের খেতে না দিয়ে শুকিয়ে মারছে সেই পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে পরিচালিত এই সংগ্রামে মৃত্যুবরণ করাও শ্রেয় নয় কি তাদের পক্ষে? ক্ষুধার কাছে হীনভাবে আত্মসমর্পণ না করে যে ক্ষুধা মানুষের মধ্যে বিদ্রোহ জাগায় সেই ক্ষুধার কাছ থেকে শিক্ষা নিতে হবে। শিল্পসংকট ও বাজারের প্রতিযোগিতার জন্য কয়লার দাম যদি কমে যায় তাহলে কি তার ক্ষতিপূরণ শুধু শ্রমিকরাই দেবে এবং তা দিতে গিয়ে শুকিয়ে মরবে না খেতে পেয়ে? কাঠের ঠেকা দেওয়ার ব্যাপারে কোম্পানির কথা কিছুতেই মানা যায় না। তা মানলে তাদের প্রত্যেকের প্রতিদিনের এক ঘণ্টার রোজগার নষ্ট হবে। সবশেষে এতিয়েন বলল, কোম্পানি তাদের পদদলিত পোকামাকড়ের মত জ্ঞান করে। কিন্তু এবার তাদের উঠে দাঁড়াতে হবে। তারা সুবিচার চায়। ন্যায়বিচার চায়।

কথাটা সঙ্গে সঙ্গে লুফে নিল শ্রোতারা। একবাক্যে সবাই বলতে লাগল, হ্যাঁ, আমরা ন্যায়বিচার চাই।

কথা বলতে বলতে উত্তপ্ত ও উত্তেজিত হয়ে উঠল এতিয়েন। র‍্যাসেনোরের মত তার মুখে সব কথা না যোগালেও এতিয়েন যা বলল তা শ্রমিকদের হৃদয়কে স্পর্শ করল। তার কথাগুলো সহজ সরল, কিন্তু তা সহজে প্রেরণা সঞ্চার করে শ্রোতাদের মনে। শ্রোতারা বলতে লাগল, ও হয়ত খুব একটা বড় হতে পারেনি, কিন্তু ওর কথা শোনার মত।

এতিয়েন আবার বলতে লাগল, আমাদের যা বেতন দেয় তাতে আমাদের

মোটেই চলে না। এই বেতনব্যবস্থা ক্রীতদাস প্রথারই সমতুল। কিন্তু আপনাদের মনে রাখতে হবে, এ খনি আপনাদের, ঠিক যেমন সমুদ্র হচ্ছে জেলেদের, জমি হচ্ছে চাষীদের। মনে রাখবেন শত শতাব্দী ধরে আপনারা বংশানুক্রমে কাজ করে আপনাদের শ্রমের দ্বারা এ খনিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন।

এই প্রসঙ্গে খনিসম্পর্কিত আইনটার কথা বলার ইচ্ছা ছিল এতিয়েনের। কিন্তু মনে পড়ল না। বলল, দেশের সব ভূখণ্ড যেমন সমগ্র জাতির, তেমনি সেই ভূখণ্ডের গর্ভস্থ খনিও সমগ্র জাতির, দেশের সমস্ত নাগরিকের। কিন্তু ঘৃণ্য আইন কতকগুলো কোম্পানিকে তার দখলিস্বত্ব দান করেছে। খনির উপর তাদের অধিকার জন্মগত। এই অধিকার ছিনিয়ে নিতে হবে মালিকদের কাছ থেকে। এমন সময় গাছের পাতার আড়াল থেকে চাঁদটা বেরিয়ে পড়তেই তার আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল এতিয়েনের মুখখানা আর শ্রোতাদের মুখের উপর পড়ল গাছের ছায়া। ছায়ান্ধকারের মাঝে এতিয়েনের উজ্জ্বল মূর্তিটা দেখে শ্রমিকরা ফেটে পড়ল উচ্ছ্বসিত প্রশংসায়। বলতে লাগল, ঠিক, ঠিক বলেছে। চমৎকার।

এরপর এতিয়েন তার প্রিয় বিষয় দেশের উৎপাদনব্যবস্থার সামাজিকীকরণ সম্বন্ধে বলতে লাগল। সেদিন বঁ জয়োর সভায় দেসিবের বাড়িতে যে কথা বলা হয়নি সে কথা এখন বলতে লাগল সে। সে বলল, বেতনব্যবস্থার উচ্ছেদ ঘটাতে হবে। রাষ্ট্রব্যবস্থারও বিলোপ ঘটাতে হবে, তা না হলে প্রকৃত স্বাধীনতা পাওয়া যাবে না। একমাত্র জনগণ যখন হাতে সরকারী শাসন ক্ষমতা পাবে তখনি তারা আদিম যুগের সেই সবল জীবনে ফিরে যেতে পারবে। তখনি তারা সমাজের মনোমত সংস্কার করতে পারবে। একমাত্র তখনি তারা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সাম্যলাভ করতে পারবে। এইভাবে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই সত্য ও ন্যায়বিচারের প্রথম সূর্য উদিত হবে নতুন বিশ্বের আকাশে। এবার সব কুণ্ঠা ঝেড়ে ফেলে এক নতুন বলিষ্ঠ পৃথিবী আর তার নতুন প্রভাতসূর্যকে বরণ করে নেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠতে হবে সকলকে।

এতিয়েন বলল, এবার আমাদের পালা। সব সম্পদ ও ক্ষমতা লাভের পালা।

বনভূমির সমস্ত নিস্তব্ধতা ভেঙেচুড়ে দিয়ে উল্লাসে চিৎকার করে উঠল সমবেত জনতার কণ্ঠ। তারা এতিয়েনের অকুণ্ঠ প্রশংসার প্রবলতায় আবার ফেটে পড়ল। এমন সময় জনতার উপর থেকে ছায়াটাও সরে যেতে চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল সমগ্র সভাস্থল। শীতরাত্রির বনস্থলীর কনকনে ঠাণ্ডার মাঝেও অন্তরে এক অসহ্য উত্তাপ অনুভব করছিল জনতা। এতিয়েনের কথাগুলো সব ঠিকমত বুঝতে না পারলেও সেই সব কথা যেন আগুনের ফুলকি আর তা সরাসরি তাদের অন্তরটাকে স্পর্শ করে। তাদের সে অন্তর সব যেন ভরে উঠেছে এক আধ্যাত্মিক অনুভূতির পূর্ণতায়। এতিয়েনের বক্তৃতার মধ্যে

এমন অনেক কথা ও যুক্তি ছিল যার অর্থ ঠিকমত তারা বুঝতে পারেনি। কিন্তু বুঝতে না পারার জন্যই হয়ত সেই সব দুর্বোধ্য কথাগুলো আরও ঘন করে তুলেছে তাদের স্বপ্নের আবেশটাকে। এতিয়েনের তুলে ধরা নতুন পৃথিবীর ছবি সত্যিই তাদের এক স্বপ্নের জগতে তুলে দিয়েছে যে জগতে তারা সব সম্পদ সকলে মিলে ভাগ করে নিতে পারবে, যে জগতে জীবনকে তারা উপভোগ করতে পারবে।

জনতা চিৎকার করে উঠল, ঠিক ঠিক, এবার আমাদের পালা। শোষকরা নিপাত যাক।

মেয়েরাও পাগলের মত উল্লাসে চিৎকার করতে লাগল। মাহিউর স্ত্রী, লা লেভাক, পিয়েরেনের মা মা ব্রুল, মুকেত্তে সকলেই হাত নেড়ে অভিনন্দন জানাচ্ছিল আর চিৎকার করছিল। ফিলোমেন দারুণ কাশছিল। মাহিউ ও লেভাক খুবই খুশি হয়েছিল। জ্যাকারি আর মুকেত মজা দেখতে এসেছিল। ওরা শুধু দুজনে এই কথা বলছিল যে একটা মানুষ জল না খেয়ে এতক্ষণ কি করে বক্তৃতা দিল। সবচেয়ে বেশী উল্লসিত হয়ে চিৎকার করছিল জাঁলিন। কাঠের গাদার উপর উঠে সে ঝুরিটা নাড়িয়ে উল্লাস প্রকাশ করছিল আর বেবার্ত ও লিডিকে তাই করতে বলছিল।

এতিয়েন এবার এক বিপুল জনপ্রিয়তার মদের আস্বাদ গ্রহণ করছিল খুশি মনে। তিন হাজার লোকের অন্তর আজ তার মুঠোর মধ্যে। এতিয়েনের সহসা সুভারিনের কথা মনে হলো। আজ এইখানে সুভারিন থাকলে ঠিকই খুশি হত। তারই শিষ্যের মুখে তারই শেখানো বিপ্লবের কথা শুনে নিশ্চয় খুশি হত সে।

একমাত্র র‍্যাসেনোর এতিয়েনের প্রতি রাগে ও ঘৃণায় ফুলে ফুলে উঠছিল। সে একবার এতিয়েনকে বলল, তুমি আমাকে কিছু বলতে দেবে কি?

এতিয়েন সেই কাঠটার উপর থেকে নেমে এসে বলল, দেখুন জনতা আপনাকে বলতে দেয় না কি।

সঙ্গে সঙ্গে র‍্যাসেনোর এতিয়েন যেখানে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছিল সেখানে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর হাত নেড়ে জনতাকে শান্ত হতে বলল সে। কিন্তু জনতা শান্ত হলো না। তার নামটা শুনেই লোকে চটে গিয়েছিল। তার কথা কেউ শুনতে চাইছিল না, কারণ তার ভাবমুর্তিটা তার সমর্থকদের মধ্যেই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তার কৃত্রিম বাঁধা শব্দ মানুষকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়, কোন বিদ্রোহের ভাব জাগায় না। র‍্যাসেনোর আরও বলল, পার্লামেণ্টে আইন পাশ করে কখনো সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন করা যায় না। সমাজের পরিবর্তন বিবর্তনের মধ্য দিয়েই আসবে। কিন্তু তার কথা শুনে জনতা হাসতে লাগল। কিছুক্ষণ পর অনেকে তার দিকে শুকনো পাতা ছুঁড়তে লাগল। একটি নারীকণ্ঠ সহসা চিৎকার করে বলল, বিশ্বাসঘাতকরা নিপাত যাক।

র‍্যাসেনোর বোঝাবার চেষ্টা করল খনি কখনো শ্রমিকদের হতে পারে না। শ্রমিকরা বরং মালিকদের লাভের একটা অংশ চাইতে পারে।

সঙ্গে সঙ্গে প্রায় এক হাজার লোক চিৎকার করে বলল, বিশ্বাসঘাতকরা নিপাত যাক। বঁ জঁয়োর থেকে অবস্থাটা আরো খারাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে র‍্যাসেনোরের কাছে। কোন কথাই শেষ করতে পারল না র‍্যাসেনোর। সে কোন কথা বলতে গেলেই 'বিশ্বাসঘাতকরা নিপাত যাক' বলে জনতা চিৎকার করতে থাকে। র‍্যাসেনোরের মুখখানা ম্লান হয়ে গেল। তার সারাজীবন ধরে বানিয়ে তোলা সাফল্যের সৌধটা আজ ভেঙ্গে যাচ্ছে। তার চোখে জল আসছিল। তার কুড়ি বছরের সাধনা সব নষ্ট হয়ে গেল।

হতাশ হয়ে তাই সেই কাঠের গাদা থেকে নেমে এল র‍্যাসেনোর।

র‍্যাসেনোর এতিয়েনকে বলল, তুমি এতে মজা পাচ্ছ। কিন্তু একদিন বুঝবে।

এই কথা বলেই র‍্যাসেনোর বন থেকে বার হয়ে চাঁদের আলো ভরা মাঠের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এর পর বুড়ো বনিমোর আর মুকে দুজনে সেই কাঠের উপর গিয়ে দাঁড়িয়ে অতীতের স্মৃতিচারণ করতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকরা নীরবে তাদের পুরনো অভিজ্ঞতার কথা শুনতে লাগল। এই জনসমাবেশ আর ঐক্যবদ্ধ জনতাব সংগ্রামশীল মনোভাব দেখে বুড়ো বনিমোর আর মুকের অন্তর আবেগে আপ্লুত হয়ে উঠেছে। বনিমোর বলল, অতীতে তারাও একবার এই ভাঁদেমের বনে এসেছিল। এত লোক নয়, মাত্র পাঁচশো লোক। রাজার সৈন্যেরা এই বনে এসে ওদের ধাওয়া করে। গুলি ছুঁড়তে থাকে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য। তবু ওরা এইভাবে হাত উঠিয়ে সংকল্প করে। প্রতিজ্ঞা করে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য।

এতিয়েন এতক্ষণ নিচে থেকে ওদের কথা শুনছিল। জনতার মধ্যে একটা অস্বস্তির ভাব দেখে সঙ্গে সঙ্গে সে কাঠের উপরে উঠে গিয়ে বনিমোরের পাশে দাঁড়াল। এতিয়েন দেখছিল সামনের সারিতে আর পাঁচজনের সঙ্গে শ্যাভেল বসেছিল। তাই ভেবেছিল নিশ্চয় ক্যাথারিনও ওর কাছাকাছি কোথাও আছে। তাই সে ক্যাথারিনের সামনে কিছু বলে হাততালি পেয়ে তার জনপ্রিয়তাটাকে তার সামনে নতুন করে প্রমাণ করতে চাইছিল। এই ভেবে সে বনিমোরের পাশে তার একটা হাত ধরে বলতে লাগল, বন্ধুগণ, আপনারা এইমাত্র এই বৃদ্ধের তার শ্রমিকজীবনের সকরুণ কাহিনী শুনলেন। শুনলেন কেমন করে এই হতভাগ্য বৃদ্ধ তার সারাটা জীবন খনিতে কাজ করে তার তিল তিল রক্ত পাত করে কি সে পেয়েছে তার প্রতিদানে।

এক প্রচণ্ড রাগে কাঁপছিল এতিয়েন। হতভাগ্য খনিশ্রমিকদের জীবন যে দুঃখে ভরা সেই দুঃখ কষ্টের এক জীবন্ত পতাকারূপে বনিমোরকে যেন জনতার

সামনে তুলে ধরতে চেয়েছিল এতিয়েন। তাই সে মাহিউ পরিবারের পূর্বপুরুষদের কথাটা তুলে ধরল। বলল, এই পরিবারের লোকরা পুরুষানুক্রমে এই খনিতে কাজ করে আসছে, কিন্তু এত শ্রম এত দুঃখভোগ সত্ত্বেও ওদের ক্ষুধা শুধু বেড়ে গেছে। ওদের দুঃখ কষ্ট বেড়ে গেছে। এটা ভাবতেও ভীষণ খারাপ লাগে যে সারা দেশের অসংখ্য খনিতে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক যখন এইভাবে পেটে অতৃপ্ত ক্ষুধা নিয়ে দিনের পর দিন, বছরের পর বছব ধরে খেটে যাবে তখন তার ফলভোগ কবে যাবে শুধু মুষ্টিমেয় কিছু অলস মালিক আব কোম্পানির অংশীদার। মাত্র কয়েক হাজার অলস ধনী মালিকের সম্পদ বাড়াবার জন্য লক্ষ লক্ষ শ্রমিক খেটে যাবে আব এইভাবে খাটতে খাটতে তারা রক্তহীনতা, ব্রঙ্কাইট, হাঁপানি, বাত প্রভৃতি কতকগুলো দুরাবোগ্য রোগের শিকার হবে। কিন্তু এভাবে আর চলতে পাবে না। এই সব খনিব গর্ভেই এমন এক ভয়ঙ্কর গণ-সংগ্রামেব বীজ উপ্ত হচ্ছে যা পৃথিবীর সমস্ত বাধা ভেদ করে বাইরে এসে প্রকাশ্য সূর্যালোকে অঙ্কুবিত হয়ে উঠবে। যে পুঁজি যে মূলধন অদৃশ্য অদ্ভুত এক দেবতাব মত অসংখ্য শ্রমিকের রক্ত শোষণ করে তাদের নিঃস্ব ও অনশনক্লিষ্ট কবে তোলে আজ শ্রম সেই অদৃশ্য দেবতাকে টেনে বার করে আনবেই। সে দেবতা যেখানেই থাক তাকে টেনে বার করে এনে তার মুখটা জলন্ত আগুনের সামনে তুলে ধরবে সকলের সামনে। রক্তে ডুবিয়ে দেবে তার সাবা শরীব। যে এতদিন নিরাপদে অসংখ্য শ্রমিকের রক্ত শোষণ করে এসেছে, তাদের বুভুক্ষু দেহেব মাংস ভক্ষণ কবে এসেছে আজ তার দেহের রক্তে তাকেই স্নান করানো হবে, আজ তার গায়ের মাংস টুকবো টুকরো করে ছড়িয়ে দেওয়া হবে।

এবার থামল এতিয়েন। কিন্তু জনতা এত জোরে উল্লাসে ধ্বনি দিতে থাকল যে তাদের সে বজ্রগর্জনের শব্দ মঁতসুর বুর্জোয়াদের কানে গিয়ে আঘাত করল। বুর্জোয়ারা সে গর্জন শুনে চমকে উঠল। সে গর্জন শুনে ভাঁদেমের বনের পাখিরা সব উড়ে পালিয়ে গেল চন্দ্রালোকিত দিগন্তের পানে।

এতিয়েন এখনি জনতার মুখ থেকে স্থির সিদ্ধান্তের কথাটা শুনতে চায়। সে বলল, বন্ধুগণ, আজ তাহলে আপনারা স্পষ্ট করে বলুন, আপনারা ধর্মঘট চালিয়ে যাবেন কি না।

জনতা সমস্বরে চিৎকার করে উঠল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ধর্মঘট চালিয়ে যাব।

এতিয়েন বলল, ঠিক আছে। তাহলে বলুন, আমাদের মধ্যে যে সব শয়তান কালো কুত্তারা খনিতে কাজ করতে গিয়ে আমাদের ধর্মঘটকে বানচাল করতে চায় তাদের কি হবে।

জনতা এবারও একবাক্যে বলে উঠল, কালো কুত্তাদের মুণ্ড চাই। তাদের মৃত্যু চাই।

এতিয়েন ভাল করে লক্ষ্য করে দেখল জনতার মধ্যে ক্যাথারিন নেই। কিন্তু

শ্যাভেল সমানে তাচ্ছিল্যভরে তার পানে তাকিয়ে আছে, তার প্রতি ঈর্ষায় জ্বলে যাচ্ছে।

এতিয়েন বলল, বন্ধুগণ আমাদের মাঝে এই ভাঁদেমের বনে সমবেত শ্রমিক জনতার মাঝেই অনেকে আছে যারা খাদে কাজ করতে যায়, যারা আমাদের কথা মালিকদের বলে দেয়। তাদের খুঁজে বার করুন। আমরা তাদের চিনি। তাহলে আপনারা ঠিক করুন আগামী কালই আমরা দলবদ্ধভাবে বেরিয়ে যে সব খনিতে কাজ হচ্ছে সেই সব খনির কাজ বন্ধ করে দেব।

শ্যাভেল বলল, তাহলে আমরা কোথাও কাজ করতে পাব না ?

একদল লোক বলল, ও কাজ করে না, ওর স্ত্রী করে।

এতিয়েন বলল, না কোন খাদে কোন শ্রমিক কাজ করবে না। একযোগে সব খনিতে কাজ বন্ধ হলে সাধারণ ধর্মঘট সফল হলে এতদিনে শ্রমিকরাই খনির মালিক হয়ে যেত। মঁতসু খনিতে যখন কাজ বন্ধ, তখন ভাঁদেমের খনিতে কাজ হবে না। তোমরা দেহুলিনের জঁ। বার্ত খনিতে কাজ করতে যাও। তোমরা সবাই বিশ্বাসঘাতক।

এবার এক ক্রুদ্ধ জনতা শ্যাভেলকে ঘিরে ফেলল। তার মুখের সামনে ঘুঁষি পাকাতে লাগল। শ্যাভেলের মুখটা ভয়ে শুকিয়ে গেল। হঠাৎ একটা মতলব এঁটে শ্যাভেল বলল, ঠিক আছে, আমার কথা শোন। আগামী কালই তোমরা জঁ। বার্ত খনিতে গিয়ে দেখ আমি কাজ করি কি না। আমরা তোমাদের দলে। সেখানে গিয়ে আমরা সকলে খনিটা একেবারে বন্ধ করে দেব। ফার্নেসের আগুন নিভিয়ে দেব। এঞ্জিনীয়ারদেরও বার করে দেব। এমন কি পাম্পগুলোও বন্ধ করে দেব যাতে সমস্ত খাদ জলে ডুবে যায়। তাহলে বিশ্বাসঘাতকরা আর কাজ করতে পারবে না সেখানে।

শ্যাভেলের কথাগুলোকে হাততালি দিয়ে সমর্থন করল জনতা।

এর পর একের পর এক করে আরো অনেক শ্রমিক বক্তৃতা দিতে উঠল। তাদের প্রায় সকলেই একই বক্তব্য প্রকাশ করল। বুভুক্ষু মানুষ ক্ষুধার তাড়নায় আবেগের তাড়নায় রক্ত ও অগ্নিকাণ্ডের সংকল্প গ্রহণ করল। তারা যতক্ষণ এইভাবে বনভূমিতে রইল শান্ত নৈশ আকাশ হতে চাঁদের আলো ঝরে পড়তে লাগল তাদের মাথার উপর। তাদের চারপাশে বীচ গাছগুলো প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে এক গভীর নিস্তব্ধতার দ্বারা ঘিরে রইল তাদের। সেই নিস্তব্ধতায় জমাট বেঁধে রইল যেন সমবেত জনতার সকল সংকল্প।

জনতা তখন সত্যিই উত্তেজিত ও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। লেভাক এঞ্জিনীয়ারদের মাথা চাইছে। মাহিউ আর তার স্ত্রী তাকে উৎসাহ দিচ্ছে। মুকেত্তে বলছে পুলিস যদি তাদের পিছু লাগে তাহলে তাদের মুখে লাথি মারবে।

পিয়েরেন কখন পালিয়ে গেছে। মা ব্রুল লিডিকে বকছিল। সে ঝুড়িতে করে চাটনির কোন আনাজ আনেনি। জাঁলিন বেবার্তকে বলল, মাদাম

র‍্যাসেনোর দেখেছে তারা ওদের পোল্যাণ্ডকে তুলে এনেছে। সুতরাং ওরা যাবার সময় পোল্যাণ্ডকে আভাস্তেজের দরজার কাছে ছেড়ে দিয়ে যাবে।

শেষবারের মত এতিয়েন বলল, বন্ধুগণ, তাহলে আগামী কাল সকালে আমরা জঁ৷ বার্ত খনিতে যাচ্ছি।

জনতা একবাক্যে বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ জঁ৷ বার্ত। বিশ্বাসঘাতকদের মৃত্যু চাই।

তিন হাজার ক্রুদ্ধ মানুষের সমবেত কণ্ঠের এক উত্তাল ঢেউ একটা ঝড়ের মত আকাশে উঠে মুহূর্তমধ্যে চাঁদের আলোর বিরাট প্লাবনের মধ্যে হারিয়ে গেল।

পঞ্চম খণ্ড

১

তখন রাত্রি চারটে বাজে। চাঁদ ডুবে গেছে। চারদিকে অন্ধকার ঘন হয়ে উঠেছে। মঁসিয়ে দেন্থুলিনের বাড়িতে তখনো সবাই ঘুমিয়ে আছে। পুরনো আমলের রুদ্ধদ্বার গোটা পাকা বাড়িটা অন্ধকারে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই বাড়ি আর জঁ৷ বার্ত খনির মাঝখানে কেবল একটা বাগানের ব্যবধান।

গতকাল খাদের ভিতর বেশ কিছুক্ষণ কাটিয়ে ক্লান্ত হয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিল দেন্থুলিন। হঠাৎ ঘুমের মধ্যেই কার ডাক শুনতে পেয়ে জেগে উঠল সে। উঠে দেখল সত্যিই তার খাদের একজন ডেপুটি তাকে ডাকছে। দেন্থুলিন তাকে জিজ্ঞাসা করল, কি ব্যাপার?

ডেপুটি বলল, বিদ্রোহ স্যার। প্রায় অর্ধেক লোক কাজে যোগদান করতে চাইছে না এবং অপর কাউকে খাদের ভিতর ঢুকতেও দিচ্ছে না।

দেন্থুলিনের চোখে তখনো ঘুম জড়িয়ে ছিল। সে ঠিক ব্যাপারটা বুঝতে পারল না। সে তাই বলল, ওদের যেতে বল।

ডেপুটি বলল, এক ঘণ্টা ধরে আমরা ওদের বলছি, কিন্তু রাজী করাতে পারছি না, তাই ভাবলাম আপনার কাছে যাই। একমাত্র আপনিই ওদের বুঝিয়ে রাজী করাতে পারেন।

দেন্থুলিন বলল, ঠিক আছে, যাচ্ছি।

এই বলে পোষাক পরে সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হয়ে উঠল দেন্থুলিন। তখনো বাড়ির ঝি চাকর লোকজন কেউ জাগেনি। কিন্তু বারান্দা দিয়ে তার মেয়েদের ঘরের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় ওদের ঘরের দরজা খুলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে

দুই মেয়ে এসে দেন্থলিনের পথ রোধ করে দাঁড়াল।

বড় মেয়ে লুসির বয়স বাইশ। তার গায়ের রংটা একটু ময়লা হলেও তার চেহারাটা বেশ লম্বা, দেহের গড়ন ভাল। ছোট মেয়ে জিয়ানের বয়স উনিশ। গায়ের রং ফর্সা, তবে চেহারাটা বেঁটে, মাথার চুলগুলো সোনালি। ওরা দুজনেই বলল, কি ব্যাপার বাবা ?

দেন্থলিন বলল, না এমন কিছু না, কিছু খরিদ্দারের মাল পছন্দ না হওয়ায় চটাচটি হয়েছে। আমি গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু মেয়েরা জেদ ধরল, গরম কিছু না খেয়ে যাওয়া হবে না।

দেন্থলিন বলল, এখন সময় নেই। দারুণ তাড়াতাড়ি। এসে খাব।

কিন্তু ওরা ছাড়বে না। অন্ততঃ একপাত্র মদ আর কিছু বিস্কুট খেতেই হবে।

দেন্থলিন বলল, বিস্কুট তার গলায় আটকে যাবে।

ছোট মেয়ে জিয়ান তখন তার বাবার গলাটা জড়িয়ে ধরে বলল, কিছু না খেয়ে গেলে আমিও এইভাবে জড়িয়ে ধরে থাকব এবং আমাকেও নিয়ে যেতে হবে সঙ্গে।

অবশেষে দেন্থলিন বাধ্য হয়ে রাজী হলো। ওরা সবাই তখন নিচের খাবার ঘরে নেমে গেল। মেয়েরা দুজনে দুহাতে দুটো বাতি ধরে নিয়ে গেল।

অল্প বয়সে মাকে হারিয়ে মেয়েরা প্রায় নিজে থেকে মানুষ হয়েছে। বাবার কাছে প্রচুর আদর পেয়েছে, যখন যা চায় তাই পায়। বড় মেয়ের ঝোঁক অভিনয়ের দিকে আর ছোট মেয়ের ঝোঁক ছবি আঁকার দিকে। তবে ওদের অদ্ভুত একটা বৈশিষ্ট্য আছে। ওরা এমনিতে বিলাস ব্যসন ও যত সব অবাস্তব কল্পনায় দিন কাটালেও ওদের ব্যবসায় যখন কোন সংকট দেখা দিয়েছে তখনি ওরা পাকা গিন্নীর মত ওদের বাবার পাশে দাঁড়িয়ে দর কষাকষি করেছে। আবার সংসারে অভাব দেখা দিলে যথেষ্ট কার্পণ্য ও মিতব্যয়িতার পরিচয় দিয়েছে।

ওদের মধ্যে একজন গ্লাসে মদ ঢালতে লাগল আর একজন কিছু বিস্কুট এনে দিল। লুসি বলল, খেয়ে নাও বাবা।

কিন্তু দেন্থলিন চুপচাপ বসে থাকায় লুসি বলল, নিশ্চয় গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটেছে। ঠিক আছে বাবা, আমরা বাড়িতে তোমার কাছেই থাকব। লাঞ্চ পার্টিতে আর যাব না।

মাদাম হানিবো আজ সকালে এক লাঞ্চ পার্টির আয়োজন করছিল। ঠিক হয়েছিল মাদাম হানিবো গাড়িতে করে প্রথমে গ্রেগরিদের বাড়ি থেকে সিসিল ও পরে দেন্থলিনের বাড়ি থেকে দুই মেয়েকে তুলে নিয়ে যাবে। ওরা যাবে মার্সিয়েনের চোর্জে নামে একটা জায়গায়। সেখানে লাঞ্চ খেয়ে কলকারখানা ঘুরে বেড়িয়ে দেখবে।

জিয়ান বলল, হ্যাঁ, আমরা অবশ্যই বাড়িতে থাকব।

কিন্তু দেম্বলিন তাতে রাজী হলো না। বলল, তার দরকার-হবে না। তোমরা যাও ঘুমোওগে, ঠিক নটার সময় উঠবে। যা ঠিক হয়েছে আগে থেকে তাই করবে।

এই বলে মেয়েদের চুম্বন করে তাড়াতাড়ি চলে গেল দেম্বলিন। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরাও উপরে উঠে গেল।

তার খনিতে যাবার জন্য রান্নাঘরের পাশ দিয়ে একটা সোজা পথ ধরল দেম্বলিন। দেম্বলিন বুঝতে পারল, মঁতস্যু খনিতে সে অনেক টাকা ঢেলেছে। সেখানে যখন কিছু কিছু লাভ হতে শুরু করেছিল ঠিক তখনি ওখানে ধর্মঘট হলো। সব লাভের পথ বন্ধ হয়ে গেল। তারপর যদি এই ভাঁদেমের খনিতে ধর্মঘট হয় তাহলে সে দারুণ বিপদে পড়বে। এই খনিটা আধুনিক কায়দায় মেরামত ও আধুনিক যন্ত্রপাতিতে সজ্জিত করতে প্রচুর টাকা খরচ করতে হয়েছে। ফলে আজ জঁা বার্ত লে ভোবোর মতই এক বড আর নামকরা খনি হয়ে উঠেছে। বরং এ খনিতে যে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি আর সাজ-সরঞ্জাম আছে তা লে ভোরো বা আশপাশের কোন খনিতে নেই। কিন্তু এত খরচ করে এত উন্নতি করার পর যদি এ খনিতে কাজ বন্ধ হয়ে যায় তাহলে। ভীষণ বিপদে ও অর্থ কষ্টে পড়বে দেম্বলিন।

সেদিন রাত তিনটের সময় শ্যাভেল উঠে প্রথমে সে জঁা বার্ত খনিতে চলে যায়। গিয়ে সে কর্মরত শ্রমিকদের উত্তেজিত করতে থাকে। বলে টবপ্রতি পাচ সেন্তিমে করে মালিক বেতন না বাড়ালে তারাও ধর্মঘট করবে। কাজ করবে না, কাউকে করতেও দেবে না।

জঁা বার্ত খনিতে চারশো লোক কাজ করে। শ্যাভেলের কথায় বেশীর ভাগ শ্রমিকই কাজ বন্ধ করার মনস্থ করে। যারা কাজে যোগদান করতে চায় তাদের আটকে রাখে। ডেপুটিরা চিৎকার করে বলতে থাকে, যারা কাজে যেতে চায়, তাদের যেতে দাও। বাধা দিও না।

শ্যাভেল হঠাৎ দেখে ক্যাথারিন কাজ করতে এসেছে। ক্যাথারিন যখন রাত্রি তিনটের সময় উঠে খাদে যাবার জন্য.তৈরি হতে থাকে তখনই শ্যাভেল তাকে নিষেধ করেছিল। বলেছিল তার কাজে যাওয়া হবে না। এই বলে সে নিজে বেরিয়ে পরে। ক্যাথারিনও তার পরে ব্যাপারটা কি দাঁড়ায় তা দেখার জন্য বেড়িয়ে পরে বাড়ি থেকে।

শ্যাভেল এবার তাকে দেখতে পেয়ে রেগে গেল। শ্যাভেল দাঁত খিচিয়ে বলল, আবার কাজ করতে এসেছিস? তোকে বারণ করেছি না?

ক্যাথারিন বলল, তার অন্য কোন আয় নেই। কাজ না করলে খাবে কি?

শ্যাভেল বলল, তাহলে আমায় বিরোধিতা করতে হবে। তাহলে আমি তোর পোঁদে লাথি মারতে মারতে বাড়ি পাঠিয়ে দেব।

ক্যাথারিন একটু পিছিয়ে গেল। তবে একেবারে চলে গেল না। কি হয় তা

দেখার জন্য রয়ে গেল।

এমন সময় দেহুলিন এসে হাজির হলো। তখনো রাতের অন্ধকার জমে আছে চারদিকে। খনি-ল্যাম্পের আলোয় দেহুলিন একবার সামনে তাকিয়ে দেখল শ্রমিকরা সব দলবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ল্যাম্প রুমে গিয়ে দেখল মাত্র আশী জন মত শ্রমিক ল্যাম্প নিয়েছে নিচে যাবার জন্য। কিন্তু তারাও যেতে পারেনি। আলো অস্পষ্ট হলেও দেহুলিন যেন তাদের প্রত্যেকটি মুখ চেনে। চারদিকে তাকিয়ে দেখল দেহুলিন সারা খনিটা স্তব্ধ হয়ে আছে মৃত্যু-পুরীর মত। শুধু জলের পাম্প ছাড়া আর কোন মেসিন চলছে না।

দেহুলিন ওদের সরাসরি জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে বল। তোমাদের অসুবিধাটা কোথায়। খুলে বল, দেখি কিছু করা যায় কি না।

শ্রমিকরা যাতে ভালভাবে মন দিয়ে কাজকর্ম করে তার জন্য সে তাদের স্নেহের চোখে দেখে। প্রায় সময় সে খাদের ভিতর গিয়ে তাদের সুবিধা অসুবিধা কোথায় তা দেখে। শ্রমিকরা তাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে। কোন বিপদ হলে দেহুলিন প্রাণের মায়া না করে আগে এগিয়ে যায়।

দেহুলিন তার শ্রমিকদের লক্ষ্য করে বলল, পবে যেন আমাকে ভাবতে না হয় যে তোমাদের বিশ্বাস করে আমি ভুল করেছি। তোমবা জান আমি পুলিসের সাহায্য নিতে চাইনি নিজের নিরাপত্তার জন্য। তোমরা শান্তভাবে কথা বল, আমি শুনব।

কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ আসতে সাহস পেল না। অবশেষে শ্যাভেল এগিয়ে এল তাদের মুখপাত্ররূপে।

শ্যাভেল বলল, দেখুন মঁসিয়ে দেহুলিন, ব্যাপারটা হলো এই যে আমরা কাজ করব না, কারণ আমবা টবপ্রতি পাঁচ সেন্তিমে করে বেতনবৃদ্ধি চাই।

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল দেহুলিন। অবশেষে বলল, কী পাঁচ সেন্তিমে? কেন এই দাবি? আমি ত মঁতসু কোম্পানির মত কাঠের কাজের জন্য আলাদা বেতনব্যবস্থা করিনি। নতুন বেতনহার প্রবর্তন করিনি।

শ্যাভেল বলল, কিন্তু আমাদের মঁতসুর সহকর্মীরা এই বেতনহার মানছে না এবং তারাও পাঁচ সেন্তিমে করে বাড়াতে বলছে। কারণ বর্তমানে এই বেতনহারে কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না। আমরাও তাই পাঁচ সেন্তিমে করে বেশী চাই।

শ্যাভেলের এই কথাটাকে অন্যান্য শ্রমিকরা সমর্থন করল। তারা সবাই চারদিক থেকে শ্যাভেলকে ঘিরে দাঁড়াল।

দেহুলিনের চোখ দুটো রাগে জ্বলছিল, মুষ্টিবদ্ধ হয়ে উঠল তার হাত দুটো। শাসনের লাগামটা শক্ত করে ধবতে চাইছিল সে। তার ইচ্ছা হচ্ছিল বিক্ষুব্ধ শ্রমিকদের একজনের ঘাডে ধরে তাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে। কিন্তু সে ইচ্ছা, সে লোভ সংবরণ করে যুক্তি দিয়ে তাদের বোঝাবার চেষ্টা করার মনস্থ করল।

দেহুলিন শান্ত কণ্ঠে তাদের বলতে লাগল, তোমরা পাঁচ সেন্তিমে বেশী চাও। আমি স্বীকার করছি, তোমরা তা পাওয়ার যোগ্য। তবে আমি যদি তা দিই, তাহলে আমার সব কিছু শেষ হয়ে যাবে। আমার জীবিকার ব্যবস্থাটা আগে করতে হবে। আমি এখন শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছি। দু বছর আগে যখন ধর্মঘট হয় তখন আমি তোমাদের দাবি মেনে নিয়েছিলাম। কিন্তু তার জন্য আমাকে এই দু বছর দারুণ কষ্ট করতে হয়। এখন সামান্য কিছু বেতন বাড়ালেও আমাকে কারবার গুটিয়ে ফেলতে হবে। তাহলে পরের মাসে তোমাদের মাইনে দেব কি করে তা বলতে পারব না।

দেহুলিনের স্পষ্ট নিরহঙ্কার স্বীকারোক্তিতে শ্রমিকরা মাথা নত করে মাটির দিকে তাকিয়ে রইল চুপ করে। একমাত্র শ্যাভেল বিদ্রূপের ভঙ্গি করে, অবিশ্বাস প্রকাশ কবল। তার দেখাদেখি অন্যান্য শ্রমিকবা অবিশ্বাস করতে লাগল দেহুলিনের সততায়। তাদের ধাবণা সব মালিকই ধনী এবং তাদের শ্রমের উপর ভিত্তি করে তাদের রক্ত শোষণ করে লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ করে।

দেহুলিন কিন্তু তার নীতিতে অবিচল। সে আবার বুঝিয়ে বলল, কিভাবে মঁতস্যু কোম্পানি তার সঙ্গে এক তীব্র প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছে। দু বছর আগে সে বাধ্য হয়ে তাদের মাইনে বাড়িয়েছিল। কারণ মঁতস্যু কোম্পানির শ্রমিকদের বেতন হাবের মত তার শ্রমিকদের বেতন হার সমান না করলে সে শ্রমিক পাবে না। মঁতস্যু কোম্পানি কতবার তাকে তাব এই খনি বিক্রি করে দিতে বলেছে ওদের। ও এখনি কোন কারণে চালাতে না পারলেই ওরা কিনে নেবে। তখন এখানকাব শ্রমিকবা এ সুখ আব পাবে না, কডা শাসনের অধীনে থাকতে হবে তাদেব। ও এখানে মালিক হলেও নিজে ওদেব সঙ্গে থাকে, আর ওদেব অংশীদাবী কারবাব বলে ওখানকাব শ্রমিকদের ম্যানেজার এঞ্জিনীয়ারদের কথায় চলতে হয়। তাদের কডা শাসনাধীনে কাজ করতে হয়, অনেক অসুবিধা ভোগ করতে হয়।

দেহুলিন বলল, এইবার তোমরা ঠিক করো কি কববে। আমি সব কিছু তোমাদের বুঝিয়ে বললাম। আমি কি করব তা তোমরাই বলে দাও—আমি কি তোমাদের পাঁচ সেন্তিমে করে বাড়িয়ে দেব না তোমাদের ধর্মঘট করতে দেব? দুটোব মধ্যে যেটাই করব তাতে আমার গলা কাটা যাবে।

এই বলে চুপ করল দেহুলিন। জনতার মধ্যে একটা কলগুঞ্জন উঠল। অনেকে ইতস্ততঃ করতে লাগল। একজন ডেপুটি শ্রমিকদের লক্ষ্য করে বলল, যারা কাজে যোগদান করতে চায় তাদের যেতে দাও, বাধা দিও না। তোমাদের কারা কাজে যোগ দিতে চাও?

ক্যাথারিন প্রথমেই এগিয়ে এল। কিন্তু শ্যাভেল তাকে টেনে সরিয়ে এনে চিৎকার করে বলল, আমরা সকলেই একমত। একমাত্র যারা পশু তারাই তাদের সঙ্গীদের বিপদের মধ্যে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়।

ক্রমে দেখা গেল মিটমাটের কোন আশা নেই। শ্রমিকরা বিক্ষুব্ধভাবে চিৎকার করতে লাগল। একে অন্যকে উত্তেজিত করতে লাগল। দেস্থলিন একা অনেক চেষ্টা করল তাদের বোঝাবার। কিন্তু কেউ বুঝল না। দেস্থলিন বুঝল এ চেষ্টা বৃথা। তাই সে হতাশ হয়ে একটা চেয়ারে বসল। অক্ষমতার এক অসহায় অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে উঠল তার সমস্ত মন।

হঠাৎ কি মনে হলো একজনকে দিয়ে শ্যাভেলকে ডেকে পাঠাল দেস্থলিন। শ্যাভেল এসে গেলে বলল, আমাদের একটু একা থাকতে দাও।

প্রথমেই দেস্থলিন বুঝেছিল আসলে তার শ্রমিকরা কাজ করতে চায়, শুধু এই লোকটার প্ররোচনাতেই তারা বেঁকে বসেছে। সে আরও বুঝেছে, লোকটা অহঙ্কারী, ঈর্ষান্বিত। তাই তাকে তোষামোদ ও প্রলোভন দ্বারা বশীভূত করার মনস্থ করল দেস্থলিন। প্রথমেই সে শ্যাভেলকে বলল, তার মত যোগ্য কর্মীর এইভাবে নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করা উচিত নয়। দেস্থলিন তার সঙ্গে এমনভাবে কথা বলতে লাগল যাতে মনে হবে সে শ্যাভেলকে অনেক শ্রমিকের মধ্য থেকে একজন যোগ্য লোক হিসাবে বেছে নিয়েছে এবং তার পদোন্নতি ঘটাতে চায়। দেস্থলিন তাকে সরাসরি বলল, অদূর ভবিষ্যতে তার পদোন্নতি ঘটিয়ে তাকে ডেপুটির পদ দান করা হবে। শ্যাভেল চুপ করে সব কিছু শুনতে লাগল। শুনতে শুনতে তার হাতের শক্ত মুঠোগুলো আলগা হয়ে গেল। নিজের ব্যক্তি-জীবনের লাভ লোকসানের কথাটা ভাল করে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল সে।

সে ভাবল ধর্মঘট করলে তার পদোন্নতির কোন আশা নেই। সে সব সময় এতিয়েনের তলায় থাকবে শ্রমিক হিসাবে পদমর্যাদার দিক থেকে। কিন্তু দেস্থলিনের প্রস্তাব আজ মেনে নিলে তার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। অদূর ভবিষ্যতে সে তাহলে সামান্য শ্রমিক থেকে হয়ে উঠবে এক পদস্থ অফিসার। একই সঙ্গে এক উজ্জ্বল আশা আনন্দ ও গর্বে বুকটা ফুলে উঠল তার। তার উপর সে ভাবল মঁতস্যু কোম্পানির ধর্মঘটী শ্রমিকদের আজ সকালে আসার কথা ছিল। তার সঙ্গে তার সব ঠিক হয়ে ছিল। কিন্তু যে কোন কারণে সে এসে উঠতে পারেনি। হয়ত পুলিস তাদের গতিরোধ করেছে। এমত অবস্থায় তার দেস্থলিনের প্রস্তাব মেনে নিয়ে কাজে যোগদান করাই উচিত। মঁতস্যু কোম্পানির লোকদের সঙ্গে তার যে গোপন চুক্তি হয়েছিল তার কথা কিছু না বলেই সে জাঁ বার্ত খনির লোকদের কাজে যোগ দেওয়ার জন্য বোঝাতে লাগল। বারবার অনুরোধ করতে লাগল।

অনেক শ্রমিক কিন্তু শ্যাভেলের কথাটা বুঝতে পারছিল না। বুঝতে পারছিল না যে শ্যাভেল একটু আগে মারমুখী হয়ে তাদের খনি থেকে বার করে দিচ্ছিল সেই শ্যাভেল হঠাৎ কেন এখন কাজে যেতে ও খাদে নামতে বলছে।

দেখতে দেখতে বেলা সাতটা বেজে গেল। রোদ উঠেছে, তবু চারদিক কুয়াশায় ভরা। দেস্থলিন কিন্তু আর কিছু বলল না। সামনে রইলও না।

কোন ডেপুটিকেও সামনে থাকতে দিল না। সব ভার শ্যাভেলের উপর ছেড়ে দিয়ে সরে পড়ল।

শেষে শ্যাভেলেরই জয় হলো। যে সব শ্রমিকরা প্রথমে তার কথা শুনছিল না তারা পরে একে একে কাজে যোগ দিতে রাজী হয়ে খাদে নেমে গেল। সাতটার পর থেকে পুরোদমে শুরু হলো খাদের কাজ। নেমে যাওয়া এঞ্জিন আবার চলতে লাগল। আবার শ্রমিক নিয়ে ডুলিটা ঘর্ঘর শব্দে নামতে লাগল। খাদের ভিতর টবের গাড়িগুলো চলতে লাগল। এইভাবে বিচিত্র শব্দে আবার মুখরিত হয়ে উঠল খাদটা।

ক্যাথারিন নিচে নামার জন্য যখন ডুলিটার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল তখন শ্যাভেল তাকে দেখতে পেয়ে বলল, কি হচ্ছে, এখানে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? খাদে যাবি না দাড়িয়ে দাঁড়িয়ে এখানে ভাববি?

এদিকে মাদাম হানিবো ঠিক নটা বাজতেই তার গাড়িতে সিসিলকে তুলে নিয়ে দেনুলিনের মেয়েদের নিতে এল। দেনুলিনের দুই মেয়ে লুসি আর জিয়ান পোষাক পরে তৈরি হয়েই ছিল। দেনুলিন কিন্তু মাদাম হানিবোর গাড়িতে নিগ্রেলকে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। কারণ কথা ছিল এই লাঞ্চ পার্টিতে শুধু মেয়েরাই থাকবে। মাদাম হানিবো বলল, শুনলাম পথে দুর্বৃত্তরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাই একজন পাহারাদারকে সঙ্গে নিলাম। নিগ্রেল হেসে বলল, কোন ভয় নেই। কিছু লোক অবশ্য বিক্ষুব্ধ অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। তবে আমাদের গাড়িতে কোন ঢিল ছুঁড়তে সাহস করবে না। দেনুলিন বলল, আজ সকালে আমার খনিতেও সংকট দেখা দিয়েছিল। ধর্মঘট হতে হতে হলো না।

ওদের গাড়িটা ছেড়ে দিল। যাবার সময় মাদাম হানিবো দেনুলিনকে বলল, সন্ধ্যের সময় আমার বাড়িতে গিয়ে মেয়েদের নিয়ে আসবেন। আমার ওখানে ওবেলায় খাবেন। গ্রেগরিরাও যাবে সিসিলকে আনতে। গাড়িটা এগিয়ে যেতে লাগল ভাঁদেম রোড দিয়ে। কিন্তু গাড়ির আরোহীরা বুঝতে পারেনি অসংখ্য মানুষের সমবেত পদধ্বনি ক্রমশঃ উত্তাল হয়ে উঠছে সে পথে।

গাড়িটা ভাঁদেমের বনের ভিতর দিয়ে গিয়ে মাসিয়েনের পথ ধরল। গাড়িটা লে তার্তারেতের কাছে যেতেই জিয়ান মাদাম হানিবোকে বলল, আপনারা কখনো গ্রীন হিলে গেছেন?

মাদাম হানিবো বলল, ওরা এখানে পাঁচ বছর থাকলেও ওদিকে যাওয়া হয়নি।

তার্তারেতে হচ্ছে ভাঁদেম বনাঞ্চলের প্রান্তে অবস্থিত একটা জলা জায়গা। ওখানে এক মৃত আগ্নেয়গিরির তলায় একটা জ্বলন্ত কয়লা খনি আছে। খনিটা সব সময় আপনা থেকে জ্বলছে যুগ যুগ ধরে। এ সম্বন্ধে এক রূপকথা প্রচলিত আছে। বহুকাল আগে ঐ খনিতে যখন কুমারী মেয়েরা অকথ্য অন্যায় কুকর্ম করত তখন তাদের শাস্তি দেবার জন্য স্বর্গ থেকে অগ্নিবৃষ্টি হয় এবং সেই

আগুন খনিগর্ভে ঢুকে গিয়ে মেয়েগুলোকে পুড়িয়ে মারে। সেই থেকে সে আগুন আজও নিবে যায়নি। আজও মেয়েগুলো জ্বলছে। ওদের পাপের যেন আজও খালন হয়নি। বহু সাহসী লোক নাকি রাত্রিবেলায় ঐ জ্বলন্ত খনিটার মুখে গিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখেছে কিভাবে সেই মৃত মেয়েদের প্রেতাত্মা-গুলো চারদিকে অগ্নিশিখায় পরিবৃত হয়ে জ্বলছে। ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে ধূমায়িত দুর্গন্ধ, ঠিক যেন শয়তানের রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসা এক উৎকট গন্ধ।

অথচ লে তার্তারেতের এই অগ্নিপ্রস্রবনের পাশেই আছে সবুজ ঘাস আর বীচগাছের পাতা ঢাকা এক চিরসবুজ পাহাড়। নাম গ্রীন হিল।

গাড়িটা এবার শূন্য প্রান্তরে গিয়ে পড়ল। নিগ্রেল কিন্তু লে তার্তারেতকে ঘিরে গড়ে ওঠা রূপকথায় বিশ্বাস করল না। হেসে উড়িয়ে দিল কথাটা। ও এক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়ে বলল, অনেক খনিতে কয়লার ধুলো থেকে এক রকম গ্যাস উৎপন্ন হয় এবং সেই গ্যাস থেকে আগুন ধরে যায় হঠাৎ। সে আগুন যুগ যুগ ধরে জ্বলতে থাকে। বেলজিয়ামে এই ধরনের এক খনিতে আগুন লেগে যায়। তখন ও সেখানে ছিল। ওরা একটা নদীর পথ ঘুরিয়ে ঐ খনির ভিতর দিয়ে চালিয়ে দেয়।

নিগ্রেল আরো কিছু বলত। কিন্তু হঠাৎ তার কথাটা থেমে গেল। একদল লোক তাদের গাড়িটার পাশ দিয়ে নিঃশব্দে চলে গেল। নিগ্রেল দেখল দলে দলে লোক কোথায় যাচ্ছে। সে বেশ বুঝতে পারল কোথায় ঠিক একটা গোলমাল হবে।

অবশেষে ওরা মার্সিয়েনে গিয়ে পৌছল।

ক্যাথারিন তখন জাঁ বার্ত খনিতে কয়লার টব ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল রিলে পয়েণ্টের কাছে। এত ঘাম ঝরে পড়ছিল তার সারা অঙ্গ থেকে যে তা হাত দিয়ে মুছে ফেলার জন্য মাঝে মাঝে থামতে হচ্ছিল তাকে।

হঠাৎ একবার টবের ঢাকা বন্ধ হতেই শ্যাভেল চিৎকার করে উঠল, কি হলো? ল্যাম্পগুলো এমনই অস্বচ্ছ অস্পষ্টতা দান করছিল যে তাতে ভাল করে কিছু দেখাই যাচ্ছিল না।

ক্যাথারিনকে শ্যাভেল ডাকলে ক্যাথারিন এসে বলল, তার ভীষণ গরম লাগছে। মনে হচ্ছে যে গলে যাবে।

শ্যাভেল বলল, আমাদের মত গায়ের জামা খুলে ফেল।

ওদের এই খাদটা সাতশো আট মিটার নিচুতে অবস্থিত। এর এখন তাপমাত্রা হলো একশো তের ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। ওদের মনে হলো এই খাদের

এধারের এই কয়লাকাটার মুখটা লে তার্তারেতের কাছাকাছি। মনে হলো লে তার্তারেতের সেই ভূগর্ভস্থ আগুনের আঁচে এই খনির এদিকটাও উত্তপ্ত।

গরম সহ্য করতে না পেরে ক্যাথারিন সত্যি সত্যিই জামাটা খুলে ফেলল। তারপর পায়জামাটাও খুলে ফেলে একটা ব্লাউজের মত জিনিস কোন রকমে কোমরে গুঁজে নিয়ে বলল, এই ভাল। এইভাবেই আমি কাজ করে যাব। এই বলে সে টব ঠেলতে লাগল।

এই গরমে কাজ করতে সত্যিই বড় অস্বস্তি বোধ করছিল ক্যাথারিন। আজ পাঁচ দিন হলো ওরা এইখানে কাজ করছে। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যায় ক্যাথারিনের। ছেলেবেলায় সে শুনেছিল, যে সব মেয়েরা খনির ভিতর পাপ কাজ করে তারাই হঠাৎ জ্বলে ওঠা খাদের আগুনে জ্বলতে থাকে। অবশ্য সে এখন বড় হয়েছে। সে সব কথা বিশ্বাস করার মত তার আর বয়স নেই। তবু তার মনে হলো, জ্বলন্ত অঙ্গারের মত চোখ আর গায়ে জ্বলন্ত আগুন নিয়ে হঠাৎ যদি কোন এক মেয়ে লে তার্তারেতের সেই ভূগর্ভস্থ আগুন থেকে দেওয়াল ভেদ করে এখানে চলে আসে তখন কি করবে সে?

কয়লাকাটার মুখ থেকে রিলে পয়েণ্ট আশী মিটার দূরে। সেখানে একজন মেয়ে আছে। সেখান থেকে আবাব আর একজন মেয়ে কয়লার টবটা নিয়ে যায়। রিলে পয়েণ্টের মেয়েটির বয়স তিরিশ, সে বিধবা। সে ক্যাথারিনের খালি গা দেখে বলল, তুমি জামা পায়জামা ছেড়ে ফেলেছ? আমি কিন্তু ছেলেদের টিটকাবির জ্বালায় তা পারি না।

ক্যাথাবিন বলল, আমার কোন উপায় নেই। যে যাই বলুক আমি গরম সহ্য করতে পারছি না।

খালি টবটা ফিরে এলে ক্যাথারিন সেই দুঃসহ তাপের মুখে খাদের এদিকটা শুধু লে তার্তারেত নয় গ্যাসটন মেরির পরিত্যক্ত অগ্নিদগ্ধ খাদটারও কাছে। আজ হতে বছর দশেক আগে এক বিস্ফোরণ ঘটায় আগুন লেগে যায় গ্যাসটন মেরির খাদে। সেই আগুন আজও নেবেনি। সে আগুন যাতে এ খাদেও ছড়িয়ে না পড়ে তার জন্য দুই খাদের মাঝখানে এক মাটির পাঁচিল দেওয়া হয়। কিন্তু সেটা এখন মেরামত করা দরকার।

ক্যাথারিন আরো দুবার যাতায়াত করে আরো ক্লান্ত হয়ে পড়ল। গরমে আবো কষ্ট হতে লাগল। কয়লাকাটার এই মুখটার নাম 'দেসিরি সীম'। এখানে রাস্তাগুলো অন্যান্য সব খনির থেকে চওড়া এবং ছাদটাও উঁচু। শ্রমিকরা ভালভাবে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে কাজ করতে পারে। কিন্তু এখানে সবচেয়ে অসুবিধা হলো জায়গাটা ভীষণ গরম। যাব জন্য এখানে কেউ কাজ করতে চায় না। শ্রমিকরা যদি একটু ঠাণ্ডা পায় তাহলে নিচু ছাদের তলায় গুঁড়ি মেরে কয়লা কাটতে বা সরু পথে যাতায়াত করতে পারে।

শ্যাভেল ক্যাথারিনকে ক্লান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চিৎকার করে বলল,

কি, ঘুমিয়ে পড়েছিস না কি? এই ধরনের কুত্তী আমার ভাগ্যে কি করে জুটল? টবে কয়লা ভরবি না কি?

ক্যাথারিন সত্যিই দাঁড়িয়ে ছিল ওরা যেখানে কয়লা কাটছিল তার ঠিক নিচে। ও তার বেলচার উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ওদের পানে তাকিয়ে ছিল। আসলে ক্লান্তির নিবিডতায় ওর মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ার উপক্রম হচ্ছিল। ওদের গায়ে ঘামের উপর কয়লার গুঁড়ো পড়ায় তেলকালিতে গোটা গা ভরে গিয়েছিল। ওদের চেনাই যাচ্ছিল না। ওদের মুখগুলো বাঁদরের মত দেখাচ্ছিল। ওদের কথা কানে শুনলেও মানছিল না ক্যাথাবিন। ও যেন দেহের সব শক্তি হাবিয়ে ফেলেছিল। তাছাড়া ল্যাম্পের মিটমিটে আলোয় কোন কিছু ভাল করে দেখা যাচ্ছিল না। ওবা কিন্তু ঠিকমত দেখতে পাচ্ছিল ক্যাথাবিনকে।

শ্যাভেল ক্যাথাবিনকে বলল, এভাবে খালি গায়ে যাতায়াত কবলে ঠাণ্ডা লেগে যাবে যে? সর্দি হবে।

আব একজন শ্রমিক বলল, ওব পা দুটো ভাল। পা দুটো ফাঁক কবলে তাতে দুটো লোক ঢুকে যাবে।

আব একজন শ্রমিক ঠাণ্ডা কবে বলল, কোমবে যেটা আছে সেটা আব একটু তোল। দেখি, দেখি।

শ্যাভেল আবার ক্যাথারিনেব উপব চটে গেল। বলল, যেখানে ওকে নিয়ে তামাশা হয়, নোংরা বসিকতাব কথা বলাবলি হয় সেখানে ও সর্বক্ষণ দাঁড়িয়ে তা শুনবে। দরকাব হলে কাল পযন্ত দাড়িয়ে থাকবে।

অতি কষ্টে টবটা ভর্তি করে চলে গেল ক্যাথাবিন। দেহটাকে বাঁকিয়ে সামনেব দিকে ঝুঁকে হাতদুটো টবটাকে যথাসাধ্য জোবে ঠেলছিল সে। তার গতি ক্রমশই খুব মন্দীভূত হয়ে পডছিল। কয়লা চেলে কয়লাকাটাব মুখটার কাছে আসতেই গবমটা অসহ্য ঠেকল ক্যাথাবিনেব। দুবাব যাবার পর এই তিনবারের বেলায় পা আর তাব উঠছিল না।

কিন্তু আজ কি হলো? এত গরম ত আব কোনদিন অনুভব করে না ক্যাথারিন। মনে হচ্ছিল তাব দেহের হাডগুলো পশম দিয়ে তৈবি। ক্যাথারিনেব মনে হলো বায়ুসঞ্চালন ব্যবস্থা ঠিক কাজ করছে না। তার ফলে বাতাসটা দূষিত হয়ে পড়েছে। কয়লা থেকে একটা গ্যাস বেরিয়ে এসে বাতাসটাকে ভারী করে তুলেছিল। এব পর ল্যাম্পের আলোগুলো হয়ত নিবিয়ে যাবে। ক্যাথাবিন এই দূষিত বাতাসের অর্থ জানে। এটা হচ্ছে সেই ক্রমদগ্ধমানা পাপিষ্ঠা মেয়েদের দীর্ঘশ্বাস। ছোটবেলা থেকে এই গরম, খনিগর্ভের এই দূষিত বাতাস এত ভোগ করে এসেছে সে যে আজ এতে সে অস্বস্তিবোধ করায় সে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছে।

ক্যাথারিন এবার গরমে মরীয়া হয়ে যে জামাটা কোমরে জড়ানো ছিল

তাও খুলে ফেলল। এবার পুরো উলঙ্গ হয়ে পশুর মত খনির অন্ধকারে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

কিন্তু সম্পূর্ণ নগ্ন হয়েও গায়ের জ্বালা মিটল না ক্যাথারিনের। সে এবার ল্যাম্পের সলতেটাকে বার করে নিবিয়ে দিল, কারণ তার মনে হচ্ছিল ল্যাম্পের আলোটার জন্য গরম বেশী লাগছে। বাতিটা নিবিয়ে যেতে এবার ঘন অন্ধকারে ডুবে গেল চারিদিক। সহসা ক্যাথারিনের মনে হলো কে যেন জাঁতা ঘোরাচ্ছে তার মাথার মধ্যে। তার চারদিকে সব ঘুরছে। অনপনেয় ক্লান্তির ভাবে, অবসন্ন হয়ে আসছে তার সমস্ত শরীর। তার হৃৎপিণ্ডটা স্তব্ধ হয়ে আসছে, চিৎ হয়ে মাটির উপর শুয়ে পড়ল ক্যাথারিন।

ওদিকে শ্যাভেল তার সাড়া শব্দ না পেয়ে চিৎকার করে উঠল, হা ভগবান, মেয়েটা আবার আলগা দিল কাজে।

ভাল করে কান পেতেও কোন শব্দ শুনতে না পেয়ে হাঁক দিল, এই ক্যাথারিন, কুঁড়ের হদ্দ কোথাকার, শুনতে পাচ্ছিস ?

তবু কেউ সাড়া দিল না তার কথার। তখন শ্যাভেল বলল, আমি কি তাহলে গিয়ে তোকে নাড়িয়ে দেব ?

তবু কোন সাড়া নেই। সেই মৃত্যুশীতল এক স্তব্ধতা। প্রচণ্ড রাগে কাঁপতে কাঁপতে ছুটে গেল ক্যাথারিনের দিকে। এত জোরে ছুটছিল শ্যাভেল যে আর একটু হলে ক্যাথারিনের শায়িত দেহটা মাড়িয়ে ফেলত। হঠাৎ শ্যাভেলের চোখ পড়ল অন্ধকারে মাটির উপর শুয়ে আছে ক্যাথারিন। নিথর নিস্পন্দ তার দেহ। এবার হুঁস হলো শ্যাভেলের। নিশ্চয় দূষিত বাতাস লেগে এই রকম হয়েছে। এ রকম হয় মাঝে মাঝে। হঠাৎ সব রাগ উবে গেল তার। মুহূর্ত মধ্যে ক্যাথারিনের অচেতন দেহটাকে কোলে তুলে নিয়ে সে তার সহকর্মীকে হাঁক দিয়ে ক্যাথারিনের জামা আর পায়জামাটা ছুঁড়ে দিতে বলল।

সেইগুলো নিয়ে ক্যাথারিনের দেহটা দুহাতে তুলে ধরে ঠাণ্ডা জায়গার দিকে প্রাণপণে ছুটতে লাগল শ্যাভেল। যেখানে বায়ুসঞ্চালন যন্ত্র আছে সেইখানে গিয়ে দাঁড়াল। সেখানে দারুণ ঠাণ্ডা। সে শীতে কাঁপতে লাগল। ক্যাথারিনের দেহটাও কেঁপে উঠল একটু। কিন্তু শ্যাভেল দেখল তার দেহটা মড়ার মত অসাড়। তার দেহে যেন কোন শক্তি নেই। যৌবনপ্রাপ্তির আগেই এক অনিবারণীয় পুরুষের উদ্ধত স্পর্শে যে তার কুমারীত্বকে হারিয়েছে সেই ক্যাথারিনের নগ্ন অপুষ্ট দেহটার পানে তাকিয়ে রইল শ্যাভেল। তারপর বলল, ক্যাথারিন, উঠে বস ক্যাথারিন।

তবু কিন্তু উঠতে পারল না ক্যাথারিন। শুধু কোন রকমে চোখের পাতা-গুলো মেলে বলল, বড় শীত লাগছে।

ক্যাথারিনের মুখ থেকে কথা শুনে তবু সাহস পেল শ্যাভেল। তবু ভাল। শ্যাভেল এবার তাড়াতাড়ি ক্যাথারিনের গায়ে জামাটা পরিয়ে দিল।

তারপর পায়জামাটাও তাকেই কষ্ট করে পরিয়ে দিতে হলো। কারণ ক্যাথারিনের এখনো উঠে বসার ক্ষমতা নেই।

জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দারুণ লজ্জা পেল ক্যাথারিন। যখন দেখল তার সারা দেহটা সম্পূর্ণ নগ্ন এবং এইমাত্র গ্যাভেল জামাকাপড় পরাচ্ছে তখন সে ভাবল তার এই নগ্ন দেহ সমস্ত শ্রমিকরা দেখে ফেলেছে। সেকথা গ্যাভেলকে বলায় গ্যাভেল মিথ্যা করে বলল, সকলের সামনে অচেতন হয়ে পড়ে এবং সে সকলের সামনে দিয়ে তার নগ্ন দেহটাকে তুলে এনেছে। পরে অবশ্য সত্য কথাটা বলল গ্যাভেল।

এবার গ্যাভেল নিজেও তার জামা পরতে পরতে বলল, আমিও শীতে মরছি।

ক্যাথারিন লক্ষ্য করল গ্যাভেল এখন তাকে যে সব কথা বলছে তার সেই সব কথার সঙ্গে তার প্রতি প্রচুর দয়ামায়া ঝরে পড়ছে। যদিও তার সঙ্গে তাকে গালাগালিও করছে, তবু আজ গ্যাভেলের এই সহানুভূতি আর মমতার কথা বড় ভাল লাগল ক্যাথারিনের। তার মনে হলো গ্যাভেল যদি রোজ তাকে এই ধরনের মিষ্টি কথা বলত, তার সঙ্গে এইভাবে ব্যবহার করত।

আবেগের সঙ্গে হাসিমুখে ক্যাথারিন বলল, আমাকে চুম্বন করো।

গ্যাভেল তাকে চুম্বন করে তার পাশে শুয়ে রইল।

ক্যাথারিন বলল, আমি গরমে কাজ করতে পারছি না। তুমি যদি জানতে কী ভীষণ গরম ওখানে। তোমার ওভাবে আমাকে বকা উচিত হয় নি।

গ্যাভেল বলল, হ্যাঁ ওখানে দারুণ গরম। জানি তোমার ওখানে বড় কষ্ট হচ্ছিল।

গ্যাভেলের এই সহানুভূতির কথাগুলো নতুন করে স্পর্শ করল ক্যাথারিনের অন্তরটাকে। এ কথায় সাহস বেড়ে গেল তার। ক্যাথারিন বলল, জায়গাটা খারাপ ঠিক। তবু দেখবে এবার থেকে আমি কিভাবে কাজ করি। কাজ যখন করতে হবে তখন উপায় কি। আমি মরব, তবু কাজ বন্ধ করব না।

দুজনেই চুপ করে রইল। গ্যাভেল একটা হাত দিয়ে ক্যাথারিনের কোমরটা জড়িয়ে ধরে ছিল আর একটা হাত দিয়ে তাকে তার বুকের কাছে সজোরে টেনে নিল।

ক্যাথারিন বুঝতে পারল এবার সে কাজে যাবার মত শক্তি ফিরে পেয়েছে, তবু তার এই সুখনিবিড় মুহূর্তগুলো বড় ভাল লাগছিল। গ্যাভেলের এই প্রেমময় বাহুবন্ধনটা ছাড়িয়ে উঠে যেতে ইচ্ছা করছিল না তার। কাঁদ-কাঁদ গলায় সে বলল, তুমি যদি আমার সঙ্গে একটু ভাল ব্যবহার করতে। ভালবাসার মত সুখ আর নেই।

গ্যাভেল বলল, কিন্তু আমি ত তোকে ভালবাসি। ভাল না বাসলে আমি তোকে নিয়ে ঘর করতাম না।

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল ক্যাথারিন। কত লোক শুধু শুধু একটা মেয়েকে পাবার জন্যই বিয়ে করে। তাদের সে দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে ভালবাসার কোন নামগন্ধ থাকে না। সহসা ক্যাথারিনের মনে হলো আর একটি পুরুষের কথা। তার মনে হলো যদি সে শ্যাভেলের পরিবর্তে সেই পুরুষকে নিয়ে ঘর করত তাহলে সে পুরুষ এমনি করে সব সময় ভালবেসে তার কোমরটা জড়িয়ে থাকত। তাহলে তার জীবন কত সুখের হত। একথা যতই ভাবতে লাগল সে ততই এক বিষণ্ণ হতাশা আচ্ছন্ন করে তুলল তাব মনটাকে, তাই তার চোখ থেকে ঝরে পডতে লাগল অবাধ্য অশ্রুর অবারিত ধারা। সত্যই সে এক আলাদা ধরনের পুরুষ। সে পুরুষের অস্পষ্ট মুখচ্ছবিটা তার চোখের সামনে একবার হঠাৎ ভেসে উঠেই মিলিয়ে গেল। নিজের মনটাকে শক্ত করল ক্যাথারিন। যাই হোক ভুলে যেতে চায় সে পুরুষের কথা, এখন একে নিয়েই জীবন কাটাতে হবে। শুধু শ্যাভেল যদি অতটা নিষ্ঠুর না হয় তাহলেই যথেষ্ট।

ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল ক্যাথারিন। শ্যাভেল তাকে আবার চুম্বন করল সোহাগভরে।

শ্যাভেলের মুখপানে তাকিয়ে হাসতে লাগল ক্যাথারিন। যদিও তার চোখে তখনো জল ছিল। ওরা আবার পরস্পরকে জড়িয়ে ধরল। এক নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে উঠল আবার। ক্যাথারিন ভাবল, শ্যাভেলের এই ভাব বেশীক্ষণ থাকবে না। সে তার প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে যাবে। তবু এই মুহূর্তের নিবিডতম আনন্দেব মধ্যে তার সব সত্তাকে বিলিয়ে দিতে চাইল ক্যাথারিন। হঠাৎ কাদেব পদশব্দে চমকে উঠল ওরা। ওদের তিনজন সহকর্মী খবর নিতে আসছে, কারণ ওবা শ্যাভেলকে এদিকে ছুটে আসতে দেখেছিল ক্যাথারিনকে কোলে নিয়ে।

ওরা সকলে একসঙ্গে আবার ফিরে গেল ওদের কাজের জায়গায়। বেলা তখন দশটা বাজে। লাঞ্চ খাবার সময় হয়ে গেছে। ওরা যখন স্যাণ্ডউইচ খাওয়া শেষ করে ফ্লাস্ক থেকে কফি ঢালতে যাচ্ছিল এমন সময় দূরে একটা গোলমালের শব্দ শুনে ভীত ও সচকিত হয়ে উঠল ওরা। কি ব্যাপার, আবার কোন দুর্ঘটনা ঘটল না কি? সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ে ছুটতে লাগল ওরা ঘটনা-স্থলেব দিকে। ওরা দেখল ওদের মত আরো সব খনিশ্রমিক ছুটে পালাচ্ছে। সকলেরই চোখেমুখে আনন্দের ছাপ। কিন্তু আসল ব্যাপারটা কি তা কেউ জানে না।

অবশেষে এক ডেপুটি চিৎকার করে বলে উঠল, ওরা তার কেটে দিচ্ছে। একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল শ্রমিকবা। ওরা কি করবে কিছু খুঁজে পেল না। সকলেই অন্ধকার পথে ছোটাছুটি করতে লাগল পাগলের মত। কে তার কাটছে? নিচেতে যখন এত লোক কাজ করছে তখন উপরে ওঠার ডুলির তার কে কাটছে ওরা কিছুই বুঝতে পারল না।

আর একজন ডেপুটি চিৎকার করে কি একটা বলতে বলতে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। সে বলছিল, মঁতস্যুর লোকরা তার কেটে দিচ্ছে। সকলে বেরিয়ে যাও তাড়াতাড়ি। সবচেয়ে আতঙ্কিত হয়ে উঠল শ্যাভেল। সে এখন উপরে গেলে মঁতস্যুর শ্রমিকদের সঙ্গে তার দেখা হবে, তাদের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে, একথা ভাবতেই সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে আসতে লাগল শ্যাভেলের। ওরা তাহলে এসে গেছে। ও ভেবেছিল পুলিস ওদের আটকেছে, আসতে দেয় নি। যাই হোক, শ্যাভেল ভাবল, যা হয় হবে, ও বাইরে গিয়ে তাদের সামনে দাঁড়াবে। সে তার ভয়কে চেপে রেখে শ্রমিকদের ছোটাছুটি করার জন্য বকাবকি করতে লাগল। যা হোক একটা ব্যবস্থা হবে। এতগুলো লোক কখনো খনির তলায় থাকতে পারে না।

একজন ডেপুটি চিৎকার করে বলে দিল, সকলে মই নিয়ে উঠে যাও।

ভিড়ের ঠেলাঠেলিতে এগিয়ে যেতে লাগল শ্যাভেল আর পাঁচজনের সঙ্গে। সে ক্যাথারিনকে বকতে লাগল। কারণ সে পিছিয়ে পড়ছিল। শ্যাভেল বলল, ক্যাথারিন কি চায় সকলে বেরিয়ে গেলে ও একা এখানে থেকে শুকিয়ে মরবে?

এবার সকলেই মইএর দিকে ছুটতে লাগল। মেয়েপুরুষ সকলেই আগে বাইরে যাবার জন্য উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল। কিন্তু কিছুদূর যাবার পর কারা বলল, ওরা মঁতস্যুর লোকরা মইগুলোও নষ্ট করে দিয়েছে। কেউ বাইরে যেতে পারবে না। শ্যাভেল এর আগে একবার ভেবেছিল গ্যাসটন মেরির ডুলিটা করে বাইরে যাবে। কিন্তু ওটা এখন বিকল হয়ে পড়ে আছে।

ক্যাথারিন ঠিকমত ছুটতে পারছিল না। তাই শ্যাভেল তাকে বলল, দয়া করে আমার সামনে এসে ছোট। তুমি পড়ে গেলে আমি অন্ততঃ তোমাকে ধরতে পারব। তিন কিলোমিটার পথ ছুটে ছুটে এসে হাঁপিয়ে পড়েছিল ক্যাথারিন। তার সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে গিয়েছিল। তার শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল।

তবু শ্যাভেল তার হাত ধরে টানছিল। তার হাতে যন্ত্রণা করছিল। ওরা জোর গলায় সকলকে বলল, এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে কিছু হবে?

এবার শ্যাভেল ক্যাথারিনকে বলল, তোর মরা ভাল। তুই মরলে আমি বাঁচি। নিষ্কৃতি পাই।

সাতশো মিটার নিচের এই খনিগর্ভ থেকে বাইরের আলো-হাওয়ায় যাবার জন্য যে মই আছে সে মই একমাত্র জরুরী অবস্থা ছাড়া কেউ কখনো ব্যবহার করে না। আজ পর্যন্ত সে মই ব্যবহার করার কোন প্রয়োজন হয়নি। সে মইএ একটা লোকই উঠতে পারে এবং উপরে খনির মুখে বেরিয়ে যাবার মুখটি খুব ছোট। একটা বলিষ্ঠ লোকের পুরো পঁচিশ মিনিট লাগবে সেই মই দিয়ে উপরে উঠতে।

একটা মইএ ক্যাথারিন শ্যাভেল আর একটা ছেলে উপরে উঠতে লাগল।

ক্যাথারিন প্রথমে উঠতে লাগল। তারপর শ্যাভেল। তারপর ছেলেটা। ওঠার সময় গণে দেখছিল ক'টা মই পার হচ্ছে। তলা থেকে উপর পর্যন্ত একশো দুটো মই আছে। প্রতিটা মই এক একটা কাঠের প্ল্যাটফরমে বা পাটাতনের উপর দাঁড় করানো আছে এবং সেই পাটাতনের মধ্য দিয়ে একটা লোক কোন রকমে গলে যেতে পারে। ছেলেটা গণে দেখল ওরা এর মধ্যে পনেরটা মই পার হয়েছে। পনেরটা মই একটানা একে একে পার হয়ে ওরা একটা প্ল্যাটফরমে একবার থামল। অনেকে বলাবলি করছিল মঁতস্যুর দুর্বৃত্তরা শেষ মইটা ভেঙ্গে নষ্ট করে দিয়েছে। ফলে ওরা এতটা উঠেও বার হতে পারবে না এবং ফিরে আসতে হবে।

একবার ওদের মনে হল মই দিয়ে ওঠা শুরু না করলেই ভাল হত। মনে হলো ওরা যেন এত কষ্ট করে পৃথিবীর বুকের উপর নয়, একেবারে খাঁটি শূন্যে উঠে যাচ্ছে। ওরা তিনজন কাছাকাছি থাকলেও মইটাতে ওরাই একমাত্র আরোহী নয়। ওদের উপরে ও নিচে আরো অনেক শ্রমিক উঠছে। তাদের সকলের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ কানে আসছে। তবে কথা বিশেষ কেউ কিছু বলছে না।

বত্রিশটা মই পাব হয়ে ওরা একটা চাতালের উপর একটুখানি থামল। ক্যাথারিন তার ক্লান্তি কিছুটা দূর করে আবার উঠতে শুরু করল। তার পা আর হাতে ব্যথা করছিল। তার উপর বড় বড় জলের ফোঁটা ঝরে পড়ছিল ওদের মাথার উপর, কারণ ওরা পৃথিবীর জলের স্তরে এসে পৌঁছেছিল। শ্যাভেল দুবার ক্যাথারিনের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করল। কিন্তু কোন উত্তর পেল না শ্যাভেল। কি হলো ওর? ওর জিবটা কি খসে গেছে নাকি?

ওরা আধ ঘণ্টা ধরে উঠছে। কিন্তু ওদের গতি এত শ্লথ যে ওরা একশো দুইটা মইএর মধ্যে মাত্র বত্রিশ তেত্রিশটা মই পার হয়েছে। ক্যাথারিনের দুর্বল দেহ নিয়ে উঠতে খুবই কষ্ট হচ্ছিল। আরো অনেকেরই কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু কোন উপায় নেই। এক সমবেত আর্তনাদ আর পুঞ্জীভূত দীর্ঘশ্বাস খনির তলা থেকে ধীরে ধীরে পৃথিবীর উপরিপৃষ্ঠের দিকে উঠে যাচ্ছিল লোকগুলোর সঙ্গে।

কষ্ট হলেও উঠে যাচ্ছিল ক্যাথারিন। এবার পৃথিবীর জলস্তর পার হয়ে এসেছে। আর জল পড়ছিল না। কিন্তু বাতাসটা এখানে কুয়াশায় ভারী। পুরনো লোহা আর ভিজে কাঠের গন্ধ আসছিল। ক্যাথারিন গণল তিরিশটা মই পার হয়েছে; এখনো উনিশটা আছে। কিন্তু ক্যাথারিনের মনে হলো আর ও উঠতে পারবে না। তার হাত পা অসাড় হয়ে আসছে। ওর মনে হলো, ওর দেহে যেন এক ফোঁটাও রক্ত নেই। এর মাঝে আবার আগে বার হওয়ার জন্য নিচেকার মানুষ অনেক সময় উপরের লোককে ডিঙ্গিয়ে উঠছিল।

হঠাৎ পড়ে গেল ক্যাথারিন। সে চেতনা হারিয়ে ফেলেছিল। পড়বার

সময় সে চিৎকার করে শ্যাভেলের নাম করেছিল। তবু শুনতে পায়নি শ্যাভেল। সে তখন তার উপরের একজনকে ছাড়িয়ে উঠবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু আর মাত্র পাঁচটা মই বাকি ছিল।

ক্যাথারিনের যখন জ্ঞান হলো তখন ও দেখল খাদের বাইরে ও পৃথিবীর মাটিতে আলো-হাওয়ায় শুয়ে আছে। ওর চারদিকে লোকের ভিড়। পরে বুঝল ও অচৈতন্য হয়ে মই থেকে পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিচের লোকেরা মইএর মধ্যেই ওকে ধরে ফেলে। তারপর তারা কোনরকমে ধরাধরি করে বাইরে নিয়ে আসে।

৩

সেদিন সকাল থেকে দুশো চল্লিশ নম্বর গাঁটা অশান্ত হয়ে ওঠে। গাঁয়ের সমস্ত লোক এক বিরাট উত্তেজনায় অধীর হয়ে পথে বেরিয়ে আসে। কিন্তু গতকাল রাতে ভাঁদেমের জনসভায় ওরা সকালে উঠেই জাঁ বার্ত খনিতে কাজ বন্ধ করতে যাবার যে শপথ করেছিল সেই শপথ অনুসারে ওরা কাজ করতে পারল না। কারণ একজন মেয়েশ্রমিক ওদের জানাল র‍্যাসেনোর ওদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে ম্যানেজার মঁসিয়ে হানিবোকে ওদের সিদ্ধান্তের কথাটা জানিয়ে দেয়। হানিবো আবার পুলিসকে জানিয়ে দিল কথাটা। ফলে ওরা মিছিল করে গাঁ থেকে বার হলেই পুলিস ও সেনাবাহিনী ওদের পথ রোধ করে দাঁড়াবে। তাই ওরা যে যার ঘরে চলে গিয়ে পুলিসের আগমন প্রতীক্ষা করতে থাকে।

তারপর বেলা সাড়ে সাতটার সময় আবার এক খবর আসে। তখন ওরা জানতে পারে আগে যে খবর পেয়েছিল তা মিথ্যা। আসল কথা, ধর্মঘট শুরু হওয়ার পর থেকে লিলের পুলিসকর্তার অনুরোধে স্থানীয় সেনাপতির নেতৃত্বে একদল অশ্বারোহী শান্তিরক্ষার জন্য মঁতসুর শ্রমিকবস্তীটা প্রতি সপ্তায় একবার করে ঘুরে যায়। অন্যদিনকার মত আজও সেনাদল টহল দিয়ে গেল। তখন বেলা নটা। নটা পর্যন্ত গ্রামবাসীরা আপন আপন বাড়ির দরজার সামনে শান্তিপূর্ণভাবে দাঁড়িয়ে রইল। সেনাদল এসে গাঁয়ের ভিতর দিয়ে টহল দিয়ে চলে গেল মার্সিয়েনের পথে।

ওদিকে মঁতসু কোম্পানির মালিকপক্ষের লোকেরা তখনো শুয়ে ঘুমোচ্ছিল বিছানায়। মঁসিয়ে হানিবোর বাড়িটা শূন্য পরিত্যক্ত বলে মনে হচ্ছিল। মাদাম হানিবো তার গাড়িতে করে কোথায় গেছে। মঁসিয়ে হানিবো একা একা তার অফিসে কাজ করছে। যে সব খনিতে ধর্মঘট করেছে শ্রমিকরা সেই সব কোন খনিতেই নিরাপত্তার জন্য পুলিসবাহিনীর সাহায্য নেওয়া হয়নি। এতে মালিকপক্ষের দূরদর্শিতার অভাবই প্রমাণিত হয়।

এতিয়েন দেখল গতকাল ভাঁদেমের জনসভায় যে তিনহাজার শ্রমিককে সে ঐক্যবদ্ধ অবস্থায় পেয়েছিল আজ তাদের সকলকে মিছিলের সময় পাবে না। অনেকে বেলা হওয়ায় ভেবেছে হয়ত মিছিল হবে না। তাই তারা এখানে সেখানে চলে গেছে। আবার দু'দল শ্রমিক সকালে উঠেই আগেই বেরিয়ে গেছে। তারা হয়ত ভাঁদেমের বনে বীচ গাছেব তলায় বসে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। তাদের ঠিকমত নিয়ন্ত্রিত না করলে তারা গিয়ে আপোষ করে ফেলতে পারে জাঁ বার্তের খনিশ্রমিকদের সঙ্গে।

এতিয়েন একবার স্থভারিনের কাছে পরামর্শ চাইতে গেল।

স্থভারিন একটা বই পড়ছিল। তাকে এ কথা বলতেই সে তাচ্ছিল্যভরে ঘাড় নাড়ল। সে বলল, মিছিল করে হাজার হাজার লোক নিয়ে গিয়ে কি হবে? দশজন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ দৃঢ়চেতা লোক এক বিরাট জনতার থেকে বেশী কার্যকরী। তাছাড়া কি হবে আন্দোলন করে? তার থেকে গোটা মঁতস্থকে পুড়িয়ে দেওয়া ভাল। এটা খুবই সহজ কথা। এই বলে সে আবার বইটা পড়তে লাগল।

এতিয়েন স্থভারিনের কাছ থেকে চলে যাবার সময় র‍্যাসেনোরেকে দেখতে পেল। র‍্যাসেনোর বসেছিল আর তার স্ত্রী তাকে কি খেতে দিচ্ছিল। তার মুখটা ম্লান দেখাচ্ছিল।

মাহিউর কথা হলো, তারা যখন কথা দিয়েছে তখন তাদের যাওয়া উচিত। কিন্তু রাত্রির মধ্যে অনেকটা নরম হয়ে উঠেছে। এখন সে বলছে, তারা জাঁ বার্তে যাবে, কিন্তু কোন গোলমাল না করে দেখবে যাতে কেউ কাজ করতে না যায় সে খনিতে।

ওরা ঠিক করল একসঙ্গে ওরা মিছিল করে যাবে না। বিভিন্ন দিক থেকে দলে দলে অথবা ব্যক্তিগতভাবে ওরা গিয়ে পৌঁছবে জাঁ বার্ত খনিতে। মাহিউ আর তার স্ত্রী একসঙ্গে বেরিয়ে গেল। এতিয়েন একা একা চলে গেল ভাঁদেমের বনের দিকে। আলজিরে বাড়িতে থেকে বাচ্চাদের দেখাশোনা করবে। বুড়ো বনিমোর গতকাল জনসভায় যাওয়ার জন্য অনেক হাঁটাহাঁটি করেছে বলে তার পায়ের রোগটা বেড়েছে। সে যেতে পারবে না।

এতিয়েন যাবার পথে একদল মেয়েকে দেখল তারা জাঁ বার্তের পথে এগিয়ে চলেছে।" ওরা পেট ভরাবার জন্য বাদাম খাচ্ছিল। এতিয়েন তাড়াতাড়ি করে বনে গিয়ে দেখল বনের ভিতর কেউ নেই। ওরা একটু আগে জাঁ বার্তে চলে গেছে।

ওদের দ্বারা কোন অনর্থ ঘটতে পারে এই ভেবে এতিয়েন সোজা জাঁ বার্তের পথে দ্রুত হাঁটতে লাগল। পথে দেখল বিভিন্ন দিক থেকে দলে দলে ধর্মঘটী শ্রমিকরা আসছে। *

এতিয়েন গিয়ে দেখল জাঁ বার্তের খনির মুখে প্রায় সবসুদ্ধ তিনশো মত

ধর্মঘটী শ্রমিক জড়ো হয়েছে। লেভাক একদল শ্রমিককে নিয়ে খনির ইয়ার্ডে ঢুকতে চাইছে খনির কাজ একেবারে বন্ধ করার জন্য।

এমন সময় ধর্মঘটী শ্রমিকদের সামনে দেন্নুলিন এসে দাঁড়াল। তার মেয়েদের মাদাম হানিবোর গাড়িতে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত মনে তার খাদের দিকে ফিরে আসছিল দেন্নুলিন। তার আর কোন চিন্তা ছিল না। তার সব শ্রমিকরা কাজে যোগদান করেছে। খনিতে পুরো দমে কাজ চলছে। আর কোন সমস্যা নেই। এমন সময় একজন ওভারম্যান দেন্নুলিনকে দেখাল দলে দলে লোক আসছে। কিন্তু দেন্নুলিন প্রথমে ভাবতে পারেনি ওই সব ধর্মঘটী শ্রমিক ওর খনির কাজ বন্ধ করার জন্য আসছে। অবশেষে যখন দেন্নুলিন দেখল সত্যি সত্যিই দলে দলে লোকগুলো ইয়ার্ডে ঢুকে পড়ছে তখন সে বুঝল আর উপায় নেই। বুঝল ওদের সঙ্গে পেরে উঠবে না সে। তবু সাহস করে গাম্ভীর্যের সঙ্গে দেন্নুলিন ওদের সামনে গিয়ে বলল, কি চাও তোমরা?

ঘটনা যাই ঘটুক সাহসের সঙ্গে তার সম্মুখীন হতে চায় দেন্নুলিন।

ওরা বলল, আমরা আপনার কোন ক্ষতি করতে চাই না। আমরা চাই আপনার খনিতে অন্যান্য খনির মত কাজ বন্ধ করতে।

দেন্নুলিন তখন বলল, তোমরা কি আমার খনিতে কাজ বন্ধ করে আমার ভাল করতে চাও? তার চেয়ে তোমরা বরং আমার পিঠে একটা গুলি করে দাও। হ্যাঁ, আমার লোকরা নিচে গেছে কাজ করতে। আমাকে মেরে না ফেলা পর্যন্ত ওরা কাজ বন্ধ করে উঠে আসবে না।

দেন্নুলিনের কথায় শ্রমিকরা চঞ্চল হয়ে উঠল। মাহিউ লেভাককে বোঝাতে লাগল। এতিয়েনও এগিয়ে এল। লেভাক এগিয়ে যাচ্ছিল দেন্নুলিনের দিকে। এতিয়েন দেন্নুলিনকে বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগল। সে বলল, ধর্মঘটী শ্রমিকদের এই দাবি ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু দেন্নুলিন তার যুক্তি খণ্ডন করে বলল, প্রত্যেকের কাজ করার অধিকার আছে। সে অধিকার কেউ কেড়ে নিতে পারে না। সে কোন যুক্তি মানতে চায় না। পরিশেষে দেন্নুলিন বলল, তার খনি রক্ষা করার জন্য পুলিসের সাহায্য না নিয়ে সে ভুল করেছে। সে বলল, আজ পুলিস থাকলে এই দুর্বৃত্তদের তাড়িয়ে দিত এক মুহূর্তে। হ্যাঁ, দোষটা আমারই। তোমাদের মত লোক শুধু গায়ের জোরে সব কাজ সিদ্ধ করতে চাও।

দেন্নুলিনের কথা শুনে এতিয়েনেরও রাগ হচ্ছিল। কিন্তু নিজেকে কোন রকমে সামলে নিয়ে বলল, আমার কথা শুনুন স্যার। আপনি আপনার লোকদের উপরে উঠে আসার হুকুম দিন। আমার দলের লোকেরা কোন ভুল করে বসলে আমি কিছু করতে পারব না। কোন অঘটন যাতে না ঘটে তার জন্য আপনারই ব্যবস্থা করা উচিত।

দেন্নুলিন বলল, না, চলে যাও তোমরা এখান থেকে। তোমরা কে?

আমার এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তোমাদের কোন সম্পর্ক নেই। তোমাদের সঙ্গে আমি কোন কিছুই আলোচনা করতে চাই না। তোমরা একদল দস্যু বা দুর্বৃত্ত ছাড়া কিছুই নও।

কিন্তু বিক্ষুব্ধ শ্রমিকদের গোলমালের মধ্যে দেস্থুলিনের সব কথা শোনা গেল না। বিশেষ করে মেয়েরা গালাগালি করতে লাগল। তবু দেস্থুলিন তার কথাগুলো সব বলতে পারায় একটা আত্মপ্রসাদ লাভ করল। এদিকে ধর্মঘটী শ্রমিকদের সংখ্যা ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছিল। তিনশো থেকে পাঁচশোতে বেড়ে গেছে তাদের সংখ্যা। ওরা একসঙ্গে এত জোরে চাপ দিচ্ছে যে দেস্থুলিন আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না।

তার খনির একজন ওভারম্যান দেস্থুলিনকে পাশে টেনে নিয়ে গেল। বলল, চলে আস্থন স্যার দয়া করে। ওরা চাপ দিয়ে পিষে মেরে ফেলবে আপনাকে।

দেস্থুলিন যেতে যেতে তবু চিৎকার করে ওদের লক্ষ্য করে বলতে লাগল, তোমরা একদল দুর্বৃত্ত। তোমরা দেখে নিও আমাদের সময় আবার আসবে। তখন দেখে নেব তোমাদের।

দেস্থুলিন ওদের কাছ থেকে রেগে চলে গেলেও ওদের রাগ কমল না। বিশেষ করে মেয়েরা পুরুষদের উত্তেজিত করছিল। একের পর এক ধ্বংসকাযে প্ররোচিত করছিল। ওরা দলে দলে সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ল। লকাররুম, কয়লা বাছাইএর জায়গা, বয়লার হাউস—সর্বত্র। মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যেই গোটা খাদটা ওদের দখলে চলে এল। ওরা গলা ফাটিয়ে পাগলের মত চিৎকার করতে লাগল। জয়ের আনন্দে হাতগুলো ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত করতে লাগল।

দেস্থুলিন একেবারে চলে যায়নি। অদূরে দাঁড়িয়ে এক নিস্ফল আক্রোশে বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে এই ব্যাপক ধ্বংসকার্য দেখছিল।

মাহিউ ভয় পেয়ে গেল। সে ছুটে গিয়ে এতিয়েনকে বলল, ওকে যেন ওরা মেরে না ফেলে।

এতিয়েনও ছোটাছুটি করছিল ওদের সঙ্গে। সে দেখল দেস্থুলিন তখনো চলে যায়নি, ডেপুটিদের ঘরের সামনে পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে। তখন সে মাহিউকে বলল, লোকটা যদি পাগলের মত কাজ করে তাহলে আমরা তার জন্য দায়ী হতে পারি না।

তবু এতিয়েনের মাথাটা তখনো ঠাণ্ডা ছিল ওদের সকলের মধ্যে। ওদের এই ব্যাপক এবং কাণ্ডজ্ঞানহীন ধ্বংসকার্যে ক্রমশই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছিল ও। ওদের নেতা হওয়া সত্ত্বেও ও সংযত করতে পারছিল না ওর সহকর্মীদের। ওর কথা ওরা শুনছিল না। ও একবার চিৎকার করে বলল, এইভাবে অকারণে পরের সম্পত্তি নষ্ট করলে শত্রুরা অজুহাত খুঁজে পাবে।

কিন্তু ওর কথায় কেউ কর্ণপাত করল না। মা ব্রুল বলল, বয়লারের দিকে

চল। বয়লার।

লেভাক একটা কাটারি ঘোরাতে ঘোরাতে চিৎকার করে উঠল, তার কেটে দাও। ডুলির তার।

সকলেই একবাক্যে বলে উঠল, তার কেটে দাও।

এতিয়েন বলল, নিচেতে এখনো অনেক লোক আছে।

বিক্ষুব্ধ জনতা বলল, ওদের খাদের ভিতর যাওয়া উচিত হয়নি। কেন ওরা গেল? বিশ্বাসঘাতকদের এই হলো উপযুক্ত শাস্তি। যাই হোক, ওরা মই দিয়ে উঠে আসতে পারবে।

মইএর কথা ভেবে এতিয়েনও চুপ করে রইল। তবে এতিয়েন ভাবল, তার কেটে দিলেও ডুলিগুলো যেন উপরেই থাকে, কারণ সেগুলো নিচে সশব্দে পড়ে গেলে তলায় লোক চাপা পডতে পারে। তাই ও গিয়ে ডুলি দুটোকে বাঁচাবার চেষ্টা করল। কিন্তু তাতে কোন ফল হলো না। লেভাক আর দুজন লোক উপরে উঠে গিয়ে তারগুলো অতর্কিতে এমনভাবে কেটে দিল যার ফলে ডুলিগুলো বিরাট শব্দ করে খাদের নিচে পডে গেল। ওদের মনে হলো দুঃখের অতলান্তিক খাদটা বন্ধ হয়ে গেল। আব কোন শ্রমিক খাদে নেমে কাজ করতে যেতে পারবে না।

এদিকে বুড়ী মা ব্রুল লকাররুমেব দিকে ছুটে গেল। তার মুখে শুধু এক কথা, বয়লার। আগুন নিবিয়ে দাও।

মা ব্রুলের সঙ্গে অন্য মেয়ে শ্রমিকরাও যোগ দিল। মাহিউর মত তার স্ত্রীর মাথাটাও ঠাণ্ডা ছিল। মাহিউর মত সেও মেয়েদের সংযত করার চেষ্টা করছিল। সে ওদের বলছিল, তারা তাদের অধিকারের দাবি করতে পারে, তাদের যাবতীয় দাবি আদায়েব জন্য লডাই করে যেতে পারে। কিন্তু মালিকদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নষ্ট করার কোন অধিকার তাদের নেই। কিন্তু মাহিউর স্ত্রীর কথা মেয়েরা শুনল না।

মোট পাঁচটা বয়লাবেব দশটা ফার্নেস আছে। লা লেভাক, মা ব্রুল প্রভৃতি মেয়েরা গিয়ে বয়লারগুলো সব ভেঙ্গে কয়লাগুলো ছডিয়ে দিল। ওদের দলে মুকেত্তেও ছিল।

এমন সময় কোথা হতে জাঁলিন এসে কর্কশ কণ্ঠে চিৎকার করে বলল, আমি আগুন নিবিয়ে দিচ্ছি।

এই বলে সে এক জায়গায় উঠে গিয়ে পাঁচটা বয়লারের প্রাণকেন্দ্র স্টীম কর্কটা খুলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে এক বিরাট শব্দ করে বয়লারগুলোর সব আগুন এক মুহূর্তে নিবে গেল। একরাশ সাদা বাষ্প সশব্দে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে চারদিক অন্ধকার করে দিল। খনির এঞ্জিনম্যান ও উপরের কর্মরত শ্রমিকরা আগেই পালিয়ে গিয়েছিল। এবার বয়লারের লোকরাও পালিয়ে গেল।

কিন্তু এতেও তৃপ্ত হলো না বিক্ষুব্ধ ধর্মঘটীরা। তারা হাতুরী দিয়ে মেশিনপত্র

যা সামনে পেতে লাগল তাই ভাঙতে লাগল নির্বিচারে। একথা শুনে এতিয়েন এসে ওদের বাধা দিল। কিন্তু কেউ ওর কথা শুনল না।

এবার 'এসকেপ শ্যাফ্‌ট' বা জরুরী নিষ্ক্রমণের পথ দিয়ে জ্যঁ বার্ত খনির কর্মরত শ্রমিকরা একে একে মই বেয়ে উঠে আসার সঙ্গে সঙ্গে ওরা তাদের প্রতি বিদ্রূপের সঙ্গে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছিল। ওরা বজ্রগর্জনে বলতে লাগল, শয়তান বিশ্বাসঘাতকরা নিপাত যাক।

সঙ্গে সঙ্গে মঁতস্যুর পাঁচশো ধর্মঘটী শ্রমিক দু'পাশে লাইন দিয়ে দাঁড়াল। জ্যঁ বার্তের যে সব কর্মরত শ্রমিক বেরিয়ে আসছিল একে একে ওরা তাদের নীরবে পালিয়ে যেতে বাধ্য করছিল। কালিঝুলি মাখা কৌপীন পরা মানুষগুলো যখন ক্লান্ত অবসন্ন দেহে একে একে বেরিয়ে আসছিল তখন তারা তাদের নানারকম অপমানজনক কথা বলে বিব্রত করে তুলছিল। কেউ একজন বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে ওরা বিদ্রূপ করে বলে উঠছিল, ঐ দেখ ওর নাকটা উড়ে গেছে। কাউকে বলছিল, ওর পা-টা ছিনে পড়ে গেছে। এইভাবে দু'পাশে বিক্ষুব্ধ জনতার মধ্য দিয়ে মাথায় অবিরল বিদ্রূপবর্ষণ উপেক্ষা করে মাথা নিচু করে চলে যাচ্ছিল শ্রমিকরা।

এতিয়েন তাদের সংখ্যা দেখে অবাক হয়ে গেল। বলল, ওরা ত সংখ্যায় অনেক আছে।

এতিয়েন ভেবেছিল জ্যঁ বার্তের বেশীর ভাগ শ্রমিক তাদের ধর্মঘটে যোগ দিয়েছে, মুষ্টিমেয় কিছু শ্রমিক খাদে নেমেছে কাজ করতে। ও এই কথাই ঘোষণা করেছিল গতকালকার জনসভায়। কিন্তু এখন দেখল জ্যঁ বার্তের সব শ্রমিকই খাদে নেমেছিল কাজ করতে।

এমন সময় হঠাৎ দরজার কাছে শ্যাভেলকে দেখতে পেয়েই তার কাছে ছুটে গেল এতিয়েন। মরণ তোমার! তুমি না আমাদের সঙ্গে আজ কাজ বন্ধ করার জন্য বেরোবে বলেছিলে?

সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য মুখ থেকে এক সঙ্গে বিদ্রূপ আর অপমানের জ্বালা বর্ষিত হতে লাগল তার মাথার উপর। সে না গতকাল তাদের কাছে শপথ করেছিল, আজ সে খাদে যাবে না কাজ করতে, আবার সে নিজে আজ কাজ করতে গেছে?

ধর্মঘটী শ্রমিকরা বলতে লাগল, ওকে ফেলে দাও খাদের নীচে।

শ্যাভেল আমতা আমতা করে কি একটা কৈফিয়ৎ দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু এতিয়েন তাকে কোন কথা বলতে দিল না। আর পাঁচজনের মত সে নিজেও উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল শ্যাভেলের বিশ্বাসঘাতকতায়। সে বলল, তুমি না বলেছিলে তুমি আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে বিভিন্ন খনিতে কাজ বন্ধ করতে যাবে?

কিন্তু হঠাৎ খনির মুখ থেকে ক্যাথারিন বেরিয়ে আসায় নতুন করে উত্তেজনা

দেখা দিল বিক্ষুব্ধ শ্রমিকদের মধ্যে। সকলেই তাকে নিয়ে পড়ল। ফলে এতিয়েনের কথাগুলো চাপা পড়ে গেল।

অথচ ক্যাথারিনের অবস্থা তখন খুবই খারাপ। মূর্ছাভঙ্গের পর পৃথিবীর আলো হাওয়ায় হঠাৎ এসে বিহ্বল হয়ে পড়ল সে। তার উপর তার দুর্বলতা তখনো কাটেনি। তার পা দুটো অসাড় হয়ে গিয়েছিল একশোটার উপর মই বেয়ে এসে। তার হাতের তালু দিয়ে রক্ত বার হচ্ছিল। কিন্তু তার এই দৈহিক কষ্টকে ছাপিয়ে বিরুদ্ধ বিক্ষুব্ধ জনতার অপমানের জ্বালার জন্য এক মানসিক যন্ত্রণা প্রবল হয়ে উঠেছিল তার মধ্যে।

এতিয়েন বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে তার মা মাহিউর স্ত্রী তার কাছে তার সামনে ঘুঁষি পাকিয়ে বলল, খুব ভাল কাজ করেছিস, কুত্তী কোথাকার! নিজের মা ক্ষুধার জ্বালায় মরছে আর উনি কাজ করতে গেছেন খাদে।

মাহিউ এসে তার স্ত্রীর হাতটা ধরে ফেলল। তা না হলে ঘুঁষি মেরে ফেলত ক্যাথারিনের মুখে। মাহিউ ক্যাথারিনের দেহটা ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে তাকে ধিক্কার দিতে লাগল তার আচরণের জন্য।

কিন্তু ক্যাথারিনকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে এতিয়েন চুপ হয়ে গেল। তার ধ্বংসাত্মক আবেগের উত্তপ্ত উচ্ছ্বাসের উপর কে যেন এক বালতি জল ঢেলে দিল। সে তার দলের লোকদের মনটা অন্য দিকে ঘোরাবার জন্য বলল, ভাই সব অন্য খাদে চল।

তারপর শ্যাভেলকে লক্ষ্য করে বলল, তুইও চল, নোংরা শুয়োর কোথাকার।

সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকরা তার হাত ধরে টানাটানি করতে লাগল। লকাররুমে গিয়ে তার জামাটা আনারও সময় পেল না শ্যাভেল।

ক্যাথারিন কোনরকমে তার জামাটা পরে বোতাম লাগিয়ে শ্যাভেলের পিছু পিছু যেতে লাগল। তার ভয় হচ্ছিল ওরা হয়ত শ্যাভেলকে খুন করে ফেলবে। মেয়েরা তাদের আপন আপন পোষাকের আঁচল তুলে ছুটতে লাগল। পথে তাদের দেখে অন্যান্য খনির শ্রমিকরাও অনেকে এসে যোগদান করল তাদের দলে। ক্রমে তাদের সংখ্যা পাঁচশো থেকে এক হাজারে গিয়ে দাঁড়াল। ওরা সকলে ধ্বনি দিতে লাগল, চল, খাদে চল। বিশ্বাসঘাতকরা নিপাত যাক। সব কাজ বন্ধ করো।

সমগ্র জাঁ বার্ত খনিতে নেমে এল এক গভীর নিস্তব্ধতা। কোথাও একটা জনপ্রাণীও নেই। দেন্থলিন এবার ডেপুটিদের ঘর থেকে বেরিয়ে এল ধীরে ধীরে। তার অফিসাররা তাকে বাড়ি নিয়ে যেতে চাইছিল সঙ্গে করে। কিন্তু সে যেতে চাইল না। একা সে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল বিধ্বস্ত খনিটাকে। কিন্তু হঠাৎ খুব শান্ত হয়ে উঠল দেন্থলিন। তার মধ্যে আর কোন ক্ষোভ নেই। একে একে কাটা কেবল, ভাঙ্গা ঠাণ্ডা বয়লার, দগ্ধ স্টোর রুম প্রভৃতি ঘুরে ঘুরে

দেখল। সমস্ত খনিটাকে তার হঠাৎ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়া স্তব্ধ বিরাট এক জন্তু বা দানবের মত মনে হলো। এখনো এক পক্ষকাল তাকে কষ্ট করতে হবে। ডুলি মেরামত করে বয়লারে আবার আগুন দিলেও লোক পাবে কোথায়? ধর্মঘট না মিটলে কাজের আর আশা নেই। এখন সে সর্বস্বান্ত, তাকে দেউলে হতে হবে।

তবু কিন্তু মঁতস্যুর ঐ দুর্বৃত্ত ধর্মঘটী শ্রমিকদের প্রতি আর কোন ঘৃণা বা রাগ জাগল না দেমুলিনের মনে। তারা অসভ্য বর্বরের মত কাজ করতে পারে; কিন্তু এটাও ঠিক তারা বুভুক্ষু, তারা অনশনক্লিষ্ট।

৪

সেদিন দারুণ শীত। বরফ পড়ছে চারদিকে। ভর্তি দুপুর হলেও সূর্যটাকে ম্লান দেখাচ্ছে। ওরা এক বিরাট দলের মধ্যে সংঘবদ্ধ ও সংহত হয়ে মিছিল করে এগিয়ে চলেছিল। এতিয়েন ছিল ওদের সামনে। ভঁালিনও তার পাশে যাচ্ছিল। তারপর ছিল মেয়েদের দল। তারপর পুরুষ শ্রমিকরা।

এতিয়েন শ্যাভেলকে তার সামনে রেখে এগিয়ে যাচ্ছিল পাছে সে পালিয়ে যেতে না পারে। ক্যাথারিন ছিল মেয়েদের মাঝখানে। তার মা তাকে লক্ষ্য রাখছিল। ক্যাথারিনের একমাত্র চিন্তা শ্যাভেলের জন্য। তার দৃষ্টি ছিল সামনে শ্যাভেলের উপর নিবদ্ধ।

মাঝে মাঝে ওরা চিৎকার করে ধ্বনি দিচ্ছিল, আমরা রুটি চাই। আমরা রুটি চাই।

তখন বেলা প্রায় দুপুর। সেই কোন সকালে ওরা মুকেত্তের দেওয়া কিছু কাজুবাদাম খেয়েছে। তারপর পেটে কিছু পড়েনি। ওদের পাকস্থলীগুলো যেন ভিতর থেকে খাদ্যের জন্য চিৎকার করছিল। এতিয়েনকে সকালে কিছু রুটি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তার ভাগের রুটি সে খায়নি। এখন তীব্র ক্ষুধার জ্বালায় চোখে অন্ধকার দেখছিল সে। সে মাঝে মাঝে তাই একটা বোতল থেকে কিছু করে মদ খাচ্ছিল। তা না হলে সে হাঁটতে পারবে না, কোন কাজ করতে পারবে না। তবু তার মাথা ঠিক ছিল। তাব বিচারবুদ্ধি পরিষ্কার ছিল। সে অকারণ ধ্বংসকার্য এড়িয়ে যাবার চেষ্টা কবছিল।

ওরা জয়সেল রোডে এসে পৌছলে ভাঁদেমের এক শ্রমিক ওদের দলে এসে যোগদান করে বলল, গ্যাস্টন মেরি চল। পাম্পটা বন্ধ করে দাও। জলে ডুবে যাক জঁা বার্ত খনিটা।

এতিয়েনের বারবার নিষেধ সত্ত্বেও ওরা সত্যি সত্যিই গ্যাস্টন মেরির দিকে যেতে লাগল। সেখানে গিয়ে ওরা পাম্পটা নষ্ট করে দিয়ে জঁা বার্ত খনিটা জলে ভাসিয়ে দেবে। এইভাবে অকারণে একটা যন্ত্রকে নষ্ট করার কোন অর্থই হয় না—

মাহিউ ও এতিয়েন দুজনেই তাই মনে করে। কিন্তু প্রতিশোধবাসনায় উন্মত্ত শ্রমিকরা ওদের কথা কিছুতেই শুনবে না, কান দেবে না।

হঠাৎ এতিয়েনের কি মনে হলো সে জোর গলায় বলল, চল, মিরৌ খনিতে, ওখানে কাজ বন্ধ করতে হবে।

এবার তার কথায় কাজ হলো। জনতা সঙ্গে সঙ্গে বাঁ দিকের পথ ধরে মিরৌএর দিকে যেতে লাগল। জাঁলিন আবার ওদের সামনে এসে এগিয়ে চলল। জাঁ বার্ত খনিটা বেঁচে গেল।

মিরৌ পৌঁছতে ওদের মাত্র আধ ঘণ্টা লাগল। অথচ চার কিলোমিটার পথ। একটা ক্যানেল পার হয়ে ফাঁকা মাঠের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল ওরা জোর পায়ে। খাঁ খাঁ করতে থাকা শূন্য প্রান্তরটা দূর দিগন্তে গিয়ে মিশে গেছে। চারদিকে কোন জনমানব নেই। দিগন্তজোড়া শূন্য প্রান্তরটার মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম হলো ক্যানেলের দুধারে সারবন্দী কিছু গাছ। গাছগুলো এখন বরফে ঢেকে গেছে। প্রান্তরটার মাঝখানে এলে মঁতসু বা মার্সিয়েন কোনটাই দেখা যায় না। শুধু দেখা যায় জনহীন প্রান্তরের অন্তহীন শূন্যতা আকাশের শূন্যতায় গিয়ে এক হয়ে মিশে গেছে।

মিরৌ খনিতে গিয়ে ওরা দেখল ডেপুটি কাঁদিউ দাঁড়িয়ে আছে ওদের সামনে। বুড়ো কাঁদিউ একজন ডেপুটি হলেও ওদের বিশেষ চেনা। কাঁদিউ আগে ছিল ওদের মত মঁতসুরই এক শ্রমিক। পরে একে একে উন্নতি হয় তার। তাই কাঁদিউকে সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ওরা জোর করে যাবার চেষ্টা করল না, থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

ডেপুটি কাঁদিউ বলল, তোমরা—যত সব দুর্বৃত্তের দল কোথায় যাচ্ছ ?

এতিয়েন এগিয়ে এসে বলল, আপনাদের কিছু সংখ্যক লোক কাজ করতে নেমেছে। আপনি তাদের বেরিয়ে আসতে বলুন।

কাঁদিউ বলল, হাঁ কাজ করছে। তারা সংখ্যায় আছে ছয় ডজন। বাকি সব তোমাদের মত যত সব দুর্বৃত্তদের ভয়ে আসেনি। কিন্তু ওরা আসবে না খাদ থেকে। তোমরা আমাকে যা করার করো।

কাঁদিউ দরজার সামনে শক্ত হয়ে দাঁড়াল। মেয়েরা তাকে ঠেলে ঢোকার চেষ্টা করতে লাগল। মাহিউ এগিয়ে এসে কাঁদিউকে বোঝাতে লাগল। বলল, এটা আমাদের অধিকার। আমরা এইভাবে জোর করে কাজ বন্ধ না করলে আমাদের ধর্মঘটকে কিভাবে সাধারণ ও ব্যাপক করে তুলতে পারব বল ?

কাঁদিউ কথাটা বুঝতে পারল, কারণ সে নিজেও একদিন শ্রমিক ছিল। শ্রমিক ঐক্যের প্রয়োজন কতখানি তা সে বোঝে। তবু সে বলল, হতে পারে তোমাদের কথা ঠিক, কিন্তু আমি শুধু হুকুম তামিল করা ছাড়া আর কিছু বুঝি না। আমার হুকুম আছে, শ্রমিকরা তিনটে পর্যন্ত খাদের ভিতর কাজ করবে। এ হুকুম আমার তামিল করতেই হবে।

কাঁদিউর শেষ কথাগুলো ওদের গোলমালের মধ্যে ডুবে গেল। মেয়েরা ঘুঁষি পাকিয়ে এগিয়ে এল। কিন্তু কাঁদিউ অটল। তার তুষারশুভ্র চুল আর ছাগলের মত দাড়ি নিয়ে সে মাথা উঁচু করে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ওদের সমবেত কণ্ঠের গোলমালের ঊর্ধ্বে ওর গলা শোনা যেতে লাগল।

কাঁদিউ বলল, ঈশ্বরের নামে বলছি, তোমরা ঢুকতে পাবে না। সূর্যকিরণ যেমন সত্য তেমনি এখানে আমার এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকাটাও সত্য। তোমরা যদি চুপ না করো তাহলে আমি এই খাদের মুখ থেকে ঝাঁপ দিয়ে মরব তোমাদের চোখের সামনে।

বিক্ষুব্ধ জনতা শান্ত হলো অনেকখানি। তখন কাঁদিউ আবার বলতে লাগল, এখানে এমন কোন শূয়োর আছে কি যে এই সামান্য কথাটা বুঝবে না যে আমি একজন সামান্য কর্মী? আমাকে এই কাজের ভার দেওয়া হয়েছে। আমার এটা কর্তব্য।

এই কথা বলে এক সামরিক কর্তব্যপরায়ণতার সঙ্গে সে শক্ত ও খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সে প্রায় পঞ্চাশ বছর খাদের ভিতরে মাটির তলায় ওদের মতই কাজ কবার পর তবে এই ডেপুটির পদ পেয়েছে। সেও একদিন ওদের মতই ছিল সামান্য খনিশ্রমিক। খনিগর্ভের অন্ধকারে দীর্ঘদিন থাকার ফলে স্তিমিত হয়ে আসে তার চোখের দৃষ্টি। ধর্মঘটী শ্রমিকরা কাঁদিউর এই আনুগত্য, সাহস, অটল দৃঢ়তা প্রভৃতি গুণগুলোতে মুগ্ধ হয়ে গেল। তাছাড়া সেও একদিন তাদের মতই শ্রমিক ছিল বলে তার সঙ্গে ওরা একটা নিগূঢ় ঐক্য খুঁজে পেল। কাঁদিউ বলল, তোমরা এর মধ্যে ঢোকার আগেই আমি ঝাঁপ দেব প্রথমে।

জনতা আর দাঁড়াল না সেখানে। তারা সেখান থেকে চলে গেল। ধ্বনি দিতে লাগল, ম্যাদলেন চল, ম্যাদলেন।

পথে একবার গোলমাল শোনা গেল। কাঁদিউকে নিয়ে যখন মিরোএর খনিতে গোলমাল চলছিল শ্যাভেল সুযোগ বুঝে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে। কিন্তু এতিয়েন তখন সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেলে। এতিয়েন বলল, ফের যদি এভাবে পালাবার চেষ্টা করো তাহলে তোমাকে শেষ করে ফেলব।

শ্যাভেল প্রতিবাদ করে বলল, এসব কি হচ্ছে, এটা কি স্বাধীন দেশ? আমি শীতে জমে যাচ্ছি। আমার গা ধোয়া দরকার।

কথাটা সত্যি। তার গায়ে কয়লার কালি চিটিয়ে লেগে গেছে। তার গায়ে সামান্য যে জার্সিটা আছে তাতে মোটেই শীত ভাঙার কথা নয়।

এতিয়েন বলল, ঠিক আছে। এখন সকলের সঙ্গে মার্চ করে চল। পরে তোমার গা ধোয়াবার ব্যবস্থা করব। আর পাঁচজনের থেকে কোন দিক দিয়েই বেশী কিছু পাবে না। তাহলে তার পরিবর্তে রক্ত পাবে নিজের দেহের।

তারা সকলেই একরকম ছুটছিল। তাদের মধ্যে ক্যাথারিনও ছিল।

এবার এতিয়েনের দৃষ্টি পড়ল ক্যাথারিনের উপর। তার পায়জামাটা জলকাদায় ভর্তি। তার গায়ে শ্যাভেলের কোটটা চাপানো ছিল। সে শীতে কাঁপছিল। ক্যাথারিনের এই অবস্থা দেখে মনে আঘাত পেল এতিয়েন। তবু এই অবস্থায় মধ্যেই ছুটছে ক্যাথারিন।

তাই এতিয়েন ক্যাথারিনকে বলল, তুমি বাড়ি যাও।

কথাটা যেন শুনেও শুনল না ক্যাথারিন। সে থামল না। কিন্তু এতিয়েনের চোখে তার চোখ পড়তেই ক্যাথারিন বুঝল এতিয়েনের চোখে রয়েছে তিরস্কারের ভাষা। কিন্তু এতিয়েন কেন এটা আশা করে যে ক্যাথারিন তার প্রণয়ীকে ছেড়ে চলে যাবে? ক্যাথারিন এটা জানে যে তার প্রণয়ী ভাল লোক নয়। এক এক সময় সে ধরে ধরে মারে তাকে, তবু সে-ই তার জীবনে প্রথম পুরুষ যে তাকে স্পর্শ করে। তার মনে হলো সে এখান থেকে চলে গেলেই ওরা শ্যাভেলকে হত্যা করবে। এক হাজার লোক মাত্র একটা লোকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

এবার মাহিউ বলল, চলে যাও।

ক্যাথারিনের চোখে জল এল। সে যেখানে ছিল সেইখানেই চলে গেল। কিন্তু মাহিউর এই কথার পর সকলেই তাকে সেইখানে একা রেখে চলে গেল।

জনতা এবার জয়সেল রোড ধরে কুনালির দিকে এগিয়ে চলল। এপথেও চারধারে দেখা যায় শুধু দিগন্তজোরা মাঠ। সে মাঠের মাঝে আছে একটা মাত্র কারখানা। আশপাশের খনিশ্রমিকদের যে সব 'একশো আশী,' 'একশো ছিয়াত্তর' এই সব নামে গাঁ রয়েছে সেই সব গাঁয়ের লোকেরা ওদের ধ্বনি শুনে বেরিয়ে এসে যোগদান করল। ছেলে বুড়ো সবাই মিছিলের পিছনে এসে দাঁড়াল। ওদের সঙ্গে এগিয়ে চলল।

কিন্তু তখন বেলা দুটো বাজলেও কুগনির খনি থেকে প্রায় সব লোক চলে গেছে। কারণ খনির ডেপুটিরা মিছিলের খবর পেয়েই আগে থেকে শ্রমিকদের চলে যেতে বলে। ওরা যখন খনিতে পৌঁছল তখন শেষ দল ডুলি থেকে বার হলো। ওরা তখন সেই দলের লোকদের তাড়া করে খানিকটা নিয়ে গেল। ওদের পিছনে পিছনে ছোটায় খনির কোন ক্ষতি হলো না।

এর পর ক্রীভেসোর খনির পথে রওনা হলো। সেখানে গিয়ে দেখল ওদের খবর পেয়ে শ্রমিকরা বেরিয়ে আসছে। ওরা তাদের আক্রমণ করল। তাদের বিদ্রূপ করতে লাগল। তারা পালাতে লাগল। একজন মেয়েকে ধরে মিছিলের মেয়েরা তার গায়ের জামা খুলে দিল। পুরুষরা তাই দেখে হাসাহাসি করতে লাগল। যুগযুগান্তব্যাপী প্রতিহিংসা আর মালিকদের উপর প্রতিশোধবাসনা, শ্রমানুযায়ী বেতনের অভাব আর বর্তমানের তীব্র ক্ষুধা ওদের হিতাহিত জ্ঞানশূন্য ও পাগলের মত করে তুলেছিল। ওরা এই খনির একটা বয়লার-কর্ক ভ দিল।

এর পর সেন্ট টমাস খনিতে যাবার পরিকল্পনা করছিল ওরা। এই খনিটা এতদিন ধর্মঘটের আওতায় পড়েনি। খনিটা যেমন বড়, তেমনি নিয়মশৃংখলা মেনে চলে। সাতশো লোক তাতে কাজ করে। ওরা গিয়ে তাদের ভাল করে কাজ করাবে। কিন্তু হঠাৎ এক গুজব শোনা গেল সেখানে নাকি পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। প্রথমে ওরা কথাটা তাচ্ছিল্যভরে উড়িয়ে দিলেও পরে ভয় পেয়ে গেল। তাই সেন্ট টমাস খনিতে না গিয়ে ওরা কান্তেল খনিতে যাবার ঠিক করল। কান্তেল এখান থেকে তিন কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। ওরা কান্তেল খনি যাবার জন্য ঢালু পাহাড়ী পথটার উৎরাইয়ে উঠতে শুরু করল।

হঠাৎ মিছিলের পিছন থেকে কে বলে উঠল ওখানেও পুলিসবাহিনী আছে। আবার একজন বলে উঠল, লা ভিক্তোরি চল।

একথা কে বলল তাদের মধ্যে তা তারা বুঝতে পারল না। তবু ভয় পেয়ে গেল তারা। একবার ভাবল, থাক পুলিস বা সেনাবাহিনী, তারা তাদের উপরেও ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাহস পেল না।

কিন্তু লা ভিক্তোরিতে কি কোন পুলিসবাহিনী নেই? তা ঠিক জানে না ওরা। তবু ওরা সেই দিকেই যেতে লাগল। লা ভিক্তোরি এখান থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূর। ওরা ক্রমাগত শুধু হেঁটেই চলেছে। কিন্তু ভাল করে দেখেনি ওদের পাগুলো ক্ষত বিক্ষত হয়ে পড়েছে। ওরা উন্মাদনার ঝোঁকে বুঝতে পারেনি কতখানি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ওরা। ওদের মিছিলটা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। ওরা যখন লা ভিক্তোরি খনিতে গিয়ে পৌঁছল তখন ওরা সংখ্যায় হয়ে উঠেছে দু হাজার।

খনি থেকে সব লোক তখন উঠে এসেছে। ওরা তবু তাদের তাড়া করল। এতিয়েন দেখল একটা ঘোড়ার গাড়িতে করে একটা লোক কয়লা ভরছে। এতিয়েন ধমক দিয়ে তাকে বলল, চলে যাও এখান থেকে।

লেভাক গিয়ে ঘোড়াটাকে ছেড়ে দিয়ে গাড়িটাকে উল্টে দিল। গাড়িটাকে ভাঙ্গার চেষ্টা করল।

ক্ষুধার জ্বালা ওদের ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তিটাকে খুঁচিয়ে জাগিয়ে দিয়েছিল। একটুতেই ওরা রেগে যাচ্ছিল। সামান্যতম অজুহাতে ওদের ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তিটা ফেটে পড়ছিল। একমাত্র মুকেত্তে মাঝে মাঝে হাসছিল। ওর পোষাকটা ময়লা হয়ে পড়ায় নিজে নিজেই হাসছিল। রসিকতা করছিল মেয়েদের সঙ্গে।

কিন্তু মারধোর বা ধ্বংসকার্য যতই করুক তাতে কখনো পেটের জ্বালা মেটে না। বরং ওদের ক্ষিদে ক্রমশ বেড়েই যাচ্ছিল। একবার ক্ষিদের তাড়নায় ধ্বনি দিতে লাগল, আমরা রুটি চাই। রুটি চাই।

লা ভিক্তোরি খনির একজন ভূতপূর্ব ডেপুটি একটা ক্যানটিন করেছিল। বিক্ষুব্ধ শ্রমিকদের আসতে দেখে সে দোকান ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। মেয়ে

ও পুরুষ শ্রমিকরা ল্যাম্পরুম থেকে ফিরে এসে একযোগে আক্রমণ করল ক্যানটিনটা। কিন্তু ক্যানটিনে শুধু দু টুকরো রুটি, দু টুকরো মাংস আর কিছু মদ ছাড়া আর কিছু ছিল না। সবসুদ্ধ পঞ্চাশ বোতল মদ পাওয়া গেল।

এতিয়েনের ফ্লাস্কে মদ ফুরিয়ে গিয়েছিল। সে এই সুযোগে ফ্লাস্কটা ভরে নিল। খালি পেটে মদ খেয়ে নেশা হয়ে গেল এতিয়েনের। তার চোখগুলো লাল হয়ে উঠল।

হঠাৎ তার খেয়াল হলো শ্যাভেল তার হাত থেকে পালিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সে সবাইকে খুঁজতে বলল। অল্পক্ষণের মধ্যেই পাওয়া গেল শ্যাভেলকে। সে ক্যাথারিনের সঙ্গে কাঠের গাদার আড়ালে লুকিয়ে ছিল।

এতিয়েন বলল, এই শূয়োর কোথাকার। তুই বলেছিলি সেই জনসভায়, নিজের হাতে তুই গ্যাস্টন মেরির পাম্প নষ্ট করবি। আমরা সেখানেই যাচ্ছি। ঈশ্বরের নামে খৃস্টের নামে সেখানে গিয়ে আমি তোকে নিজের হাতে পাম্প ভাঙতে বাধ্য করব।

মদের নেশায় সত্যিই মাতাল হয়ে উঠেছিল এতিয়েন। সে সকলকে গ্যাস্টন মেরিতে যাবারই নির্দেশ দিল।

ওরা আবার হর্ষধ্বনিসহকারে যাত্রা শুরু কবল। শ্যাভেলের কাঁধটা তখনো ধরে রেখেছিল এতিয়েন। মাঝে মাঝে তাকে ধরে নাড়া দিচ্ছিল। মাহিউ একসময় ক্যাথারিনকে বলল, তুই চলে যা।

কিন্তু এবার ক্যাথারিন তার বাবার আদেশে মোটেই কান দিল না। একটুও টলল না। সে জনতাব সঙ্গে এক মনে এগিয়ে যেতে লাগল। জনতা এবার জয়-সেল রোড ধরে লা পাওলেনের পাশ দিয়ে যেতে লাগল, পথটা সোজা হবে বলে।

লা পাওলেনের কাছে গিয়ে ওরা দেখল গ্রেগরিরা একটু আগে বেরিয়ে গেছে গাড়িতে করে। ওরা দেনুলিনের বাড়ি হয়ে হানিবোদের বাড়ি যাবে ওদের মেয়ে সিসিলকে আনতে। বাড়ির দরজা জানালা সব বন্ধ। বাড়িতে শুধু দু জন ঝি ছাড়া আর কেউ নেই। সমস্ত বাড়িটা যেন ঘুমিয়ে আছে গভীরভাবে। তাব চারদিকে বিরাজ করছে এক অবিচ্ছিন্ন নীরবতা।

বাড়িটার পাশ দিয়ে যাবার সময় ওরা ধ্বনি দিতে লাগল, আমরা রুটি চাই। রুটি চাই।

কিন্তু ওদের এই ধ্বনির উত্তরে দুটো কুকুর জোর শব্দে ঘেউ ঘেউ করে উঠল। জাঁলিন যেতে যেতে মজা কবার জন্য একটা ইট ছুঁড়ে দিল এবং সেটা লেগে একটা জানালার কাচের সার্সিটা ভেঙ্গে গেল। তা দেখে ঘরের ভিতর অনোরি আর মেলানি ভয়ে কাঁপতে লাগল।

অফুরন্ত আরাম, স্বাচ্ছন্দ্য, ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যে ভরা বাড়িটা দেখে এক শান্ত সুখী জীবনযাত্রার প্রতি লোভ ও লালসা জাগছিল ওদের মনে। সঙ্গে সঙ্গে প্রবল হয়ে উঠছিল এক প্রতিহিংসা।

ওরা যখন গ্যাস্টন মেরি পৌঁছল তখন ওদের সংখ্যা দু হাজারের উপর দাঁড়িয়েছে। ওরা সদলবলে অপ্রতিহত গতিতে ঢুকে পড়ল খনিতে। একটু আগে একদল পুলিসবাহিনী আসছিল এখানে। কিন্তু সে বাহিনী এক চাষীর ভুল নির্দেশে সেণ্ট টমাস খনিতে চলে যায়। এখানে নিরাপত্তার ব্যবস্থা হিসাবে কোন পুলিসদল না দেখে চলে যায় তারা সেখানে।

ওরা গিয়ে বয়লারের আগুন নিবিয়ে দিল। অফিস তছনছ করল। কিন্তু কোন কিছুতেই ওদের আশা মিটল না। ওদের একমাত্র লক্ষ্য পাম্প। পাম্প যেন খনিটার মূল প্রাণবস্তু। খনিটা যেন ওদের কাছে এক জীবন্ত প্রাণী যার জীবন নেবার এক অদম্য জিঘাংসায় মেতে উঠেছে ওরা।

এতিয়েন এবার শ্যাভেলের হাতে একটা হাতুরী দিয়ে বলল, তুমিই প্রথমে ঘা দাও পাম্পের উপর।

শ্যাভেল চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু সে জন্য অপেক্ষা না করে জনতার অনেকেই হাতের কাছে যা পেল তাই দিয়ে আঘাত করতে লাগল পাম্পটাকে। তাব কর্কগুলো সব খুলে দিল। লোহার সিলিণ্ডারটার উপর একটা গাঁইতি দিয়ে ওরা এমনভাবে ঘা দিয়ে সেটা ভেঙ্গে দিল যে একটা জোর শব্দ হলো। বোঝা গেল, এক অবারিত উচ্ছ্বসিত জলধারা এক সর্বগ্রাসী মত্ততায় প্লাবিত করতে ছুটল সমগ্র খনিগর্ভটাকে।

এবার সকলে শ্যাভেলের উপর নজর দিল। একবাক্যে বলতে লাগল, বিশ্বাসঘাতকের মৃত্যু চাই।

শ্যাভেল আমতা আমতা করে আবার তার গা ধোবার কথা বলল। পাম্পের কাছে একটা খালে জল জমেছিল। জলটার উপর বরফ ভাসছিল।

মা ব্রুল বলল, ওখানে অনেক জল আছে, তুমি ভাল করে গা ধোও। শ্যাভেলকে সকলে মিলে জলে ঠেলে ফেলে দিল। মা ব্রুল বলতে লাগল, দাও, খুব ডুব দাও। নাও নাও, জল খাও, খুব করে জল খাও।

সত্যিই ঠাণ্ডা বরফের মত জলটা অনেকখানি খেতে বাধ্য হলো শ্যাভেল। যতবারই সে ওঠার চেষ্টা করতে লাগল, যতবারই সে জল থেকে কোনরকমে মাথাটা তুলে পারের মাটিটা ধরল ততবারই কখনো এতিয়েন, কখনো মাহিউ বা তার স্ত্রী আবার জলে ঠেলে ফেলে দিতে লাগল তাকে। ওরা যেন ঐ জলেই ওকে ডুবিয়ে মারতে চায়। মাহিউ ও তার স্ত্রী শ্যাভেলের উপর তাদের পুরনো ক্ষোভটা মেটাতে লাগল। এই শ্যাভেলই তাদের মেয়েকে অকালে কেড়ে নেয় তাদের কাছ থেকে।

এমন কি যে মুকেত্তের মনে দয়া মায়া খুব বেশী, সেই মুকেত্তেও একবার শ্যাভেলের কাছে এসে তার জার্সিটা তুলে বলল, দেখি দেখি তুই মেয়ে না পুরুষ।

সহসা এতিয়েন এসে তাকে সরিয়ে দিয়ে বলল, আমিই সেটা দেখব।

শ্যাভেলকে জল থেকে তুলে এতিয়েন বলল, ওর হাতে একটা ছুরি দাও, আমার ছুরি আছে। আজ হয় ও থাকবে না হয় আমি থাকব।

এদিকে শ্যাভেল তখন ঠাণ্ডা জল খেয়ে ভিজে কাপড়ে কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়েছিল। তার উত্থানশক্তি ছিল না। এতিয়েনের মাথায় সত্যিই যেন সহসা খুন চেপে গেল। সে যেন রক্ত চায়।

হঠাৎ ব্যাপারটা বুঝতে পেরে ক্যাথারিন এগিয়ে এসে এতিয়েনের কান দুটো জোরে মলে দিয়ে গালে একটা চড় মেরে বলল, কাপুরুষ কোথাকার! বীরত্ব হচ্ছে? এত গালাগালি করেও হলো না? ওকে তুমি খুন করতে চাও। অথচ ও উঠে দাঁড়াতে পারছে না সোজা হয়ে। তোমরা সকলেই কাপুরুষ।

ক্যাথারিনের ঠিক সময়েই মনে পড়েছিল কথাটা। কথাটা তার প্রথম আলাপের দিন ক্যাথারিনকে বলেছিল সে। সে বলেছিল মদ খেলে তার মাথার ঠিক থাকে না। তার মাথায় যেন খুন চাপে, দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে। এই নেশাটা সে তার স্কটদেশীয় বাবা মার কাছ থেকে পেয়েছে।

শ্যাভেলের সামনে একা দাঁড়িয়ে ক্যাথারিন তার বাবা মার মুখের সামনে দাঁড়িয়ে বলতে লাগল, তোমরা সবাই কাপুরুষ। তোমরা ওর সঙ্গে আমাকেও কেন হত্যা করছ না? খবরদার, তোমরা কেউ ওর গায়ে হাত দেবে না। তাহলে আমিও তোমাদের মুখে চড় দেব।

অথচ ক্যাথারিন ভুলে গেল এই শ্যাভেল কত দুর্ব্যবহার করেছে তার সঙ্গে, তাকে কত মেরেছে। সে শুধু ভাবতে লাগল শ্যাভেল একান্তভাবে তারই লোক, সে তাকে প্রথম গ্রহণ করেছে তার নারী জীবনের প্রথম পুরুষ হিসাবে এবং তার অপমানে সবচেয়ে তারই বেশী লজ্জা।

সকলের সামনে ক্যাথারিন তাকে চড় মারলে লজ্জায় মুখখানা সাদা হয়ে ওঠে এতিয়েনের। প্রথমে সেও ক্যাথারিনকে মারতে যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ তার কি মনে হলো সে মাতাল লোকের মত নিজের গালেই একটা চড় বসিয়ে দিয়ে শ্যাভেলকে বলল, ক্যাথারিন ঠিক কথাই বলেছে, তুমি যাও। যা হবার হয়ে গেছে।

মুহূর্তমধ্যে ক্যাথারিনকে সঙ্গে করে চলে গেল শ্যাভেল। জনতা অবাক বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সেইদিকে তাকিয়ে। মাহিউর স্ত্রী বলল, ওকে ছাড়া উচিত হয়নি তোমার। ওকে রেখে দেওয়া উচিত ছিল। ও আমাদের এখন ক্ষতি করতে পারে।

যাই হোক, জনতা আবার যাত্রা শুরু করল। তখন বেলা পাঁচটা বাজে। পশ্চিম দিগন্তে এক চাপ দগ্ধ বয়লার রক্তলাল অঙ্গারের মত সূর্য অস্ত যাচ্ছিল। সেই আলোয় সমস্ত ফাঁকা মাঠটা আলোকিত হয়ে উঠেছিল। পথে এক ফেরিওয়ালা তাদের বলল, ক্রেভিসোর থেকে একদল সেনাবাহিনী আসছে। তখন ওরা বললে, মঁতসু চল। ম্যানেজারের বাড়ি চল। আমরা রুটি চাই।

৫

মঁসিয়ে হানিবো তখন বাড়িতে একাই ছিলো। এইমাত্র তাদের গাড়িটা মাদাম হানিবো আর নিগ্রেলকে নিয়ে মার্সিয়েনের পথে রওনা হয়েছে। তাই সে তার অফিস ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে সেই চলন্ত গাড়িটার পিছনে তাকিয়েছিল। বাড়িতে চাকর হিপ্পোলিতে ছাড়া আর কেউ ছিল না। কোচম্যান গাড়ি নিয়ে গেছে। নতুন ঝি রোজ কাজ সেরে চলে গেছে। সে পাঁচটার পর আসবে। হানিবো ভাবল, বাড়িতে কেউ না থাকায় একা একা বসে সে অনেক কাজ করতে পারবে।

হানিবো হুকুম দিয়েছিল চাকরকে, কাউকে যেন ঢুকতে দেওয়া না হয়। তবু ডানসার্তকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল সে। ডানসার্ত বলছিল, নতুন খবর আছে।

ডানসার্ত এসেই হানিবোকে খবর দিল, গতকাল ভঁাদেমের বনে ধর্মঘটী শ্রমিকদের এক বিরাট জনসভা হয়ে গেছে।

হানিবো বলল, আমি তার কথা আগেই জেনে গেছি।

ডানসার্ত লজ্জা পেল। হানিবো তাকে বলল তার নামে একটা বদনাম শোনা যাচ্ছে। তার ভালভাবে বাস করা উচিত। তার নামে কোন কলঙ্ক রটতে দেওয়া উচিত নয়।

ডানসার্ত বলল, মোটামুটি অবস্থা শান্ত।

এদিকে হানিবো পুলিসের কর্তার কাছে পুলিসের সাহায্য চেয়ে একটা টেলিগ্রাম করতে যাচ্ছিল। তারপর শেষ মুহূর্তে কি ভেবে আর করল না। সে কোম্পানির মালিকদের কাছে একটা পরামর্শ চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছে। লিখেছে হঠাৎ কোন গোলমাল দেখা দিলে সে কি করবে। কিন্তু এখনো কোন উত্তর আসেনি। তবে হানিবোর মনে হয় আজই তার উত্তর এসে যাবে।

হানিবো মালিকদের কাছে এমনিতেই বড় লজ্জায় আছে। সে প্রথমে জানিয়েছিল ধর্মঘট এক পক্ষকালের বেশী স্থায়ী হবে না। কিন্তু আজ সে ধর্মঘট দু মাস হয়ে গেল। তাছাড়া বর্তমানে শান্ত হলেও তার আশঙ্কা যে কোন মুহূর্তে গোলমাল দেখা দিতে পারে। তবে তার ধারণা তার আগে সামরিক সাহায্য চাওয়ার সময় পাবে সে। এ সাহায্য অকারণে নিতে চায় না সে। কারণ সেনাবাহিনী ডাকা মানেই শ্রমিকদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম, রক্তারক্তি এবং তাতে মৃত্যুও ঘটতে পারে।

বেলা এগারোটা পর্যন্ত হানিবো কাজ করে গেল শান্তিতে। তারপর দুটো জরুরী চিঠি পেল। দুটো চিঠিই পর পর এল। একটাতে ছিল ধর্মঘটী শ্রমিকদের দ্বারা জাঁ বার্ত খনি আক্রমণ আর একটাতে ছিল কিভাবে জাঁ বার্ত খনির ধ্বংসসাধন করা হয়েছে তার পূর্ণ বিবরণ। ডুলির তার কেটে বয়লারের আগুন নিবিয়ে সমস্ত অফিস তছনছ করে খনিটাকে বিধ্বস্ত করে গেছে ওরা।

এমন অবস্থায় কি করা উচিত তা ভেবে পেল না হানিবো। সে একা একাই বিরাট শূন্য খাবার ঘরে বসে লাঞ্চ খেল। সমস্ত বাড়িটার জনহীন নীরবতা তার মনের আশঙ্কাটা বাড়িয়ে দিচ্ছিল।

খাওয়ার পর অফিস ঘরে এসে হানিবো একবার ভাবল এখনি সামরিক সাহায্য চেয়ে পাঠাবে। আবার ভাবল মালিকদের জানিয়ে তাদের মতামত আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। হঠাৎ তার মনে হলো গতকাল রাত্রিতে সে নিগ্রেলকে একটা চিঠি লিখতে বলেছিল পুলিসের বড়কর্তাকে। সে ভাবল সেই চিঠিটা একবার দেখে নিয়ে পাঠিয়ে দেবে কিন্তু চিঠিটা অফিসে নেই। সে তখন ভাবল চিঠিটা নিশ্চয় নিগ্রেলের শোবার ঘরে উপরতলায় আছে। সে অনেক চিঠিপত্র রাত্রিবেলায় শোবার সময় লিখে রাখে।

এই ভেবে হানিবো অফিস ঘর থেকে সোজা দোতলায় নিগ্রেলের ঘরে চলে গেল। কিন্তু ঘরে ঢুকেই দেখল নিগ্রেলের বিছানাটা এলোমেলো হয়ে রয়েছে। ঘরটাও নোংরা হয়ে রয়েছে। মোট কথা ঘরটা পরিষ্কার করে বিছানাটা ঝাড়া হয়নি।

হঠাৎ হানিবো দেখল নিগ্রেলের বিছানার মাঝখানে একটা ছোট্ট চকচকে শিশি পড়ে রয়েছে। সে সেটা হাতে তুলে নিয়ে দেখল শিশিটা তার স্ত্রী মাদাম হানিবোর। তাতে দামী সেন্ট আছে। মাদাম হানিবো সেটা প্রায়ই হাতে নিয়ে শোঁকে।

কিন্তু এ শিশি এখানে এল কেন? হঠাৎ সেই পুরনো সন্দেহটা দানা বেঁধে উঠল হানিবোর মনে। তার মনে হলো তার স্ত্রী নিশ্চয় এই বিছানায় নিগ্রেলের সঙ্গে রাত কাটিয়েছিল। শুধু আজ নয়, এইভাবে দিনের পর দিন সে এইখানে রাত কাটিয়ে আসছে। প্রতিটি রাতে সে তার ঘরের সামনে দিয়ে খালি পায়ে নিঃশব্দে চলে আসে নিগ্রেলের ঘরে। অনেকদিন আগে একদিন দুপুর রাতে তার মনে হয়েছিল তার ঘরের সামনে দিয়ে কে যেন নিঃশব্দ পদসঞ্চারে হেঁটে যাচ্ছে নিগ্রেলের ঘরের দিকে। কিন্তু সে তার এই ধারণাটাকে তেমন আমল দেয়নি সেদিন। উড়িয়ে দিয়েছিল অলসভাবে।

কিন্তু সেদিনকার সেই অলস ধারণাটাই এক সন্দেহহীন সত্যে পরিণত হলো।

এমন সময় হিপ্পোলিতে এসে বলল, মাপ করবেন স্যার। রোজ ঘরটা পরিষ্কার না করেই চলে গেছে আমার উপর ভার দিয়ে।

হানিবো বিরক্ত হয়ে বলল, কি চাও এখন?

হিপ্পোলিতে বলল, ক্রীভেসোর থেকে চিঠি নিয়ে একটা লোক এসেছে।

হানিবো বলল, ঠিক আছে, তাকে অপেক্ষা করতে বল। আমি যাচ্ছি।

হিপ্পোলিতে চলে গেলে ঘরের দরজাটায় খিল দিয়ে ভাবতে লাগল হানিবো।

হঠাৎ তার বন্ধ ঘরের দরজার উপর ঘা দিতে লাগল, হিপ্পোলিতে। হিপ্পোলিতে চিৎকার করে বলছে, ঘর খুলুন স্যার। ওরা সব কিছু ভেঙ্গে দিচ্ছে।

নিচে অনেক লোক এসেছে। অনেক টেলিগ্রাম এসেছে।

মঁসিয়ে হানিবো বলল, তুমি যাও, আমি এক মিনিটের মধ্যেই যাচ্ছি।

আজ সকালে যদি হিপ্পোলিতে বিছানাটা পরিষ্কার করত তাহলে সে মাদামের এই শিশিটা নিগ্রেলের এই বিছানায় দেখতে পেত একথা ভাবতেই হানিবোর গায়ের রক্ত ভয়ে হিম হয়ে গেল। ও নিশ্চয় এ ব্যাপারে সব কিছু জানে। ও হয়ত এর আগে দিনের পর দিন সকালবেলায় বিছানা পরিষ্কার করতে এসে বিছানায় শুধু শিশিটাই পায়নি, ব্যভিচারে উত্তপ্ত সে বিছানার চাদরে নিশ্চয় কোন নোংরা দাগও দেখেছে। তাছাড়া এমনও হতে পারে ও গভীর রাতে এই ঘরের বাইরে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ওদের অবৈধ প্রেমের সব কথা শুনেছে।

তবু নিচে নেমে গেল না হানিবো। সে বিছানার চাদরটার পানে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে কি দেখতে লাগল আর ভাবতে লাগল। বিছানার এই নোংরা চাদরটার মধ্যে যেন ওদের অসুখী অভিশপ্ত বিবাহিত জীবনের এক কলঙ্কিত ইতিহাস অদৃশ্য অক্ষরে লেখা আছে। একে একে সব কথা মনে পড়ল মঁসিয়ে হানিবোর—ওদের বিয়ে, বিয়ের পরেই ওদের মনের অমিল, তারপর ওর স্ত্রীর একের পর এক প্রেমিক গ্রহণ, অবশেষে তার বাসায় ভাইপো নিগ্রেলের আগমন। অথচ প্রথম প্রথম তার স্ত্রী এই নিগ্রেলকে ছেলের মত দেখত, মার মত স্নেহ করত। পরে ধীরে ধীরে তার পুরনো প্রেমের কথা বলত। এই অভিশপ্ত ব্যভিচারিণী নারীকে সে এতদিন পাবার জন্য নিবিড়ভাবে কামনা করে এসেছে, পূজো করে এসেছে। এই নারী যদি একবার তার অপর সব প্রেমিকের দ্বারা ভুক্ত দেহমাংসের সামান্য অবশিষ্টাংশটুকুও তাকে দিত তাহলে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করতে পারত তার কাছে। অথচ সেই ভুক্তাবশিষ্ট আজ সে তারই ভাইপো নিগ্রেলকে দান করছে। সে ভেবেছিল উত্তীর্ণযৌবনা মাদাম হানিবোর মতিগতির পরিবর্তন হয়েছে এবং স্তিমিত হয়ে এসেছে তার দুর্বার প্রেমাবেগের স্রোত। কিন্তু দেখা গেল কোন পরিবর্তন হয়নি।

দূরে কোথায় ঘণ্টা বেজে উঠল। হানিবো বুঝতে পারল, পিওন এসেছে। পিওন এলে এইভাবে ঘণ্টা বাজিয়ে তাকে জানাবার আদেশ দিয়েছিল।

মঁসিয়ে হানিবো আবার ভাবতে লাগল। ভাবতে ভাবতে রাগে গরম হয়ে উঠেছিল তার মাথাটা। নারী নয়, যেন এক পথকুক্কুরী যার আত্মমর্যাদা বলে কোন জিনিস নেই। হানিবোর ইচ্ছা হতে লাগল সে যেন তার স্ত্রীর মুখের সামনে অসভ্য অশ্লীল ভাষায় গালাগালি দেয়। তার মনে হলো গাছ থেকে সবুজ কাঁচা ফল পেড়ে তাতে কামড় দেওয়ার মত তার স্ত্রী মাদাম হানিবো তার থেকে বয়সে অনেক কম তার ভাইপোর কৌমার্যের গায়ে এক জারজ কামনার কামড় বসিয়ে দেয়। সেই ভাইপোর বিয়ে হয়ে গেলে—যে বিয়ের জন্য সব ঈর্ষা চেপে রেখে নিজেই চেষ্টা করছে মাদাম হানিবো—আবার কাকে দিয়ে তার

দুর্বার কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করবে সে ?

রুদ্ধ দরজার উপর আবার ভয়ে ভয়ে টোকা দিচ্ছে হিপ্পোলিতে। সে বলল, স্যার, ডাক এসেছে···মঁসিয়ে ডানসার্ত এসে অপেক্ষা করছেন। বলছেন, কোথায় নাকি খুন হয়েছে।

মঁসিয়ে হানিবো ঘরের দরজা না খুলেই বলল, আমি যাচ্ছি। মরণ তোমার।

হানিবো ভাবল সে গিয়ে এখন কি করবে ? ধর্মঘটী শ্রমিকরা যদি আসে তার বাড়িতে তাহলে তাদের আজ বাড়িতে ঢুকতে দেবে না। বাইরে থেকেই তাড়িয়ে দেবে।

হানিবো আবাব ভাবতে লাগল, ওদের দুজনের ফেলা দ্রুত তপ্ত শ্বাস-প্রশ্বাসের ভারে বদ্ধঘরের আবহাওয়াটা এখনো ভারী হয়ে রয়েছে। বিছানায় ও তার আশেপাশের অগোছালো ইতস্ততঃ ছড়িয়ে থাকা জিনিসপত্রের মধ্যে তাদের ব্যভিচারের চিহ্ন স্পষ্ট ফুটে রয়েছে। হঠাৎ কি মনে হলো বিছানাটায় গিয়ে গড়িয়ে শুয়ে পড়ল হানিবো। কোথায় কি দাগ আছে তা খুঁটিয়ে দেখতে লাগল সে। তার মনে হলো এই বিছানার প্রতিটি তোষক চাদর প্রভৃতি প্রতিটি উপাদান যেন সারারাত্রিব্যাপী ওদের অবৈধ উন্মত্ত রতিক্রীডার ক্রমাগত আঘাতে ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়েছে।

হিপ্পোলিতে আবার এসেছে দরজার কাছে। আবার ডাকছে তাকে। এবার নিজের ব্যবহারে নিজেই লজ্জা পেল মঁসিয়ে হানিবো। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে ভাল করে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে অবাক হয়ে গেল সে। সে যেন নিজেকে নিজে চিনতে পারছে না। যাই হোক, ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল সে এবং অনেক চেষ্টা করে দরজা খুলে বাইরে এল।

হানিবো নিচেরতলায় তার অফিসঘরে এসে দেখল ডানসার্ত ছাডা পাঁচজন পত্রবাহক দাঁড়িয়ে আছে উত্তরের আশায়। তারা যে চিঠি এনেছে, সে চিঠির উত্তর নিয়ে যাবে। বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা উন্মত্তের মত বিভিন্ন খনিতে গিয়ে গিয়ে যে সব ধ্বংসকার্য চালায় এই সব চিঠিতে আছে তারই বিবরণ। একটি চিঠিতে লেখা আছে, মিরৌ খনিতে ডেপুটি বুডো কাঁদিউ কিভাবে আপন দৃঢ়তা ও সাহসিকতার জোরে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকদের হাত থেকে খনিটাকে রক্ষা করে। কথাটা পড়ে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ল।

পত্রবাহকদের ছেড়ে দিল হানিবো। এবার চিঠিগুলোর মধ্যে মালিকদের চিঠিটা সবচেয়ে আগে পড়তে হবে। কারণ ও মালিকদের পরামর্শ চেয়ে যে চিঠি লিখেছিল এর মধ্যে নিশ্চয় তার উত্তর আছে। হানিবো পড়ে দেখল, মালিকরা জানিয়েছে, ছোটখাটো কোন হাঙ্গামা না হলে তারা কোন দমনমূলক নীতি গ্রহণ করতে পারবে না শ্রমিকদের উপর আর তা না হলে ধর্মঘটও মিটবে না। শ্রমিকদের উপর পীড়নমূলক চাপ না পড়লে তারা মেটাতে চাইবে না।

অবস্থা সেরকম বুঝলে তারা পুলিস বা সেনাবাহিনী ডাকতে পারে।

মঁসিয়ে হানিবো এটাই চেয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে সে লিলের প্রিফেক্টের কাছে, মার্সিয়েনের পুলিস অফিসে আর সেনাবাহিনীর হেডকোয়ার্টারে সাহায্য চেয়ে চিঠি পাঠিয়ে দিল। তার কাছে যে সব চিঠিপত্র এসেছে তাতে পুলিস ও সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধেও অনেক অভিযোগ পেল। তারা যথাসময়ে খবর পেয়েও যে খনিতে গোলমালের আশঙ্কা সেখানে না গিয়ে অন্য খনিতে যায় এবং কোন খনি একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে যাবার পর সেখানে যায়।

সমস্ত বাড়িটা একেবারে নিস্তব্ধ। একমাত্র রান্নাঘরে রাঁধুনির রান্না করার শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দই শোনা যায় না। হানিবো কাগজগুলোর মাঝখানে হাতের কনুইএর উপর মুখটা ধরে বসে রইল চুপচাপ। হঠাৎ দূরাগত এক জোর শব্দ শুনে চমকে উঠল। টেবিল থেকে উঠে সে জানালার ধারে যেতেই শব্দটা স্পষ্ট কানে এল, আমবা রুটি চাই, রুটি চাই।

তখন বেলা পাঁচটা বাজে। বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা মঁতসু খনি আক্রমণ করার জন্য মঁতসু ঢোকাব সঙ্গে সঙ্গে এক পুলিসবাহিনী সেদিকে এগিয়ে যাচ্ছিল।

এই ঘটনার কিছু আগেই মাদাম হানিবোদের ঘোড়ার গাড়িটা শ্রমিকদের মিছিলের কাছাকাছি এসে পড়ে। গাড়িটা তখন মঁতসু থেকে দু কিলোমিটার দূরে ভাঁদেম বোডের ক্রসিংটা পার হয়ে আসছিল মঁতসু রোড ধরে।

মাদাম হানিবোরা আজ দিনটা ভালভাবেই কাটিয়েছে। ওরা গিয়েছিল ফোর্জের ম্যানেজারের বাড়িতে লাঞ্চ খেতে। সেখান থেকে লাঞ্চ খাওয়ার পর একটা কাচের কারখানা ঘুরে বেড়িয়ে দেখে। সব কিছু দেখাশোনার পব ওরা যখন পথে আসছিল, যখন শীতের মিষ্টিরোদে ভরা দিনটা শেষ হয়ে আসছিল সেই সময় সিসিল এক কাপ দুধ খেতে চাইল কোন চাষীর ঘরে।

পথের ধারে একটা ঘর দেখতে পেয়েই ওবা গাড়িটা দাঁড় করায়। নিগ্রেল আগে আগে ঘোড়ায় চেপে যাচ্ছিল। সেও নামল। ওদের দেখে চাষীর স্ত্রী অত্যন্ত কৃতার্থ হয়ে তাদের দুধ খাওয়াল এক কাপ করে। কিন্তু লুসি আর জিয়ান কিভাবে গাই দোয়ানো হয় তা দেখতে চাইল। তখন চাষীব স্ত্রী গোয়ালের চালাঘরে ওদের নিয়ে গেল। এমন সময় মাদাম হানিবো গাড়িতে বসে থাকতে থাকতে মিছিলের ধ্বনি শুনতে পেল।

নিগ্রেল বলল, শয়তান কোথাকার। ওবা কি কোন গোলমাল বাঁধাতে চায়?

চাষীর স্ত্রী বলল, সেই খনিশ্রমিকরা, যারা সকালে এই পথ দিয়েই গিয়েছিল। ওদের ভাবগতিক দেখে এমন কিছু ভাল মনে হচ্ছে না।

মাদাম হানিবোও গাড়ি থেকে নেমে এসে গরুর চালাটায় দাঁড়াল। সেখান থেকে ওরা ঘাড় উঁচু করে দূরে তাকিয়ে দেখল একটা বিরাট মিছিল ভাঁদেম রোড থেকে এগিয়ে আসছে। তাতে রয়েছে অসংখ্য মানুষ।

চাষীর স্ত্রী বলল, এসময় গাড়িতে চেপে গেলে ওদের সামনে পড়তে হবে। আপনারা চালার ধারে ঐ ঘরটার মধ্যে একটু অপেক্ষা করুন। ওরা চলে যাক। তারপর যাবেন।

নিগ্রেল ঠাট্টা করে বলল, সাহস অবলম্বন করো। দরকার হলে আমরা আমাদের জীবন দিয়ে দেব।

কিন্তু ওরা যতই কাছে আসতে লাগল ধূলোর মেঘ উড়িয়ে, যতই ওদের বজ্রগর্জনসুলভ ধ্বনি জোর হয়ে উঠতে লাগল ততই ভয়ে কাঁপতে লাগল ওরা। ঘোড়াটা বাইরে রেখে নিগ্রেলও ওদের সঙ্গে ঘরের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল। ওদের সামনে এমনভাবে দাঁড়াল যাতে মনে হবে ও ওদের রক্ষা করতে এসেছে। কাঠের পাটাতনের দেওয়ালের ফাঁক দিয়ে ওরা দেখল ময়লা ছেঁড়া জামাকাপড় পরা অসংখ্য মেয়েপুরুষ মুষ্টিবদ্ধ হাত উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করে বলছে, আমরা রুটি চাই। ছেঁড়াখোড়া পোষাকের মধ্য দিয়ে ওদের দেহের অনাবৃত অংশগুলো দেখা যাচ্ছিল।

মিছিলটা সত্যিই পথ দিয়ে সোজা চলে গেল। সবশেষে মুকেত্তে বুর্জোয়াদের উদ্দেশ্যে তার পোষাকের আঁচল তুলে তার গোপনাঙ্গটা দেখিয়ে গেল। এইভাবে ও কারো প্রতি ওর ঘৃণা প্রকাশ করে।

মাদাম হানিবো বলল, স্মেলিং সল্টের শিশিটা বার করো, ওদের ঘামের গন্ধ পাচ্ছি আমি।

সত্যিই হেঁটে হেঁটে ওদের পা ফুলে গেছে। ঘামে ওদের ছেঁড়া পোষাকগুলো গায়ে চিটিয়ে লেগে গেছে। ওদের মুখে এক ধ্বনি, আমরা রুটি চাই। আমরা রুটি চাই।

মিছিলটা একেবারে চলে গেলে ওরা বেরিয়ে এল। তখনো ওদের বুকটা কাঁপছিল। ওরা বেশ বুঝতে পারছিল মিছিলের বুভুক্ষু লোকগুলোর সামনে পড়লে ওদের জীবন্ত ছিঁড়ে খেত।

মাদাম হানিবো বলল, কী ভয়ঙ্কর মুখগুলো!

নিগ্রেল বলল, যেন এক একটা আস্ত শয়তান। কি মুস্কিল, আমি ওদের একটা মুখকেও চিনতে পারলাম না।

কথাটা সত্যি। সুদীর্ঘ দিনের পুঞ্জীভূত বঞ্চনা বুভুক্ষা, শ্রম আর সংগ্রাম মঁতস্যুর খনিশ্রমিকগুলোকে এক একটা বন্য পশুতে পরিণত করে তুলেছে। ওরা যে পথ দিয়ে হেঁটে চলেছিল সেই পথের উপর অস্তগতপ্রায় সূর্যের লাল আলো পড়ায় পথটাকে প্রবহমান এক রক্তের নদী বলে মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল ওরা যেন সেই রক্তের নদীতে স্নান করতে করতে চলেছে।

ওরা সবাই এক প্রবহমান নদীর মত মঁতস্যুর মধ্যে দিয়ে চলে গেল। তারপর ঘোড়ার গাড়িটাকে খামারবাড়ি থেকে টেনে এনে রাস্তার উপর রাখা হলো। কিন্তু গাড়োয়ান বলল, আমি এখন এই সব মহিলাদের নিয়ে যেতে

পারব না। ওরা চলে যাক। একটু দেরি করতেই হবে, কারণ এ ছাড়া আর কোন পথ নেই।

মাদাম হানিবো বলল, কিন্তু আমাদের যে এখনি যেতেই হবে। রাতের খাবার আমাদের সব তৈরি হয়ে গেছে।

মেয়েরা সবাই গাড়ির ভিতর গিয়ে আপন আপন জায়গায় বসল। নিগ্রেল তার ঘোড়ায় চেপে বলল, রেকিলার্তের দিকে গাড়ি চালিয়ে চল। ওদের মিছিল যদি বাধা দেয় তাহলে গাড়িটা ঐখানে থামাবে। আমরা নেমে বাগানবাড়ি দিয়ে অর্থাৎ পিছনের দরজা দিয়ে বাড়ি ঢুকব। রাস্তাটা খারাপ, বড় উঁচু নিচু; সাবধানে গাড়ি চালাবে।

ওদের গাড়িটা যখন ছাড়া হলো তখন মিছিলের জনতা মঁতসু গাঁয়ের মধ্যে ঢুকে গেছে। গাঁয়ে ঢুকে কিন্তু ভয় পেয়ে গেল ওরা। গাঁয়ে গিয়ে ওরা শুনল একটু আগে পুলিস ও সেনাবাহিনী গাঁয়ের রাস্তা দিয়ে চলে গেছে। হয়ত মঁতসু খনিতে পাহারা দিতে গেছে।

গ্রেগরিরা হানিবোদের বাড়িতে নৈশভোজন করতে যাবার আগে একটু অপেক্ষা করতে লাগলেন। ওরা ভাবলেন, এতক্ষণে সিসিলরা হয়ত ফিরেছে। কিন্তু মঁতসু গাঁয়ের থমথমে অবস্থাটা দেখে ওদের খুব একটা ভাল লাগল না। পথে পথে গাঁয়ের মানুষগুলো ছোটাছুটি করছে ইতস্ততঃ। মাইগ্রাত তার দোকানের সামনে ব্যারিকেড দিয়েছে, যাতে হঠাৎ কোন অবাঞ্ছিত লোক দোকানে ঢুকতে না পারে।

ততক্ষণে জনতা ম্যানেজার মঁসিয়ে হানিবোর বাড়ির সামনে এসে চিৎকার করতে শুরু করেছে, আমরা রুটি চাই। রুটি চাই।

ওদের ধ্বনি দূর থেকে শুনেই মঁসিয়ে হানিবো তার একতলার অফিসঘরে জানালার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। পরে মিছিলের বিক্ষোভকারী জনতা কাছে এলে হিপ্পোলিতে এসে ঘরের সব জানালা বন্ধ করে দিল।

ও গোটা একতলার সব দরজা জানালাগুলোই নিরাপত্তার ব্যবস্থা হিসাবে বন্ধ করে দিল। কিন্তু হানিবো বিক্ষোভকারীদের দেখতে চায় বলে সোজা বাড়ির দোতলায় উঠে গেল। ও নিগ্রেলের ঘরের ভিতর থেকে ভাল দেখা যাবে বলে সেই ঘরেই ঢুকল।

ঘরখানা একেবারে নিঝুম নিস্তব্ধ। ঘরখানার এই নির্জন নীরবতার শান্ত অবকাশে হানিবোর বিক্ষুব্ধ আবেগ ও অনুভূতিগুলোও শান্ত হয়ে উঠল ধীরে ধীরে। একটু আগে ঘরখানা ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে দিয়ে গেছে হিপ্পোলিতে। বিছানার চাদর পাল্টে দিয়ে নতুন করে বিছানা পেতে দিয়ে গেছে। সমস্ত ময়লা আবর্জনা দূর হয়ে যাওয়ায় এই পরিচ্ছন্ন ঘরখানার মতই তার মনটাও যেন পরিষ্কার হয়ে পরিচ্ছন্ন হয়ে গেছে। মেঘমুক্ত আকাশের মত তার অশান্ত ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠেছে শান্ত স্বচ্ছ ও আপন স্বরূপে সুস্থিত। তার

স্ত্রীর দুর্নীতি বা ব্যভিচার নিয়ে এত ভাবনা চিন্তা করে কি লাভ? এতক্ষণে নিজের ভুল বুঝতে পারল হানিবো। এর আগেও ত মাদাম হানিবোর দুজন প্রেমিক ছিল। একজনের কথা সে জানত না এবং আর একজনের কথা সে জানত। সে জেনে শুনে তার স্ত্রীর সেই অবৈধ প্রেমিককে দশ বছর ধরে সহ্য করে আসে। সেই প্রেমিকের সঙ্গে তার স্ত্রীর দেহসংসর্গ ঘটত। সে ব্যাপারটা যদি সহ্য করে থাকে তবে আজকের এই ব্যাপারটাই বা কেন সহ্য করবে না? অতীতে অন্য সব প্রেমিকদের মত পল নিগ্রেলও তার স্ত্রীর আর এক প্রেমিক এ কথাটা সহজভাবে ভাবলেই ত সমস্যাটা মিটে যায়। আসল কথা, তার স্ত্রীর সঙ্গে তার দেহ-মনের কোন মিল হয়নি। তার স্ত্রী দুর্নীতিপরায়ণ ব্যভিচারিণী জেনেও সে তাকে কামনা করে এসেছে, তার সঙ্গলাভের জন্য লালায়িত হয়ে এসেছে—তার এই অতৃপ্ত কামনাই সকল দুঃখের সকল ঈর্ষার কারণ। সহসা নিজের সব ভুল বুঝতে পারল হানিবো। দার্শনিকসুলভ এক নিস্পৃহ ঔদাসিন্য মনটাকে আচ্ছন্ন করে তুলল তার। তার এতদিনের অতৃপ্ত কামনার নিরবচ্ছিন্ন বেদনার অসারতাটা সে বেশ বুঝতে পারল।

এমন সময় নিচেরতলার জানালার ধারে বিক্ষুব্ধ জনতা চিৎকার করে উঠল সমবেত কণ্ঠে, আমরা রুটি চাই। রুটি চাই।

আপন মনে বলে উঠল মঁসিয়ে হানিবো, অপদার্থের দল।

ওরা মঁসিয়ে হানিবোর নামে গালাগালি করতে লাগল, কারণ হানিবো মোটা মাইনে পায়, কারণ শ্রমিকরা যখন ক্ষুধায় মরছে সে তখন প্রচুর আরাম উপভোগের মধ্যে দিন যাপন করছে।

ধর্মঘটী মেয়েশ্রমিকরা হানিবোদের রান্নাঘরটা দেখেছে। সেখানে কত মাংস ও ভাল ভাল সুখাদ্য রান্না হচ্ছিল। এক অদম্য হিংসায় ফেটে পরছিল তারা।

মঁসিয়ে হানিবো আপন মনে আবার বলে উঠল, অপদার্থ, তোমরা কি মনে ভাব আমি সুখে আছি?

কিন্তু ওরা সে কথা বুঝবে না একথা ভেবে আরো রেগে গেল হানিবো। ওরা জানে না ওদের এই ম্যানেজার তার মোটা বেতনের একটা বড় অংশ, তার এই সুখ ঐশ্বর্য, আরাম উপভোগের সব উপাদান তাদের দিয়ে দেবে, তাদের সবাইকে এনে ওর এই টেবিল চেয়ারে বসিয়ে দেবে যদি ও তাদের মত ইচ্ছামত যে কোন মেয়ের সঙ্গে যেখানে সেখানে সহবাস করতে পায়, সে যদি ওদের মত কোন ইচ্ছুক মেয়ের সঙ্গে ক্ষণপ্রণয়ের ক্ষণমিলনের লীলারসে মত্ত হয়ে উঠতে পারত। সেও ওদের মত এইভাবে অনশনক্লিষ্ট অবস্থায় পেটে তীব্র ক্ষুধার জ্বালা নিয়ে ঘুরে বেড়াতে পারবে যদি ও কোন সবচেয়ে একটা কুৎসিত শ্রমিকমেয়ের মনটা জয় করে তাকে নিয়ে মাঠে গিয়ে ফসলের উপরেই শুয়ে পড়তে পারত।

ওরা আবার সমবেত কণ্ঠে ধ্বনি দিল, আমরা রুটি চাই।

মঁসিয়ে হানিবোও রাগে ফেটে পড়ে চিৎকার করে বলে উঠল, বোকার দল কোথাকার! তোমরা কি ভাব রুটিটাই সব, রুটি পেলেই জীবনে সবকিছু পাওয়া গেল? ওরা কেন একথা বোঝে না যে ওদের এই মোটা বেতনভোগী ম্যানেজারের বাড়িতে প্রচুর খাদ্যবস্তু থাকা সত্ত্বেও ওর মনে শান্তি নেই, দীর্ঘায়িত মৃত্যুযন্ত্রণার মত এক সুতীব্র মনোবেদনার জ্বালায় তিলে তিলে দগ্ধ হচ্ছে ও। ওরা বিপ্লব আর বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে সমাজের কাঠামোটাকে ভেঙে নতুন সমাজ গড়ে তুলতে পারে, ওরা রুটি কেক প্রভৃতি সব খাদ্যবস্তু সকলে মিলে ভাগ করে খেতে পারে, কিন্তু একটি মানুষকেও ওরা মনের শান্তি বা স্থায়ী সুখ দিতে পারে না।

হানিবোর দুচোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল নিঃশব্দে। ঐ বুভুক্ষু বিক্ষুব্ধ মানুষগুলোর বিরুদ্ধে আর কোন রাগ অনুভব করল না হানিবো। শুধু মনে মনে বারবার বলতে লাগল, বোকা, ওরা একেবারে বোকা। তখনো ওরা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ধ্বনি দিচ্ছিল, আমরা রুটি চাই। আমরা রুটি চাই।

৬

ক্যাথারিনের হাতের চড় খেয়ে অনেকটা শান্ত হয়ে ওঠে এতিয়েন। মঁতসুর পথে ও শ্রমিকদের সামনে থেকে তাদের নেতৃত্ব দান করছিল। কিন্তু মঁতসু খনিটাকে বিধ্বস্ত করতে ওদের প্ররোচিত করলেও সঙ্গে সঙ্গে তার নিজের মধ্যে বিবেক ও যুক্তিবোধের একটা দংশন অনুভব করছিল ও। ওর ভিতর থেকে কে যেন বলছিল এসব করে কোন লাভ নেই। সে ত এই সব চায়নি। কি প্রয়োজন ছিল এই সব ব্যাপক ধ্বংসকার্যের?

কিন্তু কি করে এসব হলো? সে ত ঠাণ্ডা মাথায় ওদের নিয়ে শুধু জাঁ বার্ত খনিতে শান্তিপূর্ণভাবে কাজ বন্ধ করতে চেয়েছিল আজ সকালে। কিন্তু তবু কেন আজ সারা দিন ধরে একের পর এক করে ধ্বংসকার্য ঘটে গেল? অবশেষে এই ম্যানেজারের বাড়ি অবরোধ।

এতিয়েন অবশ্য ওদের থামতে বলেছিল, সংযত করতে চেয়েছিল। কিন্তু ওরা শোনেনি। এবারেও ওরা মঁতসু খনিটার সব কিছু ভাঙচুর করতে চায় এবং এতিয়েন ওদের বাধা দিতে চায়, কোম্পানির সম্পত্তি রক্ষা করতে চায়। কিন্তু এতিয়েন না চাইলেও ওরা ম্যানেজারের বাড়ি অবরোধ করে অকারণে ইট পাটকেল ছুঁড়তে শুরু করেছে। এতিয়েন বুঝতে পারছে না কেমন করে ওদের নিবৃত্ত করবে।

ম্যানেজারের বাড়ির সামনে রাস্তাটায় একা একা দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল এতিয়েন। ভেবে দেখতে লাগল শ্রমিকদের এই ধ্বংসাত্মক উচ্ছ্বাসটাকে অন্ধ

কোন দিকে প্রধাবিত করে মঁতস্যু কোম্পানির সম্পত্তি বাঁচাতে পারে কি না। কিন্তু এখন এমন কোন খনির নাম খুঁজে পেল না যেদিকে শ্রমিকদের চালিত করতে পারবে।

হঠাৎ পিছন থেকে কে ডাকল এতিয়েনকে। পিছন ফিরে দেখল, টিস'র মদের দোকান থেকে র‍্যাসেনোর তাকে ডাকছে। দুশো চল্লিশ নম্বর গাঁয়ের প্রায় তিরিশ জন লোক সে দোকানে ছিল। সেখানে জ্যাকারি আর তার স্ত্রী ফিলোমেনও ছিল।

র‍্যাসেনোরকে দেখেই চলে যাচ্ছিল এতিয়েন। তার কাছে যেতে প্রবৃত্তি হচ্ছিল না। র‍্যাসেনোর তবু বলল, তুমি কি আমার মুখ একেবারেই দর্শন করতে চাও না? যাই হোক, আমি তোমাকে আগেই সাবধান করে দিয়েছিলাম। এবার আসল বিপদের সূত্রপাত। তোমরা রুটি চাও, কিন্তু তার বদলে বুলেট পাবে।

এতিয়েন ঘুরে দাঁড়িয়ে গম্ভীরভাবে বলল, এটা আমার দেখতে সত্যিই খারাপ লাগছে যে আমরা যখন ক্ষুধায় মরছি, জীবন বিপন্ন করে লড়াই করছি বাঁচার জন্য, তখন কিছু কাপুরুষ হাত গুটিয়ে বসে আছে।

র‍্যাসেনোর বলল, তোমাদের সংগ্রাম মানে ত চুরি। এখানে তাহলে চুরি করতে চাও?

এতিয়েন বলল, আমি চুরি করতে চাই না। আমি চাই আমার বন্ধুদের কাছে শেষ পর্যন্ত থাকতে এবং দরকার হলে তাদের সঙ্গে মরতে।

এই কথা বলে এতিয়েন আবার জনতার মাঝে ফিরে এল। দেখল, রাস্তার উপর তিনটে ছেলে ইট ছুঁড়ছে ম্যানেজারের বাড়িতে। তাদের তাড়িয়ে দিল এতিয়েন। তারপর শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে বলল, ইট মেরে বাড়ির কাঁচ ভেঙ্গে সমস্যার কোন সমাধানই হবে না। কিন্তু কেউ ওর কথা শুনল না।

জঁলিনের নির্দেশে বেবার্ত আর লিডি সমানে ইট মেরে যাচ্ছিল। ইট মেরে কে সবচেয়ে বেশী ক্ষতি করতে পারে তার যেন একটা প্রতিযোগিতা হচ্ছিল ওদের মধ্যে। বুড়ো বনিমোর আর মুকেত জনতার পিছনে এক জায়গায় বসেছিল। বনিমোরের পা দুটো এত বেশী ফুলেছিল যে সে অতিকষ্টে কোন রকমে ঘর থেকে এইটুকু এসেছে।

সত্যিই ওরা এতিয়েনের কোন কথাই শুনছিল না। এতিয়েনের বারবার নিষেধ সত্ত্বেও ওরা সমানে ইট মেরে যাচ্ছিল। এমন কি মাহিউ নিজে দুহাতে ইট ছুঁড়ছিল। লেভাকের কাছ থেকে অতি কষ্টে তার কুড়ুলটা কেড়ে নিল এতিয়েন। মাহিউর স্ত্রী, মুকেত্তে, লা লেভাক, মা ব্রুল প্রভৃতি মেয়েরা আবার এ বিষয়ে বেশী তৎপর।

সহসা ওরা থেমে গেল। উন্মত্তভাবে ঢিল ছুঁড়তে ছুঁড়তে ওরা স্তব্ধ হয়ে গেল একেবারে। অথচ এতিয়েনের শত আদেশ বা অনুরোধও ওদের থামাতে

পারেনি। এতিয়েন দেখল গ্রেগরি দম্পতি দূরে কোথাও গাড়ি থেকে নেমে ধীরে হেঁটে আসছিল হানিবোদের বাড়ির ভিতরে যাবার জন্য। এতিয়েনকে কিছুই বলতে হলো না। ওরা সঙ্গে সঙ্গে গ্রেগরিদের যাবার জন্য পথ ছেড়ে দিল। গ্রেগরিদের সঙ্গে ওদের যেন কোন বিরোধ নেই।

গ্রেগরিরা বাড়ির পিছনের দিকের বাগানবাড়ির ভিতর দিয়ে হানিবোদের বাড়িতে চলে গেল তাদের মেয়ে সিসিলকে বাড়ি নিয়ে যাবার জন্য। গ্রেগরিরা বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ওরা আবার ঢিল ছুঁড়তে লাগল।

রোজ এতক্ষণ বাড়িতে ছিল। ওর পাঁচটা থেকে কাজ। ও ঠিক এই সময়ে বাড়ি ঢুকল গ্রেগরিদের পিছু পিছু। বলল, ওরা আমাদের কোন ক্ষতি করবে না।

দোতলার জানালার ফাঁক থেকে হানিবো এ দৃশ্য দেখেছে। গ্রেগরিরা তার বাড়ির ভিতর ঢোকার পর সে চোখের জল মুছে নেমে এল। প্রথাগতভাবে অতিথিদের সাদর অভ্যর্থনা জানাল। পরে বলল, ওরা এখনো বাইরে থেকে আসেনি। এ অবস্থায় কি করেই বা আসবে।

গ্রেগরি দম্পতি তাঁদের জীবনে এই প্রথম বোধ হয় এক তীব্র উদ্বেগে ফেটে পড়লেন। মুখে শুধু বললেন, সিসিলরা এখনো আসেনি?

কিন্তু এখন কি করা যায়, কাকে তাদের খোঁজে পাঠানো যায় তা নিয়ে চিন্তা করতে লাগল ওরা।

এদিকে ওরা তখন বাইরে ধ্বনি দিচ্ছিল, বুর্জোয়ারা নিপাত যাক! সমাজতন্ত্র জিন্দাবাদ!

বাড়ির ঝি ও রাঁধুনি ওদের পাশেই ছিল। ঝি মঁতসুরই মেয়ে, একদিন খনিতে কাজ করেছে। সে ধর্মঘটী শ্রমিকদের অনেককেই চেনে। সে বলল, ওরা খুব একটা ক্ষতি করবে না।

এমন সময় ওদের ইট পাটকেল ছোঁড়া আরো বেড়ে গেল। ওরা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিল ইটগুলো বাড়ির দেওয়ালে বাইরে থেকে লাগছিল।

হানিবো বলল, ওদের উপর আমার কোন রাগ বা ঘৃণা নেই। আমি এতদিন শান্তিরক্ষা করে এসেছি। কোন পুলিসবাহিনীর ব্যবস্থা করিনি।

রান্নাঘর থেকে রাঁধুনি এসে বলল, সে আর রান্নাঘরে কাজ করতে পারছে না।

রাঁধুনি আরও অভিযোগ করল, মার্সিয়েনে হতে কেকওয়ালা আসতে পারবে না। সে এলে পথেই তার কেকের ঝুরি ওরা চুরি করে নেবে। ওরা এখন খাবার চায়, যা পাবে তাই দিয়ে পেট ভরাবে। যাই হোক, আমি বলে দিলাম।

মঁসিয়ে হানিবো বলল, এত ব্যস্ত কেন? ধৈর্য ধরো, কেকওয়ালার আসার সময় এখনো আছে।

মঁসিয়ে হানিবো গ্রেগরিদের বৈঠকখানা ঘরে বসতে বলে দরজাটা খুলতেই চমকে উঠল বিস্ময়ে। দেখল ঘরের মাঝখানে মাইগ্রাত বসে আছে একা। হানিবো আশ্চর্য হয়ে বলল, এ কি তুমি মাইগ্রাত, কি ব্যাপার ?

মাইগ্রাত উঠে দাঁড়িয়ে বলল, সে চুপি চুপি ম্যানেজারের বাড়িতে সাহায্যের জন্য এসেছে। কারণ তার দোকান লুট করতে পারে দুর্বৃত্তরা।

হানিবো বলল, তুমি দেখছ আমরা নিজেরাই বিপন্ন। তুমি বরং নিজে তোমার দোকানে গিয়ে দোকান রক্ষা করার চেষ্টা করো।

মাইগ্রাত বলল, আমি লোহার রড দিয়ে দোকানটাকে ঘিরে আমার স্ত্রীকে পাহারায় রেখে এসেছি।

হানিবো মনে মনে ভাবল চমৎকার পাহারাদার। ক্রমাগত মার খাওয়া কৃশকায়া এক মহিলা ঐ দুর্বৃত্তের দলকে রুখবে কেমন করে ?

হানিবো বলল, যাই হোক, তুমি চলে যাও এখনি। কারণ দেখছ, ওরা খাবার চাই বলে ধ্বনি দিচ্ছে।

মাইগ্রাত একবার ভাবল, ও যদি এখন যায় তাহলে লাঞ্ছিত হবে বিক্ষোভকারীদের দ্বারা, আবার না গেলেও সর্বস্বান্ত হবে সে। দরজার সামনে আয়নায় নিজের মুখটা দেখে নিয়ে অবাক হয়ে গেল মাইগ্রাত। দেখল সে ভয়ে থরথর করে কাঁপছে। যে কোন সময়ে বিপদ ঘটতে পারে।

গ্রেগরিরা বৈঠকখানা ঘরটায় ঢুকল বটে, কিন্তু বসল না। বাইরে তখন কিছুটা দিনের আলো থাকলেও ঘরের ভিতরটা অন্ধকার হয়ে ওঠায় দুটো বাতি জ্বলছিল। আসন্ন বিপদের এক আশঙ্কায় ও আভাসে স্তব্ধ ও ভারী হয়ে উঠেছিল ঘরের আবহাওয়াটা। ওদের সকলের সব কথাবার্তা ঘুরে ফিরে শ্রমিক বিদ্রোহের মাঝেই কেন্দ্রীভূত হচ্ছিল। হানিবোর কেবলি মনে হতে লাগল এর জন্য একমাত্র র‍্যাসোনোরই দায়ী। মঁতসু কোম্পানির উপর পুরনো রাগ আর শ্রমিকদের উপর তার অশুভ প্রভাবের ফলেই আজ মঁতসু কোম্পানির শ্রমিকরা এতদূর এগোতে সাহস পেয়েছে। জানালার শার্সি দিয়ে দেখল হানিবো, ওদিকে দোকানটায় র‍্যাসেনোর দাঁড়িয়ে শ্রমিকদের যত সব বিক্ষোভ নিজের চোখে দেখছিল। হানিবোর মনে হচ্ছিল সেই যেন উস্কানি দিচ্ছে ওদের।

হঠাৎ হিপ্পোলিতে ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিল, স্যার, স্যার, মাদামকে ওরা মেরে ফেলছে।

ঘর থেকে বাইরে এসে ওরা দেখল, গাড়িটা কোথায় রেখে রেকিলার্তের দিক থেকে এসে মেয়েরা বাগানের দরজায় ঢোকার মুখে জনতার দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। রেকিলার্তে গাড়িটা রেখে মাদাম হানিবো ও অন্য সব মেয়েরা যখন নিগ্রেলের সঙ্গে বাগানবাড়ির দিকে হেঁটে আসছিল তখন ধর্মঘটী শ্রমিকমেয়েরা তা জানতে পেরে ছুটে যায়। শ্রমিক মেয়েদের সংখ্যা ক্রমশই বাড়তে থাকায় নিগ্রেল মেয়েদের বাগানবাড়ির দিকে ঠেলে দিয়ে নিজে শ্রমিকমেয়েদের মধ্যে

গিয়ে ভিড় ঠেলে এগিয়ে যেতে থাকে। মেয়েগুলো চিৎকার করতে করতে ওদের ঘিরে ধরে। ওরা বুঝতে পারে না, এই সব অভিজাত ঘরের সৌখীন মেয়েরা কি করে ওদের মাঝখানে এই গোলমালের মধ্যে এসে পড়ল। এই গোলমাল আর বিক্ষোভের মধ্যে হঠাৎ একটা অঘটন ঘটে গেল।

নিগ্রেল কোনরকমে নিজে পিছন থেকে মেয়েদের ঠেলতে ঠেলতে বাগানবাড়ির দরজার কাছে নিয়ে যায়। এদিকে বাড়ির ঝি দরজাটা খুলে তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। মাদাম হানিবো, জিয়ান আর লুসিকে ঢুকিয়ে দিয়ে পরে নিজে ঢুকেই দরজাটা বন্ধ করে দিল নিগ্রেল। তার ধারণা ছিল সিসিলও মেয়েদের সঙ্গে ঢুকে পড়েছে। গোলমালের মধ্যে মাথার ঠিক ছিল না নিগ্রেলের। ওরা কেউ খেয়াল করেনি রেকিলার্ত হতে গাড়ি থেকে নেমে হেঁটে আসতে আসতে সিসিল ভয়ে উল্টো দিকে হাঁটতে থাকে। সে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকমেয়েদের তাদের দিকে দল বেঁধে ছুটে আসতে দেখে দারুণ ভয় পেয়ে যায়।

তখন তাকে একা ছুটে পালাতে দেখে ধর্মঘটী মেয়েরা ছুটে যায় তার দিকে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করে মাদাম হানিবো। কেউ মনে করে সে মাদাম হানিবোর বান্ধবী কোন ধনী ব্যবসায়ীর স্ত্রী। সে যাই হোক, তাদের রাগের আসল কারণ হলো তার সিল্কের পোষাক, পশুর লোমের কোট, মাথার টুপীতে সাদা পালক আর তার গায়ে সেন্টের গন্ধ আর তার হাতে ঘড়ি। তার উপর তার গায়ের ত্বকটা খুব মসৃণ। যে ত্বকে কোনদিন কয়লার ছোঁয়া লাগেনি।

বুড়ী মা ব্রুল বলল, ওকে ভাল করে কয়লা মাখিয়ে দাও।

সমবেত নারীজনতা ধ্বনি দিল, বুর্জোয়ারা নিপাত যাক।

লা লেভাক বলল, আমরা শীতে মরছি আর উনি পশুর লোমের দামী কোট পরেছেন। সব পোষাক খুলে নিয়ে ওকে উলঙ্গ করে দাও।

মুকেত্তে বলল, ওর নগ্ন গায়ে বেত মারো। সিসিলের দেহটাকে নিয়ে ওদের মধ্যে যেন কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। সিসিলের সব পোষাক খুলে ওরা চায় তাকে ওদের মত করে মেয়েশ্রমিকদের পোষাক পরাতে। অভিজাত ঘরের এই সব বুর্জোয়া মেয়েরাই একটা জামা ধোবার জন্য পঞ্চাশ স্যু খরচ করে।

বিপন্ন বিব্রত সিসিলের মুখ থেকে শুধু একটা কথাই বারবার বেরিয়ে আসছিল, তোমরা আমাকে মেরো না, আমাকে যেতে দাও।

কিন্তু সিসিল কথা বলতে পারছিল না। তার কথা কেউ শুনছিল না। অনেকগুলো মেয়ে তাদের ঠাণ্ডা হাত দিয়ে তার গলাটা ধরেছিল। তাকে তারা ঠেলতে ঠেলতে বুড়ো বনিমোরের হাতে তুলে দিল।

বনিমোরও সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেলল সিসিলকে। অথচ অর্ধ-শতাব্দী ধরে এই বনিমোর কত সহনশীলতা ও উদারতার পরিচয় দিয়ে এসেছে, প্রায় ডজন

অনেক লোককে বাঁচিয়ে এসেছে, সেই দয়ামমতাভরা, নরমমনা শান্তশিষ্ট মানুষ আজ হঠাৎ সিসিলকে হাতের মুঠোয় পাবার সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ অন্য মানুষ হয়ে গেল। সহসা এক ধ্বংসের খেলায় মেতে উঠল তার মন, তার শান্ত শীতল ও স্তিমিতপ্রায় রক্তস্রোতে এক অগ্নিজোয়ার খেলে গেল সহসা। কোন এক হিংস্র বৃদ্ধ জন্তুর মত এক অক্ষম আক্রোশে দাঁত কড়মড় করতে লাগল।

দূর থেকে সিসিলের এই অবস্থা দেখে নিগ্রেল আর মঁসিয়ে হানিবো ঘরের দরজা খুলে ছুটে গেল তার উদ্ধারের জন্য। কিন্তু ভিড় ঠেলে তার কাছে পৌছতে পারল না। শ্রমিকমেয়েগুলো তাদের গালাগালি করছিল আর কিল চড় ঘুঁষি মেরে চলেছিল। গ্রেগরিরা বাড়ির দরজা থেকে অসহায়ভাবে এই সব দেখছিলেন।

মাহিউর স্ত্রী সিসিলকে চিনতে পেরে বলল, ওকে ছেড়ে দাও। ও পাওলেনের মেয়ে। সিসিলের মাথা থেকে তখন ওড়নাটা পড়ে যাওয়ায় তাকে চিনতে পেরেছিল মাহিউর স্ত্রী।

এমন সময় এতিয়েন জনতার গতিটা ঘোরাবার চেষ্টা করল। সে দেখল, ওদের মনটা অন্য দিকে সরিয়ে না দিলে এখানে ওরা এই সব অন্যায় কাজ করে যাবে একের পর এক করে। ও তাই লেভাকের কাছ থেকে নেওয়া কুড়ুলটা ঘুরিয়ে বলল, মাইগ্রাত চল, ওর দোকানে রুটি আছে।

সঙ্গে সঙ্গে লেভাক, মাহিউ প্রভৃতি কয়েকজন ছুটে গেল। দোকানঘরের দরজার উপর এতিয়েনই প্রথমে কুড়ুল দিয়ে ঘা দিল। কিন্তু মেয়েরা গেল না। তারা সিসিলকে নিয়েই রয়ে গেল। মাহিউর স্ত্রীর কথায় বুড়ো বনিমোর তাকে ছেড়ে দিলেও সিসিল এসে পড়ল মা ব্রুলের খপ্পরে। জাঁলিনের নির্দেশে বেবার্ত আর লিভি হামাগুড়ি দিয়ে সিসিলের পোষাকের আঁচল তুলে তার গোপনাঙ্গ দেখার চেষ্টা করতে লাগল।

সিসিলের পোষাকটা একেবারে ছিঁড়ে গিয়েছিল।

এমন সময় হঠাৎ ঘোড়া ছুটিয়ে দেন্থলিন এসে অনেকটা ছত্রভঙ্গ করে দিল জনতাকে। দেন্থলিন অতর্কিতে তার ঘোড়ার চাবুকটা দিয়ে যাকে তাকে মারতে মারতে বলতে লাগল, আমাদের মেয়ের গায়ে হাত?

ঘোড়া থেকে নেমে একহাতে ঘোড়ার লাগাম আর এক হাতে সিসিলের কোমরটা ধরে তাকে উদ্ধার করল ওদের হাত থেকে। সঙ্গে সঙ্গে নিগ্রেল গিয়ে মূর্ছিতপ্রায় সিসিলকে তুলে নিয়ে বাড়ির ভিতর নিয়ে গেল। তার পিছু পিছু মঁসিয়ে হানিবো আর দেন্থলিন এসে বাড়িতে ঢুকল। দেন্থলিন ঢুকতে যাচ্ছে এমন সময় একটা পাথর এসে তার ঘাড়ের উপর লাগে। দেন্থলিন বলল, আমার মেসিনপত্র ভেঙ্গেছিস, এবার আমার দেহের হাড়গুলো ভাঙ্গ।

দেন্থলিন ঘরে ঢুকে দরজাটা সজোরে বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে একরাশ ঢিল এসে পড়ল দরজার উপর। দেন্থলিন বলল, বদ্ধ পাগলের দল। ওরা মার

ছাড়া কোন যুক্তির কথা মানবে না। আর এক সেকেণ্ড দেরি হয়ে গেলেই ওরা পাথর দিয়ে আমার মাথাটা ভেঙ্গে ফেলত।

গ্রেগরিদের চোখে জল এসেছিল। সেদিনের মূর্ছা ভাঙলে দেখা গেল, তার দেহে কোন আঘাতের চিহ্ন বা ক্ষত নেই। তার পোষাকটা ছিঁড়ে গেছে আর ওড়নাটা হারিয়ে গেছে।

এদিকে গ্রেগরিদের ঝি মেলানি বাড়ি থেকে কোনরকমে পালিয়ে এখানে চলে এসেছে তার মালিকদের খবর দেবার জন্য। তাদের সাবধান করে দেবার জন্য। মেলানি এসে বলল, ওরা ওদের বাড়িতে ইট মেরেছে। খুব সাবধান।

দেনুলিন এবার তাব মেয়েদের বলল, তোমরা কেমন আছ ?

জিয়ান ও লুসি তুজনেই দারুণ ভয় পেয়েছিল। কিন্তু তাদের কোন ক্ষতি হয়নি বা তারা কোনরূপ নিগৃহীত হয়নি। তারা বেশ হাসিখুশিতেই মত্ত হয়ে ছিল। তারা মনের আনন্দে হাসছিল।

দেনুলিন বলল, হায় হায়, আজ সকাল থেকে আমার কিভাবে যে কেটেছে। তোমাদেব বিয়েতে কোন যৌতুক দিতে পাবব না। সে যৌতুকের টাকা তোমাদের ও আমাকে খেটে বোজগার করতে হবে।

দেনুলিনের গলাটা কাঁপছিল। মেয়েরা যখন তার গলাটা জড়িয়ে ধরল তখন দেনুলিনেব চোখ থেকে জল গডিয়ে পডতে লাগল।

দেনুলিন তাব বিধ্বস্ত খনি সম্বন্ধে যে স্বীকারোক্তি করল তা ওৎ পেতে শুনল হানিবো। শুনে তার আশা হলো হতাশাব মাঝে। তাহলে বিধ্বস্ত ভাঁদেমের খনিটা এবার অবশ্যই মঁতস্থ কোম্পানি কিনে নেবে এবং দেনুলিন আর তা কোনক্রমেই রেখে দিতে পারবে না। এই কেনাবেচার ব্যাপারটা যদি সমাধা করে দিতে পারে মঁসিয়ে হানিবো তাহলে মালিকদের কাছে তার কমে যাওয়া গুরুত্বটা আবাব বেড়ে যাবে। আবার সে প্রিয় হয়ে উঠবে তাদের কাছে।

বাইরে তখন গোলমাল আর ইট ছোঁডাছুঁড়ি থেমে গেছে। ওরা হয়ত অন্যত্র কোথাও চলে গেছে। এদিকে ঘরের মধ্যে সবাই চুপচাপ থাকায় সেখানে বিরাজ করছে এক ক্লান্ত প্রশান্তি।

সহসা এক দূরাগত শব্দে চমকে উঠল ওবা। নিচের তলার ঘর থেকে ওরা উপরতলায় উঠে গিয়ে জানালা দিয়ে দেখতে লাগল। শব্দটা একটা নির্দিষ্ট ব্যবধানে শোনা যাচ্ছে পর পর।

হানিবো দেনুলিনকে বলল, দেখতে পাচ্ছ, র‍্যাসেনোর দাঁড়িয়ে রয়েছে দোকানের সামনেটায় ? আমি বলিনি এই সব কিছুর পিছনে সে আছে।

কিন্তু আসলে র‍্যাসেনোর নয়, এতিয়েন। এতিয়েন তার হাতের কুড়ুলটা দিয়ে সজোরে মাইগ্রাতের দোকানের দরজা ভাঙছিল। ক্রমাগত সে শ্রমিকদের ডেকে যাচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুধার তাডনায় উন্মত্ত জনতা ভিড করছিল দোকানটার চারদিকে। তারা ভাবছিল এই দোকান ঘরের ভিতর প্রচুর খাদ্য

আছে। তারা যে রুটি চায় সে রুটি এই দোকানেই আছে। এতিয়েন দেখল লোকের ভিড এত বেড়ে গেছে যে সে কুড়ুলটা নাড়তে পারছে না।

এদিকে মাইগ্রাত হানিবোর কথায় তার বৈঠকখানা ঘর থেকে বেরিয়ে প্রথমে রান্নাঘরে চলে গিয়ে কিছুক্ষণ লুকিয়ে রইল। কারণ সে বাইরে শ্রমিকদের কাছে যেতে ভয় করছিল তখনো। তারপর যখন সে ভাবল তার দোকান ওরা লুট করবে, দরজা ভেঙ্গে সব জিনিস বার করে নেবে তখন সে আর থাকতে পারল না। এই কথা ভেবে ম্যানেজারের বাড়ির রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে উঠোনে পাম্পের আড়ালে দাঁড়িয়ে সে দেখতে লাগল। ওরা তখন দোকান ঘরের দরজা ভেঙ্গে ফেলেছে। এবার ওরা সব জিনিসের বস্তাগুলো বার করে নেবে। আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই গোটা দোকানটা ওদের হাতের মুঠোর মধ্যে এসে পড়বে। কুড়ুলের প্রতিটি ঘা ওর বুকের উপর যেন পডছিল। ওর বুকটা কেঁপে কেঁপে উঠছিল। এরপর দোকানে তার কিছুই থাকবে না। তাকে ভিক্ষে করতে হবে। তবু সে ওখানে যাবে না। ওখানে গেলে ওকে ওরা মেরে ফেলবে।

পাম্পের ঘর থেকে লুকিয়ে জানালা দিয়ে লক্ষ্য করল মাইগ্রাত, তার বাড়িতে একটা ঘরের জানালায় বসে তার স্ত্রী এক নিবিড় সন্ত্রাসের সঙ্গে দোকান লুটের সমস্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করছে। মাইগ্রাত বেশ দেখতে পেল তার মুখটা ম্লান। হঠাৎ তার মনে হলো সে ওখানে গিয়ে দুর্বৃত্তদের সম্মুখীন হবে সাহসের সঙ্গে। সে বাধা দেবে। একবার ভাবল বাড়ির উপর থেকে গরম তেল বা জলন্ত মোম ফেলবে ওদের উপর। হঠাৎ আগের থেকে জোরে শব্দ হলো আর সঙ্গে সঙ্গে দেখল কুড়ুলের এক প্রচণ্ড আঘাতে তার দোকানের দরজাটা ভেঙ্গে পড়ে গেল।

মাইগ্রাত ভাবল দোকানের যে বস্তাগুলো জিনিসভর্তি থাকত একদিন আজ সেগুলোতে তাদের দুজনের ভরে ওরা কোথাও ফেলে দেবে। তবু মাইগ্রাত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠল মনে মনে। সে একটা পাঁউরুটিও দেবে না।

মাইগ্রাত আর থাকতে পারল না। সে ছুটে তার দোকানে চলে গেল। ওদের মাঝখানে গিয়ে দোকানের জিনিস রক্ষা করার চেষ্টা করতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে ওরা উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করতে লাগল মাইগ্রাতকে দেখে। বলতে লাগল, ওকে ধরো, ধরো।

মাইগ্রাত তখন একটা পাঁচিলের উপর ওঠার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু বিক্ষুব্ধ শ্রমিকজনতা ওকে এমনভাবে তাড়া করল যে অনেকটা উঠেও সে টাল সামলাতে না পেরে একটা বড় পাথরের উপর মাথা নিচু অবস্থায় পড়ে গেল। তার মাথা পাথরে সজোরে লাগায় ভেঙ্গে গেল আর তার থেকে ঘিলু বেরিয়ে গেল। তার দেহটা নিস্পন্দ হয়ে পড়ে রইল।

ওরা তখন মাইগ্রাতের নিথর নিস্পন্দ মৃতদেহটার চারদিকে ভিড় করে

দাঁড়িয়ে তাকে নানা কুৎসিত ভাষায় গালাগালি করতে লাগল। তারা একবাক্যে বলতে লাগল সবাই, ঈশ্বর তাহলে আছেন। এতদিনে তার পাপের প্রতিফল পেল মাইগ্রাত।

মাহিউব স্ত্রী মাইগ্রাতের রক্তাক্ত দেহটার কাছে গিয়ে বলল, তুমি আমারও কাছে ষাট ফ্রাঁ পাও। দিচ্ছি।

এই বলে সে দুহাত দিয়ে মাটি খুঁড়ে এক আঁচল মাটি নিয়ে তা মাইগ্রাতের মুখের ভিতব জোব কবে ভরে দিল। মাইগ্রাতেব চোখদুটো খোলা ছিল। গোধূলিব যে শান্ত আকাশ থেকে অন্ধকাব নেমে আসছিল ধীর গতিতে মাইগ্রাতেব খোলা দু চোখেব শূন্য নিষ্প্রাণ দৃষ্টি সেই আকাশের উপব নিবদ্ধ ছিল। যে খাদ্যবস্তু ওব দোকানে থাকা সত্ত্বেও ও শ্রমিকদের দিত না, সেই খাদ্যবস্তুব প্রতীক হিসাবে ঐ মাটি শেষবাবেব মত ওব মুখে ভবা বইল।

মাইগ্রাতেব এই আকস্মিক মৃত্যু হঠাৎ ঐন্দ্রজালিকভাবে শান্ত করে দিল বিক্ষুব্ধ জনতাকে। তাবা দোকান লুটের কথা একেবাবেই ভুলে গেল। এতিয়েন লেভাক প্রভৃতি সকলেই যে যেখানে ছিল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পডল। অনেকে সেখান থেকে চলে গেল।।

কিন্তু মেয়েবা মাইগ্রাতেব মৃতদেহ ছেড়ে এক পাও গেল না। বরং তারা আবো বেশী কবে ভিড করতে লাগল। মাহিউর স্ত্রী মাইগ্রাতের মুখেব কাছে গিয়ে তাকে উদ্দেশ্য করে বলল, নাও খাও, তুমি যেমন আমাদের খেতে।

মা ব্রুল বলল, এখনো ওব শাস্তি হয়নি ঠিকমত। অনেক বাকি আছে। ওব কাপড-চোপড খুলে ফেল। ওকে ল্যাংটো কবে ফেল।

সঙ্গে সঙ্গে মুকেত্তে এগিয়ে গিয়ে মাইগ্রাতেব পায়জামাটা খুলে ফেলল। লা লেভাক পা দুটো তুলে ফাঁক করল আর বুড়ী মা ব্রুল মাইগ্রাতের লিঙ্গটা ধবে টানাটানি কবতে লাগল। হঠাৎ তাব মাথায় যেন খুন চেপে গেল। অবশেষে সমস্ত শক্তি দিয়ে অনেক টানাটানিব পব রক্ত সমেত লিঙ্গটা ছিঁড়ে গেল আব সেটা হাতে পেয়ে এক পৈশাচিক আনন্দে চিৎকার করতে লাগল মা ব্রুল, পেয়েছি, পেয়েছি। আব তুমি এটা আমাদেব মেয়েদের পেটে ভবতে পাববে না।

মেয়েদেব মধ্যে একজন মাইগ্রাতকে উদ্দেশ্য কবে বলল, তুমি আমার কাছে দশ ফ্রাঁ পাবে। তুমি যদি আমাকে এখন চাও ত আমি রাজী আছি।

এইভাবে মেয়েরা যখন এক নাবকীয় উল্লাসে মেতে উঠে বিদ্রূপ করতে লাগল মাইগ্রাতকে নানাভাবে, তখন মা ব্রুল সেই ছিন্নমূল রক্তাক্ত লিঙ্গটাকে একটা লম্বা ছডিব ডগায় বেঁধে পতাকার মত বেঁধে নিয়ে যেতে লাগল। তার সঙ্গে মেয়েরা এগিয়ে চলল শোভাযাত্রাব মত।

তখন অন্ধকার ঘন হয়ে উঠেছিল। তাই ম্যানেজারের বাড়ির দোতলার

ঘর থেকে জানালার খড়খড়ি তুলে মেয়েরা তা দেখেও কিছু বুঝতে পারল না। মাদাম হানিবো বলল, একটা রক্তাক্ত মরা ইঁদুর মনে হচ্ছে।

সিসিল বলল, লাঠির ডগায় কি বাঁধা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

এতিয়েন আর মাহিউ বিহ্বল হয়ে ভাবছিল। কি করবে কিছু ভেবে পাচ্ছিল না। এতিয়েন তার হাতের কুড়ুলটা মাঝে মাঝে তখনো ঘুরোচ্ছিল।

এমন সময় হঠাৎ কোথা থেকে ক্যাথারিন মাহিউকে বলল, চলে যাও এখান থেকে, পুলিস আসছে।

মাহিউ ক্যাথারিনের হাতটা ঠেলে সরিয়ে দিল।

এর পর ক্যাথারিন এতিয়েনের হাত থেকে কুড়ুলটা কেড়ে নিয়ে তার হাত ধরে টানতে লাগল। বলল, শ্যাভেলের কাছ থেকে আমি পালিয়ে এসেছি। ও পুলিস ডাকতে গেছে। আমি চাইনা তুমি ধরা পড়ো। তুমি চলে যাও এখান থেকে।

এতিয়েন আর কোন বাধা দিল না। ক্যাথারিন তাকে যে দিকে টেনে নিয়ে যেতে লাগল সেই দিকেই যেতে লাগল।

দেখতে দেখতে ফাঁকা জনশূন্য হয়ে উঠল জায়গাটা। শুধু তার দোকানের সামনে পড়ে মাইগ্রাতের মৃতদেহটা যেন পাহারা দিতে লাগল দোকানটাকে। মঁতস্যুর বুর্জোয়াদের ভয় তখনো কাটেনি। তারা তখনো ঘরের জানালা দরজা বন্ধ করে উঁকি মেরে তাকাচ্ছিল মাঝে মাঝে ঘটনাস্থলের দিকে। এদিকে নিঃশব্দ গ্রাম্যপথে অশ্বারোহী পুলিসদের এগিয়ে আসার শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

খণ্ড

ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম পক্ষকালটা যেন কাটতেই চাইছিল না। বরফ পড়ছে। চারদিকে কেমন যেন একটা থমথমে ছায়া-ছায়া ভাব। পথে কোন লোকজন বার হয় না। দোকানপাট সব বন্ধ। তুশো চল্লিশ নম্বর গোটা গাঁটা ঘুমোচ্ছে সেই দিনের ঘটনার পর থেকে।

সারা গাঁয়ের পথে ঘাটে এখন পুলিসের টহলকে জোরদার করা হয়েছে। প্রতিটি খনিতে ম্যানেজারের বাংলোতে, কিছু কিছু ধনী বুর্জোয়াদের বাড়িতেও সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছে। কাউকে পথে দেখলেই সৈন্যরা চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করছে, কে যায়? এগিয়ে এসে পরিচয় দিয়ে যাও।

কোন খনিতেই কাজ চালু হয়নি। বরং আগে যে সব খনিতে ধর্মঘট হয়নি

সেই সব খনিতে ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়েছে। ক্রীভেলোর, মিরৌ, কাস্তেল, লা ভিকতোরি প্রভৃতি খনিতেও কোন লোক কাজ করতে যাচ্ছে না।

দুশো চল্লিশ নম্বর গাঁয়ের লোকগুলোকে দেখে মনে হয় তারা যেন খাঁচায় আবদ্ধ আছে। কিন্তু তারা এই সব কড়া ব্যবস্থা সত্ত্বেও নতি স্বীকার করার কোন লক্ষণই দেখাল না। একবার শোনা গেল কোম্পানি নাকি বেলজিয়াম সীমান্ত থেকে সব নতুন লোক নেবে। কিন্তু প্রথমে এই কথা বলে কোম্পানি ভয় দেখালেও পরে সাহস পায়নি বাইরে থেকে লোক নিতে।

সেই ঘটনার পর পুলিস এসে মাইগ্রাতের মৃতদেহ সনাক্ত করে তদন্ত শুরু করে। কিন্তু তারা তদন্ত করে বলে, উপর থেকে পড়ে আঘাত লেগে মাইগ্রাতের মৃত্যু ঘটে। তবু কিছু লোককে গ্রেপ্তার করে পুলিস। কিন্তু আসলে কোন দোষী লোককে ধরতে পারেনি। ওরা পিয়েরেনের মত কিছু নিরীহ লোককে ধরে।

সেদিন থেকে এতিয়েনের কোন পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না। কোম্পানি ছাঁটাইএর একটা তালিকা তৈরি করেছে। তার মধ্যে সবার আগে আছে মাহিউ, লেভাক আর এতিয়েনের নাম আর আছে মঁতসুর চৌত্রিশ জন শ্রমিক। শ্যাভেল পুলিসের কাছে মাহিউর নাম করতে চেয়েছিল, কিন্তু ক্যাথারিন ওকে তা করতে দেয়নি।

এদিকে বুর্জোয়ারা এখনো খুব ভয়ে ভয়ে দিন কাটাচ্ছে।

এখন গাঁয়ে যে নতুন যাজক এসেছে তার নাম রণভিয়ের। রোগা লিক-লিকে চেহারা। চোখ দুটো যেন জ্বলছে। মোটাসোটা চেহারার যে যাজকটি আগে এ গাঁয়ের চার্চে থাকত তিনি রাজনীতি করতেন না। কিন্তু বর্তমান যাজক রণভিয়ের ধর্মপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতি প্রচারও করে। রণভিয়েরের মতে বুর্জোয়ারাই যত অনর্থের মূল। যাজকের মতে বুর্জোয়ারাই যত সব ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করে মানুষকে নাস্তিকতার পথে নিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বভ্রাতৃত্বের মূলে কুঠারাঘাত করছে।

তার কথা শুনে এ অঞ্চলের বুর্জোয়ারা তার উপর দারুণ চটে গেছে। তারা বলাবলি করছে, রণভিয়ের উগ্র সমাজবাদ প্রচার করছে এবং দুদিন পরে শ্রমিক জনতার-সামনে তাব ক্রসটা ঘুরিয়ে মিছিলের নেতৃত্ব করবে।

মঁসিয়ে হানিবো কথাটা শুনে বলল, ও যদি বেশী বাডাবাডি করে বিশপ ওকে এখান থেকে বদলি করে দেবে।

এদিকে সারা খনি অঞ্চল জুড়ে যখন বিরাজ করছিল সন্ত্রাসের রাজত্ব এতিয়েন তখন সকলের অলক্ষ্যে অগোচরে রেকিলার্তের সেই মৃত খনিটার ভিতরে জাঁলিনের গোপন বাসাটায় বাস করছিল। সে বাসায় অভাব কিছুরই ছিল না। একটা বড় খড়ের বিছানা, বোতলভরা মদ, পাঁউরুটি, শুকনো কড মাছ। জাঁলিন তাকে সব কিছু এনে দিয়েছে। কোন কিছুরই অভাব নেই।

এখানে একমাত্র যে জিনিসের অভাব তা হলো আলোর।

খনিগর্ভের এই নিবিড় নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে দিন-রাত্রি সমান মনে হয় সব সময়। দিনরাত্রির মধ্যে কখনো কোন পার্থক্যই বুঝতে পারে না এতিয়েন। জাঁলিন এত জিনিস এনেছে, কিন্তু কোন বাতি আনতে পারেনি। এতিয়েনের সবচেয়ে মুস্কিল সে কোন পড়াশুনো করতে পারে না। কোন বই পড়তে পারে না। শুধু তাই নয়, সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদ সম্বন্ধে কোন চিন্তাও করতে পারে না। সারা দিনরাত্রি ধরে যে অন্ধকার ভারী পাথরের মত তার বুকের উপর চেপে বসে থাকে সব সময় সেই অন্ধকারের নির্মম নিস্পেষণে তার মনের চিন্তা ভাবনাগুলোও যেন চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়।

এখানে আসার আগে পর পর দুদিন এত বেশী পরিশ্রম হয় এতিয়েনের যে সে দারুণ ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তারপর ক্যাথারিন তাকে টেনে নিয়ে ঘটনাস্থল থেকে দূরে নিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে তার হঠাৎ মনে পড়ে যায় জাঁলিনের এই গোপন বাসাটার কথা। অন্ধকার খনিগর্ভের এই নির্জন নীরবতার মাঝে এসে সহজেই ঘুমিয়ে পড়ে এতিয়েন। দুদিন ধরে ঘুমোয় সে। ঘুম থেকে উঠে তার মনে হলো মাথাটা ধরে আছে, মনে হলো যেন একটা বড় অসুখ থেকে উঠেছে। এখানে ইঁদুরের খুটখাট শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। এখানকার নীরবতা এত নিবিড, এত গভীর যে তা অস্বস্তিকর মনে হচ্ছিল এতিয়েনের। মনে হচ্ছিল এই গভীর অন্তহীন নৈঃশব্দ্যই ক্রমাগত নানারকমের শব্দ সৃষ্টি করছে তার মাথার মধ্যে।

অবশেষে একদিন জাঁলিন কোথা থেকে একটা বাতি চুরি করে আনে। সেই বাতিটা মাঝে মাঝে দু একবার জ্বালে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই নিবিয়ে দেয়। এতিয়েনের আজকাল একমাত্র চিন্তা ও যখন এখান থেকে গাঁয়ে ফিরে যাবে তখন ও কিভাবে একগাদা মানুষের সঙ্গে এক ঘরে পশুর মত থাকবে, কি করে এক টবে অন্য সবার মত স্নান করবে। একথা ভাবতেও এখন শিউরে ওঠে ও। এতিয়েন ভাবে ও তাই তাদের দারিদ্র্য ঘুচিয়ে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে চায়। হঠাৎ ওর মনে হলো ক্ষুধার অন্ধকার কারাগারে ওরা আর বেশীদিন 'আবদ্ধ হয়ে থাকতে পারবে না, এর অবসান ঘটাতেই হবে। বুর্জোয়ারা যে সব আরাম ও সুখস্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করে সেই সব ওরাও একদিন অবশ্যই উপভোগ করবে।

এই সব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ এক উচ্চাশা জেগে ওঠে এতিয়েনের মনের মধ্যে। ওর মনে হলো, গাঁয়ের সব লোকদের বিপদের মধ্যে ফেলে রেখে ওর এইভাবে এক গোপন বাসার অন্ধকারে লুকিয়ে থাকা কাপুরুষতা ছাড়া আর কিছুই না। ও তা থাকবে না। ও বেরিয়ে গিয়ে ওদের মাঝে দাঁড়িয়ে ওদের নেতৃত্ব দান করবে এই বিপদের দিনে এবং ও একদিন প্লুশার্তের মতই নেতা হবে। এই হীন খনিশ্রমিকের কাজ ছেড়ে দেবে। তখন ও শুধু সব সময়

রাজনীতির কাজ করে বেড়াবে।

এইভাবে তুসপ্তা কাটার পর জাঁলিন একদিন এতিয়েনকে বলল, বাইরে শুনেছে পুলিস প্রথমে এতিয়েনের খোঁজ করে তাকে না পেয়ে এখন ভাবছে এতিয়েন বেলজিয়াম চলে গেছে। একথা শুনে সাহস পেয়ে এতিয়েন সন্ধ্যার দিকে রোজ একবার করে বেরোতে লাগল। ওর কেবলি ভয় হতে লাগল যদি সত্যি সত্যিই ধর্মঘট ব্যর্থ হয়, যদি কোম্পানি কোনক্রমে মিটমাট করতে না চায় তাহলে কি করে মুখ দেখাবে ও শ্রমিকদের কাছে? তাহলে এত সব হায়রানি আর ক্ষয়ক্ষতির জন্য লোকে তাকেই দায়ী করবে এবং তখন বাধ্য হয়ে তাকেও আবার সেই সামান্য খনিশ্রমিকদের কাজেই যোগদান করতে হবে।

ঘুরতে ঘুরতে এতিয়েন আজকাল নিজের চোখে দেখতে পায় একের পর এক খনি, একের পর এক কত কারখানা অচল হয়ে পড়ে আছে। এ অঞ্চলের সব কর্মচঞ্চলতা আশ্চর্যভাবে স্তব্ধ একেবারে। তাছাড়া এই বিরাট ব্যাপক ধর্মঘটের ফলে খনিগুলো দীর্ঘদিন অচল থাকার জন্য অনেক ক্ষয়ক্ষতিও হয়েছে বিভিন্ন খনিতে। মিরৌএর কাছে খনির উপর অনেকটা জায়গা ধসে গেছে। জায়গাটার মালিকদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে কোম্পানিকে। ক্রীভেসের আর ম্যাদলেন খনিতে ছাদ থেকে ধস নামায় সব রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে। লা ভিক্তোরিতে ছাদ থেকে ধস নামার সময় তুজন কর্মরত ডেপুটি মারা যায়। কাস্তেল খনি জলপ্লাবিত হয়ে পড়ে।

এই সব তুর্ঘটনার কথা শুনে এতিয়েনের মনে আশাটা আরও জেগে ওঠে। এই সব তুর্ঘটনার কথা ভেবে কোম্পানি হয়ত মিটমাটের কথা ভাবতে পারে। তাছাড়া এতিয়েন আরও শুনেছে সমগ্র মঁতস্থ অঞ্চলের এই ব্যাপক খনিধর্মঘট নিয়ে প্যারিসে বিভিন্ন খবরের কাগজে প্রচুর আলোড়ন চলছে। এবং কোম্পানির ডিরেক্টররা এতে বিচলিত হয়ে পড়েছে। তুজন ডিরেক্টর তা নিয়ে খনি অঞ্চলে তদন্ত করতে আসে। তারা সব কিছু নিজের চোখে দেখে যায়। অবশ্য তাতে কিছু সুফল হয়নি। কারণ তারা একটা নিরপেক্ষতার ভাব দেখিয়ে চলে গেছে।

কিন্তু যখন শুনল দেমুলিন ভাদেম খনি মঁতস্থ কোম্পানিকে বিক্রি করে দেবে তখন তার আবার ভয় হলো। তখন সে আবার হতাশ হয়ে পড়ল। দেমুলিন প্রথমে বিক্রি করতে চায়নি। সে এই বিপদটা কাটিয়ে ওঠার জন্য গ্রেগরিদের কাছে এক লক্ষ ফ্রাঁ ধার চেয়েছিল। কিন্তু গ্রেগরিরা তা দেয়নি। তারা তাকে বিক্রি করে দেবার পরামর্শ দেয়। মিথ্যা সংগ্রাম করে যাওয়া, এত কষ্ট করে যাওয়ার কোন অর্থ হয় না। দেমুলিনকে টাকা দিলে সে বৃথা খনির পিছনে সব টাকা খরচ করবে বলেই গ্রেগরিরা তার ভালর জন্যই টাকাটা দেয়নি।

তবে সেদিন জাঁলিন একটা সুখবর নিয়ে এল। খবরটা ভাল বলেই মনে

হলো এতিয়েনের। লে ভোরোর খনির অবস্থা ভাল নয়। কাঠের ঠেকার কাজ দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার জন্য ছাদ ধসে পড়ছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে জল ঢুকছে খনিতে। অতি কষ্টে একদিন রাত তিনটের সময় বেরিয়ে প্রহরীর দৃষ্টি এড়িয়ে আসল খবরটা এনেছে জাঁলিন।

একদিন সকালে খনির পাশ দিয়ে যেতে যেতে প্রহরারত সৈন্যদের দেখে ভাবতে লাগল এতিয়েন, এই সৈন্যবাহিনী না থাকলে মাত্র দুঘণ্টার মধ্যে সমস্ত বুর্জোয়া-সমাজটাকে একেবারে ধ্বংস করে ফেলা যেত। তবু অকারণে বদনাম দিয়ে বলা হয় এই সেনাবাহিনী এখন সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় দীক্ষিত হয়ে উঠেছে। এতিয়েন ভাবল, কিন্তু এই সব সৈনিকদের সঙ্গে কথা বলে ওদের বোঝানো হয় না কেন?

একজন সৈনিকের কাছে সাহস করে গিয়ে এতিয়েন বলল, কী দারুণ খারাপ আবহাওয়া! শীগগির বরফ পড়বে বলে মনে হয়।

সৈনিকের মাথার চুলগুলো বড় সুন্দর। তার চেহারাটা একটু বেঁটে। তার গায়ে একটা বড় কোট চাপানো ছিল। সে বলল, হ্যাঁ ঠিক তাই। সে তার নীল চোখ আকাশে তুলে একবার তাকাল।

এতিয়েন বলল, তোমাদের কাজ বড় কঠিন। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা। দেখে মনে হবে যেন এইমাত্র বিদেশীরা আক্রমণ করছে আমাদের দেশ। তার উপর কী ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়া।

সৈনিকটা একটু নড়ে উঠল। কিন্তু কোন কথা বলল না। কোন অভিযোগই যেন তার নেই। যে ষাটজন প্রহরী লে ভোরো খনিতে পাহারা দিচ্ছে ও হচ্ছে তাদের একজন।

এতিয়েন তার সঙ্গে কিছু রাজনীতির কথা আলোচনা করার চেষ্টা করল। কিন্তু সে শুধু 'হাঁ' অথবা 'না' বলে সব কথার একটা করে অস্পষ্ট উত্তর দিচ্ছিল।

এতিয়েন তাকে জিজ্ঞাসা করল, তোমার নাম কি?

সৈনিকটি বলল, জুলি।

এতিয়েন বলল, তোমার বাড়ি কোথায়?

সৈনিক বলল, প্লেগফ।

এই বলে দূরে হাত বাড়িয়ে একটা জায়গা দেখাল সে। তারপর বলল, আমার এক ভাই এক বোন আছে। তারা আমার জন্য প্রতীক্ষায় আছে। কিন্তু আমি কখন বাড়ি যেতে পারব তা বলতে পারি না। আমি যখন বাড়ি থেকে এখানে আসি তখন পাহাড়ের কাছ পর্যন্ত এগিয়ে এসেছিল ওরা। কত দূর আমার বাড়ি।

কথা বলতে বলতে সৈনিকের চোখদুটো ছলছল করে উঠল। সে বলল, যদি আমার চাকরির খাতায় কোন খারাপ রিপোর্ট না থাকে তাহলে বছর দুয়েকের মধ্যে ওরা আমাকে এক মাসের ছুটি দেবে।

এরপর এন্তিয়েন তার পরিচয় দিল। তার কথা বলল।

তখন সকাল হয়ে গেছে। চারদিকে বরফ পড়ছিল। এন্তিয়েন রেকিলার্তের দিকে চলে যেতে সৈনিকটি কুহেলিঘেরা দিগন্তের পানে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। ওদের এবার ডিউটি চেঞ্জ হবে। সার্জেন্ট আসছে।

২

গত দুদিন ধরে দারুণ তুষারপাত হচ্ছে। চারদিক সব কিছু সাদা বরফে ঢাকা। দুশো চল্লিশ নম্বর গোটা গাঁখানা যেন সাদা কফিনের মধ্যে মৃতদেহের মত ঢাকা আছে। কোথাও কোন প্রাণচঞ্চলতা নেই। কোন জনপ্রাণী দেখা যায় না পথেঘাটে।

মাহিউদের বাড়িতে সেদিন একটুকরো জ্বালানি কাঠও ছিল না। অথচ বাইরে তখন এত বরফ পড়ছে যে চড়ুই পাখিগুলো একটা ঘাসের পাতাও পাচ্ছে না। অনবরত বরফ সরাতে সরাতে ঠাণ্ডা লেগে আলজিরে কঠিন অসুখে পড়ে গেছে। তাকে ওর মা একটুকরো বিছানার চাদর ঢাকা দিয়ে শুইয়ে রেখে ডাক্তার ভাঁদারহাগেনের অপেক্ষা করছিল। হেনরি আর লেনোর জাঁলিনের সঙ্গে বড় রাস্তায় গিয়ে পয়সা ভিক্ষে করছিল। বনিমোরের পায়ের ফুলো আরো বেড়েছে আগের থেকে। সেও বসেছিল। একমাত্র মাহিউই পিঞ্জরাবদ্ধ পশুর মত ঘরের ভিতর পায়চারি করছিল। ঘরের মধ্যে একটা তেলের প্রদীপ জ্বলছিল। তেল ফুরিয়ে যাওয়ায় আলোটা নিবে আসছিল। তবু বাইরে চারদিকে বরফ পডতে থাকায় তার প্রতিফলনে ঘরের ভিতরটা আলোকিত হয়ে উঠছিল।

হঠাৎ সকলকে চমকে দিয়ে পাশের বাড়ি হতে লা লেভাক বুতলুপকে টানতে টানতে নিয়ে এল। ঘরে ঢুকেই বলল, তুমি নাকি বলেছ আমার নামে আমি একবার শোবার বিনিময়ে আমাদের ভাড়াটে বুতলুপের কাছে কুড়ি স্যু নিয়েছি?

মাহিউর স্ত্রী অস্বীকার করল। বলল, কে বলেছে? আমি এ ধরনের কোন কথা বলিনি।

লা লেভাক তবু শুনল না। সে বলল, যেই বলুক, তুমি একথা বলেছ। তুমি নাকি বলেছ তুমি তোমার ঘর থেকে এই দেওয়ালের পাশ থেকে আমাদের বাড়িতে যে সব নোংরা জিনিস চলছে তা সব শুনতে পাও।

আজকাল প্রায়ই দুই পরিবারের মধ্যে এই ধরনের কথা কাটাকাটি আর ঝগড়াঝাঁটি হয়। মেয়েতে মেয়েতে ঝগড়া হতে হতে পুরুষরা মারামারি করতে শুরু করে দেয়।

এমন সময় লেভাক এসে হাজির হলো। মাহিউর সামনে দাঁড়িয়ে লেভাক

বলল, তোমার স্ত্রী যদি এই ধরনের কথাবার্তা বলে তাহলে তাকে তুমি মার। তা না হলে বুঝব তুমি তাকে সমর্থন করো।

এর পর লেভাক বুতলুপকে ধরে বলল, এই হচ্ছে আমাদের বন্ধু আমাদের বাড়িতে থাকে। এ বলুক, আমার স্ত্রীকে কুড়ি স্যু দিয়েছে কি না।

বুতলুপ বলল, না। এ ধরনের কোন ব্যাপার হয়নি।

মাহিউ লেভাককে বলল, মাথা খারাপ করো না, বাড়ি যাও। তা না হলে আমি একটি ঘুঁষি মেরে তোমার নাক ফাটিয়ে দেব।

এরপর মাহিউ লেভাককে বলল, কে বলল তোমাকে যে আমার স্ত্রী একথা বলেছে? পিয়েরেন?

মাহিউর স্ত্রী হঠাৎ খিল খিল করে হেসে লা লেভাককে বলে উঠল, কি বলেছে জান? বলেছে তুমি একই সঙ্গে তুজন পুরুষের কাছে শোও। একজনের উপরে আর একজনের তলায়।

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে লেভাক আর তার স্ত্রী লা লেভাক রাগে আগুন হয়ে উঠল। ওরা মাহিউদের বলল, পিয়েরেন'ত তোমাদের নামেও যা তা বলে। বলে তোমরা ক্যাথারিনকে বিক্রি করেছ, তোমরা নাকি রোগে ভুগছ সবাই।

মাহিউ বলল, পিয়েরেন একথা বলেছে? চল ত দেখি।

বুতলুপ ঝগড়াঝাঁটি অতসব পছন্দ করে না। ও সরে পডল। মাহিউ লেভাকদের সাক্ষী হিসাবে নিয়ে পিয়েরেনের কাছে চলে গেল।

ওরা সবাই পিয়েরেনের বাড়ির কাছে গিয়ে দেখল, লিডি বাড়ির বাইরে ঘোরাফেরা করছে। লিডি ওদের বলল, ভিতরে ভানসার্ত আছে, তাই তার মা তাকে বার করে দিয়েছে, তার বাবা এখন বাড়ি নেই।

আজই সকালে ভানসার্ত তুজন পুলিস সঙ্গে করে তুশো চল্লিশ নম্বর গাঁয়ে খনিতে কাজের জন্য লোক খুঁজতে আসে মালিকদের নির্দেশে। বলে, তারা যদি আগামী সোমবারের মধ্যে কাজে যোগদান না করে তাহলে কোম্পানি বেলজিয়াম থেকে নতুন লোক এনে খনির কাজ চালাবে। সেই অবসরে ভানসার্ত পিয়েরেনকে তার বাড়িতে একা দেখে পুলিসদের পাঠিয়ে দিয়ে তাদের বাড়িতে ঢুকে পড়ে।

লেভাক হঠাৎ মাহিউকে ফিস ফিস করে বলল, চুপ করো। দেখি ব্যাপারটা। পরে অন্য কথা হবে।

এই বলে ওরা দরজার সামান্য একটু ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে পিয়েরেনের ঘরের ভিতর কি হচ্ছিল তা দেখছিল। লেভাক, লা লেভাক আর মাহিউ পালা করে এক একজন করে উঁকি মেরে দেখার চেষ্টা করতে লাগল। দেখল, ঘরের ভিতর টেবিলে রুটি মদ, কত কি খাবার রয়েছে। ঘরের মধ্যে দাউ দাউ করে আগুন জলছে। এই সব দেখে ওরা ঈর্ষায় জলতে লাগল।

হঠাৎ লিভি এক সময় বলে উঠল, বাবা।

ওরা তখন পিয়েরেনকে নিয়ে পড়ল। পিয়েরেনকে ঘিরে দাঁড়াল ওরা। মাহিউ বলল, তোমার স্ত্রী আমাদের নামে যা তাই বলেছে। আমরা ক্যাথারিনকে বিক্রি করেছি, আমাদের বাড়ির লোক সব বসন্ত রোগে ভুগছে। অথচ তোমার স্ত্রী ঘরেতে কি করছে, কিভাবে টাকা রোজগার করছে তা নিজের চোখেই দেখ।

ওদের এই সব কথাবার্তা আর গোলমাল শুনে পিয়েরেন ঘর থেকে বেরিয়ে এল দরজা খুলে। দরজার উপর দাঁড়িয়ে কি ব্যাপার দেখতে লাগল। মাদামের মুখখানা রাগে লাল হয়ে উঠেছে। তার ঘাডের দিকটা খোলা। ভানসার্ত তার পায়জামাটা ঠিক করে নিচ্ছিল।

লা লেভাক বলল, তোমবা বল, সবার ঘরবাডি ময়লা। কেন হবে না, তোমাদের মত আমাদের ত আর উপরওয়ালাদের ভালবাসা নেই।

লেভাক পিয়েবেনকে বলল, তোমার স্ত্রী বলেছে আমার স্ত্রী নাকি একই সঙ্গে আমাব ও আমার ভাডাটে বুতলুপের কাছে শোয়। একজনের নিচে আর একজনেব উপরে থেকে দুজনকেই একসঙ্গে সঙ্গদান কবে।

এদিকে পিয়েবেনের স্ত্রীও তখন ঘটনার সম্মুখীন হবার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠেছে। সে বলল, যা বলেছি ঠিক বলেছি। চলে যাও তোমরা। আমার স্বামী জানে মঁসিয়ে ভানসার্ত আমাদের বাডিতে কেন আছেন।

পিয়েবেনও তার স্ত্রীকে সমর্থন করল। কিন্তু ঝগড়াটা সহসা মোর ঘুরে অন্য খাতে প্রবাহিত হতে লাগল। লেভাক আর মাহিউ একবাক্যে পিয়েরেনকে বলল, তোমরা কোম্পানির চর। তোমরা বিশ্বাসঘাতক। আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে কোম্পানিকে খবরাখবর দাও, তাই কোম্পানি টাকা দেয় তোমাদের।

এই বলে মাহিউ আর লেভাক দুজনেই পিয়েরেনের মুখে দুটো ঘুঁষি মারল। তার মুখ ফেটে রক্ত বার হতে লাগল। এমন সময় মা ব্রুল এসে সব কথা শুনে বলল, আমার জামাই একটা আস্ত শূয়োর।

এদিকে মাহিউ বাডি ফিরে দেখল, ডাক্তাব তখনো আসেনি। আলজিরের অবস্থা খুবই খারাপ। তার শরীরটা কেমন যেন অসাড় হয়ে গেছে। সে যেন কোন যন্ত্রণাও অনুভব করতে পারছে না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ডাক্তারেব পরিবর্তে যাজক রণভিয়েব এসে পড়ল। আজকাল যাজক রণভিয়ের গাঁয়ের মধ্যে প্রায়ই আসে। ধর্মঘটী গ্রামবাসীদের দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে রণভিয়ের তাদের মধ্যে ধর্মের বাণী প্রচার করে।

মাহিউকে দেখে রণভিয়ের বলল, কি, তোমরা সমবেত প্রার্থনায় সময় যাও না কেন? গত রবিবার আসনি। কিন্তু ভুল করছ। মনে রাখবে একমাত্র চার্চ এবং ধর্মই তোমাদের রক্ষা করতে পারে সমস্ত বিপদ থেকে।

মাহিউর স্ত্রী বলল, প্রার্থনা! কি বলছেন মঁসিয়ে লে কুরে, ঈশ্বর স্বয়ং আমাদের উপহাস করছেন। আমার ছোট্ট মেয়েটা ঈশ্বরের কি করেছিল যে সে আজ জ্বরে কাঁপছে? এত দুঃখ ভোগ করেও আমাদের শাস্তির শেষ হয়নি তাই মেয়েটার আবার অসুখ করল?

যাজক রণভিয়ের বলল, চার্চ আজ গরীবদের পক্ষে। আজ একমাত্র চার্চই অন্যায়কারী ও অত্যাচারী বুর্জোয়াদের উপর ঈশ্বরের সমস্ত অভিশাপ আর দোষ নামিয়ে এনে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত করবেন তোমাদের জগতে। কিন্তু তার জন্য চার্চের পাশে গিয়ে তোমাদের ভক্তি ও নিষ্ঠার সঙ্গে দাঁড়াতে হবে। এইভাবে বিশ্বের সব গরীব যদি চার্চের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়, যদি অকুণ্ঠভাবে নির্ভর করে তার উপর, তাহলে পোপ একাই দুনিয়ার নিঃস্ব নিপীড়িত মানুষদের নিয়ে এমন এক বিরাট জগৎ গড়ে তুলবে যা তোমাদের মুক্তি আনবে চিরকালের জন্য। তাহলে এক সপ্তার মধ্যে সারা পৃথিবী বুর্জোয়াদের অশুভ কবল থেকে মুক্ত হবে।

মাহিউদের হঠাৎ মনে পড়ে গেল, আগে প্রতিদিন সন্ধ্যের সময় এতিয়েনও এমনি করে কথায় কথায় এমনি এক উজ্জ্বল আদর্শ জগতের ছবি ফুটিয়ে তুলত তাদের চোখের সামনে।

মাহিউর স্ত্রী বলল, দেখুন মঁসিয়ে লে কুরে, আপনি যা বলছেন তা শুনতে খুবই ভাল। কিন্তু আজ আপনি একথা বলছেন তার কারণ আপনার সঙ্গে বুর্জোয়াদের ঝগড়া চলছে। আপনি আজ ম্যানেজারদের মত লোকের বাড়িতে লাঞ্চ খান না বলেই শ্রমিকদের প্রতি দরদ দেখাচ্ছেন।

রণভিয়ের এ কথায় না রেগে বলল, বুঝেছি, আজ চার্চ ও জনগণের মধ্যে যে ভ্রান্তির প্রাচীর গড়ে উঠেছে তার জন্য দায়ী একদল শহুরে যাজক যারা ধর্মের নামে বিলাসব্যসনে দিন কাটায়, যারা জনগণ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে রাখে। কিন্তু আমার মতে গ্রাম্য যাজকরা আজও আদর্শভ্রষ্ট হয়নি, তাঁরা গরীব গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় সত্যিই পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য নিয়ে আসতে পারবে।

মাহিউ গর্জন করে উঠল, এসব কথা বলার কোন দরকার নেই। এখন আমাদের একমাত্র দরকার কিছু রুটির।

রণভিয়ের ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় বলল, আগামী রবিবার প্রার্থনায় যাবে। ঈশ্বর তোমাদের রুটির ব্যবস্থা করবেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘরের দরজা খুলে এতিয়েন ঘরে ঢুকল। আজকাল এতিয়েন কোথায় থাকে তা মাহিউরা জানে। কিন্তু তারা একথা আর কাউকে বলেনি। এতিয়েনের অন্তর্ধান সম্বন্ধে আজকাল অনেকে অনেক কথা বলে। কেউ বলে সে সেনাবাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে আসবে তাদের মুক্ত করতে, কেউ বলে সে নাকি এতিয়েনকে গাড়িতে করে কার সঙ্গে যেতে দেখেছে। কিন্তু

বেশীর ভাগ লোকের কাছে তার আগেকার সেই জনপ্রিয়তা অনেক কমে গেছে।

ডাক্তার ভাঁদারহাগেন খুব ব্যস্তভাবে এসে ঘরে ঢুকলেন। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে উঠেছে। কোন আলো বা জ্বালানি ঘরে না থাকায় মাহিউ একটার পর একটা করে দেশলাইএর কাঠি জ্বেলে ডাক্তারকে আলো দেখাতে লাগল। তিনি সেই আলোতে আলজিরেকে পরীক্ষা করলেন। গায়ের ঢাকনাটা খুলে দেখলেন আলজিরের বরফের মত ঠাণ্ডা কঠিন দেহটা নিঃসাড় নিস্পন্দ হয়ে বিছানায় পড়ে আছে।

ডাক্তার কোন ভূমিকা না করেই বললেন, তোমাদের মেয়ে আগেই মারা গেছে। কিছুক্ষণ আগে আর একটি ছেলের মৃত্যু দেখলাম। অনাহারই এই সব মৃত্যু আর অসুখের কারণ। কিন্তু কেন আমাকে ডাক দাও? মাংস আর খাদ্যই হলো এসব রোগের একমাত্র ওষধু।

মাহিউর স্ত্রী ডুকরে কাঁদতে লাগল। কান্নার মাঝে বারবার একটা কথাই বলতে লাগল, হে ঈশ্বর, এবার আমাকে মৃত্যু দাও।

এতিয়েন এ দৃশ্য দেখে বিচলিত হয়ে বলল, বেলজিয়াম থেকে কোম্পানি লোক আনবে। লে ভোরো খনিতে কাজ চালু করবে।

মাহিউ বলল, তাহলে আমরা খনিটা ধ্বংস করে দেব।

এতিয়েন বলল, এখন আর তা পারবে না। সৈন্যরা পাহারা দিচ্ছে। এতিয়েন একটু ভেবে বলল, আর না, এবার আমাদের কোম্পানির কাছে আত্মসমর্পণ করে ধর্মঘট মিটিয়ে ফেলা ভাল। কোম্পানিরও অনেক ক্ষতি হয়েছে। একটা মীমাংসায় আসতে পারে।

মাহিউর স্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে রেগে উঠে বলল, তুমি একথা বলতে পারলে? আমরা এতদিন ধরে এত কষ্ট কি এই জন্য ভোগ করলাম? আমাদের বাড়ির জিনিসপত্র সব বিক্রি হয়ে গেল, আমার মেয়ে মরতে বসেছে, ছেলেরা অনাহারে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে—কিন্তু আত্মসমর্পণ যদি করতে হয় তবে এ সবের কি প্রয়োজন ছিল? আমি সব কিছু পুড়িয়ে ছারখার করে দেব। সবাইকে হত্যা করব, তবু আত্মসমর্পণ করব না। আত্মসমর্পণ করলেই সব সমস্যা মিটে যাবে? তা ত যাবে না। আমাদের সেই অন্যায় অবিচার আবার দিনের পর দিন ভোগ করে যেতে হবে।

এতিয়েন ভাবল, এই মাহিউর স্ত্রী একদিন ধর্মঘট পছন্দ করত না। স্বামীকে রাজনীতি করতে দিতে চাইত না। অথচ আজ সে নিজেই রাজনীতির কথা বলে। গরীবদের রক্তচোষা বুর্জোয়া দস্যুদের শেষ করে এক নতুন সমাজ গড়ে তুলতে চায়।

মাহিউর স্ত্রী বলল, আজ আমার ছেলেরা ক্ষুধায় মরছে। আজ আমার শুধু একটা দুঃখ হচ্ছে সেদিন গ্রেগরিদের মেয়েটাকে হাতে পেয়েও কেন গলা টিপে মারলাম না?

এতিয়েন কি বোঝাতে চাইল, কিন্তু মাহিউর স্ত্রী তা বুঝল না। তার আপোষের কথা সে মানবে না।

এমন সময় হেনরি আর লেনোর বাইরে থেকে ঘরে এল। ওরা এসে বলল, এক ভদ্রলোক দুটো স্যু দিয়েছিল, কিন্তু জাঁলিন তা নিয়ে পালিয়ে গেল। তাদের মা বলল, তারা যদি ভিক্ষে করে তাহলে সে তাদের হত্যা করবে। দরকার হলে মঁতস্যু অঞ্চলের দশ হাজার খনিশ্রমিক দেশের বিভিন্ন জায়গায় ভিক্ষে করে বেড়াবে। তবু মাথা নত করবে না মালিকদের কাছে।

মাহিউর স্ত্রী আবার বুকফাটা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল, হে ঈশ্বর, এবার আমার পালা, এবার আমাকে নাও।

৩

রবিবার সন্ধ্যা আটটার সময় স্যুভারিন র‍্যাসেনোরের মদের দোকানের ভিতর বসেছিল। মাদাম র‍্যাসেনোর দোকানের কাউন্টারে যথারীতি বসে থাকলেও কোন খরিদ্দার ছিল না।

আজকাল কারো হাতে পয়সা না থাকায় কোন শ্রমিক আর মদ খেতে আসে না। তার দোকানটা এই সন্ধ্যের সময়েই একেবারে ফাঁকা।

এমন সময় এতিয়েন এসে ঘরে ঢুকল। র‍্যাসেনোর তাকে সঙ্গে সঙ্গে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলল, বাইরে রাস্তায় ঘুরে বেড়ানোর থেকে এখানে বসে গল্প করা বা কথা বলা অনেক ভাল।

মাদাম র‍্যাসেনোর ভদ্রতা করে এক পাত্র মদ দিল। এতিয়েন তা খেল না।

র‍্যাসেনোর বলল, আমি অনেক আগেই জানতে পেরেছি তুমি কোথায় আছ। আমি ইচ্ছা করলেই তোমাকে ধরিয়ে দিতে পারতাম।

এতিয়েন বলল, ও কথা বলে লাভ নেই। আমি জানি তুমি সে ধরনের লোক নও। মানুষ ভিন্ন মত পোষণ করেও একে অন্যকে শ্রদ্ধা করতে পারে।

স্যুভারিন তার চেয়ারে গিয়ে আবার বসল। সে উঠে পড়েছিল একবার এর মাঝখানে। তার পোল্যাণ্ড হাতে না থাকায় তার হাতটা কি যেন খুঁজছিল।

এতিয়েন বলল, আগামীকাল লে ভোরো খনিতে কাজ শুরু হবে। কোম্পানি বেলজিয়াম থেকে লোক আনবে। নিগ্রেল নিজে লোক নিয়ে এসেছে।

র‍্যাসেনোর বলল, হ্যাঁ একদল লোক আজ এসেছে, এখনো পর্যন্ত কোন খুনোখুনি হয়নি।

একটু থেমে গলার স্বরটা একটু কমিয়ে বলল, দেখ, আমি তর্ক বিতর্ক করছি না। কিন্তু তুমি এখনো যদি গোঁড়া হয়ে থাক তাহলে আমাদের আরো বিপদে পড়তে হবে। মনে রেখো, আজ তোমাদের যে অবস্থার মধ্যে

পড়তে হয়েছে আন্তর্জাতিকেরও সেই অবস্থা। গত পরশু দিন গ্রুশার্তের সঙ্গে আমার দেখা হয়। আমার মনে হলো সে অনুশোচনা করছে। আসল কথা হলো দলাদলি আর মতভেদের ফলে 'আন্তর্জাতিক' ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। প্রথম প্রথম দারুণ প্রচারের ফলে সারা বিশ্বের প্রচুর লোককে এর সদস্য করা হয়। তা দেখে বুর্জোয়ারা ভয়ে কাঁপতে থাকে। কিন্তু দলের মধ্যে দুই শক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এই দুই শক্তি হলো নৈরাজ্যবাদী আর বিবর্তনবাদী। প্রথম দিকে নৈরাজ্যবাদীরা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কিন্তু পরে তাদের ভুল ধরা পড়ে। এখন কে কাকে দল থেকে তাড়াবে সেইটাই হলো বড় কথা। দলের মধ্যে নেতাদের মনে অহঙ্কার আর উচ্চাভিলাষ প্রবল হয়ে ওঠায় অন্তর্দ্বন্দ্ব বেড়ে যাচ্ছে দিনে দিনে। এতে গ্রুশার্তের মন ভেঙে পড়ছে। এখন সে স্বীকার করছে ধর্মঘট করা ঠিক হয়নি।

মাথা নিচু করে এতিয়েন সব কথা শুনল। একদিন আগে সে তার কয়েকজন সহকর্মীর সঙ্গে কথা বলে দেখেছে। তাদের মধ্যে তার আর সে জনপ্রিয়তা নেই। তাদের মনে আজ তিক্ততা আর সংশয় দেখা দিয়েছে। এতিয়েনের মনে পড়ল, এই র‍্যাসেনোর একদিন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল, এমন একদিন আসবে যেদিন শ্রমিকরা ধর্মঘটের দায়দায়িত্ব তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিজেরা সাধু সাজবে, তাদেব চোখে তার জনপ্রিয়তা ম্লান হয়ে যাবে।

এতিয়েন বলল, হ্যাঁ, গ্রুশার্তের মত আমিও এটা স্বীকার করি যে ধর্মঘটটা খুব হঠকারিতার সঙ্গে করা হয়েছে। কিন্তু তখন কোন উপায় ছিল না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ধর্মঘটের ঝুঁকি নিতে হয়েছিল আমায়। যখন কোন কাজের ফল খারাপ হয় তখন মনে হয় এটা আগে হতে আমাদের বোঝা উচিত ছিল।

র‍্যাসেনোর বলল, একথা যদি বুঝতে পেরে থাক তাহলে কেন তা ওদের বুঝিয়ে বলছ না?

এতিয়েন বলল, দেখ র‍্যাসেনোর, তোমার আমার মত ভিন্ন হলেও আমি এখনো তোমাকে শ্রদ্ধা করি। আমাব মনে হলো, আমাদের দেহ অনশনক্লিষ্ট হলেও এইভাবে আমাদের সংগ্রাম করে যাওয়া উচিত। তাতে যদি কোন সৈনিকের বুলেট আমার বুকে এসে বেঁধে ত বিঁধুক।

মাদাম র‍্যাসেনোর বলল, ঠিক বলেছে।

স্যুভারিন আপন মনে বলে যেতে লাগল, মাত্র একটা লোক সব কিছু ধ্বংস করে দিতে পারে। কিন্তু সে ইচ্ছাশক্তি ওদের নেই। এই জন্যই বিপ্লব সার্থক হচ্ছে না। আসলে গোটা মানবজাতিটাই ক্লীব হয়ে পড়েছে। তাদের কোন ক্ষমতাই নেই। রাশিয়ার অবস্থাও ভাল যাচ্ছে না। তার সহকর্মীরা ও যে সব নৈরাজ্যবাদী বিপ্লবীরা একদিন সারা পৃথিবীকে কাঁপিয়ে তুলেছিল আজ তারা জাতীয় স্বাধীনতা লাভ করেই আত্মপ্রসাদে মগ্ন হয়ে আছে। তারা আর কিছু চায় না। তারা আর সারা বিশ্বের শোষিত নিপীড়িত মানুষের কথা ভাবে

না। তারা ভাবে তাদের দেশের বিশেষ কোন শত্রু নিধন হলেই সারা বিশ্ব মুক্ত হবে অত্যাচারীদের কবল থেকে। তাই সে যখন তাদের কাছে পুরনো সমাজব্যবস্থা একেবারে ভেঙ্গে ফেলে নতুন সমাজ গড়ে তোলার কথা বলে তখন তারা তাকে পাগল মনে করে, তার কথাকে পাগলের প্রলাপোক্তি ভেবে উড়িয়ে দেয়।

স্থভারিন বলল, অথচ সে তার ব্যক্তিগত স্থযোগ স্থবিধা, পদমর্যাদা ও উচ্চাভিলাষ ত্যাগ করে আজ সামান্য শ্রমিক হিসাবে কাজ করছে শুধু এই আশাতে যে একদিন তারা এই শ্রমিকশ্রেণীর শ্রমের উপর ভিত্তি করে এক নতুন শ্রেণীহীন সমাজ গড়ে তুলবে। বলল, আসলে তোমরা সব কাপুরুষ, তোমরা মুখে শ্রমিক ঐক্যের কথা বললেও শুধু নিজেদের আপন আপন স্বার্থপূরণের কথা ভাব। কিছুদিন আগে মার্সাই-এর দুজন শ্রমিক যারা টুপী তৈরি করত, লটারীতে এক লক্ষ ফ্রাঁ পেয়েই কাজকর্ম সব ছেড়ে দিয়ে এখন আরাম উপভোগে দিন কাটাচ্ছে অলস ধনীদের মত। আসলে তোমরা বুর্জোয়াদের গালাগালি করলেও তোমরা নিজেরাই এক একজন বুর্জোয়া হতে চাও।

র্যাসেনোর জোরে হেসে উঠল স্থভারিনের কথায়। সে বলল, মার্সাইএর শ্রমিকরা হয়ত ভুল করেছে মানি, কিন্তু তোমার এই ধ্বংসাত্মক আবেগেরও কোন অর্থ হয় না।

স্থভারিন বলল, আমি যদি পারতাম একাই তোমাদের মত বিশ্বের যত সব কাপুরুষ ও ভোগবাদীদের ধ্বংস করে দিতাম। সারা জগৎটাকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দিতাম।

মাদাম র্যাসেনোর সমর্থন করল স্থভারিনকে।

এরপর পোল্যাণ্ডের খোঁজ করতে লাগল স্থভারিন। কিন্তু পোল্যাণ্ড নেই। সে দুটো মরা বাচ্চা প্রসব করেই প্রাণত্যাগ করেছে। কথাটা জানতে পেরে স্থভারিন শোকে অভিভূত হয়ে পড়ল। তার চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

আবেগের সঙ্গে স্থভারিন হয়ত কিছু বলত, কিন্তু হঠাৎ শ্যাভেল ক্যাথারিনকে নিয়ে দোকান ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সকলের দৃষ্টি সেই দিকে গেল। শ্যাভেল ঢুকেই বলল, আমরা দু পাত্র মদ খাব। যে আমাদের পানে আপাদমস্তক তাকাবে তার মুখ আমি ভেঙ্গে দেব। মাদাম র্যাসেনোর, কই দু পাত্র মদ দেখি।

মাদাম র্যাসেনোর সঙ্গে সঙ্গে মদ এনে দিল। শ্যাভেল বলল, মঁতস্থতে আবার কাজ শুরু হচ্ছে। আমরা তাই এই দিনটি উদ্‌যাপন করছি।

এদিকে ঘরের মধ্যে এতিয়েনকে বসে থাকতে দেখে ক্যাথারিন ভয় পেয়ে গেল। তার মুখখানা সাদা ফ্যাকাশে হয়ে গেল এক অঘটনের আশঙ্কায়।

শ্যাভেল বলল, আমি জানি কত লোকে কত কথা বলছে আমার সম্বন্ধে। কিন্তু যার সাহস হবে আমার সামনে বলবে।

এবারেও তার কথার কেউ কোন উত্তর দিল না।

শ্যাভেল আবার বলতে লাগল, আমার লুকোবার কিছু নেই। আমি দেহুলিনের খনি ছেড়ে লে ভোরোতে কাজে ঢুকেছি। আমার অধীনে বারো জন বেলজিয়াম শ্রমিক আছে।

এবার শ্যাভেল ক্যাথারিনের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, কি, মদ খাচ্ছিস কি না? যে সব শূয়োরের দল কাজ করবে না তারা জাহান্নামে যাক।

ক্যাথারিন তার মদের গ্লাসটা শ্যাভেলের গ্লাসে ঠেকাল। কিন্তু তার হাতটা কাঁপতে লাগল। শ্যাভেল তার আগেকার কোন কথার উত্তর না পেয়ে ক্রমশই উত্তেজিত হয়ে উঠছিল। সে আবার বলল, রাত্রিবেলায় যত সব ছুঁচোগুলো বেরিয়ে আসে গর্ত থেকে। কারণ তখন পুলিস ঘুমিয়ে থাকে।

এবার উঠে দাঁড়াল এতিয়েন। শ্যাভেলের কাছে গিয়ে বলল, দেখ, আমি অনেক অপমান সহ্য করেছি। তোমার গা থেকে বিশ্বাসঘাতকতার গন্ধ বার হচ্ছে। তোমার গায়ে হাত দিয়ে আমার হাতকে নোংরা করতে চাই না আমি। কিন্তু আর না। আমাদেব দুজনের মধ্যে চূড়ান্ত ফয়সালা এখনি হওয়া উচিত।

শ্যাভেল ঘুঁষি পাকিয়ে উঠে দাঁড়াল।

এতিয়েন বলল, চলে এস, কাপুরুষ কোথাকার। আমি একাই তোমাকে দেখে নেব। আজ সমস্ত অপমানের জন্য ফলভোগ করতে হবে তোমায়।

ক্যাথারিন ছুটে গিয়ে দুজনের মধ্যে দাঁড়িয়ে ওদের থামাবার চেষ্টা করল। কিন্তু দুজনেই ওকে সরিয়ে দিল। তখন ক্যাথারিন ঘরের একধারে গিয়ে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ওদের পানে তাকিয়ে রইল। র‍্যাসেনোর একবার ওদের থামতে বলল। কিন্তু মাদাম র‍্যাসেনোর তার স্বামীকে বসতে বলল। বলল, ওরা দুজনেই ওদের দোকানের খরিদ্দার। ওরা নিজেদের ঝগড়া নিজেরা ফয়সালা করে ফেলুক। এতে আমাদের হস্তক্ষেপের কিছু নেই।

র‍্যাসেনোর বসে পড়ল। প্রথম দিকে এতিয়েন প্রতিরক্ষাত্মক ভূমিকা নিল। সে শুধু শ্যাভেলের আক্রমণাত্মক ঘুঁষিগুলোর থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলাব চেষ্টা করে যেতে লাগল। শ্যাভেল বলল, আমি আজ তোমার সুন্দর মুখটাকে ঘুঁষি মেরে এমনভাবে বিকৃত করে দেব যাতে আর কোন মেয়ে তোমার পিছনে না ছোটে।

এতিয়েন কোন কথা বলল না। চেহারার দিক থেকে শ্যাভেল তার থেকে বেশ লম্বা চওড়া ছিল বলে তার কিছুটা সুবিধা ছিল। প্রথম প্রথম শ্যাভেল উত্তেজনার বশে যে-সব ঘুঁষি মারল তার অল্পই এতিয়েনের মুখে বা গায়ে লাগে। এতিয়েন সব সময় নিজেকে বাঁচিয়ে চলছিল। শুধু তার কানের কাছটা সামান্য একটু কেটে গিয়েছিল আর ঘাড়ের কাছটায় একটু ছঁড়ে গিয়েছিল। এক সময় ভদ্র লড়াইএর রীতি ভঙ্গ করে শ্যাভেল একটা লাথি মারল এতিয়েনকে।

এতিয়েন বলল, খবরদার লাথি মারবে না, আমি তা হলে চেয়ার দিয়ে তোমার মাথা ভেঙে দেব। এরপর এতিয়েনের একটা ঘুঁষিতে শ্যাভেলের নাক আর একটা চোখ কেটে রক্ত বার হতে লাগল। সে পড়ে গেল। সে ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল। তখন এতিয়েন বলল, উঠে পড়, তারপর আবার দেখা যাক।

কিন্তু শ্যাভেল উঠতে পারল না। তবে সে তার পকেটে হাত ঢুকিয়ে কি বার করছিল। ক্যাথারিন ছুটে গিয়ে এতিয়েনকে সাবধান করে দিল, ও ছুরি এনেছে সঙ্গে, সাবধান।

সত্যিই তার বড় ছুরিটা খুলে শ্যাভেল এবার আক্রমণ করল। এতিয়েন শ্যাভেলের ছুরিধরা হাতের কব্জিটা ধরে ফেলল। কিছুক্ষণ লড়াই চলার পর শ্যাভেলের হাত থেকে ছুরিটা পড়ে গেল।

ছুরিটা এখন এতিয়েনের কবলে আসায় সহসা এক জিঘাংসা প্রবল হয়ে উঠল। প্রতিহিংসার জ্বালাটা অদম্য হয়ে উঠল তার মধ্যে।

আগে মদ খেলে হত্যার প্রবৃত্তি জাগত তার মধ্যে। কিন্তু আজ মদ না খেয়েই শ্যাভেলকে হত্যা করার প্রবৃত্তি প্রকট হয়ে উঠল তার মনের মধ্যে। তবু সে নিজেকে সামলে নিয়ে শ্যাভেলকে বলল, এখনি চলে যাও। তা না হলে তোমাকে আমি খুন করব।

শোচনীয় পরাজয়ের এক তিক্ত গ্লানি বুকে নিয়ে উঠে পড়ল শ্যাভেল। ঘর থেকে চলে যাবার জন্য পা বাড়াল দরজার দিকে। ক্যাথারিনও তার পিছু ধরল। কিন্তু হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে শ্যাভেল বলল, না, তোকে যেতে হবে না। তুই যখন ওকেই চাস মনেপ্রাণে তখন তুই ওর কাছে যা। ওর কাছেই থাকবি শুবি। আমার বাড়িতে আর যদি কখনো পা দিবি ত তোকে খুন করব। প্রাণের মায়া থাকে ত এদিকে পা বাড়াবি না।

এই বলে দরজাটা জোরে বন্ধ করে চলে গেল শ্যাভেল।

৪

র‍্যাসেনোরের দোকান থেকে বেরিয়ে এতিয়েন আর ক্যাথারিন দুজনে নীরবে পথ হাঁটতে লাগল। আকাশে মেঘ থাকলেও মাঝে মাঝে পূর্ণায়ত চাঁদ দেখা যাচ্ছিল মেঘের ফাঁকে ফাঁকে। ঘটনাক্রমে যে নারী তার হাতে এসে পড়েছে সে নারী তার কিছুটা ঈপ্সিত হলেও বিব্রত বোধ করছিল এতিয়েন। কোথায় নিয়ে গিয়ে ক্যাথারিনকে রাখবে তা ঠিক করে উঠতে পারছিল না। কোন কথাই মুখে আসছিল না তার।

একবার এতিয়েন ক্যাথারিনকে বলল, তোমার বাবা মার কাছে তোমাকে রেখে আসি।

কিন্তু তাতে রাজী হলো না ক্যাথারিন। এতিয়েন একবার জিজ্ঞাসা করল,

আমার সঙ্গে যেতে ঘৃণাবোধ করছ না ত ?

ক্যাথারিন বলল, একথার কোন মানেই হয় না। কারণ আমারও একজন পুরুষ আছে আর তোমারও একজন নারী আছে।

ক্যাথারিন মুকেত্তের কথা বলছিল। আজকাল অনেকেই বলাবলি করে এতিয়েন নাকি মুকেত্তের আশ্রয়ে থাকে।

এতিয়েন বলল, একথা মিথ্যা।

ক্যাথারিনের তখন সেই রাতের কথা মনে পড়ল। সেই জ্যোৎস্নারাতে সে কাজ থেকে আসার সময় রেকিলার্তের মাঠের ধারে মুকেত্তের সঙ্গে পাশাপাশি পথ হাঁটতে দেখে এতিয়েনকে।

ক্যাথারিন বলল, তাছাড়া কোন যোগ্যতাই নেই আমাব নারী হিসাবে। যে জীবন আমি যাপন করি তাতে আমার দেহের উন্নতি কোনদিনই হবে না।

কথা বলতে বলতে ওরা মঁতস্যুর দিকে এগিয়ে চলেছিল। হঠাৎ আকাশে একটা মেঘের আড়ালে চাঁদটা ঢাকা পড়ায় একটা ছায়া ওদের ঢেকে দিল। দুজনে দাঁড়িয়ে পড়ল খুব কাছাকাছি। যে চুম্বন যে আলিঙ্গন ওরা কতদিন কামনা করে এসেছে মনে মনে সেই চুম্বন আর আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে ওঠার জন্য আকুল হয়ে উঠল দুজনেই। দুজনেই দুজনকে ধরতে যাচ্ছিল এমন সময় একজন প্রহরীকে দেখে সরে গেল ওরা।

এতিয়েন বলল, বল তাহলে কোথায় যেতে চাও।

ক্যাথারিন সহজভাবে বলল, শ্যাভেলের কাছেই আমি ফিরে যেতে চাই।

এতিয়েন বলল, কিন্তু সে তোমাকে মেরে ফেলবে।

ক্যাথারিন কোন জবাব দিল না। এতিয়েনও তাকে তার সেই গোপন বাসায় নিয়ে যাবার কোন যুক্তি খুঁজে পেল না। তার মত একজন নিঃস্ব পলাতক যার জীবন এক অনিশ্চয়তার সুতোর ডগায় কাঁপছে, কোন নারীর ভার সে নিতেই পারে না। সুতরাং শ্যাভেলের কাছেই তাকে পাঠিয়ে দেওয়া ভাল।

বিদায় নেবার সময় ক্যাথারিন তার হাতটা বাড়িয়ে দিল এতিয়েনের দিকে। এতিয়েন সে হাতটা অনেকক্ষণ ধরে রেখে দিল। ছাড়তে চাইছিল না। ক্যাথারিন আস্তে আস্তে সেটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, তুমি বেশী দূর এসো না। তোমাকে দেখতে পেলে ঝামেলা করবে।

শ্যাভেলের বাসায় চলে গেল ক্যাথারিন। কিন্তু এতিয়েন তবু চলে যেতে পারল না। ক্যাথারিন ফিরে গেলে তাকে দেখে কি প্রতিক্রিয়া হয় শ্যাভেলের তা শোনার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। কোন এক নারীকণ্ঠের আর্ত চিৎকার শোনার জন্য উৎকর্ণ হয়ে রইল সে। কিন্তু এতিয়েন দেখল কোন চিৎকার করল না। বাড়িটা আগের মত স্তব্ধ হয়ে রইল। হঠাৎ দেখল দোতলায় শ্যাভেলের বাসার জানালাটা খুলে গেল আর তার থেকে আলোর একটা রশ্মি বেরিয়ে এল। ক্যাথারিন এতিয়েনকে লক্ষ্য করে বলল, ও এখনো ফিরে আসেনি,

আমি বিছানায় শুতে যাচ্ছি। দয়া করে চলে যাও।

এতিয়েন এবার রেকিলার্তের পথে এগিয়ে যেতে লাগল একা একা। হঠাৎ ক্যানেলের ধারে মাঠের মাঝখানে যেতেই এতিয়েন দেখতে পেল একজন সৈনিক প্রহরী রাইফেল হাতে পায়চারি করছে। সে একবার মার্শিয়েনের দিকে মুখ করে পঁচিশ পা এগিয়ে যাচ্ছে আর একবার মঁতস্যুর দিকে মুখ করে ফিরে আসছে। এমন সময় হঠাৎ একটা ছায়ামূর্তি যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল সৈনিকটার ঘাড়ের উপর। চাঁদের উপর থেকে ভাসমান একখণ্ড মেঘ সরে যেতেই এতিয়েন দেখল জঁালিন একটা চকচকে বড় ছুরি সৈনিকটার ঘাড়ের উপর কণ্ঠার কাছে আমূল বসিয়ে দিল। মুহূর্তে চিৎ হয়ে পড়ে গেল সৈনিকটি। ছুরিটা তার ঘাড়ে গাঁথাই রইল।

এতিয়েন ছুটে গিয়ে জঁালিনকে জিজ্ঞাসা করল, এ কাজ কেন তুমি করলে ?

জঁালিন বলল, তা জানি না। তবে জানি ওরা আমাদের শত্রু।

এতিয়েন বলল, এখন কি করা যায় মড়াটাকে নিয়ে ?

একবার ভাবল ক্যানেলের জলে ফেলে দেবে। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবল সেটা ভেসে উঠবে। তখন সে ঠিক করল জঁালিনের সাহায্যে সে মৃতদেহটা সেই অচল খাদটার গর্তে নিয়ে গিয়ে সকলের অলক্ষ্যে অগোচরে কবর দেবে।

এতিয়েন মৃতদেহটার গলায় একটা রুমাল বেঁধে ঘাড়ের দিকটা তুলে নিল আর জঁালিন পা দুটো তুলে ধরল। এইভাবে দুজনে অতিকষ্টে সেই অন্ধকার খনিগর্ভে নিয়ে গেল। কোনক্রমে মই দিয়ে দুশো মিটার নিচে মড়াটাকে নিয়ে গেল।

সৈনিকের মৃতদেহটাকে ওরা এমন এক জায়গায় সমাহিত করল সেই অচল খনিগর্ভের মধ্যে যেখানে ছাদটা খুব নিচু। অনবরত পাথর খসে পড়ছে ছাদ থেকে। কোন রকমে গুঁড়ি মেরে সেখানে গিয়ে মৃতদেহটা রেখে আসতেই সঙ্গে সঙ্গে সেটা ঢেকে গেল পাথরের টুকরোয়। এতিয়েনের মনটা খারাপ হয়ে গেল, এই সৈনিককে সে চিনতে পেরেছে, এর নাম জুলি। এর সঙ্গে একদিন কথা বলে আলাপ করেছিল সে। তার মনে হলো, আজ ঠিক এই মুহূর্তে হয়ত কোন সমুদ্রের ধারে কোন অজানা দেশের এক গৃহদ্বারে জুলির মা আর বোন তার পথ চেয়ে বসে আছে। অথচ তারা জানে না জুলি আর কোনদিন ফিরবে না তাদের কাছে। এতিয়েন বুঝতে পারল না এ কেমন ধরনের সমাজ যেখানে গরীব গরীবকে মেরে ধনীদের সুবিধা করে দেয়।

ওরা ওদের বিছানার কাছে ফিরে এল। জঁালিন বাতিটা হাত থেকে নামিয়েই তার খড়ের বিছানায় শুয়ে পড়ল। সারাদিন অযথা পরিশ্রম আর ঘোরাঘুরির জন্য ক্লান্তিতে শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল জঁালিন। তার নাক ডাকতে লাগল।

কিন্তু আলোটা নিবিয়ে দিয়ে এতিয়েন শুয়ে পড়লেও তার ঘুম এল না। তার

কেবলি মনে হতে লাগল যেন কার সজাগ দীর্ঘশ্বাস ক্রমশই নিকটে আসছে তার। তাকে ঘিরে ফেলছে সেই শব্দটা। মনে হলো জুলি রাইফেল হাতে এগিয়ে আসছে তার দিকে। সে যেন স্পষ্ট তার পায়ের শব্দ শুনতে পেল। ভয়ে গাটা কাঁটা দিয়ে উঠল এতিয়েনের। সে বাতিটা জ্বালল, কিন্তু কোথাও কিছু দেখতে পেল না।

কিন্তু আলো নিবিয়ে দিয়ে শুতেই আবার সেই ভয়টা পেয়ে বসল তাকে। কিছুতেই ঘুম এল না। তার উপর জাঁলিনের নাক ডাকার শব্দটা দুঃসহ ঠেকল তার কাছে।

হঠাৎ কি মনে হলো, বিছানা ছেড়ে বাইরে যাবার জন্য উঠে পড়ল এতিয়েন। মই বেয়ে উপরে উঠে খাদের বাইরে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সে। রাত্রি তখন দুটো। আজই শেষ রাত্রিতে তাদের মহাপরীক্ষা। লে ভোরোর খনিতে বেলজিয়াম শ্রমিকরা কাজ করতে নামবে আর তার প্রতিবাদ করার জন্য দুশো চল্লিশ নম্বর গাঁয়ের ধর্মঘটী শ্রমিকরা খনির বাইরে জড়ো হবে। দরকার বুঝলে তারা সৈন্যদের কর্ডন ভেদ করে এগিয়ে যাবে। গুলি খাবে। তবু কাজ চলতে দেবে না।

এতিয়েন দেখল এখনো কিছুটা দেরি আছে। তাই সে ইতস্ততঃ ঘোরাফেরা করতে লাগল।

এতিয়েনের হঠাৎ মনে হলো, সে নিজে একটা অপদার্থ, কাপুরুষ। সামান্য জাঁলিনের মত একটা অর্বাচীন ছেলের যে সাহস আছে সে সাহস তার নেই। জাঁলিন কত অবলীলাক্রমে একটা সৈনিককে মেরে ফেলল, অথচ সে শ্যাভেলের মত একটা বিশ্বাসঘাতক শয়তানকে হাতের মুঠোর মধ্যে তার ছুরির নাগালের মধ্যে পেয়েও ছেড়ে দিল। কাউকে হত্যা করার সাধ্য বা সাহস যখন তার নেই তখন তাকেই মরতে হবে। সে নিজে মৃত্যুবরণ করবে।

ধীরে ধীরে জানতে পারল এতিয়েন একজন সৈনিক নিখোঁজ হওয়ায় সৈনিকদের মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু তারা ঘটনাস্থল তদন্ত করে দেখল কোন দুর্ঘটনা ঘটার চিহ্ন নেই। তারা বুঝল সৈনিকটি হঠাৎ পালিয়ে গেছে কাজ ছেড়ে।

হঠাৎ একটা অদ্ভুত কথা মনে হলো এতিয়েনের। সেদিন সে জুলির কাছে কথায় কথায় জানতে পেরেছিল ওদের ক্যাপ্টেন রিপাবলিকান বা সমাজতন্ত্রী। সুতরাং তার আশা জাগল হয়ত ক্যাপ্টেনকে সব কথা বুঝিয়ে বললে সে ধর্মঘটী শ্রমিকদের বাধা দেবে না, হয়ত এইভাবে সেনাবাহিনীর লোকরা মেহনতী মানুষদের দুঃখ হৃদয়ঙ্গম করে তাদের রাইফেল একদিন বুর্জোয়াশ্রেণীর দিকেই উঁচিয়ে ধরবে।

রহস্যময় দূরান্বিত এই আশার তাড়নায় সহসা মৃত্যুকামনাটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলল এতিয়েন। অদূরাগত এক নতুন দিনের উজ্জ্বল সম্ভাবনায় মত্ত

হয়ে উঠল সে।

এমনি করে দেখতে দেখতে পাঁচটা বেজে গেল। কিন্তু কোন বেলজিয়াম শ্রমিককে খনির পথে আসতে দেখল না। পবে এতিয়েন বুঝল, কোম্পানি শ্রমিকদের রাত্রে খনির এলাকার মধ্যেই থাকার ব্যবস্থা করেছিল বুদ্ধি করে যাতে ধর্মঘটী শ্রমিকদের সঙ্গে তাদেব কোন সংঘর্ষ না বাঁধে। পরে দেখল দুশো চল্লিশ নম্বব গাঁয়েব কয়েকজন এখানে সেখানে দাঁড়িয়ে পিকেটিং করছে যাতে কোন শ্রমিক খনিতে যেতে না পারে। এর পর দেখা গেল মাহিউ ও তার স্ত্রীব নেতৃত্বে প্রায় পঁয়ত্রিশ জনেব মত একটা দল হাত তুলে বিক্ষোভ জানাতে জানাতে এগিয়ে আসছে খনিব দিকে।

এতিয়েনকে দেখে তাকে প্রাতঃ নমস্কার জানাল তারা। কিন্তু এতিয়েন কোন উত্তর দিল না। সাবা রাতের মধ্যে তার একেবারে ঘুম না হওয়ায় তার চোখ দুটো লাল দেখাচ্ছিল।

হঠাৎ এতিয়েনেব নজর পডল দূবে ক্যাথারিনের মত দেখতে একজন মেয়ে লে ভোবোব খনিব দিকে এগিয়ে আসছে।

এতিয়েনকে বিদায় দিয়ে ক্যাথাবিন শ্যাভেলের ঘবে যেয়ে বিছানায় শুয়ে ছিল। ভেবেছিল শ্যাভেলেব বাগ পড়ে যাবে তাকে দেখে। এই ভেবে সে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পডেছিল। কিন্তু মাঝরাতে শ্যাভেল ঘরে এসে ক্যাথারিনকে দেখেই চটে যায়। সে তার কান ধবে তাকে উঠিয়ে ঘব থেকে তাড়িয়ে দেয়। তার সঙ্গে পুনর্মিলনের আর কোন আশা না দেখে আবার পথে বেরিয়ে পড়ে ক্যাথারিন। বুঝতে পারে, তখন এতিয়েনকে ছেডে দিয়ে ভুল করেছে সে।

ক্যাথারিন একবার ভাবল তার বাবা মার কাছে ফিরে যাবে। কিন্তু সাহস পেল না যাবার। তাবপর সে এখানে সেখানে এলোমেলোভাবে ঘোবাফেরার পর খনির দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। ভাবল শ্যাভেল কাজে যোগ দিতে এলে তাকে আর একবার অনুরোধ করবে। অবশ্য যদিও সে বেশ বুঝতে পেরেছে তাতে কোন ফল হবে না। কিন্তু খালি পেটে অনাহারে শীতে কাঁপতে কাঁপতে কোথায় যাবে সে ?

হঠাৎ শ্যাভেলকে দেখতে পেল ক্যাথাবিন। শ্যাভেল খনিটাব আশেপাশে ঘোরাঘুবি কবছিল। সে কাজ করার জন্য ঢুকতে চায়। তার সুযোগ খুঁজছিল। ক্যাথারিন শ্যাভেলেব চওড়া পিঠটা পুরো দেখতে পেল। কিন্তু তার কাছে যাবার সাহস পেল না। কাবণ শ্যাভেল আগেই বলে দিয়েছে, সে যদি লে ভোরো খনিতে কাজ করতে যায় তার সঙ্গে তাহলে তার গলা টিপে মারবে। জাঁ বার্ত খনিতে কাজ একেবারে বন্ধ। ক্যাথারিনেব মত অশক্ত অপটু মেয়ে তার সঙ্গে কাজ কবলে তাব সুনাম খাবাপ হয়ে যাবে মালিকদের কাছে।

ক্যাথারিন দেখল একটা কাঠের গাদায় বসে জাঁলিনের নেতৃত্বে লিডি আর বেবার্ত পাহারা দিচ্ছে। কে কোন দিক থেকে খনিতে কাজে যাচ্ছে তা দেখছে।

ঝাঁলিন আজ রাতের শেষে তার বাসা থেকে উঠে এসেছে। লিভি আর বেবার্তকে পাহারায় নিযুক্ত করেছে।

হঠাৎ জোরে বিউগল বেজে উঠল। সচকিত হয়ে উঠল সবাই। প্রহরীরা বন্দুক হাতে খাড়া হয়ে দাঁড়াল। ক্যাথারিন দেখল এতিয়েন ছুটে আসছে। চারদিক থেকে আরো ধর্মঘটী শ্রমিক আসছে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে করতে।

৫

লে ভোরো খনিতে ঢোকার মাত্র একটা পথ খোলা রেখে আর সব পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই খোলা পথটার দুদিকে ষাট জন সৈনিক পাহারায় আছে। অবাঞ্ছিত একটি লোকও ঢুকতে পারবে না। এতিয়েন শুনল খনির ভিতরে হানিবো যায়নি, নিগ্রেল আর ভানসার্ত আছে।

ধর্মঘটী শ্রমিকদের যে দলটা গাঁ থেকে এসেছিল তারা এতক্ষণ খনি থেকে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে থেকে সব কিছু লক্ষ্য করছিল। দূর থেকে মাহিউ তার স্ত্রীকে উত্তেজিত করছিল। তার স্ত্রীর কোলে তার ছোট মেয়ে এস্তেলে ছিল।

এমন সময় বেকিলার্ত থেকে বুড়ো মুকে খনিতে ঢুকতে চাইল। ধর্মঘটীরা তাকে বাধা দিলে সে বলল, ঘোড়াগুলো তার হাতে পালিত। তার যাওয়া উচিত। তাদের ঠিকমত খাওয়া হবে না সে না গেলে। তারা ত আর শ্রমিক বিক্ষোভের কথা কিছু জানে না। তাছাড়া একটা ঘোড়া মারা গেছে। তাকে উপরে তুলে আনতে হবে।

এতিয়েন তাকে ছেড়ে দিতে বলল। প্রহরারত সৈনিকরা তার ভিতরে যাবার পথ করে দিল।

কিছুক্ষণ পর দেখা গেল যে মৃত ঘোড়াটাকে নিচের থেকে তুলে আনা হলো সে হলো ট্রম্পেট নামে সেই নতুন ঘোড়াটা যে কোনদিন খনিগর্ভের অন্ধকার জীবনধারার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারেনি কোনমতে। বহুদিন পর বহু অন্ধকার অনাহার পার হয়ে তার বহু আকাঙ্খিত পৃথিবীপৃষ্ঠের মুক্ত আলো হাওয়ার মাঝে ফিরে এল ট্রম্পেট। কিন্তু তার বুভুক্ষু চেতনার সমস্ত নিবিড়তা দিয়ে সে-আলো হাওয়া আর উপভোগ করতে পারল না। তার বিশাল মৃত-দেহটা পৃথিবীর মাটির উপর এক অবাঞ্ছিত বোঝাভাবের মত পড়ে রইল।

এদিকে ধর্মঘটী শ্রমিকদের সংখ্যা ক্রমশই বাড়তে লাগল। দুশো চল্লিশ নম্বর গাঁ থেকে আর একটা মোটা রকমের দল এল বিক্ষোভ দেখাতে দেখাতে। সমবেত শ্রমিকদের সশব্দ বিক্ষোভের ঢেউ উত্তাল হয়ে উঠতে লাগল ক্রমশঃ।

এতিয়েন শ্রমিক বিক্ষোভের ক্রমবর্ধমান রূপ দেখে শঙ্কিত হয়ে উঠল। সে ক্যাপ্টেনের কাছে এগিয়ে গেল। তাকে শান্ত করা যায় কি না তা একবার চেষ্টা করে দেখতে গেল। কিন্তু সমাজতন্ত্রের প্রতি কিছুটা ঝোঁক থাকা সত্ত্বেও

ক্যাপ্টেন তার কর্তব্যপরায়ণতার দিকে নজর দিল বেশী। সে পরিষ্কার বলে দিল, আর এগোবার চেষ্টা করবে না। আমাকে আমার কর্তব্য পালন করতেই হবে। যদিও সৈনিকদের গুলি ছোঁড়ার হুকুম দেওয়া হয়েছে, তবু বলা হয়েছে যতদূর সম্ভব বুঝিয়ে কাজ সারতে হবে। একমাত্র আর কোন উপায় না থাকলে নিছক কর্তব্যের খাতিরে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য গুলি চালাবে তারা।

ক্যাপ্টেন তাই শ্রমিকদের লক্ষ্য করে তাদের শান্ত হবার জন্য অনুরোধ করল। সে দেখল, বিক্ষোভকারী শ্রমিকের সংখ্যা বেড়ে বেড়ে এখন প্রায় চারশোতে দাঁড়িয়েছে। মাত্র ষাট জন সৈনিক কখনো এই বিরাট বিক্ষুব্ধ জনতার সঙ্গে পেরে উঠবে না। বিক্ষোভকারীদের সংখ্যা ক্রমশই বাড়ছে দেখে সে আরো সৈনিক পাঠাবার জন্য খবর দিল 'সেনাবাহিনীর স্থানীয় হেডকোয়ার্টারে।

এদিকে ব্যাপার দেখে এতিয়েনও বিপদে পড়ল। সে দেখল জনতা যেভাবে মারমুখী হয়ে উঠেছে তাতে তাদের আর শান্ত করা কোন মতেই সম্ভব নয়। সুতরাং সৈনিকদের সঙ্গে লড়াই অনিবার্য। সে লড়াই যদি সত্যি সত্যিই বাধে তাহলে বহু লোক আহত ও নিহত হবে।

বিক্ষোভকারী শ্রমিকরা এগিয়ে এসে সৈনিকদের বলল, তোমরা খনি ছেড়ে চলে যাও। তোমাদের সঙ্গে আমাদের কোন শত্রুতা নেই। আমাদের ব্যাপার আমাদের বুঝে নিতে দাও।

লেভাক দাঁত খিঁচিয়ে বলে উঠল, তোমরা যাবে না তোমাদের খুন করতে হবে ?

শ্রমিকদের তরফ থেকে প্ররোচনা ক্রমশই বাড়তে দেখে ক্যাপ্টেন রেগে উঠল। সে বলল, তোমরা এরকম ব্যবহার করলে এবং ক্রমশই এগিয়ে আসার চেষ্টা করলে সৈনিকরা বাধ্য হয়ে গুলি চালাবে।

তখন অনেকে জামা খুলে বুক পেতে এগিয়ে এল। বলল, চালাও গুলি কত চালাবে। আমরা এখানে চারশো আছি। এ ছাড়া আমাদের মোট সংখ্যা হলো দশ হাজার।

ক্যাপ্টেন তার সৈনিকদের প্রথমে মৃদু বেয়নেট চার্জ করার হুকুম দিল।

মাহিউর স্ত্রী হঠাৎ এগিয়ে এসে মাহিউকে উত্তেজিত করে বলতে লাগল, তুমি এখনো দাঁড়িয়ে রয়েছ ? আমার কোলে ছেলে রয়েছে তাই, তা না হলে ওদের দেখিয়ে দিতাম।

সৈনিকদের উপর চাপ ক্রমশঃ বাড়তে লাগল। তাদের বেষ্টনী ভেদ করে বিক্ষোভকারীরা এগোতে চাইল। তারা জোর করে ঢুকে খনির কাজ বন্ধ করে দেবে।

এইভাবে এগিয়ে যেতে গিয়ে অনেকের গা ছিঁড়ে যেতে লাগল বেয়নেটের খোঁচায়। তবু ওরা শুনল না। এদিকে হঠাৎ কোথা থেকে মা ক্রল এসে খুব

বাড়াবাড়ি করতে লাগল। সে তার কুঞ্চিত চামড়া ঢাকা কঙ্কালসার হাত দুটো তুলে অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিতে লাগল সৈনিকদের। তারপর জোর করে তাদের গায়ের উপর পড়ে ঠেলতে লাগল।

তবু নিজেকে সামলে নিল ক্যাপ্টেন। মুখে তবু বোঝাতে লাগল। কিন্তু হঠাৎ যখন জনতা ইট পাটকেল ছুঁড়তে লাগল তখন আর থাকতে পারল না ক্যাপ্টেন। ইতিমধ্যে বুড়ো ডেপুটি রিকোমি একবার বেরিয়ে এসে শ্রমিকদের বোঝাবার চেষ্টা করল। বলল, আমার কথা শোন, আমিও একদিন শ্রমিক ছিলাম। এভাবে নিজেদের বৃথা মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিও না।

কিন্তু তার কথা কেউ শুনল না। প্রথমে সৈনিকরা তিনটে গুলি ছুঁড়ল, তাতে লিভি আর বেবার্ত মুখ থুবড়ে পড়ে মারা গেল। দ্বিতীয় দফায় যে গুলি ছুঁড়ল তাতে মা ক্রুল সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল।

তৃতীয় দফার গুলিতে জনতা একেবারে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। আর সে গুলিতে মাহিউ আর মুকেত্তের বুক দুটো বিদ্ধ হয়ে গেল। এতিয়েন নিজে যে মৃত্যু কামনা করেছিল সে মৃত্যু পেল না। সবচেয়ে দুঃখ হচ্ছিল এতিয়েনের মাহিউর জন্য। তার মৃতদেহটা তখনো পড়ে ছিল।

মাহিউর স্ত্রী সকরুণ কণ্ঠে মাহিউকে তখনো বলছিল, কি কথা বলছ না কেন? তোমার কি খুব লেগেছে?

এতিয়েন দেখল খনির আশেপাশে কেউ নেই। জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে কোথায় পালিয়ে গেছে। হঠাৎ যাজক রণভিয়ের এসে হাজির হলো। সমবেত প্রার্থনার পর চার্চ থেকে বেরিয়েছিল। ঘটনার বিবরণ সব কিছু শুনে প্রাচীন কালের ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষদের মত আকাশে দুহাত তুলে বুর্জোয়াদের উপর রোষাগ্নি বর্ষণ করার জন্য প্রার্থনা করতে লাগল। বলল, বিশ্বে সেই দিন শান্তি নেমে আসবে, অত্যাচারী বুর্জোয়ারা নির্মূল হবে সেদিন, যেদিন স্বর্গ থেকে অগ্নিবৃষ্টিরূপে ঈশ্বরের অভিশাপ নেমে আসবে।

সপ্তম খণ্ড

১

সেদিনকার গুলিচালনার ঘটনাটা খাস প্যারিস শহরকেও কাঁপিয়ে তুলেছিল। সমস্ত খবরের কাগজগুলো ফলাও করে ঘটনার নিখুঁত বিবরণ দেয়। খবরের কাগজে দেখা যায় মঁতসু খনিশ্রমিকদের উপর গুলি চালনার ফলে মোট পঁচিশ জন আহত হয়, চোদ্দ জন নিহত এবং অনেকে গ্রেপ্তার হয়।

এই ঘটনার বিবরণ শুনে কোম্পানির মালিকপক্ষ বিশেষভাবে বিচলিত হয়ে পড়ে। ঘটনার পর বুধবার দিন সকালে তিনজন ডিরেক্টর লে ভোরো খনিতে এসে নিজেরা সব কিছু তদন্ত করে দেখলেন।

তাঁরা এসে ধর্মঘটী শ্রমিকদের প্রতি তাঁদের শুভেচ্ছার পরিচায়ক হিসাবে কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন। প্রথমে তাঁরা খনির মুখ থেকে সেনাবাহিনী উঠিয়ে দিলেন। পরে তাঁরা বেলজিয়াম থেকে আনা ভাড়াটে শ্রমিকদের ছেড়ে দিলেন। তারপর ঘোষণা করলেন, যে সব ধর্মঘটী শ্রমিক কাজে যোগদান করবে তারা বিশেষ সুযোগ সুবিধা পাবে।

সমস্ত প্রাচীরে কোম্পানির তরফ থেকে এক হলুদ পোস্টার চিটিয়ে দেওয়া হলো। তাতে লেখা ছিল :

মঁতসুর শ্রমিকবৃন্দ! যে ভুল আপনারা সম্প্রতি করেছেন এবং যে ভুলের ভয়াবহ ও শোচনীয় পরিণাম আপনারা স্বচক্ষে দেখেছেন, আমরা চাই না সেই ভুল আবার অনুরক্ত ও কাজে যোগদানেচ্ছু শ্রমিকদের জীবিকার্জন থেকে বঞ্চিত করুক। সুতরাং আমরা এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, আগামী সোমবার দিন সমস্ত খনিগুলি খোলা হবে এবং তাতে কাজ পুনরায় শুরু হবে আমরা যে সব বিষয়ে কোন না কোনভাবে উন্নতি সম্ভব সেই সব বিষয়গুলি যত্নসহকারে পরীক্ষা ও পুনর্বিবেচনা করে দেখব। যা ন্যায়সঙ্গত ও আমাদের সাধ্যায়ত্ত তা আমরা অবশ্যই করব।

এই নোটিশটা চার্চের প্রাচীরেও আঁটা ছিল। এ নোটিশ মঁতসুর খনি অঞ্চলের দশ হাজার শ্রমিকের চোখে পরলেও তারা গুরুত্ব দিল না এটাকে। অনেকে ঘাড় নেড়ে চলে গেল।

কোম্পানির প্রস্তাবে সবচেয়ে কড়া ভাব দেখাতে লাগল দুশো চল্লিশ নম্বর গাঁয়ের শ্রমিকরা। এত কিছু সত্ত্বেও আগের মতই অনমনীয় রয়ে গেল তারা। খনিতে ঢোকার পথে যে রক্তপাত হয়েছে সেই রক্তের লাল রেখা যেন আজ এক অনতিক্রম্য বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের কাজে যোগদানের পথে। তারা বলল, কোম্পানির কথা মোটেই স্পষ্ট নয়। তারা স্পষ্ট করে তাদের ঘোষণায় বলেনি তারা কোন ধর্মঘটী শ্রমিকের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা কিছু নেবে কি না। তাছাড়া শ্রমিকরা কাজে যোগ দিলে কি সুযোগ সুবিধা দেবে তাও স্পষ্ট করে কিছু বলেনি। আর তা না বললে তারা কোনমতেই কাজে যোগদান করতে পারে না।

তবে সারা গাঁয়ের মধ্যে মাহিউদের বাড়িটাকে আজ সবচেয়ে অন্ধকার আর নিরানন্দ দেখাচ্ছে। আলজিরে আর মাহিউর পর পর দুটি মৃত্যু বিষাদঘন এক শোকের ছায়ায় নিয়ত ঢেকে রেখেছে বাড়িটাকে। মাহিউর মৃত্যুর পর থেকে তার স্ত্রী একটা কথাও বলেনি। সেদিন এতিয়েন ক্যাথারিনকে অর্ধচেতন ও কর্দমাক্ত অবস্থায় এই বাড়িতেই নিয়ে আসে। মাহিউর স্ত্রী তাতে বাধা

দেয়নি। আজকাল এতিয়েন এই বাড়িতেই থাকে এবং জাঁলিনের সঙ্গে এক বিছানায় শোয়। সেদিন থেকে এতিয়েন আর রেকিলার্তের সেই অন্ধকার অচল খনিগর্ভে শুতে যায়নি। মৃত সৈনিকের প্রেতাত্মার ভয়টা আজও কাটিয়ে উঠতে পারেনি। এখানে শুলে পুলিস যদি তাকে ধরে ত ধরুক। কারাগারে যেতে মোটেই ভয় পায় না এতিয়েন। বরং এভাবে বেকার অবস্থায় থাকার থেকে কারাগারে যাওয়া অনেক ভাল।

সেদিন বেহুঁস হয়ে পড়া ক্যাথারিনের জল-কাদায় ভেজা পোষাক খুলতে তার তলপেটের কাছে এক চাপ রক্ত দেখতে পায় তার মা। তখন তার মা ভাবতে থাকে হয়ত তার তলপেটে গুলি লেগেছে। কিন্তু পরে দেখল ওটা গুলির রক্ত না, ক্যাথারিনের অবরুদ্ধ রজের রক্তস্রাব। ক্যাথারিনের বয়স পনের হলেও এতদিন সে রজঃস্বলা হয়নি। রজ পরিষ্কার না হওয়ার জন্য নারীসুলভ বৃদ্ধি ঘটে নি তার দেহে। সেই কারণে সে সন্তান ধারণ করতে পারেনি গর্ভে। তার দেহে নারীসুলভ পুষ্টি বা বৃদ্ধি হয়নি বলে মাঝে মাঝে আক্ষেপ করত ক্যাথারিন।

আজ সেই রজঃ পরিষ্কার হলেও তার মা এটা এক নতুন দুর্ভাগ্যের সূত্রপাত বলে মনে করল। কারণ এবার ক্যাথারিন কোন পুরুষের সঙ্গে সহবাস করলেই সন্তান ধারণ করতে পারবে গর্ভে। এতদিন সে ভয় ছিল না। আর সেই সন্তান একদিন অভিশপ্ত শ্রমিকরূপে পুলিস বা সৈনিকের গুলিতে মরবে।

পাঁচ দিন পর একদিন বিকালের দিকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পথে পথে বেড়াতে লাগল এতিয়েন। সেদিনকার গুলি চালনার ঘটনার পর থেকে তার জনপ্রিয়তা একেবারে কমে গেছে। আজকাল সে পথে বার হলে কোন লোক তাকে কোন সম্ভাষণ করে না। বরং মুখখানা ভারী করে তার দিকে কটমট করে তাকায়। মেয়েরা তাকে ঘর থেকে দেখেই জানালার পর্দাটা টেনে নেয়। ধর্মঘট সম্পর্কিত সমস্ত দুঃখ আর দুর্ঘটনার জন্য এক নীরব নিরুচ্চার অভিযোগে যেন স্তব্ধ হয়ে আছে গাঁয়ের সব লোক। এতিয়েনের মনে হলো যে কোনদিন সে অভিযোগ সোচ্চার হয়ে ফেটে পড়বে তাদের মুখে।

একদিন ক্যাথারিন তার মাকে বলল, সে লে ভোরো খনিতে কাজ করতে যেতে চায়। শুধু শুধু বসে আছে। সে যদি কাজ করে আর জাঁলিনের একটা কাজ যোগাড় করে দিতে পারে তাহলে কোনরকমে তাদের দিন চলতে পারে। তাদের বাড়িতে এখন সব নিয়ে সাত জন খেতে।

কিন্তু একথায় রেগে উঠল মাহিউর স্ত্রী। সে বলল, একথা বলতে পারলি ? যে কাজ বন্ধ করার জন্য তোর বাবা প্রাণ দিল অকালে সেই কাজ তুই করতে যাবি ? এ কাজ যে করতে যাবে আমি তার গলা টিপে মারব।

স্বামীর শোকটা এখনো ভুলতে পারেনি মাহিউর স্ত্রী। তাদের বাড়ির দৈনন্দিন জীবনযাত্রার স্রোতটা আগের মতই বইতে লাগল আবার। তবে এখন

কাউকে কাজে যেতে হয় না। শুধু দুজন বিদায় নিয়েছে এই সংসার থেকে। তারা হলো মাহিউ আর আলজিরে। যে বড় বিছানাটায় মাহিউর স্ত্রী একা শোয় সেটা বড় ফাঁকা ফাঁকা মনে হয়, তার ছোট্ট কয়েক মাসের মেয়ে এস্তেলে সে বিছানার খালি অংশটা পূরণ করতে পারে না। ক্যাথারিন একা শোয়, কারণ আলজিরে আর তার কাছে শোয় না। হেনরি আর লেনোর আগের মতই এক বিছানায় শোয়, এতিয়েন শোয় জাঁলিনের সঙ্গে।

মাহিউর স্ত্রী একসময় বলল, আমাদের জন্য তোদের ঠাকুর্দাকে কোম্পানি কোন বৃত্তি দেবে না।

ক্যাথারিন বলল, কেন, ওরা যা ঘোষণা করেছে তাতে মনে হয় অনেক সুযোগ সুবিধা দেবে।

এস্তেলে টেবিলের উপর হামাগুড়ি দিতে দিতে হঠাৎ পড়ে গেল। মাহিউর স্ত্রী তখন বিরক্ত হয়ে বলল, ছেলেগুলো সব মরল না কেন ওদের বাপের সঙ্গে। সব মলে আমি বাঁচতাম।

এই বলে দেওয়ালের দিকে মুখ করে কান্নায় ভেঙে পড়ল মাহিউর স্ত্রী। এতিয়েন তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বলল, ধৈর্য অবলম্বন করো, সব ঠিক হয়ে যাবে।

মাহিউর স্ত্রী তখন এতিয়েনকে লক্ষ্য করে বলল, তুমি কি করবে? তুমিও কি খনিতে কাজ করতে যাবে? আমি তোমাকে দোষ দিচ্ছি না। তবু এসব কাণ্ড ত তোমার সৃষ্টি। আমি যদি তোমার মত অবস্থায় পড়তাম তাহলে লজ্জায় আত্মহত্যা করতাম।

এতিয়েন বুঝল, এখন যুক্তি দিয়ে মাহিউর স্ত্রীকে বোঝানো যাবে না। এর পর বাড়িতেও আর থাকা যায় না। তাই সে নিরুপায় হয়ে বেড়িয়ে পড়ল বাড়ি থেকে।

কিন্তু বাড়ি থেকে বেরিয়েই দারুণ বিপদে পড়ল এতিয়েন। তাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে ঘৃণা আর অপমানসূচক নানা কথা বলে চিৎকার করতে লাগল সব লোক। লেভাক জেলে গেছে। মা লেভাক এতিয়েনকে দেখে তার ছেলে বেবার্তের জন্য শোকে ফেটে পড়ল। বলল, আমার ছেলে যেখানে আছে সেখানে গিয়ে আমার ছেলেকে এনে দে। ভাল লোকরা জেলে ভরা আছে আর উনি হাওয়া খেতে বেরিয়েছেন।

পিয়েরেন বলল, আমার মা কোথায়?

জ্যাকারি বলল, এতগুলো লোকের মাথা খেয়ে ওর শরীরটা বেশ মোটা হয়েছে।

কোন দিকে পালাবার পথ পেল না এতিয়েন। যেখানে যেদিকে সে যায় এক ক্রুদ্ধ জনতা তাকে তাড়া করে নিয়ে যায়। ঘুরতে ঘুরতে র‍্যাসেনোরের দোকান আভান্তেজের কাছে এসে পড়ে এতিয়েন। এমন সময় হঠাৎ কোথা

থেকে বুড়ো মুকে ও শ্যাভেল এসে পড়ে। বুড়ো মুকের ছেলে মুকেত আর মেয়ে মুকেত্তে দুজনেই মারা গেছে। সে এখনো লে ভোরো খনিতে সেই পনিম্যানের কাজই করে।

এতিয়েনকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে ছেলে মেয়ের প্রতি অবদমিত শোকাবেগটা হঠাৎ উথলে উঠল মুকের। সে বলল, তুমিই আমার ছেলেমেয়ের মৃত্যুর জন্য দায়ী। দাঁড়াও, তোমাকে দেখাচ্ছি।

এই বলে একটা ইট ভেঙ্গে টুকরো করে তা ছুঁড়তে লাগল এতিয়েনের দিকে। শ্যাভেলও পুরনো প্রতিহিংসার বশে ছুটে গেল এতিয়েনের দিকে। এর আগেই এতিয়েনের বাঁ হাতটা জখম হয়ে পড়েছে। এবার সে ক্লান্ত হয়ে হাঁপাচ্ছিল।

হঠাৎ র‍্যাসেনোর তার দোকানের বাইরে দাঁড়িয়ে তাকে ডাকল। বলল, চলে এস, কথা আছে।

তবু ইতস্ততঃ করছিল এতিয়েন। র‍্যাসেনোর দরজা খুলে আবার ডাকল। বলল, তুমি চলে এস, আমি ওদের সঙ্গে কথা বলছি।

এরপর অন্য কোন উপায় না দেখে দোকানঘরে ঢুকে পড়ল এতিয়েন। ঘরের পিছন দিকে আড়াল দেখে একটা জায়গায় বসে পড়ল।

এতিয়েন স্পষ্ট শুনতে পেল, র‍্যাসেনোর জনতাকে বোঝাচ্ছে। বলছে, আমি তোমাদের নিষেধ করেছিলাম ধর্মঘট করতে, আমি তোমাদের বলেছিলাম শান্তির পথ ধরতে। কিন্তু তোমরা শোননি। তোমরা তখন বোঝনি এক দিনে কেউ কখনো কোন নতুন জগৎ গড়ে তুলতে পারে না। সময় লাগে।

জনতা চুপ করে মন দিয়ে র‍্যাসেনোরের কথা শুনছে। র‍্যাসেনোর তার হারানো জনপ্রিয়তা আবার ফিরে পেয়েছে।

এতিয়েনের হঠাৎ সেদিনকার সেই ভাঁদেমের বনে নৈশ জনসভার কথা মনে পড়ল। সেদিন কি বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল সে। তিন হাজার মানুষের আশাতুর হৃদয় তার হাতের মুঠোর মধ্যে এসে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। র‍্যাসেনোরের একটা কথাও শুনতে চায়নি তারা। সেদিন র‍্যাসেনোর কিন্তু এক অভিজ্ঞ ভবিষ্যদ্বক্তার মত তাকে সাবধান করে দিয়েছিল। চপলমতি জনতার অকৃতজ্ঞতার প্রতি সচেতন করে দিয়েছিল তাকে। কিন্তু তার সে কথা সেদিন শোনেনি। কারণ সে জনপ্রিয়তার মদে মাতাল হয়ে উঠে ভবিষ্যতের কথা ভুলে গিয়েছিল সব একেবারে।

ঘরের দরজাটা বন্ধ ছিল। এতিয়েন ভিতর থেকে স্পষ্ট শুনতে পেল, জনতা র‍্যাসেনোরকে সমর্থন করে তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। বলছে, ঠিক বলছে, এই হচ্ছে আমাদের আসল নেতা।

র‍্যাসেনোর ঘরে ঢুকে পড়তেই জনতা শান্ত হয়ে চলে গেল। র‍্যাসেনোর ঘরে ঢুকে দু পাত্র মদ নিয়ে দুজনে খেল। দুজনেই দু জনের পানে নীরবে তাকাল।

এদিকে সেইদিন সন্ধ্যেবেলায় লা পাওলেনের বাড়িতে এক ভোজসভায় পল নিগ্রেল আর সিসিলের বিয়ের কথাটা পাকাপাকিভাবে ঘোষণা করা হলো।

সে সভায় দেহুলিন আর তার মেয়েরাও নিমন্ত্রিত হয়েছিল। কিন্তু সে সভার কোন আনন্দ স্পর্শ করতে পারেনি দেহুলিনের মনকে। কারণ সেই দিন সকালেই সে তার ভাঁদেম খনি মঁতস্যু কোম্পানিকে বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছে।

অথচ সে আগে বহু প্রলোভন সত্ত্বেও ভাঁদেম খনি বিক্রি করতে চায়নি কিন্তু যে অটুট দৃঢ়তার সঙ্গে সে তার সিদ্ধান্তে অটল থেকে এসেছে এত দিন, কত কষ্ট সহ্য করেছে, একটা প্রতিকূল ঘটনার আঘাতে সে দৃঢ়তা ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেল।

কিন্তু মঁসিয়ে গ্রেগরি এই খনি বিক্রির জন্যই বাহবা দিল তাকে। তাকে জড়িয়ে ধরে অভিনন্দন জানাল এই সিদ্ধান্তে সে অবশেষে আসতে পেরেছে বলে।

২

রবিবার রাত্রিতে গাঁ থেকে বেরিয়ে পড়ল এতিয়েন। গাঁয়ের বাইরে ক্যানেল পার হয়ে মার্সিয়েন শহরের পথে এগিয়ে চলল সে। হঠাৎ নক্ষত্রের স্বল্প আলোয় এতিয়েন দেখল ক্যানেলের বাঁধ ধরে আর একজন যাচ্ছে মার্সিয়েনের পথে।

কাছে গিয়ে এতিয়েন চিনতে পারল। বলল, তুমি স্যুভারিন?

স্যুভারিন নীরবে শুধু ঘাড় নাড়ল। এরপর দুজনে পাশাপাশি পথ চলতে লাগল। এগিয়ে যেতে লাগল নিঃশব্দে। এতিয়েন প্রথমে নীরবতা ভঙ্গ করে বলল, খবরের কাগজ দেখেছ? প্লুশার্তের কৃতিত্বের কথা তাতে ছাপা হয়েছে। বেলভিনের জনসভার পর লোকে লাইন দিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে যায়।

স্যুভারিন তাচ্ছিল্যভরে হাসল। যে সব বাগ্মী রাজনীতিতে যোগ দিয়ে আইনজীবীদের মত কথার ফুলঝুরি ফুটিয়ে টাকা করতে চায় তাদের মোটেই দেখতে পারে না স্যুভারিন।

এতিয়েন আজকাল ডারউইনের সুলভ ও সংক্ষিপ্ত সংস্করণ পড়ছে। সংক্ষিপ্ত সংস্করণ পড়ে অর্থাৎ ডারউইনের সব কথা না পড়ে বা না জেনে বিবর্তনবাদের ভুল ব্যাখ্যা করেছে সে। তার ভুল ধারণা হয়েছে। তার ধারণা যাদের দেহগত বল বেশী তারাই টিকে থাকবে আর যারা কম বলবান তারা পৃথিবী থেকে সবংশে মুছে যাবে। এই পৃথিবীতে যোগ্যতমদেরই স্থান আছে, অন্যদের চলে যেতে হবে। এর থেকে এতিয়েন ধরে নিয়েছে পৃথিবীতে শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যা বেশী বলে তারা সহজেই বুর্জোয়াদের জগৎ থেকে উৎখাত করবে। কিন্তু

এতিয়েন বুঝতে পারে না বিবর্তনের ধারা শুধু সংখ্যাগত বা পরিমাণগত শক্তির উপর ভিত্তি করে চলে না, বুদ্ধিগত শ্রেষ্ঠত্বই জীবজগতের স্থায়িত্বের মূল কারণ।

যেতে যেতে হঠাৎ যেন ভূত দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল স্থভারিন। অথচ এঁতিয়েন দেখল সামনে কিছুই নেই। স্থভারিন বলল, আমি তোমাকে কোন দিন আমার স্ত্রীর কথা বলেছি ?

এতিয়েন অবাক হয়ে ঘাড় নাড়ল। সে বুঝে উঠতে পারল না, যে মানুষটি জগতের সব মানুষ ও বস্তু সম্পর্কে একেবারে উদাসীন, সে আজ কেন স্ত্রীর কথা মনে করল। এতিয়েন তার স্ত্রীর সম্বন্ধে শুধু শুনেছিল সে মাস্টারি করত আর মস্কোতে তার ফাঁসি হয়।

হঠাৎ স্বপ্নাবিষ্টের মত তার স্ত্রীর কথা বলতে লাগল স্থভারিন। বলল, তার মৃত্যুর দিন শেষ সময়ে আমি তার কাছে ছিলাম। সেদিন মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছিল। সেই বৃষ্টির মাঝেও ভিড় জমেছিল পাবলিক স্কোয়ারে। ভিড়ের মধ্যে আমারই খোঁজ করছিল আনুষ্কা। সে একটা পাথরের উপর দাঁড়িয়ে ছিল। প্রথমটা সে আমায় দেখতে পায়নি। পরে আমার উপর তার চোখ পড়ল। আমি চোখ ফেরাতে পারছিলাম না। তার পর অনেক কষ্টে আমার টুপীটা নাড়িয়ে চলে গেলাম আমি সেখান থেকে। আজ আমি সম্পূর্ণ মুক্ত। আমার কেউ নেই—কোন আত্মীয়স্বজন, স্ত্রীপুত্র, বন্ধু বান্ধব কেউ নেই। আমি অবলীলাক্রমে অকুণ্ঠভাবে যেমন নিজের জীবন দান করতে পারব, তেমনি পরের জীবন নিতেও পারব।

এতিয়েন কোন তর্ক না করে বলল, আমরা কথা বলতে বলতে অনেক দূর এসে পড়েছি। এবার ফিরতে পারি কি ?

ওরা দুজনে আবার লে ভোরোর দিকে ফিরে আসতে লাগল। এতিয়েন বলল, আজ আবার কোম্পানি নোটিশ দিয়েছে দেখেছ ?

স্থভারিন বলল, না।

এতিয়েন বলল, কোম্পানি আজ নতুন বিজ্ঞপ্তি মারফৎ জানিয়ে দিয়েছে, ওরা শ্রমিকদের আরো কিছু সুযোগ সুবিধা দিয়েছে। ওরা সব ধর্মঘটী শ্রমিকদের কাজে যোগদান করতে বলেছে। এমন কি ধর্মঘটে যারা নেতৃত্ব করেছে সেই সব উগ্রপন্থী শ্রমিকদের বিরুদ্ধেও কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। এ বিষয়ে তুমি কি মনে করো ?

স্থভারিন বলল, সব শেষ হয়ে গেল। এবার সকলে ভেড়ার পালের মত খনিতে কাজ করতে ছুটবে। আসলে তোমরা সবাই কাপুরুষ।

এতিয়েন যুক্তি দেখিয়ে স্থভারিনকে বোঝাতে চাইল। একজন লোক সাহস দেখাতে বা দৃঢ় থাকতে পারে, কিন্তু ক্ষুধার্ত জনতা কতদিন না খেয়ে আদর্শ বজায় রাখতে পারে?

সে ভোরোর খনির কাছে এসে এতিয়েন ভাবল, সে নিজে কাজে যাবে না কোনদিন। কিন্তু সে কাউকে বাধা দেবে না কোনভাবে। এতিয়েন এক সময় স্তভারিনকে বলল, জান, খাদের অবস্থা খুব খারাপ। যে কোন সময়ে ছাদ ধসে পডতে পারে। কোম্পানিকে বলতে গেলে সেই এক কথা বলবে। বলবে তারা আগে কয়লা চায়, মেরামতের কাজ পরে হবে। যাক, যত তাড়াতাড়ি খনিটা ধ্বংস হয় ততই ভাল।

স্তভাবিন বলল, কিন্তু তুমি তোমার লোকদের এই খনিতে কাজে যেতে বলেছ।

মঁতস্থর বড ঘড়িতে ঢং ঢং করে রাত্রি নটা বাজল। স্তভারিন বিদায় নেবার সময় বলল, বিদায়, আমি চলে যাচ্ছি।

এতিয়েন আশ্চর্য হয়ে বলল, চলে যাচ্ছি মানে ?

স্তভারিন বলল, আমি আমার কার্ড ফিরে চেয়েছি। আমি এখান থেকে চিরদিনেব মত চলে যাচ্ছি।

এতিয়েন বলল, তুমি কাজ ছেড়ে দিয়েছ ? কোথায় যাচ্ছ ?

স্তভাবিন বলল, কোথায় যাব তা এখনো ঠিক করিনি।

এতিয়েন বলল, আমাদেব আবার কখন দেখা হবে ?

স্তভারিন বলল, কোন সম্ভাবনা নেই। তাছাড়া আমি তা চাই না।

এতিয়েন বলল, তাহলে বিদায়।

স্তভারিন বলল, বিদায়।

বিদায় নিয়ে এতিয়েন গাঁয়ের ভিতব চলে গেল। স্তভারিন ধীর পায়ে সে ভোবোর খনিব পথে হাঁটতে লাগল। প্রথমে শহরে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়িয়ে অবশেষে রাত্রি বারোটা বাজলে সে খনিতে গেল।

রাত্রি তখন দুটো বাজে। খনিতে কাজ আরম্ভ হতে এখনো এক ঘণ্টা দেরি আছে। স্তভারিন তার কোট ফেলে এসেছে বলে কোটটা আনার নাম করে খনির ভিতবে চলে গেল।

স্তভারিন মিস্ত্রি, সে খাদের মধ্যে কোথায় কি যন্ত্রপাতি আছে তা জানে। সে খনিটাকে একেবারে বিধ্বস্ত করে চলে যেতে চায় যাতে একেবারে অচল হয়ে পড়ে। কিন্তু এই মুহূর্তে যদি সেই ধ্বংসকার্য সাধিত হয় তাহলে কোম্পানি তা মেরামত করার সময় পাবে। সে তাই এ খনির প্রাণকেন্দ্রটাকে এমনভাবে এক মারাত্মক আঘাত হেনে গেল যাতে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এর মৃত্যু হতে পারে।

কাজ সেবে স্তভাবিন যখন জরুরী নিষ্ক্রমণেব পথ দিয়ে বেরিয়ে এল খনি থেকে তখন রাত্রি তিনটে বাজে।

এদিকে এতিয়েন তখন মাহিউদের বাডিতে গিয়ে চুপচাপ শুয়ে পড়ল বিছানায়। জ্যাঁলিন তার পাশে শুল।

হঠাৎ শেষ রাতের দিকে ঘুমটা ভেঙ্গে গেল এতিয়েনের।. তার মনে হলো ঘরের মধ্যে খসখস একটা শব্দ হচ্ছে। ঘরখানা অন্ধকার বলে কিছু দেখতে পেল না। সে হাত দিয়ে দেখল জাঁলিন তার কাছে শুয়ে আছে। তাই সে বিছানা থেকে উঠে দুহাত বাড়িয়ে ধীর গতিতে ক্যাথারিনের বিছানার দিকে এগিয়ে গেল।

হঠাৎ ক্যাথারিনের গায়ে তার হাত ঠেকে যাওয়ায় এতিয়েন বুঝল ক্যাথারিন তার বিছানায় বসে রয়েছে। এতিয়েন বলল, একি, তুমি উঠে বসে আছ?

প্রথমে কোন উত্তর দিল না ক্যাথারিন। পরে বলল, হ্যাঁ, আমি কাজে যাব।

এতিয়েন নীরবে তার বিছানায় তার পাশে বসল। ক্যাথারিন তাকে চুপিচুপি বুঝিয়ে বলল, দেখ, কোন কাজ না করে এভাবে বেঁচে থাকা যায় না। আমি খনিতে কাজ করতে যাব, সেখানে যদি শ্যাভেল আমাকে অপমান করে ত করবে। আমার টাকা যদি মা না নেয় ত আমি নিজেই আমার খবচ চালাব। সুতরাং তুমি তোমার বিছানায় শুতে চলে যাও। আমার কথা মাকে কিছু দয়া কবে বলো না।

কিন্তু এতিয়েন গেল না। সে ততক্ষণে এক নিবিড় সহানুভূতিতে ক্যাথাবিনেব কোমড়টা জড়িয়ে ধরেছে। ক্যাথারিন প্রথমে এতিয়েনেব হাতের বাঁধন থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য চেষ্টা করল। কিন্তু ওরা দুজনেই তখন এত নিবিড়ভাবে ঘেঁষাঘেঁষি করে বসেছে যে দুজনেই দুজনের দেহের উত্তাপ অনুভব করছে। ক্যাথারিন প্রথম প্রথম এতিয়েনেব হাত দুটো সরিয়ে দেবার চেষ্টা করলেও এবার সে নিজেই তার দু হাত বাড়িয়ে এতিয়েনেব গলাটা জড়িয়ে ধরে তাকে টেনে নিল নিজের বুকের মধ্যে। দুজনেই দুজনের বাহু দিয়ে ইপ্সিত দেহদুটোকে জড়িয়ে ধবে শুয়ে রইল বুকে বুক দিয়ে। এতিয়েনের মনে হলো এইভাবে ও ক্যাথারিনের বুকে একটুখানি স্থান পেলে জীবনের সব দুঃখকষ্ট ও অভাব অনটন সহ্য কবে যেতে পাববে হাসিমুখে।

বেশ কিছুক্ষণ এইভাবে থাকার পর ক্যাথারিন এতিয়েনকে বলল, এবার যাও শোওগে, আমি খনিতে কাজ করতে যাবই।

এতিয়েন বলল, তুমি যদি একান্তই যাও তাহলে আমিও তোমার সঙ্গে যাব কাজ করতে।

ক্যাথাবিন বলল, লোকে তাহলে তোমাকে টিটকারি দেবে, বিদ্রূপ করবে। আমার জন্য এত ত্যাগ কেন তুমি করছ?

এতিয়েন তবু শুনল না। দুজনে পোষাক পড়ল অন্ধকারে। তারপর কোন শব্দ না করে অতি সাবধানে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মাঝখানে মাহিউর স্ত্রী একবার জেগে উঠেছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার ঘুমিয়ে পড়ে।

পথে স্যুভারিনের সঙ্গে দেখা হলো ওদের। স্যুভারিন এতিয়েনকে বলল, একি, তুমিও কাজে যাচ্ছ?

এতিয়েন বলল, হ্যাঁ, যাচ্ছি।

স্যুভারিন অনেক করে নিষেধ করা সত্ত্বেও এতিয়েন যখন শুনল না, স্যুভারিন তখন তার করমর্দন করে বিদায় দিল তাকে।

অন্ধকারে পাথরের মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে এতিয়েন আর ক্যাথারিনের পথ চলার পানে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল স্যুভারিন।

৩

রাত চারটে থেকে খনিতে শ্রমিকদের নামার কাজ শুরু হলো। ভানসার্ত নিজে টাইমকীপারের অফিসে থেকে সব শ্রমিকদের নাম লিখে রাখছিল আর তাদের হাতের ল্যাম্পটা পরীক্ষা করে দেখছিল। সব শ্রমিককে যেতে দিচ্ছিল ভানসার্ত। হঠাৎ এতিয়েনকে দেখে বিস্ময়ে লাফিয়ে উঠল ভানসার্ত। বলল, একি, কঠিন লৌহমানবটি হঠাৎ নরম হলো কি করে?

যাই হোক, এতিয়েন আর ক্যাথারিনকেও ছেড়ে দিল ভানসার্ত। কিন্তু ওরা হঠাৎ শ্যাভেলকে দেখতে পেয়ে ঘাবড়ে গেল। ক্যাথারিন ভাবল শ্যাভেল বোধ হয় আবার একটা গোলমাল বাধাবে। কিন্তু এবার শ্যাভেল ক্যাথারিনকে লক্ষ্য করে দু একটা বিদ্রূপাত্মক কথা বললেও বেশী কিছু করল না। শ্যাভেল ডেপুটির নির্দেশে এতিয়েন-ক্যাথারিনের দলেই কাজ করতে বাধ্য হলো। ওদের কাজ পড়ল খাদের নিচে মুখ থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে উত্তর দিকের গ্যালারীর শেষ প্রান্তে। ওদের কাজ ছাদ থেকে পথের উপর ধস নেমে যে সব পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সেই সব পথ পরিষ্কার করা। গাঁইতি নিয়ে এতিয়েন, শ্যাভেল আর সব পুরুষরা ধসের পাথরগুলো ভেঙ্গে দিচ্ছিল আর ক্যাথারিন ও কয়েকজন কমবয়সী ছেলে সেইগুলো কুড়িয়ে ড্রামে ভরছিল।

ডেপুটি কাছে থাকার জন্য ওরা বেশী কথা বলতে পারছিল না। তবু শ্যাভেল আর এতিয়েন দুজনেই পুরনো প্রতিহিংসার বশে কথা কাটাকাটি করছিল। মাঝে মাঝে হাতাহাতি হচ্ছিল তাদের মধ্যে এবং তাদের ছাড়িয়ে দিতে হচ্ছিল জোর করে। শ্যাভেল ঘুরে ফিরে কেবল ক্যাথারিনের কাছে গিয়ে বিভিন্ন অজুহাতে তার গায়ে হাত দিচ্ছিল বলে এতিয়েন খুব রেগে যাচ্ছিল।

ভানসার্ত এল বেলা আটটার সময়। এসেই ছাদের অবস্থা দেখে রেগে গেল। ছাদ থেকে প্রায়ই ধস নামায় রাস্তা বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। ভানসার্ত তাই সবাইকে অন্য সব কাজ ফেলে ছাদে কাঠের ঠেকা দেবার কাজ করতে বলল।

অজানা এক আসন্ন বিপদের আভাসে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল সকলের মন। কাজে ওদের কিছুতেই ভালভাবে মন বসছিল না। ক্যাথারিন বলল,

আমি ওদিকে রাস্তা পরিষ্কার করতে গিয়ে ডেকে কারো সাড়া পেলাম না। মনে হয় ওরা সবাই চলে গেছে।

আসল খাদের অবস্থা দেখে অনেকে বাইরে যাবার জন্য ডুলির কাছে গিয়ে ভিড় জমিয়েছে। এদিকে এতিয়েনের দল উত্তর দিকের এক প্রান্তে যেখানে কাজ করছিল সেখানটা ডুলির মুখ থেকে তিন কিলোমিটার দূরে। এতিয়েনদের তাই মনে হচ্ছিল ওরা যেন খাদের অন্যান্য কর্মরত শ্রমিকদলের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। তাছাড়া তাদের মনে হচ্ছিল কোথায় যেন কি একটা গোলমাল হয়েছে অথবা কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে। তাই এক অজানিত শঙ্কায় শঙ্কিত হয়ে উঠল তাদের মন।

এতিয়েনরা ভয়ে ভয়ে এগিয়ে চলল ডুলির কাছে। ওখান থেকে উপরে উঠে যাবে। কিন্তু ওরা যতই এগিয়ে যেতে লাগল ততই কোথা থেকে ক্রমাগত জলের ধারা এসে ওদের পথটা ভাসিয়ে দিচ্ছিল। অল্প সময়ের মধ্যেই ওদের কাছে এক হাঁটু জল দাঁড়িয়ে গেল। তাছাড়া উপর থেকে জল পড়ছিল সশব্দে। জলপ্রপাতের মত পতনশীল জলস্রোতের শব্দ আসছিল। কিছুদূর গিয়ে ওরা পিয়েরেনকে দেখতে পেল। পিয়েরেনও কিছু বুঝতে পারছিল না। সে ভানসার্তকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে ভানসার্ত রেগে গেল। এমন কি মুকে যখন তার বুড়ো ঘোড়া বাতেলকে নিয়ে কয়লার টব টানার জন্য অনত্র নিয়ে যাবার জন্য চেষ্টা করছিল তখন বাতেলও মুখ উঁচু করে কি এক অজানা বিপদের আভাস পেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

হঠাৎ একটা জোর শব্দ হলো বজ্রগর্জনের মত। ওরা সভয়ে দেখল ওদের পথের উপর একটা বিরাট ধস নামল আর সঙ্গে সঙ্গে অনেকটা জল এক সঙ্গে কোথা হতে পড়ে গেল। ওরা কোনরকমে পাশ কাটিয়ে বাঁচিয়ে নিল নিজেদের।

ভানসার্ত একবার উপরে উঠে গিয়ে কি ব্যাপার দেখার কথা ভাবছিল। কিন্তু হঠাৎ দ্বিতীয়বার একটা ধস নামল। সে তখন চিৎকার করে ডেপুটিদের হুকুম দিল তারা যেন খাদের সব জায়গায় কর্মরত শ্রমিকদের সাবধান করে দেয়।

এর পর ভয়ার্ত শ্রমিকরা সকলেই পালাবার জন্য ছোটাছুটি করতে লাগল। সকলেই খাদ থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য ডুলির কাছে বেগে এগিয়ে যেতে লাগল। অনেকে জরুরী নিষ্ক্রমণের সেই মইটা দিয়ে উপরে ওঠার কথাও ভাবল। কিন্তু একজন লোক সেখানে যেতে গিয়ে ফিরে এসে বলল, সে মইএর কাছে যাবার পথ বন্ধ। ধস নেমে পথ আটকে গিয়েছে বিভিন্ন জায়গায়। এই সব ধস নামার ফলে দুজন লোক তাতে চাপা পড়েছে।

সমস্ত শ্রমিক আপন আপন প্রাণ বাঁচাবার জন্য মরীয়া হয়ে ডুলির কাছে এসে ভিড় করে দাঁড়াল। কিন্তু একটা ডুলি একদল শ্রমিককে নিয়ে এইমাত্র

উঠে গেছে। আবার এ ডুলি কখন ফিরে এসে তাদের নিয়ে যাবে তার ঠিক নেই। একটা ডুলি খারাপ হয়ে গেছে। আর একটার তারগুলো এমন ক্ষীণ ও অশক্ত হয়ে পড়েছে যে তা যে কোন সময়ে ছিঁড়ে পড়ে যেতে পারে।

এত সব সত্ত্বেও ভানসার্ত খাদের মধ্যে শৃংখলা বজায় রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করছিল। সে শ্রমিকদের সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াতে বলছিল। ভানসার্তের নিজেরও ভয় হচ্ছিল। কারণ তখন ক্রমাগত যেখানে সেখানে ধস নামছিল আর মুষলধারে বৃষ্টি পড়ার মত সশব্দে জল ঝরে পড়ছিল। ভানসার্তের মনে হচ্ছিল যে কোন সময়ে সে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে জীবন্ত সমাধি লাভ করবে। অথচ সব শ্রমিককে উপরে না পাঠিয়ে সে নিজে যেতে পারে না।

অতি কষ্টে এতিয়েনের দল অনেক দূর থেকে অনেক জলমগ্ন ধসনামা পথ পার হয়ে যখন ডুলির কাছে এসে পৌঁছল তখন ওরা দেখল, শেষবারের মত ডুলিটা উপরে উঠে গেল। কারণ ডুলিটা খাদের মাটি ছেড়ে উপরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে একটা বড় ধস নেমে ডুলি নামার পথ রোধ হয়ে গেল। তার মানে এই ডুলি আর ফিরে আসবে না। তাদের উদ্ধারের আর কোন আশা নেই। তারা আছে সংখ্যায় কুড়ি জন। এদিকে ওরা যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানে জল বাড়তে বাড়তে ওদের জানুর কাছ পর্যন্ত উঠে এসেছে। ক্যাথারিন অতিশয় অবসন্ন হয়ে পড়েছিল বলে এতিয়েন তাকে দুহাতে করে তুলে নিল কাঁধে।

ভানসার্ত উপরে উঠেই নিগ্রেলের খোঁজ করতে লাগল।

নিগ্রেল চিৎকার করে তাকে শুধল, কি ব্যাপার?

ওভারম্যান ভানসার্ত বিষণ্ণ মুখে বলল, খাদটা শেষ হয়ে গেল একেবারে।

ভানসার্তের কথাটা যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না নিগ্রেলের। এত তাড়াতাড়ি এই ধরনের ধ্বংস কি করে সম্ভব? সে জিজ্ঞাসা করল, সব লোক উঠে এসেছে ত?

ভানসার্ত আমতা আমতা করে বলল, হ্যাঁ সব এসেছে।

নিগ্রেল বলল, সব লোক আসার আগেই তুমি এলে কেন?

এর পর কত জন উপরে উঠে এসেছে আর কত জন নিচে আটকা পড়ে আছে তা গণনা করা হলো। কতগুলো ল্যাম্প শ্রমিকরা নিয়েছিল আর কতগুলো ফিরে এসে জমা পড়েছে তা গুণে দেখলেই বোঝা যাবে।

ল্যাম্প গুণে দেখা গেল আজ ভোরে তিনশো বাইশটি ল্যাম্প শ্রমিকদের দেওয়া হয়েছিল। তার জায়গায় দুশো পঞ্চান্নটা ল্যাম্প জমা পড়েছে। কিন্তু তাতেও ঠিকমত হিসাব পাওয়া গেল না। কারণ অনেকে বলল, অনেক শ্রমিক ভয়ে খাদের নিচেই ল্যাম্প ফেলে পালিয়ে এসেছে। এর পর রোল কল করার কথা হলো। কিন্তু তাতেও কোন ফল হবে না। কারণ সন্ত্রস্ত শ্রমিকরা উপরে এসেই ছুটে পালিয়ে গেছে গাঁয়ের দিকে। তবে এঞ্জিনীয়ার নিগ্রেলের কাছে একটা জিনিস স্পষ্ট হয়ে উঠল। সেটা হলো এই যে বেশ কিছু লোক এখনো

খাদের নিচে আটকে আছে।

নিগ্রেলের তখন একমাত্র লক্ষ্য হলো নিচের থেকে অবরুদ্ধ লোকদের উদ্ধারের ব্যবস্থা করা। এদিকে খবর পেয়ে গাঁ থেকে দলে দলে মেয়েরা তাদের আত্মীয় স্বজনদের খোঁজে ছুটে আসছে। নিগ্রেল তার লোকদের বলল, ওদের কাছে আসতে দেবে না। তাহলে উদ্ধারকার্য ব্যাহত হবে।

খাদের আশেপাশে উদ্বিগ্ন জনতার ভিড় ক্রমশই বাড়তে লাগল। সকলেই নিগ্রেলের কাছে নিচে আটকে পড়া শ্রমিকদের নাম জানতে চাইল। জনতা একবাক্যে বলতে লাগল, নাম বলুন। নাম বলুন।

নিগ্রেল বলল, সব নাম আমরা এখনো জানতে পারিনি। জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই জানানো হবে। আপনারা এখনি অশান্ত বা হতাশ হবেন না। এখনো উদ্ধারকার্যের আশা আছে।

কিন্তু অপেক্ষমান জনতার মধ্যে মেয়েরা তাদের আটকেপড়া আত্মীয়দের জন্য শোকে দুঃখে কাঁদতে লাগল। সমবেত ক্রন্দন আর বিলাপের ধ্বনিতে ভরে উঠল সমস্ত জায়গাটা। নিগ্রেল ডুলির কাছে খনির মুখটার কাছে গিয়ে কান পেতে শুনল, পতনশীল জলের শব্দকে ছাপিয়ে অসংখ্য আর্ত মানুষের চিৎকার ভেসে আসছে। নিগ্রেল ব্যস্তভাবে ভানসার্তকে বলল, চল আমার সঙ্গে, নিচে যাব, দেখি কতজন আটকে পড়েছে।

ভানসার্ত ইতস্ততঃ করছে দেখে সে বলল, ঠিক আছে। আমি নিজেই যাব।

নিগ্রেল ডুলিতে চেপেই এঞ্জিনম্যানকে ডুলি ছাড়ার হুকুম দিল।

প্রথম দিকে কোন বাধা পেল না বা কোন ত্রুটি দেখতে পেল না নিগ্রেল। শুধু জল পড়ার শব্দ আর অবরুদ্ধ লোকদের ভয়ার্ত চিৎকার কানে আসছিল ওদের। কিন্তু তিনশো মিটার নিচে এইভাবে নামার পর নিগ্রেলের ল্যাম্পটা নিভে গেল। ডুলিটা এসে এক জায়গায় আটকে গেল। বুঝল আর যাওয়া সম্ভব নয়। এখান থেকে ফিরতে হবে। আপাততঃ অবরুদ্ধ শ্রমিকদের উদ্ধার-কার্য সম্ভব নয়। তার মনে হলো, খাদের নিচে যেন ঝড় জলের এক প্রবল দুর্যোগ চলছে।

নিগ্রেল দড়ি নেড়ে ডুলি তোলার নির্দেশ দিল। কিন্তু হঠাৎ ডুলিটা এক-বার থামিয়ে এই ব্যাপক দুর্ঘটনার কারণ কি তা জানার চেষ্টা করল। কিন্তু কিছু ধরতে পারল না। তবে এটা সে বেশ বুঝতে পারল যে এই দুর্ঘটনা কোন এক শয়তানের অন্তর্ঘাতমূলক কাজের ফল। অকস্মাৎ এ ধরনের দুর্ঘটনা আপনা থেকে ঘটতে পারে না। খাদের নিচে ছাদে যেখানে যেখানে কাঠের ঠেকা দেওয়া ছিল তা সব ভেঙে পড়ে গেছে। একথা ভেবে ভয়ে তার মাথার সব চুল খাড়া হয়ে উঠল। তার সমস্ত সাহস ও উদ্যম জমাট বেঁধে গেল। সে বুঝল আর এক মুহূর্তও এখানে থাকা সম্ভব নয়। ডুলি উপরে তোলার নির্দেশ দিল

নিগ্রেল।

বাইরে এসে নিগ্রেল দেখল মঁসিয়ে হানিবো ব্যগ্রভাবে অপেক্ষা করছে তার জন্য। তাকে দেখতে পেয়েই হানিবো তাকে জিজ্ঞাসা করল, কি খবর?

প্রথমে কোন কথা বলতে পারল না নিগ্রেল। তার মনে হচ্ছিল মূর্ছিত হয়ে পড়বে সে।

হানিবো বলল, অসম্ভব। এ কাজ কি করে সম্ভব? এ ধরনের ঘটনা কেউ কখনো শোনেনি।

নিগ্রেলও কি বিশ্বাস করতে পারছিল? স্বচক্ষে প্রমাণের বস্তু দেখেও বিশ্বাস করতে পাবছিল না সে। ভেবে পাচ্ছিল না কে সেই ভয়ঙ্কর শয়তান যে নিজের হাতে ঠাণ্ডা মাথায় খনিব পাম্পটাকে বিপর্যস্ত করে তার প্রাণকেন্দ্রটাতে এক চরম আঘাত হেনে গেছে।

নিগ্রেল যা দেখেছে তা সবার সামনে বলতে চায় না হানিবোকে। সে তাই ইশারায় হানিবোকে একটু দূরে সরে যেতে বলল। একটু দূরে তাকে নিয়ে গিয়ে সে যা দেখেছে, এঞ্জিনীয়ার হিসাবে সে যা বুঝেছে তা সব বলল।

মঁসিয়ে হানিবো আর নিগ্রেল দুজনেই বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ওদিকে ক্রমবর্ধমান জনতা ক্রমাগত সেই একই কথার দ্বারা তাদের কর্ণকুহরে আঘাত হানছিল। বলছিল, যারা যারা নিচে আছে, যারা যারা চাপা পড়েছে তাদের নাম বল।

মাহিউর স্ত্রী যখন প্রথম জানতে পারে তার মেয়ে ক্যাথারিন আর এতিয়েন দুজনে রাত্রিবেলায় তাকে কিছু না বলে কাজ করতে গেছে খনিতে তখন রেগে যায়। বলে, মরে মরুক। কিন্তু পরে দুর্ঘটনার কথা শুনে ছুটে আসে পাগলেব মত।

সমস্ত আকাশটাকে অন্ধকার করে মেঘ জমছিল দিগন্তে। ধীরে ধীরে ঘন কালো মেঘমালায় ঢেকে গেল সমস্ত আকাশটা। তারপর বৃষ্টি নামল মুষলধারে। তবু জনতা দাঁড়িয়ে রইল এক নিষ্ফল বেদনার বোঝাভারকে বুকে করে।

মঁসিয়ে হানিবো, নিগ্রেল ও অন্যান্য এঞ্জিনীয়াররা ভাবতে লাগল কি করা যায় সে সম্পর্কে। হঠাৎ খনির গর্ভ থেকে উঠে আসা এক প্রচণ্ড শব্দে কেঁপে উঠল উপরকার অফিসঘরগুলো। মনে হলো, খনির ভিতরে যেন একটা বিস্ফোরণ হলো।

এর পরই একে একে এক একটা জায়গা থেকে ধসে যেতে লাগল উপরকার মাটি আর ঘরবাড়ি। ভয়ে যে যেখানে পারল পালাতে লাগল। মনে হলো গোটা লে ভোরো খনিটার সমস্ত অফিস ও ঘরবাড়ি সমেত সব চিহ্ন পাতাল গর্ভে ডুবে যাবে অবিলম্বে। হঠাৎ ক্যানেলের কাছে একটা জায়গা নেমে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে ভরা ক্যানেলের জলস্রোত নিচে প্রবলবেগে জলপ্রপাতের মত নামতে লাগল।

মঁসিয়ে হানিবো প্যাবিস চলে গেল কোম্পানির মালিকদের সঙ্গে দুর্ঘটনার বিষয়ে আলোচনা করার জন্য। ডিরেক্টরদের সব কথা বুঝিয়ে পরের দিনই ফিরে এল মঁসিয়ে হানিবো। তাকে খুশি-খুশি দেখাচ্ছিল। কারণ মঁসিয়ে হানিবোর কথা সব বিশ্বাস করেছে মালিকরা। বিশ্বাস করেছে, তার কোন দোষ নেই এ দুঘটনায়, বরং সে সাহসের সঙ্গে যথেষ্ট তৎপরতার সঙ্গে ঘটনার সম্মুখীন হয়েছে। তাই মালিকবা মনে করে অফিসার হিসাবে হানিবোকে 'লিজিয়ন অফ অনার' উপাধি দেওয়া উচিত।

কিন্তু হানিবো নিজেকে দোষমুক্ত করে ফেলতে পারলেও কোম্পানির মালিকরা মুক্ত হলো না বিপদ হতে। শুধু যে কয়েক লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে তা নয়। গোটা লে ভোরো খনিটা এমনভাবে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে যে তা মেরামত করার আর কোন উপায় নেই।

তার উপর আছে দুঘটনায় কোম্পানির দায়িত্ব। কোম্পানি সমস্ত ব্যাপাবটাকে চাপা দেবার চেষ্টা করল। এ ব্যাপারে তারা শুধু একজন খনি-কর্মচারিকে বরখাস্ত করল। সে হলো ভানসার্ত। পিয়েরেনের স্ত্রীর সঙ্গে তার অবৈধ সংসর্গেব জন্য কর্তৃপক্ষ অনেকদিন আগে থেকেই তাকে বরখাস্ত করার কথা ভাবছিল। কিন্তু এটা ঠিক বৈধ কারণ না পাওয়ায় তা পারছিল না। আজ সেই কারণ সহজেই পেয়ে গেল কর্তৃপক্ষ। ভানসার্ত দুঘটনাকালে তার যথাকর্তব্য পালন করেনি। সে কোন নিমজ্জমান জাহাজের নাবিকদের বিপদে ফেলে পালিয়ে যাওয়া ক্যাপ্টেনের মত তার অধীনস্থ লোকজনদের খাদের নিচে ফেলে রেখে নিজে আগে চলে এসে কাপুরুষের মত কাজ করেছে।

শোনা গেল, কোম্পানি দুঘটনার আসল কারণ চাপা দিয়ে খবরের কাগজে একটা ভুল খবর পাঠিয়েছে। বলল; এটা ধর্মঘটী শ্রমিকদেরই নাশকতামূলক কাজ। তারা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে খনিটাকে একেবারে বিধ্বস্ত করার জন্য। কিন্তু কোম্পানি যাই বলুক সরকারী পরিদর্শক বিধ্বস্ত খনি পরিদর্শন করে বলল, কোম্পানি প্রথম থেকে নজর দেয়নি। কোম্পানির দীর্ঘদিনের ঔদাসিন্য ও গাফিলতির জন্য এবং সময়মত মেরামত না করার জন্য এই দুঘটনা ঘটেছে।

খবরের কাগজেও রোজ ফলাও করে মঁতসু অঞ্চলের দশ হাজার খনি শ্রমিকের দুরবস্থাব কথা তুলে নানারকম খবর ও মন্তব্য প্রকাশিত হতে লাগল। এতে কোম্পানি লোকচক্ষে হেয় হয়ে উঠল।

দেন্থলিন বিভাগীয় এঞ্জিনীয়ার নিযুক্ত হলো এ অঞ্চলে। দেন্থলিন প্রথমে ক্যানেলের গতিপথটা ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা করল। ক্যানেলের যে দিকটা ধসে যাওয়ায় জলস্রোত লে ভোরোর খনিতে ঢুকছিল, সেই দিকটা বাঁধ দিয়ে ক্যানেলের স্রোতটা ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা করছিল। এর জন্য প্রায় একশো জন লোক কাজ করছিল। খনিতে এইভাবে জলঢোকা বন্ধ না হলে উদ্ধারকার্য সম্ভব

হবে না।

এই উদ্ধারকার্যে শ্রমিকরা স্বেচ্ছায় এসে অনেকে যোগদান করল। তাদের মধ্যে জ্যাকারির উৎসাহ সবচেয়ে বেশী। অনেকের অনেক আত্মীয়স্বজন খনির ভিতর আটক আছে। তাই তারা বেতনের কোন আশা না করেই খেটে যেতে লাগল।

এদিকে নিগ্রেলও উদ্ধারকার্যের ব্যাপারে উন্মত্ত হয়ে উঠল। তার আর কোন দিকে কোন খেয়াল নেই। সে শুধু অনবরত ডেপুটিদের সঙ্গে কোন দিক থেকে উদ্ধারকার্য শুরু করা হবে তা আলোচনা করতে লাগল।

প্রথমে রেকিলার্তের অচল খনির ভিতর দিয়ে ঢোকার চেষ্টা করল। কিন্তু সেটাও জলে ভরে গেছে। প্রথমে নিগ্রেল কয়েকজন ডেপুটি আর কিছু লোক নিয়ে খনির প্রথম স্তরে অর্থাৎ একশো তিরিশ মিটার নিচের একটা গ্যালারীতে খোঁজ করতে লাগল। মুকে বলছিল অবরুদ্ধ শ্রমিকরা জলপ্লাবন থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্য ক্রমশই উপরের দিকে উঠে গেছে।

কিন্তু তিন দিন সন্ধানকার্য চালিয়েও কারো কোন খোঁজ পেল না নিগ্রেল। সে তাই একরকম আশা ছেড়ে দিল। এমন সময় জ্যাকারি তাকে বলল, ঐখানে ক্যাথারিন আছে। আমি তার কথা শুনতে পেয়েছি।

নিগ্রেল আবার সদলবলে সন্ধানকায শুরু করল। ওরা একটা দেওয়ালে ঘা দিয়ে ওপারে কোন লোক আছে কিনা জানার জন্য হাঁক দিল। তখন ওদের মনে হলো কারা যেন ওদের হাঁকের সাড়া দিচ্ছে। ওরা তখন দেওয়ালটা ভাঙতে লাগল। ভাঙতে ভাঙতে সুড়ঙ্গপথে এগিয়ে যাবে ওরা।

নিগ্রেল কি এক অজানা প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে সব সময় উপস্থিত থেকে কাজের তদারক করতে লাগল। সে খেতেও বাসায় যেত না। তার খাবার পাঠিয়ে দেওয়া হত।

ওরা বেশ বুঝতে পারল, ওরা ঠিক পথেই কয়লার চাপ কেটে কেটে এগিয়ে চলেছে। ওরা কান পেতে প্রায়ই শুনতে লাগল কালো পাথরের ঘন প্রাচীরের ওপারে কারা যেন কথা বলছে। কিন্তু শত চেষ্টা সত্ত্বেও কাজের গতি মোটেই বাড়ছিল না। কারণ এই স্তরে কয়লার চাপগুলো পাথরের মত শক্ত। পুরো দুদিন কাজ করে ওরা মাত্র তের মিটার পরিসর পাথর কেটে এগোতে পেরেছে। তৃতীয় দিনে মাত্র পাচ মিটার কাটতে পারল। তাছাড়া ওখানে দারুণ গরম। প্রতিটি কর্মীকে পাখা হাতে কাজ করতে হচ্ছিল।

মাহিউর স্ত্রী মাঝে মাঝে বাইরে থেকে খবর নিচ্ছিল উদ্ধারকার্য সম্বন্ধে। সে কেমন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল ক্যাথারিনের জন্য। জ্যাকারি প্রাণপণ চেষ্টায় সকলের আগে থেকে পাথরের মত কয়লার চাপগুলো কেটে যাচ্ছিল। তার উপর এখানকার গ্যাসটাও খারাপ। এই গ্যাস খারাপ হয়ে যাওয়ায় মাঝে মাঝে এর থেকে আগুন জ্বলে ওঠে।

নবম দিনে কাজ করতে করতে জ্যাকারি সবচেয়ে আগের দিকে তিন চার জনের সঙ্গে কাজ করতে করতে কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েছিল। ওদের কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছিল না। ওদের কাজের সময় শেষ হয়ে গেলে নতুন দল যাবার সময় ওদের যখন ডাকা হলো তখন কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

নিগ্রেল লাঞ্চ খেয়ে এসে তার লোকদের বকাবকি করতে লাগল। সে ভাবল জ্যাকারিদের ওবা ডাকেনি। ওরা বলল, ওরা বিপদের ঝুঁকি নিয়ে অন্ধকারে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু কোন সাড়া পায়নি। নিগ্রেল তখন আবার যেতে বলল। যেমন করে হোক, তাদের সঙ্গে করে নিয়ে আসতে হবে। নতুন করে তারা আবাব কোন বিপদের কবলে পডল কি না তা বুঝতে পারল না।

নিগ্রেলেব নির্দেশে একদল শ্রমিক অন্ধকারে প্রাণের মায়া ত্যাগ করে এগিয়ে গেল জ্যাকাবিদেব সন্ধানে। গিয়ে দেখল সেখানে দারুণ উত্তাপ। সেখানকার কয়লাগুলো যেন জ্বলন্ত অঙ্গাব। ওরা দেখল, জ্যাকারি আর তিন জন শ্রমিক হতচেতন অবস্থায় পডে আছে। তাদের দেহগুলো পুড়ে কালো হয়ে গেছে।

ওবা সেই হতচেতন দেহগুলো বাইরে নিয়ে এল। ওরা চারজনের একজনও বেঁচে নেই। মনে হলো ওরা আগুন গিলে খেয়েছে। ওদের দেহগুলো পোড়া কাঠেব মত কালো আর শক্ত হয়ে গেছে।

জ্যাকারির মৃতদেহটা দেখে মাহিউর স্ত্রী পাগলের মত বুক চাপডাতে লাগল। পাগলের মত বলল, ওকে বাড়ি নিয়ে চল। আমার ছেলে ফিরে এসেছে। আর বাকি আছে শুধু আমার মেয়ে।

উদ্ধারকার্য আবার শুরু হলো। কার্যরত শ্রমিকদের প্রতি কুড়ি মিনিট অন্তব ছেড়ে দেওয়া হতে লাগল। এদিকটায় জল নেই এবং বিস্ফোরণে এ দিকের গ্যালারীটার কোন ক্ষতি হয়নি। একমাত্র দূষিত গ্যাস ছাড়া আর অন্য কোন ভয় নেই এখানে।

দেন্থুলিন লে ভোরো খনির মেরামতের কাজ তদারক করছিল আর নিগ্রেল রেকিলার্তের অচল খনির ভিতর দিয়ে পাথর কেটে কেটে এগিয়ে যাচ্ছিল লে ভোরো খনিতে অবরুদ্ধ শ্রমিকদেব উদ্ধার করার জন্য। আর মাত্র দু মিটার পথ এগিয়ে যেতে পারলেই ওরা সকলকে উদ্ধার করতে পারবে।

এই সব মেরামত ও উদ্ধারকার্য দেখার জন্য বিভিন্ন জায়গা থেকে লোক আসছিল। একদিন গ্রেগরিরাও যাবার মনস্থ করল। ঠিক হলো, মাদাম ও মঁসিয়ে হানিবো আগেই দেন্থুলিনের কাজের জায়গায় অর্থাৎ লে ভোরো খনির কাছে গিয়ে হাজির হবে জিয়ান আর লুসিকে সঙ্গে করে। তারপর মঁসিয়ে ও মাদাম গ্রেগরি তাঁদের মেয়ে সিসিলকে নিয়ে যাবেন সেখানে। দেন্থুলিন ওদের সব কিছু ঘুরিয়ে দেখাবে। তারপর সেখান থেকে গাড়িতে করে একসঙ্গে ওরা যাবে রেকিলার্তে নিগ্রেলের কাছে। নিগ্রেল সেখানে তার উদ্ধারকার্যের গতি-

প্রকৃতি সব দেখাবে।

এই ব্যবস্থামত ওরা লে ভোরোর মেরামতকার্যের সব কিছু দেখল। দেহুলিন ওদের সব কিছু দেখাল। এরপর মাদাম হানিবো ওদের নিয়ে রেকিলার্তে যাবার জন্য প্রস্তুত হলো। কিন্তু গ্রেগরিরা বলল, আপনারা ওখানে চলে যান। আমরা আমাদের গাড়িতে করে একবার দুশো চল্লিশ নম্বর গাঁয়ে গিয়ে গরীব শ্রমিকদের কিছু জিনিস দান করে আসব। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আমরা ওখানে চলে যাচ্ছি।

গ্রেগরিরা সোজা গাড়িতে করে গেল মাহিউদের বাড়িতে। বাড়িটা তালা-বন্ধ ছিল বাইরে থেকে। লা লেভাকের কাছে চাবি ছিল। সে খুলে দিল গ্রেগরিদের। বলল, বাড়িতে বুড়ো বনিমোর ছাড়া আর কেউ নেই। জ্যাকারির মৃত্যুর পর মাহিউদের বাড়ির নাম চারদিকে খুব বেশী করে ছড়িয়ে পড়েছে। মাহিউ ধর্মঘটের ব্যাপারে শ্রমিকদের নেতৃত্ব করে এবং সৈন্যদের উপর ইট পাটকেল ছোঁড়ে। কিন্তু তার স্ত্রী বা ছেলেমেয়েদের কোন দোষ নেই। তাছাড়া লে ভোরো খনিতে ওদের বংশানুক্রমিক অবদান আছে। তাই সিসিল এই পরিবারকে কিছু খাদ্যবস্তু দিয়ে সাহায্য করতে চায়। সিসিল কিছু মদ, পাঁউরুটি আর বুড়ো বনিমোরের জন্য এক জোড়া জুতো এনেছিল।

লা লেভাক বুড়ো বনিমোরের কাছে সিসিলকে নিয়ে গেল। বলল, এক পক্ষকাল হলো ওর মাথাটা কেমন খারাপ হয়ে গেছে। সিসিল দেখল একটা ঈজি চেয়ারে বসে শূন্য দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। ও ঝিমোচ্ছিল। একটু আগে কাশি আসায় উঠে পড়েছে। খানিকটা কালো রক্ত উঠেছে মুখ দিয়ে।

সিসিল জিনিসগুলো নামিয়ে রেখে দেখতে লাগল বনিমোরকে। গ্রেগরিরা বলল, আমরা একটু আসছি। এসে তোকে নিয়ে যাব।

হঠাৎ সিসিলের মনে হলো এই লোকটাকে সে যেন এর আগে কোথায় দেখেছে। ধর্মঘটের সময় যখন সে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকমেয়েদের হাতে ধরা পড়ে তখন তাকে এই বুড়োটার হাতেই তুলে দেওয়া হয়। তারপর দেহুলিন তাকে রক্ষা করে।

বনিমোরও এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল সিসিলের মুখপানে। হঠাৎ খুন চেপে গেল বনিমোরের মাথায়। সে তার পেশীবহুল দুটো হাত দিয়ে সিসিলের সাদা ধবধবে গলাটা টিপে ধরল দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে। সিসিল অবশ হয়ে লুটিয়ে পড়ল ঘরের মেঝের উপর।

গ্রেগরিরা এসে সিসিলের এই অবস্থা দেখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। ওদিকে মাদাম হানিবো ও নিগ্রেল এই আকস্মিক আশ্চর্যজনক মৃত্যুর খবর পেয়ে দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল মঁসিয়ে হানিবোর সামনে। হানিবো ভাবল নিগ্রেলের বিয়ের সব আশা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হলো।

৫

এদিকে এতিয়েনদের দল যখন দেখল ভুলি আসার কোন সম্ভাবনা নেই তখন খাদ থেকে বেরোবার আশায় এদিক সেদিক ঘুরে চেষ্টা করতে লাগল। ওদের দলে ছিল মোট কুড়ি জন লোক। ওরা সবাই ঠিক করল রেকিলার্তের অচল খনিটার দিকের গ্যালারীটা ধরে ওরা সেইদিকে এগিয়ে যেতে থাকবে। পরে নিশ্চয় উদ্ধারকারীরা এসে ওদের উদ্ধার করবে।

এতিয়েনরা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে দেখতে দেখতে এক কোমর জল দাঁড়িয়ে গেল। বৃদ্ধরা কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে খনির দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম করতে লাগল। ওরা বলাবলি করতে লাগল নিজেদের মধ্যে :

'কোন এক অজ্ঞাত শয়তান পৃথিবীমাতার প্রধান শিরাটা শয়তানি করে কেটে দিয়েছে বলেই পৃথিবীমাতার গর্ভ থেকে জলের আকারে এত রক্তপাত হচ্ছে।'

কিছুক্ষণ যাওয়ার পর ওদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল। মুকে বলল বাঁ দিকে যেতে, কিন্তু শ্যাভেল বলল ডান দিকে যেতে। এই মতবিরোধের ফলে দল দু ভাগে ভাগ হয়ে গেল। এতিয়েনরা সাতজন মিলে মুকের সঙ্গে যেতে লাগল জল ভেঙ্গে। আর শ্যাভেলরা অন্য পথে চলে গেল। ছাদের কাঠগুলো খসে পড়ছিল আর উপরে বৃষ্টির মত সশব্দে জল ঝড়ে পড়ছিল।

ক্যাথাবিন হাঁটতে পারছে না দেখে এতিয়েন তাকে বলল, তোমার হাত দুটো দিয়ে আমাব ঘাডটা জডিয়ে ধরো। আমি তোমাকে তুলে নিয়ে যাব।

কিছুক্ষণ যাওয়ার পব এতিয়েন বলল, এবাব আমি চিনতে পেরেছি। এইটাই হলো গিলর্ম সীম। আমরা তাহলে ঠিক পথেই এসেছি। এই পথেই আমরা ক্রমশ উঠে গেলে আমরা চিমনির কাছে গিয়ে পৌছব।

কিন্তু ওরা বড ধীর গতিতে এগোচ্ছিল। কারণ তখন জল ওদের বুক পর্যন্ত উঠে গেছে। জল পডার কর্ণবিদারক একটানা শব্দের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত খনি-গর্ভটা প্রবলভাবে কাঁপছিল। ওদের মনে হচ্ছিল পৃথিবীতে যেন এক মহাপ্রলয় চলছে। ক্যাথাবিন দারুণ ভয় পেয়ে এতিয়েনের গলাটা আরো জোর করে জড়িয়ে ধরে বারবার বলতে লাগল, আমি মরতে চাই না। মরতে চাই না। আমাকে বাঁচাও।

এতিয়েন তাকে আশ্বস্ত করতে লাগল। এইভাবে ওরা ছয় ঘণ্টা ধরে কোন-ক্রমে জল ভেঙ্গে এগিয়ে চলল।

সহসা অন্ধকারের মধ্যে একটা বিরাটকায় সাদা জীবকে দেখে ভয় পেয়ে গেল। পরে ওরা দেখল বাতেল। বাতেল এখানে সেখানে ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে পড়েছে অবশেষে।

ছয় ঘণ্টা না ঠিক কতক্ষণ এইভাবে পথ চলেছে তা বলতে পারবে না ওরা। সময় সম্বন্ধে ওদের কোন জ্ঞান নেই। হয়ত ওরা সারাদিনই এইভাবে

কাটিয়ে ফেলেছে। কিছুক্ষণ পর ওরা একটা উঁচু জায়গায় এসে পৌঁছল। কিন্তু হঠাৎ ওদের সামনে একটা বড় পাথরের চাপ পড়ে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে বাতেলের বিরাট প্রাণহীন দেহটা লুটিয়ে পড়ল।

বাতেলের মৃত্যু স্বচক্ষে দেখে ক্যাথারিন আরো ভয় পেয়ে গেল। দলের কে কোথায় ছিটকে পড়েছে তার কোন ঠিক নেই। এখন শুধু এতিয়েন আর ক্যাথারিন। ওদের এইখানেই এখন থাকতে হবে। উদ্ধারের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

ক্ষুধার তীব্রতা আর জলভাঙ্গার ক্লান্তিতে ক্যাথারিন একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়ছিল। ও বেশ বুঝতে পারছিল ওর চেতনা ক্রমশই ক্ষীণ হয়ে আসছে। মৃত্যু এগিয়ে আসছে। ও আর বেশীক্ষণ বেঁচে থাকতে পারবে না। ওকে আশ্বস্ত করার জন্য এতিয়েন ওকে প্রায়ই সাহস দিয়ে বলছিল, আর দেরি নেই। দেখবে বাইরে থেকে লোক এসে এখান থেকেই আমাদের উদ্ধার করবে।

এখনো একশো মিটার পথ এই সুড়ঙ্গটা দিয়ে তাদের যেতে হবে। কিন্তু ওদের সামনে আবার একটা বড় পাথর চাপা পড়ায় যাবার পথ বন্ধ হয়ে গেল। হঠাৎ অন্ধকারে ওদের পিছন থেকে কে এল ওদের কাছে। এতিয়েন গলার আওয়াজ শুনে বুঝল শ্যাভেল।

শ্যাভেলও অন্ধকারে প্রথমে ওদের চিনতে পারেনি। সে তাই চিৎকার করে বলে উঠল, আমার একটা স্যাণ্ডউইচ আছে। আমি সেটা খাব। যদি তোমাদের কেউ খেতে চাও আমি তাকে খুন করব।

হঠাৎ ক্যাথারিনকে চিনতে পেরে শ্যাভেল হেসে বলল, ও তুমি! আবার আমরা তাহলে এক জায়গায় এসে পড়লাম। এর মানে আবার আমাদের মিলন হবে

সে এতিয়েনকে দেখেও যেন চিনতে পারল না।

ক্যাথারিন ও এতিয়েন দুজনেই অস্বস্তিকর নীরবতায় জমাট বেঁধে রইল। কেউ কোন কথা বলল না।

শ্যাভেল ক্যাথারিনকে বলল, তুমি আমার স্যাণ্ডউইচের আধখানা খাও। আমি শুধু তোমাকেই দেব। আর কাউকে নয়।

কিন্তু ক্যাথারিন ক্ষুধায় মূর্ছিত হয়ে পড়ার উপক্রম হলেও সে কোন কথা বলল না। এতিয়েন মরে গেলেও শ্যাভেলের কাছে খাবার চাইবে না।

ক্যাথারিন না চাইলেও শ্যাভেল তার স্যাণ্ডউইচটার আধখানা ক্যাথারিনকে জোর করে দিল। শ্যাভেল তা এমনভাবে ক্যাথারিনের হাতে গুঁজে দিল যে সে তা নিতে বাধ্য হলো।

কিন্তু ক্যাথারিন যতবারই সেই স্যাণ্ডউইচটার একটা করে টুকরো তার মুখে ভরছিল ততবারই এতিয়েনের উপস্থিতিকে উপেক্ষা করে ক্যাথারিনের মুখে একবার করে চুম্বন করছিল শ্যাভেল। যেন তার দেওয়া খাবারের এক একটি

টুকরোর দাম হিসাবে এক একটি চুম্বন নিষ্ঠুরভাবে আদায় করে নিচ্ছিল শ্যাভেল।

শ্যাভেল ক্রমশই ক্যাথারিনকে জড়িয়ে ধরে তার দিকে টানতে লাগল। তা দেখে এতিয়েন তাকে বলল, খবরদার বলছি শ্যাভেল, তুই ক্যাথারিনের গায়ের উপর থেকে হাত তুলে নে।

শ্যাভেল বলল, আরে যা যা, তুই আমার কি করবি?

এতিয়েন নীরবে উঠে দাঁড়িয়ে সেই সুড়ঙ্গের গা থেকে পাথরের চাপ নিয়ে শ্যাভেলের মাথায় সজোরে মারল।

এতিয়েন বলল, আমাদের দুজনের মধ্যে একজনেরই বাঁচা উচিত।

শ্যাভেলের মাথাটা একেবারে চূর্ণ হয়ে গেল। সে লুটিয়ে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গেই তার মৃত্যু ঘটল। ক্যাথারিন বলল, ও মরে গেছে।

এতিয়েন বলল, তুমি কি দুঃখিত তার জন্য?

ক্যাথারিন নীরবে এতিয়েনের কোলে ঢলে পড়ল। তারপর বলল, এস আমরা দুজনে একসঙ্গে মরি।

হঠাৎ এতিয়েন কান খাড়া করে ক্যাথারিনকে বলল, শুনছ?

ক্যাথারিন বলল, কি?

এতিয়েন বলল, আমার মনে হয় রেকিলার্তের ওধার থেকে আমাদের উদ্ধার করতে আসছে। পাথর কেটে কেটে পথ করে এগিয়ে আসছে ওরা। গাঁইতির ঘা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি আমি।

ক্যাথারিনও তা শুনতে পেল। কিছুক্ষণ পর বলল, আমার পিপাসা পেয়েছে।

এদিকে ওরা যেখানে বসেছিল সেখানে জল না থাকলেও ওদের পায়ের তলা পর্যন্ত জলটা উঠে এসেছে। জলটা ক্রমশই বাড়ছিল। সেই জল অঞ্জলি ভরে খেতে যাচ্ছিল ক্যাথারিন। সহসা কি একটা জিনিস ভাসতে ভাসতে ওদের পায়ের কাছে এসে পড়তেই ক্যাথারিন তা হাত দিয়ে দেখে আঁতকে উঠল। তার জল খাওয়া আর হলো না।

ক্যাথারিন বলল, এটা কি জান?

এতিয়েন বলল, কি?

ক্যাথারিন বলল, সে-ই। ঘুরে ফিরে সে-ই আবার এসেছে। ওর মোচটায় আমার হাত ঠেকে গিয়েছিল।

এতিয়েন দেখল সত্যিই শ্যাভেলের মৃতদেহটা জলে প্রথমে ভেসে গেলেও ভাসতে ভাসতে আবার ফিরে এসেছে ওদের কাছে। এতিয়েন মৃতদেহটাকে আবার ঠেলে দিল জলে। কিন্তু আবার সেটা এসে পড়ল। যতবার এতিয়েন সেটাকে ঠেলে দিতে লাগল ততবারই সেটা ফিরে ফিরে আসতে লাগল এক অপ্রতিরোধ্য অবাধ্যতায়।

এতিয়েন তখন বলল, ঈশ্বরের নামে বলছি, তুমি যাও, যাও শ্যাভেল।

আমাদের একটু একা থাকতে দাও।

এতিয়েনের মনে হলো শ্যাভেলের মৃত্যুর পরেও তার প্রাণহীন দেহটা ক্যাথারিনের উপর তার দাবি জানাতে এসেছে। ক্যাথারিনকে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে এসেছে।

এবার এতিয়েন শ্যাভেলের মৃতদেহটাকে ঠেলে দিতেই জলের একটা ঢেউ এসে অনেক দূরে সেটাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

ক্যাথারিন এবার নিশ্চিন্ত হয়ে বলল, আচ্ছা, গরম করছে না? তুমি সব সময় আমার কাছে থাক। খুব কাছে।

ছোট্ট অবুঝ শিশুর মত ক্যাথারিন এতিয়েনের কোলে শুয়ে রইল তার গলাটা জড়িয়ে ধরে। ক্যাথারিন শান্ত কণ্ঠে বলতে লাগল, আমাদের নিছক বোকামির জন্য শুধু শুধু আমাদের এই মিলনে কত দেরি হলো বল ত। অথচ আমি প্রথম থেকেই তোমাকে কামনা করে এসেছি। কিন্তু তুমি ঠিক তা বুঝতে পারনি। বুঝতে চাওনি আমার মনের কথা, আমার চোখের ভাষা। তোমার হয়ত মনে আছে আমরা যখন দিনের পর দিন এক ঘরে কাছাকাছি শুতাম, যখন আমরা পরস্পরের নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পেতাম তখন দুজনে দুজনকে কত কামনা করেছি।

এতিয়েন এক সময় ক্যাথারিনকে আদর করে বলল, তুমি আমার দু গালে একদিন চড় মেরেছিলে।

ক্যাথারিন বলল, হ্যাঁ মেরেছি। তোমাকে ভালবাসি বলেই মেরেছি।

এতিয়েন একবার জিজ্ঞাসা করল, তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে?

ক্যাথারিন বলল, না।

একটু পরে ক্যাথারিন বলল, কিন্তু বড় অন্ধকার!

এতিয়েনের মনে হলো, ক্যাথারিন যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু একটু পরেই ক্যাথারিন ঘুমের ঘোরের মধ্যেই যেন বলে উঠল, শুনতে পাচ্ছ?

এতিয়েন বলল, আমি ত কিছু শুনতে পাচ্ছি না।

ক্যাথারিন বলল, আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি এ তার কণ্ঠস্বর। সেই লোকটার কণ্ঠস্বর যে একটু আগে মারা গেছে। সেই প্রতিহিংসা, সেই ঈর্ষা। ও আমাদের একসঙ্গে সুখে থাকতে দেবে না।

হঠাৎ এতিয়েনের মনে হলো তার কোলে ক্যাথারিনের দেহটা যেন হিমশীতল হয়ে যাচ্ছে। এতিয়েন ব্যস্ত হয়ে ক্যাথারিনকে ডাকতে লাগল। কিন্তু কোন সাড়া পেলো না।

ক্যাথারিনের প্রাণ আগেই বেরিয়ে গেছে।

ঠিক এমন সময় এতিয়েন শুনতে পেল, কারা যেন তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। সুড়ঙ্গের প্রান্তদেশে একটা ল্যাম্পের আলো দেখা যাচ্ছে।

সুড়ঙ্গ থেকে ক্যাথারিনের মৃতদেহটাকে যখন বার করা হলো তখন মাহিউর

স্ত্রী এক বুকফাটা কান্নায় ভেঙে পড়ল।

৬

তখন ভোর চারটে। এপ্রিল মাস। দিনের আলো ফুটে উঠতে আর দেরি নেই। আকাশের তারাগুলো একে একে ডুবে যাচ্ছিল। শান্ত বাতাস বইছিল চারদিকে।

ভাঁদেম রোড ধরে একা এগিয়ে চলেছিল এতিয়েন। মঁতস্যুর হাসপাতালে সে ছয় সপ্তা থাকার পর মুক্তি পেয়েছে। ক্যাথারিনের মৃতদেহের সঙ্গে সেই সুড়ঙ্গ থেকে তাকে উদ্ধার করার সময় সে অচৈতন্য হয়ে পড়ে। তখন তাকে হাসপাতালে দেওয়া হয়।

এতিয়েন এখান থেকে চলে যাচ্ছে। কোম্পানি তাকে আর রাখতে চায় না। কোম্পানি তাকে একশো ফ্রাঁ অনুদান হিসাবে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু সে তা নেয়নি। কারণ সে কোম্পানির কোন অনুগ্রহই আর চায় না। প্লুশার্ত তাকে প্যারিসে তার কাছে যাবার জন্য চিঠি দিয়েছে। তাকে সে সহকর্মী হিসাবে পেতে চায়। এতে গর্বে ফুলে ওঠে এতিয়েনের বুকটা। সে ভাবে এতদিনে তার এত সব কষ্টভোগ, এত সংগ্রাম সার্থক হলো।

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে জানতে পারল এতিয়েন, দুশো চল্লিশ নম্বর গাঁয়ের সব লোক এখন জাঁ বার্ত খনিতে কাজ করছে। ধর্মঘট ব্যর্থ হওয়ায় এবং এ অঞ্চলের খনি মালিকদের জিৎ হওয়ায় জা-বার্ত কোম্পানি ইচ্ছামত বেতনহার চালু করেছে। অর্থাৎ কয়লা তোলা আর কাঠের কাজের জন্য তারা আলাদা বেতন পাবে। যে বেতন হার তাদের বেতন কাটার সমতুল এবং যার জন্য ধর্মঘট করে তারা, যার জন্য এত লোকক্ষয় হয় সেই অপমানজনক বেতনহার মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে তারা। কারণ আর কোন উপায় খুঁজে পায়নি তারা।

শুধু জাঁ বার্ত নয়, এখন মিরৌ, লা ভিকতোরি প্রভৃতি সব খনিতেই কাজ শুরু হয়েছে। ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আগের মতই এখন আবার কুয়াশাঘেরা মাঠের মধ্য দিয়ে সারবন্দী মানুষগুলো টুপী মাথায় এগিয়ে চলে খনির দিকে।

এতিয়েন ধীরে ধীরে জাঁ বার্ত খনির দিকেই পথটা ধরে এগিয়ে যাচ্ছিল। সে দেখতে পেল তার পরিচিত লোকরা একে একে সব কাজে যাচ্ছে। তাকে দেখতে পেয়ে তারা দাঁড়াল।

এতিয়েন দেখল, তার প্রতি তাদের আর কোন রাগ বা ক্ষোভ নেই। অথচ এরাই একদিন তাকে ইট মেরেছিল। এতিয়েন একে একে তাদের সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করল। তারপর মাহিউর স্ত্রীর কথা জিজ্ঞাসা করল।

ওরা বলল, মাহিউর স্ত্রীও আজকাল এখানেই কাজ করে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মাহিউর স্ত্রী পুরুষের বেশে টুপী পায়জামা পরে ল্যাম্প হাতে এসে হাজির হলো। এতিয়েনকে দেখে বলল, তুমি যাচ্ছ ভালই করছ। জেনে সুখী হলাম। তোমার প্রতি আমার কোন অভিযোগ নেই। সবই ভাগ্য।

এতিয়েন দেখল একে একে সব শোকদুঃখ কাটিয়ে উঠেছে মাহিউর স্ত্রী।

এতিয়েন বলল, তোমাদের খবর কি বল।

মাহিউর স্ত্রী বলল, বুড়োকে ওরা পাগলাগারদে দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু আমি বললাম, ও ঘরেই থাকবে। জাঁলিনও কাজ করছে। হেনরি, লেনোরও কাজ করছে। আমার অবস্থার কথা বিবেচনা করে কোম্পানি আমাকে খনির ভিতরে কাজ করার অনুমতি দিয়েছে।

একটু থেমে মাহিউর স্ত্রী বলল, ফিলোমেন পালিয়ে গেছে একটা লোকের সঙ্গে।

লা লেভাকও পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। সে বলল, প্রথমে ভেবেছিলাম ছেলে দুটোকে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে গেছে। পরে দেখলাম, না, ছেলে দুটোকেও সঙ্গে নিয়ে গেছে।

লেভাক এখনো জেলে আছে। বুতলুপ তার হয়ে সংসার চালাচ্ছে। বেবার্ত মারা যাওয়ায় ওদের সংসারটা হালকা হয়ে গেছে একেবারে। বুতলুপও কাজ করছে।

ওদের সকলকে ছেড়ে যেতে সত্যিই কষ্ট হচ্ছিল এতিয়েনের। তবু ওদের কাছে বিদায় নিয়ে ওদের গাঁটাকে পিছনে ফেলে ভাঁদেম রোড ধরে পা চালিয়ে দিল এতিয়েন।

ক্রমে ভাঁদেম রোড ছেড়ে বড় রাস্তা ধরল। সে মার্সিয়েনে গিয়ে ট্রেন ধরবে। তখন সূর্য উঠেছে। প্রথম বসন্তের সকালের ঈষদুষ্ণ সোনালি রোদ ছড়িয়ে পড়েছে মাঠে। মাঠে চাষীরা কাজ করছে। এতিয়েন পথে একা এগিয়ে গেলেও তার কেবলি মনে হচ্ছিল যেন ওর অসংখ্য বন্ধু ও অনুচর চারদিকে ভিড় করে রয়েছে। তাদের কথার শব্দ ও স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে। ওর মনে হলো, এ অঞ্চলে যে প্রাণের ও কর্মচঞ্চলতার স্রোত সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তা আবার প্রবাহিত হতে শুরু করেছে। পৃথিবীর গভীর গর্ভ থেকে আবার এক প্রাণস্পন্দন উঠে এসে সমস্ত আকাশ বাতাসকে স্পন্দিত করে তুলছে।

অনুবাদ—সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ

মাটি

The Earth

এমিল জোলা

প্রথম ভাগ

১

সকাল বেলা। কোমরে বীজের থলে বেঁধে জঁা ক্ষেতে বীজ বুনছিল। তিন পা গিয়ে প্রতিবার এক মুঠো বীজ নিয়ে একসঙ্গে চাবধারে ছড়িয়ে দিচ্ছিল। থকথকে আঠালো কাদায় ডুবে যাচ্ছে ওর মোটা চামড়ার জুতো, তবু হাঁটছিল শক্ত পায়ে। আর যখনই মুখ তুলছিল তখনই ওর সৈনিকের পোশাকে ছুটো লাল দাগ ঝকঝক করছিল সীমাহীন হলদেটে বীজের ভিতর থেকে। ও হাঁটছিল। নির্জনতার মধ্যে শুধু ওর দীর্ঘ লম্বা শরীর।

প্রায় সওয়া এক একরের একটুকরো জমি। লে কর্ণেইলস্ গ্রামের প্রান্তে জমিটুকু। লা বডডারি খামারের মালিক মঁসিয়ে হোরদিকুইনের কাছে জমিখণ্ড এত প্রয়োজনীয় যে তিনি এখানে কলের লাঙল পাঠান নি। সেটা অন্য জমি চষছে। দক্ষিণ থেকে উত্তর বরাবর যখনই যাচ্ছে জঁা তখনই ওর নজরে পড়ছে খামার বাড়ী মাইলটাক দূরে। জমির সীমানায় পৌঁছে ও বারেক মুখ তুলে সামনে নজর ছড়িয়ে দিচ্ছে, একটু জিরিয়ে নিচ্ছে ক্ষণেকের জন্যে।

শারত্রিস্ গ্রামের দিকে ছড়ানো সমতল জমি। আর এই 'বসি' সমতল ভূমি থেকে খামার বাড়ীখানা আলাদা করে রেখেছে ধূসর শ্লেট-রঙ নীচু সীমানা প্রাচীর। শেষ অক্টোবরের বিশাল সীসা-রঙ আকাশ। নীচে ছড়ানো দশ লিগ চাষের জমি, হলুদ-রঙ ফসল-ফলানো খণ্ড খণ্ড জমির মাঝে মাঝে লুসার্নো তৃণভূমির সবুজ বিস্তৃতি। কোথাও নেই কোন পাহাড়ি টিলা কিংবা গাছ, বিস্তৃত জমি হারিয়ে গেছে দূরে দিগন্তরেখায়, ঠিক যেন সবুজ-সাগরে গোলাকার ইসারা। পশ্চিমদিকে খানিকটা ন্যাড়া ধূসর বনভূমি আকাশমুখী। মাঝ বরাবর খড়ি-সাদা প্রলম্বিত রাজপথ সোজাসুজি শারোডুন থেকে অরলিয়ান্স-মুখী। দূরত্ব প্রায় চার লিগ। রাজপথের ধারে জ্যামিতিক রেখার মতন সার সার টেলিগ্রাফের থাম। এধারে ওধারে দূরে দূরে কেবল কাঠের ভিতের উপর তৈরী তিন চারটে উইণ্ড মিল—পালগুলো এখন নিথর। ব্যস আর কিছু নজরে পড়ছে না। এক একটা গ্রাম যেন দূরে দূরে এক একটা পাথুরে দ্বীপ।

মাঝে মাঝে এই সবুজ ফসল-সম্পদ-সাগরের বুকে গির্জার চূড়া মাথা জাগিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে আছে।

জাঁ আবার ঘুরে দক্ষিণ-মুখী হল। বাম হাতে বীজ থলের মুখ ফাঁক করে ডান হাতে মুঠো মুঠো বীজ বার করে হাওয়ার বুকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। এখন ওর মুখ উপত্যকার দিকে—সঙ্কীর্ণ উপত্যকা-ভূমির খুব কাছেই এখন। সেই সুদূর অরলিয়ান্স পর্যন্ত বিস্তৃত ফসল ক্ষেতের পাশে উপত্যকা-ভূমিখণ্ড একটা যেন খাদ। এর ঢালু অংশে ছোট্ট গ্রাম রগনি। কয়েকটা বাড়ীর ছাদ আর প্রাচীন গ্রামবাসীদের তৈরী গির্জার কালচে ধূসর পাথরের দেওয়াল নজরে পড়ছে। পূর্বদিকে লঘার উপত্যকা পেরিয়ে দু' লিগ দূরে ক্যাণ্টন প্রদেশের প্রধান নগরী ক্লয়েস······এখান থেকে নজরে পড়ে না। আরও দূরে লা পার্চি পাহাড়···ধূসর আলোয় আকাশের পটে আবছা মতন।

শেষবারের মতন বীজ ছড়াতে সুরু করেছে জাঁ এবং ঠিক তখনই তার নজরে পড়ল একটা মেয়ে প্রায় কিশোরী বলা যায়। রগনি গ্রামের দিক থেকে উপত্যকার পথ দিয়ে সমতল ভূমির ধার ঘেঁসে এগিয়ে আসছে। ওর হাতের দড়ি একটা গাই-গোরুর গলায় বাঁধা। পিছন ফিরে বীজ বোনার কাজ সারছিল জাঁ। সহসা সভয় চিৎকার আর ছুটন্ত পায়ের আওয়াজে মুখ তুলে তাকাল। লুসার্ণো ঘাসের উপর দিয়ে গোরুটা সবেগে ছুটছে আর কিশোরী তাকে থামাবার চেষ্টায় তার পিছনে ছুটছে। জাঁ দারুণ ভয় পেল, হয়ত এখুনি একটা দুর্ঘটনা ঘটবে।

জাঁ চেঁচিয়ে বলল—'ছেড়ে দাও ওটাকে।'

ওর কথায় কান দিল না কিশোরী।

কিশোরী হাঁপাচ্ছিল। ভয়ে আর রাগে গোরুটাকে গাল দিল—'কলিচ্ দাঁড়া। যমের অরুচি একটা। দাঁড়া বলছি, কলিচ্।'

ছোট ছোট পায়ে যতদূর সম্ভব কিশোরী মেয়েটি লাফাতে লাফাতে গোরুটার পিছনে ছুটছিল। সহসা সে উল্টে পড়ল, আবার উঠে ছুটতে লাগল। কিন্তু খানিকটা গিয়ে আবার পড়ল। গোরুটা পাগলের মতন তাকে হেঁচড়ে নিয়ে ছুটছিল। তার উল্টে-পড়া দেহের চাপে লুসার্ণো ঘাসের উপর লম্বা টানা দাগ পড়ল এবং যন্ত্রণায় কাঁদতে লাগল।

জাঁ আবার চেঁচিয়ে উঠল—'ছেড়ে দাও। ঈশ্বরের দোহাই ওটাকে ছেড়ে দাও।'

যা ঘটছিল তা দেখেই কিছু না ভেবে ও চিৎকার করছিল এবং নিজেও ওদিকে ছুটল। গোরুর দড়িটা নির্ঘাৎ যুবতীর কব্জিতে জড়িয়ে গেছে আর ক্রমশ বাঁধন চেপে বসছে। একটা চষা ক্ষেতের উপর দিয়ে ছুটে ও গোরুটার সামনে এল এবং ওর ছোটার বেগে জীবটা ভয় পেয়ে একদম নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ভাগ্য ভাল। জাঁ তাড়াতাড়ি আর তখুনি দড়ির বাঁধন খুলে যুবতীকে

ঘাসের উপর বসাল।

'হাড় ভাঙে নি ত?'

কিশোরী জ্ঞান হারায় নি। উঠে দাঁড়াল। দম নিল এবং শান্তভাবে জানুর উপর স্কার্ট গুটিয়ে যাওয়া হাঁটু-দুটো পরখ করতে লাগল। তখনও হাঁপাচ্ছে, কথা বলতে পারছে না।

'এই দেখ, এখানটা কেটেছে। তবে সাংঘাতিক নয়। হাঁটতে পারব। রাস্তায় হলে দেহ একেবারে কেটে ফালা ফালা হয়ে যেত।

কব্জিতে দড়ির বাঁধনে থেৎলানো গোলাপি ক্ষত-চিহ্নটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছিল, আঘাতের উপরে ঠোঁট বুলিয়ে থুতু লাগাল।

'কলিচ্ ঠিক বদমাস নয়, তবে গরম হওয়ার জন্যে আজ সকাল থেকে আমাদের মাথা খারাপ করে দিয়েছে···লা বর্ডেবিতে ওটাকে ষাঁড় দেখাতে নিয়ে যাচ্ছি।'

'লা বর্ডেরি?' বলল জাঁ—'ভালই হয়েছে। আমিও ত ওখানে যাচ্ছি। তোমার সঙ্গেই যাব।'

কিশোবীর সাথে কথা বলতে বলতে হাঁটতে লাগল জাঁ। বছর চোদ্দ বয়স হলে হবে কি রোগা চেহারার জন্যে এখনও তাকে খুকি খুকি মনে হয়। সে এবার সঙ্গীর দিকে তাকাল, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল তাকে·· দীর্ঘকায় যুবক, গায়ের রঙ তামাটে, মাথার বাদামি চুলগুলো ছোট ছোট করে ছাঁটা, পুরন্ত মুখমণ্ডলে অভিজ্ঞতার ছাপ। বছর উনতিরিশ বয়স যুবকের, মেয়েটির পাশে তাকে বুড়ো বলে মনে হচ্ছে।

'তোমাকে আমি চিনি। তুমি ত করপোরাল, ছুতোর মিস্ত্রি। মঁসিয়ে হোরদিকুইনের খামারে এখন চাষের মজুরি কর।'

গ্রামের লোকের দেওয়া নাম শুনে যুবক হাসল। তাকাল কিশোরীর দিকে। অবাক হয়ে দেখল, কিশোরী এর মধ্যেই ত পুরো যুবতী। ছোট ছোট কঠিন দু'টো স্তন। পানপাতার মতন মুখের ডৌল, গভীর কালো দুটো চোখ। আর রসে টসটসে পাকা ফলের মতন এক জোড়া পুরন্ত ওষ্ঠ। কিশোরীর পরণে ছাই-রঙ সার্ট আর কালো পশমের জ্যাকেট। মাথায় একটা গোল টুপি। রোদে-পোড়া দেহের রঙ তামাটে-হলুদ।

জাঁ বলল—'তুমি বোধ হয় বুড়ো মৌচির ছোট মেয়ে। তোমাকে চিনি না। তবে তোমার দিদি বুতোর আমার প্রেমিকা। গত বছর ওরা লা বর্ডেরিতে আমার সাথে কাজ করেছিল।

সহজ গলায় কিশোরী জবাব দিল—'ঠিক। আমি ফ্রান্‌কয়েস। আমার দিদি লিসা খুড়তুতো দাদা বুতোর সাথে কাজ করতে গিয়েছিল। এখন দিদির ছ'মাস···বুতো পালিয়েছে। সে এখন অরগারেস গ্রামের লা শ্যামেদ খামারে থাকে।'

জঁ। সায় দিল—'ঠিক বলেছ। আমি ওদের দুজনকে একসাথে দেখেছি।'

ওরা কয়েকটা মুহূর্ত নির্বাক হয়ে পরস্পরের দিকে তাকাল। একদিন সাঁঝের বেলায় দুই প্রেমিককে খড়ের গাদার আড়ালে দেখার কথা মনে পড়তে সে হাসছিল···আর কিশোরী ক্ষতস্থানটা এমনভাবে চুষছিল যেন থুতুতে থেঁৎলানো জায়গাটা এতেই সেরে যাবে।

নিথর হাওয়ার বুকে এ্যাঞ্জেলাসের ঘণ্টার আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ল।

জঁ। বলল —'এ কি, বারটা কখন এর মধ্যে বেজে গেছে? চল পা চালিয়ে চল।'

এতক্ষণে ওর নজরে পড়ল কলিচ্ শান্তভাবে লুসার্নো ঘাস ছিঁড়ে খাচ্ছে।

'আরে তোমার গোরুটা দেখছি জ্বালালে। কেউ দেখলে এখুনি···দাঁড়াও ওটাকে আমি আর কিছু খেতে দিচ্ছি।'

ওকে বাধা দিয়ে ফ্রান্‌কয়েস বলল—'ওকে ছাড। এ জমি আমাদের। সব্বনাশী আমাদের জমিতেই আমাকে ফেলেছে, সেই রগনি পর্যন্ত এ ধারের সব জমি আমাদের পরিবারের। এখান থেকে ওই পর্যন্ত আমাদের জমি। এর পাশের ক্ষেতখানা আমার কাকা ফৌআনেব। তার পাশের ক্ষেতখানা আমার পিসি গ্রানদির বউয়ের।'

ক্ষেত না মাডিয়ে ওবা উপত্যকার কিনারা বরাবর সুঁড়ি-পথ ধরে হাঁটছিল। দড়িতে বাঁধা গোরুটা পিছনে পিছনে চলছিল। দু'জনেব কারো মুখে আর 'রা' ছিল না। চাষীদের স্বভাবই এমনি···মাইলের পর মাইল ওরা পরস্পরের সাথে একটি কথা না বলেও পাশাপাশি হাঁটতে পারে।

ওদের বামদিকে সদর রাস্তা। ঘোডাব গাড়িগুলো সবেগে রাস্তা দিয়ে এর মধ্যেই ক্লয়েস নগবীব দিকে ছুটছে। অবশ্য ওখানকাব রাজার বেলা একটার আগে খুলবে না।

ফ্রান্‌কয়েস বলে উঠল—'ফৌআন কাকা আর রোজ কাকীকেও যেন গাড়ীতে দেখা যাচ্ছে।' একখানা ধাবমান গাডীর দিকে ও একভাবে তাকিয়েছিল। মাইল দেড়েক দূরে তখনও গাডীখানা দেখা যাচ্ছে। ওটা যেন একটা বাদাম কাঠের ঝিনুক-খোলা।

'ওরা শহরে উকিলবাবুর বাড়ী যাচ্ছে,'—বলল সে।

জঁ। বলল—'ঠিক। আমিও শুনেছি। তাহলে এটাই ঠিক হল? বুড়ো নিজের জমি-জমা দুই ছেলে আর এক মেয়ের মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা করে দিচ্ছে?'

'হ্যাঁ। তাই ঠিক হয়েছে। ওরা আজ সবাই মঁসিয়ে বেইলিহ্যাচির অফিসে যাচ্ছে।'

তখনও সে ধাবমান গাড়ীখানা দেখছিল।

'আমরা এ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না। কেন না এতে আমাদের কিছু এসে

যাবে না। অবশ্য বুতো এর সাথে জড়িয়ে আছে। দিদির ধারণা জমির ভাগ পেলে সে তাকে বিয়ে করবে।'

জঁা হাসতে লাগল।

বলল—'ওই বুতো একটা শয়তান! ওকে আমি ভালভাবেই জানি। মেয়েগুলোর কাছে ও খুব সহজেই মিথ্যেকথা বলে। আর মেয়েদের না পেলে থাকতে পারে না। মিষ্টি কথায় কাজ না হলে দুর্দান্ত হয়ে ওঠে।'

ফ্রানকয়েস চড়া গলায় বলে উঠল—'ওটা একটা শুয়োরের বাচ্চা! তুমি নিশ্চয় তোমার বোনের সাথে ওরকম ব্যবহার করতে না, পারতে না ওর পেটে একটা বাচ্চা দিয়ে এভাবে পালাতে।'

লা বর্ডেরির বিশাল খামারে ওরা হাজির হল। খামারের তিনদিকে গোয়াল, ভেড়ার খোঁয়াড় আর গোলা। কিন্তু কোথাও লোকজন নেই। এমন সময় রান্নাঘরের দরজায় একটি যুবতী বেরিয়ে এল। দীর্ঘদেহী না হলেও তার মুখ-চোখে বেশ সপ্রতিভ ভাব।

'কি ব্যাপার জঁা, আজ খাওয়া-দাওয়া করবে না না-কি?

'এখুনি আসছি মাদাম জ্যাকুলিন।'

রগনির রাস্তা-সারাইয়ের মিস্ত্রি কগনেটের মেয়ে ও। তাই ওকে সবাই বলে লা কগনেত্তি। বারো বছর বয়সে ঝিয়ের কাজ নিয়ে খামারে এসেছিল এবং এখন ঝি-চাকরদের খবরদারির কাজ করে। মহিলার মতন খাতির পাওয়ার জন্যে ও এখন সচেষ্ট।

যুবতী বলল—'আরে তুমি ত ফ্রান্‌কয়েস। ষাঁড় দেখাতে এসেছ বুঝি। তোমাকে বাপু একটু অপেক্ষা করতে হবে। রাখাল মঁসিয়ে হোরদিকুইনের সাথে ক্লয়েসে গেছে। এখুনি ফিরে আসবে। এতক্ষণ ত আসার কথা।

জঁা রান্নাঘরে ঢুকতেই যুবতী তার কোমর জড়িয়ে ধরে বুকে মুখ ঘষতে সুরু করল। কেউ যে দেখে ফেলতে পারে সে খেয়ালও নেই। হাসতে লাগল। যুবতী দারুণ কামুকী। রাতে কর্তার সাথে শুয়ে তার কাম জ্বালা মেটে না। আরও কাউকে চায় ও।

খামারের তিনভাগ জুড়ে রয়েছে একটা সারের গাদা। পাশে একখানা লম্বা পাথরের বেঞ্চি। ফ্রান্‌কয়েস বেঞ্চির উপরে বসে পড়ল।

আধঘণ্টা পরে রুটির টুকরো মাখন মাখিয়ে খেয়ে বাইরে বেরিয়ে এল জঁা। তখনও বসেছিল ফ্রান্‌কয়েস, চলে যায় নি। তার পাশে বসে পড়ল জঁা। গোরুটা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। লেজ দোলাতে দোলাতে ডাকছে।

'বিশ্রি ব্যাপার ত! রাখাল এখনও ফিরল না।'—বলল জঁা।

মেয়েটি কাঁধ নাচাল। তার খুব তাড়া নেই। ওরা আবার চুপ করে বসে রইল।

এক সময় সে জানতে চাইল—'আচ্ছা কর্পোরাল, তোমার নাম কি শুধু জঁা?

'না। জঁা ম্যাকার্ত।'

'তোমার বাড়ী ত আমাদের এদিকে নয়, তাই না?'

'না, দক্ষিণ থেকে এসেছি। যে শহরে থাকতাম তার নাম প্রাসানস্।'

ওর দিকে তাকিয়ে ওকে নিরীক্ষণ করল মেয়েটি। অবাক হল ভেবে যে অতদূর থেকেও মানুষ আসতে পারে!

জঁা তখন বলছিল—'সলফারিনো থেকে এলাম ইতালি। তারপর ওখান থেকে চলে এলাম আঠার মাস আগে। সেনাবাহিনী আমাকে ছেড়ে দিল। তখন এক বন্ধু আমাকে এখানে নিয়ে এসেছিল। পেশায় ছিলাম ছুতোর। কিন্তু ছুতোরের কাজের অভাব, আর নানা ঘটনাও ঘটল, কাজেই খামারেই রয়ে গেলাম।'

ওর মুখ থেকে বড় বড় চোখের দৃষ্টি বারেকের জন্যও না সরিয়ে যুবতী সহজ গলায় বলল—'ও!'

কিন্তু ঠিক তখুনি কাম-জ্বালায় অধীর হয়ে কলিচ্ আবার ডেকে উঠল এবং বন্ধ গোয়ালের ভিতর থেকে ফোঁসফোঁসানির আওয়াজ ভেসে এল।

জঁা বলে উঠল—'বোঝ এবার! শয়তান সীজার ঠিক গাইটার ডাক শুনেছে। শুনছ ত ওখান থেকেই ওর সাথে কথা বলছে। ওর কাজ ওর ভালই জানা আছে, উঠোনে একটা গাই-গোরু আনলেই হল। ঠিক গন্ধ পাবে। আর জানে ত কি করতে হবে।'

একটু থামল। তারপর আবার বলতে লাগল জঁা—'মনে হয় রাখাল মঁসিয়ে হোরদিকুইনের সাথেই ওখানে রয়েছে। যদি চাও ত ষাঁড়টা আমি বাইরে আনতে পারি। আমরা কাজটা করাতে পারব।'

ফ্রান্কয়েস বলল—'বেশ ত চেষ্টা করা যাক!'

বেঞ্চি থেকে ও উঠে পড়ল।

গোয়ালের দরজা খুলতে খুলতে জঁা শুধাল—'তোমার গোরুটাকে বাঁধতে হবে?'

'না, না। দরকার নেই। গাইটা তৈরী। এক ইঞ্চি নড়বে না।'

গোয়ালের খোলা দরজা দিয়ে নজরে পড়ল—ভিতরে গোরুগুলো দু' সারে বাঁধা দু'ধারের দেওয়াল ঘেঁষে। সংখ্যায় গোটা তিরিশ। কয়েকটা বিছানো খড়ের উপর শুয়ে জাবর কাটছে আর বাকিগুলো ডাবায় মুখ ডুবিয়ে বিট-পালঙের শিকড় চিবোচ্ছে।

কালো রঙের উপর সাদা ডোরা-কাটা ফ্রেসিয়ান জাতের ষাঁড়টা এক কোণে ঘাড় উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। যেন তার কাজ করার জন্যে সে তৈরী।

বাঁধন খুলে দিতেই সীজার ধীরে ধীরে বাইরে বেরিয়ে এল। তাজা হাওয়া আর রোদের মধ্যে এসে গোরুটা প্রথমে থামল অবাক হয়ে, নিথর হয়ে দাঁড়াল কয়েকটা মুহূর্ত। যেন তার পা চারখানা জমে পাথর, লম্বা লেজটা এধারে-

ওধারে দোলাল। ঘাড় ফুলিয়েছে, বাইরে বাড়ানো নাকে শ্বাস টানছে। কলিচ্ অনড়। কিন্তু তার নজর ওর দিকে, নরম গলায় ডাকছে মাঝে মাঝে। এবার ষাঁড়টা কাছে এগিয়ে এল। সবেগে গাই-গোরুটার নিতম্বে নাক ঘসল, জিভ বেরিয়ে এসেছিল। নাক দিয়ে লেজটা সরিয়ে তার নিতম্ব চাটতে লাগল। গোরুটা ওর খুশি মতন কাজে বাধা দিল না, নড়ল না একটুও। শুধু মাঝে মাঝে গাইটার গায়ের চামড়া কেঁপে কেঁপে উঠছিল। জ্যঁা আর ফ্রান্‌কয়েস হাত ঝুলিয়ে গম্ভীরভাবে দাঁড়িয়েছিল।

সীজার তৈরী হয়েই একসময় কলিচের পিঠে লাফিয়ে উঠল; সহসা এমনি-ভাবে লাফিয়ে ওঠায় তার দেহের ভারে মাটি কেঁপে উঠল। গাই-গোরুটা সরল না। ষাঁড়টা সামনের দু পা দিয়ে গাই-গোরুটার নিতম্ব চেপে ধরল। কিন্তু গাই-গোরুটা বড় জাতের। তার দেহ এত দীর্ঘ যে ষাঁড়টা তার নাগাল পেল না। অবস্থা বুঝে ষাঁড়টা আরও জোরে লাফিয়ে উঠল, কিন্তু অবস্থা আয়ত্তে আনতে পারল না।

ফ্রানকয়েস বলল—'ষাঁড়টা বড় ছোট।'

জ্যঁা বলল—'হ্যাঁ, একটু ছোট। ওতে কিছু যাবে আসবে না, ঠিক লাফিয়ে উঠবে।'

কিশোরী ঘাড় নাড়ল। কিন্তু যেমনি দেখল আবার লাফিয়ে উঠেও সীজার পড়ে গেল তখন তার মন বদলাল।

'না, আমাদের সাহায্য করতে হবে। ঠিক জায়গায় না দিলে নষ্ট হবে, গাইটা বীজ ধারণ করতে পারবে না।'

যেন খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে চলেছে তাই অবিচল নিষ্ঠা আর শান্তভাবে সে এগিয়ে এল। নিষ্ঠার জন্য তার মুখমণ্ডল ভাবলেশহীন, চোখ দুটো আরও ছায়াচ্ছন্ন এবং ওষ্ঠযুগল বিস্ফারিত। দৃঢ়ভাবে হাত বাড়িয়ে ষাঁড়টার লিঙ্গ চেপে ধরে উঁচু করল। যেমনি বুঝতে পারল, যোনি-মুখের কাছাকাছি পৌঁছেছে অমনি সীজার সব শক্তি জড়ো করে চাপ দিল এবং এক চাপে যতদূর সম্ভব ভিতরে প্রবেশ করিয়ে দিল। তারপর বার করে নিল। শেষ হয়ে গেল, বীজ সে ভিতরে ঢেলেছে। বীজ বপনের পর জমির বুক যেমন নিথর হয়ে থাকে গাই-গোরুটা তেমনি নিথর কঠিনতায় দাঁড়িয়ে রইল। যেন সে এমনিভাবে শুক্র-বীজকে গ্রহণ করছে অনড় দেহে। এমন কি সঙ্গমের সময়ও তার দেহ একবারের জন্য কাঁপে নি। ষাঁড়টা নেমে পড়ল, তার দেহের ভারে আবারও মাটি কেঁপে উঠল।

ফ্রানকয়েস ওখান থেকে হাত সরিয়ে নিল।

'ব্যস! মিটে গেল।'

'সুন্দর হয়েছে!' দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বলল জ্যঁা। কোনও মজুর যদি কোনও কাজ তাড়াতাড়ি আর সুষ্ঠুভাবে হতে দেখে তার মনে যেমন আনন্দ হয় তেমনি

আনন্দ এখন জাঁয়ের মনে।

যুবতীরা তাদের গোরু নিয়ে ষাঁড় দেখাতে এলে খামারের ছোকরারা যেমন অশ্লীল রসিকতা করে তেমন রসিকতা করার ইচ্ছে তার মনে জাগল না। কিশোরীটি সপ্রতিভভাবে এই প্রয়োজনীয় কাজটা এমন সহজে সারল যে ঠাট্টা উপহাস করার কিছুই ছিল না। কাজটা খুবই স্বাভাবিক, তাই।

কিন্তু দরজায় দাঁড়িয়ে দেখছিল জ্যাকুলিন।

তার স্বাভাবিক উপহাস-উচ্ছল কণ্ঠে বলে উঠল—'বা, তুমি ত বেশ পাকা দেখছি। মনে হয় তোমার ছোকরা প্রেমিক নিজের কাজ জানে না।'

জাঁ খুব জোরে হেসে উঠল, কিন্তু ফ্রানকয়েসের সারা দেহ সহসা সিঁদুর হল। শরম আর বিহ্বলতার ভাব সে ঢাকতে চাইল। সীজার গোয়ালে ফিরে গেছে। আর গাদায় জন্মানো এক মুঠো ঘরের গাছ ছিঁড়ে কলিচ্ চিবোতে লাগল। পকেট থেকে রুমাল বার করল ফ্রানকয়েস। বাঁধন খুলে চল্লিশটা ফ্রাঙ্ক বার করে রাখল।

বলল, 'এই খরচ রইল। চললাম।'

ফ্রান্‌কয়েস তার গোরুর দড়ি ধরে চলতে লাগল এবং জাঁ বীজ-থলি নিয়ে হাঁটতে লাগল তার পিছনে। তারা একসময় সঙ্কীর্ণ পথ ধরে পাশাপাশি হাঁটছিল। ওদের দেখে জ্যাকুলিন ঠাট্টাচ্ছলে বলল—'দেখ, একসাথে ত যাচ্ছ, কোন বিপদ হবে না ত? ছুকরি তার কাজ জানে।'

এবার ওদের কেউ আর হাসল না। ওরা ধীর পায়ে হাঁটছিল। শুধু পাথরের উপর ওদের জুতোর নালের আওয়াজ জাগছিল নইলে চারধার নিস্তব্ধ। ওর মাথার গোলাকার টুপির আড়াল থেকে কয়েক গোছা চুল ছড়িয়ে পড়েছে শিশুর মতন ঘাড়ের উপর···ব্যস। এটুকু ছাড়া ফ্রানকয়েসের মুখের আর কিছুই জাঁয়ের নজরে পড়ছে না।

বেশ কিছুটা পথ যাওয়ার পর ফ্রান্‌কয়েস বলল—'পর পুরুষের ঠেস দিয়ে এভাবে কোনও মেয়েকে ঠাট্টা করা ওর অন্যায়। আমি অবশ্য ওর জবাব দিতে পারতাম।'

জাঁয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে ও অবাক হয়ে রইল।

'কথাটা ঠিক, তাই না? লোকে বলে মাগি এমন ভাব দেখায় যেন সে মঁসিয়ে হোরদিকুইনের বউ? বোধ হয় তুমিও কিছু কিছু জান, জান কি?'

কথাটা শুনে বেকায়দায় পড়ল জাঁ, তাই বোকার ভান করল।

'আচ্ছা, তার যা' ভাল লাগে করতে পারে। এটা তার নিজের ব্যাপার।'

পিছন ফিরে ফ্রান্‌কয়েস আবার হাঁটতে লাগল।

'হ্যাঁ, তা ঠিক। ঠাট্টা করছিলাম। তুমি আমার বাবার বয়সী তাই যা' বলেছি তাতে কিছু এসে যাবে না। তবে দেখ, বুতো আমার দিদির সাথে খারাপ ব্যবহার করার পর ঠিক করেছি বরং নিজের হাত-পা কেটে ফেলব তবু

কোনও প্রেমিকের কাছে ধরা দেব না।'

জঁ। মাথা নেড়ে সায় দিল। ওরা নিঃশব্দে আবার হাঁটতে লাগল। নিজের ক্ষেতে পৌঁছে জঁ। বিদায় নিল।

'আসি তাহলে!'

ফ্রান্‌কয়েস বলল—'চললাম। অনেক ধন্যবাদ।'

সহসা ভীতকণ্ঠে জঁ। বলে উঠল—'কলিচ্‌ যদি আবার বদমাইশি করে তবে কি হবে? তোমার সাথে কি তোমাদের বাড়ী পর্যন্ত যাব?'

কিশোরী অনেকটা পথ চলে গিয়েছিল। সে ঘুরে দাঁড়াল এবং নিঃশব্দ গ্রামপ্রান্তে তার কণ্ঠস্বর ভারি শান্ত শোনাল—'না না। তার দরকার নেই। ওর আশ মিটেছে, আর বদমাইশি করবে না।'

জঁ। বীজ-থলিটা তার কোমরে বেঁধে নিল। ঢালু জমিতে উৎরাইয়ের দিকে বীজ ছড়াতে লাগল। এক সময় চোখ তুলে দেখল, দোলায়মান দেহ, ধীরগামী গাই-গোরুটা নিয়ে ফ্রান্‌কয়েস মাঠ পেরিয়ে হাঁটছে। জঁ। যখন আবার চড়াইয়ের দিকে মুখ ফিরিয়ে বীজ ছড়াতে স্বরু করল তখন আর ফ্রানকয়েসকে দেখতে গেল না। কিন্তু উৎরাইয়ের দিকে নামতেই দেখল, ফ্রান্‌কয়েস যেন একটা লিলি ফুল······ছোট্ট শরীর, সরু কোমর, মাথায় একটা সাদা টুপি। বার তিনেক ওকে দেখল······প্রতিবার ওর দেহ ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হচ্ছে। তারপর আবার যখন ওকে দেখার জন্য চোখ তুলল তখন সে বাঁক ফিরে গীর্জার আড়ালে চলে গেছে।

বিকেল গড়িয়ে আঁধার হওয়ার আগে পর্যন্ত বীজ বুনল জঁ।।

জমির উপর দিয়ে একভাবে বড় বড় পা ফেলে বীজ বুনতে বুনতে তার বীজ-থলি নিঃশেষিত হল। আর বীজগুলো মাটিতে পড়ে অঙ্কুরে পরিণত হওয়ার অপেক্ষায় মাটিতেই মুখ লুকোল।

২

শাটোডুন যাওয়ার পথে রু গ্রোত্রস-এর বামধারে ক্লয়েস শহরে দলিলকারী সরকারী কর্মচারী মৈত্রী বৈইলিহ্যাচি মহাশয়ের বাড়ী। সেদিন শনিবার। বারান্দার ডান দিকে রাস্তার ধারের ঘরখানায় অফিস। রোগা, বিবর্ণ মুখ বছর পনের বয়সের ছেলেটি অফিসের অধস্তন কেরাণী। জানালার রেশমী পর্দা সরিয়ে সে রাস্তায় লোকজনের চলাচল দেখছিল। অফিসে আরও দু'জন কেরাণী আছে। একজন বুড়ো পেট-মোটা আর নোংরা-পোশাক পরা কেরাণী। অন্য জন রোগা, রুগ্ন যুবক। তারা দু'জনে একখানা বড় ডেস্কে বসে লিখছিল। ঘরে সাত-আটখানা চেয়ার আর রয়েছে একটা আয়রণ-স্টোভ্‌······এটা ডিসেম্বর মাসের আগে কিছুতেই জ্বালা হয় না, এমন কি অল সেণ্টস্‌ ডে-তে বাইরে বরফ পড়লেও না। দেওয়ালের গায়ে সার সার পায়রার খোপ আর

দোমড়ানো কার্ড-বোর্ডের বাক্সের মধ্যে ঠাসা অজস্র হলুদ-রঙ ফাইল সারা ঘর-খানা কালি আর ধূলো-ভরা পুরোন কাগজের গন্ধে ভরপুর।

দু'জন চাষী, একজন পুরুষ আর একজন রমণী, সম্ভ্রমপূর্ণ নিস্তব্ধতায় পাশা-পাশি বসে রয়েছে। বছর চৌত্রিশ বয়স রমণীর, দেহের বর্ণ ঘোরালো খুব, খুশি-ভরা মুখে বড়-সড় একটা নাক, কাজে কর্মে ক্ষত-বিক্ষত দুহাত পরনের কালো-রঙ মখমলের জামার উপর জোর করে রেখেছে। ঘরের চারধারে ডাঁই-করে রাখা এতসব মূল্যবান দলিল দস্তাবেজের উপর সে নজর বুলোচ্ছিল উজ্জ্বল দৃষ্টিতে। পুরুষটির বয়স আরও বছর পাঁচেক বেশী। একমাথা লাল-চুল সৌম্যদর্শন চেহারা। পরনে কালো-রঙ পাজামা আর আনকোরা নীল-রঙের ঢিলা জামা। সে লম্বা টুপিটা খুলে হাঁটুর উপর রেখে বসে আছে। তার সযত্নে কামানো লম্বাটে ধরনের উজ্জ্বল মুখে ভাবনার লেশমাত্র চিহ্ন নেই, একটা ঘুমন্ত বলদের মতন সে যেন তার চীনা-নীল বড় বড় চোখের ক্লান্ত দৃষ্টি মেলে সংসারটা নিরীক্ষণ করতে ব্যগ্র।

দরজা খুলে গেল। মৈত্রী বেইলিহ্যাচি তাঁর শ্যালক খামার-মালিক হোরদি-কুইনকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। তাঁরা এইমাত্র দুপুরের খাওয়া শেষ করেছেন। তাঁর মুখখানা টকটকে লাল এবং পঞ্চান্ন বছর বয়স হলেও তাঁকে এখনও যুবক মনে হয়। পুরু এক জোড়া ঠোঁট, কোটরগত দু'চোখের কিনারায় অজস্র রেখার জাল। তাঁকে সদাহাস্যময় মনে হয়। উনি প্যাঁস-নে ব্যবহার করেন এবং স্নায়বিক দুর্বলতায় মাঝে মাঝে নিজের দাড়ি উপড়ানো তাঁর একটা বদ-স্বভাব।

তিনি বললেন—'আরে ডেলহোমি, তুমি এসেছ! তাহলে ফৌআন বুড়ো অবশেষে জমিজমা ভাগ করে দেওয়া ঠিক করল, তাই না?'

রমণী তাঁর কথার জবাব দিল।

'হ্যাঁ, মঁসিয়ে বেইলিহ্যাচি। একটা চুক্তি করার জন্যে আমাদের আজ এখানে সকলের আসার কথা, আর কি করতে হবে আপনি আমাদের বলে দেবেন।'

'বেশ ত ফ্যানি, তাই আমরা করব··· এখন ত মাত্র একটা বেজেছে, ওদের জন্যে আমরা এখন অপেক্ষা করব।'

কেরাণীবাবুরা একবারও মাথা তুলল না। তারা প্রয়োজনের চেয়েও বেশী দ্রুততার সাথে কাগজের উপর খস্‌-খস্‌ করে লিখতে লাগল। আর ডেলহোমিরা নিঃশব্দে অপেক্ষা করতে লাগল। ফ্যানি ভাগ্যবতী। একজন ধনী চাষীর সাথে তার বিয়ে হয়েছে। লোকটি তার প্রেমে পড়েছিল এবং বিয়ের আগে তার পেটে বাচ্চাও আসে নি। ফ্যানি আশাও করে নি যে, আট একরের বেশী জমি সে বুড়ো ফৌআনের কাছ থেকে ভাগে পাবে। তার স্বামী এই বিবাহের জন্যে একটুও দুঃখিত নয়। কেন না এর চেয়ে ভাল কাজে উৎসাহী গৃহস্থী বউ হয় না। তাই সব কাজেই সে বউকে সামনে ঠেলে দেয়। তার নিজের বুদ্ধি খুব

সীমিত। তবে সে শান্ত আর সবল প্রকৃতির পুরুষ। তাই রগনি গ্রামে কোনও গোলামাল বাধলে তাকে মধ্যস্থতা করতে ডাকা হয়।

ঠিক তখনি কনিষ্ঠ কেরাণী রাস্তা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নোংরা-পোশাক আর মোটাসোটা কেরাণী বাবুকে ফিস্ ফিস্ করে কি যেন বলল এবং হাত আড়াল করে হাসতে লাগল।

যেসাস্ ক্রাইস্ট আসছে।

ফ্যানি স্বামীর দিকে একটু ঝুঁকল। তার কানে কানে বলল—'শোন, আমার হাতে সব ছেড়ে দাও বাবা মা আমাকে খুব ভালবাসেন। কিন্তু তাই বলে তাঁরা আমাকে ঠকাবেন তা হবে না। বুড়ো বদমাশ হায়াসিনথের উপর নজর রাখতে হবে।'

ত্ব'ভায়ের কথাই ও বলছিল। জানালা দিয়ে দেখেছে ত বড় ভাই আসছে। তার আসল নাম হায়াসিনথ, কিন্তু এ অঞ্চলের সবাই ওকে 'যেসাস্ ক্রাইস্ট' বলে। ছেলেটা পাঁড় মাতাল আর অকম্মার ঢেঁকি। সেনাবাহিনীতে থাকার সময় তাকে আফ্রিকায় লড়াই করতে পাঠান হয়েছিল, ফিরে আসার পর সে কেবল মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াতে লাগল। নিয়মিত কাজকর্ম করতে রাজী হল না। ভীত আরব জাতির কাছ থেকে এখনও মুক্তিপণ আদায়ে রত এমনি একটা ভাব নিয়ে সে চুরি-চামারি করতে লাগল। এটাই হল তার জীবিকা।

ঘরের মধ্যে ঢুকল সে। দীর্ঘ, শির-ওঠা দেহ। বছর চল্লিশ বয়স। শক্ত সমর্থ। এক মাথা কোঁকড়ানো চুল আর ছুঁচলো, অযত্ন-বর্ধিত লম্বা দাড়ি। যেন বিধ্বস্ত আর মাতাল ক্রাইস্টের মতন মুখ-চোখের ভাব—অনেক মেয়েকে সে ধর্ষণ করেছে আর রাজপথে দাঁড়িয়ে পথচারীদের সম্পত্তি লুঠ করে পালিয়েছে। সারা সকাল ও ক্লযেসে রয়েছে এবং এর মধ্যেই মদে চুর অবস্থা। পাজামা আর জামায় বিশ্রী কাদার দাগ, ছেঁড়া টুপিটা, মাথার পিছনদিকে ঠেলে দিয়েছে। একটা সস্তা ভিজে ভিজে সিগারে ধূমপান করছিল—উৎকট গন্ধ। তবু অপূর্ব সুন্দর ওর ত্বটো চোখ, জ্বলে ভরা দৃষ্টিতে দুষ্টু কৌতুকের ছোঁওয়া এবং দিলদরিয়া আনন্দময় এক বদমাশের পরিচয় পরিস্ফুট।

সে জানতে চাইল—'তাহলে বাবা-মা এখনও আসে নি?'

রোগা আর মেজাজী ছোকরা-কেরাণীটা রেগে-মেগে যখন মাথা নাড়ল তখন সে দেওয়ালের দিকে বারেক তাকিয়ে রইল। তার হাতের সিগার থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলি উঠতে লাগল। সে তার বোন আর ভগনীপতির দিকে তাকাল না এবং তারাও সে যে ঘরে ঢুকেছে তা গ্রাহ্যের মধ্যে আনল না। তারপর আর একটাও কথা না বলে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে ফটপাথে অপেক্ষা করতে লাগল।

বড়জোর মিনিট পাঁচেক, তার মধ্যেই বুড়ো ফৌআন-দম্পতি ধীরে ধীরে আর নিষ্ঠাসহকারে হেঁটে ঘরের মধ্যে ঢুকল। বাপের বয়স এখন সত্তর। এক-

সময় খুব কর্মঠ ছিল। কিন্তু এখন ন্যুব্জ দেহ শুকিয়ে দড়ির মত হয়েছে। ...যেন যে প্রিয় মাটিকে সে এতদিন ভয়ানক লোভে আঁকড়ে ধরেছিল সেই মাটিতেই সে ফিরে যেতে চায়। কিন্তু পা দুটোকে বাদ দিলে তার অন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এখনও সবল। নিখুঁতভাবে পোশাক পরেছে। মানানসই হ্রস্ব জুলপিতে সাদা রঙ। পাতলা মুখে পারিবারিক ঢঙের লম্বা নাসা এবং অজস্র বলিরেখা কঠোর ভাব ফুটিয়ে তুলেছে। ঠিক ওর পিছনে ফুটখানেক দূরে হাঁটছে ওর বউ...দেহের গঠন হ্রস্ব এবং মোটাসোটা। সোথ্-রোগের জন্য পেটটা জয়ঢাকের মত উঁচু। যবের ছাতুর মতন মুখের রঙ, গোল গাল চোখ আর মুখখানা চিক্কণ...কৃপণের থলির মতন দু'চারটে বলিরেখা দেখা দিয়েছে মুখে। বোকা স্বভাবের নারী...দীর্ঘকাল ধরে সংসারের জন্যে খেটে খেটে এখন শান্ত ভারবাহী একটা জানোয়ারে পরিণত হয়েছে। তাই স্বামীর কর্তৃত্বের কাছে সে সদাই বেতস্ পাতার মতন কম্পমানা।

ফ্যানি উঠে দাঁড়িয়ে বলল—'ও তোমরা তাহলে এসে গেছ!'

ডেলহোমিও চেয়ার থেকে উঠে পড়ল। বুড়ো-বুড়ীর পিছনে 'যেসাস ক্রাইস্ট'ও নিঃশব্দে আবার ঘরে এসে ঢুকল। জ্বলন্ত সিগারটার আগুন টিপে নেভাল এবং সেটা জামার পকেটে রাখল।

ফৌআন বলল -'তাহলে আমরা সবাই এসে গেছি। শুধু বুতো আসে নি। শয়তানটা কখ্খনো সময়ে আসবে না, আর কারো মতন স্বভাব নয় ওর।'

ওর বাবা যখন আপনমনে বকবক করছিল ঠিক তখনি বুতো ঘরে এসে ঢুকল—বেশ প্রাণবন্ত আর আনন্দময় চেহারা। ফৌআন পরিবারের দীঘ নাসাটা ওর মুখে থ্যাবড়ানো এবং মাংসাশী প্রাণীর মতন শক্ত হনু দুটো বেশ উঁচু। ওর কপালটা তোবড়ানো আর মাথার তালু ছুঁচলো। হাস্যোজ্জ্বল ধূসর চোখ-জোড়ায় কুশলতা ও ভয়ঙ্করতার স্পর্শ। বাপের কাছ থেকে নিজের অধিকার রক্ষার জন্য আসুরিক লোভ এবং জেদী স্বভাব সে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে এবং মায়ের কাছ থেকে পাওয়া ধনলিপ্সার স্বভাব তার মনের লোভ আর জেদকে আরও ভয়ঙ্কর করে তুলেছে।

অন্যদের অনুযোগ শুনে বুতো বলল—'শোন, লা শ্যামেদ থেকে ক্লয়েসের দূরত্ব পাঁচ লীগ।'

তারপর তারা সবাই মিলে তর্ক আর আলোচনা সুরু করল, জোরালো কর্কশ কণ্ঠে নিজেদের ব্যক্তিগত ব্যাপার বলতে লাগল...যেন তারা নিজেদের বাড়ীতে বসে রয়েছে। অফিসার ওদের কণ্ঠস্বর শুনে দরজা খুলে অফিসে বেরিয়ে এলেন।

'তোমরা সবাই এসেছ? বেশ ভিতরে এস।'

এটা যেন একটা আদালত ঘর। মঁসিয়ে বেইলিহাচি নিজের ডেস্কে বসে কাজ সুরু করলেন।

'তাহলে ফৌআন কর্তা, তোমার জীবিতকালেই তুমি তোমার স্থাবর-অস্থাবর সব সম্পত্তি তোমার ছেলে-মেয়েদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দেবে ঠিক কবেছ?'

বুড়ো কথা বলল না, অন্যরাও নির্বাক। ঘরের মধ্যে মৃত নিস্তব্ধতা।

অফিসার আবার বুড়ো ফৌআনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললেন—'কথাটা তাই নয় কি? আমার ধারণা তুমি মনস্থির করেই এসেছ?'

বুড়ো ঘুরে প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকাল।

তারপর বলে উঠল—'আমার তাই মনে হচ্ছে মঁসিয়ে বেইলিহ্যাচি। ফসল তোলার সময় আপনাকে কথাটা বলতেই বলেছিলেন আরও ভেবে দেখ। ভেবে দেখেছি, ভাগ বাঁটোয়ারা আমাকে করতেই ত হবে অবশেষে।'

থেমে থেমে কাটা কাটা শব্দে সে নিজের বক্তব্য ব্যাখ্যা করল। মাটিকে সে যুবতী রমণীর মতন ভালবাসে···যে রমণীর জন্যে মানুষ অনায়াসে খুন করে। বউ নয়, ছেলেমেয়েরা নয়, নয় আর কোন মানুষ তার কাছে এত প্রিয় ···প্রিয় শুধু তার মাটি—তার ক্ষেত, জমি। এখন সে বুড়ো হয়ে পড়েছে, নিজের রক্ষিতাকে সে ছেলেদের হাতে তুলে দিয়ে যাবে, ঠিক যেমন তার বাবা দেহগতভাবে অক্ষম হওয়ার পর তার উপর ভার দিয়েছিল জমি-জমার।

বুড়ো বলতে লাগল—'এই ত সেদিন পনীর বানাবার সময় রোজ মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। আজকাল বাজারে যেতেই আমার দম ফুরিয়ে আসে। তারপর মববার সময় ত আর তুমি মাটি সঙ্গে নিয়ে যাবে না, ছেড়ে তোমাকে যেতেই হবে, সব ছেড়ে যেতে হবে। অনেকদিন ধরেই ত খাটলাম, এবার শান্তিতে মরতে চাই, তাই চাও না রোজ?'

বুড়ী তখন বলল—'তাই চাই আমরা। ঈশ্বর সাক্ষী, ওটাই আমাদের মনের শেষ ইচ্ছে।'

ঘরের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল।

একসময় মঁসিয়ে বেইলিহ্যাচি বলে উঠলেন—'তোমার যুক্তিগুলো বিবেচনা-প্রসূত। কেউ কেউ ত জীবিতকালেই সম্পত্তি ভাগ-বাঁটোয়ারা করেই দেয়। আমি শুধু এর উপর একটা যুক্তি যোগ করছি। পরিবারের মধ্যে এ ধরনের ব্যবস্থা করতে পারলে আর্থিক দিক দিয়ে কিছু সুবিধা হয়। কেননা হস্তান্তর সম্পত্তির চেয়ে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া সম্পত্তির উপর দেয় করের পরিমাণ অনেক বেশী।

বুড়ো এতক্ষণ উদাসীনভাবে বসেছিল, এবার আর কথা না বলে পারল না।

'মঁসিয়ে, কথাটা কি সত্যি?'

'নিশ্চয়। এতে তোমাদের কয়েক শ' টাকা বাড়তি খরচ বাঁচবে।'

অন্যরা তখন খুব আগ্রহ দেখাল। এমন কি ভেলহোমির চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বুড়োরাও যেন আনন্দের ভাগ পেল। অবশেষে এটাই ঠিক হল,

কাজকর্ম মিটল, এতে ওদের খরচ অনেক কমবে।

অফিসার বললেন—'এবার শুধু আমার পরীক্ষা করার কাজটুকু বাকি রইল। অনেক বিবেচক লোক সম্পত্তির ভাগ বাঁটোয়ারার নিন্দা করেন। তাঁদের ধারণায় এটা পাপ কাজ। এর জন্যে পারিবারিক বন্ধন টুটে যায়। এ সম্পর্কে বহু চাঞ্চল্যকর মামলার উদাহরণ দেওয়া যায়। মাতা-পিতা সম্পত্তি ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দেওয়ার পর তাদের সাথে সন্তানরা দুর্ব্যবহার করে…।'

দুই ছেলে আর এক মেয়ে হাঁ করে তাঁর থা শুনছিল। তাদের চোখের পাতাগুলো পিট পিট করছিল আর গালেব থলথলে মাংস তিব তির করে কাঁপছিল।

ফ্যানি অভিমানিনী। বলে উঠল—'বেশ ত, বাবা ওভাবে যদি সবকিছু বিচার করেন তবে নিজের কাছে সর্বি ছু বেখে দিতে পারেন। ভাগাভাগির দরকার নেই।'

বুতো বলল—'আমবা সব সময় আমাদের কর্তব্য কাজ করেছি এবং করব।

'যেসাস্ ক্রাইস্ট' বড গলায় বলল—'খাটতে আমবা ভয় পাই না।'

চোখের ইঙ্গিতে মঁসিয়ে বেইলিহ্যাচি ওদেব থামতে নির্দেশ দিলেন।

'আমাকে সব কথা শেষ করতে দাও। জানি, তোমরা ভাল ছেলে-মেয়ে, কাজকর্মে নিষ্ঠা আছে। তোমাদের ক্ষেত্রে নিশ্চয় কোনও বিপদ আসবে না, এবং তোমাব বাবাকেও নিজেব কাজেব জন্যে ভবিষ্যতে একদিন অনুতাপও করতে হবে না।'

দীর্ঘ পঁচিশ বছব ধরে নিজের পেশায় উনি বত, মসৃণ বাক্যাংশে গঠিত কথাগুলো সাবলীলভাবে বলে চলেছেন, কথাব মধ্যে এতটুকু শ্লেষের চিহ্ন নেই। কিন্তু রোজ ফৌআন তাঁব কথা একটুও বুঝতে পারছিল না, সে শুধু বারে বারে মেয়ে আর ছেলেদের মুখের দিকে তাকাচ্ছিল। এই তিনজনকেই সে লালন পালন করেছে। স্নেহ-বিবর্জিত সংসারের গৃহিণীর কর্তব্য ছিল সেটা…মাঝে মাঝে অর্থ সাশ্রয়ের জন্যে ছেলে-মেয়েরা বেশী খাবার খেলে বকতে হয়েছে। বড ছেলের মুখের দিকে নজর পডতে সে শান্ত হল। এই বদমাশটা তার বাপ-মার কাছ থেকে জন্মগত সূত্রে কিছুই পায় নি। কোথাও কোন যোগ নেই, একেবারে ছন্নছাডা এবং হয়ত সে জন্যেই সে এই ছেলেটাকে আর সকলের চেয়ে বেশী স্নেহ করে।

অফিসার আবার বললেন—'দেখ তোমরা সবাই ভাগাভাগিতে রাজী হয়েছ এবার আমাকে শর্ত ঠিক করতে হবে। মাসোহারা যা দিতে হবে তাতে কি তোমরা রাজী?'

আবার নিস্তব্ধতা নামল, সবাই নীরব, নিথর। তামাটে মুখগুলোয় কঠোর ভাব ফুটে উঠল, বুঝি গম্ভীর রাজনৈতিক নেতারা সমগ্র সাম্রাজ্যের দাম কষছেন। তারপর জানবার আগ্রহ নিয়ে পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকাল

কিন্তু কারো মুখে কোন কথা নেই। বাপকে আবার অবস্থাটা বুঝিয়ে বলতে হল।

'না মঁসিয়ে, ও ব্যাপারটা নিয়ে আমরা এখনও আলোচনা করি নি। এখানে ত সবাই মিলিত হব তাই আমরা ব্যাপারটা মুলতুবি রেখেছি। কিন্তু এটা ত খুবই সরল ব্যাপাব, তাই না? আমি উনিশ সেটিয়ার জমির মালিক, আজকাল এর পরিমাণ সাড়ে নয় হেক্‌টার। কাজেই এখন আমি যদি এই জমি হেক্‌টাব পিছু একশ ফ্রাঙ্কে ভাড়া দিই তবে সাড়ে ন শ' ফ্রাঙ্ক ভাড়া পাব।'

পরিবারের লোকজনদের মধ্যে বুতোর সবচেয়ে কম ধৈর্য। সে চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠল।

'কি! হেক্‌টার পিছু একশ' ফ্রাঙ্ক! তুমি কি আমাদের বোকা ঠাউবেছ, বাবা?'

এবার টাকা-পয়সার ব্যাপার নিয়ে প্রথম তর্কাতর্কি সুরু হল। হাঁ, আঙুর ক্ষেত পঞ্চাশ ফ্রাঙ্কে ভাড়া দেওয়া যাবে। কিন্তু ফৌআন কি চাষের বারো সেটিয়ার জমি ওই হারে ভাড়া দিতে পারবে? পারবে কি ছ' একর গোচারণ-ভূমি কিংবা এ্যাজর নদীর চড়ার জমি ওই হাবে ভাড়া দিতে? ওখানকার মাঠে আবার ভাল জাতের ঘাসও জন্মায় না।

ফ্যানি নিন্দা-সূচক ভঙ্গিতে বলল—'দেখ বাবা, আমাদের সাথে এরকম ব্যবহার করো না!

জানুর উপর হাতের থাপ্পড় বসিয়ে বুড়ো একগুঁয়ের মতন বলল—'হেক্‌টাব পিছু একশ' ফ্রাঙ্ক পাওয়ার যোগ্য জমি। চাইলে কাল-ই আমি এই হারে ভাড়া দিতে পারি··· তাহলে তোরা কি দাম বলছিস্? বল, তোদের দাম কি, বল না শুনি?'

বুতো বলল—'ষাট্ ফ্রাঙ্ক!'

ফৌআন যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলল। দাম বজায় রাখার জন্য সে নিজের জমির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হল। এমন ভাল জমি যে, এখানে আপনা থেকে ফসল ফলে। ডেলহোমি এতক্ষণ নীরবে বসেছিল, এবাব স্পষ্ট বলে বসল—'এর দাম আশী ফ্রাঙ্ক, তার বেশী বা কম নয়।'

বুড়ো সঙ্গে সঙ্গে শান্ত হল।

'বেশ, আশী ফ্রাঙ্কই ধর। আমাব সন্তানদের জন্যে আমি আরও কিছু ত্যাগ করলাম।'

কিন্তু রোজের কৃপণ স্বভাব। সে তার জামা টেনে ধরে একটাই শব্দ আওড়াল—'না।'

যেসাস্ ক্রাইস্টের উদাসীন ভাব। পাঁচ বছর সে আফ্রিকায় ছিল, জমির প্রতি তার আর কোনও টান নেই। সে শুধু একটা জিনিসের জন্যই দারুণ উদ্বিগ্ন। নিজের ভাগ নিয়ে অর্থ রোজগার করবে শুধু। তাই মুখে বিদ্রূপ আর

আত্মম্ভরির ভাব নিয়ে সে অলসভাবে একঠায় নীরবে বসেছিল।

ফোঁআন বলে উঠল—'আমি বলছি, আশী, আশী ফ্রাঙ্ক! সব সময় আমি এক কথার মানুষ। ঈশ্বরের নামে শপথ করছি। এই হারে সাড়ে ন' হেক্টারের ভাড়া হবে সাতশ' ষাট ফ্রাঙ্ক। অর্থাৎ ভাঙা-ভাঙতি না করলে আটশ' ফ্রাঙ্ক। কাজেই বরাদ্দ ভাতা দাঁড়াল আটশ' ফ্রাঙ্ক! এটাই ন্যায্য প্রস্তাব।'

বুতো দারুণ জোরে হেসে উঠল। ফ্যানি প্রতিবাদে মাথা নাড়ল, যেন সে প্রচণ্ড আঘাতে বোবা হয়ে গেছে। বুড়ো ঠিক বলেছে, ন্যায্য কথাই বলেছে। কিন্তু তার সন্তানরা যতদূর সম্ভব কম দাম দিয়ে চুক্তি করার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। তাদের মনের ভয়ানক নীচতা নগ্ন হয়ে পড়েছে। শুয়োর কিনতে গিয়ে চাষীরা যেমন দর-কষাকষি করে ওরাও তেমনি দর-কষাকষি সুরু করেছে। ওদের মনে আর এতটুকু সততা নেই।

বুতো খিঁচিয়ে উঠল—'আট শ' ফাঙ্ক! তুমি বেশ আরামে থাকতে চাও, তাই না? বছরে আট শ' ফ্রাঙ্কে চার জন লোকের খাওয়া-দাওয়া হয়। তোমরা তাহলে বাড়তি খেয়ে মরবে!'

ফোঁআন মেজাজ গরম করল না। এই সব দর-কষাকষি, রাগ-প্রকাশ, মুখ-ঝামটা সবই খুব স্বাভাবিক। এ সব হবেই সে জানত। কাজেই সে শুধু নিজের দাবীতে অবিচল রইল শেষ পর্যন্ত।

'এক মিনিট থাম। এগুলোই সব নয়। বাড়ী আর বাগান আমরা আমরণ আমাদের দখলে রাখব। এবং এটা খুবই স্বাভাবিক। এবং যেহেতু আমাদের আর কোন ফসল থাকবে না এবং গাই-গোরু দুটোও হাতছাড়া হয়ে যাবে তাই বছরে আমাদের এক পেটি মদ, একশ' বাণ্ডিল জ্বালানি-কাঠ, সপ্তাহে দশ লিটার দুধ, এক ডজন ডিম আর তিন টুকরো পনীর চাই।'

বুকে যেন আঘাত লাগায় যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠল ফ্যানি—'ও বাবা!'

বুতো আর আলোচনায় অংশ গ্রহণ করল না। চেয়ার ছেড়ে উঠে সে ঘরময় জোরে জোরে পায়চারি করতে লাগল। চলে যাওয়ার জন্যে সে টুপিটাও হাতে নিয়েছে। যেসাস্ ক্রাইস্টও উঠে পড়েছে। তার ভয় হচ্ছিল হয় ত এসব তর্কাতর্কির ফলে সম্পত্তির ভাগাভাগি বন্ধ হয়ে যাবে। কেবল ডেলহোমি অবিচল। এই ভয়ানক একঘেয়েমির মধ্যে সে নাকের উপর একখানা হাত রেখে ধ্যানস্থ।

মঁসিয়ে বেইলিহ্যাচি অনুভব করলেন যে, ব্যাপারটার দ্রুত নিষ্পত্তির জন্যে এবার তাঁর কিছু বলা প্রয়োজন।

'দেখ, তোমরা ত জান বন্ধুরা মদ, জ্বালানি-কাঠ, ডিম এবং পনীর নিগম-সিদ্ধ। ওগুলো দিতেই হবে।'

অবশেষে ডেলহোমি ইঙ্গিত করল যে, সে কিছু বলবে।

'এ সব বলার জন্যে আমি দুঃখিত। কিন্তু বাবা যা চাইছেন তা' ন্যায্য।

আমরা তাঁকে বছরে আট শ' ফ্রাঙ্ক দিতে পারি কারণ জমি ভাড়া দিয়ে তিনি এ অর্থ অন্য জায়গা থেকে পেয়ে যাবেন·· আমরা কিন্তু সেভাবে জিনিসটা দেখছি না। তিনি ত জমি আমাদের ভাড়া দিচ্ছেন না, দান করছেন। তাই তাঁর এবং মায়ের যা খরচ লাগবে তা' আমাদের দিতে হবে।'

অফিসার স্বীকার করলেন—'ঠিক কথা। এসব ভাগাভাগি, হিসাবপত্রের এটাই আসল কথা।'

আবার এক প্রস্থ একঘেয়ে তর্কাতর্কি সুরু হল। বুড়ো-বুড়ী দম্পতির দৈনন্দিন খরচের জন্য কত প্রয়োজন তার চুল-চেরা বিচার চলতে লাগল। প্রতিটি প্রয়োজন নিয়ে আলোচনা করা হল। সব হিসাব শেষ হলে আবার গোড়া থেকে সুরু হল। কিছু যেন বাদ না পড়ে। বছরে দুটো জামা আর ছ'খানা রুমাল। প্রত্যেক দিন পয়সা হিসাবে চিনি-ভাতা।

এমনিভাবে প্রতিটি বিষয়ের চুল-চেরা বিচার করে খুঁটিনাটি খরচ বাঁচানোর জন্য চেষ্টা চলতে লাগল। অবশেষে তারা একটা হিসাব তৈরী করল। বছরে পাঁচ শ' ফ্রাঙ্ক। সন্তানরা সব রাগে চঞ্চল হয়ে উঠল, ওরা ঠিক করল সব কিছুর জন্যে পাঁচ শ' ফ্রাঙ্কেব বেশী আর একটি পয়সাও দেবে না।

তবু ক্যানি ক্লান্ত হয়ে পড়ল। প্রকৃত পক্ষে সে নিষ্ঠুর রমণী নয় এবং পুরুষদের চেয়ে তার মনে দয়ার প্রবণতা বেশী, কেন-না, মুক্ত পরিবেশে কঠোর পরিশ্রম করে তার মন এবং হৃদয় কঠোর হয়ে পড়ে নি। কাজেই আরও কোন সুবিধা-দানে সে রাজী হল। বলল যে, পরে তারা ঠিক করে নেবে। যেসাস ক্রাইস্ট কাঁধ নাচাল, কারণ অর্থের ব্যাপারে তার স্বভাব খুব দিল-দরিয়া। তার ওপর মদের ক্রিয়ায় তার মন কিছুটা অনুভূতি-প্রবণ হয়ে পড়েছে, তাই নিজের ভাগ থেকে কিছু অর্থ দিতে সে রাজী হল। যদিও তেমন ভাগ সে কোনও দিন দেবে না তা' তার জানা।

ওর বোন বলে উঠল—'তাহলে এখন আমরা পাঁচ শ' ফ্রাঙ্ক দিতে রাজী ত?'

সে জবাব দিল—'নিশ্চয় রাজী। বুড়োদের মজা করার রসদ ত দিতেই হবে।'

তার মা ছেলের দিকে স্নেহ-ভরা দৃষ্টিতে তাকাল। বুড়ো ফৌআন কিন্তু তখনও ছোট ছেলেব সাথে কথার লডাই করে চলেছে। প্রতিটি খরচ কমানোর প্রস্তাবে বুড়ো প্রতিরোধ করে চলেছে, একটু একটু করে পিছিয়ে আসছে। কয়েকটা বিষয়ে সে নাছোড়বান্দা। তার শান্ত জেদী মন রাগে ফুঁসছে। তারই রক্ত মাংসে গডা সন্তানদের সে পালন করে তুলেছে, এখন তারাই তার জীবিতকালে তার রক্ত শোষণ করার চেষ্টা করছে। সে ভুলে গেল যে, সেও একদিন তার বাবার সাথে এমনি ধরনের ব্যবহার করেছিল। হাত কাঁপছিল বুড়োর।

ফৌআন আওড়াতে লাগল—'তোরা নষ্ট-বীজের ফসল। ভেবে দেখ, কত

কষ্টে আমরা তোদের লালন পালন করেছি, আজ তোরা আমাদের মুখের রুটি কেড়ে নিচ্ছিস্। বিশ্রি লাগছে, তোদের সাথে কথা বলতে, ঘৃণা হচ্ছে। আমি যেন কবরে সেঁধিয়েছি। তোরা তাহলে ঠিক করেছিস, ভদ্র হবি না, সাড়ে পাচশ'র বেশী আর এক কপর্দকও দিবি না?'

সে যখন রাজী হতে চলেছে এমন সময় তার বউ তার জামায় টান দিল। ফিস্ ফিস্ করে বলল—'না!'

কয়েকটা মুহূর্ত ইতস্তত করে বুতো বলল—'এবং এটাই সব নয়, যে অর্থ তুমি আলাদা করে জমিয়ে রেখেছ তার কি হবে? যদি তোমার কাছে অর্থ থাকে তবে আমাদেব কাছ থেকে তুমি নিশ্চয় অর্থ নিচ্ছ না?'

সব শেষে বলার জন্যে সে কথাটা এতক্ষণ চেপে রেখেছিল, এবং ইচ্ছে করেই সে বাপের মুখের দিকে তাকাল। বুড়োর মুখখানা সাদা হয়ে গেছে।

সে জানতে চাইল—'কোন অর্থের কথা বলছিস?'

'যে অর্থ তুমি খাটাচ্ছ, শেয়ার থেকে লাভ হিসেবে যা পেয়ে লুকিয়ে রাখছ সেই অর্থ?'

এই গোপন ভাণ্ডার সম্বন্ধে বুতো সন্দেহ করেছিল, এখন নিশ্চিত হতে চাইল। একদিন আয়নার পিছন থেকে সে তার বাবাকে এক মুঠো নোট বার করতে দেখেছিল। পরের দিন এবং তার পরের দিনও সে নজর রেখেছিল, কিন্তু আর কোনও দিন কিছু নজরে পড়ে নি। আর গর্তটাও খালি ছিল।

প্রথমটায় ফৌআনের সারা দেহ বিবর্ণ হয়ে গেল, তারপর রাগে ফুঁসে উঠল। ওর সারা দেহ রাঙা হল। উঠে দাঁড়াল।

ভয়ঙ্কর কঠিন গলায় ফৌআন চেঁচিয়ে উঠল—'হারামজাদারা, তাহলে তোরা আমার পকেট হাতড়াচ্ছিস? এক কপর্দকও আমি কোথাও খাটাই না। শয়তান, তোদের জন্যে আমি অনেক খরচ করেছি। কিন্তু তোদের কাছ থেকে কি পেলাম? আমি বাড়ীর কর্তা, তোদের বাবা, তাই না?'

সে যেন নিজের কর্তৃত্ব ফিরে পেয়ে আবার সোজা হয়ে উঠল, দেহ আরও দীর্ঘ হল। বহু বছর ধরে তার বউ আর ছেলে-মেয়েরা পরিবারের কর্তা বলে তার কঠোর অত্যাচার মাথা পেতে সহ্য করেছে। এখন যদি তারা মনে করে থাকে যে, সে শেষ হয়ে গেছে তবে তারা ভুল করেছে।

অবহেলা প্রকাশ করে বুতো খিঁচিয়ে উঠল—'যাও, যাও, বাবা।'

হাত তুলে বুড়ো ধমক দিল—'থাম, বর্বর কোথাকার! থাম, নইলে মার লাগাব!'

ছোট ছেলেটা তখন আমতা আমতা করে নিজের আসনে বসল। আঘাতের স্বাদ যেন সে পেল, ছোটবেলার ভয়ের কথা তার মনে পড়ল। তার ইচ্ছা হল আঘাত প্রতিরোধ করার।

'তোমার হাসার প্রয়োজন নেই হায়াসিনথ্। চোখ নামাও ফ্যানি।

তোমাদের ভাগ ঠিক দিয়ে যাব। ঠিক বলছি। রোদের মতন আমার কথার নড়চড় হবে না।'

একমাত্র সেই দাঁড়িয়ে ভয় দেখাচ্ছিল, আর সব্বাই বসেছিল। পাছে বে-নিশানা একটা ঘুঁষি এসে লাগে তাই তার বউ ভয়ে কাঁপছিল। ছেলে-মেয়েরা আর নড়া-চড়া করছে না, নিঃশ্বাস ফেলছে না। তারা বাবার শাসন মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে।

'শোন আমার কথা, আমার ভাতা চাই ছ'শ' ফ্রাঙ্ক। নইলে আমি সব সম্পত্তি বিক্রি করে দেব, হ্যাঁ, বিক্রি করে দেব। সব অর্থ বার্ষিক মেয়াদীতে নিয়োগ করব। সব খরচ করে যাব এবং আমার মৃত্যুর পর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। তোমরা কি ছ'শ ফ্রাঙ্ক দেবে?'

ফ্যানি ধীরে ধীরে বলল—'বাবা, তুমি যা' বলবে তাই আমরা দেব।'

ডেলহোমি বলল—'ছ'শ' ফ্রাঙ্ক! বেশ তাই দেওয়া হবে।'

যেসাস ক্রাইস্ট বলল—'চুক্তিতে আমি রাজী।'

প্রতিবাদে দাঁতে দাঁত ঘষল বুড়ো। তবে নীরব থেকে চুক্তিতে রাজী হল। তাদের উপর এখনও ফৌআনের প্রভুত্ব রয়েছে। কঠিন চোখে তার অধীনস্থদের নিরীক্ষণ করতে লাগল বুড়ো। অবশেষে বসে পড়ল।

বলল—'বেশ! এটাই ঠিক হল। আমরা সবাই রাজী।'

বিবাদের পরিসমাপ্তির জন্য অপেক্ষা করছিলেন মঁসিয়ে বেইলিহাচি। বললেন—'তোমরা রাজী হয়েছ এতেই হবে·· এখন তোমাদের সর্ত জেনেছি দলিল লিখে ফেলব···তোমরা একজন সার্ভেয়ার দিয়ে জমি মাপিয়ে নাও। কার ভাগ কেমন হবে আঁকিয়ে নেবে। মাপ-জোক আর আঁকের কাজ শেষ হলে আমাকে দেবে। সংখ্যা বসিয়ে অংশ ঠিক করে দলিলে নির্দেশ করব।

বাইরে বেরিয়ে সমগ্র পরিবার রাজপথের উপর বারেক থমকে দাঁড়াল।

বুড়ো ফৌআন বলল—'তোমরা যদি বল তাহলে পরশু সোমবার আমি জমি মাপার ব্যবস্থা করতে পারি।'

ওরা রাজী হয়ে ঘাড় নাড়ল এবং রাস্তা ধরে কয়েক দলে ভাগ হয়ে হাঁটতে লাগল।

৩

রগনি গ্রাম। ক্লয়েস থেকে বাজোকিস লা-ডয়েনমুখী রাজপথটা সোজা গ্রামখানাকে ভেদ করে চলে গেছে। ওই পথের ধারেই ফৌআন পরিবারের বাড়ী। সোমবার সকালেই ঘুম ভেঙ্গে গেল বুড়ো ফৌআনের। সকাল সাতটা বেজে গেছে। কথা আছে গীর্জার কাছে সকলে এক সাথে মিলিত হবে। বাড়ী থেকে বেরোবার মুখেই তার দিদি গ্রাণ্ডির বউয়ের সাথে দেখা হয়ে গেল। বয়স তার আশী ছাড়িয়েছে, কিন্তু তবু এই সাত-সকালে সে উঠে পড়েছে। পাশের

বাড়ীর দরজায় সে দাঁড়িয়েছিল।

কেবল বয়সের জন্য নয় সম্পদের জন্যও পরিবারের সকলে গ্রাণ্ডির বউকে ভয় এবং শ্রদ্ধা করে। তার দেহ এখনও ঋজু, অতি দীর্ঘ, হাড্ডিসার এবং কঠোর। শুকনো ঘাড়ের শিরায় রক্তস্রোত নজরে পরে। মাথা আর মুখখানা শিকারী বাজপাখীকে মনে করিয়ে দেয়। পরিবারের লম্বা নাসা এখন বেঁকে কুৎসিত করে তুলেছে মুখখানাকে। গোলাকার বিস্ফারিত এক জোড়া চোখ। প্রায় সম্পূর্ণ টাক মাথাটা একখানা হলদে রুমালে ঢাকা। কিন্তু দাঁতগুলো এখনও অটুট আছে। এখনও সে মাংসের হাড় চিবোতে পারে। কাঁটাওয়ালা লাঠিখানা ছাড়া সে এক পা বাইরে বেরোয় না। লাঠিখানা হাতে উঁচু করে রাখে, প্রয়োজন হলে মানুষ এবং জানোয়ার পেটায়। যুবতী বয়সে একটি মেয়ে নিয়ে বিধবা হয়েছিল। কিন্তু মেয়েটিকেও সে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। হতভাগা মেয়ে মায়ের অমতে ভিনসেণ্ট বুতার্ক নামে এক গরীব যুবককে বিয়ে করতে চেয়েছিল। বিয়েও করেছিল। এই তাদের দোষ। মেয়ে আর তার স্বামী অভাবে ক্ষুধার জ্বালায় মারা গেছে। তাদের একটা ছেলে আর মেয়ে আছে। মেয়ে পলমায়ারের বয়স বত্রিশ আর ছেলে হিলারিয়নের বছর চব্বিশ বয়স। গ্রাণ্ডির বউ নাতি নাতনিকেও ক্ষমা করে নি। তারা অনাহারের জ্বালায় ধুঁকছে। তারা যে বেঁচে আছে কিনা গ্রাণ্ডির বউ তা একবার মনেও করে না, খোঁজও নেয় না। স্বামীর মৃত্যুর পর থেকে সে নিজেই চাষের কাজ দেখাশুনা করে। তিনটে গোরু আর একটা শুয়োর আছে। চাষের কাজের জন্যে আছে একজন চাকর। সবাই খামারে খাওয়া দাওয়া করে। সবাই তার কথা শোনে, তাকে ভয় করে।

দিদিকে দেখে শ্রদ্ধা জানাতে ফৌআন এগিয়ে গেল। তার দিদি তার চেয়ে দশ বছরের বড়। গ্রামের সকলেই বয়সের জন্য তাদের দু'জনকে শ্রদ্ধাভক্তি জানায়, খুব প্রশংসা করে তার দিদির কঠোরতা, অর্থ-লিপ্সা, রাশভারি স্বভাব এবং বাঁচবার প্রচেষ্টা দেখে।

ফৌআন বলল—'তোমাকে কয়েকটা কথা বলতে চাই দিদি। সব সম্পত্তি ভাগ-বাটোয়ারা করে দিচ্ছি।'

গ্রাণ্ডির বউ কোনও জবাব দিল না, শুধু হাতের লাঠিখানা সজোরে ধরে মাথার উপর ঘোরাতে লাগল।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা তোমার মত নিতে এসেছিলাম। দরজায় ধাক্কা দিয়েও কোন সাড়া পাই নি।

শীর্ণ কণ্ঠে গ্রাণ্ডির বউ চেঁচিয়ে বলল—'বোকা কোথাকার! আগেই ত বলেছি আমার মত। বেঁচে থাকতে থাকতে যদি নিজের সম্পত্তি ভাগ করে দিস ত বোকামি করবি। ওরা যদি ছুরি দিয়ে আমার গলা কাটতেও আসে, তবু আমি কিছুতেই এ কাজ করব না। হতভাগা ছেলেমেয়েদের জন্যে অপরে

আমার সম্পত্তি ভোগ করবে, আমাকে তাড়িয়ে দেবে? কখখনো না।'

ফৌআন বলল প্রতিবাদের স্বরে—'যখন আর তোমার লাঙল ধরবার ক্ষমতা থাকবে না, ক্ষেত, জমি অনাবাদী পড়ে থাকবে···'

'তখন থাকবে পড়ে। রোজ সকালে নিজের জমি-জমা দেখতে যাব। এক ইঞ্চি জমি দিয়ে দেওয়াব চেয়ে বরং জমিতে ঘাস জঙ্গল হওয়া ভাল।'

নিজেকে টেনে নিয়ে যখন সে সিঁড়ি দিয়ে উঠছিল তখন তাকে একটা মেয়ে শকুনি মনে হচ্ছিল। ভাইয়ের কাঁধে হাতের লাঠি ঠুকল সে, যেন এর ফলে তার বক্তব্য আরও গভীবভাবে তার মনে দাগ কাটবে।

'শোন, কথাগুলো মনে রাখিস। সব দিয়ে দিলে তোর হাতে যখন আর কিছু থাকবে না, ওবা তখন তোকে খানায় ফেলে দিয়ে আসবে, ভবঘুরে ভিখিরির মতন না খেয়ে মরবি···তখন আমার দরজায় আসবি না। তোকে যথেষ্টবার ত সাবধান করে দিয়েছি। তখন কি করব জানিস, শুনতে চাস্?'

অনুগত ছোট ভাইয়েব মতন অনুযোগ না কবে চুপ করে রইল ফৌআন।

আর গ্রাণ্ডিব বউ বাড়ীতে ঢুকে সজোরে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে চেঁচিয়ে বলল—'এই করব তখন। যা, রাস্তায় না খেয়ে মবগে যা।'

বন্ধ দরজার বাইরে ফৌআন নিথব দেহে কয়েক মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বিরক্তিতে কাঁধ নাচিয়ে গীর্জার পথ ধরল। নজরে পড়ল, ডেলহোমি আর যেসাস ক্রাইস্ট পরস্পরের থেকে গজ বিশেক দূরে দাঁড়িয়ে আছে। ওরা একটাও কথা বলল না। শুধু নীরবে তিনজনে মালভূমির কিনারা বরাবর হাঁটতে লাগল।

অবশেষে যেসাস ক্রাইস্ট বলে উঠল—'ওই যে দাঁড়িয়ে আছে।'

অভিজ্ঞ আর শিক্ষিত আমিন গ্রসবয়েস ওখানে দাঁড়িয়েছিল। সেও একজন চাষী, পাশের গ্রাম ম্যাগনলিসে থাকে। লেখাপড়া শেখার দরুন ওর সর্বনাশ হয়েছে। একবার ওকে যখন অরগারিস থেকে বগেন্সি পর্যন্ত জমির মাপ-ঝোক করতে ডাকা হয়েছিল তখন বউয়ের হাতে সম্পত্তি দেখাশোনার ভার দিয়ে সেখানে ও চলে গিয়েছিল। তখন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে তাকে অনবরত ঘোবাঘুরি করতে হত এবং তখনই সে মদে এমন আসক্ত হয়ে পড়েছিল যে মদ না খেয়ে ও এখন কোন সময় শান্ত থাকতে পারে না। পঞ্চাশ বছব বয়স হলে কি হবে, এখনও সে সমর্থদেহী পুরুষ। থলথলে মোটা বিশাল লাল মুখে অজস্র বেগুনি রঙ তিল-চিহ্ন। আর এই সাত সকালেও তাব মাতলামিব ঘোর কাটে নি। কারণও আছে। কাল রাতে মনটিগনিব মদ প্রস্তুতকারীদের ডেরায় এক সম্পত্তির ভাগাভাগির উৎসব ছিল। সেখানে সে আকণ্ঠ মদ পান করেছিল। কিন্তু এতে তার কাজের কোন ক্ষতি হয় না, মদ যত বেশী পান করে, তত সে কাজ বর্মে মনযোগী হয়···মাপজোক বা হিসাবে কোনও ভুল করে না। নিজের পেশায় দারুণ কুশলী বলে সবাই তার কথা মন দিয়ে শোনে।

গ্রসবয়েস বলল—'আচ্ছা, সবাই তোমরা হাজির। এবার কাজ সুরু করা যাক।'

ওরা আর বুতোর জন্যে অপেক্ষা না করে এগিয়ে চলল। খানিক আগে ওরা বুতোকে লে কর্ণেলিসে নিথরভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এসেছে…এ অঞ্চলের পারিবারিক চাষ-জমির মধ্যে ওটাই বিশালতম।

পকেট থেকে একখানা তেলচিটে নোট বই বার করে গ্রসবয়েস বলল—'বাবা ফৌআন, তোমার কথা মত তোমার জমি-জমার একখানা ছক তৈরী করে এনেছি। এখন সব জমিগুলো আমাকে তিনভাগে ভাগ করতে হবে। এবার তাই করব বন্ধুরা। সেটাই ত করা দরকার, তাই না? বল তোমরাও ত এটাই চাও।'

এমন সময় বুতো এসে হাজির হল।

আজকের এই জরুরী কাজে যোগ দেওয়ার জন্যে পাঁচজন পুরুষই তাদের সেরা পোশাক পরে এসেছে। ওরা সবাই নীরব। এই সীমাহীন চাষের জমি …ঠিক যেন সবুজ সমুদ্র। ওরা নির্জনে নির্বাসিত নাবিকের মতন সমুদ্রের তীরে দণ্ডায়মান।

বুতো এক সময় বলে উঠল - 'প্রতি জমিখণ্ড তিন ভাগ করতে হবে।'

গ্রসবয়েস মাথা নাড়ল। অমনি বিবাদ-তর্ক সুরু হল। অনেক বড় বড খামারের সাথে কাজ করার এবং ঘনিষ্ঠতা থাকায় ওর মতবাদ অনেক প্রগতিশীল …ছোট ছোট সম্পত্তির মালিকদের সাথে তাই তার মত মেলে না, সে প্রতিবাদ করে। বললে, জমিগুলোকে অজস্র ভাগে ভাগ করা ঠিক নয়। কেকের মতন জমি খণ্ড খণ্ড না করে নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করে ভাগ করা উচিৎ। এমনভাবে ভাগ করা অপরাধমূলক কাজ। কেউ যদি চাষের জমি নেয় ত আর কেউ নেবে গোচারণভূমি। জমি খণ্ড খণ্ড করার দরকার কি! তিন ভাগ করা হবে। তারপর তিনজনের মধ্যে লটারি করা হবে ··যার ভাগ্যে যেটা উঠবে, সে সেই ভাগ নেবে।'

বুতোর ছোকরা বয়স। সহজেই হাসে। সব ব্যাপারটা তার কাছে হাস্যকর মনে হল।

'ধর, আমার ভাগে কেবল গোচারণভূমি পড়ল, তাহলে আমি খাব কি? ঘাস? না না, আমি প্রত্যেক জমিরই কিছু কিছু ভাগ চাই। ঘাস-জমি চাই, গোরু আর ঘোড়ার জন্যে। আর গম ও আঙুরের ক্ষেত চাই নিজের জন্যে।'

ফৌআন সব শুনছিল, এবার সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল। এমনিভাবে পিতার কাছ থেকে পুত্রের কাছে জমির হস্তান্তর ঘটে। বিবাহ-সাদি হলে নতুন করে জমির দখল মেলে, জমির সাথে জমির যোগ হয়, পরিমাণ বাড়ে।

ফৌআন আর ডেলহোমির সমর্থন পেয়ে আমিন চাইছিল এ্যাজার উপত্যকা বরাবর সমান্তরাল তিনটে সীমানা-আল টেনে জমি তিন ভাগে ভাগ করতে।

কিন্তু বুতো বলল, উপত্যকার দিকে সমকোণ করে তিনটে ভাগ করতে। সে অনুযোগ করল যে ঢালুর দিকে চাষের জমি সঙ্কীর্ণ। তার কথা মতন ভাগ করলে সব শরিকের ভাগে কিছু কিছু নিকৃষ্ট জমি পড়বে। কিন্তু এভাবে না ভাগ করলে তৃতীয় ভাগেই সব নিকৃষ্ট জমি পড়বে। ফৌআন এবার রেগে গেল। জানাল, সব জমিরই গর্ভদেশ একই রকম। মনে করিয়ে দিল যে, তার বাবাও যখন মৌচি, গ্রাণ্ডির বউ এবং তার মধ্যে জমি ভাগ করে দিয়েছিল তখনও এমনিভাবে ভাগ করেছিল। তৃতীয় ভাগের পাশে ত মৌচির পাঁচ একর জমি রয়েছে। তারপর ডেলহোমির মন্তব্যে ওদের বিবাদ থামল—যদি মেনেও নেওয়া হয় যে, এই জমিগুও নিকৃষ্ট জাতের, কিন্তু প্রস্তাবিত রাস্তাটা যদি তৈরী হয়ে যায় তাহলে ওই জমির দাম হবে সবচেয়ে বেশী। ওই রাস্তাটা ত এই জমির পাশ দিয়েই তৈরী হবে।

বুতো বলে উঠল—'হ্যাঁ, হ্যাঁ। বগনি থেকে সোজাসুজি শাটোদুন পর্যন্ত রাস্তাটা তৈরী হবে শুনছি, ওটা লা বর্ডের খামারের পাশ দিয়ে যাবে। তবে তার এখনও অনেক দেরী।'

ওর প্রতিবাদ ওরা গ্রাহ্য করল না। দাঁতে দাঁত চেপে সে চাপা গর্জন করল।

গ্রসবয়েস তখন সীমানা ভাগ করছে। ওরা তার কাজ নিরীক্ষণ করতে লাগল। সবাই কড়া চোখে তাকিয়ে আছে। ওদের সন্দেহ একটু এদিক ওদিক হলেই গ্রসবয়েস ভাগ ছোট বড় করবে। ফৌআন দু হাত পাশে ঝুলিয়ে দাঁড়িয়েছিল। দেখছিল, নীরবে ওর সম্পত্তি কেমন ভাগ হয়ে যাচ্ছে।

বুতো নীচু হয়ে সহজাত অভ্যাসে এক মুঠো মাটি তুলে নিল এবং মুখের কাছে তুলল, যেন সে মাটির স্বাদ নিতে চায়। তারপর নাক মুখ কুঁচকে এমন একটা ভাব করল, বুঝি বলতে চায় এটাই সব সেরা মাটি। মাটিগুলো হাতের ফাঁক দিয়ে ফেলে এমন কথাও জানাল, যে, এই ভাগটা যদি সে পায় তবে ভাগাভাগি মেনে নেবে, নইলে নেবে না। সব জমি সমান ভাগ করার জন্য জেদ করবে। ডেলহোমি এবং যেসাস ক্রাইস্ট বিরক্ত হল, জানাল যে, তারাও চায় সব জমি ভাগ হোক। অবশেষে সব জমি ভাগ করা হল। একজন যে ধরনের জমি পেয়েছে অন্য শরিক তেমন জমি পেল না এমন অবস্থা আর থাকল না।

ফৌআন বলল—'চল, এবার আঙুর ক্ষেতে যাওয়া যাক।

গীর্জাটা পিছনে রেখে ওরা পাশের রাস্তা দিয়ে এগিয়ে গেল। এদিকটায় আঙুর ক্ষেত। দাবার ছকের মতন ক্ষেতগুলো পরপর সাজানো। ঘেঁষাঘেঁষি। ওরা বন্ধুর জমি পেরিয়ে যাচ্ছে, এমন সময় একটা গর্তের ভিতর থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

'বাবা! বৃষ্টি সুরু হয়েছে, হাঁসগুলো ছেড়ে দিচ্ছি।'

ও বোল্ডি···যেসাস ক্রাইস্টের মেয়ে। বছর বার বয়স। লালচে চুল ঝুঁটি করে বাঁধা। পাকানো দড়ির মতন পাতলা দেহ। ওর বিশাল মুখখানা বামদিকে ঘোরানো। সবুজ চোখের তারা দুটোয় ভয়ের লেশমাত্র চিহ্ন নেই। ওকে ছেলে বলে মনে হয়। পোশাক বলতে বাবার একটা পুরনো জামা গায়ে দিয়ে কোমরের কাছে গিঁট দিয়ে একটা দড়ি বেঁধেছে।

এই বুনো স্বভাবের মেয়েটার মা ছিল একটা ভবঘুরে যুবতী। একবার মেলা থেকে ফেরবার পথে যেসাস ক্রাইস্ট তাকে খাদের মধ্যে দেখতে পেয়ে নিজের গোপন ডেরায় নিয়ে এসেছিল। এই নিয়ে রগনিতে দুর্নামের ঝড় বয়েছিল। তিন বছর ধরে এই যুগল নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ করল। শেষে ফসল তোলার সময় এক সন্ধ্যেবেলায় লম্পট মাগি গ্রাম ছেড়ে ভাগল একটা মরদের সাথে। ও যেমনভাবে এসেছিল আবার ঠিক তেমনিভাবে সরে পড়ল। বাচ্চাটা তখন সবে মাই ছেড়েছে, বুনো জঙ্গলের মতন তার কঠিন প্রাণশক্তি···তারপর বড় হয়েছে। এবং হাঁটতে শেখার পর থেকেই সে বাপের জন্যে রান্নাবান্না করছে, বাবাকে সে ভয়ও করে আবার ভালও বাসে।

যেসাস ক্রাইস্ট রাগে ফুঁসে উঠল—'যা, রান্না করগে যা। নইলে দারুণ মার খাবি। বাড়ীঘর দেখবি, চোর ঢুকবে শেষে।'

বুতো বিদ্রূপের হাসি হাসল। যেসাস্ ক্রাইস্টের ঘরে চুরি হবে শুনে ব্যাপারটা সকলের কাছে মজার বলে মনে হল, তাই ডেলহোমি এবং অন্যরা না হেসে পারল না। বাড়ী বলতে একখানা সাবেক কালের ভাঙ্গা কুঠরি। তিন দিকে শুধু দেওয়াল···যেন শিয়ালের গর্ত। পাতার ছাউনি। আর সামনের দিকটায় বড় বড পাথর-সাজানো। বাপের সাথে বিবাদ করে পশু চোর ছোকরা এই ভাঙ্গা বাড়ীতে আশ্রয় নেয়। তারপর সামনের ফাঁকা দিকটায় পাথর সাজিয়ে দেওয়াল বানিয়েছে। দেওয়ালে দুটো গর্ত—একটা জানালা, আর একটা দরজা। দেওয়াল থেকে ঝুলছে কাঁটার ঝোপ আর জানালাটা ঢাকা পড়েছে একটা গোলাপ ঝাড়ের পিছনে। প্রত্যেকটি লোকই ওই স্থানটাকে বলে শাটো। আরাম কুঞ্জ।

আবার বৃষ্টি সুরু হল। সৌভাগ্যবশতঃ আঙুর ক্ষেতটা কাছেই আর নির্বিবাদে ওটার ভাগাভাগির কাজও শেষ হল। এখন শুধু এ্যাজর নদীর ধারের আট একরের মতন গোচারণ-ভূমির ভাগাভাগি বাকি রইল। কিন্তু এই মুহূর্তে দারুণ জোরে বৃষ্টি হচ্ছে। ওরা পাশের একটা বাড়ীর সদর দরজার কাছে দাঁড়াল। আমিন ঘরের মধ্যে ঢোকার কথা বলল।

'আচ্ছা, আমরা খানিকক্ষণ ত মঁসিয়ে চার্লসের বাড়ীতে বসতে পারি?'

কৌআন দাঁড়িয়ে ইতঃস্তত করছিল। তার ভায়রাভাই আর শালী বহু অর্থ উপার্জন করে এই জমিদারী কিনে এখানে ধনীর মতন বাস করছে, তাই তাদের সম্পর্কে তার মন শ্রদ্ধায় অবনত।

সে আওড়াল—'না, না। ওরা বেলা বারোটার সময় লাঞ্চ খায়, এখন ওদের বিরক্ত করা ঠিক হবে না।'

কিন্তু মঁসিয়ে চার্লস তখন বৃষ্টির অবস্থা দেখার জন্যে সিঁড়ির গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে। সে ওদের চিনতে পেরে ডাকল—'এস, এস। ভিতরে এস।'

তারপর তাদের সকলকে জবজবে ভিজে দেখে বললে সোজা রান্নাঘরে চলে যেতে এবং সেও ওখানে যাচ্ছে। ছ'এর কোঠার মাঝামাঝি তার বয়স, সুন্দর স্বাস্থ্য, মসৃণ করে দাড়ি কামানো। দু'চোখে লোভহীন দৃষ্টির ছোঁওয়া, পুরু আঁখিপল্লব। অবসরপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেটের মতন ভাবগম্ভীর মুখমণ্ডল। পরনে নীল রঙের জ্যাকেট, পায়ে লোমের স্লিপার এবং কেরাণীসুলভ ছোট্ট টুপি মাথায়, এই পোশাকে তাকে বিশিষ্ট এবং অভিজাত মনে হচ্ছিল। এমন একটা মানুষ সে যে সারাজীবন প্রভুত্ব-ব্যঞ্জক কাজ-কর্ম করেছে।

যখন চার্লস্ বদেউলের সঙ্গে বিয়ে হয় তখন লরা কৌআন শ্যাটোভুনে পোশাক তৈরীর মজুরি খাটত আর চার্লস ছিল ছোট্ট কাফে রু দ্য এ্যাঙ্গুলিমির মালিক। নব দম্পতির মনে উচ্চাশা বাসা বেঁধেছিল। তারা চেয়েছিল খুব তাড়াতাড়ি অজস্র অর্থ উপার্জন করতে। তাই ওরা একদিন শাত্রিসে পাড়ি জমাল। কিন্তু প্রথম প্রথম ভাল কিছু করতে পারল না, ওদের আঙুলের ফাঁক গলে অর্থ পড়ে যেতে লাগল। বৃথাই তারা সেখানে আর একটা কাফে খুলেছিল। তারপর খুলল রেস্তোরাঁর সাথে দোকান···সেখানে শুঁট্‌কি মাছ বিক্রি করত। তারা হতাশ হয়ে পড়ল কারণ কোন অর্থ তারা জমাতে পারছিল না। কিন্তু মঁসিয়ে চার্লস দারুণ উৎসাহী যুবক। অবশেষে রু আউকস জুইফ নামের রাস্তায় চার্লস একটা গণিকালয় কিনে ফেলল। দেখা-শোনা করার লোকের অভাবে গণিকালয়টার দুর্ণাম রটেছিল এবং সেখানে নোঙরার স্তূপ জমেছিল। এক নজর দেখেই অবস্থাটা বুঝতে পারল চার্লস। শার্ত্রিসে গণিকালয়ের চাহিদা আছে। শক্ত হাতে পরিচালিত করে এবং প্রগতিশীল চিন্তার মাধ্যমে অতিথিদের নিরাপত্তা ও আরাম-আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে পারলে গণিকালয়টি আবার জম-জমাট হয়ে উঠবে। দ্বিতীয় বছর সুরু হল। উনিশ নম্বরের বাড়ীখানায় রঙের প্রলেপ পড়ল, জানালায় জানালায় পর্দা টাঙানো হল, আয়না বসল ঘরে ঘরে। বাছা বাছা পরিচারক-পরিচারিকা নিযুক্ত হল···ফলে বাড়ীখানার এমন সুনাম সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ল যে, গণিকার সংখ্যা অল্পদিনে বেড়ে হল ছ'জন। সেনাবাহিনীর অফিসার দল, উঁচুপদের সরকারি কর্মচারীরা এবং তামাম শহরের গণ্যমান্যরা এই সংস্থার পৃষ্ঠপোষক হয়ে উঠল···তারা আর কোনও গণিকালয়ে রাত কাটাতে রাজী নয়। সেই সফলতা আজও বজায় রয়েছে। মঁসিয়ে চার্লসকে ধন্যবাদ। তাঁর লৌহকঠিন নিয়মানুবর্তিতা এবং পরিচালন-শক্তি, যা না-কি সে পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার হিসাবে লাভ করেছিল তারই ফলশ্রুতি এই সফলতা আনল।

মাদাম চার্লসও অসাধারণ কর্ম-কৃতিত্বের পরিচয় দিল। সব কিছুর উপর ছিল তার নজর· ·কোনও কিছু না হারায়, না নষ্ট হয় সেদিকে ছিল দৃষ্টি। আবার ধনী অতিথিদের প্রয়োজনীয় কোনও ছোটখাট বস্তু চুরি হলে তার গুণাগার দেওয়ার মতন মনও গড়ে তুলেছিল।

বছর পঁচিশ পূরবার আগেই মঁসিয়ে চার্লস বদেউল তিন লক্ষ ফ্রাঙ্ক জমিয়ে ফেললে। তারপর সারাজীবন ধরে তারা যে স্বপ্ন দেখত তা' পূরণ করার জন্য সচেষ্ট হল। বৃদ্ধ বয়সে গ্রামের পরিবেশে দুজনে অলস জীবন যাপন করবে। বাগানের মধ্যে থাকবে একখানা বাড়ী···ফুল ফুটবে চারধারে, পাখিরা কলরব করবে গাছে গাছে। তারা স্নেহ-মাখানো দৃষ্টিতে আবিষ্কার করল যে, তাদের মেয়ে এস্টেলি ভিন্ন পরিবেশে লালিত-পালিত হলেও, এ সংস্থা পরিচালনা করার অসাধারণ ক্ষমতা রয়েছে তার মধ্যে···এবং অলস জামাইয়ের মধ্যে পরিচালনা-ক্ষমতার যে অভাব রয়েছে তা মেয়েই পূরণ করেছে। কাজেই বছর পাঁচেক হল তারা এই রগনি গ্রামে অবসর-জীবন যাপন করতে চলে এসেছে। তাদের সাথে এসেছে তাদের ছোট্ট নাতনি ঈলোডি। মায়ের মতন সে এখন শার্টোড়ুনে কনভেন্টে পড়ে। ধর্মসংস্থার সিসটাররা কঠোর নৈতিক আদর্শে ঈলোডির চরিত্র গঠনের ভার নিয়েছে।

মঁসিয়ে চার্লস যখন রান্নাঘরে এল তখন একজন যুবতী ঝি ওমলেট তৈরীর জন্য ডিম ফাটাতে ফাটাতে উনুনে কড়াইয়ে চাপানো পাখির মাংসের দিকে নজর রাখছিল। মাখন দিয়ে মাংস রান্না হচ্ছিল। ওরাও বসেছিল সেখানে। বুড়ো ফৌআন, ডেলহোমি এবং অন্য সকলে উঠে দাঁড়িয়ে ও টুপি খুলে তার সাথে করমর্দন করল। ওরা প্রত্যেকে এর জন্য খুব আত্মপ্রসাদ অনুভব করল।

ঝি-কে কয়েকটা গ্লাস বার করতে বলে মঁসিয়ে চার্লস নিজে কুঠরি থেকে দু'বোতল মদ বার করল। সবাই উনুনটাকে ঘিরে বসল এবং রান্না মাংসের মনমাতানো আঘ্রাণ গ্রহণ করতে করতে তারিয়ে তারিয়ে মদ পান করল।

'এ নিশ্চয় এখানকার মদ নয়। সুন্দর পানীয়!'

'আর এক গ্লাস নাও···তোমার স্বাস্থ্য পান করা যাক!'

'তোমার স্বাস্থ্য!'

ওরা যখন পান শেষ করে গ্লাস নামিয়ে রাখল তখন মাদাম চার্লস রান্নাঘরে এলেন। সম্মানীয়া মহিলা। বাষট্টি বছর বয়স। বরফ-সাদা মাথার চুল ফিতেয় বেঁধেছেন। মোটা-সোটা দেহ। ফৌআন পরিবারের অন্যান্যদের মতন লম্বা নাসা। গায়ের রঙ বিবর্ণ গোলাপী। বহুকাল ধরে ছায়া-ঘেরা গীর্জার অঙ্গনে বাস করেছেন এমন সন্ন্যাসিনীর মতন সুন্দর শান্ত মুখশ্রী। আজ দু'দিন ছুটি বলে তাঁর নাতনি ঈলোডি রয়েছে রগনিতে। সেও ছিল দিদিমার সাথে। ভয়ানক নীরবতার মধ্যে সে দিদিমাকে আঁকড়ে ধরে ছিল। মেয়েটির রক্তশূন্যতা রোগ। মোটা-সোটা দেহ বার বছরের তুলনায় যথেষ্ট বড়। মাথায়

একমাথা বিবর্ণ কুৎসিত চুল। এই ছোট্ট মেয়েটা পড়াশুনার চাপে হয়ত কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়েছে।

'সুপ্রভাত!' বললেন মাদাম। বেশ সুগম্ভীর ভঙ্গিতে ভাই এবং ভাইপোদের সাথে করমর্দন করলেন। ওদের সাথে যে তাঁর একটা ব্যবধান রয়েছে তা' তাঁর ব্যবহারে পরিস্ফুট হচ্ছিল।

পাখির মাংসটা বেশীক্ষণ ফুটছে দেখে ম সিয়ে চার্লস বেশ অধীর হয়ে পড়ল। ডিম ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, সে হাত ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

'খাবার সময় হল আচ্ছা, আবার আমাদের দেখা হবে। বৃষ্টিও থেমেছে দেখছি।'

অনুশোচনায় ওদের মন ভরে গেল, ওরা বাড়ী থেকে বেরিয়ে এ্যাজর নদীর দিকে চলল। কিন্তু পথটা এখন নদীতে পরিণত হয়েছে। আবার বর্ষণ সুরু হওয়ার আগে আট একর গোচারণভূমির ভাগাভাগি ওদের শেষ করে ফেলতেই হবে।

এবার ওরা গোঁ ধরে হাঁটতে লাগল। ক্ষুধার জ্বালায় ওরা মারা যাচ্ছে। তা হোক! ভাগাভাগির কাজ ওদের শেষ করতেই হবে। একটা বিবাদ দেখা দিল। তৃতীয় ভাগে একটাও গাছ নেই, অথচ অন্য দুটো ভাগে বনানীর কিছু পড়েছে। কিন্তু অবশেষে সব মিটে গেল, ভাগাভাগি স্থির হল। আমিন কথা দিল যে, ভাগাভাগির বিবরণ সে পাঠিয়ে দেবে দলিল তৈরীর জন্য। আরও ঠিক হল যে, আগামী রবিবার সকালবেলায় বুড়ো ফৌআনের বাড়ীতে ভাগ্য পরীক্ষা করা হবে।

৪

ঠিক যেমনটা হয় তাই হল, পরের রবিবার পয়লা নভেম্বর। অলসেণ্টস্ ডে। ঘড়িতে নটা বাজল। সকাল বেলা। বাজোকি-লা-দয়েনের যাজক এ্যাবি গডার্ড, যিনি আবার রগনির এই পুরানো গীর্জারও যাজক, তাঁকে রাস্তার শেষ মাথায় দেখা গেল। নদীর সেতু পার হয়ে রাস্তাটা সোজা গ্রামের দিকে এসেছে।

আগের তুলনায় রগনি এখন ছোট গ্রাম। অধিবাসীর সংখ্যা কমে কমে দাঁড়িয়েছে তিন শ'তে। কয়েক বছর ধরে এখানকার গীর্জায় কোনও যাজক ছিলেন না। যাজকের জন্য গ্রামবাসীদের কোন উদ্বিগ্ন ভাবও ছিল না। গীর্জার পাশের অংশে গ্রামের আরক্ষা-বাহিনীর দফতর ছিল এক সময়। এখন ওদিকটা ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়েছে।

প্রতি রবিবার এ্যাবি গডার্ড দু' মাইল পথ হেঁটে দয়েন থেকে রগনি আসেন। বেঁটে এবং মোটাসোটা দেহ তাঁর। ঘাড়ে-গর্দানে বলে মাথা পিছনে হেলিয়ে হাঁটেন। স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য তিনি এই হাঁটার অভ্যাস বজায় রেখেছেন।

এ ররিবারে বুঝতে পারছেন যে, তাঁর দেরী হয়েছে। জোরে জোরে হাঁটার জন্য হাঁপাচ্ছেন। শ্বাস নিচ্ছেন হাঁ করে। সন্ন্যাস রোগাক্রান্ত মুখের থলথলে মাংসের আড়ালে থ্যাবড়া নাক আর ধূসর কুৎকুতে চোখ-জোড়া ঢাকা পড়ে গেছে দেখা যাচ্ছে না। তুষারের ঘনঘটায় আচ্ছন্ন মেঘলা আকাশ। গত সপ্তাহ কেটেছে বৃষ্টি-বাদলার মধ্যে। এখন শীতের মরশুম সুরুর পরিবেশ। তবু যাজকমশাই তাঁর তিন-কোণা টুপীটা হাতে নিয়ে খোলা মাথায় হাঁটছেন। মাথায় এক মাথা লাল চুল, মাঝে মাঝে ধূসরতার স্পর্শ।

রাস্তা এবার সোজা উৎরাইয়ে নামছে, পাথরের সেতুমুখে এ্যাজর নদীর বাম তীরে দু একখানা বাড়ী নজরে পড়ছে। জোরে জোরে পা ফেলে যাজক মশাই জায়গাটা পেরিয়ে এলেন। নদীর দক্ষিণ তীর থেকে সুরু হয়েছে গ্রামের বসতি।

বাড়িগুলো পথের দুধারে। খান কয়েক আবার রয়েছে পাহাড়ের গায়ে। সেতু পার হলেই মেইরির স্কুলবাড়ি। একটা পুরোন খামার বাড়ীকে চুণকাম করিয়ে আর খানিকটা দোতলা বানিয়ে নেওয়া হয়েছে স্কুলের জন্য। একটু ইতঃস্তত করে যাজক মশাই খালি স্কুলবাড়ীর মধ্যে একবার উঁকি দিলেন। রাস্তার দুধারে মুখোমুখি করে দুটো শুঁড়িখানা। ঘুরে ও দুটোর দিকে একবার দেখলেন। তারপর ভাবলেন যে চড়াইগা পাশের সুঁড়ি-পথ ধরে সোজা গীর্জায় হাজির হবেন, কিন্তু তখনি একজন বুড়ো চাষীকে দেখে দাড়ালেন।

'বাবা ফৌআন বুঝি এখন একটু তাড়া আছে। তোমার কাছে আসব, কথা আছে। এখন আমরা কি করব? এ অবস্থায় লিসাকে ত তোমার ছেলে বুতো ত্যাগ করতে পারে না। সে এখন কয়েক মাসের পোয়াতি, পেট বড় হয়েছে সবাই জেনেছে কুমারী কন্যা সে, এটা একটা বিশ্রি কেলেঙ্কারীর ব্যাপার।'

নীরব শ্রদ্ধার সাথে বৃদ্ধ তাঁর কথা শুনছিল।

'বুতো যদি জেদ ধরে বসে থাকে ত আমি কি করব ফাদার? তাছাড়া ছেলেটা বলছেও ত ঠিক কথা, তার বয়সে কপর্দকহীন অবস্থায় বিয়ে করা যায় না।'

'কিন্তু একটা বাচ্চা ত জন্মাচ্ছে।'

'হাঁ, কথাটা ঠিক। কিন্তু এখনও ত জন্মায় নি। আপনি বলতেও ত কিছু পারেন না। শিশুর জন্যে এক টুকরো কাপড় কেনার ক্ষমতা না থাকলে তার আগমনে উৎসাহ থাকে না।'

জীবনে অনেক কিছু দেখেছে বৃদ্ধ, তাই মুণি ঋষির মতন বলছিল।

আবার এক সময় শান্তকণ্ঠে সে বলতে সুরু করল—'তাছাড়া একটা ব্যবস্থা হতে পারে। আমার জমি-জমা ভাগ করে দিচ্ছি। প্রার্থনার পর ভাগ্য পরীক্ষা হবে। তারপর বুতো তার অংশ পেয়ে গেলে নিশ্চয় তার খুড়তুতো বোনকে

বিয়ে করবে।'

যাজক মশাই বললেন—'ভালই। শুনে সুখি হলাম। তোমাকে আমি বিশ্বাস করি, বাবা ফৌআন।'

ঘণ্টার আওয়াজে উনি বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করলেন।

'দ্বিতীয় ঘণ্টা বাজল, তাই না?'

'না ফাদার, তৃতীয়।'

'হা ঈশ্বর! হতভাগা বেকু আমার জন্যে অপেক্ষা না করেই ঘণ্টা বাজাচ্ছে।'

অবশেষে তিনি প্রার্থনা ঘরে ঢুকলেন। দেখলেন, মঞ্চ সাজান হচ্ছে আর ডেলফিন ও নেনেসি পরস্পরকে ঠেলাঠেলি করে খেলছে। বেকুর ছেলে ডেলফিন বছর এগার বয়স। হাসিখুশি আর রোদে-পোড়া তামাটে দেহ—এর মধ্যেই বেশ স্বাস্থ্যবান হয়ে উঠেছে। জমি-জমার কাজ খুব ভালবাসে, তাই স্কুল ছেড়ে এর মধ্যেই লাঙল ধরেছে। ডেলহোমির বড় ছেলে আরনেস্ট—সবাই ডাকে নেনেসি বলে। রোগা, সুন্দর চেহারা। অলস প্রকৃতি, সব সময় পকেটে একখানা আয়না নিয়ে ঘোরে।

যাজক-মশাই ওদের তাড়া দিয়ে বললেন—'এস, আমাদের তাড়া আছে।'

তিনি দ্রুত-তালে প্রার্থনা সুরু করলেন, লাটিন-বয়ানের উপর চোখ বুলোতে বুলোতে ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো শেষ করলেন। উপদেশ দেওয়ার জন্য মঞ্চে উঠলেন না। গায়কদের মাঝখানে একখানা চেয়ারে বসে পড়লেন এবং গুনগুন স্বরে বাইবেলের বাণী আওড়াতে লাগলেন। কি বলছেন তা তাঁর মগজে ঢুকছে না এবং নিজেকে এ অবস্থা থেকে মুক্ত করতেও পারছেন না। বাগ্মীতায় তিনি দুর্বল, কথা তাঁর মুখে জোগায় না। তোতলাতে থাকেন এবং কথা আটকে যায় মুখে। একটা বাক্যও শেষ করতে পারেন না। এবং এরই জন্য পঁচিশ বছর ধরে আর্চবিশপ তাঁকে ভুলে আছেন আর যাজক মশাই পড়ে আছেন বাজকি লা দয়েনের গীর্জায়। অবশিষ্ট অনুষ্ঠান খুব দ্রুত সারলেন। পাগলা ঘণ্টার মতন সমাপ্তির ঘণ্টা বাজতে লাগল এবং 'প্রভু তোমাদের মঙ্গল করুন' বলে তিনি প্রার্থনা সভা ভেঙ্গে দিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর নয় যেন চাবুকের আস্ফালন।

অবশেষে মুক্তি মিলল। এ্যাবি দ্রুত হাঁটতে হাঁটতে একেবারে চার্লস দম্পত্তির সামনে পড়ে গেলেন। তাঁর মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়ল এবং তিনি মাথা থেকে টুপি খুললেন। মঁসিয়ে চার্লস রাজকীয় ভঙ্গিতে নত হল, এবং মাদাম ভদ্রতা-সূচক অভিবাদন জানালেন। তবে এটাও সুনিশ্চিত যে, পার্কের শেষ পর্যন্ত না গিয়ে যাজক-মশাই চলে যাবেন না এবং এখানেই বছর ত্রিশের এক রমণীর সাথে তাঁর দেখা হল। কিন্তু দেখলে মনে হয় রমণীর বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েছে। মাথায় পাতলা চুল, চ্যাপ্টা দেহের গড়ন এবং হলদেটে ফোলা-ফোলা মুখের ভাব। যাজক মশাই থামলেন। রমণী নত হয়ে দেখল,

এক বোঝা জ্বালানী কাঠ মাথায় নিয়ে টলতে টলতে ক্লান্ত চরণে হাঁটছে।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—'পলমায়ার, প্রার্থনা সভায় আস নি কেন? আজ ত অলসেণ্টস্ ডে। এটা তোমার ভারি অন্যায়।'

যন্ত্রণা-ক্লিষ্ট কণ্ঠে সে বলল—'জানি, ফাদার। কিন্তু কি করতে পারি? ভাইটা ঠাণ্ডায় ধুঁকছে। আমাদের আস্তানাটা ঠাণ্ডা বরফ। তাই ত বুনো-ঝোপ থেকে এগুলো আনতে গিয়েছিলাম।

'তাহলে গ্রাণ্ডির বউ সেই আগের মতনই নিষ্ঠুর ব্যবহার করছে?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই। বরং মরবে তবু আমাদের এক টুকরো রুটি কিংবা এক-খানা জ্বালানী কাঠ দেবে না।'

ইনিয়ে বিনিয়ে সে তাদের করুণ কাহিনী বলতে লাগল। তাদের দিদিমা তাদের বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, তাই একটা পোড়ো আস্তাবলে তারা আশ্রয় নিয়েছে। হতভাগ্য জড়বুদ্ধি হিলারিয়ন। তার পা দুখানা বাঁকা; মুখখানা কুৎসিতভাবে মোচড়ানো। বছর চব্বিশ বয়স, কিন্তু মাথায় কোন দুষ্টু বুদ্ধি নেই, তবু কেউ তাকে কাজ দেয় না। এই পঙ্গু ভাইটার জন্য মায়ের মতন স্নেহ নিয়ে সে প্রাণপাত পরিশ্রম করে চলেছে।

ওর কাহিনী শুনতে শুনতে এ্যাবি গডার্ডের থলথলে ঘামে-ভেজা মুখমণ্ডলে সমবেদনার ভাব ফুটে উঠল। তার রাগত দু'চোখ ভালবাসার ছোঁয়ায় জল-জ্বল করতে লাগল। বিশাল মুখখানা দুঃখপূর্ণ এবং সদয় মনে হল। এই সদা দুঃখী মানুষটা ভয়ঙ্করের তাড়নায় বিতাড়িত হচ্ছেন, অথচ গরীবদের জন্য তাঁর মন সমবেদনায় ভরা, নিজের অর্থ আর পোশাক তিনি দু'হাতে তাদের বিলিয়ে দেন। এবং বিলোন বলেই সারা বসি উপত্যকায় তাঁর মতন যাজক আর একজনও নেই যার পোশাক-আশাক এমন জঘন্য এবং নোংরা।

পকেট হাতড়ে একটা পাঁচ-ফ্রাঙ্ক মুদ্রা বার করে তিনি পলমায়ারকে দিলেন।

'এই নাও, লুকিয়ে রাখ। আর কাউকে দেওয়ার মতন আমার কাছে কিছু নেই। দেখি, গাণ্ডির বউকে আর একবার তোমার জন্যে বলব। উনি তোমার সাথে বড় হৃদয়হীন আচরণ করছেন!'

ইতিমধ্যে গীর্জার চত্বর ফাঁকা হয়ে গেছে। ফোঁআন এবং রোজ নিজেদের বাড়ী ফিরে গেছে। গ্রসবয়েস এসে বসে আছে ওখানে। দশটা বাজার আগেই ডেলহোমি এবং যেসাস ক্রাইস্ট এসে পৌছল। কিন্তু বুতোর জন্যে ওরা বৃথাই দুপুর পর্যন্ত বসে অপেক্ষা করতে লাগল। ওর স্বভাব একদম আলাদা। কিছুতেই নির্ধারিত সময়ে আসবে না। কোথাও আটকা পড়েছে। রাস্তায় কোথাও হয়ত ডিনার সারছে। ওকে বাদ দিয়ে ওরা ভাগ্য পরীক্ষা করতে ইচ্ছুক ছিল। কিন্তু বুতোর বিচিত্র স্বভাবকে ওরা ভয় পায়। তাই দুপুরের খাওয়ার পর বেলা দুটোর সময় ভাগ্য-পরীক্ষা করবে ঠিক করল। ফোঁআনদের বাড়ীতে গ্রসবয়েস এক টুকরো মাংস আর এক গ্লাস মদ পান করল শুধু। মদের

বোতল একসময় আনা হল, আবার নতুন একটা বোতল। ধীরে ধীরে সে মত্ত অবস্থায় ঝিমিয়ে পড়ল।

বেলা দু'টোর সময়ও বুতো এল না। আজ রবিবার উৎসবের দিন। গ্রামের সব লোক আজ উৎসবে মেতেছে, মদ পান করছে। ওরই ছিটেফোঁটা পাওয়ার আশায় আর বসে থাকতে পারল না যেসাস্ ক্রাইস্ট। বেরিয়ে পড়ল পথে। প্রথমেই ম্যাকেরনের শুঁড়িখানায় উঁকি দিল। ওর মতলব হাসিল হল। সবেগে দরজা খুলে বেকু বেরিয়ে এসে চেঁচিয়ে উঠল।

'এই যে বুড়ো শয়তান, আয়! তোকে এক গ্লাস মদ খাওয়াই।'

বিকেল প্রায় পাঁচটা বাজে⋯সজোর ধাক্কায় আবার দরজাটা খুলে গেল। বুতো ঢুকল, পিছনে জাঁ। সে যেসাস ক্রাইস্টকে দেখতে পেল।

চেঁচিয়ে উঠল—'তোর জন্যে এক ফ্রাঙ্ক বাজী ধরেছি দাদা। আমাদের খাওয়াবি না? তোর জন্যে আমরা বসে আছি সবাই।'

মাতাল 'যেসাস ক্রাইস্ট' খুশি-ভরা গলায় জবাব দিল—'থাম ভাঁড়! আবার বলে কি-না তোমার জন্যে বসে আছি। জানিস, সকাল থেকে তোর জন্যে আমরা সবাই অপেক্ষা করছি।'

আসবার সময় জ্যাকুলিনের সাথে দেখা হওয়ায় বুতো থেমেছিল লা বর্ডেরি খামারে। পনের বছর বয়সে এই জ্যাকুলিনকে বুতো এক খড়ের গাদায় টেনে নিয়ে গিয়ে শয্যাসঙ্গিনী করেছিল। জ্যাকুলিন ওকে ডেকে নিয়ে গিয়ে মাখন মাখানো রুটি মদে ভিজিয়ে খাওয়াল। খামার মালিক হোরদিকুইন আবার বাড়ী নেই, প্রার্থনা সভার পর ক্লয়েসে লাঞ্চ খেতে গেছেন। কাজেই অনেকক্ষণ ধরে ওরা খাওয়া-দাওয়া আর ফূর্তি করল। সেই থেকে পুরুষ দু'জন এক সাথেই ছিল এবং শেষে রগনিতে এল বিকেলে।

'যেসাস ক্রাইস্ট' টলতে টলতে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল এবং ভাইয়ের পিছনে পিছনে হাঁটতে লাগল। তার দু চোখে সমবেদনার স্পর্শ।

বুতো জাঁকে বলল—'এখানে থাক্। আধঘণ্টা পরে আমার সাথে দেখা করবি। আজ রাতে তুই আমাদের বাড়ীতে খাওয়া-দাওয়া করবি।'

দু'ভাই যখন ফৌআনদের বাড়ী এল তখন প্রত্যেকে ওখানে রয়েছে। বুড়ো ফৌআন দাঁড়িয়েছিল মেঝের দিকে চোখ রেখে। ঘরের মাঝখানে টেবিলে বসে যান্ত্রিকভাবে রোজ সেলাই করছিল। অপরদিকে গ্রসবয়েস খুব বেশী মদ পান করার জন্যে বসে বসে ঝিমোচ্ছিল। তার চোখ-দুটো আধ-খোলা। একটু দূরে দু'খানা নীচু চেয়ারে বসে ডেলহোমি আর ফ্যানি শান্তভাবে অপেক্ষা করছে।

পুরোন কম দামী আসবাবে সাজানো এই ধোঁয়াচ্ছন্ন ঘরখানা বিচিত্র দেখাচ্ছে। রয়েছে বহু মাজাঘসায় ক্ষয়ে-যাওয়া খান-কয়েক বাসন-পত্র। একখানা আঁচড়হীন কাগজ, কালির দোয়াত আর একটা কলম টেবিলের উপর

আমিনের পুরনো জং-ধরা টুপির পাশে রাখা। ওই টুপিটা বহু জল-ঝড়ের মধ্যে আজ বছর দশেক ধরে ব্যবহার করছে আমিন। রাত্রি আসন্ন। শেষ আলোর রশ্মি মিলিয়ে যাচ্ছে···চওড়া-কিনারা, ভস্ম-রাখার পাত্রের মতন টুপিটাকে প্রয়োজনীয় দ্রষ্টব্য বলে মনে হচ্ছে।

মাতাল হলেও নির্ধারিত কাজের জন্য আসা গ্রসবয়েস জেগে উঠল।

'এখন তাহলে আমরা সবাই হাজির···বলছিলাম না যে, দলিল প্রস্তুত। মঁসিয়ে বেইলিহাচির অফিসে কাল আমি দলিল দেখে এসেছি। তোমাদের নামের পাশে শুধু নির্দিষ্ট অংশের সংখ্যা বসানো হয় নি···কাজেই এবার আমরা ভাগ্য পরীক্ষা করব। দলিল লেখক সংখ্যা বসিয়ে দেবেন। শনিবার তোমরা গিয়ে দলিলে দস্তখত করবে।'

উঠে দাঁড়িয়ে আবার জোরালো কণ্ঠে বলল—'আমি এবার কাগজের টুকরো তৈরী করছি।'

নিজেদের মনে অবিশ্বাস গোপন না করেই যুবকরা এগিয়ে গেল। তারা তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। যেন লোকটা একটা যাদু-খেলোয়াড়, তাদের অংশগুলো মন্ত্রবলে উড়িয়ে দেবে, তাই তার প্রতিটি কাজ ওরা পরখ করতে লাগল। অত্যধিক মদ পানের জন্য তার হাত কাঁপছে। কাগজখানা সে তিন টুকরো করল; তারপর কাগজ তিনখানার উপর এক দুই এবং তিন সংখ্যা লিখল বড় বড় রেখা টেনে। যুবকরা ওর কাঁধের উপর দিয়ে উঁকি মেরে দেখছিল। ওদের নজর ছিল ওর হাতের কলমের দিকে। আর ওদের বাবা-মা তখন খুশি হয়ে মাথা নাড়ছিল, না এর মধ্যে কোনও জাল-জুয়াচুরি নেই। কাগজের টুকরোগুলো ভাঁজ করে টুপির মধ্যে ফেলা হল।

ভাবগম্ভীর নীরবতা ঘরের মধ্যে।

মিনিট দুয়েক স্থির হয়ে থেকে গ্রসবয়েস বলল—'তোমাদের মন ঠিক করে নাও এবার, কে আগে তুলবে?'

কেউ নড়ল না। অন্ধকার বাড়ছে, আর টুপিটাকে অন্ধকারে আরও বড় মনে হচ্ছে।

আমিন এবার প্রস্তাব করল—'বয়স অনুসারে আসবে তোমরা? বেশ, 'যেসাস ক্রাইস্ট' তুমি বড় ত, তুমিই প্রথম এস।'

খুশি মনে 'যেসাস ক্রাইস্ট এগিয়ে গেল, কিন্তু মদের ঘোরে দেহের ভারসাম্য হারিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। দারুণ চেষ্টা করে কোনরকমে টুপির মধ্যে হাত পুরে দিল, যেন একখণ্ড পাথর তুলছে। একখানা কাগজ তুলে নিয়ে জানালার ধারে পড়বার জন্যে নিয়ে গেল।

চেঁচিয়ে বলল—'দুই।' তার কাগজের অক্ষরটা তার কাছে অসাধারণ আর আজব বলে মনে হওয়ায় সে হাসিতে উচ্ছল হয়ে উঠল।

গ্রসবয়েস বলল—'এবার তোমার পালা, ফ্যানি!'

ফ্যানি টুপিটা স্পর্শ করল, কিন্তু তার কোন ব্যস্ততা নেই। সে একটুক্ষণ কাগজ দু'খানা ওলট-পালট করল, হাতে নিয়ে একে একে দু'খানার ভার পরখ করল।

বুতো ভয়ঙ্কর গলায় চেঁচিয়ে উঠল—'তোর পছন্দ করার অধিকার নেই।' দারুণ উত্তেজনায় সে শ্বাস নিতে পারছিল না। তার দাদা দু'নম্বর তুলেছে দেখে সে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

ফ্যানি জবাব দিল—'কেন নেই? আমি ত দেখছি না। হাত দিয়ে শুধু অনুভব করছি।'

ওদের বাবা বিড়-বিড় করে বলল—'নিয়ে নাও। টুকরো দুটো সমান, একটা আর একটার চেয়ে ভারি নয়।'

অবশেষে সে টুকরোটা তুলে নিয়ে জানালার ধারে ছুটে গেল।

'এক!'

ফৌআন বলল—'ব্যস! তাহলে তিন নম্বর বুতোর। কাগজ তোল, বাছা।'

জমাট অন্ধকার ঘরের মধ্যে ছোট ছেলেটার মুখ হতাশায় কেমন কালো হয়ে গেছে তা' কারো নজরে পড়ল না।

দারুণ রাগে সে চেঁচিয়ে উঠল—'না, কথখনো না।'

'কি?'

'তোমরা যদি ভেবে থাক যে, আমি মেনে নেব, তবে ভুল করেছ। আমি নেব না। তিন নম্বর ভাগ, তাই না? সবচেয়ে খারাপ ওটা। আমি ত তোমাদের বলেছিলাম যে, অন্য কায়দায় ভাগ কর। না, কিছুতেই তোমরা আমার সঙ্গে একটা মাটির তালের মতন আচরণ করতে পার না। তোমরা ভাবছ তোমাদের চাতুরি আমি বুঝি নি? নিশ্চয় কনিষ্ঠের আগে তোলার কথা? না, আমি আর তুলব না, তোমরা আমাকে ঠকিয়েছ!'

বাবা-মার চোখের সামনে সে রাগে মেঝেতে পা ঠুকতে লাগল। টেবিলে ঘুষি মারল।

রোজ বলল—'হতভাগা, তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।'

'মা, জানি তোমরা আমাকে ভালবাস না। আমার গায়ের চামড়া কেটে তোমরা দাদাকে দিতে চাও···তোমরা আমাকে খুন করে ফেলবে···।'

ফৌআন কর্কশকণ্ঠে তাকে বাধা দিয়ে বলল—'যথেষ্ট হয়েছে। তুই তুলবি?'

'আমি আবার গোড়া থেকে সুরু করতে বলছি।'

কিন্তু প্রত্যেকেই প্রতিবাদ করল। যেসাস ক্রাইস্ট এবং ফ্যানি তাদের হাতের কাগজের টুকরো মুঠো করে রাখল যেন নইলে ওটা কেউ কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করবে। ডেলহোমি বলল, 'ভাগ্য পরীক্ষা নিরপেক্ষ হয়েছে।' গ্রসবয়েস মনে খুব আঘাত পেল। ভয় দেখাল যে, তাকে অসৎ বলে সন্দেহ করলে সে.

এখুনি চলে যাবে।

'বেশ, বাবা তার গোপনে জমানো টাকা থেকে আমাকে এক হাজার ফ্রাঙ্ক দিয়ে দিক।

বুড়ো দারুণ অবাক হয়ে গেল, তার মুখ দিয়ে কথা সরছিল না। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে তেড়ে এল।

'কি বলছিস? বদমাস, আমাকে সত্যিই খুন করতে চাস? বাড়ী ভেঙ্গে ফেললেও এক কপর্দক কোথাও পাবি না। ঈশ্বরের দোহাই কাগজ ওঠা, নইলে কিছুই পাবি না।'

এক ধরনের লজ্জাকর নীরবতা ঘরের মধ্যে বিরাজ করতে লাগল। এখন ওই মস্ত বড় টুপিটা একটা বাধা একটাই কাগজের টুকরো ওর মধ্যে রয়েছে এবং কেউ সেটা তুলছে না, স্পর্শও করছে না। ব্যাপারটার সমাপ্তি ঘটাবার জন্যে আমিন বলল ফৌআনকে ওটা তুলতে। এবং বুড়ো ওটা নিয়ে যেন জানে না ওটাতে কি লেখা আছে তাই পড়বার জন্যে জানালার ধারে গেল।

'তিন! তুই তিন নম্বর ভাগ পেয়েছিস, শুনছিস? দলিল তৈরী। মসিয়ে বেইলিহ্যাচি দলিলে কোনও কিছু বদলাবেন না। একবার যা করা হয়েছে তা আর বদলানো যাবে না। আজ রাত্তিরটুকু তোকে ভাববার সময় দিলাম, কেননা তুই এখন বসে বসে ঘুমুচ্ছিস—এ ব্যাপারটা স্থির হয়ে গেছে। এ নিয়ে আর কিছু বলতে পারবি না।'

অন্ধকারে বুড়ো কিছু দেখতে পাচ্ছিল না, তাই কোন জবাব দিল না।

অন্যরা সোল্লাসে নিজেদের সমর্থন জানাল। ওদের মা তখন মোমবাতি জ্বালিয়ে টেবিল পাতবার কথা ভাবল।

ঠিক তখনই জাঁ তার বন্ধুর সাথে দেখা করতে আসছিল। দেখল, দুটো ছায়ামূর্তি নির্জন অন্ধকার পথের উপর পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে দাড়িয়ে আছে। ফৌআনদের বাড়ী কি হচ্ছে দেখছে। শ্লেটের মতন ধূসর রঙ আকাশ থেকে পালকের মতন হালকা তুষার পড়তে শুরু হয়েছে।

নরম গলায় একজন বলল—'আরে মসিয়ে জাঁ! তুমি আমাকে ভয় ধরিয়ে দিয়েছিলে!'

ওর মাথার ওড়নার নীচে ডিম্বাকৃতি মুখ আর পুরন্ত ঠোঁট জোড়া দেখে ফ্রানকয়েসকে সে চিনতে পারল। দিদি লিসার কোমর জড়িয়ে তার বুকে মুখ রেখে দাঁড়িয়ে আছে। দু বোনের মধ্যে খুব টান। এমনভাবে পরস্পরের গলা জড়িয়ে ধরে দাড়িয়ে থাকতে ওদের প্রায়ই দেখা যায়। লিসা দীর্ঘদেহী সুন্দরী মেয়ে। মোটাসোটা আর বাড়ন্ত গড়ন এবং ও আরও ফ্র্যাঙ্ক। দুর্ভাগিনী হলেও সে খুব হাসি-খুশি।

জাঁ আনন্দে বলল—'ও! তোমরা গোয়েন্দাগিরি করছ?

সে জবাব দিল—'হা ঈশ্বর! ওখানে কি হচ্ছে তাতে আমাদের কি এসে

যায়···তবে বুতো যদি কিছু ঠিক করে থাকে ত সেটাই জানবার ইচ্ছে।'

ফ্রানকয়েস তার দিদির পুরন্ত পেটের উপর হাত রাখল।

বকল—'শুয়োরের বাচ্চা যদি পেয়ে যায়! জমি-জমা পেলে ও নিশ্চয় পয়সাওয়ালা মেয়ে খুঁজবে!'

দ্বিতীয় ভাগ

১

সকাল চারটে। মে মাসের সবে সুরু। এইমাত্র সূর্য উঠল অরুণ রশ্মি ছড়িয়ে। আকাশ ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে উঠছে, কিন্তু লা বর্ডেরি খামারটা এখনও আধা অন্ধকারে ঢাকা। খামারের বিস্তীর্ণ চত্বরের তিন দিক ঘিরে তিন সার ঘর। একেবারে সব শেষে শুয়োরের খোঁয়াড়, ডান দিকে গোলা-বাড়ী আর বাম কিনারায় গোয়াল, আস্তাবল আর থাকবার ঘর। চতুর্থ সীমানায় গাড়ি যাতায়াতের দরজা···এখন লোহার খিল দেওয়া, বন্ধ। একটা মোরগ শুধু সারের গাদার উপর বসে জোরালো গলায় ডেকে উঠল, আসন্ন দিনকে সম্বর্ধনা জানাল। জবাব দিল দ্বিতীয় একটা মোরগ। তারপর সাড়া দিল তৃতীয় আর একটা। এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত খামারে খামারে মোরগ ডেকে উঠল। তাদের ডাক ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

কাল রাতও ছিল অন্য রাতগুলোরই মতন। হোরদিকুইন জ্যাকুলিনের শোবার ঘরেই রাত কাটিয়েছে। পরিচারিকার জন্য নির্ধারিত ছোট ঘর, ফুল ছাপ দেওয়া কাগজে মুড়ে ঘরখানা সাজিয়ে নিতে বলেছে, পাতলা কাপড়ের পর্দা টাঙানো এবং ঘরে দিয়েছে মেহগনি কাঠের আসবাব পত্র। কর্তার উপর জ্যাকুলিনের কর্তৃত্বের ক্ষমতা দিন দিন বাড়ছে। প্রত্যেক রাতে তার ইচ্ছে হয় কর্তার সাথে কর্তার মৃত-পত্নীর খাটে শোবে। কিন্তু প্রত্যেক বার প্রত্যাখ্যাত হয়, এটা কর্তার মৃত পত্নীর স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন। বিবাহের ঘর কর্তা পবিত্র রাখতে চায়। জ্যাকুলিনের মনে তাই গভীর বেদনা, তার ধারণা ওই ওক কাঠের খাটে লাল পর্দা টাঙানো বিছানায় সে যদি না শুতে পায় তাহলে সে কখনও সত্যিকারের রক্ষিতা হতে পারবে না।

প্রথম আলোক-ঝর্ণার স্পর্শে তার ঘুম ভেঙে গেল এবং চিৎ হয়ে একটুক্ষণ বিছানায় শুয়ে রইল। দু'চোখ পরিপূর্ণ বিস্ফারিত। খামার-মালিক ত তখনও তার পাশে শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে। শয্যার উত্তেজক উষ্ণতায় তার গভীর কালো চোখ-জোড়ায় স্বপ্নের ছায়া নামল। তার সুন্দর দোহারা দেহে রোমাঞ্চ জাগল। এক মুহূর্ত ইতঃস্তত করল; তারপর মন ঠিক করে নিল। রাত-পোশাক হাতে নিয়ে কর্তার ঘুমন্ত দেহ এমন অবলীলাক্রমে এবং কুশলতার

সঙ্গে টপকে গেল যে, কর্তা কিছুই অনুভব করতে পারল না। নিঃশব্দে কামনায় জ্বর-তপ্ত হাতে সে পেটিকোটে বোতাম আটকাল। কিন্তু একখানা চেয়ারের সাথে ওর ধাক্কা লাগায় হোরদিকুইন চোখ খুলে তার দিকে ঘুরল।

'পোশাক পরছ ? কোথায় যাচ্ছ গো ?'

'রুটি দেখতে। ভয় হচ্ছে। তাই ওগুলো পরখ করতে যাচ্ছি।'

বিড বিড় করে হোরদিকুইন নিজের মনে বক বক করতে করতে আবার ঘুমিয়ে পড়ল। নিজের তন্দ্রাবস্থায় ওর এই ওজর শুনে সে অবাক হল। কি অদ্ভুত ধারণা! এমন সাত সকালে তার রুটি দেখতে যাওয়ার কথা নয়। সন্দেহের পোকা কিলবিল করে উঠল তার মস্তিষ্কে, অমনি চমকে জেগে উঠল। দেখল, সে ওখানে নেই, নেই ঝিয়ের শোবার ঘরে···ওখানে হোরদিকুইনের চটি-জোড়া, পাইপ আর ক্ষুর রয়েছে। মাগি নিশ্চয় তাহলে খামারের কোনও ছোকরার কাছে আবার গেছে।

হোরদিকুইনের চৌকো কাঁধ, চওড়া ইট-রঙ মুখমণ্ডল···এবং সব সময় ঝিয়েদের সে পায়ের নীচে রাখে। এমন কি তার বউ যখন বেঁচে ছিল তখনও সে ঝিয়েদের সাথে স্বাভাবিকভাবে রাত কাটাত, একটুও ভাবত না। তার ধারণা, এটা সঠিক এবং উপযুক্ত কাজ। গরীব চাষীদের যে সব মেয়েরা পোশাক্ সেলাই করত তারা পালিয়ে রেহাই পেত। কিন্তু যে মেয়ে খামারে ঝিয়ের কাজ করত পুরুষের হাত থেকে তার পরিত্রাণ ছিল না, হয় কোনও খামারের মজুর আর না হয় মালিক তার দেহ উপভোগ করবেই। মাদাম হোরদিকুইন তখন বেঁচে, জ্যাকুলিনকে সে-সময় দয়া করে লা বর্ডেরি খামারে কাজ দেওয়া হয়। তার বাবা কগনেট ছিল পাঁড় মাতাল, প্রায়ই মেয়েটাকে মারধোর করত। মেয়েটা এত রোগা ছিল যে ছেঁড়া জামা ফুঁড়ে তার পাঁজরার হাড় বেরিয়ে আসত। তাকে এত কুৎসিত দেখতে ছিল যে, ছেলেরা তাকে দেখে 'কু' দিত। আসলে বয়স তার আঠার হলেও তাকে পনের বছরের মেয়ে বলেও মনে হত না। রান্নাঘরের ঝি-কে সে কাজে সাহায্য করত এবং তাকে সবাই মনে করত একটা জঞ্জাল। খামার বাড়ী ঝাঁট দিত আর ধোয়া-মোছা করত। জানোয়ারগুলোর দেহ পরিষ্কার করতে হতো ফলে নোঙরা লেগে থাকত তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত। কিন্তু মাদাম হোরদিকুইনের মৃত্যুর পর তার অবস্থা ফিরে গেল। সব ক'জন খামারের চাষী তাকে খড়ের গাদায় টেনে নিয়ে যেত। লা বর্ডেরি খামারে যারাই কাজ করতে আসত তারাই কোনও না কোন সময় ওব সয্যাসঙ্গী হত।

একদিন কর্তার সাথে সে মাটির নীচেব কুঠবিতে গিয়েছিল, অমনি কর্তার মনে হল এই কুৎসিত মেয়েটাকে উপভোগ করা যাক। এর আগেও অবশ্য মেয়েটার দিকে সে হাত বাড়িয়েছিল, কিন্তু সে ভীষণভাবে প্রতিরোধ করেছিল। এমন আঁচড়ে কামড়ে দিয়েছিল যে শেষপর্যন্ত সে মেয়েটাকে ছেড়ে দিয়েছিল।

সেই দিন সেই মুহূর্ত থেকে মেয়েটার ভাগ্য গেল খুলে। দশ মাস ধরে সে কর্তার গ্রাস থেকে নিজেকে প্রতিরোধ করেছে তারপর ধীরে ধীরে ইঞ্চি ইঞ্চি করে কর্তার কাছে ধরা দিল। খামার থেকে রান্নাঘরে তার পদোন্নতি হল এবং হল বাঁধা ঝি। তারপর একজন ঝি ঠিক হল তাকে সাহায্য করার জন্য, শেষে একজন মহিলার যেমন থাকে তেমনি তার জন্যেও একজন খাস ঝি রাখা হল। রঙ্গিনী মেয়েটা এখন শ্যামলা-রঙ যুবতীতে পরিণত হয়েছে। সুন্দর মুখের ডৌল, দৃঢ় একজোড়া স্তন, নারীদেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পেলব এবং সুঠাম। দিনে দিনে সে হয়ে উঠল অপচয়ী ছিনাল, দেহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না করলেও সারা অঙ্গে গন্ধসার ঢালতে ভুলত না। ওদিকে বয়ঃসন্ধিক্ষণে পৌঁছেছে হোরদিকুইন···বয়স এখন পঞ্চান্ন। ছিনাল যুবতী এখন পুরোপুরি তাকে অধিকার করেছে। মানুষ যেমন খাদ্য আর মদের জন্য ক্ষুধার্ত হয় সে এখন তেমনি জ্যাকুলিনের দেহ উপভোগ করার জন্য কাম ক্ষুধায় ক্ষুধার্ত। তাকে যখন মনে ধরে তখন যুবতী তাকে বিড়ালীর মতন জড়িয়ে ধরে আদর করতে থাকে এবং শরম-হীন, নীতিজ্ঞানশূন্য উপায়ে তার দেহে উপগত হতে কর্তাকে বাধ্য করে, কোন ব্যাপারে তার ঘৃণা হয় না এবং সাধারণ যুবতীরা যা সাহস করে না তাও সে করে। ঘণ্টা খানেক এমনিভাবে শৃঙ্গার করলেই কর্তা অবশ হয়ে পড়ে তাকে থাকবার জন্য অনুরোধ করে···সুরু হয় বিবাদ এবং মন কষাকষি। কর্তা শেষে তাকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দেওয়ার ভয় দেখায়।

আগের রাতেও এমনি অবস্থার সৃষ্টি করার জন্যে কর্তা তাকে খুব পিটিয়েছিল। সে বলেছিল, তোমার বউ যেখানে মরেছে সেই খাটে শোব। তারপর সারা রাত ধরে জ্যাকুলিন আর কর্তাকে কাছে ঘেঁষতে দেয় নি। যখনই সে তাকে কাছে টানতে গেছে তখনই তার গালে চড় কষিয়েছে, প্রতিরোধ এবং অবাধ্যতার মাধ্যমে কর্তার কাম-লালসাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে এবং এমনিভাবে সে তাকে বশ করেছে। কর্তার সাথে কাম-ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ করলেও খামার-মজুরদের সাথে সে সব সময় কাম-ক্রীড়া করে দারুণ আনন্দ লাভ করে। তাই সাত সকালে সেই স্যাঁতস্যেতে ঘরে অগোছাল বিছানায় কর্তা তার উপস্থিতির উষ্ণতার গন্ধ পায় এবং দুরন্ত রাগে এবং কাম-লালসায় বিহ্বল হয়ে পড়ে। হোরদিকুইন সন্দেহ করল, মাগি আবার অসতীপনা সুরু করেছে। সে লাফিয়ে বিছানা থেকে উঠে পড়ল।

চেঁচিয়ে বলল—'কুক্কুরী কোথাকার! দাঁড়া তোকে আগে ধরি!'

তাড়াতাড়ি পোষাক পরে নিয়ে সে নিচের তলায় নামল।

জ্যাকুলিন দ্রুতপায়ে নিস্তব্ধ ঘরগুলো পার হয়ে যেখানে প্রথম রোদের ঝলক প্রবেশ করছে সেখানে এল। উঠোন পার হওয়ার সময় সে বারেক দাঁড়িয়ে পড়ল, ইতঃস্তত করল···মেষপালক সোলাসকে দেখতে পেল, লোকটা এর মধ্যেই উঠে পড়েছে। কিন্তু এই মুহূর্তে তার কাম-লালসা অত্যন্ত তীব্র, সে আরও

এগিয়ে গেল তাকে এড়িয়ে। এবং এড়িয়ে চলল আস্তাবলটা, ওখানে থাকে পনেরটা ঘোড়া আর ঘুমোয় চারজন মাল-টানা গাড়ীর চালক। ঘরের শেষ প্রান্তে শুধু খড়ের বিছানায় কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমুচ্ছে জঁা। সে ওখানটায় এল। ঘুমন্ত মানুষটাকে জ্যাকুলিন জড়িয়ে ধরল এবং তার মুখে চুমু খেয়ে কাঁপতে লাগল লালসায়।

হাঁপাতে হাঁপাতে মৃদুস্বরে বলল—'আমি, সোনা! ভয় পেও না। তাড়াতাড়ি! তাড়াতাড়ি কর!'

কিন্তু ভীত হল জঁা। ধরা পড়ার ভয়ে সে কখনও নিজের বিছানায় এ কাজ করতে চায় না। খড়ের গাদায় উঠবার মইটা পাশেই রয়েছে এবং তারা মই বেয়ে উপরে উঠল। কাটা-দরজাটা রাখল খুলে এবং সোজা খড়ের গাদায় শুয়ে পড়ল।

'বোকা সোনা, বোকা সোনা আমার!' বারবার বলতে লাগল জ্যাকুলিন। আনন্দে তার কণ্ঠে নরম স্বরধ্বনি সৃষ্টি হল, যেন তার দেহের গভীরতম অংশ থেকে আনন্দের অনুভূতির ব্যাঞ্জনাময় স্বরধ্বনি নির্গত হচ্ছে।

এই খামারে আজ প্রায় দুবছর হল জঁা রয়েছে। সেনাবাহিনী থেকে ছাড়া পেয়ে এক বন্ধুর সঙ্গে জঁা এসেছিল বাজুকি লা দয়েনে, সেও তার মতন ছুতোরের কাজ করত। তার বন্ধুর বাবা ছিলেন একজন গ্রাম্য কনট্রাকটর। দু' তিনজন লোক তাঁর কাছে কাজ করত। জঁা তাঁর কাছে কাজে লাগল। সাত বছর ধরে সেনাবাহিনীতে কাজ করার ফলে নিজের পেশার কাজ আর জঁায়ের ভাল লাগে না, সেনাবাহিনীর কাজ তার পারদর্শিতার ধার ভোঁতা করে দিয়েছে। ফলে করাত আর রাঁদা ধরতে তার মন ওঠে না, সে ভিন্ন মানুষ এখন। নিজেকে আর সে চিনতে পারে না। সে ত অলস হয় নি, সামরিক কাজ তার মনকে উদার করেছে। বলা যায় যেমন, রাজনীতি··· আগে রাজনীতি তাকে বিরক্ত করত কিন্তু এখন সে সাম্য এবং ভ্রাতৃত্বের কথা নিয়ে চিন্তা করে। সময় নষ্ট করার স্বভাব তৈরী হয়েছে তার···বিষণ্ণ, অলস প্রহরার কাজ, একঘেয়ে নিরানন্দ ব্যারাক-জীবন এবং যুদ্ধের বন্য নৃশংসতা এর কারণ। ইতালি অভিযানের কথা মনে পড়লেই আপনা থেকে তার হাত থেকে যন্ত্রপাতি খসে পড়ে এবং তখন প্রয়োজন হয় বিশ্রাম। ইচ্ছা হয় ঘাসের উপর হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে সব ভুলে যেতে।

এক সকালে তার কর্মকর্তা তাকে লা বর্ডেরিতে মেরামতির কাজে পাঠালেন। মাসখানেকের কাজ। শয়ন-ঘরের মেঝে বানানো, দরজা এবং জানালাগুলো শক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় মেরামতি। এত খুশি হল জঁা যে, কাজ শেষ করতে ছ' সপ্তাহ কাটাল। ইতিমধ্যে তার নিয়োগকর্তা মারা গেলেন, তাঁর ছেলের আগেই বিয়ে হয়েছিল···সে শ্বশুরবাড়ির জেলায় বাস করতে চলে গেল। কাজেই জঁা লা বর্ডেরি খামারে রইল · এখানে সব সময়

ভাঙ্গা কাঠ বদলানোর এবং এটা ওটা মেরামতির কাজ থাকেই, এসব করেই জঁায়ের রুজি রোজগার হতে লাগল। তারপর এল ফসল আহরণের মরশুম··· কৃষকদের সাথে মাঠের কাজে নামল সে। কেটে গেল আরও ছ' সপ্তাহ। অবশেষে খামার মালিক যখন দেখল যে, মাঠের কাজ জঁা ভালই করে তখন তাকে কাজ দিয়ে রেখে দিল খামারে। এক বছরের কম সময়ে ভূতপূর্ব কাঠের কারিগর একজন দক্ষ খামার মজুরে পরিণত হল···ক্ষেত-জমির প্রশান্ত পরিবেশে গাড়ী চালানো, লাঙল দেওয়া, বীজ বোনা এবং ফসল কাটা·· সব কাজই শিখে ফেলল। শান্তি অন্বেষণ রত তার মন পতিতৃপ্তির স্বাদ লাভ করল। আর করাত বা র‍্যাদা চালানোর কাজ নয়। এমনি ধরনের ধীরে, সযত্নে আর শৃঙ্খলাপরায়ণতার সঙ্গে ক্ষেত-জমিতে কাজ করতেই যেন সে জন্মলাভ করেছে, আর এই বলদের মতন নিরীহ স্বভাব সে লাভ করেছে তার মায়ের কাছ থেকে। যে আনন্দের খোঁজ কৃষকদের কাছে অজানা সেই পরমানন্দের অনুভূতি সে সর্ব প্রথম লাভ করল, উপভোগ করল গ্রাম-জীবনের পরিবেশে···শিশুদের জন্য লিখিত নীতিমূলক বইতে যে সরল আদর্শবাদ, সংগুণ এবং পরিপূর্ণ প্রশান্তির কথা সে পড়েছিল সেই সব ভাবাবেগ সমৃদ্ধ কাহিনীর স্মৃতি তার মনকে উজ্জীবিত করে তুলল।

সত্যি কথা বলতে কি, সে খামারে রয়ে গেল আরও একটা কারণে। একদিন জঁা দরজা মেরামত করছিল, সহসা সেই কাঠের চক্‌লার উপর জ্যাকুলিন আলু-থালু পোশাকে এসে বসে পড়ল। প্রথম প্রথম জ্যাকুলিন এই মরদের দিকে নজর দেয় নি, তারপর শক্ত সমর্থ-দেহী মরদটার উপর জ্যাকুলিনের নজর পড়ল। ওর এই দৈহিক সবলতা ও পৌরুষ একনিষ্ঠতার পরিচায়ক। জঁা ওর দিকে মুখ ফিরিয়ে আপন মনে কাজ করতে লাগল। বোকা বনার ভয় তার মনে। এবং তাছাড়া কামনার উদগ্র লালসায় তার মন পীড়িত হয়েছিল, এই ভয়ঙ্কর নারী জানে কিভাবে মরদের মনে কামাগ্নি জ্বালাতে হয়। তার স্বাভাবিক মনের গভীরতম প্রদেশে তাই সততা বিদ্রোহ করল। মঁসিয়ে হোরদিকুইনের রক্ষিতাকে শয্যাসঙ্গিনী করা অন্যায়·· এই খামারের মালিক তিনি এবং সে তাঁর কৃতজ্ঞতার ঋণে ঋণী। অবশ্য নিজের মনে স্পষ্টভাবে সে যুক্তি-জাল রচনা করতে পাবে যে, জ্যাকুলিন মালিকের বউ নয়। সেও তাদেরই মতন মালিকের একজন মজুর। সুযোগ পেলেই জ্যাকুলিন মালিককে ঠকায়, কাজেই জঁা অন্য মজুরদের মতন তার সাথে আনন্দ উপভোগ করতে পারে। কিন্তু এই ওজর তার অনুভূতিকে বেশীদিন প্রতিরোধ করতে পারল না। দিন দিন তার প্রতি চাষী-মনের ভালবাসার আকর্ষণ গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে। জঁা জানে এর পরিণাম একদিন অশুভ হবেই।

খড়ের গাদায় জঁা এবং জ্যাকুলিন নিঃশ্বাস রোধ করে পাশাপাশি শুয়েছিল। সাবধানে কান খাড়া করে ছিল জঁা·· মইতে ক্যাঁচকোচ আওয়াজ হল। লাফিয়ে

উঠল জাঁ এবং খড় নীচে ফেলার গর্ত দিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নিজের দেহ গলিয়ে দিল নীচের দিকে। ঠিক তখনি অন্যদিকের কাটা দরজায় হোরদিকুইনের মাথা দেখা গেল। একই সাথে হোরদিকুইন দেখল, একটা মরদের পলায়মান দেহের ছায়া আর মাগিটার উলঙ্গ উদর ··জ্যাকুলিন তখনও চিৎ হয়ে পা ছড়িয়ে খড়ের গাদায় শুয়ে আছে। জ্যাকুলিন উঠে বসল। হোরদিকুইন এমন রেগে গেল যে নীচে নেমে দেখতে ছুটল না, মাগির পলায়মান নাগরটি কে! বরং কষিয়ে দিল জ্যাকুলিনের গালে এক চড়·· এমন চড়ে বলদও পড়ে যায়।

'বেশ্যা মাগি কোথাকার!'

যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল এবং দুরন্ত রাগে প্রতিবাদ করল জ্যাকুলিন—'এটা ঠিক নয়।'

ওর পেটে লাথি মারার এবং কামাগ্নিতে জ্বর-জ্বর নগ্ন কীটটাকে পায়ের গোড়ালিতে পিষে মারার ইচ্ছা হোরদিকুইন দমন করল কোনও রকমে।

'তোর নাগরকে দেখলাম এখুনি। স্বীকার কর নইলে খুন করে ফেলব!'

'না, না! সত্যি নয়।'

অবশেষে জ্যাকুলিন উঠে দাঁড়িয়ে জামার স্কার্ট নামাল। সে আবার অবাধ্য ও কাম-উত্তেজক হয়ে উঠল। তার সর্বশক্তিমান প্রভাব বিস্তার করবে ঠিক করল।

'বেশ ত, এতে তোমার কি হয়েছে, বাবু? আমি ত তোমার বউ নই। তোমার খাটে ত আমায় শুতে দাও না, কাজেই আমি যেখানে খুশি শোব।'

যেন তার কাম-লালসাকে পরিহাস করছে এমনি ভঙ্গিতে ঘুঘুর ডাকের মতন শব্দ করে হাসল জ্যাকুলিন, কি মোহিনী যুবতী!

'এবার নাম, পথ ছাড় বাবু। আজ রাতে চলে যাব এখান থেকে।'

'এখুনি যাবি ত!'

'না, সন্ধ্যেবেলায় যাব। দাঁড়াও একটু ভেবে দেখি!'

সেখানে দাঁড়িয়ে সে রাগে কাঁপতে লাগল, বুঝতে পারল না, কাকে এখন সে অপরাধী বলে ধরবে। এখনি, এই মুহূর্তে জ্যাকুলিনকে তাড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতা তার নেই তবে সেই মরদটাকে সে তাড়িয়ে দিতে পারে। কিন্তু কোথায় সে তাকে খুঁজে পাবে? আবার সোজা আস্তাবলে চলে গেছে লোকটা। কিন্তু ওদের বিছানাগুলো ত দেখে আসে নি হোরদিকুইন। আবার নীচে এলে তার নজরে পড়ল যে, মালটানার গাড়ীর কোচোয়ানরা পোশাক পরছে ·· আর জাঁও রয়েছে ঘরে। এই পাঁচজনের মধ্যে কে অপরাধী? এদের যে কোনও একজন হতে পারে, হয় ত এরা পাঁচজনও পর পর করতে পারে। কিন্তু তার আশা, লোকটা নিজেই পালাবে এর পর।

হোরদিকুইন সকালে সকলকে মাঠের কাজে যেতে বারণ করল। নিজেও

গেল না। হাত মুঠো করে খামারের মধ্যে পায়চারি করতে লাগল এবং মাঝে মাঝে সন্দেহের চোখে দেখতে লাগল ওই পাঁচটা মরদকে। ওদের সেই একজনকে ও মেরে শায়েস্তা করবে। ভেড়ার খোঁয়াড়টা দেখা শেষ করে হোরদিকুইন ভাবল, একবার মেষপালক সৌলাসকে জিজ্ঞাসা করবে। এই পঁয়ষট্টি বছরের বুড়ো অর্ধশতাব্দী ধরে এই খামারে কাজ করছে। ওর মাতাল ছিনাল বউটা সব উড়িয়ে দিয়েছে তাই কিছু জমাতে পারে নি সৌলাস। অবশেষে বউকে কবর দিয়ে সে আনন্দ লাভ করেছে। তার মনে অহরহ ভয়, বুড়ো হয়েছে সে এবার, ওকে খামার থেকে হয়ত তাড়িয়ে দেবে। হয়ত ওর মালিক ওকে দেখবেন। কিন্তু কে বলবে যে, মালিক তার আগে মরবেন না? ওরা কি কেউ তাকে কোন দিন এক টুকরো তামাক বা এক গ্লাস মদ দিয়েছে? তার ওপর জ্যাকুলিনের সঙ্গে তার আদায় কাঁচকলায় সম্পর্ক। এই খামারের একজন বুড়ো বিদ্বেষপরায়ণ অনুচরের মত সে মাগিটাকে দু'চোখে দেখতে পারে না, কত পরে এসে সে কত উঁচুতে উঠেছে। এখন মাগি তাকেও হুকুম করে। অমনি ওর মনে পড়ে মাগিকে সে ছেঁড়া পোশাক পরে নোঙরা সাফাই করতে দেখেছে এবং কথাটা ভাবলেই তার মাথা গরম হয়ে যায়। মাগি একটু ক্ষমতা হাতে পেলেই তাকে প্রথম এখান থেকে ভাগাবে। এই চিন্তা তাকে সাবধানী করে তুলেছে, কাজটা সে হারাতে চায় না, যদিও সে জানে যে, মালিক তার পক্ষে তবু মাগির সাথে বাদ-বিসম্বাদ সে এড়িয়ে চলে।

উঠোনের একদম শেষ প্রান্তে ভেড়ার খোঁয়াড়···একখানা বিশাল বাড়ি। আট শ' ভেড়া থাকে। কাঠের পাটাতন দিয়ে ঘেরা প্রতিটা ভেড়া থাকার চৌকো চৌকো ঘর। এক একটা জায়গায় ভেড়ীগুলোকে দঙ্গল করে রাখা হয়। আর একদিকে সব বাচ্চাগুলো রয়েছে। মদ্দা ভেড়াগুলো অন্য জায়গায় থাকে। দু'মাস বয়স হলেই মদ্দা ভেড়াগুলো খাসি করা হয়। এগুলো বিক্রি করার জন্য পোষা হয়। ভেরী পোষা হয় বাচ্চা তোলার জন্য। বেশী বয়স হয়ে গেলে ভেড়ীগুলোও বিক্রি করে দেওয়া হয়। নির্ধারিত দিনে মদ্দা ভেড়ার সাথে ভেড়ীর মিলন ঘটানোই নিয়ম···দিশলে জাতের সাথে মেরিনো জাতের মিলন হয়। শান্ত-দৃষ্টি, বিশাল-মাথা মদ্দা ভেড়া, ঠিক যেন এক একটা কামুক পুরুষ। ভেড়ার খোঁয়াড়ের মধ্যে দুর্গন্ধে শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। তিন মাস অন্তর পুরোন খড় ফেলে নতুন খড় পাতা হয় খোঁয়াড়ের মেঝেতে। পচা খড় আর পুরীষ থেকে উৎকট ঝাঁঝালো এ্যামোনিয়ার গন্ধ বেরোয়। দেওয়াল ঘেঁষে রয়েছে তাক। পুরীষের জঞ্জাল খুব পুরু হয়ে উঠলে তাক সরিয়ে ঘর পরিষ্কার করার ব্যবস্থা। বড় বড় জানালা দিয়ে তাজা হাওয়া আসা-যাওয়া করে। কাঠের তক্তার মাচায় রয়েছে খড়ের গাদা। তক্তা সরিয়ে খড় পাড়া হয়। ভিতরটা উষ্ণ। ভেড়ার স্বাস্থ্য অটুট রাখার জন্যে এমন উষ্ণতা প্রয়োজন।

একটা দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল হোরদিকুইন, দেখল আর একটা দরজা

খুলে বেরিয়ে যাচ্ছে জ্যাকুলিন। সৌলাসের কথা মনে পড়েছে জ্যাকুলিনের, সে তাকে জাঁয়ের সাথে দেখেছে···সে তাই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল। কিন্তু যুবতী কেন তার সাথে ভাল ব্যবহার করছে? এমন ত সে করে না। কারণটা না বুঝতে পেরে বুড়ো মেষ-পালক অনড় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ভেড়ার খোঁয়াড থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে কেন মাগি? ও ত কখখনো এখানে আসে না। অনিশ্চয়তার ভাব বাডল খামার মালিকের মনে।

সে জিজ্ঞাসা করল-—'আচ্ছা সৌলাস, আজ সকালের খবর কি?'

মেষ-পালকের দীর্ঘ আর রোগা শরীর, মুখমণ্ডল বলিরেখাবহুল। মনে হয় গাঁটওয়ালা ওক কাঠ থেকে তার দেহ খোদাই করা হয়েছে।

ধীরে ধীরে সে জবাব দিল—'কোন খবর নেই, মালিক। ভেডার লোম ছাঁটার লোকেরা এসেছে। তারা কাজ সুরু করবে।

ওখান থেকে বেরিয়ে উঠান পেরিয়ে যাওয়ার সময় হোরদিকুইনের নজরে পড়ল যে, জ্যাকুলিন সেখানে দাঁড়িয়ে খোঁয়াডের মধ্যে কি কথা হচ্ছিল তা শুনছিল। এমন একটা ভান করছিল যেন সে তার ছ শ হাঁস-মুরগী-পায়রা নিয়ে গডা পোলট্রি নিরীক্ষণ করছে· পাখিগুলো তখন সারের গাদা খুঁডে খুঁডে খাবার খুঁটছে আর অনবরত শব্দ করছে। বেঁটেখাটো শুয়োর পালক বাকেটে করে পরিষ্কার জল নিয়ে যাচ্ছিল শুয়োরদের জন্যে, যুবতীর ইচ্ছে হল লোকটার মুখে একটা ঘুষি মারতে, কিন্তু মালিকের মুখ দেখে নিশ্চিত হল যে, সে কিছু জানতে পারে নি। যুবতী আরও বেশী অবাধ্য হয়ে উঠল।

দুপুরবেলা খাওয়ার সময় তাই যুবতী উত্তেজক উল্লাসের ভঙ্গীতে আচরণ সুরু করল। রান্নাঘরে একখানা লম্বা খানা-টেবিল পাতা, দু'পাশে বেঞ্চি বসবার এখানেই ওরা খাওয়া-দাওয়া করে। একটাই নতুন আমদানি ঘরে · অগ্নিকুণ্ডের এক কোণে ঢালাই-লোহার একটা উনুন রাখা হয়েছে। পিছন দিকে একটা উনুন আছে, তার কালচে মুখটা খোলা। ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন, দেওয়ালে মাজা-ঘষা সস্-প্যানগুলো ঝোলান। আজ সকালে রান্নাঘরে ঝি রুটি সেঁকেছে—রুটির খোলা চাটু থেকে স্যাঁকা রুটির গন্ধ বেরোচ্ছে।

হোরদিকুইন সবার শেষে খাওয়ার ঘরে ঢুকতে জ্যাকুলিন বলে উঠল—'আজ কি পেট ভরা, খাওয়ার ইচ্ছে নেই?'

বউ আর মেয়ে মারা যাওয়ার পর থেকে একা খাওয়ার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে হোরদিকুইন চাকরদের সাথে এক সঙ্গে বসে খায় রোজ। টেবিলের এক প্রান্তে সে বসে আর অন্য প্রান্তে রক্ষিতা আর চাকর-বাকররা বসে। টেবিলে খেতে বসে ওরা চোদ্দজন। পরিচারিকা পরিবেশন করে। মালিক জবাব না দিয়ে খেতে বসল। জ্যাকুলিন বলল, সে পরিবেশিত খাবারের উপর নজর রাখবে। স্যাঁকা রুটির টুকরো ঝোলের গামলায় খণ্ড খণ্ড করে রেখে তার সাথে মদ আর ঝোলা গুড মিশিয়ে মিষ্টি করা হয়েছে। আর এক

চামচে দেবে কি-না জানতে চাইল জ্যাকুলিন। এমন ভান করে রসিকতা করল যে, আজ সব মরদগুলোকে সে নষ্ট করে দেবে এবং শুনে সবাই হেসে উঠল। তার প্রত্যেকটি মন্তব্যের দু'টো অর্থ হয় এবং সে বলেই রেখেছে যে, আজ রাতে সে চলে যাবে। তুমি এসেছিলে আবার চলেও গেলে—কিন্তু যে পিছনে পড়ে রইল সে দুঃখ পাবে। একবারের জন্যেও সে তার খাবারে হাত দেয় নি। মেষ-পালকের মুখে সেই বোকামির ছাপ, সে আপনমনে খাচ্ছিল —আর তার মালিকের মুখ ভাবলেশহীন, যেন কিছুই সে বুঝতে পারছে না। মনে মনে একটা অসোয়াস্তির ভাব, কিন্তু সে ধরা পড়তে চায় না তাই আর সকলের সাথে সজোরে হেসে উঠছিল, এই ঘটনায় তার ভূমিকাটুকু সে যেন গ্রাহ্যই করে না।

খাওয়া-দাওয়া চুকলে বৈকালিক কাজ সুরু করার জন্য হোরদিকুইন আদেশ দিল। এখন সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, দুরন্ত রাগের জন্য তার কানের মধ্যে ভোঁ-ভোঁ আওয়াজ হচ্ছে এবং নিজেকে মনে হচ্ছে একান্ত অসহায়। এবং অসহায় অবস্থায় সে চারধারে পায়চারি করছে, ভুলতে চাইছে এই জঘন্য অবস্থা। খামারের এক কোণে একটা চালার নীচে ভেড়ার লোম ছাঁটার লোকেরা কাজ সুরু করেছে। তাদের কাছে দাঁড়িয়ে সে ওদের কাজ দেখতে লাগল।

ওরা পাঁচজন · দীর্ঘ, পাতলা আর ঈষৎ হলদে মুখমণ্ডল ওদের। মাটিতে বসে বিশাল ইস্পাতের কাঁচি চালিয়ে ওরা লোম ছাঁটছে। মেষ পালক সামনের পা দুটো বেঁধে ভেড়াগুলোকে ওদের সামনে নিয়ে আসছে, যেন ওগুলো এক একটা চামড়ার ভিস্তি। মাটিতে শুইয়ে রাখছে, ওদের আর কিছু করবার কোনও ক্ষমতা নেই, মাঝে মাঝে মাথা উঁচু করে শুধু ডাকছে। একটা ভেড়ীকে লোম ছাঁটাইয়ের জন্য ধরতেই সে শান্তভাবে শুয়ে পড়ল, গায়ে কালো ধূলো আর তেল লাগা বিশাল লোমের আবরণ। তারপর ওরা দ্রুত কাঁচি চালাতেই দস্তানার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা উলঙ্গ হাতের মতন মনে হচ্ছে সেটাকে ·· শুধু চামড়ার উপর ছোট ছোট সোনালি আর গোলাপী লোমের পাতলা আবরণটুকু রয়েছে।

সেদিন বাইরে যাওয়ার পর নিজের ছেলের কথা মনে পড়ল···সে একজন ক্যাপ্টেন। তারা দু'জন থাকলে ভাল কাজ হত। কিন্তু হতভাগা চাষের কাজের চেয়ে তলোয়ারের পিছনে ছোটার কাজটাই বেশী পছন্দ করল···ছেলের স্মৃতি সে মন থেকে ছেঁটে ফেলতে চাইল। না, তার আর কোনও সন্তান নেই, এমনই একাকীত্বের মধ্যে তার মৃত্যু ঘটবে। দু'জন মজুর ক্ষেতে লাঙল দিচ্ছে, ও ক্ষেতের ভিতর দিয়ে ওদের কাজ দেখতে গেল। পায়ে কাদা জড়িয়ে যাচ্ছে···উর্বর কাদার প্রলেপ, যেন মাটি তাকে আলিঙ্গনে বেঁধে রাখতে চায়। মাটি আবার তাকে পুরোপুরি গ্রহণ করেছে। সেই তিরিশ বছরের যৌবন-শক্তি আর সুখ যেন সে ফিরে পেয়েছে। মাটি-ই একমাত্র নারী;

আর কোন নারী নেই সংসারে। জ্যাকুলিনদের মতন নারীরা ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না·· ওরা যেন এক একখানা থালা, যাতে সবাই খেতে পারে, শুধু ওগুলো যথেষ্ট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হলেই হল। ওই ছিনালের দেহ উপভোগের জন্য লজ্জা-কর প্রয়োজনের একটা যুৎসই ওজর সে বার করল এবং মনে মনে খুশি হয়ে উঠল। ঘণ্টা তিনেক ধরে সে মাঠে মাঠে হাঁটল। ক্রয়েসের দিক থেকে অন্য খামারের একটা মজুর মেয়ে গাধার পিঠে চড়ে আসছিল, তার উলঙ্গ পা দু'খানা ঝুলছিল···তাকে দেখে হোরদিকুইন রসিকতা করল।

খামারে ফিরে হোরদিকুইন দেখল, জ্যাকুলিন উঠোনে দাঁড়িয়ে বিড়ালগুলোর কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে। খামারে এক দঙ্গল বিড়াল রয়েছে···বার, পনের, কুড়ি। ঠিক যে কতগুলো তাদের সংখ্যা তা কেউ জানে না। বিড়ালীরা তাদের বাচ্চাগুলোকে খড়ের গাদার গর্তের মধ্যে লুকিয়ে রাখে। মায়ের সাথে পাঁচ ছ'টা বাচ্চা বেরিয়ে আসে এক এক সময়। এবার জ্যাকুলিন মেষ-রক্ষক কুকুর দুটো এমপারার আর ম্যাসাকাবের কাছে বিদায় নিতে গেল। কিন্তু কুকুর দুটো তাকে দু'চোখে দেখতে পারে না, তাকে দেখে গর্জে উঠল।

এত বিদায় নেওয়ার ঘটা সত্বেও রাতের আহার-পর্ব শান্তিতে চুকল। খামারমালিক খাওয়ার সময় স্বাভাবিকভাবে দু'চারটে কথাও বলল। তারপব দিন শেষ হয়ে রাত বাড়ল, কিন্তু চলে যাওয়ার কথা কেউ মুখেও আনল না। প্রত্যেকেই বিছানায় গা ঢেলে দিল এবং আঁধারের চাদরখানা খামার-বাড়ী ঢেকে ফেলল।

সে রাতে জ্যাকুলিন রাত-কাটাল মৃতা মাদাম হোরদিকুইনের বিছানায়। সুন্দর ঘর, বিশাল বিছানাটার লাল পর্দাঘেরা পরিবেশ। একটা পোশাক রাখার আলমারি, একটা গোল টেবিল এবং ভলতেয়ারের আমলের কায়দায় নির্মিত একখানা আরাম-কেদারা রয়েছে ঘরে। ছোট একটা মেহগনি কাঠের ডেস্কের উপর রাখা বিভিন্ন কৃষি-প্রদর্শনীতে খামারমালিকের পাওয়া পদকগুলো কাঁচের আধারের মধ্যে ঝক্-ঝক্ করছে। রাত-পোশাক পরে রুগনেত্তির কন্যা সেই বিবাহের খাটের উপর হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল, বুঝি এই মুহূর্ত থেকে সে সব কিছু অধিকার করে ফেলেছে। ঘুঘুর ডাকের মতন খনখনে গলায় জ্যাকুলিন হেসে উঠল।

পরের দিন সকালে সে জ্যাঁ-এর গলা জড়িয়ে ধরে আদর করতে গেল, কিন্তু জ্যাঁ তাকে ঠেলে সরিয়ে দিল। এর ফলে যদি সঙ্গীন অবস্থার সৃষ্টি হয় তাই সে আর এ সব চায় না।

২

ক্রয়েস থেকে একদিন জ্যাঁ পায়ে হেঁটে ফিরছিল, রগনি গ্রাম তখনও মাইলটাক দূরে। সহসা দেখল ওর সামনে দিয়ে চাষীদের একখানা ঘোড়ায় টানা

গাড়ী যাচ্ছে। কিন্তু একটা বিচিত্র দৃশ্য দেখে সে অবাক হল। গাড়ীখানা মনে হচ্ছে খালি, চালকের আসনে কেউ নেই, ঘোড়াটা আপনা থেকেই ধীরগতিতে আস্তাবলে ফিরে যাচ্ছে। যুবক এগিয়ে এসে গাড়ীখানা ধরল। গাড়ীটা থামাল এবং ভিতরটা দেখবার জন্যে গাড়ীতে চড়ল। গাড়ীর ভিতরে একজন বেঁটে-মোটা বছর ষাটেক বয়সের লোক পড়ে আছে। সে পিছনে পড়ে গেছে, মুখখানা এত লাল যে কালচে দেখাচ্ছে।

জ়াঁ অবাক হয়ে চেঁচিয়ে উঠল।

হায় রে, ও ঘুমিয়ে পড়েছে না-কি? মাতাল? আরে, এ ত দেখছি ওই দুটো মেয়ের বাবা মৌচি! লোকটা ত দেখছি নিকেশ হয়ে গেছে! ব্যাপার কি!

মৌচি সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হয়েছে, যন্ত্রণায় মৃদু শ্বাস টানছে। জ়াঁ তাকে সোজা করে শুইয়ে মাথাটা তুলে ধরল। তারপর আসনে বসে ঘোড়াটাকে চাবুক কষাল। মরণাপন্ন মানুষটাকে নিয়ে তাড়াতাড়ি ঘরে ফেরার জন্য ঘোড়াটাকে সবেগে ছোটাল। তার ভয় হচ্ছে, লোকটা যে কোন মুহূর্তে মারা যেতে পারে।

গীর্জার সামনে চত্বরের কাছে পৌঁছে দেখল, ফ্রানকয়েস তাদের বাড়ীর দোরে দাঁড়িয়ে আছে। জ়াঁকে তাদের গাড়ী চালাতে দেখে সে অবাক হল।

সে জানতে চাইল—'কি হয়েছে?'

'তোমার বাবার শরীর সুস্থ নয়।'

'কোথায় বাবা?'

'ওই ত, দেখ।'

ফ্রানকয়েস চাকায় ভর দিয়ে গাড়ীতে চড়ল। তাকাল। বাবার কালচে মুখোশ-পরা মুখখানা একপাশে মোচড়ানো, যেন কেউ সজোরে মুণ্ডুটা উপর দিকে টেনেছে···বুঝতে না পেরে সে দারুণ ভয় পেল। রাতের আঁধার নামছে। বিশাল মেঘ আকাশখানাকে যেন হলদে আলোয় ভরিয়ে দিচ্ছে, আর সেই আলোয় মরণাপন্ন মানুষটার মুখখানা জ্বল্ জ্বল্ করছে।

তারপর সহসা সে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল এবং দিদিকে ডাকতে ছুটল।

'লিসা! লিসা! হায় ভগবান!'

একা একা জ়াঁ ইতঃস্তত করছিল। এভাবে বুড়োকে গাড়ীতে ফেলে রেখে সে চলে যেতে পারে না। চত্বর থেকে বাড়ীর ভিত তিনটে সিঁড়ি নীচে···এই অন্ধকারে ওখানে গাড়ী ঢোকান যাবে না। তারপর দেখল রাস্তামুখী বাড়ীতে ঢোকার আর একটা দোর রয়েছে···ওখানটা চত্বরের সমতল। ঘোড়াটাকে খুলে দিতেই সেটা ধীরে ধীরে আপনা থেকে আস্তাবলের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। ওখানটায় গোয়াল···দুটো গোরু রয়েছে গোয়ালে।

ফ্রানকয়েস এবং লিসা একসাথে ছুটে এল। মাস চারেক আগে লিসার

একটা বাচ্চা হয়েছে ভয়ে সে বাচ্চাটাকে কোলে করেই নিয়ে এসেছে। খবর যখন পেল তখন বাচ্চাটাকে ও দুধ খাওয়াচ্ছিল। বাচ্চাটাও কাঁদছিল।

দু চোখে জলের ধারা, মেয়ে দুটো কাঁদতে কাঁদতে বলল—'বাবা! আমাদের কিছু বলবে না? বল, কি হয়েছে তোমার! তোমার মাথায় কি কিছু হয়েছে? কিছুই ত তুমি বলতে পারছ না। বাবা, জবাব দাও।

জাঁ বেশ বিবেচনার সাথে বলল—'নেমে এস! ওকে বরং আমরা গাড়ীর ভিতর থেকে বার করি।

ওরা ত তাকে সাহায্য করতে পারলই না, বরং আরও জোরে কাঁদতে লাগল। ওদের প্রতিবেশী ফ্রিমাতের বউ কান্না আর চেঁচামেচি শুনে বেরিয়ে এল। লম্বা, হাড্ডিসার বুড়ী আজ দু বছর ধরে সে তার সন্ন্যাস রোগগ্রস্ত স্বামীর পরিচর্য্যা করছে। তার ওপর ভারবাহী পশুর মতন খেটে নিজেদের ছোট ক্ষেত জমিও চাষবাস করছে ওদের দুজনের বেঁচে থাকার জন্য ওই জমিটুকুই এখন সম্বল। সে কিন্তু ঘাবড়াল না, বরং এই ব্যাপারটাকে সহজ-ভাবে গ্রহণ করল। মরদের মতন সে সাহায্য করল। জাঁ এবার মৌচির কাঁধ আর মাথা ধরে টেনে বাইরে নামাতে ফ্রিমাতের বউ তার পা ধরল। তারপর দু জনে তাকে বাড়ীর মধ্যে টেনে আনল

বুড়ী জিজ্ঞাসা করল 'একে কোথায় রাখবে?

ফ্রানকয়েস একটা মোমবাতি জ্বালাল বকু দফাদারের বউ এসে হাজির হল। বাইরে কোথাও খবর পেয়েই সে ছুটে এসেছে। এসব খবর ত কয়েক মহূর্তের মধ্যেই অজানা নিয়মে সারা গ্রামে ছড়িয়ে যায়।

'আহা বুড়ো মানুষটার কি হয়েছে গা? ও! বুঝেছি। দেহের মধ্যে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। তাড়াতাড়ি ধরে একখানা চেয়ারে বসাও।

কিন্তু ফ্রিমাতের বউ বলল অন্য কথা। যে লোক দাঁড়াতে অক্ষম সে বসতেও পারে না। ওকে বরং মেয়েদের কারো বিছানায় শুইয়ে দাও। এমনি-ভাবে ওরা যখন বলাবলি করছে নিজেদের মধ্যে তখন ফ্যানি তার ছেলে নিনেসি-কে নিয়ে হাজির হল। সে ম্যাকরনের দোকানে সেমাই কিনতে এসেছিল। খুড়তুতো বোনেদের বিপদের কথা শুনে উদ্বিগ্ন হয়ে দেখতে এসেছে।

সে বলল—'ওকে বসিয়ে রাখাই ভাল, তাহলে রক্ত চলাচল করবে।

টেবিলের উপর একটা মোমবাতি জ্বলছিল। ওখানেই একখানা চেয়ারে মৌচির দেহ বসানো হল। ওর চিবুক ঝুলে পড়ল বুকের উপর। হাত আর পা আলতোভাবে ঝুলতে লাগল। তার বাম চোখটা খোলা, কেননা ওর মুখের এই দিকটা টানে দুমড়ে গেছে। মোচড়ান মুখের কোণ দিয়ে জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে, যেন শিসের আওয়াজ। নীরব ঘর। পেটানো মাটির মেঝে, স্যাঁতস্যেঁতে দাগে-ভরা দেওয়াল, আর একটা বড় চিমনি ঘরের

মধ্যে মৃত্যু যেন বিরাজ করছে।

জাঁ আনাড়ীভাবে ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। আর একপাশে দুটি মেয়ে আর তিনজন নারী তাকিয়ে আছে মরণাপন্ন বৃদ্ধের দিকে।

সে একসময় বলল—'আমি এখুনি গিয়ে ডাক্তারকে ডেকে আনতে পারি।'

বেকুর বউ মাথা নাড়ল। কিন্তু আর কেউ কথা বলল না। ও যদি সুস্থ হয়ে ওঠে তবে আর ডাক্তারকে পয়সা দিয়ে কি হবে? এবং যদি মারা যায় তবে ডাক্তার কি-ই বা করবে?

বুড়োর আটকানো দাঁতের ফাঁকে চামচে ঢুকিয়ে তারা জোর করে একটু লেবু-দেওয়া চা খাওয়াল। তারপর মাথায় ও-ডি-কলোন ঘষল, কিন্তু অবস্থার কোন হের ফের হল না। তারা হতাশ হয়ে পড়ল। মুখখানা ক্রমে ক্রমে আরও কালচে হচ্ছে, চেয়ার থেকে ওর দেহ গড়িয়ে পড়ছিল। মনে হল একেবারে মেঝের উপর মুখ থুবড়ে পড়বে···তারা তাই ওকে আবার চেয়ারের উপর তুলে বসাল।

সিনেসি দরজার দিকে ফিরে গিয়ে বলল—'আরে বাপ! দারুণ বৃষ্টি আসছে। এমনটা দেখা যায় না। আকাশের রঙ কি অপূর্ব হয়েছে!'

জাঁ বলল—'ঠিক। বিশ্রী মেঘ করেছে দেখছি। ওতে কিছু এসে যাবে না।' তারপর আবার নিজের আগের ধারণার উল্লেখ করে বলে উঠল—'তোমরা বললে আমি ডাক্তার ডেকে আনতে পারি।'

লিসা এবং ফ্রানকয়েস পরস্পরের দিকে উদ্বিগ্ন হয়ে তাকাল। তারপর ফ্রানকয়েস, অল্পবয়স্ক হওয়ার জন্যই বোধ হয় মানবিকতা দেখিয়ে স্থির করল। বলল—'হাঁ, হাঁ। করপোরাল, তুমি ক্লয়েস গিয়ে মঁসিয়ে ফিনেত্-কে নিয়ে এস। আর সহ্য করতে পারছি না। যা করা উচিৎ তা করতে পারছি না।'

এসব গণ্ডগোলের জন্যে ঘোড়াটার সাজ এখনও খোলা হয় নি। জাঁ গাড়ীতে চড়ে তাড়াতাড়ি ছুটল। ঘরের মধ্য থেকে ওরা ধাবমান ঘোড়ার গাড়ীর চাকার সাথে রাজপথের ঠোকাঠুকি ঘর্ষণের আওয়াজ শুনল। ফ্রিমাতের বউ এবার যাজককে আনার কথা বলতে অন্যরা মন্তব্য করল যে, এর মধ্যেই তাদের অনেক ভোগান্তি হয়েছে। আর নয়!

কোকিল আঁকা দেওয়াল ঘড়িতে দশটা বাজল। তারা অবাক হয়ে ভাবতে লাগল যে, এখানে তারা দু'ঘণ্টা রয়েছে অথচ কিছুই করতে পারল না। দৃশ্যটা তাদের ভাল লাগছে তাই কেউ যাওয়ার নাম করছে না। শেষ পর্যন্ত ওদের দেখে যাওয়ার ইচ্ছে। আর একটা মোমবাতি ওরা জ্বালাল না, কিংবা যেটা জ্বলছে সেটা নিভিয়ে দেওয়ার মতন কষ্টও করল না। এটা খুব একটা আনন্দদায়ক দৃশ্য নয়···জীর্ণ, আড়ম্বরহীন, অন্ধকার রান্নাঘর—টেবিলে ঠেস দেওয়ানো মরণাপন্ন বৃদ্ধের শ্বাস-কষ্টের আওয়াজ বেরিয়ে আসছে।

জাঁ চলে যাওয়ার আধ ঘণ্টা পরে সহসা মৌচির দেহ চেয়ার থেকে গড়িয়ে

মেঝের উপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। আর সে শ্বাস নিচ্ছে না। সে মৃত এখন।

বেকুর বউ তিক্তকণ্ঠে বলল—'কি বলেছিলাম না তোমাদের! কিন্তু তোমরা ডাক্তার আনতে ছোটালে!'

ফ্রানকয়েস এবং লিসা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। সহোদরার স্বাভাবিক স্নেহে তারা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরল।

বারবার ভাঙ্গা ভাঙ্গা শব্দে বলতে লাগল—'হায় ঈশ্বর! আমরা দু'জন শুধু রইলাম। সব শেষ, শুধু আমরা দু'জন! এখন আমাদের কি হবে? হা ঈশ্বর!'

কিন্তু মৃতদেহ ত মেঝের উপর ফেলে রাখা যাবে না। ফ্রিমাতের বউ আর বেকুর বউ দু'জনে প্রয়োজনীয় কাজ কয়েক মিনিটের মধ্যে সেরে ফেলল। মৃতদেহ নড়াবার সাহস ওদের হল না। তাই ঘরের একটা বিছানা থেকে তোষক টেনে এনে মেঝেয় পাতল এবং তার উপর মৌচির দেহ সোজা করে শুইয়ে দিল। তার গলা পর্যন্ত একখানা চাদরে ঢাকা দিল। ইতিমধ্যে ফ্যানি আর দুটো বাতিদানে দুটো বাতি জ্বালিয়ে দিয়েছে। মৃতদেহের দু'পাশে দুটো বাতি মেঝের উপর বসিয়েছে। এটা করা হল সাময়িকভাবে। কিন্তু মৃতদেহের বাম চোখটা যেটা বার তিনেক বুজে গিয়েছিল সেটা এখন খুলল এবং তাদের কাজ দেখতে লাগল সাদা চাদরে ঢাকা কালচে মুখের ভিতর থেকে।

'মাঝ রাত হল।' বেকুর বউ গলা চড়িয়ে বলল—'মঁসিয়ে ফিনেতের কি হল? বলেছিলাম ত তোমাদের এ ধরনের লোকের মরতে অনেক সময় লাগে। ক্লয়েস থেকে ডাক্তার আনতে দু'ঘণ্টারও বেশী সময় লাগছে!'

উঠোনের খোলা দোর দিয়ে দমকা হাওয়া ছুটে এল ঘরের মধ্যে। মৃতদেহের দু'পাশের মোমবাতি দুটো গেল নিভে। এতে ওরা দারুণ ভয় পেল। তারা আবার যখন বাতি জ্বালতে গেল তখন ঝড়ো হাওয়ার ঝটকা আবার এল ছুটে···এবার আরও জোরে। আঁধার ঘেরা গ্রামের দূরান্ত থেকে উত্থিত প্রচণ্ড গর্জনের আওয়াজ উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল। আওয়াজটা এমনই ভয়ানক যেন একটা বিশাল লুঠেরা সেনাবাহিনী গর্জন করতে করতে ছুটে আসছে। গাছের ডাল-পালা ভেঙ্গে পড়ছে এবং পদদলিত ক্ষেত-জমি আর্তনাদ করছে। নারীরা দোর গোড়ায় ছুটে গেল। নজরে পড়ল, তামাটে রঙের বিশাল মেঘ আকাশ-পথে ধেয়ে আসছে। তারপরই সুরু হল চড-বড চড-বড় গুলির আওয়াজ। বড় বড় শক্ত বৃষ্টির ফোঁটা তাদের পায়ের কাছে আছড়ে পড়তে লাগল। গভীর হতাশাব্যাঞ্জক আর্তনাদ ওদের মুখ থেকে বেরিয়ে এল।

'শিলা-বৃষ্টি! শিলা-বৃষ্টি!'

আতঙ্কিত দৃষ্টিতে এই ভয়ানক কাণ্ড ওরা বিবর্ণ মুখে দেখছিল। মাত্র দশ

মিনিট ধরে ঝড় চলল। বজ্রগর্জন নয়⋯বিশাল নীলচে বিজলীর ঝলক বারে বারে আকাশময় ঝলসে উঠছিল⋯যেন ধরিত্রীর বুকে অনুপ্রভ পরিখা। রাতের অন্ধকার স্বচ্ছ হয়ে আসছে। অসংখ্য উজ্জ্বল শিলা চারধারে কাঁচের টুকরোর মতন ছড়িয়ে রয়েছে। শব্দে কানে তালা ধরে যাচ্ছে⋯যেন কামান দাগা হচ্ছে মুহুর্মুহু⋯অথবা লোহার মতন সেতুর উপর দিয়ে পূর্ণ বেগে রেল-গাড়ী ছুটে চলেছে। ভয়ঙ্কর ঝড় বইছিল এবং শিলা পড়ছিল কোণাকুণিভাবে, শিলার আঘাতে সব কিছু কেটে যাচ্ছিল। শিলা-পাথরের স্তর জমছিল মাটির উপর।

'শিলা বৃষ্টি হচ্ছে। হায় ঈশ্বর! কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার! দেখ, দেখ এক একটা শিলা যেন মুরগীর ডিমের মতন।'

উঠোনে বেরিয়ে শিল কুড়োবার সাহস ওদের হল না। ঝড়ের দাপট আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। জানালার কাঁচগুলো ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। শিলার আঘাতে একটা কুঁজো ছিটকে পড়ল। কতকগুলো শিলা এসে পড়ল মৃতদেহের কাছে বিছানার উপর।

হাতে শিলা নিয়ে ওজন অনুমান করতে করতে বেকুর বউ বলল—'পাঁচটার কমে এক পাউণ্ড হবে।'

ফ্যানি এবং ক্রিমাতের বউ বেপরোয়া হয়ে উঠল।

'সব কিছু গেল শেষ হয়ে। কি ভয়ানক ব্যাপার!'

তারপর একসময় সব থামল। দূর থেকে এই ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের আওয়াজ শুধু এখন ভেসে আসছিল। এখানে নেমে এল শ্মশানের নীরবতা। মেঘের আড়ালে গোটা আকাশের রঙ হয়েছে কালির মতন কালো। নিঃশব্দে গুঁড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়ছিল। নজরে পড়ছিল শুধু সাদা চাদরের মতন বিছানো শিলার স্তর⋯আপনা থেকে সেই স্তর থেকে আলোর দ্যুতি বিচ্ছুরিত হচ্ছিল⋯ যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু এই রাতের আলোকের ব্যাপ্তি।

নিনেসি সহসা বাইরে ছুটে গেল এবং তার হাতের মুঠোর মতন, এবড়ো খেবড়ো, চ্যাপ্টা একখানা কোণাকৃতি তুষার-খণ্ড নিয়ে ফিরে এল। ক্রিমাতের বউ আর চুপচাপ বসে থাকতে পারছিল না, পারছিল না ছুটে বাইরে গিয়ে দেখার ইচ্ছা দমন করতে।

এক সময় বলল—'চললাম লণ্ঠন আনতে। সর্বনাশের চেহারাটা একবার দেখতেই হবে।'

ফ্যানিও চঞ্চল, মাত্র কয়েকটা মিনিট আর বসে থাকতে পারল। আঃ কি ভয়ানক কাণ্ড! সে কাঁদতে লাগল। শাকসব্জী আর ফলের বাগানের হয়ত দারুণ ক্ষতি হবে! গম, যব আর বালির চারাগুলো এখনও বড় হয় নি, তত ক্ষতি হবে না, কিন্তু দ্রাক্ষালতা! হায় হায় দ্রাক্ষালতাগুলো একদম শেষ হয়ে যাবে।

সে এক সময় বলে উঠল—'দেখ তোমাদের একটা লণ্ঠন নিয়ে যাচ্ছি। একবার আমাদের আঙুর-ক্ষেতখানা দেখে আসব।'

বেকুর বউয়ের জমি নেই তাই কোন ভাবনাও নেই। সব সময় সব কিছুর জন্যে অনুযোগ করা তার স্বভাব। তাই দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, ঈশ্বর সাহায্য করবেন! কিন্তু কৌতূহলী হয়ে সে বারবার দোরের কাছে ছুটে যাচ্ছিল। দেখল অজস্র লণ্ঠন জ্বলছে সারা গ্রামে—এসব দেখে তার কৌতূহল আরও বাড়ল। সে চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। গোয়াল আর বার-বাড়ীর ফাঁক দিয়ে সীমানা-বেড়ার পাশ দিয়ে নজরে পড়ছে সারা রগনি গ্রামখানা। শিলাবৃষ্টিতে সব চাষীরা জেগে উঠেছে। প্রত্যেকেই নিজের নিজের ক্ষেতের অবস্থা দেখার জন্যে অধীর। দিন হওয়ার জন্য তারা আর সবুর করতে চায় না···তাই একে একে লণ্ঠনগুলো ছুটতে ছুটতে দুলতে দুলতে আসছে ·আসছে, আরও আসছে।

বাবার মৃতদেহ নিয়ে লিসা এবং ফ্রানকয়েস ঘরের মধ্যে বসে রইল। বৃষ্টি সমানে পড়ছিল। হালকা স্যাঁতস্যেতে বাতাস ঢুকছে মাটি ঘেঁষে মোমবাতির আলো কাঁপছে। দোরটা বন্ধ করে দেওয়া উচিত ছিল মেয়েদের, কিন্তু ওরা কেউ সেকথা ভাবছে না, বাড়ীর মধ্যে এই ভয়ানক দুঃখের ঘটনা ঘটলেও বাইরের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্য তারাও ক্ষতিগ্রস্ত। বাড়ীতে এই মৃত্যুর ঘটনা, এটাই কি যথেষ্ট নয়? ঈশ্বর প্রত্যেকটি বস্তু ধ্বংস করলেন, খাওয়ার মতন এক টুকরো রুটি রইল কি-না তাই অনেকে জানে না।

ফ্রানকয়েস বলল—'বাবা খুব আঘাত পেতেন! ভালই হয়েছে তাকে দেখতে হল না!'

ওর দিদি অন্য লণ্ঠনটা তুলে নিল।

'কোথায় যাচ্ছিস?'

'মটরশুঁটি আর সীমের ক্ষেতের কথা ভাবছি। এখখুনি আসছি!'

বৃষ্টির মধ্যেই উঠোন পার হয়ে সে তরকারির ক্ষেত দেখতে গেল। এখন বৃদ্ধের মৃতদেহ আগলে রয়েছে ফ্রানকয়েস। দাঁড়িয়ে আছে দোরগোড়ায়। লণ্ঠনটাকে সামনে পিছনে নড়তে দেখে সেও বিহ্বল হয়ে পড়ছে। তার মনে হল, সে ফোঁপানি আর কান্না শুনতে পাচ্ছে, তার হৃদয় দুঃখে ভেঙ্গে যাচ্ছে।

চেঁচিয়ে উঠল—'কি হয়েছে দিদি? কি ব্যাপার?'

কেউ তার প্রশ্নের জবাব দিল না; লণ্ঠনগুলো মাতালের মতন শুধু দুলছে।

'সীমের চারাগুলো কি পড়ে গেছে? বল না আমাকে? মটর চারা নষ্ট হয়েছে নাকি? হায় ঈশ্বর! ফলগাছ আর লেটুস-চারাগুলোর কি হল?'

তারপর আর্তনাদের আওয়াজ সে শুনল, সে মনস্থির করে ফেলল। স্কার্টের প্রান্ত উঁচু করে ধরে সে দিদির কাছে ছুটল। মৃত মানুষটার দেহ পড়ে রইল খোলা রান্নাঘরে···চাদরের নীচে, ধোঁয়া ওঠা করুণ দুটো মোমবাতির আলোর

মাঝখানে রক্ষিত মৃতদেহটা কঠিন শীতল। বামদিকের চোখটা একগুঁয়ের মতন খোলা, দৃষ্টি নিবদ্ধ ছাদের কড়ির দিকে।

সারা জেলায় ভয়ানক ক্ষতি হল! এই দুর্বিপাকের জন্য প্রত্যেকেই অনুযোগ করছিল, কি ভয়ানক সর্বনাশ ঘটেছে তা' ওই দোলায়মান লণ্ঠনগুলো দেখে বোঝা যাচ্ছে। সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছে গাছগুলোর। ছোট-ছোট ডাল-পালা আর ফলগুলো দেখে মনে হচ্ছে কেউ যেন ছুরি দিয়ে ওগুলো কেটেছে। আর গাছের গুঁড়িগুলো গেছে থেঁৎলে, ছালের গর্ত দিয়ে তাই রস ঝরে পড়ছে।

দ্রাক্ষা-লতাগুলো কে যেন কাস্তে দিয়ে কেটেছে। ছোট ছোট ডাল-পালা আর লতার সাথে আঙুরের কুঁড়িগুলো পড়ে আছে। শুধু এবছরের ফসলই নষ্ট হল না, দ্রাক্ষা-কাণ্ডগুলো যেভাবে ভেঙেচুরে গেছে তাতে ওগুলো এবার মরে শুকিয়ে যাবে। বৃষ্টি কেউ গ্রাহ্যই করছে না। একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠল এবং সমাধির সামনে যেন দাঁড়িয়ে আছে এমনিভাবে নারীরা আর্তনাদ করতে লাগল।

পরিত্যক্ত মৌচির মৃতদেহ তখন বিছানায় পড়ে, একটিমাত্র খোলা চোখের দৃষ্টি ছাদে নিবদ্ধ ঠিক সেই সময় দু'খানা ঘোড়ার গাড়ী বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল। জঁ। অবশেষে মঁসিয়ে ফিনেত্‌কে নিয়ে এল। তিন ঘণ্টা তাঁর জন্যে সেখানে জঁাকে অপেক্ষা করতে হয়েছে। ডাক্তার নিজের গাড়িতে এসেছেন।

ডাক্তারের লম্বা, পাতলা শরীর, হলদে মুখে উচ্চাশার ছাপ, ঘরের মধ্যে তিনি ঢুকলেন। মনে মনে তিনি তাঁর চাষী রোগীদের ঘৃণা করেন এবং দোষ দেন নিজেকে নিজের মধ্যম অবস্থার জন্য।

'হ্যালো! এখানে কেউ নেই না-কি? ভাল আছে বুঝি?' তারপর মৃতদেহের দিকে চোখ পড়তে বললেন—'দেখছি, বড় দেরি হয়ে গেছে। এজন্যেই ত আসতে চাইছিলাম না। সেই এক কাহিনী। রোগী যখন মারা যায় তখনই ওরা আমাকে ডাকে।'

মাঝ রাতে এই অপ্রয়োজনীয় ঝঞ্ঝাটে তিনি বিরক্ত হলেন। ঠিক তখনি লিসা এবং ফ্রানকয়েস ঘরে ঢুকল। তারপর যখন শুনলেন যে, দু'ঘণ্টা পার হওয়ার পর তারা তাঁকে আনতে লোক পাঠিয়েছে তখন দারুণ রেগে গেলেন।

'তোমরাই ওকে মেরে ফেলেছ! সন্ন্যাস রোগে ওডি-কলোন এবং লেবু চা ব্যবহার করাটা হাস্যকর ব্যাপার। তার ওপর এখানে দেখছি কেউ নেই। তোমাদের জানা উচিত এ ছোটাছুটি করবে না।'

লিসা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল—'কিন্তু মঁসিয়ে শিলাবৃষ্টির জন্যই এমনটা হয়েছে।'

মঁসিয়ে ফিনেত্‌ এবার আগ্রহান্বিত হলেন, শান্ত হল তাঁর মেজাজ। 'এখানে কি তাহলে শিলা-ঝড় হয়েছে? চাষীদের সাথে থাকতে হয় বলে

তাদের অনুভবের, আবেগের তিনি সঙ্গী। জাঁ তাঁর সাথে যোগ দিল। অবাক হল তারা। অথচ ক্লয়েস থেকে আসার পথে তারা শিলাবৃষ্টির কোন চিহ্ন দেখে নি। কয়েক মাইলের দূরত্বে কিছু লোক নিস্তার পেল আর কিছু লোকের সর্বনাশ হয়ে গেল। ভুল দিকে থাকলে তোমার ভাগ্য কত না খারাপ হতে পারে! তারপর ফ্যানি লণ্ঠন নিয়ে ফিরে এল···এবং তার সাথেই ফিরল বেকুর বউ এবং ফ্রিমাতের বউ। যে ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দৃশ্য তারা দেখে এল তিনজনেই তা বিশদভাবে বর্ণনা করল।

ডাক্তার বিষণ্ণকণ্ঠে বললেন—'এটা এক বিয়োগান্ত ব্যাপার! গ্রাম-ঘরে এর চেয়ে বিয়োগান্ত আর কিছু হয় না।'

এমন সময় গলায় ঘড়ঘড়ে আওয়াজ হতে তাঁর কথা বাধা পেল। দুই মোমবাতির মাঝে রক্ষিত ভুলে-যাওয়া মৃত মানুষটার দেহ থেকে এই আওয়াজ উত্থিত হল। প্রত্যেকে নীরব হল এবং নারীরা বুকে ক্রুশ চিহ্ন আঁকল।

৩

একটা মাস পার হল।

ফ্রানকয়েস পনের বছরে পা দিল। তার দিদি তার চেয়ে দশ বছরের বড়। বুড়ো ফৌআন তাদের অভিভাবক নিযুক্ত হয়েছে। নিজেদের খাসে এক টুকরো রেখে অবশিষ্ট ক্ষেত-জমি তাদের ভগ্নীপতি ডেলহোমিকে বর্গা দেওয়ার ব্যবস্থা ফৌআন করে দিয়েছে, এর ফলে জমির চাষ ঠিক মতন হবে। এখন মেয়ে দুটির মাথার উপর ত কেউ নেই, বাড়িতে বাবা বা দাদা নেই, এমন অবস্থায় লোকজন দিয়ে' চাষ করবার ব্যবস্থা করতে গেলে ভয়ঙ্কর সর্বনাশা মজুর-খরচের মধ্যে পড়ে যাবে। ডেলহোমি তাদের সাহায্য এবং সেবা করার মতলবে এই ব্যবস্থা করেছে এবং রাজী হয়েছে যে, কোন একজন বোনের বিয়ে হলেই সে বর্গা ছেড়ে দেবে। তখন হয় ত তাদের জমি-জমা ভাগাভাগি করে নেওয়ার প্রয়োজন হবে।

লিসা এবং ফ্রানকয়েস তাদের ঘোড়াটা প্রয়োজন হবে না বলে ভগ্নীপতিকে দিয়ে দিল। তবে গাইগোরু দুটোকে, কলিচ্ আর ব্লানচেত, নিজেরা রেখে দিল। আর রাখল তাদের গাধা গিডনকে। লিসা তরকারির ক্ষেতখানা আর ফ্রানকয়েস গাইগোরু দুটোকে দেখবে। এতেই ওদের অনেক কাজ করতে হবে। তবে ওদের স্বাস্থ্য খুব ভাল এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ওরা এই বিপদ থেকে অবশেষে উদ্ধার পাবেই।

প্রথম কয়েকটা সপ্তাহ ওদের খুব খাটতে হল কেননা শিলা-বৃষ্টিতে বহু ক্ষতি হয়েছে। বাগানের জমি ফের কুপিয়ে শাকসব্জির চারা লাগাতে হল। এ কাজে জাঁ-ও তাদের সাহায্য করল। যেদিন থেকে মেয়ে দুটির মরণাপন্ন পিতাকে বাড়ী নিয়ে এসেছে সেদিন থেকে সে তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ হয়েছে।

মৃতদেহ সংকারের পরের দিন ছ্'বোন কেমন আছে সে দেখতে এসেছিল। তারপর আসতে স্থরু করল ওদের সাথে গল্পগুজব করতে। তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বাড়ল। অবশেষে একদিন সে লিসার হাত থেকে কোদাল কেড়ে নিয়ে বাগানের খানিকটা অংশ কুপিয়ে দিল। ছ্'বোন সেদিন থেকে তাকে বন্ধু বলে গ্রহণ করেছে। খামারের কাজের পর সে যেটুকু অবসর পেত তা এদের সাথেই কাটাতে লাগল। এখন সে এ বাড়ীর-ই একজন। তিন-শতাব্দী আগে ফৌআনদের পূর্ব-পুরুষরা যে-বাড়ী তৈরী করেছিল সেই বাড়ীকে এখন সে নিজের বাড়ী বলে মনে করে···যেন অনেকটা তারই পরিবার।

জাঁ এখানে আনন্দের সন্ধান লাভ করেছে এবং অবাক হয়ে ভাবে কেন সে এখানেই ফিরে ফিরে আসে। আনন্দময়ী লিসা তাকে প্রতিবারই উষ্ণ সম্বর্ধনা জানায়। লিসার বয়স পঁচিশ, কিন্তু তাকে আরও বড় দেখায়। সহজ সরল যুবতী। বিশেষ করে মেয়ে জন্মানোর পর থেকে সে আরও সরল হয়েছে। হাত ছ্'খানা খুবই সবল, এমন গভীর উৎসাহে পরিশ্রম করে, চেঁচিয়ে কথা বলে আর হাসে যে ওকে দেখতে খুব মজা লাগে। জাঁ ওকে একজন যুবতী মনে করলেও তার বোন ফ্রানকয়েস ওর কাছে কচি খুকি। এখনও মাঠে কঠোর পরিশ্রম করতে শেখে নি ফ্রানকয়েস, ওর দেহ এখনও লাবণ্য ভরা, পান পাতার মতন মুখে এক টুকরো অবাধ্য কপাল, ছ্চোখে গভীর রহস্তের স্পর্শ, ঠোঁট জোড়ায় ঈষৎ নম্রতার জন্ম ছায়ার আভাষ। তাকে কিশোরী মনে করা হলেও সে ইতিমধ্যেই যৌবনে পা দিয়েছে। তাই তার দিদি বলে বেড়ায়, ওর পেটে বাচ্চা দেওয়ার জন্ম কোনও মরদ যেন ওর সাথে আসনাই না করে। তাদের মায়ের মৃত্যুর পর থেকে লিসা তাকে মানুষ করেছে। তাই তাদের মধ্যে এত স্নেহের আকর্ষণ। দিদি বড় গলায় তা বলে বেড়ায়, কিন্তু ছোট বোনের স্বভাব উত্তেজনা-প্রবণ এবং সংযমী। ফ্রানকয়েস অসাধারণ আত্মপ্রত্যয়ের অধিকারিণী বলে পবিচিতা। অন্যায় দেখলেই সে চটে আগুন হয়। তাই যখন সে বলে 'এটা আমার এবং ওটা তোমার তখন মবণ-যন্ত্রণার চাপেও সে কথা সে ফিরিয়ে নেবে না এবং যেহেতু লিসাকে তাব শ্রদ্ধা করা উচিৎ তাই সে তাঁকে শ্রদ্ধা করে। সে পরিমিত ও সংযত বুদ্ধির মেয়ে, মনে কোনও তুষ্ট চিন্তার স্থান নেই শুধু তার কর্মঠ দেহ মাঝে মাঝে লোভ আর আলসেমিতে পীড়িত হয়। একদিন তার চেয়েও বয়স্ক মনে করে জাঁয়ের সাথে সে ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ জুড়ে দিল। জাঁ তার সাথে খেলে, জ্বালাতন করার উদ্দেশ্তে মিথ্যে বলে রাগায়, এবং দারুণ রাগে তাকে বোবা দেখবার জন্তে সে মাঝে মাঝে অন্যায়কে সমর্থন জানায়।

জুন মাসের এক রবিবার। অপরাহ্নবেলা। লিসা তরকারির ক্ষেতে কাজ করছিল। নিড়নি দিয়ে আগাছা তুলছিল। বাচ্চা মেয়ে জুলিকে শুইয়ে রেখেছে একটা কুলগাছের নীচে··সে ঘুমোচ্ছে। ছুপুরের কড়া রোদ এসে

লুটিয়ে পড়েছে লিসার দেহ ··নীচু হয়ে, কোমর বেঁকিয়ে আগাছা তুলছে আর হাঁপাচ্ছে। এমন সময় ঝোপের আড়াল থেকে ডাক শুনে মাথা তুলল লিসা।

'কি ব্যাপার ? রবিবারেও বিশ্রাম নেবে না ?'

কণ্ঠস্বর বুঝতে পেরে লিসা উঠে দাঁড়াল। তার হাত দু'খানা লাল হয়ে উঠেছে। মুখখানা অরুণ-বরণ কিন্তু তবু হেসে চলেছে।

'হায় ঈশ্বর! রবিবারেই হোক বা অন্যবারেই হোক ক্ষেত-জমির চাষবাস আপনা থেকেই হয় না।' কথা বলছিল জঁা। ঝোপ ঘুরে সে উঠোনে এল।

'ও কাজটা আমার হাতে ছেড়ে দাও। তোমাদের জন্যে কাজটা আমি তাড়াতাড়ি করে দিচ্ছি।'

কিন্তু লিসা রাজী হল না। বলল যে, কাজটা সে প্রায় করেই ফেলেছে এবং এ কাজ না করলে একটা কিছু ত তাকে করতেই হবে। কাজ ফেলে রাখার সময় কই। ভোর চারটের সময় সে যদিও ওঠে আর সেলাই ফোঁড়াইয়ের কাজ করে সন্ধ্যেবেলা·· তবু সারাদিনে তার কাজ শেষ হয় না।

তাকে আঘাত দিতে চাইল না জঁা, তাই জুলির পাশে কুলগাছ তলায় বসে পড়ল। সে দেখল, পাছা আকাশ-মুখী করে কোমর নুইয়ে লিসা আবার আগাছা তুলছে। স্কার্ট উঁচু হওয়ায় তার পুরুষ্টু জানুযুগল চোখে পড়ছে আর মাই-দুটো যেন লুটিয়ে পড়েছে মাটিতে।

জঁা বলল—'সত্যি তোমার দেহ বড় সুগঠিত। খুব ভাল এটা।'

কথাটা শুনে লিসা গর্ব অনুভব করল। এবং হেসে ধন্যবাদ জানাল। তাকে একজন মরদের মতন সুস্থ দেহে কঠোর পরিশ্রম করতে দেখে জঁা-ও তাকে হেসে প্রশংসা করল। পাছা আকাশমুখী, হাঁটু নুইয়ে কাজ করছে তাই দু পায়ের গুলী দুটো যন্ত্রণায় টাটিয়ে উঠেছে। গরমে ঘর্মাক্ত জানোয়ার দেহের মত তার ঘামে-ভেজা শরীরে গন্ধ। তবু জঁার মনে কোনও অসম্মানজনক ইচ্ছা হচ্ছে না। শুধু এইটুকু ভাবছে যে, এমনি ধরনের সবল বাহুর সাহায্যে সে অনেক কাজ করতে পারবে। সে নিশ্চিত পরিবারে এমন নারী পুরুষের সাথে সমান তালে কাজ করতে সক্ষম।

বুঝি 'তার মনে কোনও ভাবের সম্মিলন ঘটেছে, তাই অনিচ্ছার সঙ্গে সে একটা খবর ফাঁস করে ফেলল অথচ এ খবরটা এখানে ফাঁস না করার দৃঢ় ইচ্ছা ছিল তার মনে।

'গতকাল বুতোর সাথে দেখা হয়েছিল।'

ধীরে সুস্থে লিসা উঠে দাঁড়াল, কিন্তু প্রশ্ন করবার সুযোগ সে পেল না · গোয়ালের এক কোণে ডেয়ারিতে কাজ করছিল ফ্রানকয়েস, বাইরে জঁায়ের কণ্ঠস্বর শুনে বেরিয়ে এল, তার হাত দু'খানা তখনও দুধেসাদা।

সে বেগে বলে উঠল—'ওর সাথে তোমার দেখা হয়েছিল ? ও একটা

শুয়োরের বাচ্চা !'

ওর মনের বিরোধ-ভাব দিন দিন বাড়ছিল। যখনই সে খুড়তুতো ভাইয়ের নাম শোনে তখনই জঘন্য ঘৃণায় তার মন ভরে যায়, তাকে ব্যক্তিগতভাবে অপমান করার প্রতিশোধ নেওয়ার দায়িত্ব যেন তার উপর বর্তায়।

লিসাও শান্তভাবে বলে—'সত্যিই ও একটা শুয়োরের বাচ্চা। কিন্তু কেবল মুখে গালাগালি দিয়ে ত কোনও ফল হবে না।'

সে নিতম্বে হাতের ভর রেখে দাঁড়াল।

তারপর গম্ভীরভাবে জানতে চাইল—'বেশ, বুতো কি বলল শুনি ?'

এমনভাবে খবরটা বলে ফেলার জন্যে জঁা ভারি লজ্জিত হয়ে পড়ল। বসল—'কিস্‌সু না। নিজের কথাই কেবল বলল। তার বাবা না-কি চারধারে বলে বেড়াচ্ছে যে, সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করবে। বুতো বলছে যে, বুড়োর দেহ এখনও সমর্থ, সে আরও অনেক দিন বাঁচবে। ওর সম্পত্তির জন্যে তার মাথা ব্যথা নেই।'

'সে কি জানে যে, যেসাস্ ক্রাইস্ট আর ফ্যানি এসব সত্ত্বেও দলিলে সই করে নিজেদের ভাগ বুঝে নিয়েছে ?'

'হ্যাঁ, সে জানে। আর এটাও শুনেছে যে, বুতো যে সম্পত্তি নেয়নি বুড়ো ফৌআন তা' ডেলহোমিকে ভাড়া দিয়েছে। জানে যে, মঁসিয়ে বেইলিহ্যাচি খুব রেগে গিয়ে বলেছেন যে, কাগজপত্র সই না হলে তিনি ভাগগুলোর সীমানা চিহ্নিত করবেন না। হাঁ, সে জানে যে, সব শেষ হয়ে গেছে।'

'কিন্তু তবু সে কিছু বলছে না ?'

'না, একেবারেই না।'

নিঃশব্দে লিসা নুয়ে পড়ে আবার আগাছা উপড়াতে লাগল, তার পাছা সেই আগের মতনই আকাশ-মুখী। এবং একসময় ঘুরে আগাছায় হাত রেখে সে বলল—'আচ্ছা করপোরাল, ওকে কি আমি কিছু বলব ? অবশ্য আমি নিজে জুলিকে মানুষ করতে পারি।'

'হাঁ, তুমি ঠিক বলেছ।'

জুলির কথা ভুলে গিয়েছিল জঁা, এবার সে তার দিকে তাকাল। শিশুটি কাঁথা মুড়ি দিয়ে তখন ঘুমোচ্ছে এবং তার ভাবলেশহীন মুখে রোদ ছড়িয়ে পড়েছে। এই শিশুটি হচ্ছে সব বিবাদের মূল। নইলে সে যখন ঝাড়া হাত-পা তখন সে কেন লিসাকে বিয়ে করবে না ? লিসাকে এমনভাবে কাজ করতে দেখেই চিন্তাটা সহসা তার মাথায় ঢুকেছে। বোধ হয় জঁা ভালবাসে লিসাকে। তাই হয়ত তাকে সে গৃহস্থ বধূ হিসাবে দেখতে চায়। কিন্তু সে বিস্মিত। কই তার জন্য ত জঁার মন লালায়িত নয়, এবং কখনও তার সঙ্গে সে খেলা করে নি যেমন সে খেলা করে ফ্রানকয়েসের সাথে। এবং সেই মুহূর্তে সে মাথা তুলতেই দেখতে পেল ছোট মেয়ে ফ্রানকয়েস রোদে দাঁড়িয়ে আছে, তার মুখমণ্ডল ভীষণ

হয়ে উঠেছে, কাম-লালসায় তার দু'চোখ ঝক্‌ঝক্ করছে, এবং এই বিচিত্র আবিষ্কারের জন্য জঁা মনে দারুণ আনন্দ অনুভব করল ··খুশী হল।

কিন্তু সহসা শিঙা বাজার আওয়াজ তারা শুনতে পেল।

মটর-চারাদের ছেড়ে লিসা এগিয়ে এসে বলল—'আরে লাম্‌বারদি এসেছে। আমি ওকে একটা মস্তকাবরণ আনতে বলব ভাবছি।

রাস্তার দিককার কাঁটা-ঝোপ পেরিয়ে শিঙ্গা হাতে একটা বেঁটেখাটো লোক এগিয়ে এল·· ওর সঙ্গে একখানা ঘোড়ায় টানা মাল-গাড়ী। ঘোড়াটার রঙ ধূসর। ওই লাম্‌বারদি। ব্রুয়েসে ওর একখানা দোকান আছে। নানা সুন্দর সুন্দর জিনিস-পত্রে তার দোকানখানা সে বাড়িয়ে তুলেছে। জামা-কাপড়, ছোট-খাট পণ্য-দ্রব্য, জুতো এমন কি লোহার তৈজস-পত্র পাওয়া যায় যেন ছোট-খাট একটা বাজার। শহর থেকে ছ'সাত ক্রোশ দূর পর্যন্ত গ্রামগুলোতে সে এসব জিনিস ফেরি করে বেড়ায়।

সে মস্তকাবরণ সরবরাহ করার বরাত নিল।

বলল—'ভাল রুমাল আছে, দেখবেন না?'

একটা বড় বাক্স থেকে সে সোনালি বুটিদার লাল রঙের বড় বড় রুমাল বার করে রোদে মেলে ধরল। বলল—'কেবল তিন ফ্রাঙ্কেই বেচি। তবে এক শ সাউ যদি দেন ত দু'খানা দিতে পারি।'

লিসা এবং ফ্রানকয়েস রুমাল দুখানা নিয়ে বেড়ার ধারে যেখানে জুলির কাঁথা শুকোচ্ছে সেখানে মেলে ধরে পরখ করতে লাগল, ও দুটো কেনবার জন্য তাদের ইচ্ছে হচ্ছিল। তারা বিবেচক মেয়ে, এগুলো ওদের কাছে খুব প্রয়োজনীয় নয় কাজেই এগুলো কেনবার কি সার্থকতা আছে? ওরা যখন রুমাল দু'খানা ফিরিয়ে দিচ্ছিল ঠিক তখনই জঁা স্থির করে ফেলল যে, বাচ্চা থাকা সত্ত্বেও সে লিসাকে বিয়ে করবে। ব্যাপারটার যেন দ্রুত নিষ্পত্তি করার জন্যই সে বলল—'না, না। রেখে দাও। আমি তোমাকে দিচ্ছি। না নিলে দুঃখ পাব। এটা বন্ধুত্বের চিহ্ন, বুঝলে।'

ফ্রানকয়েসকে সে কিছুই বলে নি। সে তখনও তার রুমালখানা ফেরিওয়ালার দিকে বাড়িয়ে ধরে ছিল। তার মুখের ভাব দেখে তার কষ্ট হল। মনে হল মেয়েটার মুখখানা বিবর্ণ হয়ে শুকিয়ে গেছে।

'বোকা মেয়ে, তোমারটাও রেখে দাও! তোমাকেও দিচ্ছি, ওরকম মুখ করে দাড়িয়ে থাকতে হবে না!'

দুটো মেয়েরই মন জয় করল জঁা। তারা 'নেব না' বলল না এবং প্রাণ খুলে হাসতে লাগল। লাম্‌বারদি তখন বেড়ার উপর হাত বাড়িয়ে দিয়েছে দাম নেওয়ার জন্যে। দাম নিয়ে সে এগিয়ে গেল। তার ঘোড়াটা তার পিছনে পিছনে গাড়ীখানা টেনে নিয়ে চলল। তার কর্কশ শিঙ্গাধ্বনি আঁকা-বাঁকা পথ পেরিয়ে দূর থেকে দূরে মিলিয়ে গেল।

আরও একটা সপ্তা' পার হল।

জঁায়ের মনে গভীর লজ্জা এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল যে, সাহস করে সে লিসার সাথে কথা বলতে পারছিল না। নিজের ধারণা তার কাছে অন্যায় বলে মনে হয় নি; বরং চিন্তা করলে এর সুবিধার দিকটা তার সামনে প্রকাশ হয়ে পড়ে। দু'দিক দিয়ে চিন্তা করলে এর ভালটাই চোখে পড়ে। জঁায়ের কিছু নেই, কিন্তু লিসার জীবন জড়িয়ে আছে একটা শিশুর সাথে। তার অর্থ তারা দু জনেই সমান। চুলচেরা হিসাব সে করছে না, তবে লিসার এবং নিজের সুখের মুখ চেয়ে সে সবকিছু বিবেচকের মতন খুঁটিয়ে বিচার করছে। এবং তারপর বিবাহ কবলে সে খামার ছেড়ে আসতে বাধ্য হবে। আজকাল আবার স্রেফ তার প্রতি ভালবাসার দুর্বলতার জন্য জ্যাকুলিনের সঙ্গে সে মিলিত হচ্ছে, সহবাস করছে···এখন সে যদি খামার থেকে চলে আসে তবে জ্যাকুলিন মুক্তি পাবে। সে তাই মনস্থির করে ফেলল এবং কথাটা বলার জন্যে সুযোগ খুঁজতে লাগল। দীর্ঘদিন সামরিক বাহিনীতে থাকার জন্যে নারীদের ব্যাপারে সে কাপুরুষে পরিণত হয়েছে তাই ঠিক যে কি কথা বলতে হবে তাই সে ভেবে দেখছে।

অবশেষে একদিন বেলা চারটের সময় জঁা খামার থেকে বেরিয়ে এল। মনে মনে ঠিক করল, কথাটা আজ বলবেই। ফ্রানকয়েস এ সময় রোজ তার গোরুগুলোকে মাঠে ঘাস খাওয়াতে নিয়ে যায়, তাই এ সময়টা সে খাওয়ার জন্য বেছে নিয়েছে কারণ লিসাকে সে একলা পাবে। কিন্তু সে হতাশ হল। অপ্রত্যাশিতভাবে ফ্রিমাতের বউ এসে হাজির হল প্রতিবেশীসুলভ মন নিয়ে··· লিসাকে সে রান্নাঘরের ধোয়া-মোছার কাজে সাহায্য করে। সে খুব কাজের নয়, কিন্তু বড় বক্-বক্ করে। এবং ধোয়ার জল ধরবার জন্যে যে-পাত্রটা রাখা আছে সেটা প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর সে কড়ার উপর উপুড় করে দিচ্ছে।

সে চলে যাবে এই আশায় জঁা শান্তমনে বসে রইল। কিন্তু ফ্রিমাতের বউ বসে বসে পক্ষাঘাত-গ্রস্ত স্বামীর কথা সমানে বলতে লাগল···মানুষটা এখন কেবল হাত নাড়তে পারে। এটা তার কাছে দারুণ মানসিক ক্লেশের ব্যাপার হয়ে উঠেছে। তারা কোনও সময় ধনী ছিল না, কিন্তু মানুষটার যখন খাটবার ক্ষমতা ছিল তখন জমি ভাড়া করার এবং খাজনা দেওয়ারও ক্ষমতা ছিল, কিন্তু এখন তাদের সামান্য এক টুকরো খাস-জমি চাষ করতেই সে হিম-সিম খেয়ে যাচ্ছে।

রগনি গ্রামে জঁায়ের সম্পর্কে লোকে কি বলাবলি করে তাও সে বলল। জমিতে লাঙল দেয় না জঁা, সে একজন মজুর, কারিগর···করাত আর রঁাদা নিয়ে কাজ করে···লোকে তাই প্রথম প্রথম তাকে ভাল চোখে দেখত না। তারপর সে যখন চাষ-বাস সুরু করল তখন লোকে বলছে, জঁা এ জেলার লোক নয়, ভিনদেশী, সে তাদের রুজি-রোজগারে ভাগ বসিয়েছে। কোথা থেকে সে

এসেছে কেউ জানে না। যদি সে ফিরে যেতে সাহস না করে তবে বুঝতে হবে সে কোনও অপরাধ করে তার জন্ম-শহর থেকে পালিয়ে এসেছে। তারা জানে, জ্যাকুলিনের সঙ্গে তার আসনাই আছে, একদিন ওরা দু'জনে বুড়ো হোরদি-কুইনকে শোওয়ার সময়ে পানীয় খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখে তার সর্বস্ব লুঠ করে নেবে।

জঁা দারুণ রেগে আওড়াল—'শুয়োরের বাচ্চি কোথাকার!'

লিসা কড়াই থেকে এক মগ গরম জল তুলে আনছিল, জ্যাকুলিনের নাম শুনে সে হেসে উঠল। সেও মাঝে মাঝে জ্যাকুলিনের ঠেস দিয়ে জঁা-কে চিমটি কেটে বহু কথা বলেছে।

ফ্রিমাতের বউ আবার বলতে লাগল—'আচ্ছা, একবার বলতে যখন সুরু করেছি, তখন সব আমাকে বলতেই হবে। তুমি এখানে রয়েছ, তোমার সম্পর্কেও লোকে অজস্র টিপ্পনি কাটে। ওর নাম জড়িয়ে বলে অনেক কথা। গত সপ্তাহে তুমি মেয়ে দুটোকে দু'খানা রুমাল কিনে দিয়েছ, তারা গতকাল সেই রুমাল মাথায় বেঁধে গীর্জায় গিয়েছিল। এটা খুবই শুনতে খারাপ লাগে। লোকে তাই বলছে, তুমি দু'বোনকে নিয়েই রাতে শোও।'

তারপর জঁা হঠাৎ উঠে দাঁড়াল, তার সারা দেহ কাঁপছিল।

বলল—'তোমার কাছেই কথাটার জবাব বলছি, মা। এসব কথায় আমি একটুও উদ্বিগ্ন নই। হঁা, আমি লিসাকে বলছি, সে যদি চায় ত আমি তাকে বিয়ে করব। লিসা, তুমি শুনছ? তোমাকেই জিজ্ঞেস করছি, তুমি কি হঁা বলবে। খুব খুশি হব।'

লিসা তখন কাচাকাচির বালতিতে মগের জল ঢালছিল, ব্যস্ততা নেই তার, ধীরে সুস্থে কাপড়গুলো ভেজাল। এবার সে গম্ভীরভাবে তার মুখের উপর দৃষ্টি রাখল, তার খোলা হাত-দু'খানা জলীয় বাষ্পে ভিজে, স্যাঁৎস্তেতে।

'তুমি মন থেকে কথাটা বলছ ত?'

'হঁা, বলছি।'

সে একটুও বিস্মিত হয়েছে বলে মনে হল না। এটা যেন খুবই একটা স্বাভাবিক ঘটনা। সে শুধু 'হঁা' 'না' কিছু একটা বলতে পাবে না, একটা কোনও ব্যাপার বুঝি তাকে বাধা দিচ্ছে।

জঁা বলল—'দেখ, জ্যাকুলিনের কথা ভেবে তুমি না বল না। কেননা জ্যাকুলিন…।'

লিসা ভুরু কুঁচকে তাকে থামাল, কেননা সে ভালভাবেই জানে যে, খামারের ওসব প্রেমের খেলার মধ্যে কোন গুরুত্ব নেই, ওসব নিরর্থক।

'অবশ্য এটা ঠিক যে, আমার যা সঙ্গে আছে তা'ছাড়া আর তোমাকে আমি কিছুই দিতে পারব না। অথচ তোমার আছে এই বাড়ী আর জমি।'

আবার সে ভুরু কুঁচকে নিজের অবস্থা ইঙ্গিত করল—তার কুমারী জীবনের

বাচ্চা রয়েছে, কাজেই তার ধারণা যে, তাদের দু'জনের অবস্থাই তুল্যমূল্য।

অবশেষে সে বলেই ফেলল—'না না, ওটাই সব নয়। বুতোর কথা ভাবছি আমি।'

'কিন্তু সে ত তোমায় বিয়ে করতে চায় না।'

'ঠিক কথাই বলেছ। খারাপ ব্যবহার করার জন্যে ওর সাথে আমার আর বন্ধুত্ব নেই। তবু ওকে একবার জিজ্ঞেস করা দরকার।'

'বেশ!' কিছুক্ষণ ধরে কথাটা মনে মনে নাড়াচাড়া করল জঁা।

শেষে সুবিবেচনার সাথে বলল, —'যদি তুমি চাও তাই করো, কারণ বাচ্চাটা রয়েছে ত!'

ফ্রিমাতের বউ মন দিয়ে বালতির জল ঢালছিল কড়াইতে, সেও ভেবে দেখল যে, এই প্রস্তাব তার সমর্থন করা উচিত। তাছাড়া জঁায়ের দিকেই তার সমর্থনের ঝোঁকটা বেশী—মরদটা সোজাসুজি কথা বলে, অবাধ্য এবং নিষ্ঠুর প্রকৃতির নয়। ঠিক সে সময় তারা শুনতে পেল যে, ফ্রানকয়েস তার গোরু নিয়ে বাড়ী ফিরছে।

সে ডাকল —'দেখে যা' দিদি, কলিচের পায়ে লেগেছে।'

তারা সবাই বেরিয়ে এল। গোরুটার বাম পায়ে আঘাত লেগেছে, রক্ত ঝরছে, খোঁড়াতে খোঁড়াতে আসছে দেখে ফ্রানকয়েসের উপর দারুণ রেগে গেল লিসা। ফ্রানকয়েসকে শিশুর মতন ব্যবহার করতে দেখলে সে মাঝে মাঝে ক্ষেপে ওঠে।

'আবার অসাবধান হয়েছিস, হয়েছিস ত? আগের দিনের মতন আজও বুঝি ঘাসের জঙ্গলে শুয়ে ঘুমোচ্ছিলি?'

'না, না। ঘুমোই নি। ঠিক কি হয়েছে জানি না। খুঁটোয় বেঁধে রেখে-ছিলাম, হয়ত দড়িতে পা জড়িয়ে ফেলেছিল।'

'থাম মিথ্যেবাদী! তুই দেখছি একদিন আমার গোরুগুলোকে মেরে ফেলবি!'

ফ্রানকয়েসের কালো চোখ দুটো জ্বলে উঠল, চোখ-মুখ হল পাণ্ডুর।

সে রেগে তোৎলাতে লাগল—'তোর গোরু! তোর! তুই বলতে পারিস আমাদের গোরু!'

'আমাদের গোরু কি বলছিস? তুই বাচ্চা মেয়ে, তোর গোরু কোথা থেকে আসবে?'

'বলবই ত! এ বাড়ীর সব কিছুর অর্ধেক আমাব। অর্ধেকের অধিকার আছে আমার। আমার ভাগ চেয়ে এখুনি আমি তুল-কালাম কাণ্ড বাধাতে পারি!'

দু'বোন জ্বলন্ত দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে কট্‌মট্ করে তাকিয়ে রইল। এত বছর ধরে পরস্পরের মধ্যে যে ভালবাসা ও স্নেহের বন্ধন ছিল তা আজ 'তোমার'

এবং 'আমার' এই অধিকারের সূত্র ধরে চিঁড় খেল। এই প্রথম তাদের মধ্যে তিক্ত বিবাদ বাধল। ছোট বোনের বিদ্রোহে রেগে গেল লিসা এবং এই অবিচারের জন্য ফ্রানকয়েস হল দুর্বিনীতি ও অবাধ্য। পাছে ছোট বোনকে মেরে বসে তাই লিসা সেখান থেকে সরে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল। এবং ফ্রানকয়েস তার গোরু দুটোকে গোয়ালে বাঁধল এবং ফিরে এসে রুটির পাত্র থেকে একটুকরো রুটি কেটে নিয়ে কামড় দিল। নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল।

কিন্তু লিসা এক সময় শান্ত হল। ছোট বোনকে এরকম উত্তেজিত অবস্থায় দেখে সে সম্পূর্ণ বিহ্বল হয়ে পড়েছিল। একটা অপ্রত্যাশিত খবর শুনিয়ে এই দুর্ঘটনার উপর সে যবনিকাপাত করতে ব্যগ্র, তাই সে প্রথম কথা বলল—'তুই আন্দাজ করতেও পারবি না! জানিস, জঁা আমাকে বিয়ে করতে চাইছে। সে নিজে আমাকে বলেছে।'

জানালার ধারে দাঁড়িয়ে ফ্রানকয়েস রুটি খাচ্ছিল, সে উদাসীনভাবে সেখানে দাঁড়িয়ে রইল এবং মুখ ফেরাল না।

'তাতে আমার কি?'

'তুই তাকে ভগ্নীপোত হিসেবে পাবি, কাজেই তুই ওকে পছন্দ করিস কি-না জানতে চাইছি।'

ফ্রানকয়েস কেবল একবার কাঁধ নাচাল।

'যদি ওকে আমি পছন্দ করি? তাতেও অবস্থার পরিবর্তন হবে না। সে অথবা বুতো, এদের কারো সঙ্গেই ত আমি সহবাসে রাজী নই! তুই আমার কাছে কি শুনতে চাস? এটা আমার কাছে ভাল বলে মনে হচ্ছে না।' রুটি খাওয়া শেষ করার জন্যই সে উঠোনে বেরিয়ে গেল।

লিসা বলল—'আজ এ পর্যন্তই থাক কর্পোরাল। আমি 'না' 'হাঁ' কিছুই বলছি না। ঘাস কাটার মরশুম সুরু হচ্ছে। আমাদের পরিবারের সকলের সাথে দেখা হবে। ওদের জিজ্ঞেস করব আমার কি করা উচিৎ! তখন আমরা স্থির করব। এটাই ঠিক ত?'

'হাঁ, তাই ঠিক।'

সে হাত বাড়িয়ে লিসার সাথে করমর্দন করল। তার সারা দেহ জলীয় বাষ্পে ভেজা, গৃহস্থ-বধূর দেহের গন্ধ…কাঠ ছাই আর পেঁয়াজের সুবাস।

৪

লিসা গিয়েছিল ফৌআনের বাড়ী, কিন্তু বাড়ীতে কাউকে না দেখে সে ভয় পেল। বাড়ীখানা যেন পোড়ো মনে হচ্ছিল। গোরু দুটোর হাত থেকে রোজ মুক্তি পেয়েছে, বুড়ো ফৌআন ঘোড়াটাকে বেচে দিয়েছে। গৃহপালিত পশু আর বাড়ীতে নেই। কাজ-কর্মও নেই বলে বাড়ীর মধ্যে এবং উঠোনে কেউ

নড়া-চড়াও করে না। একটু ঠেলতেই দরজা খুলে গেল, লিসা অন্ধকার ঘরে ঢুকে দেখল, এই ঘাস কাটার আনন্দঘন মরশুমেও সবাই চুপচাপ। এক টুকরো রুটি আর পনীর খেয়ে বুড়ো ফৌআন দাঁড়িয়ে আছে ঘরের মধ্যে। আর তার বউ অলসভাবে বসে তাকে দেখছে।

'শুভ দিন, কাকী। তোমাদের সময় ভাল যাচ্ছে ত?'

ও আসাতে বুড়ীর মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হল। জবাব দিল—'হাঁ। কাজ-টাজ নেই ত, তাই আমরা এখন অলসভাবে বসে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আরাম উপভোগ করছি।'

কাকার সাথে ভাল ব্যবহার করার ইচ্ছা হল লিসার।

বলল—'তোমার খাবার ইচ্ছে ত আছে দেখছি।'

ফৌআন জবাব দিল—'দেখ, ক্ষিধের জন্য খাচ্ছি না। খাচ্ছি নিজেকে একটা কাজে ব্যস্ত রাখার জন্যে। এতে সময় কেটে যায়।'

দারুণ বিষণ্ণ মনে হল ফৌআনকে, কিন্তু রোজ তৎক্ষণাৎ বলে উঠল, তাদের হাতে আর কোনও কাজ নেই তারা খুব সুখী। এই শেষ বয়সে তারা অবসর জীবন যাপনের অধিকার অর্জন করছে কিন্তু তারা তাদের উপার্জন ঠিক পেয়ে যাচ্ছে, ভারি ভাল লাগছে এই অলস জীবন। দেরীতে উঠছে তারা, বুড়ো আঙুল নাচিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, দিনটা গরম কি ঠাণ্ডা সে ভাবনা তাদের ভাবতে হচ্ছে না কোনও রকম ভাবনা-চিন্তা নেই তাদের। হাঁ, তাদের জীবনে এ এক দারুণ পরিবর্তন! তারা সত্যি অনুভব করছে যে, তারা স্বর্গরাজ্যে বাস করছে। তবু তাদের এই নকল সুখানুভূতি এবং কথাবার্তায় জ্বরতপ্ত উৎসাহ একেবারেই গোপন করতে পারছে না তাদের জীবনের ফল্গু-ধারার মতন একঘেয়েমির অস্তিত্ব। এই দুই বৃদ্ধের জীবনে অলসতা পীড়ন হিসাবে দেখা দিয়েছে, তাই তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো স্তব্ধ হয়ে গেছে, পুরনো যন্ত্রপাতিকে যেমন অপ্রয়োজনীয় বস্তু হিসাবে পরিত্যাগ করা হয়, তেমনিভাবে এই বিশ্রাম তাদের জীবনে অন্যায়ের বোঝা হয়ে উঠেছে—তারাও আজ পরিত্যক্ত।

অবশেষে লিসা ঠিক করল যে, তার আসার কারণ সে এবার ওদের বলবে।

'কাকা, শুনলাম বুতোর সাথে সেদিন তোমাদের দেখা হয়েছে।'

তাকে বক্তব্য শেষ করতে না দিয়ে ফৌআন দুরন্ত রাগে বলে উঠল—'বুতো একটা শুয়োরের বাচ্চা। ও যদি এ রকম অবাধ্যতা না করত তাহলে ফ্যানির সাথে আমার গণ্ডগোল হত না।'

এই প্রথম ছেলে-মেয়েদের সাথে তার বিরোধের প্রকাশ ঘটল, অথচ এ ব্যাপারটা সে গোপন করে রেখেছিল। কিন্তু এখন তার মনের তিক্ততা উপরে ভেসে উঠল। বুতোর অংশের জমি সে যখন ডেলহোমির হাতে ছেড়ে দিল দেখাশোনার জন্য তখন ভেবেছিল হেক্টর পিছু আশী ফ্রাঙ্ক করে ভাড়া আদায়

করবে, কিন্তু ডেলহোমি মাত্র দু গুণ ভাতা দিতে রাজী হল—অর্থাৎ নিজের ভাগের দু'শো এবং বুড়োর ভাগের জন্য দু'শো ফ্রাঙ্ক। এটাই ন্যায্য ব্যবস্থা, বুড়ো এই অন্যায়ের জন্য রাগান্বিত হল।

লিসা জানতে চাইল—'ঝামেলা কি হল? ডেলহোমিরা ভাতা ঠিক মতন দিচ্ছে না?'

বোজ বলে উঠল—'হাঁ, দিচ্ছে ত। প্রত্যেক তিন মাস অন্তর দুপুরবেলা এসে ওই টেবিলের উপর টাকা রেখে যাচ্ছে। তবে ওদের এই দেওয়ার পদ্ধতি বাপের মনে আঘাত করছে। ওদের অন্তত একটু ভদ্র হওয়া উচিৎ ছিল। ফ্যানি এমনভাবে আসে যেন সে নায়েবকে খাজনা দিচ্ছে, যেন কেউ তাকে শোষণ করছে।

বুড়ো আরও যোগ করল 'হাঁ, তারা দেয়। ব্যস! সেটাই সব। আমি নিজে কিন্তু এটা যথেষ্ট মনে করি না। আমি একটু সম্মান আশা করি। টাকা দিয়েই তারা প্রত্যেক ব্যাপার থেকে উদ্ধার পেতে পারে না, পারে কি? যেন আমরা মহাজন, এমনি ভাব ওদের। তবু ওরা সবাই যদি পাওনা সবটা মিটিয়ে দেয় তবে আমরা অনুযোগ করব না।

ও থামল এবং ঘরের মধ্যে বিশ্রী নীরবতা বিরাজ করতে লাগল। এটা বলা হল 'যেসাস্ ক্রাইস্টকে ঠেস দিয়ে। সে এক কপর্দকও দেয় না এবং নিজের অংশের জমি জমা বাঁধা দিয়ে মদ গেলে। এতে মায়ের মন একেবারে ভেঙ্গে গেছে। অথচ এ বদমাসটা মায়ের স্নেহের পাত্র, বেশী প্রিয়—মা সব সময় তার কৃতকর্ম সমর্থন জানাতে প্রস্তুত। আবার একটা ক্ষত মুখ আবরণ মুক্ত হল দেখে মার দেহ কেঁপে উঠল। সে তাড়াতাড়ি জবাব দিল—'দেখ, বাজে ব্যাপার নিয়ে ভেবে মন খারাপ করো না। আমরা যখন সন্তুষ্ট তখন যা' পাচ্ছি না তার জন্যে শোক করছ কেন? যা' পাচ্ছি তাই যথেষ্ট।

এবার লিসা নিজের কথা বলার সুযোগ পেল।

'আমার আর তার বাচ্চার সম্পর্কে বুড়ো কি ভাবছে তাই জানতে চাইছি। বলতে পারবে না যে, আমি তাকে বিরক্ত করছি। এবার তার মন স্থির করার সময় হয়েছে।'

ওরা দুজনেই নীরবে শুনতে লাগল।

লিসা এবার সোজাসুজি ফোঁআনকে প্রশ্ন করল।

'তোমার সাথে যখন দেখা হয়েছে তখন সে নিশ্চয় আমার কথা বলেছে। কি বলেছে সে?

'কিছু না। একটা কথাও বলে নি আর বলবারই বা কি আছে! গীর্জার যাজকমশাই ত ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলার জন্যে আমাকে বিরক্ত করছেন। কিন্তু ছেলেটা যতদিন না তার ভাগ নিচ্ছে ততদিন কিছুই করা যাবে না!

লিসার মনে খুব সন্দেহ ছিল তাই সে আবার ভাবল।

'তোমার কি মনে হয় সে কোনদিন তার ভাগ নেবে ?'

'এখনও সম্ভাবনা আছে।'

'এবং তুমি কি ভাব সে আমাকে বিয়ে করবে ?'

'করতে পারে।'

'আমাকে কি অপেক্ষা করতে বলছ ?'

'সেটা তোমার ইচ্ছে। সকলেরই নিজের খুশিমত কাজ করার অধিকার আছে।'

জঁা যে প্রস্তাব করেছে তার উল্লেখ করার ইচ্ছে তার নেই, তাই সে নীরব হয়ে রইল। কিন্তু কি করে সে নির্দিষ্ট একটা জবাব পাবে। তারপর সে একটা শেষ চেষ্টা করল।

'তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছ। কি ঘটবে জানতে না পেরে আমি নিরাশ হয়ে পড়ছি। 'হাঁ' অথবা 'না' একটা জবাব আমার চাই। কাকা, তুমি একবার বুতোর সাথে দেখা করে জিজ্ঞেস করতে পার না ? দয়া কর !'

ফৌআন তার কাঁধ নাচাল।

'প্রথম কথা, ওই শুয়োরের বাচ্চাটার সাথে আমি কথা বলব না। এবং তুমিও বাছা একদম বোকা ! তুমি ওর সাথে দেখা করতে পার না ? অবাধ্য ছোকরা কেবলই বলে, না। ওকে সুযোগ দাও যখন ও নিজেই বলবে, হাঁ।'

কাজেই লিসা নির্দিষ্টভাবে কোন কথা জানতে পারল না। সে ওদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে দোর বন্ধ করে দিল। ঘরখানা আবার নিস্তব্ধ হল এবং বাড়ীখানাকে পোড়ো বাড়ী মনে হতে লাগল।

এ্যাজর নদীর ধারে দুটো মজুরনী নিয়ে জঁা ঘাস কাটা সুরু করেছিল। ফ্রানকয়েস আঁটি বেঁধে গুছিয়ে রাখছিল। ঘাসের গাদার উপর সে দাঁড়িয়েছিল এবং জঁা ও পলমায়ার যে ঘাসগুলো কাঁটায় করে তুলে দিচ্ছিল তা গোলাকার ভাবে সাজিয়ে রাখছিল। ঘাসের গাদা ক্রমে ক্রমে বড় আর উঁচু হয়ে উঠছিল। ফ্রানকয়েস তখনও মাঝখানে দাঁড়িয়েছিল, আরও আরও বেশী ঘাস পায়ের নীচে গাদা করছিল। এবং ঘাসের দেওয়াল তার হাঁটু পর্যন্ত উঁচু হয়ে উঠল। ইতিমধ্যে গাদাটা প্রায় ছ' ফিট উঁচু হল। পলমায়ার এবং জঁা কাঁটায় ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল এবং খুব জোরে হেসে উঠল। খোলা মাঠে কাজ করতে করতে তারা খুশি হয়ে উঠেছে এবং নতুন ঘাসের গন্ধবহ পরিবেশে তারা পরস্পরকে উদ্দেশ করে অবান্তর উপহাস ছুঁড়ে দিচ্ছে। ফ্রানকয়েসকে বিচিত্র দেখাচ্ছে। তার রুমাল মাথা থেকে সরে গেছে, রোদ ঝলসাচ্ছে খোলা মাথায়, বাঁধন-মুক্ত চুলগুলো উড়ছে, চারধারে ঘাস আর ঘাস, ওর জানু পর্যন্ত ঘাসে ডুবে গেছে। নীচে থেকে ছুঁড়ে দেওয়া প্রতিটা ঘাসের আঁটি সে আদুল হাতে লুফে নিচ্ছে এবং তার সারা দেহ কুঁচো কুঁচো ঘাসে ভরে যাচ্ছে। সে ক্রমে ক্রমে ডুবে যাচ্ছে যেন ঢেউয়ের আঘাতে নিমগ্ন জাহাজের যাত্রী।

'আরে এগুলো আমার গায়ে ফুটছে!'

'কোথায়?'

'আমার স্কার্টের নীচে, এখানে পর্যন্ত।'

'ওটা মাকড়সা। পায়ে পা চেপে শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাক!'

তারপর তারা সজোরে হেসে উঠল, পরস্পরকে নোঙরা রসিকতা করল এবং উঠল আরও জোরে হেসে।

খানিক দূরে দাঁড়িয়ে ডেলহোমি একটু উদ্বিগ্ন হল, বারেকের জন্য এদিকে মাথা ঘোরাল। কিন্তু তার হাতের কাস্তে থামাল না—আগু পিছু করে ঘাস কাটছিল। ওই মেয়েটা যদি ওভাবে খেলা করে তবে কোনও কাজই করতে পারবে না। আজকাল মেয়ে-মজুররা নষ্ট হয়ে গেছে, শুধু মজা করাব জন্য তাবা খাটে। কাস্তে চালিয়ে সে সমানে ঘাস কেটে গাদা করছিল আর জমিতে একটা সরলরেখা অঙ্কিত হচ্ছিল। সূর্য দিগন্ত-মুখী এবং মজুররা ক্রমে ক্রমে জমির ঘাস কেটে পরিষ্কার করে ফেলছে।

জঁা বলল—'ভাল! একজন মজুব ত তার হাতের অস্ত্র আবার ধারালো করে নিতে সরে পড়েছে। শানওয়ালী শান্ নিয়ে অপেক্ষা কবছে তাব জন্যে।'

পলমায়ার খুব বেশী হাসতে অভ্যস্ত নয়, হাসতে হাসতে তার দম আটকে আসছিল। বলল—'লোকটা ত বড় অসভ্য!'

জঁা তখন তাকে আরও রাগাতে লাগল।

'বয়স ত বত্রিশ হয়েছে, কিন্তু বেড়া টপকাও নি কখনও?'

'না, কখনও টপকাই নি।'

'বলছ, কোনও ছোকবাব সাথে প্রেম কর নি? নাগব পাও নি, না?'

'না।'

তার সারা দেহ ফ্যাকাসে আব গম্ভীর, মুখখানা এর মধ্যে রক্তশূন্য হয়ে পড়েছে, কাজ কবে কবে ভোঁতা দেখাচ্ছে। দেখাচ্ছে ভয়ানক সঙ্গীন—শুধু নিরীহ, বুড়ী মাদী কুকুরেব মতন দুটো চোখ স্বচ্ছ, গভীর আর বিশ্বস্ত।

নীববতা নামল। খড়ের গাদাব উপব দাঁড়িয়ে আছে ফ্রানকয়েস, নিথব দেহ। সে ওদেব কথা শুনছিল। একটু জিবিয়ে নিতে জঁা তাকে উত্যক্ত কবার জন্য কথা বলছিল। যে-কথা তাব জিভের ডগায় এসেছিল তা বলতে সে দ্বিধা কবছিল। অবশেষে সে মন স্থিব করে বলেই ফেলল।

'তাহলে লোকে যে বলে তুমি তোমার ভাইয়ের সাথে শোও সেটাও মিথ্যে কথা, বল?'

পলমায়ারেব ফ্যাকাসে গালে এক ঝলক বক্ত উঠে এল। তাকে আবার ছুকরি মনে হল। সে বিহ্বল হয়ে পড়ল, রাগে তোৎলাতে লাগল, তাব সম্বন্ধে প্রচাবিত জনরব যত জোরে সে প্রতিবাদ কবতে চাইল তা পারল না।

'ও! কি বদমায়েস ওরা! তুমিও যদি তা' বিশ্বাস কর…।'

তখন ফ্রানকয়েস আর জঁা খুশি হল, তাকে অবাক করে বিপর্যস্ত করার জন্য এক সাথে কথা বলতে লাগল। হায় ঈশ্বর! ভাঙ্গা গোয়াল-ঘরে যেখানে সে আর তার ভাই থাকে, সেটায় দু'জন লোক গায়ে গায়ে ধাক্কা না খেয়ে থাকতে পারে না। মাটিতে তাদের খড়ের বিছানা দুটো পরস্পরের সাথে লাগানো থাকে। এবং অন্ধকারে অন্যায় কাজ করা তাদের পক্ষে সহজ।

'বল, এটা ত সত্যি কথা! স্বীকার কর! আর যাহোক, প্রত্যেকেই ত জানে ব্যাপারটা!'

'যদি ব্যাপারটা সত্যিই হয় তাতে তোমাদের কি এসে গেল? হতভাগ্য ছেলেটার জীবনে ত কোন আনন্দের সুযোগ নেই। আমি তার দিদি। সহজভাবে আমি তার বউ হতে পারি কেননা কোন মেয়ে ত তার দিকে তাকাবে না কোনদিন।'

সে যখন এই পাপ স্বীকার করছিল তখন তার দু'গাল বেয়ে চোখের জল ঝরে পড়ছিল। এই পঙ্গু ছেলেটার প্রতি রয়েছে তার মনে অজস্র মাতৃস্নেহ, যা' অবৈধ সঙ্গমে রূপান্তরিত হয়েছে। তার মন ভেঙ্গে গেল। সে তার জন্য রুজি রোজগার করে তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে, অন্য কেউ তাকে যা' দেবে না সে নিশ্চয়ই তাকে রাতে তা' দিতে পারে···এ ব্যবহারের জন্য তাদের কোনও খরচ হয় না। এই দুটো প্রাণী পরস্পরের খুবই ঘনিষ্ঠ। তারা একঘরে, তাদের কেউ ভালবাসে না। এবং কেমনভাবে এটা ঘটল তাও তারা বলতে পারে না। শুধু তাদের মনের অন্ধকারে সুপ্ত সহজাত ইচ্ছা আর অভাবিত-স্বীকৃতি জেগে উঠেছিল। ছেলেটি ত একটা অত্যাচারিত পশু, আর মেয়েটি আবেগ-রুদ্ধ একটা মানুষ···সহজেই আবেগের হাতে শিকার হওয়ার জন্য প্রস্তুত। তাই তাদের ঠাণ্ডা কনকনে আস্তানায় বাড়তি একটু উষ্ণতার লোভে তারা সহবাসের আনন্দে ধরা পড়েছে।

মেয়েটির বিহ্বল অবস্থা দেখে জঁা গভীর সমবেদনায় আপ্লুত হল, বলল—'ঠিক বলেছে ও। এর সাথে আমাদের কি সম্পর্ক আছে? এটা তাদের ব্যাপার। কারো ত এতে ক্ষতি হয় নি।'

ঘাসের গাদা তৈরী এবার শেষ হল। ওটা প্রায় ফুট বারো উঁচু হয়েছে। নিরেট গোলাকার একটা মৌমাছির চাকের মতন দেখতে। রোগা রোগা হাতে পলমায়রি শেষ আঁটিটা ছুঁড়ে দিল। ঘাসের গাদার মাথায় দাঁড়িয়ে আছে ফ্রানকয়েস·· অস্তগামী সূর্যের বিবর্ণ রক্তিম রোদে তাকে দীর্ঘদেহী মনে হচ্ছে। সে একদম হাঁপিয়ে পড়েছে, ঘামে-ভেজা তার দেহ কাঁপছে। চুলগুলো গায়ের চামড়ায় লেপ্‌টে আছে। ছোট আর দৃঢ় স্তন-যুগলের উপর বডিসটা বাঁধন খুলে ঝুলছে। স্কার্টের আঙটা খুলে একেবারে পাছার উপর নেমে এসেছে।

'ওঃ কি উঁচু হয়েছে! বড় ভয় করছে!'

জঁা বলল—'ছেলেমানুষি করো না। বসে পড়ে পাশ দিয়ে হড়কে নাম।'

'না, না। আমার ভয় করছে। পারব না।'

তারপর সুরু হল চেঁচামেচি, অনুরোধ, গুজব আর স্থূল রসিকতা।

'পাছা ঘসড়ে নেমো না, ফুলে উঠবে। হাতে ফোঁড়া না উঠে থাকলে হাতের ভর দিয়ে নেমে এস।'

নীচে দাঁড়িয়ে জঁা উত্তেজিত হয়ে উঠল, উপরে তাকাতে মেয়েটির সুডৌল দু'খানা পা নজরে পড়ছিল। ওকে অত উঁচুতে নাগালের বাইরে দেখে তার উত্তেজনা উত্তরোত্তর বাড়ছিল। এবং অবচেতনভাবে ওর পুরুষ মনে ইচ্ছা জাগল মেয়েটিকে নীচে নামিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরতে।

'না, না। তোমার হাত-পা কিছুই ভাঙ্গবে না। গড়িয়ে নাম। সোজা আমার হাতে এসে পড়বে।'

'ওঃ না, না। পারব না।

ঘাসের গাদার কাছে দাঁড়িয়ে সে হাত উঁচু করল যাতে ফ্রানকয়েস তার বুকে এসে পড়ে। এবং তারপর মন স্থির করে ফানকয়েস চোখ বন্ধ করল এবং গড়িয়ে পড়ল। গড়ানে গাদার পাশ দিয়ে সহসা পড়ে দু'পায়ে জঁা-কে জড়িয়ে ধরল। দুজনেই জড়াজড়ি করে মাটিতে পড়ে গেল। মাটিতে পড়ার সময় তার স্কার্ট মাটিতে খসে পড়ল। সে হাসতে লাগল। হাসতে হাসতে তার দম বন্ধ হয়ে গেল। বলল যে, তার দেহে কোথাও আঘাত লাগে নি। কিন্তু তার ঘামে-ভেজা, উষ্ণ দেহের চাপ মুখের কাছে পড়তেই জঁা তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল। নারী দেহের তিক্ত উগ্র গন্ধ আর নতুন ঘাসের সোঁদালি সুবাসে সে মাতাল হল এবং কষ্ট, কাম-লালসায় তার দেহের প্রতিটি মাংস পেশী টান্-টান্ হয়ে উঠল। আরও কিছুর অস্তিত্ব ছিল, সহসা এই কিশোরীকে পাওয়ার জন্য তার অবচেতন কাম-লালসা উজ্জীবিত হয়ে উঠল। এ এক আবেগময় দৈহিক ভালবাসা যা' বহুদিন ধরে তিলে তিলে বেড়ে উঠেছে মেলামেশা। খেলাধুলা আর হাস্য-লাস্যের মধ্য দিয়ে এই মুহূর্তে লালসা এত তীব্র হল যে, এখানে এই ঘাসের উপর তার দেহ উপভোগ করতে দারুণ ইচ্ছে হচ্ছে।

'আঃ জঁা যথেষ্ট হয়েছে! আমার হাড়-গোড় ভেঙ্গে দেবে দেখছি!

জঁা খেলা করছে ভেবে ফ্রানকয়েস তখনও হাসছিল। তারপর পলমারাবের বড় বড় চোখের দৃষ্টি দেখে জঁা সচকিত হয়ে উঠে দাঁড়াল। একটা মাতালের যখন খোয়াড়ি ভাঙ্গে এবং সে বড় বড় হাই তোলে, তার দেহ থেকে কম্পিত হয়, তেমনি অবস্থা হল জঁাযের। এটাই কি তার ব্যাখ্যা? সে তাহলে লিসাকে চায় না, চায় এই কিশোরীকে। লিসার মাংসল দেহের স্পর্শ তার হৃদয়ের গতিবেগ কখনও তীব্রতর গতিশীল করে তুলবে না, অথচ ফ্রানকয়েসকে কেবল চুমু খাওয়ার চিন্তা তার সারা দেহকে অবশ করছে। এবার সে বুঝতে পারছে কেন সে বারবার মেয়ে দুটির বাড়ীতে গিয়ে আনন্দিত হয় তাদের কাজে

সাহায্য করে, কিন্তু মেয়েটি ত একদম শিশু! নিজেকে তার দীন এবং লজ্জিত মনে হল।

ঠিক তখনই ফৌআনদের বাড়ী থেকে লিসা ফিরছিল। পথে আসতে আসতে সে প্রস্তাবটা মনে মনে ভাবছিল। বুতো তার বাচ্চার জন্মদাতা তাই সে বুতোকেই পেতে চায়। বুতো ঠিকই বলেছে, তাড়াতাড়ি করার দরকার নেই, যদি কোন দিন বুতো না বলে তখনও হাঁ বলার জন্য জাঁ থাকবে।

তাই সে জাঁয়ের কাছে এগিয়ে এল।

বলল—'জবাব পেলাম না। কাকা কিছু জানে না। আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।'

জাঁয়ের তন্দ্রামগ্ন দেহ তখনও কাঁপছিল, ওর দিকে তাকাল কিন্তু কিছুই বুঝতে পারল না। তারপর তার মনে পড়ল—বিবাহ, শিশুটি, বুতোর অনুমতি, ঘণ্টা দুয়েক আগে যে-সব বিষয় তাদের দু'জনের কাছেই খুব রমণীয় ছিল।

জাঁ তাড়াতাড়ি বলে উঠল—'হাঁ, হাঁ, অপেক্ষা করা যাক। অপেক্ষা করাই বরং ভাল।

৫

গ্রামের ব্যস্ত একঘেয়ে জীবনের উপর দিয়ে দুটো বছর গড়িয়ে গেল। ঋতুচক্রের নিষ্ঠুর পরিক্রমণের মধ্যে রগনি গ্রামের জীবনে সেই একই অপরিবর্তনীয় ঘটনা ঘটতে লাগল, সেই একই কাজ এবং সেই একই বিশ্রামের অবসর।

গ্রামের ঢালু জায়গার নিম্নাংশে, রাস্তার ধারে ঠিক স্কুলবাড়িখানার এক কোণে একটা ঝরণা আছে, গ্রামের মেয়েরা ওখানে পানীয় জল আনতে যায়। কেননা গ্রামের ডোবাগুলো থেকে শুধু গৃহপালিত পশুদের আর চাষবাসের জন্য জল পাওয়া যায়। সন্ধ্যে ছ'টার সময় স্থানীয় খবরের কাগজ এখানেই পড়া যায়; ছোটখাট খবরগুলো বার বার আলোচিত হয়। সেদিন যারা মাংস খেয়েছে অথবা 'ক্যণ্ডল্‌ম্যাস' উৎসবের দিন থেকে যে মেয়ে পোয়াতি হয়েছে তাদের সম্বন্ধে নানা ধরনের মন্তব্য শোনা যায়। ঋতু বদলায়···দু'বছর ধরে সেই একই জনরব কানাকানি হয়। বার বার আলোকিত হয়···ছুঁড়িগুলো বড় অল্প বয়সে পোয়াতি হচ্ছে, মরদগুলো মদ গিলে মেয়েদের পিটছে··· হতভাগ্যদের জন্য রয়েছে অজস্র কাজ। কত ঘটনা ত ঘটে চলেছে কিন্তু তবু এগুলো কিছুই নয়।

ফৌআনের জমি-জমা ভাগাভাগি নিয়ে একটা আগ্রহ আর আবেগ সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু ব্যাপারটা এমন মন্থরভাবে ঘটে চলেছিল যে, সবাই ভুলে গেল। কিছুই বদলায় নি। বুতো এখনও অবাধ্য এবং মৌচির বড় মেয়েকে সে বিবাহ করবে না—অথচ মেয়েটা তার বাচ্চা মানুষ করছে। জাঁয়ের কথা আলোচনা প্রসঙ্গে তারা অভিযোগ করল যে, সে নির্ঘাৎ লিসার সাথে শোয়,

আর যদি না শোয় ত ওই তুটো মেয়ের কাছে সে যায় কেন? এটা বড় বিচিত্র ব্যাপার। সব কিছু এখন খুবই শান্ত। তারপরই সহসা তুটো ব্যাপার ঘটল—আসন্ন নির্বাচন এবং রগনি থেকে শাটোতুন পর্যন্ত সেই বিখ্যাত রাস্তা। জনরব আর কানাকানির স্রোত বইতে সুরু করল। জলের কলসী আর কুঁজো ভরা হয়ে গেলে সাজিয়ে রেখে দেয় সার করে, মেয়েরা কেউ গুলতানি ছেড়ে বাড়ীর দিকে পা বাড়াতে চায় না। এক রবিবার সন্ধ্যেবেলা মেয়েদের মধ্যে একটা রীতিমত লড়াই হয়ে গেল।

দিন পনের পরে অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি এম, ত্থ, চেদিভিল বহু ভোটের ব্যবধানে পুনবায় নির্বাচিত হলেন। আগস্ট মাস শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর কথা রাখলেন। নতুন রাস্তা নির্মাণেব জন্য জেলায় ক্ষতিপূবণের ব্যবস্থা হল এবং রাস্তার কাজও সুরু হল।

কোদাল, গাঁইতির আঘাতে যেদিন প্রথম সুরু হল রাস্তার কাজ সেদিন সন্ধ্যের সময় বেকুর বউ তার এ্যাপ্রনে হাত ঢেকে অবিরাম বক্‌বক্‌ কবছিল। রাস্তার ভীষণ প্রয়োজনীয়তা নিয়ে ঝরণার ধারে ক'দিন ধরে বৈপ্লবিক আলোচনা জমে উঠেছিল। কিছু কিছু লোক ক্ষতিপূরণ পেল, ফলে অন্যদের হল দারুণ হিংসে আর রাগ। সহসা বেকুব বউ একটা খবর পরিবেশন কবল।

'তোমরা কি বিশ্বেস করবে, বাপু! মৌচির মেয়েরা পাঁচ শ' ফ্রাঙ্ক পাচ্ছে!

'না, তা' সম্ভব নয়।'

তৎক্ষণাৎ সব মেয়েরা তাদের জলের পাত্র মাটিতে রেখে কাছাকাছি জড় হল। কথাটা সত্যি—লা কর্ণেইলে রাস্তাটা মৌচির জমিব পাশ দিয়ে যাবে এবং তাদের প্রায় আড়াই শ' গজ জমি রাস্তার মধ্যে পড়বে—কাজেই প্রতি গজে যদি তু'ফ্রাঙ্ক ক্ষতিপূবণ দেয় তবে মোট ক্ষতিপূবণ পাঁচশ' ফ্রাঙ্ক হবেই। তার ওপর রাস্তাব ধারে হওয়ার জন্য জমির দামও বাড়বে। কি ভাগ্য ওদেব!

'আচ্ছা, বাচ্চা থাকলেও ত লিসা এখন বিয়ের যুগ্যি হয়েছে। আর কর্পোরাল ছোকরাও খুব চালাক, ঠিক ওর সাথে লেগে আছে।'

'ফিরে না এলেও বুতোব জমিব দামও এখন খুব বেড়েছে।'

বেকুর বউ ঘুরে দাঁড়িয়ে অন্য মেয়েদের কনুইয়ের গুতো দিয়ে বলল—'থাম! থাম!'

লিসা তখন খুশিমনে তার কলসী দোলাতে দোলাতে আসছিল। কাজেই মেয়েরাও তাদের জলভরা কলসী কুঁজো নিয়ে সার বেঁধে হাঁটতে লাগল।

লিসা এবং ফ্রানকয়েসকে এবার তাদের গাইগোরু ব্লানচেত্তিকে সরাতে হবে, কেননা ওটার দেহে খুব চর্বি জমেছে, আর বাচ্চা দেবে না; কাজেই তারা শনিবার ক্লয়েসের হাটে গিয়ে আর একটা গাইগোরু কিনবে ঠিক করল। জঁা তাদের সাথে করে নিয়ে যাবে বলল। সেদিন বিকালে তার ছুটি ছিল

আর খামারের মালিক একখানা ঘোড়ায় টানা মালগাড়ী নেওয়ারও অনুমতি তাকে দিল, কেননা জনরব তার কানে গেছে যে, এই ছোকরার সাথে মৌচির বড় মেয়ের সাদি হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে, ব্যাপারটা স্থির হয়ে গেছে। অন্ততঃ জঁা বলেছে যে, আসছে সপ্তাহে সে বুতোর সঙ্গে দেখা করে কথাটা পাড়বে। লিসার ভবিষ্যৎ নিরূপণের জন্য দু'জনের মধ্যে একজনকে প্রয়োজন—হয় বুতো আর না হয় সে।

ওরা বেলা একটার সময় যাত্রা করল। সামনে পাশাপাশি জঁা আর লিসা এবং পিছনের বেঞ্চিতে একা ফ্রানকয়েস বসল। জঁা তার পিঠে ফ্রানকয়েসের হাঁটুর উষ্ণ স্পর্শ অনুভব করছিল এবং মাঝে মাঝে তার দিকে ঘুরে তাই এক টুকরো হাসি ছুঁড়ে দিচ্ছিল। এটা ভয়ানক একটা দুঃখের ব্যাপার যে, মেয়েটা তার চেয়ে বয়সে পনের বছর ছোট। অনেক চিন্তা-ভাবনা আর কাল কাটাবার পর সে বড বোনকে বিয়ে করবে বলে ঠিক করেছে, কিন্তু এটাও নিশ্চিত যে, মনের অন্তরতম প্রদেশে তার ইচ্ছা সে ছোট মেয়েটির কাছাকাছি থাকবে, তার সাথেই তার ঘনিষ্ঠতা। কিন্তু তাহলে তুমি ভেসে গেলে কেন, না জেনেই তুমি এসব করেছ—একবার মন স্থির করেছ বলে সেটাই বড় হল!

ক্লয়েসে পৌঁছে জঁা গাড়ী থামাল এবং ঘোড়াটাকে সমাধিস্থলের পাশ দিয়ে পাহাড়ের চড়াইয়ের ধারে নিয়ে গেল। সরাইয়ের দিকে যাওয়ার পথে ওরা চৌরাস্তার মোড়ে হাজির হল। সহসা জঁা রু গ্রুয়েসের দিকে আঙুল তুলে একটা মূর্তি দেখাল, বলল—'দেখ, দেখ! মনে হচ্ছে বুতো।'

লিসা বলল—'হাঁ, সেই। মনে হচ্ছে মঁসিয়ে বেইলিহ্যাচির কাছে যাচ্ছে। তোমার কি মনে হয় ও তার অংশ নিতে যাচ্ছে?'

জঁা তার হাতের চাবুকটা আছড়ে হাসল।

'কে জানে! ও যা' চালাক।'

দূর থেকে তাদের দেখেই চিনতে পেরেছিল বুতো কিন্তু এখন এমন একটা ভাণ করছিল যেন সে তাদের দেখেই নি। হাঁটতে হাঁটতে বুতো থামল একবার। ওরা তাকে পিছিয়ে ফিরে আসতে দেখে ভাবল নিঃশব্দে যে, ব্যাপারটা তাহলে এবার জানা যাবে। সরাইখানার উঠোনে গাড়ী থেকে ফ্রানকয়েস প্রথমে নামল, এতক্ষণ সে একটা কথাও বলে নি। একখানা চাকার উপর পা দিয়ে সে নীচে নেমে এল। উঠোনে আরও অনেকগুলো ঘোড়া-ছাড়া গাড়ী দাঁড় করানো ছিল। সরাইখানার ভিতরটা জনকোলাহলে ভরা।

আস্তাবল থেকে ফিরে জঁা জিজ্ঞাসা করল—'আচ্ছা, এখুনি যাবে না-কি?'

'হাঁ, নিশ্চয়। চল যাওয়া যাক!'

ডেলহোমি না আসায় ফ্যানি কিছু যব নিয়ে এসেছে হাটে বেচবার জন্যে এবং বুড়ো ফৌআনের বউ মেয়ের সাথে একই গাড়ীতে এসেছে একটু বাইরে বেড়াবার জন্যে। তারা দু'জন স্ত্রীলোকই শানওয়ালার কাছে দাঁড়িয়েছিল।

এই শানওয়ালা কুড়ি বছর ধরে বুড়ীর কাঁচি শান দিয়ে দেয়।

'ও, তুমি এসেছ।'

ফ্যানি ঘুরে জঁা-কে দেখে বলল—'কি বেড়াতে এসেছ বুঝি?'

কিন্তু তারা যখন শুনল যে, মেয়ে দুটি তাদের গাই-গোরু ব্লানচেত্তির বদলে একটা নতুন গাই-গোরু কিনতে এসেছে তখন তাদের আগ্রহ বাড়ল। ওদের যব এর মধ্যেই বেচা হয়ে গেছে, তাই তারা ওদের সঙ্গ নিল। রমণী চারজন সার বেঁধে হাঁটছিল আর যুবক জঁা ছিল ওদের পিছনে। ওরা বাজারে ঢুকল।

লিসা মোড় ঘুরে বলল—'এই রাস্তায় চল।

হাটেব শেষে ঘোড়াগুলো রেখেছে। একটা আড করে রাখা বাঁশের সাথে বাঁধা, গলায় শুধু দড়ির ফাঁস। মাঝে মাঝে ঘাড আর লেজ নাডছে। আব বামদিকে রয়েছে গোরুগুলো—বিক্রেতাবা তাদেব গলার দডি ধরে রেখেছে, খবিদ্দাবকে ভালভাবে দেখাবার জন্যে দডি ধরে গোরুগুলোকে এধারে ওধারে ঘোবাচ্ছে মাঝে মাঝে।

চাবজন রমণীই একটা সাদায়-কালোয় মেশানো গোরু দেখে মনে মনে পছন্দ কবে ফেলল। এক দম্পতি এই গোরুটাকে হাটে বেচতে এনেছে। কঠিন-মুখ, কৃষ্ণাঙ্গী স্ত্রীলোকটি গোরুর গলায় বাঁধা দডি ধরে সামনে দাঁড়িয়ে আছে। পুরুষটি নিথর দেহে ব্যাজার-মুখে গোরুব পিছনে রয়েছে। প্রায় পাঁচ মিনিট ধবে গোরুটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল সবাই, কিন্তু নারীরা কেউ কোন রকম ইঙ্গিত করল না, কিংবা কথাও বলল না। তাবপর তারা বিশ পা গিয়ে অন্য আর একটা গোরুকে নিরীক্ষণ করতে লাগল। একটা বাচ্চা মেয়ে এই বিশাল কালো গোরুটাকে দড়ি বেঁধে নিয়ে এসেছে বেচতে···ওব হাতে হিজল ডালের একখানা ছপটি। তাবপর তারা সাত-আটবার থেমে থেমে প্রথম থেকে শেষ পযন্ত সব ক টা গাই-গোরু নিরীক্ষণ করল। কারো মুখে কোনও রা ছিল না। অবশেষে চারজন রমণীই আবার প্রথম দেখা গোরুটার কাছে ফিরে এসে দাঁডাল, নীরবে মগ্ন হয়ে দেখতে লাগল।

কেবল এবার ওরা খুব গম্ভীর। পাশাপাশি দাঁডিয়ে ওরা গোরুটার সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অন্তরভেদী দৃষ্টি বুলিয়ে নিরীক্ষণ করছিল। বিক্রেতা রমণী তখনও কিছু বলল না, অন্য দিকে তাকিয়ে ভাণ করল যে, ওরা আবার ফিরে এসে গোরুটাকে দেখছে তা' যেন তার অজানা।

তারপর ফ্যানি ঝুঁকে লিসাকে কি যেন বলল। রোজ বুড়ী আর ফ্রানকয়েসও ফিস ফিস করে কথার আদান-প্রদান করল। তারপর তারা চুপ করল এবং দাঁড়িয়ে দাঁডিয়ে গোরুটাকে পরখ করতে লাগল।

লিসা জিজ্ঞাসা করল—'দাম কত?'

কৃষক রমণীটি বলল—'চল্লিশ পিস্টোল।'

তারা সম্পূর্ণ অপ্রতিভ হওয়ার ভাণ করল। জঁাকে তারা খোঁজ করল।

অবাক হয়ে দেখল যে, সে খানিকটা পিছনে অনেকদিনের পরিচিত বন্ধুর মতন বুতোর সাথে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। লা শ্যামেদ থেকে বুতো একটা বাচ্চা শুয়োর কিনতে এসেছে এবং শুয়োরের দাম নিয়ে দর কষাকষি করছে। গাড়ীর পিছনে বহনযোগ্য খোঁয়াড়ে শুয়োরগুলো রেখেছে বিক্রেতা। সেগুলো পরস্পরের সাথে কামড়াকামড়ি করছে এবং কান-ফাটানো চেঁচামেচি করে জায়গাটাকে নরক করে তুলেছে।

বিক্রেতাকে বলল বুতো—'বিশ ফ্রাঙ্ক নেবে?'

'না, তিরিশ।'

'তা হলে নরকে পচে মর।'

এবং বেশ হাসি-খুশি মুখে রমণীদের দিকে এগিয়ে গেল…মা, বোন আর খুড়তুতো বোনেদের দেখে তার মুখে হাসি ফুটল…এমন একটা ভাব যেন গতকালই সে প্রথম তাদের দেখেছে। ওরাও শান্ত… তার সাথে দু'বছর ধরে যে বিবাদ আর তর্কাতর্কি চলছে তা' যেন তারা ভুলে গেছে।

বুতো বলল—'তারপর বোনেরা, তোমরা গোরু কিনতে এসেছ? জাঁ বলল আমাকে। এখানে অবশ্য একটা ভাল জাতের রয়েছে দেখছি। সারা হাটের মধ্যে এটাই সেরা, একটা সত্যিকারের গোরু।'

সে বিশেষ করে সেই সাদা-কালো মেশানো কটেনটাইন জাতের গোরুটাকেই দেখাল।

ফ্রানকয়েস আওড়াল—'চল্লিশ পিসটোল চাইছ? না, ধন্যবাদ!'

তার পিঠে চাপড় মেরে ঠাট্টার ছলে বুতো বলল—'কি গো, তোমার দাম চল্লিশ পিসটোল?'

কিন্তু রমণী রেগে গেল। তাকে ধাক্কা মেরে কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল—'আমাকে একা থাকতে দিতে পার না? মরদের সাথে আমি ইয়ারকি মারি না।'

এতে আরও খুশি হয়ে উঠল বুতো। লিসা বিবর্ণ ও গম্ভীর মুখে দাড়িয়ে ছিল। বুতো বলল—'কি বল, এ ব্যাপারে আমি মাথা গলাব? বাজী ফেলছি, তিরিশ পিসটোলে আমি ওঁকে রাজী করাতে পারব। বাজী ফেলবে আমার সাথে পাঁচ ফ্রাঙ্ক?'

'বেশ, তাই হবে। যদি আনন্দ পাও ত দেখ।'

রোজ এবং ফ্যানিও মাথা নেড়ে সায় দিল। ওরা জানে, এই যুবক দর কষাকষিতে ভারি ওস্তাদ। সে জেদি এবং উদ্ধত, মিথ্যে কথা বলতে এবং ঠকাতে কুশলী, আসল দামের তিনগুণ বেশী দামে জিনিস বেচে এবং কেনে নামমাত্র দামে। জাঁয়ের সাথে তাকে ওরা এগিয়ে যেতে দিল এবং নিজেরাও পিছনে পিছনে চলল যেন তার সাথে তাদের কোনরকম সংশ্রব নেই।

বুতো একসময় রমণীকে জিজ্ঞাসা করল—'তাহলে মা, কততে গোরুটাকে

ছাড়বে ?'

কৃষক রমণী ব্যাপারটা কি ঘটছে না ঘটছে দেখছিল।

সে শান্তভাবে আবার বলল—'চল্লিশ পিস্‌টোল।'

কথাটা প্রথমে সে রসিকতা হিসাবে নিয়ে হাসল। তারপর কৃষকটি, যে না-কি এতক্ষণ শান্তভাবে একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল, তাকে উদ্দেশ করে বলল।

'কি গো বুড়ো, তোমার বুড়ীকেও কি এই দামে বেচবে না-কি ?'

সারাক্ষণ সে গোরুটাকে পরখ করতে করতে রসিকতা করছিল এবং বুঝল যে এটার দুধেলা গাই হওয়ার সব গুণই আছে··ছোট্ট মাথা, পাতলা এক-জোড়া শিঙ, বড় বড় দুটো চোখ, বেশ বিশাল শিরা-উঠা উদর, অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো কিছুটা হ্রস্ব হলেও সরু লেজটা উঁচুতে বসানো। সে নীচু হয়ে ঝুলন্ত পালানটা পরখ করল, পরখ করল চৌকো স্থিতিস্থাপক বাঁটগুলো। তারপর গাইটার পিঠে হাত রেখে তার হাড়গুলো দেখতে দেখতে সুরু করল দর কষাকষি।

'তাহলে তুমি চল্লিশ পিসটোল চাইছ, তাই না ? হাসিও না আমাকে ! তিরিশে ছাড়বে ?'

হাত রেখে সে হাড়ের শক্তি আর অবস্থান অনুভব করল। তার হাতের আঙুলগুলো এবার নীচের দিকে দু'জানুব মাঝখানে গোলাপি রঙের চামড়ার কাছটায় থামল। লোমহীন দেহাংশ। বেশী বেশী দুধ দেওয়ার এটা লক্ষণ।

'তিরিশ পিস্‌টোল, এটাই ঠিক ত ?'

কৃষক রমণী জবাব দিল—'না, চল্লিশ !'

বুতো ঘুরে সরে দাড়াল, কিন্তু পরমুহূর্তে এগিয়ে এল। এবার কৃষক রমণী ঠিক করল কথা বলবে।

'দেখছ ত গোরুটা কি সুন্দর ! দুধেলা গাই। টিনিটি রবিবারে ওর বয়স দু'বছর পুরবে। এখন ত গাবিন। দিন পনেবর মধ্যেই বাচ্চা দেবে ! দেখ, এ গোরুটা তোমার মনে ধরবে।'

বলল আবার বুতো—'তিরিশ পিসটোল দেব !'

এবার ওকে চলে যেতে দেখে কৃষক রমণীটি তার স্বামীর দিকে তাকাল এবং চেঁচিয়ে বলল—'দেখ, আমি পঁয়তিরিশ পিস্‌টোলে দিতে পারি, নেবে ?'

'তিরিশ !'

'না, পঁয়তিরিশ !'

এবার মনে হল, এখানেই বুঝি সব চুকে-বুকে গেল। জঁা বুতোর হাত ধরে এগিয়ে গেল যেন বোঝাতে চাইল সুস্পষ্টভাবে যে, এ ব্যাপারটা সে ছাড়ল। হতাশ হয়ে মেয়েরাও তাদের সাথে যোগ দিল—তারা নিশ্চিত যে গাই-গোরুটার সঙ্গত দাম পঁয়তিরিশ, গোরুটা ফ্রানকয়েসের খুব পছন্দ হয়েছিল। ওই অর্থে কেনবার কথাও বলল—কিন্তু বুতো রেগে গেল। বলল, কেউ এভাবে তার

উপর ডাকাতি করবে তা' সে সহ্য করবে না কিছুতেই। এবং ফ্রানকয়েসের উদ্বিগ্ন মুখের সামনে সে ঘণ্টাখানেক দাঁড়িয়ে রইল, তাদের পছন্দ করা গোরুটার সামনে সম্ভাব্য কোন ক্রেতা দেখলেই ওরা কেঁপে উঠছিল ভয়ে। সে কিন্তু গোরুটার উপর থেকে নজরও সরাল না। দর কষাকষির এটাও একটা অংশ, তোমায় লেগে থাকতে হবে। এটা সুস্পষ্ট যে, কেউ তাদের টাকা তাড়াতাড়ি বার করতে চায় না। তারা দেখবে যে, কেউ তিরিশ পিসটোলের বেশী দেয় কি-না। এদিকে বাজার বন্ধ হয়ে আসছে কিন্তু গোরুটা বিক্রি হবার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

কৃষক রমণীর কাছে আবার এগিয়ে এল বুতো, বললে ক্লান্তিহীন গলায়—'তিরিশে দেবে ত ?'

'না, পঁয়তিরিশ !'

তখন আরও একজন খরিদ্দার জুটেছে, সেও দর কষাকষি করছে, জোর করে গোরুটাকে হাঁ করিয়ে তার দাঁত গুণছে। মুখ বিকৃত করে বুতো সরে এল। ঠিক সেই সময় গোরুটা মল ত্যাগ করল, আলতোভাবে মল মাটিতে পড়ল। বুতো গোরুটার মল দেখে মুখখানা আরও বিকৃত করল। তাই দেখে অন্য ক্রেতা প্রভাবিত হয়ে চলে গেল।

বুতো বলল—'না, আমি আর কিনতে চাই না, গোরুটার রক্ত জমে গেছে।'

এবার কৃষক রমণীটি মেজাজ গরম করে ভুল করল। এটাই চাইছিল বুতো, তাই রমণীটি যখন তাকে গালাগালি দিতে সুরু করল তখন সেও খিস্তির বান ছুটিয়ে দিল। দর্শক জুটে গেল এক দঙ্গল, তারাও হাসতে লাগল। কৃষকটি তখনও তার স্ত্রীর পিছনে দাঁড়িয়েছিল, নড়ে নি। অবশেষে সে তার স্ত্রীর হাত ধরে টান দিল এবং কৃষক রমণীটিও সহসা চেঁচিয়ে বলল—'তুমি বত্রিশ পিসটোলে কিনবে ?'

'না, তিরিশ।'

বুতোকে চলে যেতে দেখে কৃষক-রমণী তাকে ফের ডেকে ধরাগলায় বলল :

'ঠিক আছে, বেজন্মা, তুই নে গোরুটা। কিন্তু ঈশ্বরের দোহাই আবার যদি এমনিভাবে দর কষাকষি করিস তাহলে প্রথমেই তোর মুখে মারব টেনে এক ঘুঁষি।'

রাগে গর-গর করছিল সে। জোরে হেসে উঠল বুতো এবং দু'চারটে স্থূল রসিকতা করে বলল যে, তার সাথে শুলে অর্থের ঘাটতিটুকু পুষিয়ে দেবে।

লিসা সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এল। কৃষক রমণীকে একটু দূরে একটা গাছতলায় টেনে নিয়ে গিয়ে টাকা মিটিয়ে দিল। ফ্রানকয়েস এর মধ্যেই গাই-গোরুটার দড়ি ধরেছে এবং গোরুটা নড়ছে না দেখে জঁ। তাকে পিছন থেকে তাড়া দিল। তারা প্রায় ঘণ্টা দুয়েক গোরুর হাটে রয়েছে এবং রোজ ও ফ্যানিকে নিঃশব্দে, শান্তমনে অপেক্ষা করতে হচ্ছে। এবার ওরা সামনে এগিয়ে গেল। বুতোকে

খুঁজল, কিন্তু বুতো অদৃশ্য—সে শুয়োর-বিক্রেতার সাথে দর কষাকষি করছে। কেবল কুড়ি ফ্রাঙ্কেই সে শুয়োরটা কিনল। দাম দেওয়ার আগে পকেটের মধ্যেই একবার টাকাগুলো গুণে ঠিকঠাক টাকা বার করল, আধখোলা মুঠোর মধ্যেও একবার গুণে নিল। তারপর একটা বস্তার মধ্যে শুয়োরটা ঢোকাবার দুরূহ কাজটুকু সারল। বস্তাটা সে বগলের নীচে করে সাথেই এনেছিল। শুয়োবটাকে ভিতবে পোরবার সময় বস্তাটা একটু ছিঁড়ে গেল, জানোয়ারটার খুরগুলো আর নাকটা ছেঁড়া দিয়ে বেরিয়ে রইল। বস্তাটাকে পিঠে ফেলে বুতো হাঁটতে লাগল, জানোয়ারটা ভীষণভাবে ছটফট করতে করতে চেঁচাচ্ছে তখন।

বুতো বলল—'কই লিসা, আমার পাঁচ ফ্রাঙ্ক দাও? টাকাটা আমি ত রোজগার করেছি!'

লিসা রসিকতা মনে করে পাঁচ ফ্রাঙ্ক দিল, ভাবল বুতো নেবে না। বুতো কিন্তু নিয়ে পকেটে পুরল। তারপর তারা ধীরে ধীরে সরাইখানা লা বন লেবারের দিকে হাঁটা দিল।

ওখানে হাজির হয়ে বুতো বেশ খুশি মেজাজে বলল—'তোমরা তাহলে চললে? লিসা, তুমি আর তোমাব বোন থাক না, একটু খাওয়া-দাওয়া করব?'

লিসা অবাক হয়ে জ'ায়ের দিকে ফিরল।

বুতো বলল—'বেশ ত জাঁ থাকুক। ও থাকলে খুশি হব।'

রোজ এবং ফ্যানি পরস্পরের দিকে একবার তাকাল। ছোকরার মাথায় নির্ঘাৎ একটা মতলব এসেছে। ওর মুখমণ্ডলে কোন ভাবের প্রকাশ হয় না। আর কোনও কিছুর জন্যই ওরা তার বাধা হবে না।

ফ্যানি বলল—'হঁ্যা, তুমি থাক। মাকে নিয়ে আমাকে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিবতে হবে। সবাই অপেক্ষা করছে।'

ফ্রানকয়েস গোরুটাকে ছাড়ে নি। বলল—'আমি-ও চলে যাব।'

এ ব্যাপারে সে ভীষণ জেদি, সরাইখানায় যাওয়ার তার একেবারেই ইচ্ছে নেই। এখুনি গোরুটাকে নিয়ে সে ফিরতে চায় ঘরে। সে এত বিরক্ত হল যে, ওরা সরাইখানায় যাওয়ার মতলব ছাড়তে বাধ্য হল। কাজেই গাড়ীতে ঘোড়া জোতা হল, গোরুটাকে বাঁধা হল গাড়ীর পিছনে এবং টপাটপ সবাই গাড়ীতে উঠে পড়ল।

ছেলের সাথে কথা বলার একটা সুযোগ খুঁজছিল রোজ এবং এতক্ষণে একটু ফুরসৎ পেল। জিজ্ঞাসা করল বুতোকে—'তোর বাবাকে কিছু বলে পাঠাবি?'

বুতো জবাব দিল—'না, কিস্‌স্যু বলার নেই।'

মা সোজাসুজি ছেলের মুখের দিকে তাকাল।

'তাহলে নতুন কিছু বলবি না?'

'যদি কিছু বলার থাকে ত সময় হলেই তোমরা জানতে পারবে।'

ফ্যানি ঘোড়াটাকে চাবুক মারল, ধীরে ধীরে ঘোড়াটা চলতে লাগল, গাড়ীর পিছনে দড়িতে বাঁধা গোরুটা গলা বাড়িয়ে গাড়ীর পাশে পাশে হাঁটতে লাগল। কাজেই কেবল লিসা রইল জঁা আর বুতোর সাথে।

তখন ছটা। ওরা কাফের মুখোমুখি সরাইখানার ঘরের মধ্যে একখানা বেঞ্চিতে পাশাপাশি বসল। সে দাম দেবে কি দেবে না এসব কোনও ইঙ্গিত না করেই রান্নাঘরে ঢুকে বুতো ডিম-ভাজা আর খরগোসের মাংসের হুকুম করল। ও যখন বেরিয়ে এল তখন লিসা জঁাকে সব কিছু খুলে বলতে বলল, তাহলে এখানেই ব্যাপারটা ফয়সালা হয়ে যাবে এবং জঁাকে আর তার সঙ্গে দেখা করতে যেতে হবে না। তারা ডিম-ভাজা শেষ করে খরগোসের মাংস চিবোতে লাগল, কিন্তু তখনও লজ্জিত জঁা কথাটা পাড়তে পারল না। এবং এটাও স্পষ্ট যে, বুতো এসব ব্যাপার নিয়ে একেবারেই ভাবছে না। সে আন্তরিকভাবে খাচ্ছে আর জোরালো গলায় হাসছে। মাঝে মাঝে খুশির মেজাজে টেবিলের নীচে হাঁটু দিয়ে জঁা আর লিসার হাঁটুতে গুতো মারছে। তারপর রগনি আর নতুন রাস্তা সম্পর্কে তারা গভীর আলোচনা জুড়ে দিল। যদিও পাঁচশো ফ্রাঁক ক্ষতিপূরণ এবং বর্ধিত জমির মূল্য নিয়ে তারা একটা কথাও বলল না। কিন্তু এই চিন্তাটা সব সময় তাদের মনে লুকিয়ে ছিল। তারা গ্লাসে গ্লাস ঠেকিয়ে পান করছিল আর বুতো সারাক্ষণ করছিল স্থূল রসিকতা। ওর ধূসর দু' চোখে একটা ছাপ ফুটে উঠেছিল যে, তৃতীয় অংশটার যেহেতু মূল্য বেড়েছে তাই সে একটা মোটা দাঁও মাবার সুযোগ খুঁজছে। আর তার প্রেমিকার জমিখণ্ড রয়েছে ঠিক তার পাশেই এবং তারও দাম দুনো হয়েছে।

সে চেঁচিয়ে উঠল—'হা ঈশ্বর! আমরা কি একটু কফি খাব না?'

জঁা হুকুম দিল—'তিন কাপ কফি দাও।'

সরাইখানায় পান-পর্ব সারতে তাদের ঘণ্টাখানেক পার হল। ব্রাণ্ডির বোতলটা খালি হল। কিন্তু তখনও বুতো নিজের মনের কথা বলল না। যেন মনে হচ্ছে সে আগেই দাম-টাম মিটিয়ে দিয়েছে এবং এখন চলে যেতে চায়। জিনিসটা নিয়ে এমন একটা ভাব দেখাচ্ছে বুঝি এখনও দর কষাকষি করছে গোরুর দাম নিয়ে। ব্যাপারটার যেন ফয়সালা হয়েই গেছে, এখন সব দৃষ্টিকোণ থেকে অবস্থা পর্য্যালোচনা করতে হবে শুধু। সহসা সে লিসার দিকে ঘুরল।

বলল তাকে—'মেয়েটাকে আন নি কেন?'

লিসা হাসল, এবার হয়ত ব্যাপারটার ফয়সালা হবে। তাই খুশি-ভরা মেজাজে তাকে আসকারা দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল—'ওটাকে ঠিক বুতোর মতন দেখতে হয়েছে। একটা ক্ষুদে শয়তান!'

ব্যস! এটুকুই সব! বুতোও হাসল। বিয়ের ঠিক হয়ে গেল। সারাক্ষণ লজ্জিত মুখে বসে রইল জঁা এবং সোয়াস্তি অনুভব করে ওদের হাসিতে যোগ

দিল। কিন্তু সবশেষে নিজের মনের কথা বলল।

'ভালই হল যে, তুমি ফিরে এসেছ। আমি ত তোমার জায়গা নিচ্ছিলাম।'

'হাঁ, শুনেছি তা'। ওর জন্তে আমি একটুও উদ্বিগ্ন হই নি। বোধ হয় তুমি আমাকে সব কিছু বলতে।'

'নিশ্চয়ই বলতাম। তবে বাচ্চাটা রয়েছে, তুমি ওকে গ্রহণ করে ভালই করছ, বুতো। আমরাও সব সময় তাই বলাবলি করতাম, তাই না লিসা?'

'হাঁ, সব সময়। ওর কথা ঠিক।'

ওরা তিনজনেই এবার পরস্পরকে বন্ধুর মতন ভালবাসল, বিশেষ করে জাঁ। তার মনে একটুও বিদ্বেষ নেই, বরং এই বিবাহে তার মন সায় দেওয়ায় সে একটু অবাক হল। সে মদের অর্ডার দিল।

বুতো চেঁচিয়ে উঠল—'আমরা কিছু পান করতে পারি নিশ্চয়।'

দু জনের মাঝখানে এখন বসেছে লিসা। ওরা টেবিলে দু'কনুইয়ের ভর রেখে সাম্প্রতিক বর্ষণ আর তার ফলে শস্য-চারার মাটিতে পড়ে যাওয়া নিয়ে আলোচনা করতে লাগল।

বুতোই খাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছিল কিন্তু তবু জাঁ সব দাম মেটাল এবং এর ফলে খোশ মেজাজী লোকটা আরও আনন্দে মেতে উঠল। উঠোনে গাড়ীতে আবার ঘোড়া জোতা হল। বুতো বন্ধুর কাঁধে হাত রেখে বলল—'বুঝলে, তোমার আসা চাই। সপ্তাহ তিনেকের মধ্যেই বিয়ের ব্যবস্থা করব। দলিল প্রমাণকারী অফিসারের অফিসে গিয়ে দলিলে সই করে এসেছি, কাগজপত্র সব তৈরী।'

বুতো হাত ধরে লিসাকে গাড়ীতে তুলল।

বলল—'এস, তোমাকে বাড়ী পৌছিয়ে দেব। রগনি দিয়েই ত আমি যাব। ওটুকু ঘুরে যেতে আমার অসুবিধে হবে না।'

নিজের গাড়ীতে জাঁ একাই বাড়ি ফিরে চলল। এটাই স্বাভাবিক। সে ওদের পিছনে চলল। ক্লয়েস নগরী এখন ঘুমন্ত, নিথর শান্তিতে মগ্ন……শুধু রাস্তার হলুদ আলোগুলো নক্ষত্রের মতন জ্বলছে। হাটের জনকোলাহল থেমে গেছে, মাঝে মাঝে মাতাল চাষীর স্খলিত পদশব্দ শোনা যাচ্ছে। এখন তার সামনে প্রলম্বিত সমগ্র পথ সম্পূর্ণ অন্ধকারে আচ্ছন্ন। অন্য গাড়ীখানা আবার তার নজরে পড়ল, দম্পতি যুবক-যুবতীকে নিয়ে গাড়ীখানা ঘরে ফিরছে। এটা হয়ে ভালই হয়েছে। এটাই হওয়া উচিৎ ছিল, মুক্ত আর হালকা মনে সে শিস্ দিচ্ছিল……শিষের শব্দ রাতের হাওয়ায় ভর করে ভাসতে লাগল।

৬

এই জবর ঘটনার জন্যই সারা রগনি-গ্রাম অধীর হয়ে ছিল···আহা-হা, কত দিন ধরেই এই বিয়েটা থমকে ছিল। মেয়র হোরদিকুইন এই বিয়ের পৌরহিত্য করলেন, কিন্তু সন্ধ্যেবেলায় অনুষ্ঠিত ভোজ-আসরে থাকতে রাজী হলেন না। একটা মামলার জন্যে তাঁকে শাত্রিস শহরে রাত কাটাতে হবে, এবং যেহেতু তারা অনুগ্রহ দেখিয়ে মাদাম জ্যাকুলিনকে নিমন্ত্রণ করেছে তাই মাদাম আসবে ভোজ আসরে। দু'চার জন গণ্যমান্য অতিথি আসুক এই ভেবে তারা যাজক এ্যাবি গডার্ডকে আমন্ত্রণ করতে চেয়েছিল, কিন্তু কথাটা তাঁর কাছে পাড়তেই তিনি রাগে ফেটে পড়লেন, কেননা এই বিয়েটা গরমকালের মাঝামাঝি হোক এটাই ছিল তাঁর ইচ্ছে। তাঁকে বাজকিস লা-দয়েনে বিশাল প্রার্থনা সভায় যোগ দিতে হবে আর এই ধর্মসভার কাজটাও খুব খ্যাতি এবং সম্মানের, কাজেই সকালে তিনি রগনি গ্রামে আসবেন কিভাবে? তখন লিসা, রোজ আর ফ্যানি, এই তিনজন নারীই জেদ ধরে বসল···তারা কাউকে আমন্ত্রণ করবে না। শেষে বুতোও তাতে রাজী হল। দুপুরবেলা দারুণ বদমেজাজে যাজক মশাই এলেন, রাগে গর-গর করতে করতে প্রার্থনার কাজ সারলেন। সবাই তাঁর ব্যবহারে মনে আঘাত পেল।

সকালের দিকে সারা আকাশখানা ছিল মেঘে ঢাকা। তারপর মেঘ কাটল। সন্ধ্যেবেলায় গরম পড়ল। গড়ে উঠল নির্মল আর মেজাজী পরিবেশ। বিশাল রান্নাঘরের মধ্যে পাতা হল খানা-টেবিল। সামনেই উনুনে বড় হাঁড়িতে করে মসলা-মাখানো মাংস সিদ্ধ হচ্ছে। উনুনের তাতে ঘরখানা এমন গরম হয়ে উঠেছে যে, ঘরের জানালা দুটো আর দরজা খুলে দিতে হয়েছে এবং খোলা দরজা-জানালা দিয়ে নতুন-কাটা ঘাসের সোঁদা সোঁদা গন্ধ ভেসে আসছে।

আগের দিন থেকেই রোজ এবং ফ্যানি মৌচির মেয়ে দুটিকে কাজে সাহায্য করছে। বেলা তখন তিনটে বেজেছে···তৈরী পিঠে নিয়ে গাড়ী এসে হাজির হল। অমনি চারধারে ছড়িয়ে পড়ল উত্তেজনা। গ্রামের বউ-মেয়েরা নিজেদের বাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে সব দেখতে লাগল। নানা ধরনের ফলগুলো টেবিলে সাজিয়ে রাখা হল কেমন মানায় দেখার জন্যে। এবং ঠিক তখুনি নির্দিষ্ট সময়ের আগেই তাদের পিসী গ্রাণ্ডির বউ এসে হাজির হল। দু' হাঁটুর মধ্যে লাঠিখানা চেপে ধরে সে বসল চেয়ারে; দৃষ্টি নিবদ্ধ করল খাবার আর ফলের উপর। লোকে যে কিভাবে খাওয়ার জন্যে এত খরচ করতে পারে সেটাই তার ভাবনা! আজ দুপুরবেলা সে কিছুই খায় নি তাহলে সন্ধ্যেবেলায় ভোজ-আসরে পেটপুরে খেতে পারবে।

পুরুষরা সবাই উঠোনে বল ছোঁড়াছুঁড়ি খেলছিল···বুড়ো ফৌআন, বুতো আর বিয়ের আসরে তার দোসর জাঁ, ডেলহোমি এবং তার ছেলে নিনেসি কালো ট্রাউজার আর রেশমি টপ্-হ্যাট পরে খেলায় মেতে উঠেছিল। মঁসিয়ে চার্লস

এল একা···আগের দিন নাতনি ঈলোডিকে শাতোত্নে রেখে এসেছে। খেলায় যোগ না দিলেও সে গভীর আগ্রহে খেলা দেখছিল এবং মাঝে মাঝে মূল্যবান মন্তব্য ছুঁড়ে দিচ্ছিল।

ছ'টা বাজল। সব তৈরী। কিন্তু জ্যাকুলিনের জন্যে তাদের বসে থাকতে হল। রান্না করার সময় উনুনের ধারে পাছে কাদা লাগে তাই মেয়েরা জামার ঝুল উঁচু করে পিন আটকে রেখেছিল এখন ঝুল নামিয়ে দিল। লিসার পরণে ছিল নীল পোশাক আর ফ্রানকয়েসের অঙ্গে গোলাপি। পুরনো আমলের ফ্যাসান-মাফিক কটকটে রঙের রেশমি কাপড়ে তারা পোশাক বানিয়ে নিয়েছে। এই কাপড় দুনো দামে লাম্‌বুরদি তাদের বেচেছে, যদিও বেচার সময় সে বলেছিল যে, প্যারি শহরে এই ধরনের কাপড়ই হচ্ছে হাল-আমলের ফ্যাসান। বিগত চল্লিশ বছর ধরে গ্রামেব সব বিয়ের আসরে যে বেগুনি রঙেব পোশাকটা পরে রোজ ফৌআন খেতে অভ্যস্ত সেটাই আজও পবে এসেছে। সবুজ রঙের একটা পোশাক আর সব হীরে জহরৎ গয়না-গাঁটি অঙ্গে পরেছে ফ্যানি···ঘড়ি আর ঘড়ির চেন, পোশাক আটকানো পিন, আঙটি আর কানের দুল·· সব তার দেহে ঝলমল করছে। একটুক্ষণ অন্তর অন্তর কোন না কোন একজন ছুটে বাইরে গিয়ে গীর্জার ধারে দাঁড়িয়ে দেখে আসছে যে, খামাবেব কোন মহিলা আসছে কি-না! বড দেরী কবছে আসতে। মাংস খাচ্ছে ধরে, ভুল করে মশলাদার যে ঝোল ডিসে পরিবেশন করা হয়েছে তাও যাচ্ছে ঠাণ্ডা হয়ে। অবশেষে কে একজন চেঁচিয়ে উঠল—'এসেছে! সে এসেছে!'

গাড়ী এসে থামতেই জ্যাকুলিন ছোট্ট এক লাফে মাটিতে পা রাখল।

লাল বুটি দেওয়া সাদা সুতি-কাপড়ের একটা সাধারণ পোশাকে তাকে চমৎকার মানিয়েছে···কেননা তার পছন্দ উচ্চমানের আর নিজের দেহকে সাজাবার কৌশল তার জানা। হোরদিকুইনের দেওয়া সেই কানের সুন্দর দুল-জোড়া যা' নিয়ে একদিন আশপাশের খামারে খামারে টি টি পড়ে গিয়েছিল, সেটি ছাড়া আর কোনও গয়না-গাঁটি সে পরে নি। কিন্তু সঙ্গের খামারের ছোকরাকে সে যেতে বলল না দেখে সবাই বিস্মিত হল, এবং অন্যরা বরং তাকে গাড়ী থেকে ঘোড়া খুলতে সাহায্য করল। লোকটার নাম ট্রন···একটা প্রায় শ্বেতকায় দৈত্যবিশেষ, একমাথা লালচে চুল আর শিশুসুলভ মুখের ভাব। লা পারচি গ্রাম থেকে লা বর্ডেবিতে খামার চাকরের কাজ নিয়ে এসেছে।

জ্যাকুলিন খুশিব মেজাজে বলল—'ট্রন থাকছে, জান ত। ও আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে ঘরে।'

বসি উপত্যকার চাষীরা পারচির গেঁইয়াদের ভাল চোখে দেখে না···ওরা কপট আর ধূর্ত। সবাই পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল; তাহলে এই বিশালকায় লোকটা এখন জ্যাকুলিনের একজন নাগর। বুতো আজ সারাদিন খুশ-মেজাজে আছে আর ভদ্র ব্যবহার করছে।

'নিশ্চয়, ও থাকুক ! তোমার সাথে ও থাকলে ভালই হবে।' জবাব দিল।

লিসা এবার সকলকে খাওয়া স্থরু করতে বলল। ওরা খানা-টেবিলে বসে, বড় গলায় চেঁচিয়ে গল্প করতে করতে খাওয়া স্থরু করল। ঘরে খান তিনেক চেয়ার কম। তাই দু'খানা টুলের উপর একখানা কাঠ পেতে বেঞ্চি তৈরী করা হয়েছে। ডিসের উপর চামচ ঠোকাঠুকির আওয়াজ হচ্ছিল। সবাই খাবারের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে, বেপরোয়াভাবে সব নিঃশেষ হতে লাগল ; মুরগি, খরগোস আর নানা ধরনের মাংস···ভয়ানক-দর্শন এবং ভীতিজনক চোয়াল-নাড়ানোর মধ্যে মাংসের সম্ভার অদৃশ্য হচ্ছে। এই লোকগুলো নিজেদের বাড়ীতে স্বল্প আহারী হলেও অপরের বাড়ীতে গুরু ভোজনে অভ্যস্ত। অনেক বেশী আহার করতে পারবে তাই গ্রাণ্ডির বউ কারো সাথে কোন কথা বলছে না, সে অনবরত চিবোচ্ছে। ব্যাপারটা দেখতে বেশ ভীতিজনক হয়ে উঠল, একটা চ্যাপ্টা, আশী বছরের বৃদ্ধা কি পরিমাণ আহার করে ফুলে উঠছে ক্রমে ক্রমে।

ঠিক হয়েছিল, সম্মান দেখাবার জন্য ফ্রানকয়েস আর ফ্যানি খাদ্য পরিবেশন করবে। তাহলে অতিথিদের খাদ্যের জন্য বারবার উঠতে হবে না ; কিন্তু লিসা শান্ত হয়ে বসে থাকতে পারছিল না, তাই প্রতি মুহূর্তে উঠে উঠে হয় সে চাটনি আর না হয় রুটির টুকরো পরিবেশন করছিল অতিথিদের। অবশেষে অল্পক্ষণের মধ্যে সবাই হাত লাগাল, সব সময় কেউ না কেউ চেয়ার ছেড়ে উঠে রুটির টুকরো কেটে নিচ্ছে আর না হয় ডিসে ঝোল ঢালছে। বুতোর দায়িত্বে ছিল মদ, কিন্তু সেই মদ তার পক্ষে সঙ্গীন হয়ে উঠল। কল-বসানো একটা পাত্রে সে এক পেটি মদ আগে থেকে ঢেলে রেখেছিল, তাহলে আর বারবার বোতলের ছিপি খোলার হাঙ্গামা করতে হবে না। ফলে তার নিজেরই খাওয়া হল না। জঁা তার বদলে অতিথিদের মদের গ্লাস ভরে দিতে লাগল। ডেলহোমি তার চেয়ারেই সারাক্ষণ বসে রইল এবং স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানী ব্যক্তির মতন ঘোষণা করল যে, উদরস্থ খাবার যাতে না গলা টিপে ধরে তার জন্য এখন তরল পানীয় প্রয়োজন। এক সময়ে গাড়ীর চাকার মতন দেখতে বিশাল একখানা পিঠে খানা-টেবিলে রাখা হলে সকলে বিস্ময়ে থ' হয়ে গেল। মাংস দিয়ে তৈরী বলগুলো সকলের মনে বিস্ময়ের ছাপ ফেলল। এমন কি মঁসিয়ে চার্লস বলল যে, এমন সুন্দর জিনিস সে শাত্রিসে দেখে নি তা' শপথ করে বলতে পারে।

বর আর কনে পরস্পরের বিপরীতে বসেছিল। বুতো বসেছিল তার মা আর গ্রাণ্ডির বউয়ের মাঝখানের আসনে এবং লিসা বসেছিল বুড়ো ফৌআন ও মঁসিয়ে চার্লসের মাঝে। অন্যান্য অতিথিরা নিজের নিজের খুশি মতন জায়গায় বসেছিল। জ্যাকুলিন ট্রনের পাশে···ছোকরা মাঝে মাঝে তার বোকামি-ভরা দৃষ্টিতে জ্যাকুলিনের দিকে তাকাচ্ছিল। জঁা বসেছিল ফ্রানকয়েসের পাশে, শুধু ওদের মাঝখানে ছিল ছোট্ট জুলি। ওরা দু'জনেই

তার খাওয়ার তদারকি করছিল। কিন্তু টক্ আসতেই সে আর খেতে চাইল না, তার পেট ভরে গেছে। কাজেই লিসা তাকে বিছানায় শুইয়ে রেখে এল। এবার জঁা আর ফ্রানকয়েস পাশাপাশি বসে খেতে লাগল। ফ্রানকয়েস বার বার উঠছে, বসছে···বিশাল উনুনটার গনগনে আগুনের তাতে তার সারা মুখ লাল হয়ে উঠেছে। পরিশ্রমে সে ক্লান্ত আর অতিমাত্রায় উত্তেজিত। জঁা তাকে সাহায্য করার জন্য উঠতে চাইছিল, কিন্তু সে থামল না। কাজ করতে লাগল। মাঝে মাঝে ফ্রানকয়েসের সাথে বুতোর বিবাদ বাধছিল। খোশ মেজাজে থাকলে বুতো মেয়েদের পিছনে লাগে এবং আজ স্থরু থেকেই সে ফ্রানকয়েসের সাথে খুনস্থটি করছিল। যখনই ফ্রানকয়েস পাশ দিয়ে যাচ্ছিল তখনই বুতো তাকে চিম্‌টি কাটছিল, এক সময় রেগে-মেগে ফ্রানকয়েস বুতোকে একটা চড় কষিয়ে দিল; তারপর এক ছুতোয় ফ্রানকয়েস তার পাশ দিয়ে যাওয়ার জন্যে উঠল এবং তাহলে সে তাকে আবার চড় কষাতে পারবে। সে অনুযোগ করল যে, তার জানুর উপর কালো-নীল খিম্‌চানোর দাগ পড়েছে।

জঁা বলল—'তাহলে বসে থাক!'

চেঁচিয়ে বলল ফ্রানকয়েস—'না, না। ওকে বুঝিয়ে দিতে চাই সে আমার নাগর নয়। সে লিসার।'

আঁধার ঘনাতেই ওরা ছ'টা মোমবাতি জ্বালাল। ঝাড়া তিন ঘণ্টা ধরে ওরা খেয়ে চলেছে, অবশেষে দশটার সময় ওরা ফলে হাত দিল। তারপর থেকেই তারা কফি পান করছে। এক কাপ দু'কাপ নয়···মগ ভরতি করে তারা কফি গিলতে লাগল। ওরা রসিকতায় আরও সোচ্চার হল। কফি শক্তি দান করেছে দেহে; যে মরদগুলো ঘুম-কাতুরে তাদের পক্ষে কফি ভালই, মাঝে মাঝে বিবাহিত অতিথিরা দু'এক চুমুক গালে নিয়ে পাশে কুলকুচো করে ফেলে দিচ্ছে।

নিজের গম্ভীর স্বভাব ভুলে ফ্যানি এখন হাসতে হাসতে ডেলহোমিকে বলল—'তুমি একটু কফি পান কর গো।'

লজ্জায় লাল হল ডেলহোমি এবং শান্তভাবে সে ব্যাখ্যা করল যে, তাকে খুব খাটতে হচ্ছে। ওদের ছেলে নিনেসি হা-হা শব্দে হেসে উঠল। এই দাম্পত্য আলাপে সবাই জানু থাপড়ে সজোরে হাসতে লাগল। কিন্তু ছেলেটা বড্ড খেয়ে ফেলেছে, তার পেট ফাটবার উপক্রম। সে এক সময় ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, সবাই চলে গেল, কিন্তু সে ফিরল না। পরে দেখা গেল, সে গোয়ালে দুটো গোরুর মাঝখানে শুয়ে ঘুমোচ্ছে।

গ্রাণ্ডির বউ সবচেয়ে বেশীক্ষণ বসে রইল। মাঝ রাতে বুড়ী একটু হতাশ হল, কেননা সে বুঝতে পারল যে, খাবার সে শেষ করতে পারবে না। সরের গামলা শেষ হয়েছে এবং পিঠের টুকরোগুলোও নিঃশেষ। সবাই তখন মদ পান করছিল স্তন-বন্ধনী আলগা করে দিয়েছে মেয়েরা, পুরুষরা খুলে দিয়েছে

ট্রাউজারের বেল্টের বাঁধন। জায়গা বদল করে ছোট ছোট দলে তারা খানা-টেবিলের ধারে বসে গল্প করছে। সারা টেবিলে মদ আর তরকারির দাগ। এক সময় গান সুরু হল কিন্তু চলল না বেশীক্ষণ। শুধু অশ্রু-ভেজা মুখে বুড়ী রোজ গুন গুন স্বরে আঠার শতকের একখানা গান গাইছিল। যৌবনকাল থেকে এই সুরটা তার মনে গেঁথে আছে। গানের সাথে সাথে সে মাথা নেড়ে নেড়ে তাল দিচ্ছিল। নাচের ক্ষমতা-ওয়ালা অতিথি ছিল একেবারেই কম, মরদরা কেবল অজস্র মদ গিলতে আর পাইপে ধূমপান করতে চাইছিল। খানা-টেবিলের ঢাকনার উপর তারা পাইপের ছাই ঝাড়ছিল, জঁা আর ট্রনের সামনে একটা কোণায় বসে ডেলহোমি আর ফ্যানি আজকে নবদম্পতির কত ফ্রাঙ্ক খরচ হল এবং ভবিষ্যতে তাদের আর্থিক অবস্থা কি হবে তাই নিয়ে আলোচনা করছিল। এবং এই আলোচনা চলছিল একঘেয়েভাবে, প্রতি ইঞ্চি জমির তারা দাম, কষছে। রগনি গ্রামের প্রতিটি মানুষের আয় এমন কি তাদের বাড়ীর পোশাক-আশাকের দাম পর্যন্ত তাদের জানা।

রাত একটা বাজল এবং তারা এবার বাড়ীতে শুতে যাওয়ার কথা ভাবল। নব দম্পতির একটা সন্তান আছে কাজেই তাদের প্রথম রাত্রিতে শয্যায় শোয়া নিয়ে স্থূল রসিকতা করার কোনও সুযোগ নেই। সেই সব পুরোন ঠাট্টা-তামাসা যেমন কোঁকড়ান চুল রাখা, কিংবা খাটের পেরেক খুলে দেওয়া অথবা খেলনা পুতুল রেখে দেওয়া যাতে বিছানায় বসলেই পুতুলটা ককিয়ে ওঠে···এসব ইয়ারকি ফাজলামি এখন নিরর্থক। এ যেন ভোজ মেটার পর সরষে-বাটা পরিবেশন করার মতন হাস্যকর ব্যাপার। সবচেয়ে ভাল হচ্ছে, এখন আর এক পাত্তর মদ গিলে বিদায় নেওয়া।

ফৌআন এবং ডেলহোমি দম্পতিরা বিদায় নিল এবং চলে গেল মঁসিয়ে চার্লস-ও। গ্রাণ্ডির বউ শেষ বারের মতন খানা-টেবিল চক্কর দিয়ে দেখে নিল যে, একটুকরো খাবার কোথাও পড়ে নেই। এবার সে চলে যাওয়ার কথা ভাবল এবং যাওয়ার আগে জঁাকে বলে গেল যে, বুড়ো দম্পতি অভাবে মরবে। অন্যরা যখন মাতাল অবস্থায় রাজপথের পাথরে ঠোক্কর খেতে খেতে হাঁটতে লাগল তখন গ্রাণ্ডির বউ হাতের লাঠি ঠুকতে ঠুকতে সবল পায়ে দূর থেকে আরও দূরে চলে গেল।

ট্রন এর মধ্যেই মাদাম জ্যাকুলিনের জন্যে গাড়ীতে ঘোড়া জুতেছে। গাড়ীতে উঠে জ্যাকুলিন ঘুরে বলল—'আমাদের সাথে গাড়ীতে যাবে না-কি জঁা? মনে হয় না তুমি এখানে এখন থাকবে, থাকবে না কি?'

যদিও গাড়ীতে উঠবে বলেই জঁা ঠিক করেছিল, কিন্তু ও মন বদলাল। ধন্যবাদ! ওই মরদটার হাতেই সে সহজেই এখন জ্যাকুলিনকে ছেড়ে দিল। নতুন নাগরের বিশাল দেহের আশ্রয়ে জঁা দেখছে জ্যাকুলিনকে এবং গাড়ী অদৃশ্য হতেই তাই সে না হেসে পারল না। সে হেঁটেই খামারে ফিরবে। তবে

উঠোনের পাথরের বেঞ্চিতে যেখানে ফ্রানকয়েস চুপ করে বসে আছে সেখানে ওর পাশে খানিকক্ষণ বসবে এখন। গরমে আর ক্লান্তিতে অবসন্ন দেহে ফ্রানকয়েস ওখানে বসে আছে অতিথিদের বিদায় নেওয়ার অপেক্ষায়। বুতোরা তাদের ঘরে ঢুকেছে। ফ্রানকয়েস কথা দিয়েছে যে, সে দরজা বন্ধ করে তবে শুতে যাবে।

মিনিট পাঁচেক নিস্তব্ধ হয়ে বসে থাকার পর ফ্রানকয়েস বলে উঠল—'আ! কি সুন্দর এখানটা।'

তারপর গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল। শীতল রাত্রির পরিবেশ। মনোরম নক্ষত্র-ভরা আকাশ। এ্যাজর নদীর তীরভূমি সংলগ্ন তৃণক্ষেত্রেব তীব্র সুবাস যেন বনফুলের সুগন্ধে বাতাসকে সুবাসিত করে তুলেছে।

জঁা জবাব দিল—'হাঁ, সত্যিই বড় মনোরম!'

ফ্রানকয়েস আর কোনও কথা বলল না এবং জঁা দেখল ও ঘুমিয়ে পড়েছে। তার কাঁধে মাথা বেখে ফ্রানকয়েস ঘুমোচ্ছে। আবও এক ঘণ্টা সে বসে রইল। মনের মধ্যে নানা গোলমেলে চিন্তার ভিড। অসৎ ইচ্ছাবা তাকে অভিভূত করে ফেলেছিল, তারপর তাবা মিলিয়েও গেল। ফ্রানকয়েস বড ছেলেমানুষ। ভাবল জঁা, সে তার জন্যে অপেক্ষা করতে পারে। বয়স বাড়লে ফ্রানকয়েস নিজেই একদিন তাব কাছে ধরা দেবে।

'শোন ফ্রানকয়েস, এবাব বিছানায় শোওয়ার সময় হল। এখানে আব থাকলে আমাদের ঠাণ্ডা লাগতে পাবে।'

চমকে জেগে উঠল ফ্রানকয়েস।

'কেন, হাঁ, সত্যি কথাই বলেছ। এবার বিছানায় শুয়ে পড়াই ভাল। চললাম, জঁা।'

'চললাম, ফ্রানকয়েস।

তৃতীয় ভাগ

১

বুতোরা এখন চুটিয়ে সংসাব কবছে। একতলার বড ঘবখানা দখল করেছে নব-দম্পতি আর দোতলার ছোট ঘরখানা পেয়েই ফ্রানকয়েস খুশি·· আগে বুড়ো মৌচি এই দোতলার ঘরখানাতে থাকত। ঘরখানা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে একখানা ফোলডিঙ খাট, একটা পুরোন ড্রয়ার, একটা টেবিল আর খান-চারেক চেয়ার পাতা হয়েছে। ফ্রানকয়েস ঠিক আগের মতনই গোরু দুটোর দেখাশুনা

করে। দৈনন্দিন জীবনের ধারাও সেই আগের মতন। তবু এই আপাত শান্ত জীবনে ফল্গুধারার মতন প্রবহমান রয়েছে অমিল মতের স্রোতধারা। কেননা এখনও দু'বোনের সম্পত্তির ভাগাভাগির নিষ্পত্তি করা হয় নি। লিসার বিয়ের পরের দিন ওদের অভিভাবক বুড়ো ফৌআন পীড়াপীড়ি করেছিল যে, ভবিষ্যতে গণ্ডগোল এড়াবার জন্য ভাগাভাগি করে নেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু বুতো প্রতিবাদ করেছিল। এর কারণ কি? যুক্তি কি? ফ্রানকয়েসের বয়স খুবই কম তার জমি-জমার প্রয়োজন নেই। কোনও কিছু ত বদলায় নি, বদলেছে কি? সে ত ঠিক আগের মতন তার দিদির সাথেই থাকছে। তার খাদ্য আর পোশাক পাচ্ছে, এবং তার জন্য নিশ্চয় কোন অনুযোগ নেই, আছে কি? যখন এই ধরনের প্রত্যেকটা যুক্তির অবতারণা করা হল তখন বুড়ো সম্মতিসূচক মাথা নেড়েছিল। কিন্তু পরে কি যে ঘটবে তা' ত বলা যায় না। কাজেই সব কিছুর নিষ্পত্তি হওয়াই ভাল। এবং মেয়েটি কোনটি তার নিজস্ব তার নিষ্পত্তি করতে চাচ্ছে। অবশ্য পরে সে তার জমি-জমা ভগ্নীপতির হাতেই চাষবাসের জন্য রাখতে রাজী আছে। কিন্তু বুতো তার মেজাজী, ভোঁতা বুদ্ধি আর অবাধ্য পীড়নের মাধ্যমে দিন কাটাতে লাগল। ফলে ভাগাভাগির কথা আর কোন পক্ষই তুলল না এবং মনের আনন্দে সে সুন্দর সাংসারিক জীবনের মজা লুটতে লাগল।

'আমরা সবাই মিলেমিশে থাকব, এবং এটাই আমি চাই।'

প্রথম মাস দশেক দু'বোনের মধ্যে কোন রকম বাদ-বিসম্বাদ হল না এবং দম্পতির মধ্যেও হল না মনোমালিন্য কিন্তু তার পরেই ধীরে ধীরে বিরোধ দেখা দিল। বদ মেজাজের বিস্ফোরণ আর একঘেয়েমি থেকে সুরু হল গালিগালাজ। বিরক্তিজনক সত্ত্ব-স্বার্থের প্রশ্নটা ফল্গুধারার মতন তার প্রংসকার্য সুরু করল এবং পরিণামে তিনজনের মধ্যেকার স্নেহ-রস তিক্ততায় পরিণত হল।

এটা ঠিক যে, লিসা ও ফ্রানকয়েসের মধ্যে সেই আগের মতন প্রবল স্নেহের আকর্ষণ পরস্পরের প্রতি আর ছিল না। এখন আর তাদেরকে পরস্পরের কোমর জড়িয়ে থাকতে কিংবা প্রদোষে একই শালে জড়াজড়ি করে দু'জনকে হাঁটতে দেখা যায় না। তারা যেন পরস্পরের থেকে আলাদা হয়ে গেছে এবং তাদের মধ্যে বিরূপতা দিন দিন বাড়ছে। যেহেতু বাড়ীতে একজন মরদের আবির্ভাব ঘটেছে তাই ফ্রানকয়েসের ধারণা সেই মরদ তার দিদিকে তার কাছ থেকে সরিয়ে নিচ্ছে। অতীতে সে প্রত্যেকটি বস্তু দিদির সাথে ভাগ করে উপভোগ করত, কিন্তু এই মরদের ভাগ ত সে নিতে পারে না, তাই এই মরদের অবস্থিতি এ বাড়ীতে অবিভক্ত, যে হৃদয় সে একা দখল করে রেখেছিল সেই হৃদয়ের দ্বারে আজ বাধার দেওয়াল উঠেছে। বুতো যখন লিসাকে চুমু খায় তখন ফ্রানকয়েস ঘর থেকে বেরিয়ে যায়, কারণ সে আঘাত পায়, কেউ যেন তার গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে। আর জমি-জমার ব্যাপারে তার মনে রয়েছে

ছেলেমানুষি ধারণা আর ভয়ানক জেদ—এটা আমার আর ওটা তোমার, এবং যেহেতু তার দিদিকে একজন পরপুরুষ দখল করেছে তাই সে তাকে ত্যাগ করেছে, কিন্তু অর্ধেক জমি-জমা আর বাড়ী তার। যা তার সে তার দখল চায়।

ফ্রানকয়েসের রাগের আরও একটা কারণ আছে কিন্তু সে তা প্রকাশ করতে পারে না। বুড়ো মৌচি ছিল মৃতদার, তাই তার সংসার ছিল স্নেহ-হীন, নারী পুরুষের প্রেম নিবেদনের কোনও পরিবেশ ছিল না এ বাড়ীতে। তাকে কেউ বিরক্ত করবার ছিল না। কিন্তু এখন এ বাড়ীতে একজন মরদের আবির্ভাব ঘটেছে···একজন সত্যিকারের জানোয়ার মরদ, সে খাদের মধ্যে মেয়েদের টেনে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করত, লিসার সাথে সেই মরদটা যখন শৃঙ্গারে রত হয় তখন বাড়ীখানার ভিতবের কাঠের দেওয়াল কাঁপতে থাকে এবং কাঠের ফাঁক-ফোকর দিয়ে যৌন সঙ্গমেব দৃশ্য নজরে পড়ে। জন্তু জানোয়ারদের মিলন দৃশ্য দেখে নারী-পুরুষের যৌন-মিলন সম্পর্কে সব কিছুই ফ্রানকয়েস জেনেছে, কিন্তু তবু এদের মিলন-দৃশ্য নজরে পড়লে তার মন তিতি-বিরক্ত হয়ে ওঠে। দিনের বেলা তাই সে বাইরে বাইরে কাটায় যাতে ওবা ভালবাসা-বাসির নোঙরা কাজগুলো শান্তিতে সাবতে পারে। সন্ধোবেলা খানা-টেবিল থেকে উঠবার সময় যদি ওরা হাসতে থাকে তাহলে ফ্রানকয়েস চেঁচিয়ে বলে, অন্ততঃ ডিসগুলো ধোয়া পর্যন্ত তারা তাকে সময় দিক। তারপর নিজের ঘরে ঢুকে সে সজোরে দরজা বন্ধ করে আওড়ায় চাপা দাঁতের ফাঁক দিয়ে—'শালা, শুয়োরেব বাচ্চা!' এ সব কিছু সত্বেও ফ্রানকয়েসের মনে হয়, নীচের তলায় শৃঙ্গার-মিলনের সব আওয়াজ সে শুনতে পাচ্ছে। বালিসে মাথা চেপে সে শুয়ে থাকে এবং চোখ পর্য্যন্ত চাদরে ঢাকা দেয়। কিন্তু তাব দেহ যেন জ্বরে পোড়ে, কান শোনে বিচিত্র কথোপকথন, চোখ দেখতে থাকে অদেখা দৃশ্যের ছায়া···তার কাঁ মনের বিদ্রোহ তাকে পীড়া দিতে থাকে।

এর সবচেয়ে খারাপ দিক হচ্ছে বুতো বুঝতে পারছে যে, এসবের জন্যে ফ্রানকয়েস দারুণ বিহ্বল হয়ে পড়ে, বিরক্ত হয়। তবু সে তার সাথে খুনসুটি করে। আচ্ছা? কেন নয়? ফ্রানকয়েস নিজেই এসব যখন করবে তখন সে কি করবে? লিসা হাসল, আর এর মধ্যে কোনও রকম বিসদৃশ কিছু তার নজরে পড়ল না। তারপব বুতো ব্যাপারটার একটা ব্যাখ্যা নিজের মনে খাড়া করল। ঈশ্বর ত সবাইকে এই আনন্দ উপভোগ করার সুযোগ দিয়েছেন। এবং দিয়েছেন বিনা দক্ষিণায়। তখন তুমিও একটা সময় আনন্দের মধ্যে অতিবাহিত করতে পার। কিন্তু সাবধান, কোনও বাচ্চা যেন না জন্মায়। ওহ, না না। নিশ্চয় আর কোনও বাচ্চা জন্মাবে না। বিয়ের আগে তুমি অনেক এ রকম করেছ কারণ তখন তুমি আহাম্মক ছিলে। এই বোকামির জন্যই জুলির জন্ম হয়েছে, একটা ভুলের বিস্মিত ফসল, এখানেই ওকে নিরস্ত হতে হবে। আর একটা শিশুর জন্ম দেওয়ার চেয়ে সে আত্মহত্যা করবে বরং৷

না, ধন্যবাদ ! খাওয়াবার জন্যে আর কোনও মুখ চাই না।…কেন না ওরা বড় তাড়াতাড়ি সব খেয়ে ফেলে। তাই বউয়ের সাথে সহবাসের সময় সে নজর রাখে। কিন্তু মাগিটা একটা কামুক কুকুরী, এক চাপেই সবটা প্রোথিত করে নেয়। বুতো মনে মনে বলে, সেও খুব চালাক, গভীরভাবে লাঙল দেয় কিন্তু বীজ বপন করে না। শস্য, হাঁ ; মাটির ফুলে ওঠা উদরে সে যত পারে বীজ বপন করতে পারে, কিন্তু না, কোনও শিশুর জন্যে বীজ বুনবে না, এখন সব কিছু শেষ হয়ে গেছে।

যৌন মিলনের এই সব অফুরন্ত এবং নিবিড় দৃশ্য দেখে দেখে ফ্রানকয়েস মিলনের উত্তাপ অনুভব করে এবং মনে মনে আরও চঞ্চল হয়ে ওঠে। তার চরিত্র যেন বদলাতে থাকে, অভাবিত মনোবেগে যা কখনও তার মনকে প্রফুল্ল করে আবার কখনও গভীর হতাশা ও বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন করে এবং এরই দরুণ সে বিহ্বল হয়ে পড়ে। সকালে বুতো শরমহীন, আধা-উলঙ্গ অবস্থায় রান্নাঘরের ভিতর দিয়ে যখন যায় তখন ফ্রানকয়েস ঘোরালো দৃষ্টিতে তাকে একবার দেখে নেয়। কাপ-ভাঙ্গা বা এমনি ধরনের ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে দু বোনের মধ্যে ঝগড়া বাধে। এটা কি তারও কাপ নয় অন্ততঃ এর আধখানাবও সে কি মালিক নয় ? ইচ্ছে হলে সে কি সব জিনিসপত্রের অর্ধেক ভেঙ্গে নষ্ট কবতে পারে না ? সম্পত্তি নিয়ে এধরনের বিবাদ তিক্ততা সৃষ্টি করে এবং এমন ধরনের বিরোধ-জনিত নিরানন্দ অবস্থা বেশ কয়েকদিন বিরাজ করতে থাকে।

এসময়ে বুতো নিজেও খুব মেজাজী হয়ে উঠল। গ্রামে গ্রামে খরা চলছিল। ছ' সপ্তাহ ধরে এক ফোঁটাও বৃষ্টি পড়ে নি। মাঠে মাঠে রবি-শস্যের বিপদ… রাই সর্ষের ফলন মন্দ, যব আর গমের শীর্ণ শীষগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে দিন দিন— এসব দেখে সে গভীর হতাশায় ভেঙ্গে পড়ছে…বাড়ী ফিরছে রোজ বদ মেজাজে, দু হাতের মুঠো পাকানো। গমের চারাগুলোর মতন তারও দেহ অসুস্থ হয়ে পড়ছে। তার দেহের ওজন কমছে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে খিল ধরছে, মাংসপেশী শীর্ণ হচ্ছে—চিন্তায় আর উদ্বিগ্নতায় তার দেহ যেন শুকিয়ে যাচ্ছে, ছোট হয়ে যাচ্ছে। এক সকালে প্রথম ফ্রানকয়েসের সাথে তার বিবাদ সুরু হল। সেদিন ছিল খুব গরম। কুয়ার জলে বেশ করে গা-হাত-পা ধুয়ে একটা জামা আর ট্রাউজার কোন রকমে পবে বুতো ঘরে ঢুকল, তখনও সে বোতাম আঁটে নি, ট্রাউজারটা শুধু নিতম্ব ঢেকেছে··সেই অবস্থায় সে খেতে বসল। ফ্রানকয়েস তাকে পরিবেশন করতে এসে চুপ করে তার পিছনে দাঁড়িয়ে রইল কয়েকটা মুহূর্ত।

অবশেষে ফ্রানকয়েস বলল—'কি, ঠিক মতন জামা পরতে পার না ? এত অসভ্যতা !'

এমনিতেই বুতোর মেজাজ চড়ে ছিল এবার সে দারুণ রাগে ফেটে পড়ল।

'হায় ঈশ্বর ! আমার বিরুদ্ধে অনুযোগ না করে থাকতে পার না ? তোমার

খারাপ লাগলে এদিকে তাকিও না। আরে মাগি, আমার নীচের কিছু ধরতে তোমার ইচ্ছে হচ্ছে বুঝি? ওটাই পাওয়ার জন্য সব সময় মুখিয়ে আছ!'

এবার লজ্জায় লাল হল ফ্রানকয়েস, একটা উপযুক্ত জবাব দেওয়ার জন্য তোতলাতে লাগল।

কিন্তু লিসা এসময় কথা বলে ভুল করল।

'ঠিক বলেছে ও, তুই আমাদের বড় জ্বালাচ্ছিস। আমাদের সংসারে থাকতে যদি তোর ইচ্ছে না হয়ত তুই চলে যা।'

রেগে মেগে ফ্রানকয়েস বলল—'ঠিক আছে, তাই যাব। তারপর সজোরে দরজা বন্ধ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পরের দিন আবার বুতো খুব হাসি খুশি, মেজাজ শরীফ। মিটমাট করতে ব্যগ্র। সাত্বর বেলাতেই আকাশে মেঘ জমেছিল। ঝর্টা বারো ধরে সুন্দর গরম আর প্রচণ্ড বর্ষণ হচ্ছে ফলে সারা গ্রামখানা প্রাণ ফিরে পেল যেন গ্রীষ্মকালের ধারা-বর্ষণে। জানালা খুলে দিয়েছে বুতো এবং ভোর থেকে পকেটে হাত ঢুকিয়ে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে ধারা-বর্ষণ দেখছে।

খুশি ঝরা কণ্ঠে বলল বুতো—'এবার আমাদের সময় ফিরবে, ঈশ্বর আমাদের দিকে। নিরর্থক খেটে মরার চেয়ে আজকের মতন অলসভাবে ঘরে বসে থাকা অনেক বেশী শ্রেয়।

সহসা শুনল কেউ যেন দরজা খুলে ঘরের মধ্যে ঢুকল। ও ঘুরে অবাক হয়ে দেখল বুড়ো ফৌআনকে।

'আরে! বাবা! তুমি কি ব্যাঙ ধরতে এসেছ না কি?

বুড়ো তার বিশাল নীল ছাতাটা নিয়ে ধ্বস্তাধ্বস্তি করছিল, দোরের বাইরে জুতো খুলে সে ভিতরে ঢুকল।

শুধু বলল—'সুন্দর বৃষ্টি হচ্ছে। আমাদের দরকার ছিল বৃষ্টির।'

যেহেতু আজ বছর খানেক হল তার জমি-জমা ভাগ হয়ে দলিলে সই হয়ে গেছে, তাই বুড়ো ফৌআনের হাতে কোন কাজ নেই, এখন ঘুরে ঘুরে নিজের এক সময়ের জমি দেখাই তার নেশা। এখন প্রায়ই চোখে পড়ে, সে ঘুরে ঘুরে ক্ষেত দেখছে, আগ্রহ নিয়ে কখনও খারাপ ফসল দেখে হতাশ হচ্ছে আবার কখনও বা দারুণ খুশি হচ্ছে, ছেলেদের বিরুদ্ধে তার অনুযোগ, তারা কোনও কাজের নয় এবং শস্য না ফলার জন্য ওরাই দায়ি। তাই এই বর্ষণ দেখে সে দারুণ খুশি।

বুতো বলল—'তাহলে আমাদের দেখতে এসেছ? এখান দিয়ে যাচ্ছিলে বুঝি?'

ফ্রানকয়েস এতক্ষণ চুপ করে ছিল, এবার এগিয়ে এল।

শুকনো গলায় বলল সে—'না, কাকাকে আমি আসতে বলেছি।'

লিসা টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে আলুর খোসা ছাড়াচ্ছিল, কাজ থামিয়ে সে

হাত ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার মুখখানা কঠিন হয়ে উঠল। বুতো মুঠো পাকাল, তারপর আবার তার মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হল, কেননা মেজাজ খারাপ করবে না বলেই সে মনে মনে ঠিক করেছে আজ।

ধীরে ধীরে বুড়ো বলল—'হাঁ, মেয়েটা কাল আমাকে সব বলেছে। এখন বুঝছ ত তখন আমি সম্পত্তি ভাগ করে দেওয়ার কথা বলেছিলাম, সেটাই ঠিক কাজ হত। প্রত্যেকেই যদি নিজের নিজের ভাগ বুঝে পায় তাহলে আর ঝগড়া হয় না। মন কষাকষি বা তর্কাতর্কি করতে হয় না। এখন আমাকে সব মিটিয়ে দিতে হবে। এটা তার অধিকার, তাই না? মেয়েটাকে জানাতে হবে, তার কি কি জিনিস। নইলে লোকে আমাকে দোষ দেবে। একটা দিন ঠিক করো, সেদিন আমরা দু জনেই মঁসিয়ে বেইলিহ্যাচির বাড়ী যাব।'

কিন্তু লিসা আর নিজেকে সংযত করে রাখতে পারল না।

'ও আমাদের নামে পুলিসের কাছে অভিযোগ করছে না কেন? হায় ঈশ্বর! তুমি হয়ত ভাবছ আমরা ওর সব সম্পত্তি লুঠ করে নিচ্ছি। আমি কি জনে জনে বলে বেড়াব যে, মেয়েটা এমন নচ্ছার হয়ে উঠেছে যে, আমরা ওর ধারে কাছে যাই না।'

ফ্রানকয়েস ঠিক একই গলায় দিদির কথার জবাব দিতে যাচ্ছিল কিন্তু বুতো যেন মজা করার জন্যই পিছন থেকে তাকে জড়িয়ে ধরল।

বুতো বলে উঠল—'আঃ কি সব জঘন্য ব্যাপার হচ্ছে! আমরা তর্কাতর্কি করলেও পরস্পরকে ভালবাসি, তাই না? দু'বোনে এক জায়গায় মিলেমিশে থাকাই ত ভাল।'

এক ঝটকায় নিজেকে মুক্ত করে নিল ফ্রানকয়েস। হয় ত আবার বিবাদ বাধত কিন্তু বুতোর নজরে পড়ল যে সদর দোরটা আবার খুলে গেল।

আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল বুতো—'আরে জঁা যে! তোমার সারা দেহ দেখছি ভিজে গেছে। এবার তোমাকে একটা সত্যিকারের ভিজে ইঁদুর মনে হচ্ছে।'

প্রকৃতপক্ষে যেমন মাঝে মাঝে আসে তেমনিভাবে জঁা সোজা খামার থেকে আসছে। বৃষ্টি থেকে বাঁচবার জন্যে শুধু একটা বস্তায় মাথা ঢেকে নিয়েছে। তবুও একদম ভিজে গেছে। গা-মাথা থেকে জল ঝরে পড়ছে, তবু সে খুশি। সে গা-মাথা মুছতে লাগল। বুতো জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়াল। এবং বৃষ্টি সমানে পড়ছে দেখে দারুণ আনন্দিত হল।

'এখনও, এখনও বৃষ্টি পড়ছে। এ যেন আশীর্বাদ! যেভাবে বৃষ্টি হচ্ছে তাতে বেশ মজা লাগছে না?'

তারপর ঘুরে দাঁড়াল বুতো।

বলল—'ঠিক সময়ে তুমি এসেছ! এই দুটো মেয়ে ঝগড়া করার জন্যে মুখিয়ে উঠেছে। আমাদের ছেড়ে চলে যাবে বলে ফ্রানকয়েস তার জমি-জমা ভাগ করে নিতে চাইছে।'

অবাক হয়ে বলল জঁা—'সে কি ? ওর মতন বাচ্চা মেয়ে ?'

ফ্রানকয়েসকে পাওয়ার জন্যে তার ভয়ঙ্কর লালসা গোপনে নিহিত। তাকে চোখের দেখা দেখবার জন্যই ত সে এ বাড়ীতে আসে এবং এরাও তাকে বন্ধু মনে করে। এমনি ধরনের একটা কচি মেয়ের পক্ষে সে যে বেশ বুড়ো তা নিজে মনে করে বলেই ত এতদিন মুখ ফুটে অনুমতি চাইতে পারে নি নইলে সে এর মধ্যে বার কুড়ি বলত যে, সে ফ্রানকয়েসকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু আর দেরী করার কোন মানে হয় না। কেননা ওদেব পনের বছব বয়সের যে ফারাক রয়েছে তা' ত ঘুচবে না। জঁা যে ফ্রানকয়েসকে ভালবেসেছে ওরা কেউ তা সন্দেহ করে না ·না ফ্রানকয়েস নিজে, বা তার দিদি অথবা তার ভগ্নীপতি। তাই ত বুতো তাকে সাদরে এবাড়ীতে অভ্যর্থনা জানায় কেননা এমন একটা পরিণতির ভয় তাব মনে বাসা বাঁধে নি।

বুতো কাঁধ নাচিয়ে পিতৃসুলভ কণ্ঠে বলল—'শিশু ! ঠিক, এই শব্দটাই ওর পক্ষে খাটে।'

কিন্তু ফ্রানকয়েক তখনও কুপিত, তার দৃষ্টি মাটির দিকে নিবদ্ধ।

সে তাগিদ দিল—'আমার ভাগ আমি চাই।'

বুড়ো ফৌআন বলল—'ওর ভাগ বুঝিয়ে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।'

এবার জঁা শান্তভাবে ফ্রানকয়েসেব কব্জি ধবে তাকে কাছে টেনে আনল, তার হাঁটুর কাছে এনে জড়িয়ে ধরল, তাব স্পর্শে জঁায়ের হাত কাঁপছিল। তাকে সদয় কথা বলতে লাগল এবং তাকে এখানে থাকতে অনুবোধ করার সময় তার কণ্ঠস্বর কাঁপছিল। কোথায় সে যাবে ? কোন অপরিচিতদের কাছে ? ক্লয়েস কিংবা শাটোহূনে সে কি কাজ করবে ? যারা তাকে ভালবাসে, যেখানে সে জন্মেছে, বড় হয়েছে, সেখানে থাকাই কি ভাল নয় ? ফ্রানকয়েস তার কথা মন দিয়ে শুনল এবং তাব মনের রাগ পড়ল। সে জঁাকে তার প্রেমিক বলে মনে না করলেও তাব কথা ইচ্ছে করেই শুনল, খানিকটা তার স্বভাবের জন্য এবং খানিকটা তার বন্ধুত্বের জন্য এবং কিছুটা ভয়ের জন্য কারণ সে তাকে খুব চিন্তাশীল বলে মনে করে।

ফ্রানকয়েস কাঁপা কাঁপা গলায় বলল—'আমার ভাগ চাই। বেশ আমি চলে যাব তা' আর বলছি না।'

এবার বুতো বাধা দিয়ে বলল—'বোকা মেয়ে কোথাকার ! থাকছ যখন তখন ভাগ নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছ কেন ? তোমার দিদিব মতন এবং আমার মতন সবই ত পাচ্ছ ! তবে সব কিছু অর্ধেক চাইছ কেন ? না, এটা সত্যিই তোমার বোকামি হচ্ছে। শোন এবার, যেদিন তোমার বিয়ে হবে সেদিন তোমার অংশ ঠিক পাবে।'

জঁা তার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়েছিল, মনে হচ্ছিল যেন তার বুকের ধুকপুকুনি বন্ধ হয়ে গেছে।

'আমার কথা শুনছ? যেদিন তোমার বিয়ে হবে।'

ফ্রানকয়েস জবাব দিল না, গভীর হতাশা তার মন আচ্ছন্ন করেছিল।

'যাও ফ্রানকয়েস, তোমার দিদিকে চুমু দাও। এটাই ভাল ব্যবস্থা।'

লিসা যেন আনন্দিত এক যুবতীর মূর্তি, স্নেহ-ভরা মন! ফ্রানকয়েস তার গলা জড়িয়ে ধরতেই সে কেঁদে ফেলল। বিবাদ মিটতে সময় নিলেও বুতোর মেজাজ শরীফ হয়ে উঠল, বলল, তারা এবার একটু মদ পান করতে পাবে। সে পাঁচটা গ্লাস আনল, একটা বোতলের মুখ খুলল এবং আরও একটা বোতল বার করে আনল। বুড়ো ফৌআনের আবহাওয়া-অভিজ্ঞ মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে উঠল বলতে বলতে যে, যা' কল্যাণকর সে তাই সমর্থন করবে। নারী এবং পুরুষ সবাই মদে চুমুক দিল, পরস্পর পরস্পরের স্বাস্থ্য পান করল।

নিজের নিঃশেষিত গ্লাসটা ঠক্ করে টেবিলে রেখে বুতো বলল—'এ মদটা খাসা হয়েছে। কিন্তু যেরকম বৃষ্টি পড়ছে তার চেয়ে আর কিছু ভাল হয় না। বর্ষণের চেহারাটা একবার দেখ। সারাক্ষণই বৃষ্টি পড়ছে। সত্যিই কি সুন্দর!'

ওরা সবাই জানালার ধারে জমা হল, এক ধরনের ধর্মীয় আনন্দে ওরা উজ্জ্বল। অবিরাম ধীর বর্ষণ তারা নিরীক্ষণ করছে, ওরা যেন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে, এই জীবন-প্রদায়ী বর্ষণধারার নীচে সবুজ গম চারাগুলো দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে উঠছে।

২

গরম কাল। একদিন বুড়ী ফৌআনের শরীর আই-ঢাই করতে লাগল। ওর হাত-পা আর এখন সবল নয়। তাই বড় নাতনি পলমায়ারকে ডেকেছিল ঘরের কাজগুলো করে দিয়ে যাওয়ার জন্যে। রোজকার মতন বুড়ো ফৌআন বেরিয়েছিল ক্ষেত-জমি নিরীক্ষণ করতে। হতভাগিনী মেয়েটার সারা দেহ ভিজে সপ-সপে, হাঁটুদুটো ক্ষত-বিক্ষত, কিন্তু তবু রোজ তাকে মুহূর্তের জন্যেও ছুটি দিতে নারাজ, এবং দু'জনেই একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করে চলেছে।

প্রথমেই সে পলমায়ারের দুর্ভাগ্যের কাহিনী নিয়ে আলোচনা করছিল কেননা তার ভাই হিলারিয়ন এখন তাকে মারধোর করছে প্রায়ই। আধ-পাগলা ছেলেটা এখন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে এবং তার দৈহিক ক্ষমতা সম্পর্কে কোনও জ্ঞান নেই বলে পলমায়ারের আশঙ্কা যে, ছেলেটা হয়ত তাকে কোনদিন খুন করে ফেলবে। মাঝে মাঝে ওকে জোরে চেপে ধরে···ওর হাতের চাপে পাথর গুঁড়ো হওয়ার মতন শক্তি। কিন্তু তবু এ ব্যাপারে পলমায়ার কাউকে মাথা গলাতে দেবে না, ছোট ভাইকে সে দারুণ ভালবাসে তাই বাইরের কেউ তাকে সান্ত্বনা জানাতে এলে সে তাকে তাড়িয়ে দেয়। গত সপ্তাহে ছেলেটা তার দিদিকে খুব মারধোর করছিল এবং তাই নিয়ে সারা রগনি গ্রামে ঢি-ঢি পড়ে গেছে, কেননা গ্রামের লোকজন যখন ছুটে এল, দেখল ছেলেটা তার দিদির

সাথে কুৎসিত কাজে রত।

একটা বিশ্বাস আনার জন্যে রোজ জানতে চাইছিল—'হারে খুকি, ওই জানোয়ারটা বুঝি জোর করে তোর ওপর অত্যোচার করছিল?'

ভিজে পোশাকে হাঁটু গেড়ে বসে ঘর মুছছিল পলমায়ার, থামল। এবং প্রশ্নের জবাব না দিয়ে রেগে টঙ্ হল।

'পরের তা' জানার দবকাব কি? তারা কি আমাদের ঘরে আড়ি পাতছে না-কি? আমরা ত কারো টাকা-পয়সা ছিনতাই করি নি!'

বুড়ী কিন্তু বলতে লাগল—'হায় ঈশ্বর! লোকে যা' বলে সেই মতন তোরা যদি এক সঙ্গে শুয়ে থাকিস তবে সেটা পাপ!'

কয়েক মিনিটের জন্য হতভাগা মেয়েটা নীরব রইল, তার মুখ দুঃখে ম্লান, দৃষ্টি দূরে নিবদ্ধ। তারপর আবার মুখ নামিয়ে রোগা হাতগুলো নেড়ে তোতলাতে তোতলাতে আওড়াল:

'ও, কি করে জানব আমবা যে, এটা মন্দ কাজ? যাজক আমাকে ডেকে বলেছেন যে, আমরা নরকে যাব। কিন্তু হতভাগ্য ছেলেটা যেন না যায়। ফাদার, ও ত নির্দোষী, আমি বলেছি। সপ্তাহ তিনেকের একটা শিশু ছাড়া ও আর কিছু নয়। ওর দেখাশুনা না করলে ও এতদিন মরে যেত। এবং এখনকার অবস্থার চেয়ে সেটা ভাল হত না। এটা আমার ব্যাপার, তাই না? মাঝে মাঝে ওর মধ্যে যে আক্ষেপ দেখা দেয় তার ফলে ও হয়ত একদিন আমাকে গলা টিপে খুন করবে। আমি তখন ভাবব যে, ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করবেন কি-না।'

এ সব সত্য রোজ বহুদিন হল জেনেছে, কাজেই এখন সে নতুন কিছু শুনছে না।

রোজ তাই বিজ্ঞের মতন বলল—'আচ্ছা ব্যাপারটা যদি এই হয় তবে এ আব বদলাবে না। কিন্তু তোমার জীবনটা ত নষ্ট হয়ে গেল, বাছা।'

এবং সে অনুযোগ করল যে, প্রত্যেকেরই বইবার মতন নিজের 'ক্রশ' আছে। নমুনা দেখ, সে এবং তার স্বামী ছেলেমেয়েদের উপর অনুকম্পা দেখিয়ে নিজেদের জমি-জমা সব তাদের ভাগ করে দেওয়ার পর থেকে কি দারুণ দুঃখ দুর্দশা ভোগ করছে। সেই মুহূর্ত থেকে সে আব থামল না। এটাই হল তার সীমাহীন অনুযোগের কারণ।

'হায় ঈশ্বর! এর জন্যে তুমি সামান্য শ্রদ্ধাও আশা করতে পার না। তারা শুয়োরের বাচ্চা তাই তাদের সন্তানরাও শুয়োরেব বাচ্চা। তবু তারা যদি বৃত্তিটা দিত...।'

সে বিশবার বলেছে যে, একমাত্র ডেলহোমি তিন মাস অন্তর অন্তর পঞ্চাশ ফ্রাঙ্ক দিয়ে যায় নিয়মিত। বুতো দেরী করে এবং প্রতিবারই দেওয়ার সময় কিছু কিছু কম দেয়। এই ত এবার দশদিন পার হয়ে গেল...তাই সে বুতোর

জন্যে অপেক্ষা করছে। আজ সন্ধ্যেবেলায় এসে টাকা দিয়ে যাবে বলে কথা দিয়েছে। আর যেসাস ক্রাইস্টের ব্যাপার ত একেবারেই সরল, সে কিছুই দেয় না, আজ পর্যন্ত তারা তার টাকার মুখ দেখে নি।

রাত নামল। ফৌআন রাতের খাবার খাওয়ার জন্যে ঘরে ফিরল। সে যখন টেবিলে মাথা নীচু করে খাচ্ছিল তখন রোজ ফৌআন আবার বক-বক করতে সুরু করল। ঈশ্বরের দোহাই! এটা কি সম্ভব! তাদের কাছে পাওনা ছ শ' ফ্রাঙ্কের মধ্যে ডেলহোমি দিচ্ছে দু'শ', বুতো দেয় একশ র কাছাকাছি আর যেসাস ক্রাইস্ট ত কিছুই দেয় না। অর্থাৎ তারা বৃত্তির মাত্র অর্ধেক পাচ্ছে। এবং হতভাগারা দলিলে শর্ত মেনে সই করেছে এবং এই দলিলও আইন-সিদ্ধ। ওরা ত আইনকেও তোয়াক্কা করছে না।

অবশেষে রোজ উঠল মোমবাতি জ্বালাতে এবং ঠিক সে সময়ে গ্রাণ্ডির বউ তার সেলাই নিয়ে ঘরে ঢুকল। গরম কালের লম্বা দিনগুলোতে আলোর অভাব নেই, কিন্তু বাতির শেষ অংশটাও যাতে পোড়ানর হাত এড়ানো যায় তাই প্রতিদিন এসময় ঘণ্টাখানেক সে ভাইয়ের বাসায় এসে থাকে এবং শেষে বাড়ীতে ফিরে বিছানায় ঢুকে পড়ে। রোজ তখুনি বসে পড়ল এবং পলমায়ারের বাসন-পত্তর মাজা-ধোওয়ার কাজ বাকি ছিল, সে তার দিদিমাকে দেখলেই কেমন বোবা হয়ে যায় তাই একটাও কথা বলল না।

রোজ বলতে লাগল—'দেখ বাছা, গরম জল যদি লাগে ত উনুনে চাট্টি কাঠ গুঁজে দাও।'

মুহূর্তের জন্য সে নিজেকে সংযত করল, অন্য কথার অবতারণা করতে চাইছে, কেননা গ্রাণ্ডির বউয়ের সামনে ফৌআনরা কোনও রকম অনুযোগ করবে না। কেননা জানে যে, ভাগাভাগির জন্যে তারা দুর্ভোগ ভোগ করছে এই স্বীকৃতি শুনলে সে খুশি হবে, সে তাদের ভাগ করতে নিষেধ করেছিল। কিন্তু রোজ নিজেকে সংযত করতে পারল না।

'একে কি জ্বালানীর কাঠ বলে, তুই এক বোঝা উনুনে দিয়ে দে'। মরা ডাল-পালা আর শুকনো ঝোপ-ঝাড়! ফ্যানি নিশ্চয় তার কাঠের ভাঁড়ার সাফ করে কতকগুলো জঞ্জাল পাঠিয়েছে আমাদের জন্যে।'

সামনে টেবিলে এক গ্লাস মদ নিয়ে ফৌআন বুড়ো এতক্ষণ চুপচাপ বসেছিল, শেষ পর্যন্ত এই নীরবতা সে বজায় রাখতে চেয়েছিল, কিন্তু পারল না। দারুণ রেগে বলে উঠল:

'ঈশ্বরের দোহাই! জ্বালানী কাঠের কথা বলা তোমার শেষ হয়েছে? এগুলো যে অতি বাজে কাঠ তাও আমরা জানি। আর এই যে মদ বলে ডেলহোমি আমাকে কদর্য ভিনিগার দিচ্ছে এর জন্যে কি বলতে পারি, ভাব ত?'

মোমবাতির শিখার সামনে গ্লাসটা তুলে ধরে সে দেখতে লাগল।

'দেখ, কি যে বস্তু এর মধ্যে ঢুকিয়েছে! এটা পিপে ধোওয়া জলও নয়!

এবং তবুও সে খুব সৎ লোক বলতে হবে! অন্য দু'জন ত আমাদের তৃষ্ণায় শুকিয়ে মারবে, নদী থেকে এক বোতল জল এনেও ওরা আমাদের দেয় না।'

শেষটায় এক চুমুকে সব মদটা গিলে ও সজোরে থুথু ফেলতে লাগল।

'বিষাক্ত পানীয়! বোধহয় এর অর্থ ওরা আমাকে সোজাসুজি খুন করবে!'

ব্যস! ফৌআন আর রোজ আর কোনও কথা বলল না। তাদের অন্তরের দগদগে ঘায়ে যেন মলম পড়ল, সোয়াস্তি পেল তারা, একে একে তারা তাদের অভিযোগ বার বার বলতে লাগল। যেমন, সপ্তাহে দশ লিটার দুধ দেওয়ার কথা, প্রথম প্রথম তারা পেত ছ' লিটার, এবং তারপর দুধ ত ধর্মযাজকের হাত ঘুরে আসে না তবে খৃষ্টীয় দুধ পাচ্ছে কেননা জল দিয়ে এই দুধের ধর্মান্তকরণ করা হয়েছে।

গ্রাণ্ডির বউ এতক্ষণ মুখ খোলে নি, শুধু একবার এর আর একবার ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছিল তার শকুন-চোখের দৃষ্টিতে।

সে বলল—'এ ত তোমাদের দোষ বাপু!'

কিন্তু ঠিক সেই সময় বুতো এসে ঘরে ঢুকল। পলমায়ারের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল, রোজের দেওয়া পনেরটা পয়সা নিয়ে সে সরে পড়বার সুযোগ খুঁজছিল। ঘরের মধ্যে নিথর-দেহে বুতো দাঁড়িয়েছিল··· সত্যিকারের একজন চাষী প্রথমেই কথা বলার জন্য উদ্বিগ্ন হয় না। দু মিনিট সময় পার হল। ওর বাবাই প্রথম কথা সুরু করতে বাধ্য হল।

'তাহলে তুই মনস্থির করেছিস। ভাল! তোর জন্যে আজ দশ দিন আমরা অপেক্ষা করে আছি।'

বুতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সামনে পিছনে দুলতে লাগল।

'যখন আসতে পারি তখন আসি। আমরা সবাই জানি রুটির কোন ধারে মাখন মাখানো।'

ধীরে ধীরে বুতো নিজের পকেটে হাতড়াল। ভুরু কুঁচকে একবার গ্রাণ্ডির বউয়ের দিকে তাকাল, তার উপস্থিতি মনে হল তাকে অপ্রতিভ করল। হাতের সেলাই থামিয়ে রোজ অর্থগুলো দেখবার আশায় ছেলের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। বাপ আর মা দু'জনেরই ছেলের হাতের দিকে সাগ্রহ নজর। এবং যেহেতু তিন জোড়া চোখের নজর তারই দিকে নিবদ্ধ, তাই সে অনিচ্ছার সাথে পকেট থেকে পাঁচ ফ্রাঙ্ক প্রথম বার করল।

টেবিলের উপর মুদ্রাগুলো রেখে সে বলল—'এই প্রথম।'

অন্যরা ধীরভাবে তাকে দেখছিল ··ধীরতা ক্রমে ক্রমে বাড়ছিল। কাঁপা কাঁপা গলায় বুতো মুদ্রাগুলো গুণল। পাঁচটা গুণবার পর থামল এবং তারপর আর একটা খোঁজবার জন্যে পকেটে হাত ঢোকাল। এবার বেশ জোরালো আর কঠিন গলায় আওড়াল:

'এই ছয় হল!'

ফৌআন অপেক্ষা করছিল, কিন্তু আর একটাও মুদ্রা বেরোল না।

অবশেষে তার বাবা বলল—'কি বলছিস তুই, কেবল ছ'টা? তোকে দশ দিতে হবে। তুই কি আমাদের বোকা ঠাওরেছিস? গত তিন মাসে চল্লিশ দিয়েছিস, আর এবারে দিচ্ছিস তিরিশ?'

সহসা বুতো বিলাপ করতে সুরু করল, অবস্থা ভাল যাচ্ছে না। গমের দাম আবার পড়ে গেছে, যব ভাল হয় নি। ঘোড়াটার পেট ফুলে উঠেছে এবং দু'বার পশু চিকিৎসককে ডাকতে হয়েছে। কি করে যে সব খরচ কুলোবে তা বুঝতে পারছে না, তার সব শেষ হয়ে যাবে।

ভীষণ রেগে বলল বুড়ো—ওসব আমার জানার কথা নয়। আমার পঞ্চাশ ফ্রাঙ্ক দিয়ে দে,' নইলে আমাকে মামলা করতে হবে।'

কিন্তু সে শেষ পর্যন্ত তিরিশ ফ্রাঙ্ক নিয়েই শান্ত হ'ল এবং বলল যে, নতুন একখানা রসিদ লিখে দেবে।'

'আসছে সপ্তায় বাকি কুড়ি ফ্রাঙ্ক দিয়ে যাবি। কাগজে আমি লিখে দেব।'

বুতো ঝটিতি হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে মুদ্রাগুলো তুলে নিল।

'না না, তা হবে না। এতেই শেষ করতে চাই। রসিদ যেমন আছে তেমনি থাক, নইলে এই চললাম, হায় ঈশ্বর! তোমাদের কাছে ধার আছে বলে আমার যা' আছে সব দিয়ে দিতে হবে!'

দারুণ তর্ক সুরু হল। বাপ আর ছেলে দু'জনেই জেদী। ওরা একই কথা বার বার বলতে লাগল। বাপ সোজাসুজি মুদ্রাগুলো নিয়ে পকেটে রাখে নি বলে রেগে গেল আর ছেলে মুদ্রাগুলো হাতের মুঠোয় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, পুরো রসিদ না পেলে কিছুতেই দেবে না। আর তার মা আবার স্বামীর জামা টেনে ধরল কিন্তু সে ছাড়িয়ে নিল জামা।

'ঠিক আছে, চোর কোথাকার! এই নে তোর রসিদ! ওটা তোর মুখের উপর ছুঁড়ে দেওয়াই উচিৎ ছিল। আমার টাকা দিয়ে দে।'

হাতে হাতে বিনিময় হল। এবং দেওয়া-নেওয়া শেষ হতেই বুতো হাসতে লাগল। সে খুব খুশি তাই খোশ মেজাজে বেরিয়ে গেল। প্রত্যেকের কাছে বিদায় নিল। ফৌআন টেবিলের পাশে ক্লান্তদেহে ভেঙে পড়ল। রোজ আবার সেলাই হাতে তুলে নেওয়ার আগে গ্রাণ্ডির বউ কেবল দুটো শব্দ ফিস্ ফিস্ করে আওড়াল:

'রক্তচোষা বোকা!'

ঘরের মধ্যে আবার নীরবতা নামল। তারপর দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল যেসাস্ ক্রাইস্ট। বোলডি তাকে সাবধান করে দিয়েছে যে, তার ভাই আজ সন্ধ্যেবেলা টাকা দেবে, তাই সে রাস্তায় দাঁড়িয়ে নজর রেখেছিল, ভাইয়ের বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করছিল। তাকে দয়ালু মনে হচ্ছে।

কাল প্রচুর মদ গিলেছিল তাই আজ বেশ খোশ্‌ মেজাজে রয়েছে। চৌকাঠ পেরিয়ে ঘরে ঢুকতেই টেবিলের উপর রাখা মুদ্রাগুলোর উপর ওর নজর পড়ল কেননা ফৌআন হঠকারীর মতন মুদ্রাগুলো টেবিলের উপরই ফেলে রেখেছিল।

ছেলেকে দেখে রোজ ভারি খুশি। বলল—'কি হায়াসিনথ এলি!'

'হাঁ, আমি এসেছি। তোমরা ভাল আছ ত।'

সে এগিয়ে এল। রূপোর মুদ্রাগুলোর উপর তার দৃষ্টি নিবদ্ধ, মোমবাতির আলোয় ওগুলো চাঁদের মতন ঝিকমিক করছে। ঘুরে দাঁড়াল ওর বাবা। দেখল, ছেলের নজর এবং টেবিলের উপর পড়ে থাকা মুদ্রাগুলো। ফৌআন সহসা উদ্বিগ্ন হল। তাড়াতাড়ি একখানা ডিস দিয়ে সে মুদ্রাগুলো ঢাকা দিতে চাইল কিন্তু তখন বড় দেরি হয়ে গেছে। রক্তচোষা বোকা, নিজের অসাবধানতার জন্য নিজের উপর রাগ হল। ঠিক বলেছে গ্রাণ্ডির বউ।

এবার জানোয়ারের মতন ফৌআন বলে উঠল—'ভালই হয়েছে, তুই টাকা দিতে এসেছিস্‌। নইলে ভাবছিলাম, কাল তোর পিছনে পেয়াদা লেলিয়ে দেব। কথাটা এই মোমবাতির আলোর মতনই সত্যি।'

'যেসাস্‌ ক্রাইস্ট' নম্রভাবে বিলাপ করতে করতে বলল—'হাঁ, বোলডিও তাই বলল। তোমাদের কাছে এলাম। আমাকে ত তোমরা মেরে ফেলতে চাও না, চাও কি? তোমাদের টাকা দেব কোথা থেকে? বেঁচে থাকার মতন রুটিই জোটাতে পারছি না। সব বেচে দিয়েছি। সত্যি ঠাট্টা নয়, বানানো গল্প বলছি যদি মনে করে থাক ত চল আমার সঙ্গে। দেখবে চল। চাদর নেই বিছানায়, নেই কোন আসবাব, একেবারে কিছু নেই। আর অসুখও করেছে আমার।'

করুণায় ভরে গেল রোজের সারা মন। কিন্তু ফৌআন দারুণ রেগে উঠল।

'কুঁড়ের বাদশা! নিষ্কর্মার ঢেঁকি! মদ গিলে সব ওড়ালি তুই! এ তোর শ্রাদ্ধ তুই করবি। এমন খাসা জমি, বছরের পর বছর ওই জমি আমাদের পরিবারের হাতে ছিল, আজ তুই সেই জমি বাঁধা দিয়েছিস! হাঁ, তুই আর তোর ওই ধিঙ্গি মেয়ে, কয়েক মাস তোরা বেশ মজাসে ছিলি, এখন সব রেস্ত ফুরিয়েছে। ঠিক আছে, এখন থাক্‌ না খেয়ে।

যেসাস্‌ ক্রাইস্ট আর দ্বিধা করল না, ফোঁপাতে লাগল।

'না বাবা, ওভাবে বলো না। নিজের ছেলেকে বিমুখ করা অন্যায়। আমার মন মেজাজ এখনও ভাল আছে, শেষে বিগড়ে যাব। এমন ত নয় যে, তোমার হাতে টাকা নেই। তোমার যখন হাতে টাকা আছে তখন ছেলেকে কিছু দান করতেই ত পার। বিমুখ করা কি উচিত? আমি কি অন্য লোকের কাছে হাত পাতব! তাহলে কি সেটা খুব ভাল হবে! খুব ভাল!'

কাঁদতে কাঁদতে সে বলছিল, কিন্তু একটা চোখ সব সময় ছিল প্লেটের দিকে,

আর বুড়ো ফোঁআনের সারা দেহ কাঁপছিল। তারপর তার যেন শ্বাসরোধ হয়ে যাচ্ছে এমন একটা ভাণ করল যেসাস্ ক্রাইস্ট কেউ বুঝি তাকে খুন করছে তাই তীব্র চিৎকার করে উঠল। ছেলের এই ফোঁপানি শুনে রোজের হৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠল, ফোঁআনের হাত জড়িয়ে ধরে সে অনুনয় করল :

'ওগো, দেখ…।'

কিন্তু ফোঁআনের মনে তখনও লড়াই চলছিল। তাই ওর অনুনয়ে রাজী হল না।

বাধা দিয়ে বলল—'না না, ও আমাদের দিকে তাকায় না। বদমাস মাগি, তুই চুপ করবি? এভাবে চিল্লাবার কি দরকার? পড়শীরা সব ছুটে আসবে এখুনি। তুই আমাদের মাথা খারাপ করে দিবি, দেখছি!'

এতে মাতালের ফোঁপানি আরও বেড়ে গেল এবং সে চিৎকার করে কাঁদতে লাগল।

'তোমাকে ত এখনও বলি নি, কাল পেয়াদা আসছে আমার জমি-জমা সব ক্রোক করতে। হাঁ, একটা দেনার মামলা। লাম্‌বুরদির জন্যে সই দিয়েছি। একটা শুয়োরের বাচ্চা আমি। তোমার অসম্মান করেছি। আত্মহত্যা করব। শুয়োরের বাচ্চা আমি। নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে ডুবে মরব। জল খেয়ে পেট ঢাক হয়ে উঠবে, আর জীবনে জল খেতে হবে না। যদি না তিরিশ ফ্রাঙ্ক পাই তবে!'

এই দৃশ্য দেখে ফোঁআন ঘাবড়ে গেল। তিরিশ ফ্রাঙ্কের কথা শুনে সে লাফিয়ে পড়ে প্লেটখানা সরিয়ে দিল। বদমাসটার নজরে ঠিক পড়েছে মুদ্রাগুলো, সে ওগুলো গুণছে…কাজেই ওগুলো এখানে রেখে দেওয়ার কি সার্থকতা আছে।

'তুই সব চাইছিস! হায় ভগবান, এটা অন্যায় আবদার। এখানে এসে তুই আমাকে বিরক্ত করছিস! অর্ধেক নিয়ে এখান থেকে ভাগ, আর কখনো এ মুখো হবি না।'

তৎক্ষণাৎ সুস্থ হল হেসাস্ ক্রাইস্ট, মুহূর্ত মধ্যে তার মধ্যে প্রতিক্রিয়া দেখা গেল।

বলল—'পনের ফ্রাঙ্ক! না, ওতে হবে না। ওটা কুড়ি ফ্রাঙ্ক কর এবং তাহলে চলে যাব।'

তারপর মুদ্রাগুলো যখন তার পকেটে নিরাপদে স্থান নিল তখন সে ওদের বলে আনন্দ দিল কিভাবে সে বেকুকে ঠকিয়েছে। এ্যাজর নদীতে বে-সরকারী জায়গায় সে লুকিয়ে মাছ ধরছিল ছিপ ফেলে, এমনভাবে সে মাছ ধরছিল যে, কনস্টেবল বেকু তাকে ধরতে আসতেই সে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল।

দরজাটা বন্ধ করে সে চলে যেতেই রোজ বলল—'ছেলেটার অন্তঃকরণ খুব সাদা।'

গ্রাণ্ডির বউ তার সেলাইয়ের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে চলে যাওয়ার জন্য

উঠে পড়ল। সে তার ভাজের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল, এবার তাকাল ভাইয়ের দিকে।

অনেকক্ষণ মনে মনে রাগ চেপে রেখেছিল। বলল—'রক্তচোষা বোকার দল, এক পয়সাও দেব না। আমার কাছে কখনও কিছু চাইবে না।'

তারপর সে চলে গেল। বাইরে বেরোতেই বুতোর সাথে তার দেখা হল। সে ম্যাকেরণের দোকান থেকে সোজা এখানে আসছে। খানিক আগে সে খোশ মেজাজে যেসাস্ ক্রাইস্টকে দোকানে ঢুকতে দেখেছে, তার পকেটে শুনেছে টাকার ঝনঝনানি। কি যে ঘটেছে এখানে তাও সে খানিকটা সন্দেহ করেছে।

গ্রাণ্ডির বউ তাকে বলল—'হাঁ। ওই নিরেট বোকাটা তোর দেওয়া টাকাগুলো নিয়ে চলে গেছে। তাই দিয়ে ও মদ গিলবে। তোর জন্যে ওদেব মাথা ব্যথা নেই।'

বুতোর মেজাজ গেল বিগড়ে, সে সজোরে কৌআনের দরজায় ঘুষি মারল। ওরা যদি দরজা না খোলে তবে সে দরজা ভেঙে ঢুকবে। দুই বুড়ো-বুড়ী ইতিমধ্যে বিছানায় শোবার জন্যে তৈরী হয়েছে। তার মা মাথার রুমাল খুলে, পোশাক বদলে শুধু পেটিকোট পরেছে। তার পাকা চুলের গোছা ঝুলে পড়েছে কপালের উপর। ওরা দরজা খুলে দিতেই বুতো সজোরে ঘরে ঢুকে ওদের মাঝখানে দাঁড়াল। চাপা কণ্ঠস্বরে গর্জে উঠল—'আমার টাকা! আমার টাকা কই!'

ওরা দারুণ ভয় পেয়ে সরে দাঁড়াল। ওদের দু'চোখে তখন ঘুম জড়ানো, প্রথমে ওরা ব্যাপারটা বুঝতেই পারল না।

'তোমরা কি চাও ওই নোংরা দাদার জন্যে আমি না খেয়ে মরব? ও নিষ্কর্মা, সামান্য কাজও করবে না, আর ওকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে আমি খাটব। না আমি তা পারব না।'

এবার ওর বাপের মেজাজও বিগড়ে গেল।

'ব্যস! যথেষ্ট হয়েছে। শুনতে পাচ্ছিস? এতে তোর কি হয়েছে? তোর টাকা ত এখন আমার। আমি তা' নিয়ে যা ইচ্ছে করতে পারি।'

বুতো এবার বাপের দিকে তেড়ে এল। মুখখানা সাদা, দু'হাতে মুঠো পাকানো। বলল—'কি বলছ তুমি? তুমি আমাকে সর্বস্ব দিতে বলছ? আমার মনে হয়, এটা তোমার একটা নোংরা চালাকি। হাঁ, সত্যিই নোংরামি। তোমার কাছে লুকোন টাকা থাকা সত্ত্বেও তুমি ছেলেদের কাছ থেকে টাকা আদায় করছ। জানি, তোমার টাকা লুকোন আছে।'

বুড়ো দারুণ অবাক হয়ে গেল এবং ভীষণভাবে প্রতিবাদ করল, তার গলার স্বর কাঁপতে লাগল, তার দেহের শক্তি যেন ফুরিয়ে গেছে, নিজের মনের কর্তৃত্বভাব আর ফিরিয়ে আনতে পারছে না—পারছে না ছেলেটাকে বাড়ী

থেকে তাড়িয়ে দিতে।

'না না। আমার কিছু লুকোন নেই। তুই বেরিয়ে যাবি ?'

'ধর আমি যদি খুঁজে পাই! ধর শুধু!' বুতো আবার বলল। সে এর মধ্যে ড্রয়ার খুলে হাতড়াচ্ছে। দেওয়ালে টোকা মেরে দেখছে।

রোজ এবার ভয় পেল। তার ভয় হল, বাপ আর ছেলে হয়ত এখুনি মারামারি সুরু করবে। সে বুতোর কাঁধ চেপে ধরল।

রোজ তো-তো করে বলল—'হতভাগা ছেলে, তুই কি আমাদের খুন করবি ?'

এবার বুতো মায়ের দিকে ফিরল। মায়ের কব্জি চেপে ধরল এবং তার দারিদ্র্য-শীর্ণ শুকনো মুখের দিকে চোখ তুলে চিৎকার করে উঠল :

'তোমার দোষ! তুমিই হায়াসিনথকে টাকা দিয়েছ! বুড়ী মাদি কুকুর, তুমি কোন দিন আমায় হু'চোখে দেখতে পার না!'

এবং জোরে মা-কে ঠেলে ফেলে দিল। দেওয়ালে সজোরে মাথা ঠুকে যেতেই রোজ মেঝের উপর লুটিয়ে পড়ল। চাপা কণ্ঠে বুড়ী কেঁদে উঠল। একটা ভাঙ্গা জিনিসের মতন মেঝের উপর পড়ে রইল, মুহূর্তের জন্য বুতো তার দিকে তাকাল। শেষে পাগলের মতন সজোরে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে পালাল।

বলে গেল—'এখানটা একটা নরক! রক্তাক্ত নরক!'

পরের দিন রোজ নিজের বিছানা ছেড়ে উঠতেই পারল না। ডাক্তার ফিনেতকে খবর দেওয়া হল। তিনি বার তিনেক এলেন কিন্তু তার যন্ত্রণার উপশম করতে পারলেন না। তৃতীয় বারের বার এসে ডাক্তার দেখলেন যে, রোজ মরতে চলেছে। তিনি ফৌআনকে এক পাশে ডেকে নিয়ে বললেন যে, সে যদি বলে ত তিনি 'ডেথ-সারটিফিকেট্' লিখে দিয়ে যেতে পারেন। তাহলে আর তাঁকে কষ্ট করে আসতে হবে না। দূর-প্রান্তের গ্রামগুলোতে তিনি এ ধরনের কথা বলেই থাকেন। তবু কিন্তু রোজের মৃত্যু অনেক পরে হল। ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করতে ডাক্তার জবাব দিয়েছিলেন যে, বয়স হওয়ার এবং খাটুনির জন্য সে মরছে। দেহ শুকিয়ে গেলে কেউ বাঁচে না। কিন্তু রগনি গ্রামে সবাই যখন এ কাহিনী শুনল, তারা বলল যে, তার গায়ের রক্ত জমে গেছে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় বহু লোক যোগ দিয়েছিল। বুতো এবং পরিবারের অন্য সবাই দারুণ শ্রদ্ধা জানাল।

কবরখানায় কবরে মাটি ভরা হল। একা বাড়ী ফিরে এল ফৌআন। এই সেই বাড়ী এখানে তারা একসাথে পঞ্চাশ বছর ধরে বাস করেছে। জ্বালা-যন্ত্রণা ভোগ করেছে। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এক টুকরো রুটি আর পনীর খেয়ে নিল। তারপর ফাঁকা বাড়ী আর বাগানে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল· নিজেকে সে কিভাবে সান্ত্বনা দেবে বুঝতে পারছে না। আর কিছুই ত করবার নেই, এবার বাড়ী থেকে বেরিয়ে নিজের পুরোন ক্ষেত-জমির দিকে পা চালাল ··ওখানে সে দেখতে চায় যে, বীজের অঙ্কুর মাথা তুলেছে কি-না!

৩

সে-বছর রাতে বড় গরম পড়তে লাগল, তাই জাঁ আস্তাবলের কোণায় তার বিছানায় সব রাতে ঘুমোতে পারছিল না। আস্তাবল থেকে বেরিয়ে পুরো পোশাক পরেই সে উঠোনে পাথর বাঁধানো চত্বরে শুয়ে থাকত। ঘোড়াব গায়ের অসহ্য গরম কিংবা মলের গন্ধেই কেবল যে সে বাইরে চলে যেত তা নয়, সে আসলে ঘবে ঘুমোতেই পারছিল না। কেননা ফ্রানকয়েসের স্মৃতি অনবরত তার মনের পটে ভেসে উঠছিল এবং তার মন আবিষ্ট হয়ে পড়ছিল চিন্তায় চিন্তায়···ফ্রানকয়েস তার কাছে এসেছে, সে তাকে কাছে টেনে নিয়েছে, তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করেছে। আজকাল জ্যাকুলিন ভিন্ন জায়গায় তাকে ছেড়ে টোপ ফেলছে। তাই তার ভালবাসা এই মেয়েটিকে ঘিরে দুর্দমনীয় লালসায় পরিণত হচ্ছে। আধা ঘুমে জাঁ প্রতিরাতে বারবার ছটফট করে আর মনে মনে শপথ করে, কালই গিয়ে সে মেয়েটাকে বুকে জড়িয়ে ধরবে। কিন্তু সকালে উঠে যেমনি সে এক বালতি ঠাণ্ডা জলে মাথা ধুয়ে ফেলে অমনি রাতেব ধারণাটা তার মাথা থেকে উবে যায়, তার মনে শিহরণ জাগে, না না, মেয়েটাব পক্ষে সে খুবই বয়স্ক। তবু সেদিন রাতেই আবার তাব মনে অস্থিবতা সুরু হয়।

ফসল কাটার মজুররা আসতে আরম্ভ করেছে···ওদের দলে একটা যুবতীকে জাঁ চিনতে পারল, বছর দুয়েক আগে ওই যুবতীকে সে ধর্ষণ করেছিল, তাকে নিয়ে বিছানায় শুয়েছিল। যুবতীটি তখন ছিল একটা বাচ্চা মেয়ে। এক সন্ধ্যে বেলায় তার কাম-লালসা এত তীব্র হয়ে উঠেছিল যে, সে চুপিচুপি ভেড়ার খোঁয়াড়ে ঢুকে যুবতীর পা ধরে টেনেছিল। যুবতী শুয়েছিল তাব স্বামী আর ভাইয়ের মাঝখানে· পুরুষ দু'জন হাঁ করে নাক ডাকাচ্ছিল। একটুও প্রতিবাদ করল না যুবতী, তার কাছে ধরা দিল। শ্বাসরোধকারী অন্ধকার। চষা মাটির উপর খড় বিছানো। সেই রাতে ওরা পরস্পরের সঙ্গে দুরন্ত কাম-কেলিতে রত হল। ভেড়ার প্রস্রাবের এ্যামোনিয়া গ্যাসের তীব্র গন্ধে তাদের দু'চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। এরপর তিন সপ্তাহ ধরে প্রতি রাতে এই যুবতীর সঙ্গে সে কাম-ক্রীড়া করল।

শেষ দিনগুলোতে গরম আবহাওয়া আরও তীব্র হয়ে উঠল। বিশেষ করে, এক দিন জাঁ গাড়ী করে বুতোর ক্ষেতের কাছে ফসলের আঁটি বয়ে আনছিল, খামারের জমির সব ফসল এখানেই গাদা করা হবে। প্রায় ফুট পঁচিশ উঁচু হবে গাদাটা···অন্তত হাজার তিনেক আঁটি থাকবে ওখানে। খরায় গমের গাছ ভঙ্গুর হয়ে গেছে, নিথরভাবে গমের শিষগুলো কেবল দাঁড়িয়ে আছে। মাথার উপর বাতাসে গরম হলকা। রোদ যেন জ্বলছে···পোড়াচ্ছে গমের গাছগুলো ···চোখে পড়ছে তাতারসির কাঁপন। বাতাস ঠাণ্ডা করার মতন এতটুকু ছাওয়া নেই কোথাও, কিছু নেই শুধু মাঠে মাঠে চাষীদের দেহের বেঁটে বেঁটে ছায়া

ছাড়া। এই জলন্ত আকাশের নীচে সে সকাল থেকে তার গাড়ী ভরে গমের আঁটি বয়ে আনছে আর আঁটি নামাচ্ছে। ঘাম ঝরছে তার দেহ থেকে, মুখে রা নেই। কিন্তু প্রতিবার গাড়ী আনার সময় ফ্রানকয়েসকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। বুতো গম কাটছে আর তারই পিছনে খুব নীচু হয়ে কোমর বেঁকিয়ে ফ্রানকয়েস গমের আঁটি বাঁধছে।

তাকে সাহায্য করার জন্য বুতো আজ পলমায়ারকে ভাড়া করেছে। ফ্রানকয়েস খুব খাটতে পারে না। আর লিসাকে ত কাজে ডাকাই যায় না, কেননা সে আট মাসের পোয়াতি। এতেই আরও বুতোর মেজাজ চড়ে গেছে। এত সতর্ক ছিল সে তবু কি করে যে এই বাচ্চাটা পেটে এল! সে বউকে খিস্তি করে এবং ইচ্ছে করেই মাগি এমনটা বাধিয়েছে বলে দোষ দেয়—এমনভাবে গাল দেয় যেন একটা ভিখিরি কিংবা ছাড়া-জানোয়ার সব লুটে-পুটে খেতে তার বাড়ীতে ঢুকেছে। আট মাসের পোয়াতি লিসার জয়ঢাকের মতন ফোলা পেট দেখে ওকে খিস্তি না করে বুতো থাকতে পারে না।

'তুই আর তোর এই ফোলা পেট! মাগি এমন বোকামি করলি কি করে! আমার সর্বনাশ করবি দেখছি!'

সকালের দিকে অবশ্য লিসা মাঠে খাটতে এসেছিল, কিন্তু বুতো তাকে বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছে। অত বড় ভারি পেটটা নিয়ে নটর-বটর করতে দেখে বুতোর মেজাজ চড়ে গিয়েছিল। বেলা চারটের সময় লিসা তাদের জন্যে কিছু খাবার নিয়ে আবার মাঠে আসবে।

ক্ষেতের একটা দিকের ফসল আজ কেটে ফেলবে ঠিক করেছে বুতো। এক সময় সে বলে উঠল—'হায় ঈশ্বর! রোদে আমার পিঠ পুড়ছে! জিভ শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে!'

সে পিঠ সোজা করে দাঁড়াল। দু পা পোতা ভারি মোটা চামড়ার জুতোয়, পরনের মোটা কাপড়ের পাৎলুনের উপর বোতাম-খোলা জামাটা আধাআধি ঝুলছে। বুক থেকে নাভিমণ্ডল পর্যন্ত লোমগুলো পড়ছে নজরে।

'আর একবার মদ গিলতে হবে দেখছি!'

ঠাণ্ডা রাখবার জন্যে একটা মদের বোতল বুতো জামার পকেটে রেখেছিল, সেটা বার করল। তারপর সেই উত্তেজক মদ বোতল থেকে দু চুমুক পেটে পড়তেই মেয়েটার কথা তার মনে পড়ল।

'কি গো, তোমার তেষ্টা পায় নি, বুঝি?'

'হাঁ, পেয়েছে।'

ফ্রানকয়েস বোতলটা হাত বাড়িয়ে নিল। প্রাণভরে মদ গিলল। তার মুখে ঘৃণার চিহ্নমাত্র নেই। সে পিছনে ঝুঁকল। অমনি তার স্তন দুটো যেন কাপড়ের বাঁধন ফুঁড়ে বেরিয়ে পড়ার জন্যে ছটফটিয়ে উঠল। বুতো তাকাল তার দিকে। ফ্রানকয়েসের পরনে ছাপা ক্যালিকো কাপড়ের পোশাক। অগোছাল।

তারও সারা দেহ দিয়ে ঘাম গড়াচ্ছে। স্তন-বন্ধনীর উপর দিকটা খোলা, করসা গা আদুল তাই। নীল রুমালে মাথা আর ঘাড় ঢাকা বলে ভাবলেশহীন চোখ দুটো খুব বড় দেখাচ্ছে।

আর একটিও কথা না বলে বুতো আবার কাজ সুরু করল। কোমর নুইয়ে হাতের কাস্তে দুলিয়ে সে গম-গাছগুলো মুঠোয় ধরে কাটছে আর প্রতি পদক্ষেপে ফসল কাটার সময় কাস্তের সর-সর আওয়াজ হচ্ছে। ফ্রানকয়েসও শরীর দ্বিগুণ নুইয়ে কাটা ফসলের আঁটি মুঠো করে বেঁধে রাখছে।

এক সময় বুতো আবার সোজা হয়ে দাঁড়াল, হাতের পিঠে কপালের ঘাম মুছল। পিছন দিকে তাকিয়ে দেখল, অনেকটা পিছিয়ে পড়েছে ফ্রানকয়েস। তার পাছা আকাশমুখী, মাথা একদম মাটিতে নোয়ানো…ঠিক যেমন কোনও নারী পুরুষেব কাছে ধরা দেয় কাম-ক্রীড়ার আগে। অমনি বুতোর জিভ যেন আরও শুকিয়ে গেল।

সে মোটা গলায় ডাকল—'কই গো শামুক-সুন্দবী, এদিকে এস। কিছু না করে দাঁড়িয়ে থেক না।'

নীল আকাশ বিবর্ণ, ধীরে ধীরে সাদা গরম ধাতুর পাতে পরিণত হচ্ছে… আর প্রজ্জ্বলন্ত রোদ ক্রমে ক্রমে উত্তপ্ত রক্তিম হয়ে উঠছে। দুপুবের খাওয়া ওরা শেষ করল। আহাবেব পর ক্লান্ত দেহে ঘুম জড়িয়ে আসছে। কাছেই ডেলহোমি তার মজুবদের নিয়ে শস্তের গাদা বানাচ্ছিল। ওদের গাদাটা দেখতে হচ্ছিল একটা মৌচাকের মতন। চারটে আঁটি নীচে আর একটা উপরে ছাদের মতন। ওরা এর মধ্যেই চোখের আড়ালে চলে গেছে…হয় ত কোন খাদে কিংবা অন্য কোথাও ঘুমোচ্ছে। এক মুহূর্তের জন্য বুড়ো ফৌআনকে দেখা গেল সে দাঁড়িয়ে আছে। দিন পনেব আগে ফৌআন তার বাড়ী বিক্রী কবে দিয়েছে। এখন থাকে জামাইয়ের বাড়ীতে। কিন্তু সেও এখন শুয়ে পড়েছে কোথাও তাই আব তাকে নজরে পডছে না। শূন্য দিগন্ত পটে শুধু নজরে পড়ছে গ্রাণ্ডির বউয়ের নিকষ কালো দেহ-কাঠামো। লাঠি হাতে সে তার মজুরদের দিয়ে শস্তের গাদা তৈরী করাচ্ছে। তার দেহ যেন বয়সে জীর্ণ একটা শুকনো গাছ…রোদের ভয় থেকে তাই মুক্ত। সে সোজা দাঁড়িয়ে আছে। দেহে এক ফোঁটাও ঘাম নেই কোথাও, অন্য লোকগুলো ঘুমুচ্ছে তাই দারুণ রাগান্বিত।

ফ্রানকয়েসেব দিকে তাকাল বুতো। বলল—'হায় ঈশ্বর! রোদে চামড়া আমার ফেটে যাচ্ছে। ঘুমোবার কি করবে?

এধারে ওধারে এক ফোঁটা ছায়া খুঁজল, কিন্তু না, কোথাও কিছু নেই। রোদ খাড়াভাবে ঝরে পড়ছে, তাই কোথাও কোন আশ্রয় নেই। অবশেষে ওর নজরে পড়ল ক্ষেতের শেষে শস্তের গাছ এখনও কাটা হয় নি। ওখানটায় একটা খাদের সৃষ্টি হয়েছে…ছোট একটুখানি ধূসর ছায়াও পড়েছে।

বুতো চেঁচিয়ে বলল—'কি গো পলমায়ার, আমাদের মতন বিশ্রাম

করবে না কি ?'

পঞ্চাশ পা দূরে পলমায়ার কাজ করছিল, এমন ক্ষীণকণ্ঠে সে জবাব ছুঁড়ে দিল যে ওরা তা প্রায় শুনতেই পেল না।

'না না, আমার সময় নেই।'

এখন আর তারা নড়ছে না, তাদের দেহ নিথর। ঘাম ঝরছে। মুখে রা নেই। ওরা চোখ বন্ধ করল। সহসা গাঢ় ঘুম ওদের দেহ আবৃত করল এবং ঘণ্টাখানেক ওরা ঘুমিয়ে নিল। ওদের নিথর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে ঘাম ঝরছিল অবিরাম। ভারি, গরম ফারনেসের মতন হাওয়ার ঝাপটা। চোখ মেলেই ফ্রানকয়েস দেখল বুতো তার দিকে পাশ ফিরে শুয়ে লোভীর মতন তাকিয়ে আছে। সেও চোখ বন্ধ করে ভাণ করল যেন সে আবার ঘুমিয়ে পড়েছে। যদিও বুতো মুখে কিছু বলছে না, কিন্তু ফ্রানকয়েস অনুভব করছে যে, সে তাকে চাইছে, সে তাকে বড় হতে দেখেছে এবং বুঝতে পেরেছে যে, সে এখন যুবতী। এই চিন্তায় ফ্রানকয়েস শঙ্কিত হয়ে উঠল। ওই শুয়োরের বাচ্চা সাহস করে তার দিকে হাত বাড়াবে না-কি ? আর সে যে প্রতি রাতে তার দিদির উপর কাম-ক্রিয়ার অত্যাচার চালায় তা ত জানে ফ্রানকয়েস। ও যেন কাম-উত্তপ্ত একটা মদ্দা ঘোড়া, এর আগে ওর উপর এত রাগে নি সে। ও সাহস করে হাত বাড়াবে না-কি ? এবং ওরই জন্যে সে অপেক্ষা করতে লাগল। অবচেতন মনে সে কি ওকেই চাইছে। মনে মনে ঠিক করল, ও যদি তার দেহ স্পর্শ করে তবে সে ওর গলা টিপে ধরবে। সহসা ফ্রানকয়েস যেমনি চোখ বন্ধ করল অমনি বুতো হাত বাড়িয়ে তাকে ধরল।

ওকে ঠেলে দিয়ে ফ্রানকয়েস বাধ বাধ স্বরে বলে উঠল—'শুয়োরের বাচ্চা কোথাকার !'

'বোকামি কর না ! এস, করবে না কেন ? বলছি, ওরা সবাই ঘুমোচ্ছে, কেউ দেখবে না।'

ঠিক সেই সময়ে মৃত্যুর মত সাদা পলমায়ারের মুখখানা গম গাছের আড়াল থেকে নজরে পড়ল। ওদের কণ্ঠস্বর শুনে সে এদিকে এসেছে, কিন্তু এসব পলমায়ার নজর তুলে দেখলই না—যেন একটা গোরু তাদের দিকে কেবল ঘাড় বাড়িয়েছে। এবং সত্যিই সে আবার তার কাজ করতে চলে গেল। একেবারেই সে উদাসীন। প্রতিবার সে কোমর নুইয়ে কাজ করছে আর অমনি তার পিঠের হাড়ের 'মট্‌মট্‌' আওয়াজ ওদের কানে এসে বাজছে।

বুতো তখন ফ্রানকয়েসের পরণের স্কার্ট পাছার উপর টেনে তুলেছে।

'খাসা মাদী হাঁস তুমি ! একবার দাও লিসা, জানতেও পারবে না।'

ফ্রানকয়েস দুর্বল হয়ে পড়েছিল, মনে মনে হার স্বীকার করছিল কিন্তু বোনের নাম শুনতেই তার মনে জেদ টান্ টান্ হয়ে উঠল। তার পর থেকে আর কিছুতেই সে হার স্বীকার করল না। মুঠো পাকিয়ে সজোরে ঘুষি মারতে

লাগল, আহত পা দিয়ে মারল লাথি। এই লোকটা ত তার মরদ নয়, তার দিদির মরদ। আর একজন নারীর মুখের গ্রাস সে কিছুতেই কেড়ে নেবে না।

'শুয়োরের বাচ্চা, আমার দিদির সাথে শুগে যা। সে চাইলে তাকে ফেঁড়ে ফেলিস্। রোজ রাতে তাকে একটা করে বাচ্চা দিস!'

সে যখন বুতোকে মারছিল তখন বুতো রাগে বিড় বিড় করতে লাগল, ভাবল পরিণামের কথা ভেবেই হয়ত ফ্রানকয়েস রাজী নয়।

'বোকা কোথাকার। কথা দিচ্ছি, ঠিক বার করে নেব। তোমার পেটে বাচ্চার জন্ম দেব না।'

বুতোর দু পায়ের মাঝ বরাবর ফ্রানকয়েস লাথি মারতেই সে তাকে ছেড়ে দিল। এত জোরে সে ফ্রানকয়েসকে ঠেলে ফেলে দিল যে সে যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল।

এবাব খেলার সময় শেষ হল। বুতো উঠে দাঁড়াতেই দেখল, লিসা খাবার নিয়ে আসছে। সে এগিয়ে গেল লিসার সাথে আগ বাড়িয়ে দেখা করার জন্যে। লিসাকে সে আটকাতে চায়। তাহলে এই অবসরে স্কার্ট নামিয়ে সামলে নিতে পারবে ফ্রানকয়েস। সে ভেবে আতঙ্কিত হল যে, ফ্রানকয়েস হয়ত লিসাকে সব বলে দেবে। ওকে একটা লাথি কষাতে পারলেই ভাল হত। কিন্তু ফ্রানকয়েস কিছুই বলল না, কর্তিত ফসলের উপর বসে জেদী অবাধ্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। এবং যখন আবার বুতো কাস্তে হাতে গম কাটতে সুরু করল তখন আলস্য-ভরা চোখে মেয়েলি স্বভাবসুলভ অবাক নয়নে শুধু তাকিয়ে রইল।

এতখানি হেঁটে এসে লিসাও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তাই সেও শুয়ে পড়ে জিজ্ঞাসা কবল—'কি হয়েছে রে? তুই আর খাটবি না?'

বিক্ষুব্ধ ফ্রানকয়েস জবাব দিল—'না, বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি!'

বুতো আর তাকে ঘাঁটাতে চাইল না, তাই তার বদলে বউয়ের দিকে তাকাল। মাদী শুয়োর যেমন পেট উঁচিয়ে রোদ পোহায় তেমনিভাবে শয়তানিটা ওখানে শুয়ে পড়ে করছে কি? ওঃ ওর পেটে একটা আশ্চর্যজনক কুমড়ো ঢুকেছে, দিনে দিনে পাকছে। ওর দেহের গোলগাল ভাব রসিকতার সৃষ্টি করছে দেখে লিসা হাসল তার মন্তব্যে। হয়ত কথাটা ঠিক বলেছে, বাচ্চাটা হয়ত ওমনিভাবে বড হয়, পাকে। প্রজ্জ্বলন্ত রোদে সে নিজের বিশাল পেটটা দিল ছড়িয়ে, যেন ওই জিনিসটা উর্বর মাটির বুক ফুঁড়ে ঠেলে উঠছে। ওটা পেট নয় একটা বীজের অঙ্কুর। কিন্তু বুতো হাসল না, সে নিষ্ঠুর কণ্ঠে তাকে উঠে ফসল কাটার কাজে হাত দিতে বলল, তার দু জানুর উপর ঝুলন্ত বিশাল মাংসস্তূপের ভারে লিসা হাঁটু গেড়ে বসতে বাধ্য হল। এ পাশ ও পাশ দুলতে দুলতে গমের শিষ কুড়োতে লাগল। লিসা খুব হাঁপাচ্ছিল। তার বেঢপ ঝুলন্ত পেট একটু ডান দিকে হেলে পড়ল।

তার দিদি তাকে বলল—'দেখ, তুই যখন ক্ষেতে কাজ করছিস না তখন ঘরে গিয়ে খাবারটা রেঁধে ফেল।'

একটি কথাও না বলে ফ্রানকয়েস চলে গেল। এখন শ্বাসরোধকারী উত্তাপ চারধারে। কিন্তু সারা মাঠ জুড়ে আবার প্রাণের সাড়া জেগেছে। দলে দলে চাষী মজুর কাজে ফিরে আসছে। বিশাল দিগন্ত-ব্যাপী মাঠের বুকে চলমান কালো কালো ফুটকির মতন কেবল মানুষ আর মানুষ। ডেলহোমি দু'জন মজুর নিয়ে তখন গাদা দেওয়ার কাজ শেষ করছিল, আর হাতের লাঠিতে ভর দিয়ে গ্রাণ্ডির বউ দেখছে যে, তার শস্যের গাদার কলেবর ধীরে ধীরে বাড়ছে। অলস মজুরকে লাঠি পেটা করার জন্যে সে সদাই প্রস্তুত। ফৌআন একবার গিয়ে দেখে ফিরে এল, সে এখন জামাইয়ের কাছে দাঁড়িয়ে তার মজুর খাটানো দেখছে। এখন সে বৃদ্ধ। স্মৃতির দংশনে সে মনমরা। ভারি পা ফেলে ফেলে সে একসময় চলে গেল মাঠ থেকে।

'এস, এস! এখানে এস!'

ডাকছিল জঁা। সকাল থেকে পাশের ক্ষেত থেকে সে কাটা ফসলের আঁটি বয়ে আনছে, সেই আঁটির আড়ালে তার দেহের আধখানা নজরে পড়ছিল। এখুনি সে এক গাড়ি মাল নামিয়েছে এবং তার ঘোড়া দু'টো চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে একপাশে। রোদে নিথর তাদের দেহ। পরের দিন সকাল পর্যন্ত ওগুলো আর বড় গাদায় সাজান হবে না। কাজেই জঁা আঁটিগুলো তিন থাকে এমন ভাবে সাজিয়ে রেখেছে যেন একখানা—খড়ের দেওয়ালের মধ্যে গভীর লুকোন একটা গর্ত।

'এস! আমি ডাকছি!'

ফ্রানকয়েস যন্ত্রের মতন তার ডাক শুনে এগিয়ে এল। এমন কি পিছন ফিরে একবার তাকাবার সাবধানতাটুকুও সে গ্রহণ করল না। যদি সে পিছনে তাকাত তাহলে তাকে রাস্তা ছেড়ে ফের মাঠে নামতে দেখে বিস্মিত বুতোকে তার নজরে পড়ত। প্রথম প্রথম জঁা তার সাথে রসিকতা করছিল।

'কি ব্যাপার, তোমার ত খুব দেমাক বেড়েছে! বন্ধুদের সাথে কথা না বলে এড়িয়ে যাচ্ছ!'

ফ্রানকয়েস জবাব দিল—'হায় ঈশ্বর! লুকিয়ে রয়েছ, তোমাকে দেখতে পাই নি!'

বুতোর ব্যবহার সম্বন্ধে সে অনুযোগ করল, কিন্তু তার চিন্তা ভিন্ন খাদে বইছে। নিঃশব্দ রইল সে, মাঝে মাঝে দু'একটা কথা বলল। নিজের ইচ্ছায় ফ্রানকয়েস গর্তের মধ্যে ঢুকে খড়ের গাদায় বসে পড়ল, যেন সে দারুণ অবসন্ন হয়ে পড়েছে। তার মনে এখন শুধু একটাই চিন্তা, দারুণ বাস্তব ভঙ্গিতে তার সারা দেহ ছটফট করছে—বুঝি ওই লোকটা একটু আগে মাঠের পারে তাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে আক্রমণ করেছিল। নিজের জানুতে তার উত্তপ্ত হাতের

স্পর্শ এখনও সে অনুভব করছে। ওর গায়ের গন্ধ এখনও তাকে তাড়া করছে। পুরুষের আলিঙ্গনের স্বাদ পাওয়ার জন্যে তার দেহ মুখিয়ে রয়েছে এবং তাই বোধহয় লালসা দমনের জন্য সে শ্বাসরোধ করল। অনুভব করল কাঠিন্য, তাই দু'চোখ বোজাল।

জাঁ কিছু বলল না। ফ্রানকয়েসকে এভাবে আরামে গা ছড়িয়ে ঝুঁকে বসতে দেখে জাঁয়ের ধমনীতে রক্তের স্রোত তীব্র গতিতে ছুটল। এমন অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে জাঁ ভাবেও নি, সে চুপ করে বসে রইল—এই বাচ্চা মেয়েটার উপর সুযোগ নিলে অন্যায় করা হবে। কিন্তু তার বুকের ধুক্‌পুকুনি তাকে মোহাচ্ছন্ন করছে, কত দিন ধরে তাকে পাওয়ার আশায় সে রয়েছে, তাকে পাওয়ার কামনায় সে পাগল, কত জ্বরতপ্ত জাগব রাত কাটাচ্ছে সে। ওর দেহ ঘেঁষে ও শুয়ে পড়ল, প্রথমে ওর একখানা হাত সে হাতে তুলে নিল। তারপর দু'খানা হাত নিয়ে সজোরে পিষল। কিন্তু ওকে চুম্বন করার সাহস তার হল না। হাত দু'খানা কিন্তু টেনে নিল না ফ্রানকয়েস। ভারি চোখের পাতা খুলে তাকাল। মুখে হাসি নেই, দু'চোখে শূন্য দৃষ্টি। লজ্জাহীন মুখে বিব্রত ভাব। তার নীরব প্রায় দুঃখ-ম্লান দৃষ্টি সহসা জাঁকে নিষ্ঠুর করে তুলল। সে তার জামার নীচে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে তার জানু স্পর্শ…ঠিক এমনটাই একটু আগে করেছিল অন্য মরদটা।

তোতলাতে লাগল ফ্রানকয়েস—'না না, এমন নোংরা কাজ করো না।'

কিন্তু নিজেকে সে প্রতিরোধ করতে চাইল না। একবার যন্ত্রণায় সে ককিয়ে উঠল। অনুভব কবল যে, তাব পিঠের নীচে মাটি নেমে যাচ্ছে এবং তার আচ্ছন্ন অবস্থায় মনে করতে পারল না সেই আগেব মরদ ফিরে এসেছে কিংবা আসেনি। সেই একই ধরনের পুরুষতা, একই রকম মরদ দেহের তীব্র গন্ধ, রোদে হাড়-ভাঙা খাটুনির দরুণ ঘামের কটু ঝাঁজ। সজোরে চোখ বন্ধ করে রাখল ফ্রানকয়েস, যেন উজ্জ্বল অন্ধকারে তার সব কিছু গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। তাই এক সময় তোতলাতে তোতলাতে বলল—'ওগো দেখ, আমি বাচ্চা চাই না। এবার থাম!'

জাঁ তাকে সজোরে ছেড়ে দিয়ে সরে গেল। নিশানাভ্রষ্ট পুরুষ-বীর্য নষ্ট হল। ছিটকে পড়ল শুকনো শস্যেব গাদায়, মাটিতে। এই সেই মাটি যে কোনদিন অস্বীকার করে না বীজ ধাবণ করতে, সদা সর্বদা নগ্ন হয়ে শুয়ে আছে। চিরন্তন তার উৎপাদিকা শক্তি, সব রকমের বীজ ধারণের শক্তি রয়েছে এই মাটির।

নীরবে ফ্রানকয়েস চোখ খুলল। নড়ল না। তন্দ্রাভিভূত তার দেহ-মন। এর মধ্যেই কি শেষ হয়ে গেল? আর তাকে আনন্দ দেবে না? এখন রয়েছে কেবল যন্ত্রণার অনুভূতি। অন্য মরদের চেহারা তার মনের পটে ভেসে উঠল। তার অবচেতন মনে কামনার অতৃপ্তির জন্য হাহাকার উঠছে—এর জন্য

দায়ী জঁা, তার পাশেই রয়েছে। ওর প্রতি ফ্রানকয়েসের মন বিরূপ হয়ে উঠল। কেন সে জঁায়ের হাতে ধরা দিল? এই বুড়োকে ত সে ভালবাসে না। যা' ঘটে গেল তার আঘাতে সে অভিভূত তাই নিথর-দেহে বসে রইল···জঁা ঠিক ফ্রানকয়েসের মতন। অবশেষে নিজের উপর বিরক্ত হয়ে কি যেন বলতে গেল জঁা কিন্তু তার কণ্ঠে স্বর ফুটল না। তখন সে আরও অপ্রস্তুত হয়ে তাকে চুমু খাবে ঠিক করল, কিন্তু সে সরে বসল। না, ওকে আর সে ছুঁতে দেবে না।

সে বিড়বিড় করে বলল—'আমায় যেতে হবে। একটুক্ষণ এখানে থাক।'

ফ্রানকয়েস জবাব দিল না, শূন্য চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল।

'এটাই ঠিক হবে, তাই না? মিনিট পাঁচেক বস, তাহলে কেউ আর তোমাকে আমার সঙ্গে এখান থেকে বেরোতে দেখবে না।'

এবার সে জবাব দেবে ঠিক করল।

'বেশ তাই হবে। যাও।'

ব্যস! সেই শেষ। জঁা হাতের চাবুক আছড়াল, ঘোড়া দুটোকে খিস্তি করল এবং গাড়ীর পাশে গিয়ে দাঁড়াল। তার পদক্ষেপ ভারি, মাথা নোয়ানো।

কর্তিত শস্যের আড়ালে ফ্রানকয়েস অদৃশ্য হতেই বুতো অবাক হয়ে গিয়েছিল, এখন জঁা-কে ওখান থেকে বেরিয়ে আসতে দেখল। সন্দেহ তার মনে দানা বাঁধল। লিসাকে কিছু না বলে সে মাথা নুইয়ে পাকা শিকারীর মতন ওদিকে পায়ে পায়ে চলল। তারপর দ্রুত এক লাফে একেবারে গর্তের মাঝ বরাবর গিয়ে পড়ল। ফ্রানকয়েস তখনও সেখান থেকে নড়ে নি, আচ্ছন্ন অবস্থায় বসেছিল। শূন্যদৃষ্টিতে উপর দিকে তাকিয়ে আছে। পা দু'খানা তখনও উলঙ্গ। কোনও কিছু সে অস্বীকার করতে পারল না, চেষ্টাও করল না।

'নোঙরা কসবী কোথাকার! আমার পেটে লাথি মেরে ওই বদমাসটার কোলে শুয়ে ছিলি! হায় ঈশ্বর! আচ্ছা, তোর ব্যবস্থা করছি।'

বুতো এর মধ্যেই তাকে আঁকড়ে ধরেছে। ওর কঠিন মুখ দেখে ফ্রানকয়েস বুঝতে পারল যে, সে এবার এই অবস্থার সুযোগ নেবে। ওই মরদটা যখন একটু আগে তাকে ভোগ করেছে তখন সে কেন ভোগ করবে না? কিন্তু যে মুহূর্তে তার হাতের স্পর্শ তার দেহে লাগল সেই মুহূর্তে সে আগের মতন বিরূপ হল। সে ওখানেই রয়েছে, এবার আর সে তাকে হারাবে না, তাকে ফ্রানকয়েস চায় না। যদিও তার মন বদলানো সম্বন্ধে সে নিশ্চিত নয় তবু তার মনে তিক্ত বিদ্বেষের জ্বালা।

'এই শুয়োর, আমাকে ছেড়ে দে বলছি। নইলে তোকে কামড়ে ছিঁড়ে ফেলব।'

দ্বিতীয়বার আর চেষ্টা করতে পারল না বুতো, কিন্তু ওই মরদটার সাথে মেয়েটা কামানন্দ উপভোগ করেছে এই চিন্তা তার মেজাজ বিগড়ে দিল।

দারুণ ক্ষেপে সে তোতলাতে লাগল—'যদি জানতে পারতাম যে তোরা

দু'জনে এখানে আছিস তাহলে এতক্ষণ ওকে ফেঁড়ে ফেলতাম। নোঙরা বেশ্যা মাগি। ওই বেজন্মা গন্ধ-গোকুলটা তোকে এভাবে শুইয়ে গেল তুই সহ্য করলি কেন ?'

খিস্তির তুফান বইয়ে দিল বুতো। কুৎসিত কথাগুলো সে ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারছিল এবং কাঁচা ভাষায় এমন নোঙরা কথাগুলো বলছিল যে নিজেকে তার উলঙ্গ মনে হল, লজ্জিত হল। সেও এবার ভীষণ ক্ষেপে গেল। তার বিবর্ণ-মুখ টান টান হয়ে উঠল। কিন্তু সে অতীব শান্তভাবের ভাণ করল।

শুকনো গলায় প্রতিটি অপমানের জবাবে বলল—'তোমার তাতে কি হয়েছে ? আমার যা খুশি করার স্বাধীনতা আছে, নেই আমার ?'

'আচ্ছা, তোকে আমি তাড়িয়ে দেব। হাঁ, বাড়ী ফিরেই তোকে তাড়াব। লিসাকে বলব গলার কাছে স্কার্ট তোলা অবস্থায় তোকে দেখেছি। বাড়ী ছেড়ে অন্য জায়গায় খুশি হলে অমন মজা লুটতে পারিস !'

এবার বুতো তাকে ঠেলে নিয়ে চলল। টেনে নিয়ে এল ক্ষেতের মধ্যে যেখানে লিসা রয়েছে।

'এবার বল লিসাকে। যেখানে খুশি আমি চলে যাব।'

'যদি যেতে চাস ত সেটা পরে ভেবে দেখব। তবে পাছায় আমার লাথির দাগ নিয়ে তবে যাবি।'

লা কর্ণেইলের ক্ষেতের দিকে বুতো তাকে তাড়া করল। এই ক্ষেতখানা তার আর তার দিদির অবিভক্ত জমি। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ফ্রানকয়েস এই জমিখণ্ড ভাগ করতে চেয়েছিল। একটা ধারণা মগজে ঢুকতেই সহসা বুতো হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। এক ঝলকে সে দেখল যে, ওকে যদি সে তাড়িয়ে দেয় তাহলে ক্ষেতখানাও দু ভাগ করতে হবে। সে ক্ষেতখানার অর্ধেক নিয়ে নির্ঘাৎ তার নাগরকে দিয়ে দেবে। এই ধারণা তার মনকে নাড়া দিল এবং তৎক্ষণাৎ সে তার অতৃপ্ত কামনার কথা ভুলে গেল। না, এটা বোকামি হবে, একটা মেয়ে তোমাকে বিমুখ করেছে বলে তুমি সবকিছু ছেড়ে দিতে পার না। অমন মজা তুমি আবারও লুটতে পারবে যদি জমি তোমার দখলে থাকে।

বুতো আর কিছু বলল না। ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল। বউয়ের কাছে যাওয়ার আগে মনের রাগ কি করে শান্ত করবে ভাবতে পারল না। অবশেষে সে মনস্থির করে ফেলল।

'কুৎসিত বিবাদ আমি পছন্দ করি না। তুমি আমার দিকে মুখ ঘুরিয়েছ তাই রেগে গেছি। আমার স্ত্রীর এই অবস্থা এখন ওকে আমি বিব্রত করতে চাই না।'

ফ্রানকয়েস ভাবল, লিসাকে তার কথা বলে দেবে বলে বুতো ভয় পেয়েছে।

'একটা কথা নিশ্চিত জেনে রাখ, তুমি যদি বল তবে আমিও বলে দেব।'

এবার সুনিশ্চিত হয়ে সে শান্ত হল। বলতে লাগল—'ভয় পাই নি আমি।

বলব তুমি মিথ্যে কথা বলছ, তোমাকে হাতে-নাতে ধরেছি বলে প্রতিশোধ নিচ্ছ।

ওরা এখানে হাজির হলে বুতো বলল—'ওসব কথা আমরা নিজেদের মনে এখন রাখি। পরে আবার আমরা কথা বলব।'

৪

'যতদিন বাছুরটা না জন্মাচ্ছে ততদিন আমার বাচ্চাটাও পড়বে না, দেখছি!' রোজ সকালে লিসা কথাটা বলবে আর নিজের বিশাল জয়ঢাক পেটটা বয়ে নিয়ে গোয়ালে ঢুকবে। তাকিয়ে থাকবে গাই-গোরু কলিচের দিকে। সেও পোয়াতি, তার পেটও ফুলে বিশাল হয়ে উঠেছে। সেণ্ট ফিকারস্ ডে-তে ন'মাস পুরল। ফ্রানকয়েস যেদিন তাকে ষাঁড় দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল সেদিনের তারিখ যত্ন করে লিখে রেখেছে। দুর্ভাগ্যের কথা লিসা পোয়াতি হওয়ার সঠিক তারিখ জানে না। এই অবাঞ্ছিত শিশুটা এমন আশ্চর্যজনকভাবে তার পেটে এসেছে যে এটা জানার কোন অর্থই নেই। কিন্তু বোধহয় সেণ্ট ফিকারস্ ডে-র আগে কিংবা পরের দিন হবে।

ফসল ওঠার পর দুটো সপ্তাহ পার হয়েছে। যেন বুতো আর তার মধ্যে কিছুই হয় নি এমনি ধরনের একটা ভাব নিয়ে ফ্রানকয়েস আবার নিয়ম মত সংসারের কাজ করছে। বুতো মনে হচ্ছে সব ভুলে গেছে আর যে ব্যাপারটার জন্যে সে মনে মনে উদ্বিগ্ন তার চিন্তা ফ্রানকয়েস এড়িয়ে চলতে চায়। সে জ্যাকে সাবধান করে দিয়েছে তাই জঁা আর ফিরে আসে নি। বুনো ঝোপের আড়ালে জঁা তার সঙ্গে দেখা করে বার বার অনুরোধ করেছে, সন্ধ্যেবেলা এক ফাঁকে পালিয়ে এস। খাদের মধ্যে দেখা হবে। কিন্তু ফ্রানকয়েস ভয় পেয়েছে, আসতে অস্বীকার করেছে…দারুণ বিতৃষ্ণা থেকে তার প্রতি তার মনে শৈত্যভাব দেখা দিয়েছে। সে বলেছে, পরে যেদিন বাড়ীতে কাজ কম থাকবে সে তাকে জানাবে। সন্ধ্যেবেলায় ম্যাকেরণের দোকানে ফ্রানকয়েস চিনি কিনতে যাচ্ছিল, পথে জঁায়ের সাথে তার দেখা হতেই জঁা তাকে গীর্জার পিছনে যেতে বলল। কিন্তু তার সাথে যেতে রাজী হল না ফ্রানকয়েস। সারাক্ষণ সে গাই-গোরু কলিচের কথাই বলল—তার পিঠের হাড়ে মট্‌মট্ শব্দ হচ্ছে আর গর্ভস্থলের পথ ফাঁক হয়ে গেছে। এসব নিশ্চিত চিহ্ন এবং বাচ্চা হতে আর বেশী দেরী নেই।

এবং সত্যিই 'সেণ্ট ফিকারস্ ডে'-র ঠিক আগের দিন সন্ধ্যেবেলা খাওয়ার পর লিসা পেটে বিশ্রী যন্ত্রণা অনুভব করল, সে তখন বোনকে নিয়ে গোয়ালে গাই-গোরুটার অবস্থা দেখছিল। কলিচেরও যন্ত্রণা সুরু হয়েছে, কোলা পেটের ভারে তার জানুগুলো অনেকটা ফাঁক হয়েছে এবং ডাকতে সুরু করেছে নরম গলায়।

লিসার মেজাজ ভীষণ হয়ে উঠল। বলল—'তোকে ত বলেছিলাম। এবার আমরা দারুণ বিপদে পড়ে গেলাম।'

সে খুব নীচু হয়ে নিজের পেট চেপে ধরল, এত কষ্ট দিচ্ছে বলে বুঝি শাস্তি দিতে চাইছে।

হতচ্ছাড়া শিশুটা কি তাকে একটু শান্তি দেবে না? সে মনে মনে জিজ্ঞাসা করল। সে ত আর কিছুদিন অপেক্ষা করতে পারত। সে অনুভব করল, তার দেহে যেন পোকায় হুল ফোটাচ্ছে, এবং পিঠ থেকে যন্ত্রণাটা সুরু হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে, একেবারে হাঁটু পর্যন্ত নেমে যাচ্ছে। সে বিছানায় শুতে চাইল না, হাঁটতে লাগল এবং বলল যে, এমনিভাবে সে শিশুটাকে আবার পিছনে ঠেলে দেবে।

দশটা বাজল। ক্ষুদে জুলিকে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হল। কোনও কিছু হচ্ছে না দেখে বুড়ো রেগে গেল এবং শুতে চলে গেল। গোয়ালে রইল লিসা আর ফ্রানকয়েস। কলিচের যন্ত্রণার তীব্রতা বাড়তে লাগল। গর্ভযন্ত্রণার কাল হলেও কোন উন্নতি হচ্ছে না দেখে মেয়ে দুটো উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। পথ ত অনেকটা ফাঁক হয়ে গেছে তবু বাছুরটা বার হচ্ছে না কেন? তারা গাই-গোরুটার পিঠে চাপড় মেরে উৎসাহ দিল, একগামলা জাবনা মেখে সামনে ধরল। কিন্তু সে খেতে চাইল না। মাথা অবনত। গভীর যন্ত্রণায় তার নিতম্ব কেঁপে কেঁপে উঠছে। সারাক্ষণ গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করছিল লিসা, কিন্তু মাঝরাতে তার যন্ত্রণা সহসা কমল। তার ব্যাপারে এটা হয়ত ঝুটা ব্যথা। মাঝে মাঝে সে ব্যথা অনুভব করছে। তার দৃঢ় বিশ্বাস, বাচ্চাটাকে সে ঠিক পিছনে ঠেলে দিয়েছে। সারারাত ধরে বোনের সঙ্গে লিসা গোয়ালে বসে রইল। কলিচের সেবা করতে ওরা জেগে রইল, কাপড় গরম করে ওর জ্বরতপ্ত দেহে সেঁক দিল। সেদিন ক্লয়েসের হাট থেকে তারা যে গাই-গোরুটা কিনেছে সেই রাভিট অবাক চোখে মোমবাতির আলো দেখছে।

সকাল হল। সূর্য উঠল। কোন কিছুই হল না দেখে ফ্রানকয়েস ঠিক করল তাদের পড়শী ফ্রিমাতের বউকে সে ডেকে নিয়ে আসবে। গো-বিস্তার জন্যে তার খুব নাম-ডাক আছে। অনেক গাই-গোরুর সে রোগ সারিয়েছে। তাই বাছুর বাঁচাবার জন্যে গ্রামের লোকেরা গো-চিকিৎসকের বদলে স্বেচ্ছায় তাকে ডেকে আনে। সে এসে সব দেখে নাক-মুখ কোঁচকাল।

মৃদু কণ্ঠে ফ্রিমাতের বউ আওড়াল—'অবস্থা খুব ভাল নয় দেখছি। কখন থেকে এ অবস্থা হয়েছে?'

'বারো ঘণ্টা হল।'

বুড়ী গাই-গোরুর চারধারে ঘুরে খুঁটিয়ে সব দেখল। ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল। তাকে বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল। ওরা দু'জন আরও ভয় পেল।

সে বলল—'তবু এখনও জল ভাঙ্গছে। অপেক্ষা করে দেখতে হবে।'

কাজেই সারা সকাল তারা বসে রইল। জল জমে জমে থলেটা বাইরে বেরিয়ে আসছে। তারা সাবধানে জলের থলে লক্ষ্য করল, তার মাপ হিসাব করল এবং নিজেদের অভিমত জানাল। অবশ্য এটা ঠিক, অন্য থলের চেয়ে এগুলো ভিন্নরকম নয়। তবে এগুলো একটু লম্বাটে আর বড়। কিন্তু ন'টা বাজলে ব্যথা হল। বিশ্রীভাবে জলের থলেটা ঝুলতে লাগল। প্রতিবার গোরুর দেহ কাঁপার সাথে সাথে সেটা দুলতে লাগল। গোরুটার অবস্থা সত্যিই সঙ্গীন হয়ে উঠছে।

মাঠ থেকে দুপুরের খাওয়ার জন্য বুতো ঘরে ফিরল। গোরুর সঙ্গীন অবস্থা দেখে শঙ্কিত হল। খরচের বহর ভেবে যদিও তার দেহ কাঁপল তবু সে পাতয়েরকে ডাকবার কথা বলল।

ফ্রিমাতের বউ তিক্তকণ্ঠে বলল—'গো-চিকিৎসক! তোমরা কি গোরুটাকে মেরে ফেলতে চাও? বুড়ো সসিসের গোরুটা তার চোখের সামনে পেট ফেটে মরে গেছে। না, না। এবার দেখ, জলের থলেটা ফাটিয়ে দিচ্ছি, এবং তোমাদের জন্যেই বাছুরটাকে আমি বার করে আনব।'

ফ্রানকয়েস প্রতিবাদ করল—'মঁসিয়ে পাতয়ের বলেছেন জলের থলে কখনও ফাটাবে না, ওতে প্রসবের স্থবিধে হয়, প্রসব হতে জল সাহায্য করে।'

ফ্রিমাতের বউ গভীর ক্রোধে নিজের কাঁধ নাচাল। পাতয়ের একটা আহাম্মক। কাঁচির খোঁচায় সে জলের থলেটা ফাটিয়ে দিল। চাকার আঘাতে যেমনভাবে জলপ্রবাহের জল বেরোয় তেমনিভাবে হুড় হুড় করে জল ছড়িয়ে পড়ল, ওরা পিছনে সরে গেল। কিন্তু তখন খুব দেরি হয়ে গেছে। ওদের দেহ জলে ভিজে গেল। মুহূর্তের জন্যে কলিচ্ সোয়াস্তিতে শ্বাস নিল এবং সাময়িক-ভাবে বিজয়িনী হল ফ্রিমাতের বউ। সে ডানহাতে বেশ করে মাখন মাখিয়ে নিল। তারপর বাছুরের অবস্থান পরখ করার জন্য ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দিল। সে ধীরে ধীরে ঘুরল।

বলল—'বাছুরটার পায়ে হাত ঠেকছে, কিন্তু মাথা পাচ্ছি না। মাথা না পাওয়াটা খুবই খারাপ লক্ষণ।'

সে হাত বার করে নিল। দারুণ যন্ত্রণায় কলিচের দেহ কেঁপে উঠল। সে এত জোরে কোঁৎ দিল যে, বাছুরটার পা বেরিয়ে এল। যাক্ তাহলে একটা কিছু হল! বুতো সোয়াস্তির শ্বাস ফেলল। তারা অনুভব করল, বাছুরটার দেহের একটা অংশ অন্ততঃ বেরিয়েছে এবং তখন থেকে তাদের মনে একটাই ভাবনা হল যে, যেমন করে হোক বাছুরটাকে তারা টেনে বার করে আনবে। তাদের ভয় হল, ওটা হয়ত আবার ভিতরে ঢুকে যাবে এবং আর বেরোবে না।

ফ্রিমাতের বউ বিজ্ঞভাবে বলল—'তাড়াতাড়ি না করাই ভাল, শেষে ওটা বেরিয়ে আসবেই!'

ফ্রানকয়েসেরও তাই মত! কিন্তু বুতো উত্তেজিত হয়ে প্রতি মিনিটে

বাছুরটার পা দু'খানা স্পর্শ করছিল এবং আর বেরোচ্ছে না দেখে দারুণ রেগে গেল। সহসা সে একগাছা দড়ি এনে তার বউয়ের সাহায্যে বাছুরের দু'পায়ে শক্ত করে বাঁধল—তার বউয়ের দেহ তারই মত থরথর করে কাঁপছিল।

বুতো চেঁচিয়ে উঠল—'এবার টান! সবাই একসঙ্গে···কিন্তু হতচ্ছাড়াটা ত একটুও নড়ছে না। ভিতরে কোথাও আটকে গেছে—এস। টান। আবার টান! টান।'

মেয়েরা হাঁপিয়ে পড়ল। তাদের দেহ থেকে ঘাম ঝরতে লাগল। তবু তারা আবার টানতে স্থরু করল।

'এস! টান লাগাও। ওরে শয়তান, বেরিয়ে আয়।'

তারপরই বিয়োগান্ত ঘটনাটা ঘটল। পুরানো আধ-পচা দড়ি। ছিঁড়ে গেল এবং তারা সবাই গোবরের উপর উল্টে পড়ল। চেঁচিয়ে গাল্ দিল।

লিসা দেওয়ালের দিকে গড়িয়ে গিয়ে পড়ল এবং তারা সবাই তাকে সাহায্য করতে গেল। তখন লিসা বলল—'কিছু হয় নি!'

কিন্তু তার মাথা ঘুরছিল তাই উঠে দাঁড়াতে পারল না। তাকে বসিয়ে দেওয়া হল। মিনিট পনের পরে লিসা নিজের পেট দু হাতে চেপে ধরল। আগের দিনের মতন তার ব্যথা আবার স্থরু হল। নিয়মিতভাবে গভীর থেকে ব্যথা গড়িয়ে গড়িয়ে উঠছে। এবং সে ভেবেছিল যে, বাচ্চাটাকে সে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে। কি জঘন্য দুর্ভাগ্য! দুই-ই সমান এখন—গোরুটার প্রসব তাড়াতাড়ি হচ্ছে না এদিকে তার আবার ব্যথা স্থরু হয়েছে বিশ্রীভাবে, প্রায় গোরুটার মতন হয়ত অবস্থা হতে চলেছে। ভাগ্যের হাত থেকে কারো রেহাই নেই! এটাই ভাগ্যের লিখন যে, বাছুরটার এবং বাচ্চাটার একই সময় জন্ম হবে। লিসা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। সহসা তার এবং বুতোর মধ্যে বিবাদ স্থরু হয়ে গেল। কেন সে দড়ি ধরে টানতে গেল? গোরুর পেটের ভিতরটা নিয়ে তার ত ভাবনার কিছু ছিল না। তার নিজের পেটের ভিতরেরটা প্রথমে ফেলাই ভাল। ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ করছিল লিসা, তাই জবাবে গাল দিল। জঘন্য শুয়োরের বাচ্চা! মরদটা যদি এভাবে তার ভিতরে বীজ না ফেলত তাহলে তার এই জঘন্য দশা আজ হত না।

ফ্রিমাতের বউ বলল—'ওসব কথার কথা! ওসব বলে আমরা এখন পার পাব না!'

বেকুর বউও বলল—'কথা বলে একটু সোয়াস্তি পাওয়া যায় বটে, তবে সবই সমান!'

ছোট্ট জুলিকে এখান থেকে সরিয়ে ডেলহোমির বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন ছ টা বাজল। কিন্তু সাতটা পর্যন্ত ওরা বসে রইল। কিছুই ঘটল না। সারা বাড়ীখানার নারকীয় অবস্থা! লিসা জেদ ধরে একখানা চেয়ারে বসে আছে। বসে বসে দেহ মোচড়াচ্ছে আর কাতরাচ্ছে।

কলিচের দেহ যখন ব্যথায় কাঁপছে তখনই ডেকে উঠছে, তার সারা দেহ থেকে ঘাম ঝরছে—ক্রমশঃ তার অবস্থা আরও খারাপ হচ্ছে। অন্য গোরুটা রাস্টি ভয়ে ডাকছে। এবার মেজাজ খারাপ হল ফ্রানকয়েসের। বুতোও গালাগালি দিল খানিকটা। চেঁচিয়ে বলল যে, সে আবার টেনে বার করবার চেষ্টা করবে। পাড়া-পড়শীদের ডেকে আনা হল। যেন একটা ওক্ গাছ টেনে ফেলছে এমনিভাবে একগাছা নতুন দড়ি দিয়ে বেঁধে ওরা জনা ছয়েক মিলে টানতে লাগল। এবার আর দড়ি ছিঁড়ল না। কিন্তু কলিচ্ কাঁপতে কাঁপতে পড়ে গেল, কাৎ হয়ে পড়ে রইল খড়ের উপর। পাগুলো ছড়ানো এবং শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। ভারি করুণ দৃশ্য!

কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বুতো বলল—'ওই বাছুরটাকে আমরা কখনো বার করতে পারব না, আবার গোরুটাকেও হারাব।'

এবার ফ্রানকয়েস দু হাত জোড় করে অনুরোধ করল—'মঁসিয়ে পাতয়েরকে একবার ডেকে আন। টাকা-পয়সা যা' লাগে লাগবে। তাকে গিয়ে নিয়ে এস।'

বুতোও হতাশ হয়ে পড়েছিল। শেষবারের মতন চেষ্টা করে এবং আর একটি কথাও না বলে সে বেরিয়ে গেল গাড়ী জুততে।

গো-চিকিৎসককে আনার নাম হতেই ফ্রিমাতের বউ গোরুটার ব্যাপারে একদম উদাসীন হওয়ার ভাণ করল এব' এবার সে লিসার দিকে নজর দিল। সে পোয়াতি-নারীদের সম্বন্ধেও অনেক কিছু জানে এবং পড়শীদের অনেক সন্তান প্রসব করিয়েছে। এখন সে লিসার জন্য উদ্বিগ্ন হল এবং ভয়ের ব্যাপারটা বেকুর বউয়ের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখল না। বুতো গাড়ী জুতছিল, তাড়াতাড়ি বেকুর বউ তাকে ডেকে আনল।

'শোন! তোমার বউয়ের জোর ব্যথা উঠেছে। একজন ডাক্তার ডাকার কি করবে?'

বড় বড় চোখ করে বুতো সেখানে নির্বাক দাঁড়িয়ে রইল। নিশ্চয় আর কারো দরদ দেখানোর প্রয়োজন নেই? প্রত্যেকের জন্যই তার খরচ করার ক্ষমতা নেই।

যন্ত্রণার ধকল সহ্য করার ফাঁকে লিসা বলে উঠল—'না, না। আমি ঠিক ব্যবস্থা করে নেব। পোড়াবার মতন যথেষ্ট পয়সা আমাদের নেই।'

বুতো ঘোড়ার পিঠে চাবুক কষাল আর অমনি গাড়ীখানা সন্ধ্যার আঁধার ঠেলে ক্লয়েসের রাস্তায় ছুটল।

ঘণ্টা দু'য়েক পরে পাতয়ের এসে হাজির হলেন কিন্তু তখনও অবস্থা এতটুকু বদলায় নি। কলিচ্ কাৎ হয়ে পড়ে আছে, তার গলায় ঘড-ঘড় শব্দ হচ্ছে, আর চেয়ারে আলতোভাবে বসে লিসা ব্যথায় দেহ মোচড়াচ্ছে। প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা ধরে এমনিভাব চলছে।

গো-চিকিৎসক ভারি খোশ-মেজাজের লোক। জিজ্ঞাসা করলেন 'এবার বল, কাব জন্য আমায় ডাকা হয়েছে?' তারপর সোজা লিসার দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন—'নিশ্চয় তোমার জন্যে আমায় ডাকা হয় নি, আর তা' যদি হয় তবে তুমি বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়। এখন তোমার শুয়ে থাকা দরকার।'

লিসা জবাবও দিল না এবং চলেও গেল না।

তিনি ইতিমধ্যে গোরুটাকে পরীক্ষা করার কাজ সুরু করেছেন।

'হায় ঈশ্বর! তোমরা গোরুটাকে ত মেরে ফেলার জোগাড় করেছ, দেখছি। সব সময় তোমরা আমার কাছে দেরীতে আস নিয়ে যেতে। বাছুরটাকে টানাটানি করেছিলে মনে হচ্ছে। দেরী না করে গোরুটাকে দু'টুকরো করে ফেলতে। একটু তর সয় নি, যত নিরেট আহাম্মকের দল।'

হতাশায় আর শ্রদ্ধায় ওরা দৃষ্টি নত করে চিকিৎসকের কথা শুনতে লাগল। শুধু অনুকম্পা ভরে ফ্রিমাতের বউয়ের ঠোঁট একটু ফাঁক হয়ে ছিল। মঁসিয়ে পাতয়ের কোট খুললেন, জামার হাতা গুটিয়ে নিলেন। তাবপর বাছুরটার পায়ে দড়ি বেঁধে আবার ঠেলে ভিতরে ঢুকিয়ে দিলেন। দড়িটা এমনভাবে জড়ান রইল যেন দবকার হলে টেনে আনা যায়। তারপর তিনি ডান হাতখানা ভিতরে ঢুকিয়ে দিলেন।

মুহূর্তখানেক পবে আবার বলে উঠলেন—'কেন, হাঁ! ঠিক যা' ভেবেছি তাই ঘটেছে। বাছুরের মাথা বাঁ-দিকে ঘোরানো রয়েছে। কাল সকাল পর্যন্ত টানাটানি করেও তোমরা বাছুরটাকে বার করতে পাবতে না। ওহে, আব একটা কথা বলছি তোমাদেব, শোন। বাছুরটা মরে গেছে। ওর মাথা ঘোরাতে গেলে ওর দাঁতে আমার হাত কেটে যেতে পারে। আর তা' কবেও ওটাকে আমি বার কবতে পারব না। গোরুর ক্ষতি হবে।'

ফ্রানকয়েস ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

'মঁসিয়ে পাতয়ের, আপনাকে অনুরোধ করছি আমাদের গোরুটা বাঁচান। হতভাগ্য কলিচ্, সে আমাকে বড্ড ভালবাসে—।'

যন্ত্রণায় লিসার সারা মুখ সবুজ হয়ে উঠেছে। বুতো ভালই আছে, অপরের যন্ত্রণার প্রতি সে উদাসীন। তবু এখন লিসা এবং বুতো দু'জনেই বিহ্বল হয়ে কাঁদতে সুরু করল। বার বার ওরা একই অনুরোধ করল।

'গোরুটাকে বাঁচান, অনেক বছর ধরে ও আমাদের অনেক দুধ দিয়েছে। মঁসিয়ে পাতয়ের, আপনি ওকে বাঁচান।'

'কিন্তু একটা কথা জেনে রাখ, বাছুবটাকে কেটে ওর পেট থেকে বার কবতে হবে।'

'নরকে যাক বাছুব! মঁসিয়ে পাতয়েব গোরুটাকে শুধু বাঁচান।'

গো-চিকিৎসক তাঁর সঙ্গে একটা বড় নীল রঙের 'এ্যাপ্রন' এনেছেন, একটা সাদা ট্রাউজার চেয়ে নিলেন। রাস্তির ওপাশে গিয়ে নিজের পরণের সব

পোশাক ছেড়ে ফেললেন। শুধু ট্রাউজার আর এ্যাপ্রনটা পরে কোমরের কাছে বেঁধে নিলেন। আবার যখন এলেন তখন বুলডগের মতন তাঁর মুখখানা খুশিতে ভরা, এই হালকা পোশাকে তাঁকে বেশ মোটাসোটা দেখাচ্ছে। কলিচ্ একবার মাথা তুলে দেখল, কাতরানি থামাল—নিঃসন্দেহে এটা বিস্ময়ের জন্যই হল। কিন্তু কেউ হাসল না, কেননা এই দেরীর জন্য তারা অধীর হয়ে উঠেছে।

'কয়েকটা মোমবাতি জ্বালাও!'

চারটে মোমবাতি তিনি মাটিতে বসালেন। তারপর গোরুর পিছনে খড়ের উপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লেন। গোরুটা আর এখন উঠতে পারছে না। এক মুহূর্ত অমনিভাবে শুয়ে গোরুটার দু'জানুর মাঝে চোখ পাতলেন। শেষে আবার দড়ি ধরে টেনে বাছুরের পা দু'খানা বাইরে আনলেন এবং বেশ ভালভাবে পরখ করলেন।

পাশে একটা সরু আর লম্বা বাক্স রেখেছিলেন গো-চিকিৎসক। একটা কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠে বাক্স থেকে একখানা ছোট ছুরি নিলেন। ঠিক তখনি যন্ত্রণায় কাতরানর শব্দ শুনে অবাক হয়ে উঠে বসলেন।

'কি হল? বুড়ী খুকি, তুমি এখনও এখানে বসে আছ? কাতরানি শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম, এ ত গোরুর গলার আওয়াজ নয়।'

কাতরাচ্ছিল লিসা। এতক্ষণে তার আসল প্রসব-বেদনা স্থুরু হয়েছিল। যন্ত্রণায় সে কুঁকড়ে পড়েছিল। তার পেটের নাড়ি-ভুঁড়ি যেন ছিঁড়ে যাচ্ছিল।

'ঈশ্বরের দোহাই! যাও, ঘরে গিয়ে নিজের ব্যবস্থা করগে। এখানে আমাকে আমার কাজ করতে দাও। সত্যি বলছি, তোমার জন্যে আমার কাজে বাগড়া পড়ছে, আমার পিছনে বসে ওভাবে কাতরাচ্ছ, আমি কাজে মন বসাতে পারছি না। যাও, এরকম করছ কেন? তোমরা ওকে সরিয়ে নিয়ে যাও।'

ফ্রিমাতের বউ আর বেকুর বউ ঠিক করল, লিসার দু'হাত ধরে ওরা তাকে তার ঘরে নিয়ে যাবে। লিসা তাদের কথা শুনল, তার আর বাধা দেওয়ার ক্ষমতা নেই। রান্নাঘরে ওরা এসে ঢুকল। ঘরে একটা মোমবাতি জ্বলছে। লিসা বলল সব জানালা-দরজা খুলে দিতে, তাহলে সে দূরে আছে বলে মনে করবে না। সন্তান প্রসবের জন্য একটা বিছানা পেতে ফেলল ফ্রিমাতের বউ। বিছানাটা হল গ্রামের কায়দায়—ঘরের মাঝখানে খড় পেতে তার উপর শুধু চাদর পাতা এবং এক দিকে তিনখানা উল্টানো চেয়ার। লিসা উবু হয়ে বসল, পা দু'খানা দিল দু'ধারে ছড়িয়ে। একখানা উল্টানো চেয়ারে ঠেসান দিল। একখানা চেয়ারে ডান পা এবং আর একখানা চেয়ারে বাঁ পা ঠেস দেওয়া। তখনও সে পোশাক খোলবার সময় পায় নি। চটি পায়ে দেওয়া অবস্থায় চেয়ারে পায়ের ঠেস দিল। নীল মোজা হাঁটু পর্যন্ত টানা, স্কার্ট গোটানো বুক পর্যন্ত। মোটাসোটা থলথলে, মৃতদেহের মতন সাদা জানুদুটো এবং বিশাল

জয়ঢাক পেট একদম আদুল। দুই জানু এত ফাঁক করে ছড়ানো যে, তার ভিতরটা পর্যন্ত নজরে পড়ছে।

ম'সিয়ে পাতয়েরকে আলো দেখাবার জন্যে বুতো এবং ফ্রানকয়েক গোয়ালে ছিল। ওরা উবু হয়ে বসে খুব কাছে বাতি ধরেছিল আর গো-চিকিৎসক আবার শুয়ে পড়ে ছুরি দিয়ে বাছুরের বাম জানুর খানিকটা মাংস কেটে বার করলেন। এরপর চামড়া ছাড়িয়ে কাঁধ টেনে বার করলেন, সে বেরিয়ে ভেঙ্গে গেল। ওই দেখে ফ্রানকয়েসের মুখ শুকিয়ে গেল, ভয় পেল। তার হাত থেকে বাতিটি পড়ে গেল এবং সে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে পালাল:

'হতভাগিনী কলিচ্! তোর এদশা আর দেখতে পারব না!'

পাতয়ের রেগে গেলেন। মোমবাতিটা পড়ে যাওয়ায় খড়ে আগুন ধবে গিয়েছিল। তাঁকে উঠে পড়ে আগুন নেভাতে হল বলে তাঁর রাগ আরও বাড়ল।

'ওই বাচ্চা মেয়েটা দেখছি মহিলাদের মতন ভাবপ্রবণ! ও দেখছি মাংস ঝলসানোর মতন আমাদের ঝলসাতো!'

যে ঘরে ওর দিদি প্রসব যন্ত্রণা ভোগ করছিল ফ্রানকয়েস সেই ঘরে ছুটে এসে একখানা চেয়ারে বসে পড়ল। লিসার হাঁ করা দু'জানু দেখে তার মধ্যে আবেগের কোনও পরিবর্তন ঘটল না, বরং এই মাত্র গোয়ালে যা দেখে এসেছে তার তুলনায় এটা স্বাভাবিক আর অতি সাধাবণ। গো-চিকিৎসক কি ভাবে জীবন্ত মাংস কেটে কেটে বার করছে সে স্মৃতি সে তাড়াতাড়ি ভুলতে চায় এবং গোরুটার কি অবস্থা তারা করছে তা তোতলাতে তোতলাতে বলল।

'ওটা ভাল হচ্ছে না! আমাকে ওখানে ফিরে যেতেই হবে।' সহসা লিসা বলল, অসহ্য যন্ত্রণা হওয়া সত্ত্বেও চেয়ার থেকে সে উঠে দাঁড়াল।

কিন্তু ফ্রিমাতের বউ আর বেকুর বউ তাকে জোর করে ধরে বসিয়ে দিল। বলল—'বস ঠাণ্ডা হয়ে। তোমার কি হয়েছে?'

ফ্রিমাতের বউ আরও যোগ করল—'ঠিক আছে, তোমারও জল ভাঙ্গছে!'

সহসা হুড় হুড করে জল বেরিয়ে এল। চাদবের নীচে শুকনো খড় তখনি সব জল শুষে নিল। এবাব প্রসব বেদনাব অন্তিম পর্ব সুরু হল। আদুল পেট আপনা থেকে ঝুলে পডল এবং তার ফাট-ফাট অবস্থা হল। নীল মোজায় ঢাকা পা দু'খানা একবার মুড়ছে আবার খুলে যাচ্ছে, যেন অচেতনভাবে সে ডুবন্ত ব্যাঙের মতন অঙ্গ-ভঙ্গি করছে।

বেকুর বউ বলল—'দেখ, তোমাকে ঠাণ্ডা রাখার জন্যে ওখানে কি হচ্ছে দেখে এসে বলছি।'

এর পর থেকে সে শোবার ঘর ও গোয়ালের মধ্যে যাতায়াত করতে লাগল। শেষ দিকে হাঁটার পরিশ্রম থেকে বাঁচার জন্য সে রান্নাঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কি হচ্ছে না হচ্ছে চেঁচিয়ে বলতে লাগল। গো-চিকিৎসক রক্তমাখা দেহ-খণ্ডগুলো কেটে কেটে বার করে গোবরের উপর ছুঁড়ে ফেলছিলেন। তাঁর সারা

দেহ রক্ত আর গোবরে মাখামাখি। বড় জঘন্য কাজ।

বেকুর বউ বলল—'সব ঠিক আছে, লিসা। ভেব না, কোঁৎ পাড়। বাছুরের অন্য কাঁধ আমরা বার করতে পেরেছি। এবার মাথাটা বার করা হচ্ছে। উনি মাথাটা বার করেছেন। আঃ কি বড় মাথাটা! সব কাজ শেষ। দেহের বাকি অংশ এবার এক সাথে বেরিয়ে এসেছে।'

কাটাকুটির প্রত্যেকটা খবরই লিসা পাচ্ছিল এবং সে হৃদয়-বিদারক দীর্ঘশ্বাস ফেলে সব শুনছিল। কেউ বলতে পারছিল না যে, সে নিজের দৈহিক যন্ত্রণার জন্য, না বাছুরটার জন্য এমন কষ্ট পাচ্ছিল মনে। সহসা বুতো বাছুরটার মাথা নিয়ে এল তাকে দেখাবার ইচ্ছায়।

এবং লিসার প্রসব-যন্ত্রণা তখনও থামে নি, আশ্বাসদানের অযোগ্য হতাশায় অভিভূত হয়ে সে সজোরে কোঁৎ দিল। তার দেহের মাংসপেশীগুলো টান টান হয়ে উঠল, জানু দুটো উঠল আবও ফুলে।

'হায় ঈশ্বব, কি ভয়ানক জিনিস! অমন আশ্চর্যজনক বাছুরটা! জঘন্য দৃশ্য এটা! অমন সুন্দর বাছুর সহজে চোখে পড়ে না!'

ফ্রানকয়েসও কাতরাচ্ছিল। সবারই মনে প্রতিবাদের ফল্গুস্রোত। ফলে মঁসিয়ে পাতয়ের অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি ছুটে বেরিয়ে যেতে গিয়েও অভদ্রতা হবে বলে দোব-গোড়ায় দাঁড়িয়ে পড়লেন।

'শোন এবাব! তোমাদের ত সাবধান করেই দিয়েছিলাম। তোমরা গোরুটাকে বাঁচাতে বলেছিলে! শয়তান, তোমাদের আমি চিনি! সকলকে নিশ্চয় তোমরা বলে বেড়াবে না যে আমি তোমাদের বাছুরটাকে মেরে ফেলেছি, বেড়াবে কি?'

তাঁর সাথে গোয়ালের দিকে যেতে যেতে বুতো বলল—'না না, নিশ্চয় বলব না। একই কথা, আপনি ওটাকে কেটে কেটে বার করেছেন।'

সেই তিনখানা চেয়ারের মাঝখানে লিসা মেঝের উপর পড়ে আছে। তার চামড়ার নীচে মাংস মাঝে মাঝে ভয়ানক ব্যথায় কেঁপে কেঁপে উঠছে, ব্যথার জন্ম হচ্ছে তার পেটের ভিতর থেকে এবং ঢেউয়ের মতন ব্যথা ফুলে উঠে আবার নামছে, শেষ হচ্ছে দুই জানুর মাঝখানে। দারুণ হতাশায় এতক্ষণ এসব কিছু ফ্রানকয়েসের নজরে পড়ে নি, এখন সামনে দাঁড়িয়ে দিদির অবস্থা দেখে সে ভয়ে পাথর হয়ে গেল। উলঙ্গিনী দিদিকে যেন আরও খর্বকায়া মনে হচ্ছে। সে শুধু দেখছে কোণাকৃতি দুটো উন্নীত হাঁটুর দু'ধারে বাম আর ডান দিকে কুঁজের মত পেটের অংশ আর মাঝ বরাবর একটা বিশাল গর্ত, এই গর্তটা এত অভাবিত, দেখার অযোগ্য এবং বিশাল যে সে একেবারেই বিহ্বল হল না। এমন জিনিসের কল্পনা সে কখনও করে নি, এ যেন তুরপুনের নলের হাঁ-করা মুখ, চিলে কোঠার খোলা জানালা আর তার চারধারে আইভি লতার কালো আচ্ছাদন। তারপর সে দেখল আর একটা গোল আকৃতি, একটু ছোট…

ওটা শিশুর মাথা···প্রতিবার কোঁৎ দেওয়ার সাথে সাথে ওটা একবার বেরোচ্ছে আবার ভিতরে ঢুকছে, যেন এক চিরন্তন লুকোচুরি খেলায় ওটা মেতেছে। এই দেখে ফ্রানকয়েসের দারুণ হাসি পেল, কিন্তু সে হাসতে পারল না পাছে লোকে তাকে সমবেদনাহীনা বলে দোষ দেয় তাই সে কাশতে বাধ্য হল।

ফ্রিমাতের বউ বলল—'আর একটু ধৈর্য ধর। ওটা এখুনি বেরিয়ে আসবে।'

লিসার দু পায়ের মাঝখানে শিশুটাকে ধরবার জন্যে সে হাঁটু গেড়ে বসেছিল, কিন্তু বেকুব বউ বলল যে, ওটা মজা করছে। একবার ত ওটা একেবারে ভিতরে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল। এবং তখনই কেবল ফ্রানকয়েস তার সামনে উনুনের ঢাকা সরানো মুখের মতন জায়গাটা থেকে তার বিস্মিত দৃষ্টি সরিয়ে নিল। লজ্জায় সে অভিভূত হয়ে পড়ল এবং এগিয়ে গিয়ে দিদির হাত আঁকড়ে ধরল। অন্য দিকে দৃষ্টি সরিয়ে নিলেও সে তার জন্য দুঃখিত হল।

'দিদি, তোর বোধহয় খুব যন্ত্রণা হচ্ছে!'

'হাঁ, যন্ত্রণা হচ্ছে। কেউ আমার জন্যে দুঃখিত নয়। যদি কেউ আমার জন্যে একটু দুঃখ পেত! ওই আবার যন্ত্রণা সুরু হচ্ছে! দারুণ যন্ত্রণা! এ হয়ত কখনও থামবে না।'

হয়ত আরও অনেকক্ষণ এমনি যন্ত্রণা চলত, সহসা গোয়ালের দিক থেকে সোচ্চার চিৎকার ভেসে এল। পাতয়ের অবাক হয়ে দেখলেন সে, কলিচ্। এখনও অস্থিরভাবে মৃদু গলায় ডাকছে। তখনই তাঁর সন্দেহ হল, ওর পেটে দ্বিতীয় একটা বাছুর আছে বোধহয়। সত্যি সত্যি তিনি আবার হাত ঢুকিয়ে দিলেন এবং অতি সহজে আর একটা বাছুর টেনে বার করলেন। এবার আর অসুবিধা হল না, যেন পকেট থেকে রুমাল বার করছেন এমনি একটা ভাব। তিনি এত আনন্দিত ও খোশ-মেজাজী হয়ে উঠলেন যে, ভদ্রতা ভুলে গিয়ে বাছুরটাকে কোলে করে লিসার ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। বুতোও হাসতে হাসতে তাঁর সঙ্গে গেল।

'এই নাও, বুড়ী! একটা বাছুর চেয়েছিলে এই নাও!'

'এ্যাপ্রন' পরা দেহের নীচের অংশ উলঙ্গ, হাত-মুখ এবং প্রায় সারা দেহে গোবর আর রক্ত··· বাছুরটার দেহ এখনও ভেজা, মস্ত বড় একটা মাথা, তার দু'চোখে বিস্ময় যেন মদে মাতাল। এবং এ অবস্থায় তিনি গলা ছেড়ে হাসতে লাগলেন।

সবাই আনন্দে সোচ্চার·· লিসা যখন বাছুরটা দেখল তখন তার মধ্যে অসংযত, অসীম হাসির আবেগ দেখা দিল। সে হাসতে সুরু করল।

'আহা! কি সুন্দর বাছুর! কি অসভ্য তুমি আমাকে এভাবে এত হাসাচ্ছ! দারুণ যন্ত্রণা বাড়ছে, যন্ত্রণা আমার দেহ দু টুকরো করে ফেলছে। না না, আমাকে আর হাসিও না! আর হাসতে পারছি না!'

প্রচণ্ড হাসিতে তার হৃষ্টপুষ্ট স্তন-যুগল নাচতে লাগল এবং দমকা ঝড়ের

মতন হাসির ধমক নেমে গেল পেটের মধ্যে। তার সারা দেহ দুলে উঠল, আবার শিশুর মাথা বাইরে-ভিতরে যাওয়া-আসা করতে লাগল যেন কামান দাগার আগের মুহূর্তে কামানের গোলার মতন অবস্থা।

কিন্তু এখনও শেষ পরিণতির সময় আসে নি। গো-চিকিৎসক বাছুরটাকে তাঁর সামনে নামিয়ে রেখে হাতের পিঠে ঘাম মুছতে চেষ্টা করলেন। তাঁর কপালে গোবরের টানা দাগ পড়ল। প্রত্যেকেই বেদম হাসতে লাগল। প্রসব-বেদনায় আর্ত মেয়েটির হাসির চোটে প্রায় দম বন্ধ হয়ে এল। ডিম পাড়তে উদ্যত মুরগীর মতন সে ককিয়ে কেঁদে উঠল।

'আমাকে মেরে ফেলল! থামাও হাসি। তোমাদের জঘন্য তামাসা আমার দেহ ফাটিয়ে দেবে। হায় ঈশ্বর! এই যন্ত্রণা আমায় শেষ করবে।'

গর্তের ফাঁক আরও গোল হল, এত বড় যে, ফ্রিমাতের বউকে গিলে ফেলবে, সে তখনও ওখানে হাঁটু গেড়ে বসেছিল। সহসা যেন একটা নারী-কামানের মুখ থেকে শিশুটা ছিটকে বেরিয়ে এল···লাল টুকটুকে চেহারা দেহের, শেষভাগ দুর্বল এবং বিবর্ণ। একটা বড় পাত্রের জল পড়ার মতন শব্দ হচ্ছে শুধু। শিশুটি মিউ মিউ আওয়াজ করল, আর তার মা বেদম হাসতে লাগল, চুপসে যাওয়া একটা চামড়ার বোতলের মতন তার পেট নড়ছিল। তার দেহের এক অংশ থেকে কান্না উথলে উঠছে আর এক অংশে হাসির তুফান। বুতো তার জানু থাবড়াল, বেকুর বউ তাকে পাশ থেকে ধরেছিল, মঁসিয়ে পাতয়ের খুব হাসছিলেন। আর ফ্রানকয়েস তার দিদি যখন শেষবারের জন্য কোঁৎ পাড়ছিল তখন তার হাত ধরেছিল, এখন সে হাসতে লাগল, না আর তার দিদির হাত ধরে থাকার দরকার নেই। কিন্তু তখনও সে তার দিদির পেটটাকে একটা গীর্জা বলে মনে করছিল এবং তার মধ্যে সে তার স্বামীকে সম্পূর্ণ গ্রাস করে নিতে পারে।

ফ্রিমাতের বউ বলল—'একটা মেয়ে হয়েছে।'

লিসা বলল—'না না। মেয়ে চাই না, ছেলে চাই।'

'বেশত খুকু, আমি ওটাকে ফের ভিতরে ঢুকিয়ে দিচ্ছি। কাল ছেলে পাবে।'

আরও জোরে হাসির তুফান ছুটল। তারা সত্যিই হাসতে হাসতে অসুস্থ হয়ে পড়ল। বাছুরটা তখনও তার সামনে রয়েছে, লিসা সেটার দিকে তাকাল। ধীরে ধীরে শান্ত হল।

সে দুঃখ প্রকাশ করল—অন্যটা আরও সুন্দর ছিল। ভালই হত, আমরা দুটো বাছুর পেতাম।

কলিচ্‌কে বোতল তিনেক মিষ্টি মদ খাওয়ানো হলে মঁসিয়ে পাতয়ের চলে গেলেন। শোবার ঘরে ফ্রিমাতের বউ লিসার পোশাক বদলিয়ে তাকে বিছানায় শুইয়ে দিল। বেকুর বউ আর ফ্রানকয়েস খড় বাইরে ফেলে ঘরখানা ধুয়ে

ফেলল। মিনিট দশেকের মধ্যে সব কিছু গুছিয়ে ফেলা হল, এখানে যে সন্তান প্রসব করানো হয়েছে তা আর বোঝা যাচ্ছে না। শুধু বাচ্চাটা এক নাগাড়ে কাঁদছে তাকে গরম জলে ধোওয়ানো হচ্ছে। তারপর তাকে গরম জামা-কাপড়ে মুড়ে দোলনায় শোওয়ানো হল, ধীরে ধীরে তার কান্না থামল। তার মা সম্পূর্ণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, এখন ঘুমোতে লাগল। মোটা চাদরে ঢাকা তার দেহ, মুখখানা কাশিবর্ণ।

এগারটার সময় পড়শী দু জন চলে গেল। ফ্রানকয়েস বলল বুতোকে তার এখন খড়ের ঘরে গিয়ে ঘুমোনই ভাল। সে মেঝেতে একখানা মাদুর পেতে শুয়ে রাতটা দিদির কাছে কাটাতে চাইছিল। নীরবে পাইপ টানতে লাগল বুতো, জবাব দিল না। সব কিছু এখন অচঞ্চল। শুধু ঘুমন্ত লিসার নাক ডাকছে। তারপর ঘরের অন্ধকার কোণে মাদুরে শোবার জন্যে হাঁটু মুড়ে বসল। বুতো তখনও নীরব। সহসা সে পিছন থেকে ফ্রানকয়েসকে ঠেলে ফেলে দিল। এবার মাথা ঘোরাল ফ্রানকয়েস। তার মুখের টান-টান রক্তিম অবস্থা থেকে সব কিছু বুঝতে পারল তৎক্ষণাৎ। লালসায় তার মন আচ্ছন্ন, তাকে উপভোগ করবার লালসা তার মন থেকে দূর হয় নি। সহসা এমনিভাবে, তার বউ যখন খুব নিকটেই শুয়ে আছে, তখন তাকে উপভোগ করবার লালসা প্রকাশ করে লোকটা তার লাম্পট্য জাহির করল। অথচ একটু আগেই যে সব দৃশ্য সে দেখল তা এতটুকু সুখপ্রদ নয়। ফানকয়েস তাকে ঠেলে ফেলে দিল। নিঃশব্দে দু জনের মধ্যে রুদ্ধশ্বাস ধস্তাধস্তি সুরু হল। চাপা গলায় তাকে বলল বুতো:

'এস না গো, এতে কি হবে? তোমাদের দু জনকে সামলানোর ক্ষমতা আমার আছে।'

বুতো ভালভাবেই জানে যে, ফ্রানকয়েস চেঁচাবে না। প্রকৃতপক্ষে একটি কথাও না বলে সে প্রতিরোধ করতে লাগল, মনে মনে সে এত অহঙ্কারী যে, সে তার দিদিকে কিছুতেই ডাকবে না। নিজের ব্যাপারে সে কাউকে নাক গলাতে দেবে না, এমন কি দিদি লিসাকেও না। বুতো তার শ্বাস রোধ করে তাকে প্রায় পেড়ে ফেলেছিল।

'জান খুব ভাল লাগবে। আমরা সবাই একসাথে থাকব, আলাদা থাকতে হবে না।'

কিন্তু সহসা বুতো যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল, ফ্রানকয়েস তার নখ ফুটিয়ে দিল বুতোর ঘাড়ে। এবার সে রেগেমেগে জাঁয়ের উল্লেখ করল।

'যদি ওই বেজন্মাটাকে বিয়ে করবি বলে ভেবে থাকিস ত সাবালিকা না হওয়া পর্যন্ত পারবি না।

এবার সে তার স্কার্টের নীচে তার নিষ্ঠুর হাত ভরে দিয়ে তাকে কায়দা করতে চাইল, কিন্তু ফ্রানকয়েস তাকে এমন লাথি কষাল যে, সে যন্ত্রণায় আবার ককিয়ে উঠল। এক লাফে উঠে দাঁড়াল বুতো, ভীত চোখে বিছানার দিকে

তাকাল। তার বউ এখনও ঘুমোচ্ছে এবং সমতালে শ্বাস নিচ্ছে। তাকে ভীষণভাবে শাসিয়ে সে চলে গেল।

শান্ত মনে ফ্রানকয়েস তার বিছানায় এবার শুয়ে পড়ল। নিদ্রাহীন দু চোখ। সে এসব কামনা করে না, করলেও কখ্‌খনো ওকে করতে দেবে না। সে বিস্মিত হল, কেননা জঁাকে বিয়ে করার ইচ্ছে এখনও তার মাথায় আসে নি।

৫

রগনি গ্রামের লাগোয়া হোরদিকুইনের ক্ষেতে আজ দু দিন ধরে জঁা কাজ করছে। শাটোদুনের এক ইঞ্জিনীয়ারের কাছ থেকে ভাড়া করে আনা বাষ্প-চালিত একটা গম-ঝাড়াই কল বসিয়েছে খামারের মালিক। ইঞ্জিনীয়ার ভদ্রলোক এই কলটা বনভ্যাল এবং ক্লয়েসের মধ্যে ভাড়া খাটান। ঘোড়া দুটো আর গাড়ী নিয়ে যুবক জঁা লাগোয়া ক্ষেত থেকে অাঁটি বয়ে নিয়ে আসছে এবং গম ভর্তি বস্তা নিয়ে খামারে পৌছে দিচ্ছে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কলটা শ্বাস ফেলে চলছে, রোদে সোনালি ধুলো উড়ছে এবং সারা গ্রাম অবিরাম জোরালো নাক ডাকার মতন আওয়াজে ভরে আছে।

জঁায়ের মনে অসুখ। আবার ফ্রানকয়েসকে দেখবার জন্যে তার মগজে একটা ফন্দি আবিষ্কারের চেষ্টা করছে। এই যে ক্ষেতে আজ তারা গম ঝাড়াই করছে এখানেই একমাস আগে সে ফ্রানকয়েসকে বুকে জড়িয়ে ধরবার সুযোগ পেয়েছিল এবং তারপর থেকেই ফ্রানকয়েস তাকে এড়িয়ে চলছে কারণ হয়ত সে তাকে ভয় করে। তার কাছে যাওয়া সম্পর্কে সে হতাশ হয়ে পড়ছে, কিন্তু তবু আগের চেয়ে তার প্রতি তার আকর্ষণ অনেক তীব্র হয়েছে এবং কামনায় তার মন কানায় কানায় ভরপুর। ঘোড়া ছোটাতে ছোটাতে সে অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, সে সোজা বুতোর কাছে গিয়ে বলছে না কেন যে, সে ফ্রানকয়েসকে বিয়ে করতে চায়। আর তাদের মধ্যে যখন স্পষ্টত এবং চরম বিচ্ছেদ এখনও হয় নি। তারা পাশ দিয়ে চলে গেলে এখনও ত তারা পরস্পরকে বিদায় সম্ভাষণ জানায়। মেয়েটিকে পাওয়ার জন্যে বিয়ে করার মতলবটা যেমনি তার মগজে এল অমনি এই উপায়টা সম্বন্ধে তার মন স্থির হয়ে গেল। তার মনে বিশ্বাস জন্মাল যে, এটাই তার কর্তব্য। এবং যদি সে তাকে বিয়ে না করে তবে তার সততা থাকবে না।

তবু পরের দিন কলে কাজ করতে গেলে তার মন জুড়ে ভয় চেপে বসল। বুতো এবং ফ্রানকয়েসকে একসাথে মাঠের কাজে যেতে না দেখলে সে কখনও তাদের সঙ্গে দেখা করার ঝুঁকি নিত না। সে বুঝেছিল যে, লিসা সব সময় তার সম্বন্ধে ভাল ধারণা পোষণ করে তাই সে তার সম্বন্ধে কম ভীত। এক বন্ধুর কাছে ঘোড়াদুটোকে বিশ্বাস করে রেখে সে বেরিয়ে পড়ল।

লিসা আতুড়-ঘর থেকে বেরিয়েছে। তার শরীর এখন সেরেছে এবং বেশ

খোশ-মেজাজে আছে। তাকে দেখে লিসা বলে উঠল—'আরে জঁা যে! তোমাকে ত আর দেখতেই পাই নে। কি হয়েছে?'

ক্ষমা চাইল জঁা। তারপর কাপুরুষ-সুলভ বিশেষ ধরনের লাজুকতার দরুণ সে তাড়াতাড়ি নিজের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করল। লিসা প্রথমে ভেবেছিল সে হয়ত কোনও প্রস্তাব করছে তার কাছে, কেননা জঁা তাকে মনে করিয়ে দিল যে, সে সব সময় তাকে পছন্দ করে এবং স্বেচ্ছায় তাকে বিয়ে করতেও চেয়েছিল।

জঁা তাড়াতাড়ি বলে উঠল—'সেই কারণেই আমি ফ্রানকয়েসকে বিয়ে করতে চাই যদি তোমরা আমার সাথে তার বিয়ে দাও।'

লিসা এমন অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল যে, জঁা তোতলাতে লাগল।

'আমি জানি যে, এই বিবাহ সহজে হবে না তাই ত তোমার সাথে কথা বলতে এসেছি।'

অবশেষে লিসা বলল—'হায় ঈশ্বর! আমি অবাক হচ্ছি, তোমাদের মধ্যে বয়সের এত তফাৎ তাই এমন প্রস্তাব আমি ভাবতেই পারি নি। প্রথমে আমাদের ফ্রানকয়েসের কাছ থেকে জেনে নিতে হবে যে, সে কি ভাবছে।'

বিয়ের প্রয়োজন বোঝাবার জন্যে সে সব কিছু খুলে বলবে বলেই একটা নির্দিষ্ট মতলব করেছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে একটা সন্দেহ তাকে দ্বিধায় ফেলল। যদি ফ্রানকয়েস তার দিদিকে সব কথা না বলে থাকে, আর বলেছে কি-না তা' অনুমান করাও যায় না, তেমন হলে তার আগে বলার কোনও অধিকার কি আছে? এর জন্যে তার মনের সাহস ফুরিয়ে গেল এবং নিজের তেত্রিশ বছর বয়স হওয়ার জন্য লজ্জা অনুভব করল।

সে আওড়াল—'অবশ্যই আমরা এ ব্যাপার নিয়ে তার সাথে কথা বলব। তাকে আমরা জোর করতে পারি না।'

যা' হোক লিসা বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠল এবং উল্লসিত মনে তার দিকে তাকাল। এটা পরিষ্কার যে, এই প্রস্তাবে সে অখুশি হয় নি। প্রকৃতপক্ষে সে তার সঙ্গে সুন্দর ব্যবহার করে।

'সে যা' চাইবে আমরা তাই করব, জঁা। বুতো ভাবে যে, ফ্রানকয়েস এখনও ছোট কিন্তু আমি তা' ভাবি না। তার প্রায় আঠার বছর বয়স হল। একটা কেন এখন দুটো মরদকে সামলানোর বয়স তার হয়েছে। এবং আর কি, দু বোন পরস্পরকে ভালবাসতে পারে ঠিকই কিন্তু এখন তার বয়স হয়েছে এবং বদলে আমি না হয় একজন চাকর রেখে দেব। যদি সে হাঁ বলে, তাকে বিয়ে করো। তুমি ত খুবই ভাল এবং বয়স্ক মরদ-ই উত্তম।'

ফ্রানকয়েস লম্বা-হাতল শস্য ঝাড়াইয়ের কাষ্ঠ-খণ্ড আর কাঠের পাখা দু'হাতে তুলে নিল। এ দুটো চামড়ার দড়ি দিয়ে আটকানো। এ যন্ত্রটা তার নিজের বহু-ব্যবহারে বেশ মসৃণ। হাত থেকে যাতে খসে না যায় তাই শক্ত করে দড়ি দিয়ে

বাঁধা। লম্বা হাতল যন্ত্রটা দু হাতে মাথার উপর তুলে গমের খড়ে আছড়াল। কাঠের পাখা সজোরে খড়ের দৈর্ঘ বরাবর আছড়ে পড়ল। তারপর চলল তার গম ঝাড়াইয়ের কাজ, যন্ত্রটাকে আবার মাথার উপর তুলল, যেন কব্জা লাগানো এমনিভাবে নোয়ালো এবং যান্ত্রিকভাবে আছড়াল যেমন ভাবে কামার তালে তালে হাতুর চালায় তেমনিভাবে তাল রেখে যন্ত্রটি আছড়াতে লাগল। ঠিক তার বিপরীত দিকে দাঁড়িয়ে বুতোও কাজ করছিল—ফ্রানকয়েসের যন্ত্রটি যখন উপরে উঠছিল, বুতোর হাতেরটা তখন আছড়ে পড়ছিল। ক্রমে ক্রমে তাদের দেহ গরম হয়ে উঠল, যন্ত্রের উঠা-নামার তাল হল দ্রুততর। আর কিছুই নজরে পড়ছে না শুধু পায়ে দড়ি বাঁধা পাখীদের মতন সেই যন্ত্র উপরে উঠে তাদের মাথার চারধারে চক্কর দিয়ে আছড়ে পড়ছে।

ফ্রানকয়েসের মুখখানা লাল টকটকে হয়ে উঠেছে, ফুলে উঠেছে হাতের কব্জি দুটো, গায়ের চামড়া জ্বলছে, তাদের চারধারে আকাশে-বাতাসে জ্বলজ্বলে রোদের ব্যাপ্তি নজরে পড়ছে। তার ঠোঁট দু'খানা ঈষৎ ফাঁক এবং সে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। ছোট ছোট খড়-কুটো তার খোলা চুলে জড়িয়ে রয়েছে। প্রতিবার যন্ত্রটা মাথার উপর তুলবার সময় তার ডান পা-খানা স্কার্টের নীচ থেকে বেরিয়ে পড়ছে, নিতম্ব আর স্তন-যুগল ঠেলে বেরিয়ে আসছে। সহসা তার দেহের রেখাসমূহ টান টান হয়ে উঠেছে এবং সুগঠিত দেহ-বল্লরী যেন একেবারে উলঙ্গ হয়ে পড়ছে। তার স্তন-বন্ধনীর একটা বোতাম গেছে ছিঁড়ে। রোদ-পোড়া গলার নীচে পেলব সাদা আদুল দেহ-ত্বকের অনেকটা অংশ বুতোর নজরে পড়ছে। এবং প্রতিবার কাঁধ ও বাহুর ভয়ানক আন্দোলনের সময় আরও বেশী করে সাদা মাংস পিণ্ড-যুগল নগ্ন হয়ে পড়ছে। একজন শক্তিমতী নারী যখন কঠোর পরিশ্রম করে তখন তার দেহের আন্দোলনের দৃশ্য পুরুষের কাছে খুবই উত্তেজক। এমনিভাবে শস্য-ঝাড়াইয়ের কাজ চলতে লাগল। শস্যের দানাগুলো শূন্যে লাফিয়ে উঠে বৃষ্টির ধারার মতন আবার নীচে ঝরে পড়ছিল আর ওরা কর্মী দু'জন সমানে তালে তালে হাঁপাতে হাঁপাতে হাতের যন্ত্র চালাচ্ছিল।

তখন পৌনে সাতটা—আঁধার ঘনিয়ে আসছে। ফৌআন এবং ডেলহোমি এল ওখানে।

কাজ না থামিয়ে বুতো চেঁচিয়ে ওদের বললে—'আজ আমরা এ কাজটা শেষ করবো, পেটাও ফ্রানকয়েস!'

সে থামল না, আরও জোরে কাজ করতে লাগল। কর্মে আর শব্দে সে যেন দারুণ উত্তেজনার স্বাদ লাভ করেছে। ঠিক তখনি খাওয়ার ছুটি পেয়ে ওদের দু'জনকে কাজ করতে দেখে ওখানে এসে হাজির হল। সহসা তার মনে হিংসার ভাব জন্মাল—ওদের যেন সে হঠাৎ ধরে ফেলেছে, এই গুরু পরিশ্রমের কাজ তারা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে করছে, সময়ের তাল ঠিক রেখে সময়টিতে যন্ত্র

আছড়াচ্ছে, সারা দেহ ঘামে সিক্ত, উত্তপ্ত শরীর মন। পোশাক এমন বিস্রস্ত যেন ওরা শস্য ঝাড়াই করছে না, যৌন-সঙ্গমে রত হয়েছে। কঠোর পরিশ্রম করছিল ফ্রানকয়েস, তারও মনে বোধ হয় ওই একই ভাবের উদয় হল তাই সে লজ্জায় কাজ থামাল। তখন বুড়ো ঘাড় ঘোরাল এবং বিস্ময়ে রাগে এক মুহূর্তের জন্য নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'এখানে কেন এসেছ?'

কিন্তু লিসা এসে হাজির হল। তার সঙ্গে ফৌআন আর ডেলহোমি। সে উল্লাস-তরল কণ্ঠে বলে উঠল—'কেন, নিশ্চয়। তোমাকে এখনও ত বলি নি। আজ সকালে জাঁয়ের সাথে দেখা হয়েছিল এবং আমি সন্ধ্যেবেলায় তাকে আসতে নিমন্ত্রণ করেছি।'

লাল টকটকে মুখ তুলে তার স্বামী এমন চোখ রাঙল যে সে যেন ক্ষমা চাওয়ার ইচ্ছেয় আবার যোগ করল—'ফৌআন কাকাও বোধহয় তোমাকে কিছু বলতে চায়।'

বুড়ো বলল—'আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করবে?

এদের প্রত্যেকের সামনে সহসা ব্যাপারটার অবতারণা হতে সে বেশ লজ্জিত হল এবং তোতলাতে লাগল। তখন বুড়ো ভীষণভাবে প্রতিবাদ জানাল। তার বউয়ের আনন্দময় দৃষ্টি-ধারা ফ্রানকয়েসের উপর বর্ষিত হচ্ছে দেখে সে সব কিছু আন্দাজ করতে পারল।

বলল—'তুমি কি ভাবছ যে, আমরা সব বোকা? বুড়ো বদমাস, এই কচি মেয়েটা তোর উপযুক্ত নয়!'

এই কর্কশ সম্ভাষণ জাঁয়ের মনে সাহস সঞ্চার করল। সে ঘুরে দাঁড়িয়ে বুড়ো ফৌআনকে বলল—'ব্যাপারটা যে কি তা' তোমায় বলছি বাবা ফৌআন। একটা খুব সহজ ব্যাপার। তুমি ফ্রানকয়েসের অভিভাবক, তাই ওকে চাইলে তোমার কাছেই চাইতে হবে, তাই না? সে যদি আমাকে চায় তাহলে আমি তাকে বিয়ে করব। ওকে বিয়ে করার জন্যে তাই অনুমতি চাইছি।'

অবাক হল ফ্রানকয়েস, তার হাত থেকে শস্য-ঝাড়াইয়ের কাষ্ঠখণ্ডখানা পড়ে গেল। এটাই সে চাইছিল, একই কথা, কিন্তু সে একেবারেই ভাবে নি যে, জাঁ এত শীঘ্র তাকে বিয়ে করার কথা সাহস করে বলবে। সে আগে তার কাছে বলল না কেন? এটা তার কাছে খুবই আকস্মিক হল। সে কিছুতেই বলতে পারল না যে, সে আশায় অথবা ভয়ে কাঁপছে, এবং এখনও গুরু পরিশ্রমে জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছে, তার আলগা স্তন-বন্ধনীর আড়ালে স্তন-যুগল ওঠা-নামা করছে, দাঁড়িয়ে আছে দুই মরদের মাঝখানে। এত জোরে রক্তস্রোত তার ধমনীতে বইছে যে ওরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে তা' অনুভব করতে পারছে।

বুতো ফোঁআনকে জবাব দেওয়ার সুযোগ দিল না।

ক্রমবর্ধমান রাগে সে বলে উঠল—'আচ্ছা, তোমার খুব সাহস বেড়েছে! তেত্রিশ বছরের এক বুড়ো আঠারো বছরের একটা কচি মেয়েকে বিয়ে করতে চাইছে। তোমাদের মধ্যে পনের বছর বয়সের ফারাক। তোমার কি এটা বিরক্তিজনক অবস্থা মনে হচ্ছে না? তোমার কি মনে হয় বুড়ো ভাম হয়ে তুমি একটা মুরগীর ছানা ধরবে?'

এবার জঁা রেগে গেল।

'আমি যদি ওকে চাই এবং সে যদি আমাকে চায় তাতে তোমার কি?'

তারপর সে ফ্রানকয়েসের দিকে তাকাল যাতে সে তার মনের কথা বলতে পারে। কিন্তু তখনও ফ্রানকয়েস ভীত এবং উত্তেজিত, এমনভাবে তাকিয়ে আছে যেন সে কিছুই বুঝতে পারছে না। সে না বলতে পারছে না, কিন্তু হাঁ বলতেও পারছে না। বুতো উপরন্তু তার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে আছে যেন সে তাকে খুন করবে এবং হাঁ-শব্দটাকে তার গলা দিয়ে ভিতরে ঢুকিয়ে দেবে। ফ্রানকয়েস বিয়ে করলে সে তাকে হারাবে, হারাবে তার জমি—ক্ষেত। সহসা এই পরিণতির চিন্তা তাকে ক্ষিপ্ত করে তুলল।

'শোন! বাবা আর তুমি ডেলহোমি, এ লোকটা আমাদের জেলার মানুষও নয়, এই বুড়োর সঙ্গে ওই কচি মেয়েটার বিয়ের কথা ভাবতে তোমাদের ঘেন্না হচ্ছে না? আমরা জানি না, লোকটা কোথাকার, ও ত একটা ভবঘুরে। ছুতোরের কাজও পারল না, তারপর চাষের কাজ করছে, যেন নিজেকে গোপন করছে।'

ওর কথায় শহরের মজুরদের প্রতি তার মনের বিরূপতা প্রকাশ পেল।

'আমি যদি ওকে চাই এবং সে যদি আমাকে চায় তাতে তোমার কি?'—বুতো আবার আওড়াল। নিজেকে সে খাড়া রাখতে চাইল। নিজের কাহিনী ওদের বলবার আগে সে ভদ্রতা পরিত্যাগ করবে না শপথ করেছে। তারপর বলল—'ফ্রানকয়েস, তুমি এবার বল।'

বোনের যদি বিয়ে হয় তবে সে তার হাত থেকে মুক্তি পাবে, এই কামনায় অধীর হয়ে এবার লিসা বলে উঠল—'কিন্তু এটা ঠিক কথা! ধর, ওরা রাজী হল। তখন তুমি কি বলবে বাপু? তোমার মতামতে ওর প্রয়োজন নেই, ও খুব ভদ্র তাই এখনও তোমায় সহ্য করছে। তোমাকে নিয়ে আমরা দুজনেই জ্বালাতন হচ্ছি।'

এবার বুতো বুঝল যে, মেয়েটা যদি কথা বলে তবে ব্যাপারটা এখুনি স্থির হয়ে যাবে। সে বিশেষ করে ভীত হয়ে পড়ল যে, জঁায়ের সঙ্গে তার ব্যবহার যদি জানাজানি হয়ে যায় তবে তাদের বিয়ের সঙ্গত কারণ থাকবে। ঠিক সেই সময়ে গ্রাণ্ডির বউ মাঠে এসে হাজির হল, ঈলোডিকে নিয়ে মঁসিয়ে চার্লস ও তাঁর বউ ফিরছিলেন। বুতো তাঁদের ডাকল এবং তখনও সে বুঝতে পারছে

না কি বলবে। সহসা একটা মতলব তার মাথায় এল, উত্তেজনায় তার মুখ ভীষণ লাল হয়ে উঠল। বউ আর শালীব দিকে ঘুষি তুলে বুতো কঠিন কণ্ঠে বলল :

'অভিশপ্ত গোরু তোরা! হাঁ, তোরা দুটোই! গোরু! বেশ্যা! একটা কথা তোমাদের বলছি, শোন। এই দুই মাগির সাথেই আমি শুই! এবং ওরা আমার সাথে খুশিমতন রাতে কাম-কেলি করে—বলছি তোমাদের, ওদের দু'জনকে নিয়েই আমি রাত কাটাই। ওরা বেশ্যা!'

বিস্মিত চার্লস পরিবার ওর কথাগুলো শুনে লজ্জায় বিবর্ণ হলেন। মাদাম চার্লস তাড়াতাড়ি শ্রবণরত ঈলোডিকে যেন নিজের দেহের আড়ালে বাঁচাতে চাইলেন। তারপব তাকে তরকারির ক্ষেতের দিকে নিয়ে গিয়ে বললেন—'এস এদিকে। দেখ কি চমৎকার লেটুস আর বাঁধাকপি হয়েছে! কি সুন্দর বাঁধাকপিগুলো!'

বুতো তখন খুঁটিনাটি বর্ণনা করে চলেছে—'একটি মেয়ে যখন পুরোপুরি যৌবন জ্বালা তৃপ্ত করে আমার কাছ থেকে উঠে যায়, নিজেব ভাগ পুষিয়ে নেয় তখন অন্য মেয়েটি এসে শোয়। তাকে ভরে দিতে হয় একেবারে গলা পর্যন্ত তবে তার জ্বালা মেটে।' অশ্লীল ভাষায় সে সব বর্ণনা কবে। কাঁচা খিস্তিব তুফান ছোটায়। সে সব উল্লেখ করতে মনে বিদ্রোহ জাগে। এমন আকস্মিক আক্রমণে লিসা হতভম্ব হয়ে পড়ল এবং নিজের কাঁধ নাচাল।

লিসা বলল—'ও পাগল হয়ে গেছে। হায় ভগবান! এ সব অবিশ্বাস্য, মিথ্যা! নির্ঘাৎ ওর মাথা খাবাপ হয়ে গেছে!'

জঁা বলল ফ্রানকয়েসকে—'ওকে বল, এসব মিথ্যে কথা বলছে।'

শান্তভাবে বলল মেয়েটি—'নিশ্চয়! এসব মিথ্যে বলছে।'

বুতো বলতে লাগল—'বটে, আমি মিথ্যে কথা বলছি, তাই না? ফসল তোলার সময় তুমি আমার সাথে মজা করতে চেয়েছিলে খড়েব গাদায়, সেটা সত্যি নয়? কিন্তু এবার বলছি, আমার হাত ছাড়িয়ে তোমরা কোথায় যাবে! তোমরা দু'জনই অসতী মেয়েমানুষ!'

এই ভয়ানক উদ্ধতভাব জাঁয়ের দেহ নিথর করে ফেলল এবং সে হতভম্ব হয়ে পড়ল। ফ্রানকয়েসকে সে লাভ করেছে, একথা কি সে বলতে পারে? এখন ফ্রানকয়েস যদি তাকে সাহায্য না করে তবে এ দাবী করা নোঙরামি হয়ে দাঁড়াবে। অন্যবা, এমন কি ডেলহোমিরা, ফৌআন এবং গ্রাণ্ডির বউ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে বইল, তাদের মুখে রা নেই। তাবা একটুও বিস্মিত হয়েছে বলে মনে হল না এবং স্পষ্টতই তারা ভাবল যে, যদি বুতো সত্য সত্যই দু'বোনের সাথেই যৌন-সঙ্গম করে থাকে তবে সেই তাদের স্বামী এবং তাহলে তার খুশিমত কাজ সে কবতে পাবে। তোমাব অধিকার থাকলে তুমি সে অধিকাব খাটাতে পার।

তখন থেকে বুতোর ধাবণা হল যে, সে জয়ী হয়েছে এবং তার কর্তৃত্বের

অধিকার নিয়ে তাই কেউ প্রশ্ন করছে না। সে জাঁয়ের দিকে ঘুরে বলল:

'আর তুই, একটা শালা শুয়োরের বাচ্চা! আমার বাড়ীতে ঢুকে আর বিরক্ত করবি না! বেরো এখান থেকে এখুনি। কি রে যাবি না বুঝি? দাঁড়া, মজা দেখাচ্ছি!'

সে তার শস্য-ঝাড়াইয়ের কাষ্ঠখণ্ডটা নিয়ে মাথার উপর ঘোরাতে লাগল। নিজেকে বাঁচাবার জন্যে জাঁ তখন ফ্রানকয়েসের শস্য-ঝাড়াই কাষ্ঠখণ্ডটা হাতে তুলে নেওয়ার কেবল সময়টুকু পেল। অন্যরা চেঁচাতে চেঁচাতে তাদের ছাড়াতে চেষ্টা করল, কিন্তু মরদ দু জন তখন দারুণ চটে গিয়েছিল, তারা আবার পরস্পরকে তেড়ে এল। লম্বা হাতল অনেক দূর পর্যন্ত আঘাত হানতে পারে তাই তারা দূরে সরে দাঁড়াল। কেবল মরদ দু'জন মাঝখানে পরস্পর থেকে খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে তাল ঠুকতে লাগল, হাতিয়ারটাকে ঘোরাতে লাগল এমনভাবে যেন দূর থেকে আঘাত করতে পারে। তারা এখন নীরব, দাঁতে দাঁত চেপে লড়াইয়ে প্রবৃত্ত। আর কোনও শব্দ নেই, শুধু কাঠের যন্ত্র তীব্র তীক্ষ্ণ আওয়াজে মাঝে মাঝে মাটিতে আছড়ে পড়ছে।

বুতোই প্রথম আঘাত হানল, তখনও জাঁয়ের দেহ অবনত, সে যদি দ্রুত একপাশে লাফিয়ে পড়ত তাহলে তার মাথাটা ওই আঘাতে গুঁড়িয়ে যেত। দেহের মাংসপেশীগুলো শক্ত করে সহসা শস্য ঝাড়াইয়ের কাষ্ঠখণ্ডটা তুলল এবং শস্য পেটানর মতন সজোরে আঘাত করল। কিন্তু অন্য লোকটিও তখন আবার আঘাত করেছে। আহত পাখির ডানা ঝাপটানোর মতন দুটো যন্ত্রের পাখায় পাখায় ঠোকাঠুকি হল। বার তিনেক এরকম আঘাত প্রত্যাঘাত চলল।

মেয়েরা কান্না জুড়ে দিল, ডেলহোমি আর ফৌআন সামনে ছুটে এল। বুতোর বিশ্বাসঘাতক চাবুকের মতন হাতিয়ার মাটি বরাবর জাঁয়ের পায়ে আঘাত করল, খড়ের গাদায় উল্টে পড়ল জাঁয়ের দেহ, কিন্তু আঘাতের তীব্রতা কম ছিল তাই পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার জাঁ উঠে দাঁড়াল। যন্ত্রণায় এবং রাগে অস্থির হয়ে জাঁ দুরন্ত বেগে তার হাতিয়ার মাথার উপর ঘোরাতে সুরু করল। অনেকটা জায়গা জুড়ে বোঁ বোঁ করে ঘুরছিল। বুতো ভেবেছিল বাম দিকে আঘাত পড়বে কিন্তু জাঁ তার ডানদিকে আঘাত করল। আঘাত আর কয়েক ইঞ্চি উপরে পড়লে নির্ঘাৎ ওর মগজের ঘিলু ছিটকে বেরিয়ে আসত। তবে আঘাত পড়ল কানের কাছে এবং তীব্র আঘাত লাগল তার বাহুতে। সঙ্গে সঙ্গে হাড় ভেঙ্গে গেল। ভাঙ্গা কাঁচের মতন হাড়ভাঙ্গার শব্দ হল।

বুতো আর্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল—'খুন! ও আমাকে খুন করল!'

জাঁ তার হাতিয়ার নামাল। তার মুখ বিবর্ণ, দু'চোখ জবাফুলের মতন লাল। তারপর এক মুহূর্তের জন্য সে ওদের দিকে তাকাল···ওরা সবাই হতভম্ব, কেননা ঘটনা দ্রুত বদলে গেছে। তারপর গভীর হতাশায় সে খোঁড়াতে খোঁড়াতে

চলে গেল।

বাড়ীর বাঁক ঘুরে সমতলভূমির দিকে যাওয়ার পথে বোলডির সঙ্গে তার দেখা হল বাগানের ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে সে লড়াই দেখছিল। সে তখনও মুখে শব্দ করছিল। যেসাস ক্রাইস্ট যখন শুনবে যে, পরিবারের লোকজনের চোখের সামনেই বুতোর হাত মেরে ভেঙ্গে দিয়েছে তখন সে নির্ঘাৎ হাসিতে ফেটে পড়বে। সে কিলবিল করতে লাগল যেন কেউ তাকে কাতুকুতু দিচ্ছে এবং ব্যাপারটা তার কাছে খুব মজার মনে হওয়ায় সে হাসতে হাসতে প্রায় মাটিতে শুয়ে পড়ল।

সে চেঁচিয়ে বলল—'ও, করপোরাল! কি মার! মটাস করে হাড় ভেঙ্গে গেল। এটা আধাআধি মজাও হল না।'

জঁ৷ কোন জবাব দিল না, আরও ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগল। তাকে বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিল। বোলডি তার পিছনে পিছনে চলল, শিষ্ দিয়ে হাঁসগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে যেতে লাগল। দেওয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে এই যে সে সব শুনছিল তার একটা ওজর তৈরীর জন্যই সে হাঁসগুলোকে নিয়ে এসেছিল। আঁধার ঘনিয়ে আসছে। জঁা আপনা থেকেই শস্য ঝাড়াইয়ের কলটার দিকে হাঁটছিল কলটা এখনও চলছে। সে ভাবছিল সব শেষ হয়ে গেল, সে আর বুতোর বাড়ীতে মাথা গলাতে পারবে না, আর লাভ করতে পারবে না ফ্রানকয়েসকেও। কি বোকামি না হল! মাত্র দশ মিনিট লাগল ঘটনাটা ঘটতে, জিনিসটা যখন ভালর দিকেই গড়াচ্ছিল তখনই এই অবাঞ্ছিত বিবাদ সুরু হল এবং শেষ হল দুর্ভাগ্যজনক মারামারির মধ্য দিয়ে। এবং এখন আর কখনও নয়, কখনও নয়। দীর্ঘ আর গভীর বিলাপের মতন শস্য ঝাড়াই কলের গর্জন-ধ্বনি আঁধার ফুঁড়ে ভেসে আসছে।

চতুর্থ ভাগ

দিনটা ঝোড়ো বাতাসের দিন। উত্তপ্ত বাতাসের ঝাপটায় বড় বড় মেঘের খণ্ডগুলো দ্রুত ভেসে চলেছে। যখন সূর্যের মুখ মেঘমুক্ত হচ্ছে অমনি আগুনের মতন রোদ ঝরে পড়ছে। সেই সকাল থেকে মেষপালক সোলাস্ জলের অপেক্ষায় উৎকণ্ঠিত হয়ে রয়েছে বর্গনি গ্রামের উত্তরে কর্তিত ফসলের ক্ষেতে সে পশু চরাতে এসেছে, শুয়োর, ভেড়ার পাল আর তার নিজের জন্যে খামার থেকে জল বয়ে আনবে মজুররা, কেননা এই ক্ষেত থেকে জলাশয় অনেক দূরে।

মাঠের উপর কাঠ দিয়ে অস্থায়ী এবং বহনযোগ্য খোঁয়াড় তৈরী করা হয়েছে। পশুগুলো মাটিতে শুয়ে জোরে জোরে ঘন ঘন শ্বাস টানছে। কুকুর দুটো খোঁয়াড়ের বাইরে শুয়ে জিভ বার করে ধুঁকছে। দু'চাকার গাড়ীতে টানা কুঁড়ের গায়ে হেলান দিয়ে বসে আছে সৌলাস। চারণভূমি বদলাবার সময় সৌলাস কুঁড়ে ঘরখানাকে টেনে নিয়ে যায়। ছোট্ট সঙ্কীর্ণ কুঁড়ে ঘর···একটা ছোট বিছানা, পোশাক রাখবার আলনা এবং কিছু খাবার-দাবার থাকে কুঁড়ের মধ্যে, খানিকটা ছায়াও পাওয়া যায়।

বেলা দুটোর আগে কোন কিছুর চিহ্ন নজরে পড়ল না। রোদের তাপ বাড়ছে, দীর্ঘ প্রশান্তির ক্ষণ নেমে এল সহসা নির্জন পরিবেশে···অসহ্য এই অবস্থা। মাটি ধুলোয় পরিণত হয়েছে। ঘূর্ণিঝড়ের দাপটে ধুলোর ধোঁয়া উড়ছে···যেন অন্ধ করে ফেলছে, শ্বাসরোধ করছে···যন্ত্রণাদায়ক মানুষের তৃষ্ণা আরও বর্ধিত করছে। অবস্থা আরও সঙ্গীন হয়ে উঠছে।

মেষপালক উদাসীনভাবে অপেক্ষা করছে, তার মনে কোন অনুযোগ নেই। সহসা তার মুখে সোয়াস্তিতে ভাষা ফুটল :

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, খুব তাড়াতাড়ি না হলেও আসছে।'

মাঠের পারে দিগন্ত রেখায় দু'খানা গাড়ী নজরে পড়ল···হাতের মুঠোর মতন ছোট দু'খানা গাড়ী। একখানা গাড়ী চালাচ্ছে জঁ। জলের পিপেগুলো পরিষ্কার নজরে পড়ছে সৌলাসের। দ্বিতীয় গাড়ীখানা চালাচ্ছে ট্রন। তাতে গমের বস্তা রয়েছে। পাঁচ শ' গজ দূরে অবস্থিত দীর্ঘ কাঠের বাড়ীতে ওই গম কল। দ্বিতীয় গাড়ীখানা পথের উপর দাঁড় করিয়ে সাহায্য করার জন্য ভেড়ার খোঁয়াড় পর্যন্ত এগিয়ে এল। এটা খানিকটা বিশ্রাম করার আর দু'চারটে কথা বলার ফুরসৎ।

মেষপালক বলল—'কি ব্যাপার, আমাদের তেষ্টায় শুকিয়ে মারতে চাও বুঝি?'

ভেড়াগুলোও জলের গন্ধ পেয়েছে। খোঁয়াড়ের মধ্যে একসাথে দাঁড়িয়ে ভেড়াগুলো বেড়া ঠেলছে, বাইরে গলা বাড়িয়ে করুণ কণ্ঠে ডাকছে।

জঁ বলল—'একটু ধৈর্য ধর, তোরাও জল পাবি।'

ওরা সঙ্গে সঙ্গে জলের পিপেগুলো গাড়ী থেকে নামিয়ে কঠের গামলাগুলো ভরে ফেলল। ফুটো দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে, কুকুর দুটো ছুটে এসে জল চাটতে লাগল। আর একটুও অপেক্ষা না করে শুয়োর পালক আর মেষ-পালক দু'জনেই জলের গামলা থেকে জল খেতে লাগল। পালের সব ভেড়াগুলো এখন সার বেঁধে জল পান করছে, ওদের গলা দিয়ে জল নামার একটানা শব্দ হচ্ছে, ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ছে মাটিতে। মানুষ আর জানোয়ার সবাই এখন খুশি, জল ছিটিয়ে তারা একে অপরকে ভিজিয়ে দিচ্ছে।

জল পান শেষে তাজা হয়ে সৌলাস বলল—'এবার তাহলে খোঁয়াড়টা ঠেলে

সরিয়ে নিয়ে যেতে আমাকে সাহায্য করো !'

জঁা এবং ট্রন রাজী হল। কতিত শস্যের মাঠের উপর দিয়ে তারা খোয়াড়টা টেনে নিয়ে চলল—এক জায়গায় দু'তিন দিনের বেশী ওরা খোঁয়াড় রাখে না এবং সেই ক দিনেব মধ্যেই ভেড়াগুলো ঘাস খুঁটে খেয়ে ফেলে। এর ফলে অনেকটা জমিতে সার দেওয়ার কাজও হয়। কুকুর দুটোকে নিয়ে মেষ-পালক ভেড়া-পালকে দেখতে লাগল এবং দু'জন মবদ আর শুয়োব-পালক খোঁয়াড়েব বেড়া ভেঙ্গে পঞ্চাশ পা দূবে খোঁয়াড় সরিয়ে নিয়ে গেল। চাবকোণা খানিকটা জমিতে খুঁটি পুঁতে ওবা আবাব খোঁয়াড় বানাল। আপনা থেকেই ভেড়াগুলো আবাব এসে খোয়াড়ে আশ্রয় নিল। ওদেব বিশাল একটা জায়গায় আটকে বাখাব কাজ মিটল।

সৌলাসেব বয়স অনেক হয়েছে তবু সে একাই কুঁড়ে ঘবখানাকে খোঁয়াড়েব দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে।

সে জঁাকে বলল—'ব্যাপাব কি? মনে হচ্ছে নিজেব শোক মিছিলে যোগ দিতে যাচ্ছ!'

ফ্রানকয়েসকে সে হাবিয়েছে এই চিন্তা কবলে তাব বুকখানা চুবমাব হয়ে যাচ্ছে দুঃখে। সে বিষণ্নভাবে মাথা নাড়ল।

বুড়ো জিজ্ঞাসা কবল—'বল ত, কোন মেয়েমানুষ এব জন্যে দায়ি? ওই শস্ত বেশ্যাগুলো, ওদেব মাথা কেটে ফেলা উচিৎ।'

জঁা তাকাল বুড়ো সৌলাসেব দিকে তাব ধাবণা যে, এসব ব্যাপারে বুড়ো ভাল উপদেশ দিতে পাববে। কারো সাথে আলোচনা কবাব প্রয়োজন ছিল, তাই সে সৌলাসকে খুলে বলল সব কথা। বলল, কেমনভাবে সে ফ্রানকয়েসকে পেয়েছিল এবং বুতোব সঙ্গে মাবামাবি হওয়াব জন্যে কিভাবে তাকে হাবিয়েছে। মুহূর্তেব জন্য তাব ভয় হয়েছিল যে হয়ত হাত ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য বুতো তাকে আদালতে টেনে নিয়ে যাবে। ভাঙ্গা হাত এর মধ্যে আধাআধি সাবলেও সে এখনও কাজ কবতে পাবছে না। কিন্তু সন্দেহ নেই, বুতো ঠিক করেছে যে, এই পাবিবাবিক ব্যাপাব নিয়ে আদালতে যাওয়া ঠিক হবে না।

মেষ-পালক জিজ্ঞাসা করল—'তুমি তাহলে ফ্রানকয়েসকে পেয়েছিলে, তাই বুঝি?'

'হ্যাঁ, একবার।'

বারেকেব জন্য সে গম্ভীবভাবে ভাবল এবং অবশেষে বলল—'বুড়ো ফৌআনকে তুমি বল সব কথা। হয়ত সে তোমার সাথে তাব বিয়েব ব্যবস্থা করে দিতে পারবে।'

জঁা অবাক হল, এমন একটা সহজ সমাধান ত তার মাথায় আসে নি!

সব ভেড়া এখন খোঁয়াড়ে ঢুকেছে। সে বিদায় নিল। ঠিক করল,

আজ সন্ধ্যেবেলাতেই বুড়ো ফৌআনের সঙ্গে সে দেখা করতে যাবে। জঁা তার গাড়ী হাঁকিয়ে ফিরে গেল আর বুড়ো তার অতন্দ্র পাহারায় মন দিল। সমতল মাঠের বুকে তার পাতলা দেহ যেন এক খণ্ড লাঠির মতন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

রাতের খাওয়ার সময় এখনও হয় নি। কাজ থেকে ঘণ্টাখানেক আগে ছুটি নিয়ে জঁা বুড়ো ফৌআনের সঙ্গে দেখা করতে ডেলহোমিদের বাড়ির দিকে চলল। সেতুর পারে রগনি গ্রামের একধারে ওদের বাড়ী। ছোটখাট একটা খামার। সম্প্রতি গোলা আর গোয়াল বানানো হয়েছে। একটা বেশ বড় উঠোনের চারধার ঘিরে অনেকগুলো ছোট বড় ঘর—প্রতিদিন সকালে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়, এমন কি সার-গাদাটাও তাই সাজানো-গুছানো নজরে পড়ে।

'শুভ সন্ধ্যা বাবা ফৌআন!' পথ থেকেই বলল জঁা, তার কণ্ঠস্বর অস্থির।

উঠোনে দু' হাঁটুর মধ্যে লাঠিখানা ধরে বুড়ো বসে ছিল, তার দৃষ্টি অবনত। যাহোক দ্বিতীয়বার ডাকতেই বুড়ো তার দিকে মুখ তুলে তাকাল এবং অবশেষে তাকে চিনতে পেরে বলল—'ও, করপোরাল তুমি! এখান দিয়ে যাচ্ছিলে?'

কোনও রকম বদ মতলবের চিহ্ন নেই, বুড়ো স্বাভাবিকভাবে তাকে অভিনন্দন জানাল। তাই দেখে যুবক ভিতরে ঢুকল। সোজাসুজি কথাটা পাড়তে সাহস করল না জঁা যদিও তবু ফ্রানকয়েসকে কিভাবে সে লাভ করেছে তাই বলতে তার সাহস অসফল হল। সুন্দর আবহাওয়া এবং এই আবহাওয়া আঙুরের ফলনের পক্ষে কত ভাল হবে তাই নিয়ে তারা কথা বলতে লাগল। আর এক সপ্তাহ রোদ থাকলে খাসা মদ তৈরী করা যাবে। তারপর যুবকের সঙ্গ তার কাছে আনন্দদায়ক মনে হল।

'এখন তুমি পুরোপুরি ছুটি পেয়েছ। এ জেলায় তোমার মতন সৌভাগ্যবান জমির মালিক আর কেউ নেই।'

'হ্যাঁ, তা ঠিক।'

'তোমার পরিবারের লোকজনও সুন্দর, এমনটা তুমি সহজে খুঁজে পাবে না।'

'তা ঠিক। কিন্তু জান ত, প্রত্যেকেই আলাদা, আলাদা।'

তার মন আবার বিষণ্ন হয়ে পড়ল। যেহেতু বুড়ো এখন ডেলহোমিদের বাড়ী থাকছে তাই বুতো তার বৃত্তি আর দেয় না। তার বক্তব্য হচ্ছে, নিজের পয়সা খরচ করে সে বোনের বাসা বানাতে রাজী নয়। যেসাস ক্রাইস্ট ত তাকে এক কপর্দক কোন দিন দেয় নি। আর শ্বশুর তারই বাড়ীতে থাকছে, খাচ্ছে তাই ডেলহোমিও কিছু দেয় না। বুড়োর অবশ্য পকেট খরচের অভাব হয় না, কেননা বাড়ীখানা বেচে দিয়ে মঁসিয়ে বেইলিহ্যাচি তাকে বছরে দেড়শ' ফ্রাঙ্ক পাওয়ার বিশেষভাবে ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, তার মানে মাসে মাসে সে সাড়ে বারো ফ্রাঙ্ক পাচ্ছে। এ থেকে সে ছোটখাট খরচ চালায়—রোজ সকালে তামাক কেনে, লেগেগোনির ভাঁটিখানায় মদের দাম দেয় এবং

ম্যাকেরনের দোকান থেকে কফি আনে। ফ্যানি খুব সাবধানী···বাড়ীতে কেউ অসুস্থ না হলে সে নিজের ভাঁড়ার থেকে কফি বার করে না। এমন কি ব্র্যাণ্ডিও দেয় না। বাইরে ফূর্তি করার যদিও সে অনেক সুযোগ পায় এবং তার সঙ্গতিও আছে, মেয়ের বাড়ীতে তার কোন কিছুর অভাবও হয় না তবু কিন্তু সে খুশি নয়, বরং বিষণ্ন হয়ে দিন কাটায় সব সময়।

যেন অসাবধানে একটা কাঁচা ঘায়ে হাত দিয়ে ফেলেছে এমনিভাবে জঁা বলতে লাগল—'ও হাঁ। কারো বাড়ী থাকার সময় নিজের বাড়ীতে থাকার আনন্দ পাওয়া যায় না।'

বিদ্রোহ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেই জঁা উঠে পড়ল একসময়, বলল —'ঠিক বলেছ, ঠিক তাই। এস একটু মদ পান করি। একজন বন্ধুকে মদ পান করানোর অধিকার বোধ হয় আমার আছে।'

কিন্তু দোরগোড়ায় উঠেই তার ভয় আবার মনে দেখা দিল।

বলল—'তোমার পা মুছে নাও করপোরাল, দেখছ ত এসব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য ওরা প্রচুর খাটা-খাটনি করে।'

ভিতরে ঢুকে জঁা মনে মনে সোয়াস্তি পাচ্ছিল না। বাড়ীর কর্তা-গিন্নী ফিরে এলে এখুনি তাকে আবার সব কিছু বুঝিয়ে বলতে হবে তাই সে উদ্বিগ্ন। রান্নাঘরের গোছানো ভাব দেখে সে অবাক হল। তামার কড়াইগুলো ঝকঝকে মাজা, আসবাবপত্রের কোথাও এক দানা ধুলো নেই, মেঝের টালিগুলো নিয়মিত ঘষে ঘষে পরিষ্কার করার ফলে ক্ষয়ে গেছে। সারা ঘরখানা এমন পরিচ্ছন্ন আর ঠাণ্ডা যেন এখানে কেউ থাকে না। কালকের রান্না-করা বাঁধা কপির ঝোল কমানো ছাই-পড়া আঁচে বসানো রয়েছে।

'তোমার স্বাস্থ্য!' বলল বুড়ো। পাশের তাক থেকে একটা মুখ-খোলা বোতল আর দুটো গ্লাস সে নামিয়ে এনে রেখেছিল টেবিলে।

মদ পান করার সময় তার হাতখানা একটু একটু কাঁপছিল, যে অন্যায় কাজ সে করেছে তার জন্যে যেন সে ভীত। বিপদের দারুণ ঝুঁকি নিয়েছে এমন লোকের মতন সে গ্লাসটা টেবিলে নামিয়ে রাখল। তাড়াতাড়ি বলে উঠল:

'বিশ্বাস করবে, ঘরে থুতু ফেলেছিলাম বলে গত পরশু থেকে ফ্যানি আমার সঙ্গে কথা বলে না। আচ্ছা প্রত্যেকেই ত থুতু ফেলতে পারে? থুতু ফেলার দরকার হয়েছিল বলেই ত আমি থুতু ফেলেছিলাম। এভাবে ওদের বিরক্ত করার চেয়ে আমি এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাব।'

প্রতিটা অনুযোগ শোনার পর জঁা বলছিল—'তোমাকে ওদের সহ্য করা উচিৎ। আর ধৈর্য ধরে থাকলে তুমিও অভ্যস্ত হয়ে যাবে।'

কিন্তু একটা মোমবাতি জ্বালাতে উত্তেজিত হয়ে পড়ল, রেগে গেল।

'না না। যথেষ্ট সহ্য করেছি। এখানে এসব আমাকে ভুগতে হবে তা' আগে যদি জানতে পারতাম! বাড়ী বেচে ফেলার পর দিনই আমি বরং

যেতাম! এখানে ওরা আমাকে আটকে রাখবে একথা যদি ওরা ভেবে থাকে তবে ভুল করেছে, এখানে থাকার চেয়ে আমি বরং রাস্তায় পাথর ভাঙব!'

আবেগে তার গলা বুজে আসতে সে বসে পড়ল। অবশেষে জঁা তার কথা বলবার সুযোগ পেল।

'ভান বাবা ফৌআন, সেই ব্যাপারটা নিয়ে তোমার সাথে আলোচনা করতে চাই বলে এসেছি। আর ব্যাপারটা ত তুমি জান। সেদিনকার ব্যাপারটার জন্যে আমি সত্যি দুঃখিত। আমি মারতে চাই নি, বুতো আক্রমণ করতে আমি কেবল নিজেকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম, তাই না? তবু সবই সমান। ফ্রানকয়েস এবং আমি রাজী। এখন কেবল তুমিই আমাদের ব্যাপারটা মেটাতে পার। তুমি বুতোর কাছে গিয়ে সব কিছু বুঝিয়ে বলতে পার।'

বুড়ো গম্ভীর হয়ে উঠল। সে মাথা নাড়ল এবং জবাবে কি বলবে বুঝতে না পেরে দারুণ লজ্জা অনুভব করল। এমন সময় ডেলহোমিরা ফিরে এসে তাকে বিপদ থেকে বাঁচাল। জঁাকে নিজেদের বাড়ীতে দেখে তারা বিস্মিত হল না এবং স্বাভাবিকভাবে তাকে সম্ভাষণ জানাল। কিন্তু ফ্যানির নজর তখনি পড়ল টেবিলের উপর রাখা বোতল ও গ্লাস দুটোর উপর। সে সেগুলো তুলে রেখে একখণ্ড ন্যাকড়া আনতে গেল। তারপর জঁায়ের দিকে না তাকিয়ে এবং যদিও গত আটচল্লিশ ঘণ্টা সে বাবার সাথে কথা বলেনি, তবুও এখন শুকনো গলায় বলল:

'বাবা, তুমিত জান এসব আমি পছন্দ করি নে।'

ফৌআন উঠে দাঁড়াল, তার দেহ কাঁপছিল এবং অপরের সামনে এ ধরনের মন্তব্য করেছে বলে রেগে উঠল।

'কি? হায় ঈশ্বর, বন্ধুদের এক গ্লাস মদ খাওয়ানোর অধিকারও আমার নেই? বেশ ত তুলে রাখ, আমি কেবল জল খাব।'

এ ধরনের মিথ্যা লোভী হওয়ার দোষারোপের জন্য ফ্যানির এবার রেগে উঠবার কথা।

ফ্যানি বিবর্ণ মুখে বলল—'যদি ভাল লাগে ত ফেটে মরবার আগে বাড়ীর সবকিছু গেলবার অধিকার তোমার আছে, কিন্তু টেবিলের উপর গ্লাস রেখে গোল দাগ ফেলবে তুমি তা' আমি পছন্দ করিনে। এটা তোমার ভাঁটিখানা নয়।'

তার বাবার চোখে জল এল। বুড়ো তার শেষ কথা আওড়াল:

'খুকি, তুই আর একটু পরিষ্কার করবার বাই কমা এবং আর একটু মনটা ভাল কর।'

ফ্যানি যখন খুব ঘষে ঘষে টেবিল মুছছিল বুড়ো তখন জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়াল। ঘনায়মান অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইল। গোপন হতাশায় তার মন চঞ্চল।

এসব ব্যাপারে ডেলহোমি মাথা গলায় না, সে নীরব থেকে বউয়ের দৃঢ় এবং

বিবেচনাপ্রসূত আচরণকেই সমর্থন জানায়।

জঁা আর এক গ্লাস মদ পান না করে চলে যাবে ডেলহোমির তা' একেবারেই মনঃপুত হল না, তাই ফ্যানি প্লেটের উপব গ্লাস রাখল। তারপর ফ্যানি শান্তভাবে এবং মৃদু কণ্ঠে ক্ষমা চেয়ে বলল :

'তুমি জান না। বুড়োদের নিয়ে সংসার করা কি কঠিন কাজ! তাদের কতকগুলো বদ্ধ ধারণা আব বদ দোষ ত্যাগ কবাব বদলে তারা মরতেও রাজী। এই মানুষটা বদ নয়, তবে সে আগের মতন আর সক্ষম নেই। কিন্তু একটা বুড়োর সেবা করার চেয়ে চারটে গোরুর দেখাশুনো করতে আমি রাজী।'

জঁা গ্লাসের মদ নিঃশেষ করে দেখল বুড়ো ফৌআন জানালার ধার ছেড়ে ধীরে ধীরে ঘর থেকে উঠোনে বেরিয়ে গেল। সেও বিদায় জানিয়ে বেবিয়ে এল। দেখল, বুড়ো বাইরে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে।

'বাবা ফৌআন, শোন। তুমি কি একবাব বুতোর কাছে গিয়ে বলবে যাতে আমি ফ্রানকয়েসকে বিয়ে করতে পাবি? তুমি ত কর্তা, তোমাকেই কথাটা পাডতে হবে।'

আঁধারের মধ্যেই বুড়োর জবাব তার কানে ভেসে এল।

বুড়ো ঝামটা দিয়ে বলল—'পাবব না! আমি পারব না!'

তারপর বুড়ো থামল, তার সব কিছু গোলমাল হয়ে গেল। ডেলহোমিদের সাথে তার সম্পর্ক চুকে গেল। কাল সকালেই সে বুতোর বাড়ীতে থাকবার জন্যে চলে যাবে, তারা দু'জনে তাকে থাকবার জন্যে বলেছে। মেয়ের কথার হুলের চেয়ে ছেলেব হাতের মার তার কাছে অনেক বেশী কাম্য, কম যন্ত্রণাদায়ক। এই নতুন পরিস্থিতির জন্য জঁা আরও হতাশ হয়ে পড়ল! কিন্তু শেষে বলল :

'বাবা ফৌআন, তোমাকে বলছি শোন ফ্রানকয়েস এবং আমি যৌন-সঙ্গমও করেছি।'

বুড়ো চাষী সহজ গলায় বলল—'ও!' তারপর বারেক চিন্তা করে সে জানতে চাইল—'মেয়েটা কি পোয়াতি?'

জঁা নিশ্চিত জানে যে, ফ্রানকয়েস তা হয় নি কারণ তারা নষ্ট করেছে।

তবু জবাব দিল—'হওয়া সম্ভব।'

'তাহলে এখন অপেক্ষা করাই একমাত্র পথ। মেয়েটা যদি পোয়াতি হয় ত আমরা ব্যবস্থা কবব।'

ঠিক তখনি ফ্যানি দোরগোড়ায় বেরিয়ে এসে বাবাকে খেতে ডাকল।

বুড়ো ঘুবে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলল—'নরকে যাক তোর খাবার। আমি ঘুমোতে চললাম।'

না খেয়ে দারুণ রাগে সে উপরে উঠে গেল।

খামারে ফিরে যাওয়ার রাস্তা ধরল জঁা। ধীরে ধীরে হাঁটছিল। তার

মনে এত গভীর নিরাশা যে কোন রাস্তা ধরে সে হাঁটছে বুঝতে না পেরে একেবারে মালভূমির উপর এসে হাজির হল। রাতের আকাশ-পট গভীর নীল। অজস্র নক্ষত্রের সমাবেশ। ভারি আর উত্তপ্ত আবহাওয়া। মাথা তুলতেই নজরে পড়ল তার বামদিকে শত শত অনুপ্রভ চোখ জ্বলছে। যেন অজস্র জ্বলন্ত মোমবাতি। তার পায়ের শব্দে তারা তার দিকে ধেয়ে আসছে। ওগুলো খোঁয়াড়ের মধ্যে চারণ-রত ভেড়ার পাল। সে তাহলে খোঁয়াড়ের পাশ দিয়ে হাঁটছে। শুনল, বুড়ো ফোঁআন মৃদু কণ্ঠে কথা বলছে।

'আচ্ছা, কি ব্যাপার হে খোকা?'

কুকুর দুটো মাটিতে শুয়েছিল, নড়ল না। তারা গন্ধ পেয়েছে যে, খামারের কেউ এসেছে। ক্ষুদে শুয়োর-পালক গরম বোধ হওয়ায় বাইরে একটা খাদের মধ্যে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। আর এই নির্জন, বিস্তীর্ণ আঁধার ঢাকা প্রান্তরের বুকে একমাত্র মেষপালক অতন্দ্র প্রহরী।

'কি খোকা, ব্যবস্থা হল?'

জঁা থামল না তবু।

'সে বলেছে, মেয়েটা যদি পোয়াতি হয় তাহলে আমরা দেখব।'

সে তখন খোঁয়াড়ের সীমানা পার হয়ে গেছে, তখন বুড়ো সৌলাসের কথা তার কানে ভেসে এল, বিশাল নির্জনতায় তার কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হল।

'ভালই ত, তুমি অপেক্ষা করো!'

২

পরদিন ফোঁআন বুতোর সঙ্গে থাকতে চলে গেল। তার এই প্রস্থান কাউকে বিব্রত করল না। দ্বিতীয় আর একজনকে সঙ্গে না নিয়ে বুড়ো নিজেই তার জামা-কাপড়ের বোঁচকা দু'টো বয়ে নিয়ে যেতে পারবে বলে জেদ ধরল। ডেলহোমিরা তার এই চলে যাওয়ার কারণ জানানোর জন্য পীড়াপীড়ি করল, কিন্তু বুড়ো মুখ খুলল না।

বুতো বিজয়ী হল। ফোঁআন যেদিন থেকে ডেলহোমিদের বাড়ীতে বাস করতে গেছে সেদিন থেকেই তার মনে বুনো হিংসে জমাট বেঁধেছে, এ ব্যাপার নিয়ে রগনি গাঁয়ের লোকদের আলাপও তার কানে গেছে। ডেলহোমিদের পক্ষে বুড়োর ভার নেওয়া সহজ, কিন্তু হায় ঈশ্বর, বুতোদের ত এক কপর্দকও নেই। ওরা তার ভাব নিতে অক্ষম। তাই প্রথমেই সে বাবাকে খাইয়ে-দাইয়ে মোটাসোটা করে তুলবে তারপর সবাইকে দেখিয়ে দেবে, বুতোর সংসারে কেউ অনাহারে মরে না। তারপর সে বাড়ী বেচার দেড়শ' ফ্রাঙ্ক হাতাতে পারবে, কারণ ছেলে বা মেয়ে যার কাছেই থাকুক বাবা নিশ্চয় ওই মুদ্রাগুলো তারই হাতে দেবে। তার ওপর যেহেতু ডেলহোমি নিজের বাড়ীতে আর তাকে রাখছে না তাই তার দেয় বার্ষিক দু'শ ফ্রাঙ্ক বৃত্তি আবার দেবে এবং আগেও

সে তাই দিত। ওই দু'শ ফ্রাঙ্কের দিকেই বুতোর নজর। সব মতলব সে ছকে ফেলেছে · প্রথমে সুসন্তান বলে গাঁয়ের সবাই তার প্রশংসা করবে এবং এর জন্যে এক কপর্দকও তাকে খরচ করতে হবে না। পরে এর জন্য সে পুরস্কারও পেতে পারে। এর মধ্যে সে বুড়োর লুকোন অর্থ ধরে নি। তার এখনও সন্দেহ, বুড়ো ওই অর্থ কোথাও লুকিয়ে রেখেছে, অবশ্য এখনও সে তার প্রমাণ লাভ করতে সফল হয় নি।

এই জীবন-ধারা যেন ফৌআনের কাছে প্রকৃত অবসরযাপন। তাকে হৃষ্টপুষ্ট অবস্থায় প্রতিবেশীদের দেখাতে হবে। তাকে কেমন দেখতে হচ্ছে! সে নিশ্চয় বাজে খরচ করছে না। তার ছেলে মেয়ে দুটো লরা এবং জুলি নিশ্চয় খেলাধুলো করে তাকে ব্যস্ত রাখছে, তাকে আনন্দ দিচ্ছে। কিন্তু বুড়ো তার অভ্যাসগুলো ফিরে পেয়ে সবচেয়ে বেশী এখন খুশি, এ বাড়ীতে এখন সে অনেক বেশী স্বাধীনতা ভোগ করছে। যদিও লিসাও একজন সুগৃহিণী এবং পরিচ্ছন্নতা পছন্দ করে তবে ফ্যানির মতন তার মনে অহেতুক বিষয় নিয়ে হৈ-চৈ করার বাতিক নেই এবং সে অত স্পর্শকাতরও নয়। কাজেই বুড়ো যেখানে খুশি বসতে এবং খুশিমতন খেতে পারে। চাষীদের অভ্যাস অনুযায়ী অনেকক্ষণ ধরে পরিশ্রম করতে হয় বলে রুটি থেকে টুকরো কেটে নিয়ে খেলেও কোন দোষ হয় না। এমনিভাবে তিনটে মাস পার হল। ডিসেম্বর মাস পড়ল। দারুণ শীত, বুড়োর পায়ের কাছে রাখা কুঁজোর জল রাতের ঠাণ্ডায় জমে বরফ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সে কখনও অনুযোগ করে না। ঠাণ্ডায় ঘরখানা ভিজে স্যাঁৎস্যেতে, দেওয়াল বেয়ে বর্ষার মতন বরফ-গলা জল ঝরে পড়ছে। এসব সে স্বাভাবিক বলে মনে করে, এরকম কর্কশ জীবন সে যাপন করেছে। যতদিন সে তার তামাক আর কফি পাবে ততদিন কেউ তাকে বিরক্ত করতে পারবে না। সে মাঝে মাঝে বলে, রাজাকে নিজের কাকা বলার অভ্যাস তার নেই।

অবস্থা আবার ঘোরালো হয়ে উঠতে লাগল। এক রোদ-ঝরা সকালে বুড়ো তার পাইপ নেওয়ার জন্যে ঘরে ফিরে এল, সবাই ভেবেছিল যে, সে বেরিয়ে গেছে। সে দেখল যে. বুতো তখন ফ্রানকয়েসকে আলুর গাদায় ফেলবার চেষ্টা করছে। আর মেয়েটি খুব সাহসের সঙ্গে নিজেকে বাঁচাতে চাইছে, মুখে রা নেই, সে উঠে বাইরে চলে গেল···বিটের শিকর নিয়ে যাওয়ার পর সে গোরুগুলো নিয়ে যেতে ঘরে ঢুকেছিল। বুড়ো ছেলের সঙ্গে একা হতেই মেজাজ চড়াল।

'নোঙরা শুয়োরের বাচ্চা! তোর বউ রয়েছে .এত কাছে আর তুই ওই কচি মেয়েটাকে ধর্ষণ করতে চেষ্টা করছিলি। মেয়েটা তা চাইছিল না, তাই অত লাথি ছুঁড়ছিল।'

কিন্তু বুতো তখনও হাঁপাচ্ছিল, সারা মুখে রক্ত চাপ বেঁধেছে, সমালোচনা

শুনতে সে রাজী নয়।

'আমার ব্যাপারে তোমার নাক গলাবার মানে কি? তোমার চোখ পিট্‌পিটুনি বন্ধ কর, বকবকানি থামাও। নইলে বিপদে পড়বে।'

লিসার বাচ্চা এবং জাঁয়ের সঙ্গে লড়াই হওয়ার পর থেকে বুতো আবার ফ্রানকয়েসকে পাওয়ার জন্যে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। ভাঙ্গা হাত জোড়া লাগাবার জন্য সে অপেক্ষা করছিল এবং এখন সুযোগ পেলেই ঘরের যে কোন জায়গায় ফ্রানকয়েসের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কেননা সে নিশ্চিত যে, যদি সে একবার ওর দেহ দখল করতে পারে তবে পরে যা'খুশি তাই করতে পারবে। ওর বিয়ের দিন পিছিয়ে দেওয়ার এটাই উত্তম উপায়, তাই না? এবং তাহলে মেয়ে আর জমি দুই-ই হাতে রাখতে পারবে। এই দুই লোভ অবিভাজ্য···যা' সে হাতে পেয়েছে একবার তা' ছাড়তে সে রাজী নয় এটাই তার জেদ, জমি দখলে রাখার তার ভয়ানক মানসিক দৃঢ়তা এবং তার পুরুষ মনের অতৃপ্ত রিরিংসা যা ফ্রানকয়েসের প্রতিরোধে যৌন-লালসায় পরিণত হয়েছে। তার স্ত্রীর দেহ দিন দিন একটা মাংসের ডেলায় পরিণত হচ্ছে, এখনও সে লরাকে মাই খাওয়ায় তাই সারাক্ষণ বাচ্চাটা তার বুকে লেপটে থাকে। আর এই যে কুমারী কন্যা, তার শালী—তার সারা অঙ্গে নবীন নারীত্বের সুবাস, বাচ্চা বকনা বাছুরের বাঁটের মতন তার স্তন দুটো দৃঢ় এবং নমনীয়। দু জনের কাউকে সে অবহেলা করে না। এমনটা হলে সে দু জনকেই দখল করতে পারবে··একজন মোটাসোটা আর একজন কঠিনদেহী, প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিশেষত্বে আকর্ষণীয়। দুটো মুরগীর পক্ষে সক্ষম মোরগ সে, এবং নিজেকে সে পাশার মতন মনে করে—দু'জন নারী তার সেবা করবে, আদর করবে, কাম-ক্রীড়ায় আনন্দ দান করবে। ওরা যদি চায় তবে সে কেন দু'জন নারীকেই বিয়ে করতে পারবে না? ভালবাসা গড়ে তোলার এটাই ত পথ···এর ফলে জমি-জমাও ভাগ করতে হবে না, এবং নিজের একখানা হাত কেটে ফেলার মতন এই জমি-জমার ভাগাভাগিই তার কাছে সবচেয়ে আতঙ্কজনক।

গোয়ালে, রান্নাঘরে, প্রত্যেক জায়গায়, যখনই যেখানে তারা কেবল দু'জনে থাকছে এক লহমার জন্যে তখনই সেখানে সুরু হচ্ছে ভয়ানক লড়াই···আক্রমণ এবং প্রতিরোধ। বুতো ছুটে যাচ্ছে ফ্রানকয়েসের দিকে আর সে তাকে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে। এই একই ক্ষিপ্র ক্রুদ্ধ দৃশ্যের অবতারণা ঘটছে বারবার অবিরামভাবে। কখনও সে তার পরুষ হাত ঢুকিয়ে দিচ্ছে মেয়েটার স্কার্টের তলায়, খামচে ধরছে তার উলঙ্গ মাংসল অঙ্গ, ছিঁড়ে নিচ্ছে খানিকটা চামড়া আর লোম, যেন ওই মেয়েটা একটা জানোয়ার, এমনি ধরনের আচরণ লাভের-যোগ্য। ফ্রানকয়েস দাঁতে দাঁত চেপে থাকে এবং তাকে জোর করে মাটিতে চেপে ধরলে যত জোরে সম্ভব বুতোর দু'পাশের মাঝখানে লাথি কষায়। কারো মুখে কোন শব্দ নেই, কেবল কানে বাজে তাদের গরম, রুদ্ধ শ্বাসক্রিয়ার এবং

ধস্তাধস্তির চাপা আওয়াজ। বুতো যন্ত্রণায় কান্না চাপে। ফ্রানকয়েস বিস্রস্ত পোশাক ঠিক করে নিয়ে খোড়াতে খোড়াতে চলে যায়, তার দেহের নিম্নাংশ ছিঁড়ে, থেঁতলে গেছে···বুঝি তার হাতের পাঁচটা নখের গভীর ক্ষতচিহ্ন নিজের মাংসল দেহে সে যা' অনুভব করছে তা' চিরন্তন হয়ে থাকবে। লিসা পাশের ঘরে থাকলেও এমনটা ঘটছে এমন কি একই ঘরে সে যখন পিছন ফিরে তাকে জিনিসপত্র কাপড় চোপড় গোছায় তখনও ঘটছে। তার স্ত্রীর উপস্থিতিতে বুতো যেন আরও বেশী উত্তেজিত হয়ে ওঠে। সে তখন নিশ্চিত হয় যে, মেয়েটা কিছুতেই তার অহঙ্কারী মনের একরোখা নীরবতা ভাঙবে না।

যা'হোক আলুর গাদায় বুড়ো ফৌআন তাকে ওই অবস্থায় দেখার পর থেকেই বিবাদের সুরু হল। সে লিসাকে বেশ কড়া গলায় সব কিছু শোনাল যাতে সে তার স্বামীকে এরকম করা থেকে সংযত করতে পারে। লিসা চেঁচিয়ে বলল, বুড়ো যেন তার নিজের কাজে মন দেয়। তারপর ছোট বোনের উপর মুখিয়ে উঠল। এসব তার দোষ কেননা সেই ত পুরুষদের লালায়িত করছে, পুরুষগুলো ত এক একটা শুয়োরের বাচ্চা, তাদের সাথে মানিয়ে থাকতে হবে।

তারপর থেকে লিসা এবং ফ্রানকয়েসের অবচেতন মনে ফল্গুধারার মতন ধীরগামিনী যে ঘৃণার অস্তিত্ব ছিল তা' দিন দিন প্রবল থেকে প্রবলতর হতে লাগল। অতীতের স্নেহের পরিপূর্ণ অংশ এখন বিদ্বেষে রূপান্তরিত হল, স্পষ্টত কারণ না থাকলেও সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত তাদের পরস্পরের মধ্যে সংঘাত হচ্ছিল। এবং তার একমাত্র কারণ বুতো, একটা হানিকর মদের খামিরের মতন তাদেব মধ্যে তার অস্তিত্ব। বুতোর আচরণে ফ্রানকয়েসের মনে অস্থিরতা দিন দিন বাড়ছিল, যখনই বুতো তার দেহ স্পর্শ কবে তখনই নিজেকে তার কাছে দান করার লালসার বিরুদ্ধে তার মনন-শক্তি বিরোধিতা করে, নইলে অনেক আগেই সে যৌন-সঙ্গমে রাজী হত। এর জন্য নিষ্ঠুরভাবে সে নিজের মনকে শাসন করে এবং সহজ বিবেক-বুদ্ধিকে আঁকড়ে ধরে···সে কাউকে কিছু দেবে না এবং কারো কাছ থেকে কিছু নেবেও না। তার দিদির নিজস্ব একজন মরদ আছে তাই দিদিকে সে মনে মনে হিংসা করে, কিন্তু নিজের মনের এই হিংসা সে ঘৃণা করে কেননা বরং সে কামনার জ্বালায় শুকিয়ে মরবে তবু মবদের ভাগ নেবে না। তাই বুতো যখন তার পরনের প্যান্ট নামিয়ে, ভুঁড়ি বাড়িয়ে ফ্রানকয়েসকে তাড়া কবে তখন সে তার পুরুষ অঙ্গের উপর থুতু ছিঁটিয়ে দেয় এবং অমনি থুতু-মাখা পুরুষ-অঙ্গ নিয়ে তার বউয়ের কাছে তাড়িয়ে দেয়। এতে তার অতৃপ্ত কামনা কিছুটা সোয়াস্তি লাভ করে, সে অনুভব করে যে, সে থুতু ছিটিয়েছে তার দিদির মুখে যে কাম-ক্রীড়ার সে সঙ্গিনী নয় সে কাম-ক্রীড়ার আনন্দের প্রতি তার ঘৃণা সে প্রকাশ করছে। লিসা নিজে অবশ্য ঈর্ষান্বিতা নয় একেবারেই, কেননা বুতো এই যে চিৎকার করে বলছে যে, সে দুটো মেয়ের সঙ্গেই শোয় এটা তার দম্ভোক্তি। কিন্তু তার ছোট

বোন এত গর্বিতা যে, সে কিছুতেই ওর কাছে ধরা দেবে না। তবে সে ফ্রানকয়েসের উপর রেগে যাচ্ছে কারণ সে গররাজী হওয়ার জন্যই সারা বাড়ীখানা নরক হয়ে উঠেছে। যত তার দেহে মেদ জমছে ততই যেন সে নিজের নিরেট অস্তিত্বে অটল হচ্ছে, জীবনে তৃপ্তিলাভ করছে, নিজের মরদকে কেন্দ্র করে স্বার্থপরের মতন খোশ্ মেজাজে সবরকম আনন্দ উপভোগ করছে।

প্রতিদিন রাতে বিছানায় শুতে যাওয়ার সময় তাই সে বুতোকে বলে—'দেখ, জানি ও আমার ছোট বোন, কিন্তু ও যদি তোমাকে বিরক্ত করার অভ্যাস না ছাড়ে তবে এ বাড়ী থেকে আমি ওকে তাড়িয়ে দেব।'

বুতো কিন্তু ব্যাপারটা এভাবে দেখে না।

'ব্যাপারটা তাহলে খুবই ভাল হবে। সারা জেলার লোক আমাদের বিরুদ্ধে যাবে। নেকা মাগি কোথাকার! তোদের দু'জনকেই তাহলে ডোবায় খুন করে ফেলে দেব একসাথে। ব্যস! তাহলে দু'জনেই জল খেয়ে ঠাণ্ডা হবি, তোদের পরস্পরের ঝগড়া মিটে যাবে।'

আরও দুটো মাস পার হল। লিসা এখন অন্য দু'জনের মধ্যে কেবল ধাক্কা খাচ্ছে। ফলে দিশেহারা হয়ে পড়ছে, যা কিছু করছে তাতে কোন মঙ্গল হচ্ছে না। সে আঁচ করতে পারে যে, তার বোন আবার তার মরদকে প্রত্যাখ্যান করেছে কারণ তাদের প্রত্যেকেরই মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে উঠেছে, বুতোর পরাজয়ে সে দারুণ ভীত হয়ে উঠছে, উদ্বিগ্ন হচ্ছে কেননা তার বোনের স্কার্টের আড়ালে পরাজিত বুতো যখন চোরের মতন পালিয়ে যায় তখন তার ভাবনা হয় যে, এবার সে আরও নিষ্ঠুর রাগে ফিরে আসবে হয়ত এবং সারা বাড়ীখানাই ফেলবে ভেঙ্গে। দারুণ সঙ্গীন হয়ে উঠল দিনগুলো, অবস্থার উন্নতির জন্য সে কিছু করছে না বলেই সে হতভাগিনী জেদী ফ্রানকয়েসকে ক্ষমা করতে পারছে না।

বিশেষ করে একদিন ত এক ভয়ানক ঘটনা ঘটল। বুতো সেদিন ফ্রানকয়েসকে নিয়ে চোর-কুঠরিতে ঢুকেছিল আপেল রসের মদ নিয়ে আসতে। খানিক পরে বুতো দারুণ বিশৃঙ্খল ও উত্তেজিত অবস্থায় উপরে উঠে এল, বাটিতে ঝোল খুব গরম দেখে বাটিটা দেওয়ালে ছুঁড়ে মারল এবং বাইরে চলে গেল···আর যাওয়ার আগে এত জোরে ঘুঁষি কষাল লিসাকে যে, সে আঘাতে ষাঁড়ও পড়ে যাবে, লিসা ছিটকে পড়ল মাটিতে।

লিসা কাঁদতে কাঁদতে উঠে বসল, তার মুখ ফুলে উঠেছে, গাল দিয়ে রক্ত ঝরছে। ছোট বোনের দিকে সে তেড়ে গেল।

চিৎকার করে বলল—'মাদি কুকুর কোথাকার! ওর সাথে বিছানায় শুস্ না কেন, আমি তোর জন্যে অনেক সহ্য করছি! তুই যদি এমন জেদ করিস তবে তোকে ঠিক বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেব, এর জন্যে যদি মারধোর খেতে হয় খাব।'

ভয়-বিহ্বল, বিবর্ণমুখে সব শুনল ফ্রানকয়েস।

লিসা কেঁদে উঠল—'ঈশ্বরের নামে বলছি, তুই বরং ওর কথায় রাজী হ,' তাহলে ও আমাদের ছু'জনকে শান্তিতে থাকতে দেবে!'

একখানা চেয়ারে সে লুটিয়ে পড়ল, ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। তার হৃষ্ট-পুষ্ট দেহ বুঝি এখনই চেতনা হারাবে। তার হৃদয়ে এখন একটামাত্র উন্মত্ত ইচ্ছা, নিজের মরদের ভাগ দিয়েও সে জীবনে সুখী হতে চায়। যদি সে তার মরদের ভাগটুকু বজায় রাখতে পাবে তাহলে তাকে কিছুই হারাতে হবে না। লোকদের এ সম্বন্ধে বাজে ধারণা আছে, মরদ ত রুটি নয় যে একটুরো কেটে নিয়ে খেয়ে ফেললে উবে যাবে। এতে কি তাদের সম্পর্ক সহজ হবে না? তাবা পরস্পরের কাছাকাছি আসবে না? পারিবারিক জীবন যাপন করতে পারবে না তারা?

'আর যা হোক, তুই বা এটা চাইছিস না কেন?'

ফ্রানকয়েসের দেহ গুলিয়ে উঠল, দারুণ রাগে কেঁদে ফেলল, রুদ্ধ হল কণ্ঠস্বর।

'ওই মবদটার চেয়েও তুই বেশী ঘৃণ্য!'

গোয়ালে বসে কাঁদবার জন্যে ফ্রানকয়েস চলে গেল। দুঃখ-ম্লান ডাগর ডাগর চোখ তুলে কলিচ্ তার দিকে তাকিয়ে রইল। কি কাবণে তাব এত রাগ সেটাই সব জিনিস নয়, লিসা এখন বিনয়ী স্ত্রী হওয়াব ভূমিকা গ্রহণ কবছে, ঘরের শান্তি বজায় রাখাব জন্যে স্বামীব এই লালসা সহ্য কবছে। এটা যদি তাব নিজের মরদের কথা হত তাহলে সে তিলমাত্র মবদের ভাগ ছাড়তে রাজী হত না। লিসার প্রতি তার বিদ্বেষ এখন ঈর্ষায় রূপান্তরিত হল। মনে মনে সে শপথ কবল এবার, সে বরং মববে তবু দেহ দান করবে না।

কিন্তু সেদিন থেকে তার জীবন আরও সঙ্গীন হয়ে উঠল, ফ্রানকয়েস পরিণত হল একজন পদ-দলিত মজুরাণীতে। লিসা আর তাকে মুহূর্তের জন্যেও অলস হয়ে থাকতে দেয় না, ভোর হওয়ার আগেই তাকে বিছানা থেকে তুলে দেয় এবং গভীর রাত পর্যন্ত তাকে এমন খাটায় যে, হতভাগিনী অনেক রাতে পোশাক না ছেড়েই বিছানায় ঘুমিয়ে পড়ে, দেহের সব শক্তি যেন যায় ফুরিয়ে। নিপুণ হাতে বুতো তাকে জ্বালাতন করে…কখনও তার পাছায় লাথি মারে, তার জানু খিমচে ধরে, সব রকম নিষ্ঠুব কায়দায় তাকে আদর করার চেষ্টা করে…ফলে তার দেহ-মন টান টান হয়ে ওঠে, রক্ত ঝরে পড়ে, দু'চোখ কানায় কানায় জলে ভরে যায়, তবু সে নীরবে জেদ বজায় রেখে সব সহ্য করে। বুতো যখন তাকে আঘাত করে, যখন ফ্রানকয়েস কোন রকমে কান্না চেপে টলতে টলতে সরে যায় তখন ভারি খুশি হয় এবং অশ্লীল কাঁচা খিস্তি করে, চাপা হাসি হাসে সে। আঘাতে আঘাতে তার সারা দেহে কালসিটে দাগ পড়েছে, থেঁৎলে গেছে, নখের রক্তাক্ত ক্ষত-চিহ্ন হয়েছে। তার দিদির চোখের সামনে বিশেষ করে যখন এসব অত্যাচার চলে তখন সে অগ্রাহ্য করার সাহস খুঁজে

পার, পুরুষ হাতের এসব আঁচড়ান অত্যাচার বর্ষিত হয় যখন তার দেহে তখন সে সব কিছু অস্বীকার করে।

সারা গ্রামের লোক অবাক হয়ে গিয়েছিল। ফ্রানকয়েস বাড়ী থেকে পালিয়ে যাচ্ছে না কেন? যারা সব জানে তারা মাথা নাড়ে, সে এখনও সাবালিকা হয় নি, তাকে এখনও আঠার মাস অপেক্ষা করতে হবে। বাড়ী থেকে পালিয়ে ভুল পথ ধরলে যে জমি-জমার সে অধিকারিণী তা তার হাতছাড়া হয়ে যাবে·· এ ব্যাপারটা যে বার বার সে ভেবেছে এর জন্ম ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। বুড়ো ফৌআন মেয়েটার অভিভাবক, সে যদি এসময় তার পাশে দাঁড়াতে পারত·· কিন্তু বুড়ো নিজেও ছেলের বাড়ীতে আনন্দে থাকতে পারছে না। তার নিজের ভয়, সে হয়ত এ ব্যাপারে জড়িয়ে যাবে। তাই চুপ করে আছে। তাছাড়া, এক ধরনের বুনো মেয়ে যে নিজের উপর নির্ভর করে, এবং গর্বিত ও সাহসী, তার মতন ফ্রানকয়েস নিষেধ করেছে তাকে তার ব্যাপারে নাক না গলাতে।

ভবিষ্যতে তাই প্রতিটি বিবাদের পরিণাম হচ্ছে একই ধরনের অসম্মান।

'বেশ, তাহলে দূর হও! দূর হয়ে যাও!'

'হাঁ, তোমরাও সেটাই আশা করছ, চাইছ! আমি বোকামি করেছিলাম তাই চলে যেতে চেয়েছিলাম। এখন তোমরা আমাকে খুন করলেও চলে যাচ্ছি না। আমার জমি-জমার ভাগ নেওয়ার জন্যে থাকব। আমার জমি চাই, বাড়ী চাই এবং সেসব আমি বুঝে নেব। হাঁ, প্রতিটা জিনিস বুঝে নেব।'

প্রথম কয়েকটা মাস বুতোর মনে ভয় হয়েছিল যে, ফ্রানকয়েস হয়ত জাঁয়ের দ্বারা অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে। তার পর থেকে অর্থাৎ সেই খড়ের গাদায় ওদের যেদিন ধরেছিল সেদিন থেকে সে দিন গুণছে, এবং নিপুণভাবে ও উদ্বিগ্ন মনে তার পেটের উপর নজর রেখেছে···কেননা ওর পেটে যদি বাচ্চা আসে তবে ওর সাথে তার বিয়ে দিতেই হবে এবং তার সব চেষ্টা বিফল হবে। এদিকে ফ্রানকয়েস কিন্তু খুবই শান্ত, সে জানে যে, সে পোয়াতি হয় নি। কিন্তু যখন দেখল যে, তার দেহের অবস্থার দিকে বুতোর আগ্রহ তখন সে উদ্দেশ্যমূলকভাবে পেট উঁচু করে দাঁড়াতে লাগল ··তাকে সে বিশ্বাস করাতে চায় যে, দিনে দিনে তার পেট বড় হচ্ছে। যখন বুতো তাকে জড়িয়ে ধরত তখন সে অনুভব করত যে, বুতো তার কর্কশ আঙুল বুলিয়ে তার পেট মেপে দেখছে।

অবাধ্য ভাব নিয়ে ফ্রানকয়েস অবশেষে তাকে বলল—'হাঁ, ওখানে একটা কিছু হয়েছে। ওটা দিন দিন বাড়ছে।'

এক সকালে খানিকটা কাপড় ভাঁজ করে পেটের উপর জড়িয়ে নিল। সেই বিকালে ওরা পরস্পরকে প্রায় খুন করেই ফেলেছিল। খুনীর দৃষ্টিতে যখন বুতো তার দিকে তাকাল তখন দারুণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল ফ্রানকয়েস। তবু সত্যিই যদি তার পেটে বাচ্চা আসে তবে নিশ্চয় সে তাকে এমন আঘাত হানবে যে

বাচ্চাটা মরেই যাবে। সে তাই তার রসিকতা বন্ধ করল এবং দেহের স্বাভাবিক অবস্থা আবার ধারণ করল, তার ব্যবহারে বুতো দারুণ ঘাবড়ে গিয়েছিল এমন যে, নিশ্চিত হওয়ার জন্যে সে তার ভিজে অন্তর্বাসগুলো ঘেঁটে পরীক্ষা করতেও ছাড়ল না।

তারপর ঠাট্টা করেই বলল বুতো—'বেশ, তাহলে একটা বাচ্চা ধারণ কর।'

ফ্রানকয়েসের মুখখানা ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

চটে উঠে সে বলল—'ধারণ করব না, কেননা বাচ্চা আমার চাই না।'

কথাটা সত্যি। জেদ ধরে ফ্রানকয়েস আর জঁায়ের সাথেও মিলন ঘটায় নি। এর জন্যে বুতো অবশ্য আনন্দিত এবং তাই তার প্রেমিককে আক্রমণ করেছিল। সে একটা খাসা মরদ, তাই না? এত বুড়ো আর অক্ষম যে, ওকে একটা বাচ্চা দেওয়ার ক্ষমতাও তার নেই। বিশ্বাসঘাতক তাই আর একজনের হাত ভেঙ্গে দিয়েছে, অথচ এত দুর্বল যে, একটা যুবতীর কাম-লালসা তৃপ্ত করতে অক্ষম। তারপর থেকে ফ্রানকয়েসের সামনেই নাছোড়বান্দার মতন সে পরোক্ষভাবে এ ব্যাপারটা নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করে।

বুতো তার সম্বন্ধে যে সব কথা বলছে তা শুনে জঁা ভয় দেখাল যে, মেরে তার মুখ গুঁড়িয়ে দেবে। সে সব সময় ফ্রানকয়েসের সাথে দেখা করতে চাইছিল এবং তাকে একদিন অনুরোধও করেছিল তার কাছে আসতে···কি রকম তাকে বাচ্চা এবং বেশ বড়-সড় বাচ্চা দিতে না পারে তা' দেখবে। রাগে তার কাম-লালসা বাড়তে লাগল। কিন্তু প্রতিবারই ফ্রানকয়েস এই অবাঞ্ছিত মরদের সঙ্গে কাম-ক্রীড়া না করার জন্য একটা না একটা নতুন অজুহাত দেখিয়ে তাকে এড়িয়ে চলতে লাগল। সে জঁাকে ঘৃণা করে না, কিন্তু সে তাকে চায় না, বুতোর আক্রমণে রেগে-মেগে সেদিন সেই খরের গাদায় ফ্রানকয়েস জঁায়ের আলিঙ্গনে ধরা দিয়েছিল কিন্তু তখনও সে তাকে একটুও চায় নি। বেজন্মা কোথাকার। সেদিনও যৌন লালসার উত্তেজনায় ভরপুর মন নিয়ে সে ওই শুয়োরের বাচ্চা মরদটাকে গাল দিয়েছিল, কিন্তু জঁা যখন তার দেহ-মনের সেই আবেগের সুযোগ গ্রহণ করেছিল অমনি তার মনে কাম-শীতলতা দেখা দিয়েছিল। না, না, এর জন্যে সে সত্যিই লজ্জিত। একদিন অজুহাত দেখিয়েও যখন ওকে শান্ত করা গেল না, তখন ফ্রানকয়েস বলল যে, দেহ-মিলন বিয়ের রাত পর্যন্ত মুলতুবি থাকবে। সেই প্রথম সে বিয়ের কথা উল্লেখ করল। তার আগে পর্যন্ত যতবার সে তাকে তার বউ হওয়ার কথা বলেছে সে নির্দিষ্ট কোন জবাব এড়িয়ে গেছে। এর পর কম-বেশী এটা বোঝা গেল যে সে তাকে বিয়ে করতে পারবে, যখন সে সাবালিকা হয়ে তার জমি-জমার দাবি জানিয়ে সব অধিকার করবে তখন তাদের বিয়ে হবে। এই সুবিবেচনা-প্রসূত কথাগুলো জঁাকে অভিভূত করল। সে তাকে ধৈর্য ধরতে বলল এবং নিজেও তাকে জ্বালাতন করা বন্ধ করল। শুধু মাঝে মাঝে যখন কামনায় পীড়িত হয় তখন

শুধু প্রাণ খুলে হাসে। এই অস্পষ্ট ব্যবধান রচনায় চিন্তা ফ্রানকয়েসকে সোয়াস্তি দিল, শান্ত করল। শুধু জঁায়ের হাত দু'খানা জড়িয়ে ধরে এবং ডাগর ডাগর সুন্দর চোখে তার দিকে তাকিয়ে নিজেকে সংযত করে…ঠিক যেমন একজন যুবতী সন্তান চায় না কিন্তু কামনা করে স্বামীর সঙ্গ-সুখ।

যদিও বুতো জানে যে, সে পোয়াতি হয় নি, তবে তার মনে ভয় জঁায়ের কাছে গেলে সে পোয়াতি হতে পারে। তাই সমানে সে তাকে অস্বীকার করে চলেছে এবং ভয়ে কাঁপছে কারণ জঁা চারধারে বলে বেড়াচ্ছে যে, সে ফ্রানকয়েসের সাথে এমন জোরালো সঙ্গম করবে যে ওর সারা অঙ্গ ভরে যাবে। এমন সঙ্গম কোন মেয়ে কখনও উপভোগ করে নি। তাই সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত বুতো তার উপর নজর রাখছে, প্রতিটা মুহূর্ত তাকে কাজে ব্যস্ত রাখছে। ফ্রানকয়েস যেন তার হুকুমের চাকরাণী, কাজ না করলে তাকে চাবকাবে বলে শাসাচ্ছে—সে যেন মানুষ নয় একটা গৃহপালিত জানোয়ার, মারের ভয়ে ভীত। তার উপর এ এক নতুন ধরনের পীড়নের ব্যবস্থা। সে অনুভব করছে যে, তার দিদি আর জামাইবাবু সব সময় কেউ না কেউ তার পিছনে রয়েছে, এমন কি ওদের নজর এড়িয়ে সার-গাদায় তার প্রস্রাব যাওয়ার উপায়ও নেই। রাতে ওরা তাকে ঘরে বন্ধ করে আটকে রাখে, একদিন সন্ধ্যেবেলা ঝগড়া-ঝাঁটির পর সে দেখল ওরা তার ঘরের স্কাই-লাইটের ঢাকা তালা বন্ধ করে দিয়েছে। মাঝে মাঝে সে ওদের এড়িয়ে যায়, তখন একই অবস্থা ঘটে। সে ফিরে এলেই সুরু হয় জেরা। আবার কখনও কখনও ওর দেহ-তল্লাসি করে…বুতো তার দু' ঠোঁট ধরে থাকে আর তার দিদি তাকে অর্ধনগ্ন করে সারা দেহ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরখ করে। এসব পীড়নের ফলে জঁায়ের প্রতি তার মন আরও ঝুঁকল, শেষে সে জঁায়ের সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করল কেননা সে অন্যদের অস্বীকার করতে চায়। ওরা দু'জনে যদি তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করত, তাহলে হয় ত শেষ পর্যন্ত ফ্রানকয়েস বুতোর কাছে আত্মসমর্পণ করে ফেলত। ঘটনা যাই হোক ফ্রানকয়েস মনে মনে শপথ করল যে, জঁায়ের কাছেই সে ধরা দেবে, এই যে বুতো বলে বেড়াচ্ছে যে সে দু'জনকেই শয্যাসঙ্গিনী করেছে এবং সেই পথ দেখানোর নিশানা এমন একটা প্রভাব সৃষ্টি করতে চাইছে এটা বুতোর দম্ভ প্রকাশ…এব জবাব দেওয়া ফ্রানকয়েসের পবিত্র দায়িত্ব। জঁা নিজেও মানসিক পীড়ন ভোগ করছে কেননা তার ধারণা যে, এটা খুবই সম্ভব এবং স্বাভাবিক। কিন্তু মনে হয় জঁা বিশ্বাস করে ফ্রানকয়েসেব কথা। তাবা যখন পরস্পরের কাছ থেকে চলে আসে তখন প্রকৃত বন্ধুব মতন চুম্বন বিনিময় করে। পরস্পরের প্রতি ওদের বিশ্বাস যে, সেদিন থেকে ফ্রানকয়েস জঁাকে তার বিশ্বাসের পাত্র এবং পরামর্শদাতা বলে মনে করছে, সামান্য বিপদ বুঝলেও সে তার সাথে দেখা করে এবং তার সমর্থন ছাড়া কোন বিপদের ঝুঁকি নেয় না। এখন আর জঁা তার অঙ্গ স্পর্শ করে না এবং তাকে তার সমস্বার্থের সঙ্গিনী মনে করে।

বুড়ো কৌআন এসব এড়িয়ে থাকতেই চাইছিল কিন্তু সব রকম বিবাদ-বিসম্বাদেই সে জড়িয়ে পড়ছিল। সে নীরব থাকলেও তারা তাকে একটা না একটা পক্ষ নিতে বাধ্য করে। যদি সে পালিয়ে যায় বাইরে তবে ফিরে এসে দেখে সারা বাড়ীতে নরক গুলজার এবং তার উপস্থিতি অন্তঃস্রোত ক্রোধের সৃষ্টি করে। তখন পর্যন্ত সে সত্যিকারের কোন রকম দৈহিক অসোয়াস্তি ভোগ করে নি তবে তার খাওয়া-দাওয়ার পরিমাণ দিল কমিয়ে। সীমিত হল রুটির পরিমাণ এবং যৎসামান্য ফূর্তি করার সুযোগও দিল বন্ধ করে। প্রথম আসার সময়ের মতন আর তাকে পেট-ভরা খাবার দেওয়া হল না, সামান্য মোটা রুটির টুকরো কেটে নিলে কর্কশ কটু কথা শুনতে হচ্ছিল। কি ভয়ানক খাওয়ার লালচ! তাহলে যে কম খাটবে সেই বেশী খাবে। প্রতি তিন মাস অন্তর বুড়ো কৌআন ক্লয়েসে মঁসিয়ে বেইলিহ্যাচির দপ্তরে যায় বাড়ী বেচার তিন হাজার ফ্রাঙ্কের নির্ধারিত অংশ আনতে, ওরা বাড়ীর বাইরে অপেক্ষা করে এবং বুড়োর কাছ থেকে সব অর্থ কেড়ে নেয়। এমন কি ফ্রানকয়েসও কয়েকটা পয়সা দিদির তবিল থেকে চুরি করে বুড়োকে তামাক কিনতে দেয়⋯ ফ্রানকয়েসকেও ওরা নিঃস্ব করে রেখেছে। অবশেষে যে ঘরে বুড়ো ঘুমোয় সে ঘরের স্যাঁৎস্যেঁতে অবস্থার জন্য সে অসোয়াস্তি ভোগ করতে লাগল। সে জানালার কাঁচ ভেঙে ফেলেছে, ওরা সেটা সারাবার খরচা না করে সেখানে খড় বেঁধে দিয়েছে। হায় রে, সন্তানরা সব ভয়ানক হয়, তাদের সকলের চরিত্র এক রকম।

একদিন বুড়ো কৌআন ক্লয়েস থেকে ফেরার পথে একটা খাদের মধ্যে বসেছিল। যেসাস ক্রাইস্ট ওখানে খরগোসের গর্ত খুঁজছিল। সে দেখল, বুড়ো গভীর অভিনিবেশ সহকারে বসে একখানা রুমালে পাঁচ ফ্রাঙ্কের মুদ্রাগুলো গুণে বাঁধছে। তৎক্ষণাৎ সে মাথা নীচু করে হামাগুড়ি দিয়ে নিঃশব্দে তার দিকে এগিয়ে এল এবং বাপের মাথার ঠিক উপরটায় এসে থামল। সেখানে শুয়ে অবাক হয়ে দেখল, তার বাবা সতর্কভাবে একটা মোটা অঙ্কের অর্থ, সম্ভবতঃ আশী ফ্রাঙ্ক, রুমালে বাঁধছে। তার দু'চোখ জ্বলে উঠল, এবং নিঃশব্দে দাঁত বের করে হাসল। বুড়োর গচ্ছিত ধনের পুরোন ধারণাটা তার মনে পড়ল। স্পষ্টতঃ বুড়ো লুকিয়ে কিছু অর্থ বিনিয়োগ করেছে এবং তিনমাস অন্তর মঁসিয়ে বেইলিহ্যাচির কাছে যায় তার সুদ আনতে। যেসাস ক্রাইস্ট প্রথমে ভাবল যে, কান্নাকাটি করে সে বাপের কাছ থেকে কুড়ি ফ্রাঙ্ক আদায় করে নেবে। তারপর ভাবল, ওটা খুবই কম অর্থ। ওর মাথায় আর একটা মতলব এল। সরীসৃপের মতন নিঃশব্দ গতিতে সে যেমন এসেছিল তেমনি সরেও গেল। কাজেই রাস্তায় শ' খানেক ফুট দূরে তাকে নজর পড়তে বুড়ো কৌআন তাকে অবিশ্বাস করতে পারল না যেন অলস মন্থর পদে সে রগনি গ্রামের দিক থেকে আসছে। তারা দু'জনে কথা বলতে বলতে হাঁটতে লাগল এবং কৌআন অনিবার্যভাবে এক সময় বুড়োদের আচরণ বলল। ওরা হৃদয়-

হীন, নিষ্ঠুর···তাকে অনাহারে রেখে শুকিয়ে মারবে। এবং তার ছেলে তখন কাঁদতে কাঁদতে এই জানোয়ারদের কবল থেকে তাকে উদ্ধার করার জন্ম হাত ধরে নিজের পল্লীনিবাসে নিয়ে চলল। কেন নয়? এটা বোকামি হবে না, কেননা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ওরা বাড়ীতে নানা মজা করে। এর মধ্যে বোলডি অবশ্য দু'জনের রান্না করেছে, সে তিনজনের জন্যও রান্না করতে পারবে। জিনিস কেনবার মতন রেস্ত ঘরে থাকলে সে খুব ভালই রান্না করতে পারে।

ফৌআন ওর এই প্রস্তাব শুনে অবাক হল, বিপদের আঁচ পেল এবং খেতে অস্বীকার করল। না, না, তার এই এত বয়সে সে আর এ বাড়ী ও বাড়ী করতে পারে না, পারে না কি বছর নিজের জীবন-ধারা বদলাতে।

'আচ্ছা বাবা, আমার কথা তুমি আবার ভাব। বলছি, তোমার উচিৎ, তুমি রাস্তায় থাকতে পার না। ওই দুটোর সঙ্গে যখন তোমার চরম ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে তখন তুমি আমার ঘরে চলে এস।

মৃদু ভিজে ভিজে নভেম্বরের দিন। বুড়ো ফৌআন ঘরে ফিরল। বাড়ী বিক্রির পর থেকে তিন মাস অন্তর অন্তর বুড়ো যে সাড়ে সাঁইত্রিশ ফ্রাঙ্ক নিয়ে আসে বুতো তা চাইল। এটা ঠিক হয়েছিল যে, এ টাকাগুলো ত দিতেই হবে, উপরন্তু ডেলহোমিরা বছরে যে দু'শো ফ্রাঙ্ক দেয় তাও দিতে হবে। কিন্তু এবারে রুমালে বাঁধা মুদ্রাগুলোর সঙ্গে পাঁচ ফ্রাঙ্কের একটা মুদ্রার কেমন গোলমাল হয়ে গেছে। কাজেই সে যখন পকেট উল্টেপাল্টে সাড়ে বত্রিশ ফ্রাঙ্ক বার করল তখন তার ছেলে বুতো রাগে টঙ হয়ে গেল। বলল, বুড়ো পাঁচ ফ্রাঙ্ক চুরি করেছে এবং মদ গিলেছে, বর্ণনার অযোগ্য ভয়ানক কাজে ব্যয় করেছে। তার বাবা হেরে গেল এবং নিজের রুমালের উপর হাত রাখল, সামান্য ভয় হল যে ও হয়ত এটাও টেনে বার করে নেবে। তোতলাতে তোতলাতে কারণ দেখাল যে, হয়ত নাক ঝাড়তে রুমাল বার করার সময় ওটা নিশ্চয় পড়ে গেছে। সে ঈশ্বরের নামে বার বার শপথ করল যে, সে হারিয়ে ফেলেছে। আবার একবার সারা বাড়ীখানা নরকের মতন গুলজার হয়ে রইল।

বুতোর এই সাংঘাতিক মেজাজের কারণ হচ্ছে, বিদে দেওয়ার মই নিয়ে ঘরে ফেরার সময় সে জঁ। এবং ফ্রানকয়েসকে একটা প্রাচীরের আড়ালে যেতে দেখেছে। ফ্রানকয়েস অবশ্য তার গোরুর জন্যে ঘাস কাটবার ছল করেই গিয়েছে এবং এখনও ফিরে আসে নি। তাছাড়া সে জানে যে, বাড়ী ফিরলে কি অবস্থা তার হবে। রাত বাড়ছে এবং বুতো রাগে অন্ধ হয়ে মুহূর্তে মুহূর্তে উঠোনে বেরিয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে সেই রাস্তা পর্যন্ত চলে যাচ্ছে দেখবার জন্যে যে অসতী মেয়েটা তার নাগরের সাথে অবশেষে ফিরে আসছে কি না। বুড়ো ফৌআনকে না দেখেই সে অশ্লীল খিস্তিতে গাল দিচ্ছিল। বিবাদ-বিসম্বাদ মিটলে বাড়ীখানা শান্ত হলে তবে সে ভিতরে ঢুকবে বলে পাথরের বেঞ্চিতে বসে আছে অনেকক্ষণ ধরে এবং রোদ-ঝরা নভেম্বরের বিকেলের নরম উত্তাপ

উপভোগ করছে···ঠিক যেন বসন্তের আবহাওয়া।

চড়াই বেয়ে জুতো পায়ে ওঠার আওয়াজ ভেসে আসছে। ফ্রানকয়েস হাজির হল, বিরাট এক বোঝা ঘাস ন্যাকড়া-টুকরোয় বেঁধে কাঁধে নিয়েছে, বোঝার ভারে তার দেহ মাটিতে নোয়ানো। হাঁপাচ্ছে। ঘাম ঝরছে সারা দেহ থেকে এবং বোঝার আড়ালে তার দেহের আধখানা ঢাকা পড়েছে।

বুতো চেঁচিয়ে উঠল—'বেশ্যা মাগি কোথাকার! বাড়ীতে কাজ পড়ে রয়েছে আর তুই কি-না তোর নাগর নিয়ে দু'ঘণ্টা ধরে লীলা খেলায় মেতেছিলি। ভেবেছিস, এভাবে আমাদের চোখে ধুলো দিবি!'

সে ধাক্কা মেরে ফ্রানকয়েসকে ঘাসের বোঝা-শুদ্ধ ফেলে দিল। বোঝাটা মাটিতে পড়ে গেল···বুতো তেড়ে গেল তার দিকে, আর অমনি লিসা বেরিয়ে এল বাড়ী থেকে এবং তাকে বকতে স্বরু করল।

'কুঁড়ে জঘন্য মাগি! আয় তোকে গাধার মতন লাথাই। নিজের কাজের জন্যে লজ্জিত হচ্ছিস না?'

কিন্তু বুতো এর মধ্যেই মেয়েটার স্কার্ট টেনে ধরেছে। তার রাগ সব সময় আকস্মিকভাবে ফ্রানকয়েসের দেহ উপভোগের কামনায় রূপান্তরিত হয়। সে মেয়েটাকে ঘাসের উপর ঠেসে ধরতে চেষ্টা করল এবং তার সারা মুখমণ্ডল বাড়তি রক্ত চাপে সিঁদুর হয়ে উঠল।

চাপা কণ্ঠে বুতো গজরাল—'বেশ্যা মাগি! এবার তোকে আমি ঠিক বাগে পেয়েছি, পড়ুক মাথায় আকাশ ভেঙ্গে, তবু একটু আগে তোর নাগর যেখানে ঢুকিয়েছিল এবার আমিও সেখানে ঢোকাব!'

স্বরু হল দারুণ ধ্বস্তাধ্বস্তি! অন্ধকারে বুড়ো ভাল দেখতে পাচ্ছিল না, কিন্তু বুঝল যে, লিসা পাশে দাঁড়িয়ে দেখছে এবং একাজ করতে দিচ্ছে। তার মরদ মেয়েটার বুকের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছে আর মেয়েটা তাকে পাশে ফেলে দিচ্ছে প্রতি মুহূর্তে, এবং বুতো তার উদ্দেশ্য কিছুতে সফল করতে পারছে না তবু যেখানে হোক একটা জায়গায় আনন্দ করতে পারলেই হল। সব শেষ হতেই মেয়েটা তার হাত ছাড়িয়ে উঠে পড়ল।

ফ্রানকয়েস হাঁপাতে হাঁপাতে তোতলাতে লাগল—'শুয়োরের বাচ্চা! তবু তুই পারিস নি! ওতে কিছু এসে যাবে না। ও আমি গ্রাহ্য করি না। তবে কোনদিন তুই আমার ভিতরে ঢোকাতে পারবি না।'

বিজয়িনীর মতন এক আঁটি ঘাস নিয়ে সে নিজের পা মুছল, সারা দেহ তার কাঁপছে, যেন এই অবাধ্য প্রত্যাখ্যানের মধ্য দিয়েও সে খানিকটা পরিতৃপ্তি লাভ করেছে। বাহাদুরি দেখিয়ে ঘাসের আঁটিটা সে তার দিদির পায়ের কাছে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

'এই নে, এটা তোর! ফিরে যে পাচ্ছিস এ জন্যে তুই দোষী ন'স!'

লিসা সজোরে বোনের মুখে চড় কষাল। পাথরের বেঞ্চি ছেড়ে বুড়ো

ফোঁআন উঠে পড়েছিল, এসব দেখে তার মন বিদ্রোহী হয়ে উঠল। হাতের লাঠি ঘুরিয়ে ওদের বাধা দিল।

'জঘন্য জানোয়ার কোথাকার, তোরা দুটোই জানোয়ার! ওই মেয়েটাকে না ঘাঁটিয়ে পারিস না? যথেষ্ট ত করেছিস!'

পাড়া-পড়শীদের দরজায় আলো দেখা গেল, এই ধ্বস্তাধ্বস্তির গোলমালে সবাই শঙ্কিত হয়ে পড়ল। বুতো তাড়াতাড়ি তার বাবা আর ফ্রানকয়েসকে ঠেলে রান্না ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। লরা এবং জুলি এককোণে ভয়ে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একটা মোমবাতি জ্বলছে। লিসা ভিতরে এল। বুড়ো ফোঁআন অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে আসার পর থেকে দেহে-মনে সে বিধ্বস্ত এবং তাই নীরব। কিন্তু তখনও তাকে গালাগালি দিচ্ছে বুড়ো।

'জঘন্য আর বোকার মতন কাজ। দেখেছি, তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলে সব!'

সজোরে বুতো টেবিলে এক ঘুঁষি কষাল। বলল—'থাম! সব মিটে গেছে। এবার যে কথা বলবে তাকেই ঠেঙাব!'

কম্পিতকণ্ঠে বুড়ো ফোঁআন জানতে চাইল—'এবং আমি যদি কিছু বলি ত আমাকেও মারবি?'

'তোমাকে মারব অথবা আর কাউকে। তুমি আমাকে বিরক্ত করছ!'

ফ্রানকয়েস সাহসের সঙ্গে ওদের মধ্যে এসে বাধা দিয়ে বলল—'তোমাকে অনুরোধ করছি কাকা, এ ব্যাপারে জড়িয়ো না। দেখছ ত, নিজেকে বাঁচাবার বয়স আমার হয়েছে।'

বুড়ো কিন্তু তাকে ঠেলে সরিয়ে দিল।

'বাধা দিস নি, এটা এখন আর তোর ব্যাপার নয়, আমার ব্যাপার!'

সে তার লাঠি উঁচাল।

'বদমাস, তুই আমাকে মারবি, তাই না? ভেবেছিস কি, এবার তোকে আমি শাস্তি দেব।'

বুতো তার হাত থেকে তাড়াতাড়ি লাঠিখানা কেড়ে নিয়ে তাকের উপর রেখে দিল। তারপর অবজ্ঞাভরে বাপের দিকে তাকাল, তার দু'চোখে ক্রুর দৃষ্টি এবং সোজাসুজি তার মুখের উপর বলল—'আমাকে একা থাকতে দেবে? ভেবেছ কি তোমার চোখ রাঙানিতে ভয় পাব? তা' আমি পাব না।'

ফ্রানকয়েস দ্বিতীয়বার তাদের মাঝে দাঁড়িয়ে থামাতে চেষ্টা করল। লিসা নিজে একবার চেষ্টা করল। বিবাদ নতুন দিকে মোড় নিতে সে নিরাশ হয়ে পড়ল। কিন্তু মরদ দু'জন মেয়েদের ঠেলে সরিয়ে দিয়ে কাছে এগিয়ে এল। ভয়ানক জোরে জোরে ওরা শ্বাস ফেলছে, রক্তের সাথে রক্তের লড়াই। বাপের কাছ থেকে সন্তান এই নিষ্ঠুরতার উত্তরাধিকারী হয়েছে। এবং সুরু হয়েছে এখন সংঘর্ষ।

পরিবারের কর্তৃত্ব ফিরে পাওয়ার জন্য বুড়ো ফৌআন সোজা হয়ে দাঁড়াল। কারণ প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে সবাই তার সামনে ভয়ে কেঁপেছে…তার যখন সম্পদ ছিল, ছিল ক্ষমতা তখন ভয়ে কেঁপেছে তার বউ, সন্তানরা এবং গৃহপালিত পশুরা পর্যন্ত।

'বল তুই মিথ্যে কথা বলেছিলি শুয়োরের বাচ্চা! বল নইলে তোর চামড়া ছাড়িয়ে নেব। আমার এই বাতির আগুনের মতন সত্যি জানবি!'

ছেলেকে ভয় দেখানোর জন্যে সে শূন্যে হাত তুলল, অতীতে তার ভাব-ভঙ্গি দেখে সবাই ভয়ে সিটিয়ে যেত।

ছোটবেলায় বুড়ো হাত তুলে তার মার আটকাতো, ভয়ে তার দাঁতে ঠোকাঠুকি হত; এখন কেবল উপহাস এবং অপমান প্রকাশের ভঙ্গিতে কাঁধ নাচাল।

'ভাবছ কি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ…যখন বাড়ীর কর্তা ছিলে তখন এসব চলত, এখনও কি তাই চলবে!'

'আমি এখনও কর্তা, তোর বাবা আমি!'

'ভাগ বুড়ো ভাঁড়। তুমি এখন কিসস্যু না। আমাকে শান্তিতে থাকতে দেবে?'

তারপর যেমনি দেখল বুড়োর হাত কাঁপতে কাঁপতে নামছে তাকে মারবার জন্যে, সে হাতখানা ধরে তার কর্কশ হাত দিয়ে মুচড়ে ধরল।

'তুমি একটা জঘন্য একরোখা বুড়ো! আমার মেজাজ বিগড়ে দিয়েছ, এবার দেখাব কি তোমাকে আমি গ্রাহ্য করি না? কি মঙ্গল করবে তুমি? কেবল তোমার জন্যে অর্থ গচ্চা, ব্যস এই সব! তোমার যখন জমি-জমা ছিল তখন সময় ছিল এবং তোমার জমি-জমা অপরকে দিয়ে দিয়েছ এখন চুপ করে থাকবে। তাদের আর বিরক্ত করবে না।'

সে গলা চড়িয়ে কথাগুলো বলল এবং বাপকে সজোরে নাড়া দিল। তারপর শেষবারের মতন তার দেহ নাড়া দিয়ে জোরে ঠেলে ফেলে দিল। বুড়ো কাঁপতে কাঁপতে টলতে টলতে জানালার ধারে একখানা চেয়ারে লুটিয়ে পড়ল। তার বহুদিনের কর্তৃত্ব হারিয়ে সে এখন পরাজিত, মৃত। বাকরুদ্ধ অবস্থায় সেখানেই সে পড়ে রইল। সব শেষ হয়ে গেল। তার যা' ছিল সব দিয়ে দিয়েছে তাই এখন আর কেউ তাকে মানে না।

ঘরে এখন পরিপূর্ণ নীরবতা। সবাই হাত ঝুলিয়ে নিথর দেহে দাঁড়িয়ে আছে। মার খাওয়ার ভয়ে ছেলে-মেয়ে দুটোও শ্বাসরোধ করে আছে। তারপর একসময় ঘরের কাজ-কর্ম সুরু হল, যেন কোন কিছু হয় নি।

লিসা বলল—'ঘাসের বোঝাটার কি হবে? ওটা কি উঠোনেই ফেলে রাখা হবে?'

ফ্রানকয়েস জবাব দিল—'ওগুলো এনে আমি শুকোতে দিচ্ছি।'

ফিরে এল ফ্রানকয়েস। ওদের রাতের খাওয়া শেষ হল। এক সময় ফ্রানকয়েস বলল যে তার বডিসের মধ্যে একটা পোকা ঢুকে হুল ফুটাচ্ছে, অমনি দুশ্চরিত্র বুতো তার বডিসের মধ্যে হাত ঢোকাল পোকাটাকে বার করার জন্যে। এতে কিন্তু রাগল না ফ্রানকয়েস, বরং হাসল।

'না, না। তোমার অন্য কোথাও পোকায় কামড়াচ্ছে!'

ফৌআন নড়ল না, তার অন্ধকার কোণায় শক্ত হয়ে বসে রইল। দুটো জলের বড় ফোঁটা তার গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল। তার মনে পড়ল সেদিন সন্ধ্যার কথা, ডেলহোমিদের সাথে সেদিন বুড়োর কথা কাটাকাটি হয়েছিল। এবং আবার এক সন্ধ্যায় সেই ঘটনা ঘটল। সে আর পরিবারের কর্তা নয়, একরোখা রাগে সে খেতে অস্বীকার করল। ওরা তাকে বার তিনেক খেতে ডাকল; সে খেতে গেল না। সহসা উঠে সে নিজের ঘরে শুতে গেল। পরের দিন ভোরবেলা সে বুতোদের বাড়ী ছেড়ে যেসাস ক্রাইস্টের বাড়ী চলে গেল।

৩

অক্টোবর মাস পড়ল। আঙুর ফসল ঘরে তোলা সুরু হল। এটা আনন্দ-মুখর সপ্তাহ। পৃথক হয়ে যাওয়া পরিবারগুলো এসময় মদের কুঁজো ঘিরে বসে, নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের সমাপ্তি ঘটায়। গোটা সপ্তাহ ধরে রগনি গ্রামে আঙুরের গন্ধ ম-ম করে। প্রত্যেকেই আকণ্ঠ গেলে। এত গেলে যে প্রত্যেক ঝোপের আড়ালে নারীরা তাদের পরণের স্কার্ট তুলে ধরে আর মরদরা প্যাণ্ট নামায়। দ্রাক্ষা-ঝোপে প্রেমিকরা মুখে মুখ লাগায়···তাদের মুখে মদের গন্ধ ভুর-ভুর করতে থাকে। সব মিটে যায়···পড়ে থাকে একদঙ্গল মাতাল পুরুষ আর পোয়াতি নারী।

'যেসাস ক্রাইস্ট গোপন ভাণ্ডার খুঁজছিল। তার ধারণা, বুড়ো তার টাকা-পয়সা দলিল-দস্তাবেজ সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়ায় না। কোথাও নিশ্চয় সে সেগুলো লুকিয়ে রেখেছে। বোলডি তার বাপকে সাহায্য করছিল এ ব্যাপারে। কিন্তু প্রথমে তারা বৃথাই বাড়ীর সব জায়গায় তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে, নিজেদের চতুরতা এবং চুরি করায় তাদের পারদর্শিতা থাকা সত্ত্বেও তারা কিছুই খুঁজে পেল না। পরের সপ্তাহে পশু-চোর একটা পুরানো তাকের নীচে ঠিক ছাদের কার্নিশের তলায় একখানা ভাঙা কড়াইয়ের মধ্যে এক প্যাকেট কাগজ সহসা পেয়ে গেল। টুপির গঁদ-লাগানো ছেঁড়া কাপড়ের থলেতে যত্ন করে রাখা ছিল। ওর মধ্যে একটাও মুদ্রা নেই, মুদ্রাগুলো অন্য কোথাও নিশ্চয় লুকোন আছে। আর বেশ মোটা অঙ্কের মুদ্রা জমেছে কেননা পাঁচ বছর ধরে ত বুড়ো কিছু খরচ করে নি। এগুলো ত দেখছি একখানা দলিলের কাগজ-পত্র···শতকরা পাঁচ ফ্রাঙ্ক বছর সুদে তিন হাজার ফ্রাঙ্কের বিনিয়োগ-পত্র। 'যেসাস ক্রাইস্ট' সব হিসেব করল এবং খুঁজতে খুঁজতে তার হাতে একখানা কাগজ পড়ল···স্ট্যাম্প

লাগানো বড় বড় হাতের লেখায় ভরা। কাগজখানা পড়ে সে টলতে লাগল। হায় ঈশ্বর! তাহলে এখানেই যাচ্ছে টাকাগুলো!'

এটা এক আজগুবি কাহিনী। নোটারির অফিসে সব জমি-জমা ভাগাভাগি হয়ে যাওয়ার দলিল সই হলে বুড়ো ফৌআনের বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে যায়। আর তার হাতে কোন জমি নেই একথা ভাবতেই তার হৃদয় যায় ভেঙে, এমন কি একমুঠো শস্যের সংস্থানও তার নেই। না, এভাবে সে বাস করতে পারবে না, এতে তার মৃত্যু হবে এবং তখনই সে এই ব্যবস্থা করেছিল। নিজেকে নিয়ে খুব বেশী চিন্তা করলে বুড়োরা এরকম ছেলেমানুষি করে এবং গোপনে মাদি কুকুরের কাছে যায় বঞ্চিত হওয়ার জন্যে। নিজের সময় কালে যে অত চালাক-চতুর ছিল বুড়ো বয়সে সেই বঞ্চিত হওয়ার জন্যে বন্ধু বুড়ো সসিসের কাছে হাজির হল। সম্পদের মালিক হওয়ার এই ইচ্ছা নিশ্চয় খুব তীব্র হয়ে উঠেছিল। ওর দেহের কাঠামোতে এই পাগলামি জড়িয়ে ছিল, মাটির বুক উর্বর করার কাজে যাদের দেহ ক্ষয় পায় সে সব বুড়োর মধ্যে এই রোগ দেখা দেয়। এই রোগ ফৌআনের মধ্যে এমন তীব্র হয়েছিল যে, বুড়ো সসিসের সঙ্গে সে এক চুক্তি করেছিল যে, জীবন ভোর প্রতিদিন সকালে পনের সউ করে দিলে তার মৃত্যুর পর সে দেড় একর জমির মালিকানা পাবে। বিক্রেতার বয়স যখন ক্রেতার চেয়ে দশ বছর কম তখন ছেষট্টি বছরের ক্রেতার পক্ষে এ এক মজাদার চুক্তি। আসল কথাটা হচ্ছে এই যে, সসিস এ সময়টা খুব কৌশলে বিছানা-শায়ী হয়। তার কাশির রোগ···এবং ভাণ করে যে, সে মরতে চলেছে। কাজেই বুড়ো ফৌআন লোভের জন্য বোকা বনল, দু'জনের মধ্যে নিজেকে বেশী চালাক মনে করল এবং এটাকে অভ্রান্ত কারবার ভেবে দ্রুত চুক্তি সম্পাদন করল। তা' সত্ত্বেও এটা প্রমাণিত হল যে, লোক যখন মেয়েমানুষ বা জমি লাভের জন্য বেপরোয়া হয়ে ওঠে তখন কোন চুক্তিতে সহি না করে একসাথে বিছানা-শায়ী হওয়াই ভাল···আজ পাঁচ বছর ধরে বুড়ো ফৌআন প্রতিদিন সকালে পনের 'সউ' হিসাবে শোধ করে চলেছে, যত শোধ করছে ততই সে বেপরোয়া হয়ে উঠছে জমি পাওয়ার জন্য। সারা জীবনের কাছে উদ্বিগ্নতাভরা কর্ম-জীবন পরিত্যাগ করার পর অপরকে এই অকৃতজ্ঞ মাটির আত্মসমর্পণ করতে দেখা এবং নিজে শান্তিতে মৃত্যুকে বরণ করা ছাড়া তার ত আর কোনও কাজ নেই···কিন্তু তার বদলে পরিণামে নিজের সর্বনাশের ব্যবস্থা করেছে। বৃদ্ধ কিংবা যুবক কেউই জীবনে খুব জ্ঞান অর্জন করতে পারে না।

যেসাস ক্রাইস্ট মুহূর্তের জন্য ভাবল, দলিল এবং বিনিয়োগ-পত্র সব সে হাতিয়ে নেবে। কিন্তু তার সাহসে কুলোল না, কারণ এ ধরনের কোন কিছু করলে তাকে পালিয়ে যেতে হবে। এটা অর্থ নিয়ে নেওয়ার মতন ব্যাপার নয়, এ থেকে অর্থ পেতে হলে দেরী করতে হবে। তাই দারুণ রাগে সে আবার

কাগজ-পত্রগুলো কড়াইয়ের মধ্যে রেখে ছাদের কার্নিশের নীচে রেখে দিল। কিন্তু সে এত কুপিত হয়েছিল যে, সব কথা বলে না বেড়িয়ে থাকতে পারল না। পরের দিন সারা রগনি গ্রাম সসিসের ব্যাপার জেনে ফেলল। দেড় একর পাথুরে জমির জন্য প্রতিদিন পনের 'সউ করে দিতে হবে, নিশ্চয় জমির দাম তিন হাজার ফ্রাঙ্কের বেশী নয়। পাচ বছরে এর মধ্যেই চোদ্দ শ' ফ্রাঙ্ক দিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং বুড়ো যদি আরও পাঁচ বছর বেঁচে থাকে তবে ওই বুড়ো বদমাস টাকা এবং জমি তুইই পাবে। প্রত্যেকেই বুড়ো ফৌআনকে উপহাস করল। কিন্তু নিজের দেহের চামড়া ছাড়া আর কিছুই ছিল না বুড়োর কেননা সে সব জমি-জমা ভাগ করে দিয়েছিল। তখন রাস্তায় দেখা হলে কেউ তাকে সম্ভাষণ জানাত না, এখন সবাই জানল সে অর্থবান এবং জমির মালিক কাজেই আবার সবাই তাকে 'শুভ দিন' জানাতে কসুর করল না।

বিশেষ করে ফৌআন পরিবার বিস্মিত হল। বাপের সঙ্গে ফ্যানির সম্পর্ক সবচেয়ে খারাপ—কারণ সে ভেবে মনে আঘাত পেয়েছে যে, তার কাছে না এসে বাবা গিয়েছে তাব বদমাইস দাদার কাছে, তবু স্বামীর খান কয়েক পুরোন জামা-প্যাণ্ট নিয়ে ফ্যানি বাবার কাছে হাজির হল। কিন্তু বুড়ো কর্কশকণ্ঠে ফ্যানির বলা সে কথাগুলো উল্লেখ করল 'বাবা একদিন হাঁটু গেড়ে বলবে আমাকে থাকতে দে', এবং তাকে সম্ভাষণ জানিয়ে বুড়ো বলল—'তাহলে শেষ' তক তুই এলি হাঁটু গেড়ে আমার সাথে দেখা করতে।'

কথাগুলো যেন ফ্যানির গলায় কাঁটার মতন বিঁধল।

সবাইকে অবাক করে দিয়ে বুতো একদিন পল্লীনিবাসে এসে হাজির হল, ভাণ করল যেন সে বুড়োর সঙ্গে দেখা করবে। ব্র্যাণ্ডির বোতল বার করে আনার সময় যেসাস ক্রাইস্ট মুখ সিটকাল। তারপর দুজনে বসে মদ পান করল। কিন্তু তার তামাসা-প্রবণতা বিস্ময়ে পরিণত হল যখন সে দেখল যে, তার ভাই পকেট থেকে দশ ফ্রাঙ্কের মুদ্রাগুলো বার করে টেবিলের উপর সাজিয়ে রাখল।

বলল বুতো—'বাবা, আমাদেব হিসাব-নিকাশ মেটাতে হবে। তোমার গত তিন মাসের বৃত্তি এই রইল।

রক্তখেগো ঠকবাজ! কত বছর ধবে সে বাপকে তার দেয় বৃত্তি এক কপর্দকও দেয় নি, এখন বুড়ো বাপকে টাকার বহু দেখিয়ে করুণা প্রকাশ করতে এসেছে। কিন্তু বুড়ো যেমনি মুদ্রাগুলো নেওয়ার জন্য হাত বাড়াল অমনি বুতো তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে মুদ্রাগুলো কুড়িয়ে নিল।

'আমার যে টাকা আছে তাই তোমায় দেখালাম। তোমার জন্যেই রাখছি। এবং কোথায় রাখছি তাও তোমার জানা!'

ব্যাপারটা যে কি ঘটছে তা বুঝতে পারল জেসাস ক্রাইস্ট। সে রেগে-মেগে বলল:

'শোন্! বাবাকে তোর কাছে নিয়ে যেতে চাস ত···।'

কিন্তু বুতো ব্যাপারটা রসিকতা হিসাবে গ্রহণ করেছে।

'তাহলে তোমার হিংসে হয়েছে, বল? ধর, আমি বাবাকে এক সপ্তা রাখব, তুমি রাখবে আর এক সপ্তা, তাহলে সেটা যথেষ্ট স্বাভাবিক হবে না? বাবা তুমি ত তোমাকে দু ভাগ করতে পার? আমরা যখন বসে আছি তখন তোমাব স্বাস্থ্যপান করতে পারি!'

চলে যাওয়াব সময় সে ওদের পরের দিন তাব আঙুব ক্ষেতে আঙুর-উৎসবে যোগ দেওয়াব জন্য নিমন্ত্রণ করে গেল। তারা যত খুশি আঙুর খেতে পারবে। প্রকৃতপক্ষে, সে এত সুন্দর ব্যবহার করল যে, অন্য দু'জন ঠিক কবল যে, সে একটা শয়তান। কিন্তু সে যাতে পরাস্ত করতে না পারে তাই তারা আনন্দ-ফূর্তি করল। এবং নিজেরা আনন্দ উপভোগ করার জন্য তারা কিছুটা রাস্তা ওর সাথে গেল।

মাসেব পর মাস পাব হতে লাগল। শীত শেষ হল, এল বসন্ত। রগনি গ্রামেব স্বাভাবিক জীবন-ধারা একই খাতে বইছিল। কোন কিছু ঘটেছে এমন ধারণা করতেই বহু বছর পার হয়, কেননা এই একই ক্লান্তিকর জীবন-ধারা চিরন্তন বয়ে চলেছে। কিন্তু জুলাই মাসে, রোদ-মরশুম যখন যাই যাই করছে তখনই আগামী নির্বাচনের প্রস্তুতি গ্রামের পরিবেশ চঞ্চল করে তুলল।

ঠিক সেদিন রবিবার সকালবেলায় শ্যাটোতুনের কারখানা মালিক মঁসিয়ে রচিফনতেইনের আসার কথা ছিল, সেদিন বুতোর বাড়ীতে লিসা এবং ফ্রানকয়েসের মধ্যে এক ভয়ানক দৃশ্যের অবতারণা হল। এটা পরিষ্কার বোঝা গেল যে, যখন মনে হয় না কিছু ঘটছে তখন কিন্তু একটা কিছু ঘটেই চলেছে, সবই সমান কথা। দু'বোনের মধ্যে যে শেষ সম্পর্কের সূত্র যা' নাকি সব সময় প্রায় ছিন্ন হওয়ার অবস্থায় পৌছায় তা' প্রতিদিনকার বিবাদ-বিসম্বাদের ফলে শীর্ণ হয়ে পড়ছিল, তা সহসা ছিন্ন হল একটা অতি তুচ্ছ আহাম্মকির ফলে এবং আর কোনদিন তা' সারানো সম্ভব হল না।

সকালবেলায় ফ্রানকয়েস তার গোরুগুলো ঘরে ফিরিয়ে আনছিল সহসা গীর্জাব কাছে তার সঙ্গে জাঁয়ের মুখোমুখি দেখা হয়ে যেতে সে বারেকের জন্যে দাঁড়িয়ে জাঁয়েব সঙ্গে কথা বলল। বুতোদের রাগাবার জন্যেই আরো তাদের বাড়ীর ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলল।

ফ্রানকয়েস বাড়ী ফিরতেই লিসা বলে উঠল—'দেখ, নাগরদের সঙ্গে যখন ঢলাঢলি করার ইচ্ছে হবে তখন আমাদের জানালার সামনে করার চেষ্টা করিস নে।'

একখানা কাটারিতে ধার দিতে দিতে বুতো সব শুনছিল।

ফ্রানকয়েস জবাব দিল—'আমার নাগররা! অনেক নাগরের সাথে আমি ঢলাঢলি করি, তাই না? তবে চাইলে একজন নাগরকে নিয়ে, জানালার ধারে

নয়, একেবারে তোর বিছানায় শুয়ে ঢলাঢলি করতে পারতাম।'

বুতোকে ইঙ্গিত করায় লিসা রেগে টঙ হয়ে গেল। অনেক দিন ধরে বোনকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার একটা ইচ্ছা তার মনে গেঁথে রয়েছে, তাহলে সংসারে শান্তি ফিরে আসবে এবং এমন কি এর ফলে তাকে যদি অর্ধেক জমি-জমা হারাতে হয় তাতেও সে রাজী। এই ইচ্ছের জন্যে তার স্বামী তাকে অনেকদিন পিটিয়েছে, কেননা বুতোর মনে বিপরীত ইচ্ছে, সে শেষ পর্যন্ত দেখতে চায়···যেহেতু তাদের দু'জনেরই প্রয়োজন রয়েছে তাই সে মেয়েটাকে শয্যাসঙ্গিনী করতে চায়। লিসার রাগ কারণ তার বোন রক্ষিতা হচ্ছে না বলে এবং তাই এক বিশেষ ধরনের হিংসায় সে জ্বলে পুড়ে মরছে। তার বোনকে তার স্বামী ধর্ষণ করুক এটা সহ্য করতে সে এখনও প্রস্তুত, তার কামনা মিটুক এটাই সে চায়···কিন্তু সে রাগছে কারণ সে এখনও ফ্রানকয়েসকে কামনা করছে। সে বোনকে তাই মনে প্রাণে ঘৃণা করছে, ঘৃণা করছে তার অটুট যৌবনকে, তার ছোট ছোট নিটোল স্তন দুটোকে এবং জামার হাতা গুটিয়ে কাজে নামলে তার দেহের যে শ্বেত ত্বক ঝলমল করে সেই দেহ-ত্বককে। যদি সে সংসারের কর্তা হত তাহলে সে তাকে খুন করতো, এবং এমন কি সে ধর্ষণের কাজে স্বামীকে সাহায্য করতেও রাজী। স্বামীকে যদি ভাগ করে নিতে হয় তাও সে গ্রাহ্য করবে না, কিন্তু বোনের সঙ্গে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা দিন দিন বিষাক্ত হয়ে উঠছে কারণ তার চেয়ে তার বোন এখন বেশী সুন্দরী এবং পুরুষকে অনেক বেশী আনন্দ দান করতে সক্ষম।

সে চেঁচিয়ে উঠল—'কসবী কোথাকার! তুই আমার মরদকে নষ্ট করেছিস। তুই যদি সারাক্ষণ ওর ধারে কাছে ঘুর ঘুর না করতিস তাহলে কখনও ও তোর নোঙরা পাছার লোভে ছুটত না। কি জঘন্য ব্যাপার।'

এই মিথ্যে দোষারোপ গভীরভাবে তার মনকে নাড়া দিল, সে বিবর্ণ হয়ে গেল। সে কুপিত হয়ে ঠাণ্ডা আর শান্তভাবে জবাব দিল :

'বেশ, তাই হবে। আর পনের দিন অপেক্ষা কর, আমি আর তোদের জ্বালাব না আর সেটাই যখন তোরা চাইছিস। পনের দিন পরে আমার একুশ বছর বয়স হবে, আমি চলে যাব।'

'ও তুই তাহলে বয়স হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করছিস, তাই না? তুই এসব করছিস আমাদের বিপদে ফেলার জন্যে। আচ্ছা রে মাদী কুকুর। তোকে পনের দিনও সময় দেব না। এখনি বেরিয়ে যাবি। বেরো, বেরো এখখনি।'

'ঠিক আছে! মাকেরণের একজন লোক দরকার। ওরা আমাকে রাখবে। চললাম।'

ফ্রানকয়েস চলে গেল। আর কিছুই বলবার ছিল না। ওদের মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে গেল। কাটারিতে ধার দিচ্ছিল বুতো, সেখানা নামিয়ে ছুটে এল। ভেবেছিল, দু'জনকে দুই ঘুঁষি কষিয়ে থামাবে, আর ওরা ঝগড়া করবে

না। কিন্তু ওর বড় দেরী হয়ে গেল, সে শুধু বউয়ের মুখে একটা ঘুঁষি কষিয়ে দেওয়ার সুযোগটুকু পেল এবং বউয়ের নাক ফেটে রক্ত ঝরতে লাগল। এই রক্তচোষা মাগিগুলো! এতদিন ধরে সে এই ভয়-ই করছিল এবং এতদিন ধরে এই অবস্থাটা সে থামিয়ে রেখেছিল। এখন ফ্রানকয়েস পালিয়ে গেল, এবার সুরু হবে নানা ধরনের গোলমাল। সে ভেবে দেখল এবার সে সর্বস্ব হারাবে, হারাবে দুইই···জমি এবং নারী।

বুতো গজরাল—'ম্যাকেরণের দোকানে যাব একটু পরে। ওর পাছায় জুতো শুদ্ধ পায়ের লাথি কষাব, ওকে ফিরে আসতেই হবে।

৪

একটা সপ্তাহ পার হল। ফ্রানকয়েস তার দিদির বাড়ী ফিরবে না বলে জেদ ধরে রইল। একদিন ত পথের উপর একটা বিতিকিচ্ছিরি দৃশ্যের অবতারণা ঘটল। বুতো তার চুল ধরে টেনে আনছিল, ফ্রানকয়েস তার বুড়ো আঙ্গুল কামড়ে ক্ষত-বিক্ষত করতে সে তাকে ছেড়ে দিল। ম্যাকেরণ তাই দেখে দারুণ ভীত হল। নিজেই মেয়েটাকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিল। বলল, তার মতন বিদ্রোহিনীকে আর সে উৎসাহ দিতে পারবে না।

কিন্তু ঠিক সেই সময় গ্রাণ্ডির বউ সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল এবং ফ্রানকয়েসকে সাথে করে নিজের বাড়ী নিয়ে এল। বুড়ার বয়স এখন আষ্টাশি এবং ভাবল যে, তার মৃত্যু হলেই সম্পত্তি নিয়ে উত্তরাধিকারীদের মধ্যে কামড়াকামড়ি সুরু হবে এবং একঘেয়ে মামলা বাধবে। সে যে উইল সম্পাদন করেছে তাতে অস্বাভাবিক জটিলতা রয়েছে এবং ইচ্ছে করেই সে গোলমেলে উইল লিখিয়েছে, যাতে কাউকে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত না করলেও এই উইল নিয়ে তারা পরস্পরকে ছিঁড়ে ফেলবে। এ মতলব সে নিজেই বার করেছে, সম্পত্তি সে ত নিজের সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে না তবে মরবার সময় একটা সান্ত্বনা নিয়ে যাবে যে, এই উইল অন্যদের ধ্বংস করবে। এমনিভাবে পরিবারের সবাই পরস্পরের গলা কাটছে দেখেই সে আনন্দ লাভ করে। তাই সে তাড়াতাড়ি ভাইঝিকে এনে বাড়ীতে রাখল। বারেক তার ইতব-মন ইতঃস্তত করেছিল কিন্তু তারপর যখন বুঝতে পারল যে, সামান্য খাবার দিয়ে সে মেয়েটাকে দিয়ে বহু কাজ করিয়ে নিতে পারবে তখন তাকে রাখতে মনস্থ করল। বাস্তবিকই সেদিন সন্ধ্যেবেলায় সে তাকে দিয়ে সিঁড়ি এবং রান্নাঘর পরিষ্কার কবিয়ে নিল। তারপর যখন বুতো এল তখন বুড়ী তাকে দাঁড় করিয়ে রাখল বাইরে, একটা শয়তান শিকারী পাখীর চোখে তাকিয়ে রইল তার দিকে। এবং যে বুতো বলেছিল, ম্যাকেরণের দোকান ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেবে সেই বুড়ীর সামনে কাঁপতে কাঁপতে তোতলাতে লাগল। সেও বুড়ীর সম্পত্তির একটা অংশের উত্তরাধিকাব পাবে বলে এই ভয়ানক মহিলার সাথে মুখোমুখি তর্ক করতে সাহস করল না এবং পক্ষাঘাত-গ্রস্তের মতন

দাঁড়িয়ে রইল।

সে বলল—'ফ্রানকয়েসকে আমার প্রয়োজন এবং আমি তাকে আমার কাছে রেখে দেব, কেননা সে তোমার বাড়ীতে সুখে ছিল না। যা' হোক এখন সে সাবালিকা হয়েছে, এবার তোমাকে সম্পত্তির হিসাব দিতে হবে। এ নিয়ে পরে আলোচনা করব।'

দারুণ রেগে বুতো ফিরে এল। তার মাথার উপর যে সমস্যার জাল সৃষ্টি হচ্ছে তাই দেখে সে ভীত হয়ে উঠল।

একটা সপ্তাহ কাটল। তখন সেটা আগস্ট মাসের মাঝামাঝি সময়। ফ্রানকয়েসের বয়স একুশ বছর পুরল। এখন সে নিজেই নিজের মালিক। কিন্তু তার মাথার উপব যে জঘন্য অস্তিত্বটা চেপে বসেছে তাকে প্রথমে সরাতে হবে···কারণ সেও তার পিসীর সামনে ভয়ে কাঁপে। এই দুর্গন্ধ-ভরা বাড়ীতে ঠাণ্ডায় খেটে খেটে তাকে জীবনপাত করতে হচ্ছে, সাবান কিংবা ব্রাশ ছাড়াই প্রতিটা বস্তু ঘষে' ঘষে' উজ্জ্বল করতে হচ্ছে। ঠাণ্ডা জল আর শক্ত বাহুই একমাত্র সম্বল। একদিন মুরগীগুলোকে খাবার দিতে ভুল হওয়ার দরুণ গ্রাণ্ডির বউয়ের লাঠির আঘাতে তার মাথা প্রায় দু'ফাঁক হয়ে গিয়েছিল। জনরব বলে যে, ঘোড়াগুলোকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্যে বুড়ী তার নাতি হিলারিয়নকে লাঙলে জুতে দিত জমি চাষ করার জন্য। যদি ওটা একটা অভিনব আবিষ্কার বলে মনে হয় তবে সত্যি বুড়ী তার নাতির সঙ্গে পশুর মতন ব্যবহার করত, তাকে চাবুক কষাত ও খাটিয়ে মারত। পাশবিক শক্তিতে খাটতে খাটতে ছেলেটা ক্লান্ত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ত। তারপর শুয়োর-ছানাদের মতন সামান্য রুটির গুঁড়ো আর ভুক্তাবশেষ দিত খাওয়ার জন্য। তাই ভয়ে এবং ক্ষুধার জ্বালায় তার দেহ আচ্ছন্ন এবং অচেতন হয়ে থাকত। ফ্রানকয়েস যখন বুঝতে পারল যে, তাকেও দ্বিতীয় ঘোড়াটার বদলে কাজে ব্যবহার করা হবে তখন এ-বাড়ী ছেড়ে পালাবার প্রবল এবং একমাত্র ইচ্ছা জাগল তার মনে। এবং তখনই সে সহসা ঠিক করে ফেলল সে বিয়ে করবে।

সমস্ত ব্যাপারটা সে তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলতে চাইল। সে বরং মরবে তবু লিসার সাথে ঝগড়া মিটিয়ে ভাব করবে না, তার মনের বিবেচনা-শক্তি, শৈশবে যা' তার মনকে বিষিয়ে দিয়েছে, তারই জন্য তার মনে এই একরোখা অবস্থা গড়ে উঠেছিল। তার কারণ ছিল ন্যায়-মুখী তাই এতদিন ধৈর্য্য ধরে সবকিছু সহ্য করেছে বলে নিজের উপর তার ঘৃণা জন্মাল। বুতো সম্পর্কে সে কিছুই বলত না, তবে দিদির সম্পর্কে কটু কথা বলত যাকে ছাড়া তাদের একসঙ্গে মিলে-বিশে থাকা সম্ভব হত। এখন সব, সব কিছু শেষ হয়ে গেছে। সে এখন একটা আশা নিয়ে বেঁচে আছে···তার ধন-সম্পত্তি, জমি-জমা সব ফেরৎ পাবে, ফিরে পাবে তার উত্তরাধিকারের ভাগ। এর জন্য সে সকাল

থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত উদ্বিগ্নতার মধ্যে কাটায়, এর জন্য প্রয়োজনীয় সীমাহীন আনুষ্ঠানিক প্রথাসমূহ তাকে বিরক্ত করে তোলে। কেন? এটা আমার, ওটা তোমার! এটা মিটমাটের জন্য মিনিট তিনেকের বেশী সময় লাগা উচিৎ নয়। তারা কি সত্যিই ভাবছে যে, তাকে ঠকাবার জন্যে ওরা দু'জনে মিলে সড় করে কাজ করছে। তার সন্দেহ হল যে, পরিবারের সমস্ত মানুষ-জন বুঝি এমন একটা অবস্থায় পৌছে বলছে যে, একজন স্বামী এ অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে পারে। এটা সত্যি কথা যে, জ্যঁয়ের সামান্য এক টুকরো জমিও নেই এবং সে তার চেয়ে বয়সে পনের বছর বড় কিন্তু সে ছাড়া আর কোন মরদ ত তাকে বিয়ে করতে চায় নি। এবং বুতো-ঘটিত কাহিনী জানাজানি হওয়ার পর বোধ হয় আর কেউ রাজী হবে না কেননা রগনি গ্রামে লোকে তাকে এত ভয় করে যে, কেউ বুতোর সাথে শত্রুতা করতে চায় না। এবং তাই আবার সে জ্যঁয়ের সঙ্গে ভাব জমাল, এর জন্য কোন বিপদ দেখা দিল না। কারণ জ্যঁ পরিণামের কথা ভাবে নি, সে খুব দয়ালু আর সৎ মরদ। ফ্রানকয়েস নিজেও তাকে গহণ করতে চায় কারণ সে আর কোন মবদকে গ্রাহ্য করে না। তাকে ক্রুদ্ধ বুতোব হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সে একজন মবদকে গ্রহণ করছে এটুকুই তার কাছে আসল কথা। তার নিজের মরদ হল সে।

জ্যঁ এখনও তাকে খুব ভালবাসে। বহুদিন ধরে সে ফ্রানকয়েসকে লাভ করার কামনা করছে এবং এখন তার কামনা অনেকটা শান্ত হয়েছে। তবু সে আজ তার কাছে ফিরে এসে বড় খুশি। একদিন তারা পরস্পরের মধ্যে শপথের বিনিময় ঘটিয়েছিল আজ সে তার স্বামী। সে সাবালিকা না হওয়া পর্যন্ত ধীরভাবে অপেক্ষা করেছে, তার এই অপেক্ষা করার প্রস্তাবের বিরোধিতা করে নি, উপরন্তু সে যাতে তার দিদির বাড়ীতে বেশী বিরোধিতা না করে তা থেকে তাকে বিরত রেখেছে। এখন গ্রামের সব সৎ লোকই ফ্রানকয়েসকে সমর্থন করছে। যদিও এত তাড়াতাড়ি বাড়ী ছেড়ে চলে আসার জন্য জ্যঁ। তার সমালোচনা করছে তবু বলছে এখন সে তার খুশি মতন করতে পারবে। এবং ফ্রানকয়েস যখন পরের করণীয় কাজ করতে তৈরী হল, জ্যঁ নিজেও তখন প্রস্তুত।

তাই একদিন সন্ধ্যেবেলা জ্যঁ যখন গ্রাণ্ডির বউয়ের গোয়ালঘরে ফ্রানকয়েসের সঙ্গে দেখা করতে এল তখন তাদের বিয়ের কথা পাকা হল। উঠোনে ঢোকবার বেরোবার পথে একটা লোহার গেট লাগানো···তারা দু'জনেই সেই লোহার গেটে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল···সে বাইরে আর ফ্রানকয়েস ভিতরে। আর তাদের পায়ের কাছে গোয়ালের গোবর-সারের যেন স্রোত বয়ে চলেছে।

তার চোখের দিকে তাকিয়ে ফ্রানকয়েস বলল—'জান করপোরাল, তুমি যদি এখনও আমাকে বিয়ে করতে চাও ত আমি রাজী আছি! এখনই!'

জ্যঁ এক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়েছিল, নরম গলায় বলল:

'কথাটা আমি আর বলি নি, কেননা মনে হবে যে, আমি বোধ হয় তোমার সম্পত্তি চাই। কিন্তু তুমি যা' বলেছ তা' ঠিক এবং সেটা একই কথা। আমরা

এবার বিয়ে করতে পারি।'

ওদের মধ্যে নীরবতা নেমে এল। ফ্রানকয়েস গেট ধরে ছিল, জঁা তার হাতে হাত রাখল।

জঁা বলল—'দেখ, জ্যাকুলিনকে নিয়ে তুমি মাথা ঘামিও না। ওসব কথা, যা' চারধারে ছড়িয়েছে, তা' ঘটনা ছাড়া কিছু নয়। অন্ততঃ বছর তিনেক আমি তার দেহ স্পর্শ করি নি।'

ফ্রানকয়েস জবাব দিল—'আমার ব্যাপারেও সেই একই কথা, বুতোর ব্যাপার নিয়ে তুমি দুর্ভাবনা করবে তা' আমিও চাই না। ওই শুয়োরের বাচ্চা বলে বেড়ায় যে, সে আমাকে ভোগ করেছে। বোধ হয় তুমিও ওর কথা বিশ্বাস কর?'

প্রশ্নটার জবাব সোজাসুজি এড়িয়ে জঁা বিড় বিড করে বলল—'জেলার সবাই তার কথা বিশ্বাস করে।'

ফ্রানকয়েস তার দিকেই তাকিয়েছিল।

জঁা আবার বলতে লাগল—'দেখ, আমি তার কথায় বিশ্বাস করেছিলাম। সব বুঝতেই পেরেছিলাম কেননা ও একটা জঘন্য দুশ্চরিত্র তা' জানি ত। তোমার পক্ষে কিছু করা সম্ভব ছিল না।'

'হাঁ, চেষ্টা করেছিল। সে আমার সারা দেহ আঁচড়ে ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়েছে, কিন্তু শপথ করে বলছি সে কখনও আমাকে ভোগ করতে পারে নি। আমাকে বিশ্বাস করছ?'

'তোমার কথা বিশ্বাস কবছি গো।'

আনন্দ প্রকাশেব জন্য জঁা তার হাতে চাপ দিল, ধরে রাখল এবং তার বাহু ন্যস্ত ছিল লোহার গেটের উপর। এতক্ষণ তার নজরে পডে নি যে, গোয়ালের ভিতর থেকে জলের ধারা বয়ে এসে তার পায়ের জুতো ভিজিয়ে দিচ্ছে, সে এবার দু'পা ফাঁক করে দাঁড়াল।

'অমন খোশ্-মেজাজে তুমি ওদের বাড়ীতে থাকতে চাইলে দেখে ভেবেছিলাম যে, এসব ছোটখাট মজায় তুমি বেশ আনন্দ পাচ্ছ।'

ফ্রানকয়েস বিব্রত হয়ে পড়ল এবং তার দিলখোলা ভাব-ভঙ্গির রূপান্তর ঘটল।

'বিশেষ করে সেদিন তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গমে রাজী হলে না। মনে পড়ছে ত? এতে অবশ্য কিছু এসে যায় নি; তোমাকে বাচ্চার মা হওয়ার সুযোগ দিতে পারি নি বলে রাগ হয়েছিল, কিন্তু এখন দেখছি বাচ্চা না হওয়াটা ভালই হয়েছে। অবস্থাটা তাই সম্মানের হয়েছে।'

জঁা থামল এবং বলল যে, ফ্রানকয়েসও গোবর-জলেব স্রোতে দাঁড়িয়ে আছে।

'চেয়ে দেখ! তুমি ভিজছ।'

তখন ফ্রানকয়েসও পা ফাঁক করে দাঁড়াল।

বলল সে—'তাহলে আমরা দু'জনেই রাজী?'

'আমরা রাজী। তোমার খুশি মতন দিন স্থির কর।'

তারা পরস্পরকে চুম্বন করল না, বন্ধুর মতন গেটের উপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে করমর্দন করল। তারপর তারা নিজের নিজের পথ ধরল।

সন্ধ্যেবেলা গ্রাণ্ডির বউকে ফ্রানকয়েস যখন বলল যে, সে জাঁকে বিয়ে করবে এবং বোঝাল সম্পত্তিতে তার দখল প্রতিষ্ঠা করার জন্য তার একজন মরদ দরকার তখন বুড়ী প্রথমটায় কিছুই বলল না। সে তার দিকে গোলাকার দু'চোখ মেলে তাকিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে রইল। নিজের লাভ ক্ষতি সে মনের মধ্যে খতিয়ে দেখছিল এবং এই বিবাহে সে কি পরিমাণ মজা লুটতে পারবে তাও ভাবছিল। তাই পরদিন সে নিজের সমর্থন জানাল। সারা রাত ধরে খড়ের বিছানায় বুড়ী জেগে শুয়ে রইল, সমস্ত বিষয়টা আবার সে ভাবতে লাগল। পরিবারের মধ্যে এই বিষয়টা যে কি ভয়ানক আলোড়ন সৃষ্টি করবে তা' ভেবে সে দু চোখের পাতা খুব অল্পই এক করতে পারল, বলতে গেলে ভোর পর্যন্ত জেগে থাকল। সে আশঙ্কা করেছিল যে, এই বিবাহ প্রত্যেকের জীবনে এমন সুদূর-প্রসারী পরিণামের সৃষ্টি করবে যে, সত্যিকারের যৌবনসুলভ উত্তেজনায় অধীর হয়ে সে দিন গুণতে লাগল। ইতিমধ্যে সে বুঝতে পারছিল যে, এ থেকে সামান্যতম পশ্চাৎপদ হলে আরও জটিলতার সৃষ্টি হবে এবং বিবাহ সম্পূর্ণভাবে ভেস্তে যাবে। তারই ফলে স্নেহ প্রকাশের জন্য বুড়ী ভাইঝিকে বলল যে, বিয়ের সব কিছু সে দেখা-শোনা করবে। দারুণভাবে এবং ভীতিজনকভাবে হাতের লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে বুড়ী সজোরে কথাগুলো বলল। ফ্রানকয়েস ত পরিত্যক্ত কন্যা তাই বুড়ী তার মায়ের কাজ করবে এবং এর অর্থ সে সকলকে দেখিয়ে দেবে।

এখন তাদের স্থির করতে হবে যে, কোন কাজটা আগে করা হবে—সম্পত্তি ভাগ-বাঁটোয়ারা না বিবাহ। গ্রাণ্ডির বউ দু' রাত ধরে ভাবল এবং তারপর স্থির করল যে, এখনি আগে বিয়েটা দিতে হবে। জাঁয়ের সাথে ফ্রানকয়েসের বিয়ে মিটে যাওয়ার পর স্বামীর সাহায্য নিয়ে ফ্রানকয়েস তার জমি-জমার ভাগ চাইবে এবং তাহলে বুতোরা প্রবল সমস্যার মধ্যে পড়বে। কাজেই সে সব কিছু তাড়াতাড়ি সারতে লাগল। ঠিক যেন একটি কর্মচঞ্চলা যুবতী, তার ভাইঝির কাগজপত্র গোছাল, জাঁয়ের কথা সব জিজ্ঞাসা করে জেনে নিল। গ্রামের গীর্জাতেই বিয়ের ব্যবস্থা করল। বিয়ের ব্যাপারে তার এত উৎসাহ যে, এজন্যে সে তাদের প্রয়োজনীয় অর্থ ধার দিল অবশ্য সুদ সহ প্রাপ্ত অর্থের দু'গুণ শোধের চুক্তিপত্রে বর ও কনেকে সহি করতে হল। তার সবচেয়ে মনে লাগল যখন ব্যবস্থার সময় লোকজনদের মদ পরিবেশন করতে হচ্ছে বলে, অবশ্য তার ভিনিগার মেশান তেতো মদ পানের অযোগ্য···তবু সবাই শ্রদ্ধার সঙ্গে সেই মদ গিলল। সে ঠিক করেছিল যে, পারিবারিক গণ্ডগোলের জন্য অভ্যর্থনার কোন ব্যবস্থা হবে না।

তবে মিলিত প্রার্থনা সভার পর সবাই বর-কনের স্বাস্থ্য পান করবে। ফৌআনের মেজাজ বিগড়ে গিয়েছিল। শরীর খারাপ হয়েছে বলে বিছানায় শুয়ে পড়ল। আত্মীয়দের মধ্যে একমাত্র ডেলহোমি হাজির হল এবং সে ফ্রানকয়েসের তরফে সাক্ষী দাঁড়াল এবং এটা সে করল জঁায়ের মতন একটি সৎ ছেলের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার জন্য। সাক্ষী হিসাবে বর তার সঙ্গে এনেছিল তার খামারের মালিক হোরদিকুইন আর একজন খামার-মজুরকে। এই দ্রুত বিবাহ ব্যবস্থায় সারা রগনি গ্রামে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল কেননা এই বিবাহ নিয়ে অনেক বিরোধ দেখা দিয়েছিল। তাই প্রত্যেকে তাদের বাড়ীর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে বিয়ে দেখছিল।

ফ্রানকয়েস জেদ ধরেছিল, সে বাড়ীর ভাগ নেবেই তাই স্থির হল যে, সম্পত্তির ভাগ-বাঁটোয়ারা না মেটা পর্যন্ত সে গ্রাণ্ডির বউয়ের বাড়ীতেই থাকবে। পনের দিনের জন্য একখানা আলাদা বাড়ী ভাড়া করার কি সার্থকতা আছে? খামারের গাড়োয়ান জঁা ততদিন খামারেই থাকবে শুধু রোজ সন্ধ্যেবেলা এসে জঁায়েব সঙ্গে দেখা করবে। তাদের বিয়ের রাত তাই একেবারে অর্থহীন এবং নিরানন্দময় হল, তবে পরিণামে একদিন তাদের মিলিত জীবন গড়ে উঠবে তাই তারা খুশি। সে যখন ফ্রানকয়েসকে গ্রহণ করল তখন ফ্রানকয়েস কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল, কান্নায় তার কণ্ঠরোধ হল, কিন্তু কোনভাবেই ত জঁা তাকে আঘাত করে নি···কেননা সে বড় শান্ত-শিষ্ট মানুষ। ব্যাপারটা সবচেয়ে বিসদৃশ হয়ে উঠল যখন সে কাঁদতে কাঁদতে বলল যে, তার বিরুদ্ধে ফ্রানকয়েসের কোনও অভিযোগ নেই, তবু সে কান্না থামাতে পারছে না এবং সে কেন কাঁদছে তাই সে জানে না। স্বাভাবিকভাবেই এ ধরনের অবস্থা হলে কোন লোকের মনেই কাম-লালসা বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা অতি অল্প। তাই আবার সে তাকে আলিঙ্গন করল কিন্তু বৃথাই আলিঙ্গন করল। তারা একেবারেই যেন তৃপ্তি পেল না, প্রথম দিন খড়ের গাদায় তারা যতটুকু আনন্দ লাভ করেছিল আজ রাতের আনন্দ হল তার চেয়ে অনেক কম। সে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে চাইল যে, যেহেতু তারা সহজ, সরল ভাবে মিলিত হয় নি তাই মিলনের স্বাদ তারা হারিয়েছে। কিন্তু তবু এই অসোয়াস্তি ও লজ্জার জন্য তাদের দু'জনেরই হৃদয় বেদনার্ত হয়ে উঠেছিল তবু তারা একতা অনুভব করছিল। তারা ঘুমুতে পারছিল না তাই বাড়ী আর জমি পেলে কিভাবে জীবন গড়ে তুলবে তাই নিয়ে আলোচনা করে সারা রাত কাটিয়ে দেবে ঠিক করল।

পরের দিন ফ্রানকয়েস তার জমি-জমার ভাগ দাবি করল, কিন্তু গ্রাণ্ডির বউ আর আগের মতন অত অধীর হতে চাইল না। প্রথমেই সে চাইল তার আনন্দের সুযোগগুলো আরও স্থায়ী করতে, তার রক্ত-সম্পর্কীয় আত্মীয়দের মনে ছুঁচ ফোটানোর ইচ্ছাকে দীর্ঘস্থায়ী করতে। মেয়েটাকে দিয়ে যথেষ্ট কাজ করিয়ে নিচ্ছে উপরন্তু তার স্বামীকে দিয়েও করাচ্ছে, প্রতিটি রাত তার বাড়ীতে

কাটানোর জন্যে তাঁকে দু' ঘণ্টা করে রোজ বেগার খেটে দিতে হচ্ছে এবং এটাই ঘরের ভাড়া। কাজেই তাদের চলে যাওয়া এবং নিজেদের সংসার পাতার জন্য সে একটুও তাগাদা দিল না। যাহোক বুতোদের জিজ্ঞাসা করতে হবে যে, কি ভাবে তারা ভাগ-বাঁটোয়ারার ব্যবস্থা করতে চায়। ফ্রানকয়েসের হয়ে বুড়ী নিজে দাবি করল, বাড়ীখানা, চাষের জমির অর্ধেক এবং চারণ-ভূমির আধা-আধি। আঙুর-ক্ষেতের অর্ধেক ভাগ সে ছেড়ে দিল কারণ অর্ধেক বাড়ীর দাম আর আধখানা আঙুর ক্ষেতের দাম সমান সমান হবে সে কষে দেখল। এই প্রস্তাব নিরপেক্ষ এবং বিবেচনা-প্রসূত, বাস্তবিকই বন্ধুত্বপূর্ণ অবস্থায় ভাগাভাগির ব্যবস্থা করে নিলে এ ব্যাপারে আদালতকে এড়ানো যায়। বাঁচা যায় আইনের হাত থেকে। আইন-ব্যবসায়ীরা সব সময় বড় বেশী মুনাফা লুটতে ব্যগ্র। গ্রাণ্ডির বউ তার বাড়ী আসতেই বুতো তোতলাতে লাগল, সম্পদের জন্য বুড়ীকে সে শ্রদ্ধা দেখাতে বাধ্য অথচ বুড়ী যা বলছে তা সে সহ্য করতে পারছে না। সে রেগে-মেগে বেরিয়ে গেল। ভয় হল, নিজের স্বার্থ ভুলে সে হয়ত বুড়ীকে মেরে বসবে। লিসা একা রইল পিসীর কাছে, তার কান দুটো জ্বলছিল এবং সেও রাগে তোতলাতে লাগল।

'বাড়ী! সে বাড়ী চায়, ওই অকর্মণ্য নোংরা মাগি আমার বাড়ী দাবি করছে। বিয়ের আগে আমাকে একবার বলতে এল না। ঠিক আছে পিসী, আমার মরা দেহ মাড়িয়ে তবে সে এ বাড়ীতে ঢুকতে পারবে।'

গ্রাণ্ডির বউ শান্তভাবে শুনছিল।

'ঠিক আছে, বাছা! উত্তেজিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। তুমিও ত বাড়ী চাইছ আর তা' চাইবার তোমার অধিকার আছে। আমরা বিচার করে দেখব।'

তিন দিন ধরে বুড়ী দু'বোনের কাছে বারবার আসা-যাওয়া করল, পরস্পরকে পাঠানো তাদের ঘৃণাপূর্ণ প্রস্তাব আদান-প্রদান করল। এবং অন্তিমে ক্লান্ত এবং নিঃশেষিত উদ্যম হয়ে দু বোনই অসুস্থ হয়ে শয্যায় আশ্রয় নেওয়ার অবস্থায় পৌঁছল। বুড়ী নিজে ক্লান্তিহীনা, এবং সে দেখাতে চাইল যে, দু বোনকে সে কত ভালবাসে এবং এই জঘন্য কাজ করছে বলে তার ভাইঝিদের উচিৎ তার কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে থাকা। অবশেষে ঠিক হল যে, জমি-জমা ভাগ করা হবে। এবং যেহেতু তারা একমত হয়ে চুক্তি করতে পারল না তাই বাড়ী-ঘর আসবাব-পত্র এবং গৃহপালিত পশুগুলো বেচা হবে। প্রত্যেক বোনই জেদ ধরল, সে বাড়ীখানা কিনবে, তা সে দাম যাই হোক না কেন। প্রয়োজন হলে তার যথা-সর্বস্ব মায় শেষ পোশাকটা পর্যন্ত বিক্রি করে দেবে।

গোটা একটা মাস ধরে বুতো রেগে টঙ হয়ে রইল। প্রথমত মেয়েটা তার মুঠো থেকে পালিয়েছে। অতৃপ্ত কামনায় তার দেহ-মন অসুস্থ। তাকে একদিন অঙ্কশায়িনী করার একরোখা আশা ফলবতী করার জন্য সে আর তার স্কার্টের নীচের খানিকটা মাংস খামচে ধরতে পারছে না। বিয়ের পর থেকে অন্য

একজন মরদ তাকে শয্যাসঙ্গিনী করে তার সাথে খুশি মতন যৌনাচার করছে···এই চিন্তা অবশেষে তার রক্তে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। তারপর রয়েছে জমি-জমা···সেই লোকটা তার কাছ থেকে জমিগুলোও কেড়ে নিচ্ছে। এর চেয়ে সে বরং তার একখানা অঙ্গ কেটে দিতে পারত। মেয়েটাকে সে হয়ত একদিন দেখতে পাবে···কিন্তু জমি···যে জমিকে সে নিজের বলে মনে করত এবং কখনও যে জমি সে হাতছাড়া করবে না বলে মনে মনে শপথ নিয়েছিল··· সে দেখল লাল রঙের চিহ্ন এবং নৈরাশ্যজনক উপায়ের কথা তার মনে উদয় হল, ভয়ানক বন্য অপরাধ এবং খুনের কল্পনা তার মন জুড়ে বসল, কিন্তু পুলিশের ভয় এই অপরাধ-মূলক কাজ করা থেকে তাকে নিবৃত্ত করল।

অবশেষে মঁসিয়ে বেইলিহ্যাচির সঙ্গে তাদের দেখা করার ব্যবস্থা হল এবং এই প্রথম মুখোমুখি দেখা হল বুতো এবং লিসার সাথে ফ্রানকয়েস ও জঁায়ের। নিজে আনন্দ পাওয়ার জন্যে গ্রাণ্ডির বউ তাদের সঙ্গে গেল কিন্তু ভাবখানা এমন যে, অন্যায় রোধ করার জন্যই তার এই গমন। মনে টান টান নীরবতা নিয়ে পাঁচজনে অফিসে প্রবেশ করল। ডান দিকে বসল বুতোরা আর বাম দিকে ফ্রানকয়েস। জঁা দাঁড়িয়ে রইল ঠিক ফ্রানকয়েসের পিছনে। এমন একটা ভাব দেখাতে লাগল জঁা যে, এই সম্পত্তির ভাগাভাগিতে সে নেই, শুধু এসেছে তার স্ত্রীর অধিকার সাব্যস্ত করতে। মাঝখানে বসেছে গ্রাণ্ডির বউ··· চর্মসার, ঋজু দেহ, বিশাল দুটো চোখের দৃষ্টি আর চঞ্চুর মতন নাকটা পরম পরিতোষের সঙ্গে একবার এদিক একবার ওদিক ফেরাচ্ছে। বোন দুটি যেন পরস্পরকে চেনেই না, মুখে রা নেই, একবারও তাকিয়ে দেখছে না পরস্পরকে···এবং ভাব-ভঙ্গি অতীব কঠোর। একবার কেবল দুই মরদ পরস্পরের দিকে তাকাল···দ্রুত, বাঙ্ময় দৃষ্টি···ছুরির ফলার মতন তীক্ষ্ণ।

এই ভয়ঙ্কর ভাব-ভঙ্গীর সম্মুখীন হয়ে মঁসিয়ে বেইলিহ্যাচি শান্ত হয়ে রইলেন।

একসময় তিনি বললেন—'বন্ধুগণ, জমি ভাগ করার ব্যাপারে তোমরা একমত হয়েছ তাই ওই জমির ভাগাভাগি আগে শেষ করা যাক।'

এবার প্রথমেই তিনি স্বাক্ষর দাবি করলেন। দলিল তৈরী হল, তাতে সব ভাগও দেখান হল, শুধু ভাগের দাবিদারের নামের জায়গাটা রইল ফাঁকা। নামের লটারি হওয়ার আগে দলিলে ওদের স্বাক্ষর করতে উনি আদেশ দিলেন। গণ্ডগোল এড়াবার জন্যে তিনি এটাই ঠিক করলেন।

ফ্রানকয়েসের উঠল দু'নম্বর আর লিসাকে নিতে হল এক নম্বর। বুতোর ধমনীতে তীব্র রক্তস্রোতের চঞ্চলতা আর মুখখানা কালিবর্ণ ধারণ করল। তার ভাগ্য কখনও সুপ্রসন্ন নয়। এখন আবার তার জমি দু'ভাগে ভাগ হল। এই রক্ত-চোষা ছোট বোন আর তার মরদ তার ডানদিকের আর বামদিকের জমি খণ্ড দুটোর মাঝখানের জমির মালিক হল।

দাঁতে দাঁত চেপে সে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল—'রক্তাক্ত নরক! রক্তখেগো শুয়োরের বাচ্চা।'

দলিল সম্পাদনকারী কর্মচারী তাকে রাস্তায় না যাওয়া পর্যন্ত চুপ করে থাকতে বললেন।

বোনের দিকে না তাকিয়ে লিসা বলল—'ওটা সমভূমি পর্যন্ত আমাদের জমি দু'ভাগে ভাগ করেছে। বোধ হয় আমাদের সাথে ওটা বদলি করে নিতে ওরা রাজী হবে। এটা করলে আমাদের সুবিধা হবে কিন্তু আর কারো ক্ষতি হবে না।'

ফ্রানকয়েস শুকনো গলায় বলল—'না।'

গ্রাণ্ডির বউও সমর্থন-সূচক ঘাড় নাড়ল। ভাগ্য যা' স্থির করেছে তার বিরুদ্ধে যাওয়া দুর্ভাগ্যের লক্ষণ। ভাগ্যের এই নিষ্ঠুর আঘাতে সে আনন্দিত হল, জাঁ কিন্তু তখনও তার স্ত্রীর পিছনে দাঁড়িয়েছিল, নড়ে নি। সে সব কিছু থেকে দূরে থাকাটাই স্থির করল তাই তার মুখ ভাবলেশহীন।

মঁসিয়ে বেইলিহ্যাচি বললেন—'এবার আমরা ব্যাপারটা শেষ করি এস। আর সময় নষ্ট করব না।'

দু'বোনই রাজী হল, মঁসিয়ে বেইলিহ্যাচি তাদের বাড়ী, আসবাবপত্র এবং গৃহপালিত পশুগুলো বিক্রির ব্যবস্থা করে দেবেন। সেই মাসের দ্বিতীয় নীলাম বিক্রির বিজ্ঞাপন বেরোল কাগজে এবং নীলাম হবে তাঁর অফিসে। নীলামের শর্তে ঠিক হল যে, ক্রেতা বাড়ী কেনার দিনই সব কিছুর দখল লাভ করবে এবং ভোগের অধিকার পাবে। শেষে নীলাম মিটলে ভাগীদারদের মধ্যে পাওনার হিসাব-নিকাশ করা হবে। কোনকরম তর্ক বিতর্ক না করে এই প্রস্তাব গৃহীত হল।

কিন্তু ঠিক সেই সময় অফিসের কেরাণীবাবু ফৌআন বুড়োকে নিয়ে ঘরে ঢুকল···ছোট বোনের অভিভাবক হিসাবে ফৌআনের আজ এখানে হাজির থাকার কথা ছিল। কেরাণীবাবু কিন্তু যেসাস ক্রাইস্টকে ঢুকতে দিচ্ছিল না কেননা বদমাসটা খুব মদ গিলেছে। যদিও ফ্রানকয়েস আজ মাসখানেক হল সাবালিকা হয়েছে তবু এখনও অভিভাবকত্বের হিসাব দেয় হয় নি, এর ফলে ব্যাপারটা বেশ জটিল হয়ে উঠেছে। এগুলো এখন দিয়ে বুড়ো মানুষটাকে দায়িত্ব মুক্ত করা প্রয়োজন। বুড়ো সকলের মুখের দিকে তাকল, তার কুৎকুতে দু'চোখ আয়ত দৃষ্টি। তার সারা দেহ ভয়ে কাঁপছিল, তার ভয় হচ্ছিল যে, তার সঙ্গে একটা আপস-রফা করা হলে সে আইনের ফাঁদে জড়িয়ে যাবে।

মঁসিয়ে বেইলিহ্যাচি হিসাব পড়ে শোনালেন। ওরা শুনছিল এক মনে, ওদের চোখের পাতা নড়ছিল না। কোনও কথা যেন অবোধ্য না থাকে তাই ওরা উদ্বিগ্ন। ওরা ভীত হল যে, একটা শব্দও ছাড় গেলে ওদের জীবনে দুর্ভাগ্য সুরু হবে।

পড়া শেষ করে মঁসিয়ে বেইলিহ্যাচি জানতে চাইলেন—'তোমাদের কোনও আপত্তি আছে?'

তারা হতভম্ব হয়ে বসে রইল। কিসের আপত্তি? এটা সম্পূর্ণ সম্ভব যে, তারা হয় ত কোন বিষয় উল্লেখ করতে ভুলে গেছে, কিন্তু কই কিছুই ত মনে পড়ছে না।

সহসা গ্রাণ্ডির বউ বলল—'মাফ করবেন, ফ্রানকয়েসের দিক দিয়ে হিসাবটা কিন্তু সম্পূর্ণ হয় নি। আমার ভাই অবশ্য এ ব্যাপারে অন্ধ হয়ে আছে অথবা সে বুঝতে পেরেছে যে, মেয়েটাকে লুঠ করা হয়েছে।'

ফৌআন তোতলাতে লাগল—'কি ব্যাপার? আমি ওর সম্পত্তির একটা কপর্দকও কোনদিন নিই নি। ঈশ্বর সাক্ষী রেখে শপথ করে বলতে পারি।'

'আমি বলছি, ফ্রানকয়েসের দিদির বিয়ের পর থেকে, তা' প্রায় বছর পাঁচেক হবে, বাড়ীতে চাকরাণীর মতন কাজ করেছে। কাজেই তার বেতন পাওনা আছে।'

এই আশাতীত দাবি শুনে বুতো তার চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠল। লিসার বাকরোধ হয়ে গেল।

'বেতন! কি, ছোট বোনকে বেতন দিতে হবে? এটা সত্যি একটা জঘন্য ভাবনা!'

মঁসিয়ে বেইলিহ্যাচি ওদের থামতে হুকুম করলেন এবং যুক্তি দেখালেন যে, যদি চায় তাহলে নাবালিকার বেতন চাওয়ার অধিকার আছে।

ফ্রানকয়েস বলল—'হাঁ, আমি চাই! আমার যা' কিছু পাওনা আছে, সব চাই।'

বুতো এবার মরীয়া হয়ে বলে উঠল—'ও যে খাদ্য খেয়েছে তাহলে তার কি হবে? রুটি, মাংস এসব ত দীর্ঘস্থায়ী হয় না। দেখছেন ত! ও কুঁড়েটা ত আর দেয়াল চেটে মোটা হয় নি?'

লিসা ভয়ানক কণ্ঠে বলল—'ওর পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারটা কি হবে? এবং সেগুলো পরিষ্কারের ব্যাপারটা? দু'দিনেই ওর শেমিজ নোঙরা হয়ে যেত, কেননা সে দারুণ ঘামত।'

ফ্রানকয়েস রেগেমেগে বলল—'দারুণ খাটতে হত বলেই দারুণ ঘামতাম।'

গ্রাণ্ডির বউ বলল—'ঘাম শুকিয়ে যায়, তাতে নোঙরা হয় না।'

মঁসিয়ে বেইলিহ্যাচি আবার বাধা দিলেন। তিনি বুঝিয়ে বললেন হিসাবের খসড়া আবার তৈরী করতে হবে, একদিকে মাসিক বেতন এবং আর একদিকে খাওয়া-দাওয়া এবং পোশাক-পরিচ্ছদের খরচ। তিনি কলম নিয়ে ওদের দাবি অনুযায়ী আবার হিসাব করতে বসলেন···কিন্তু হিসাব করা ভয়ানক কঠিন কাজ। গ্রাণ্ডির বউয়ের সমর্থন পেয়ে ফ্রানকয়েস দাবি জানিয়ে বলল যে, সে মোটা বেতন পাওয়ার যোগ্য কেননা ঘরে তাকে সব কাজ করতে হত, গোরু

দেখাশুনা করত সে, ঘর-গৃহস্থালীর কাজও করত। আবার তার ভগ্নীপতি তাকে মাঠে একজন মরদের মতন খাটাত। অন্যদিকে খাওয়া-দাওয়া আর পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারে বুতোরা মোটা অঙ্কের খরচের হিসাব দিল এমন কি তার জন্মদিনের উপহার কেনার খরচের কথাও উল্লেখ করল। তারা এত বেশী বেশী হিসাব দেখান সত্ত্বেও তাদের কাছে বেতন বাবদ ফ্রানকয়েসের একশ' ছিয়াশী ফ্রাঙ্ক পাওনা হল। ওদের হাত কাঁপতে লাগল, দু'চোখ লাল হয়ে উঠল এবং অবাক হয়ে ভাবতে সুরু করল আর কোন খরচ তারা জুড়তে পারে, কোন খরচ বাদ পড়েছে। হিসাব যখন গৃহীত হওয়ার মুখে তখন বুতো চেঁচিয়ে উঠল:

'একটু থামুন! ওর মাসিক হওয়ার জন্য ডাক্তার ডাকতে হয়েছিল, তার খরচ? তিনি দু'বার এসেছিলেন। ছ ফ্রাঙ্ক খরচ হয়েছিল।'

অপর পক্ষ দাবির ব্যাপারে বিজয়ী হবে তা' সে সহ্য করতে রাজী নয়, তাই ভাই ফৌআনকে বলতে বলল যে, ও বাড়ীতে যখন সে ছিল এবং চলে আসবার ঠিক আগে ফ্রানকয়েস ক'দিন মাঠে কাজ করেছিল। ত্রিশ সউ দৈনিক মজুরিতে পাঁচ দিন না ছ'দিন হবে? ফ্রানকয়েস চেঁচিয়ে বলল—'ছ দিন।' লিসা বলে উঠল—'পাঁচ দিন।' এমন ভয়ানক কণ্ঠে ওরা বলল যেন ওরা পরস্পরকে পাথর ছুঁড়ে মারছে। বুড়ো মানুষটা ঢুলছিল। নিজের কপালে মুষ্ঠাঘাত করতে করতে দু'জনের কথাই সমর্থন করল। দিনের ব্যাপারে ফ্রানকয়েস জিতল এবং তার পাওনার হিসাব দাঁড়াল একশ' উননব্বই ফ্রাঙ্ক।

মঁসিয়ে বেইলিহ্যাচি জিজ্ঞাসা করলেন—'তাহলে এবার হিসাব মিটল ত, তাই ত?'

বুতো চুপচাপ চেয়ারে বসে ছিল, এবং এই ক্রমবর্ধমান হিসাবে সে যেন দেহমনে ধ্বংস হয়ে গেল, আর সে লড়াই করতে রাজী নয়। তার বিশ্বাস যে, সে সর্বনাশের অতলে পড়েছে।

সে দুঃখ-ম্লান কণ্ঠে বলল—'আমার গায়ের জামাটাও যদি চাও ত এই নাও খুলে দিচ্ছি।'

কিন্তু শেষ আঘাত হানার জন্যে গ্রাণ্ডির বউ চুপ করে ছিল, ব্যাপারটা খুবই প্রয়োজনীয় অথচ খুবই সাধারণ অথচ সবাই সে কথা ভুলে আছে।

'শোন! রাস্তা বানানোর জন্যে যে পাঁচশ' ফ্রাঙ্ক ক্ষতিপূরণ হিসাবে পেয়েছিলে সেটা কোথায়?'

বুতো লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল, তার চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে, তার দু'ঠোঁট বিস্ফারিত। এ ব্যাপারে কোন কিছু বলার বা প্রতিবাদের অবসর নেই, এ টাকা সে গ্রহণ করেছে এবং তার অর্ধেক তাকে দিতেই হবে। বারেকের জন্য সে অন্য একটা কিছু ভাবতে চেষ্টা করল। এই সাময়িক উত্তাল উন্মত্ততা থেকে মুক্তির কোনও পথ খুঁজে পেল না এবং এই উন্মত্ততা তার মস্তিষ্ক

আচ্ছন্ন করে ফেলল। সে সহসা জাঁকে তেড়ে গেল।

'শুয়োরের বাচ্চা, তুই আমাদের বন্ধুত্ব নষ্ট করেছিস। তুই না থাকলে আমরা একসাথে এক পরিবারে সুখে থাকতাম।'

জাঁ এতক্ষণ খুব শান্ত ছিল, ছিল নীরব। এবার আত্মরক্ষার জন্য বলল—'আমার গায়ে হাত দিতে এস না, এলে মারব!'

সহসা ফ্রানকয়েস এবং লিসা উঠে পড়ল। তারা তাদের নিজের নিজের মরদের সামনে দাঁড়াল। তাদের মুখে ক্রমবর্ধমান ঘৃণার অভিব্যক্তি, থাবা দিয়ে তারা তাদের পরস্পরের চোখ উপড়ে নিতে প্রস্তুত। গ্রাণ্ডির বউ বা ফৌআন কেউ ওদের লড়াই থামানর জন্য উঠল না। শুধু মঁসিয়ে বেইলিহাচি ধমক দিলেন।

'ঈশ্বরের দোহাই! রাস্তায় না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর! এটা বড় বিশ্রী ব্যাপার যে, ঝগড়া না করে আমরা একটা চুক্তি করতে পারি না!'

তারপর ওরা সবাই থামল, কিন্তু তখনও রাগে ওদের দেহ কাঁপছিল।

মঁসিয়ে বেইলিহাচি বললেন—'তোমরা রাজী, কেমন রাজী ত? আচ্ছা, আমি অভিভাবকত্বের হিসাবটা করে ফেলছি। তোমরা স্বাক্ষর দেবে, তারপর আমরা বাড়ীখানা বেচার কথা আলোচনা করব। ব্যাস! তাহলেই সব শেষ। এবার চলে যাও, বোকামি স্বভাবের জন্য অনেক সময় মূল্য দিতে হয়!'

এই কথায় ওরা শেষ পর্যন্ত শান্ত হল। কিন্তু ওরা যখন সবাই চলে যাচ্ছিল তখন বাপের জন্য বাইরে অপেক্ষারত যেসাস ক্রাইস্ট পরিবারের সবাইকে অপমান করল। বলল, এটা বড় লজ্জাজনক ব্যাপার, এই জঘন্য ব্যাপারে একজন বুড়ো মানুষকে টেনে এনেছ তোমরা। নির্ঘাৎ তার সর্বস্ব লুঠ করে নেওয়া হবে। তারপর যেমনভাবে বুড়োকে নিয়ে এসেছিল তেমনিভাবে অর্ধমাতাল অবস্থায় তাকে টানতে টানতে গাড়ীতে গিয়ে তুলল খড় পাতা গাড়ীখানা সে এক প্রতিবেশীর কাছ থেকে ধার করে এনেছে। বুতোরা একদিকে চলে গেল। গ্রাণ্ডির বউ তখন জাঁ এবং ফ্রানকয়েসকে 'বন লাব্যুররের' মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়ে কালো কফি পান করল। সে তখন আনন্দে আত্মহারা।

অবশিষ্ট চিনিটুকু পকেটে রেখে সে বলল—'খুব হাসি পাচ্ছে!'

সেদিন বুড়ীর মাথায় আর একটা মতলব এল। রগনিতে ফিরেই সে আর একটা চুক্তি করার জন্যে বুড়ী সসিসের দিকে ছুটল। জনরব, সসিস একদিন তার প্রেমিকদের একজন ছিল। যেহেতু বুতোরা স্থির করেছে যে, তাদের সম্বলের শেষ কপর্দক পর্যন্ত তারা বাড়ীর জন্যে ফ্রানকয়েসের বিরুদ্ধে নীলাম ডাকবে তাই, বুড়ী ঠিক করল যে ওই বুড়ো চাষী তার হয়ে নীলামে ডাক দেবে, তাহলে ওরা কেউ করবে না এবং বুড়োকে ছেড়ে দেবে। সে তাদের প্রতিবেশী এবং নিজের সম্পত্তি হয় ত বাড়াতে চাইবে। একটা ছোট-খাট উপহার পেয়েই বুড়ো রাজী হল। ফলে গ্রাণ্ডির বউ যা ভেবেছিল

সেই মত মাসের দ্বিতীয় রবিবার নীলামের ব্যবস্থা হল। আর একবার ওরা ম'সিয়ে বেইলিহ্যাচির অফিসে এল। বুতোরা বসল একদিকে এবং গ্রাগুির বউয়ের সাথে ফ্রানকয়েস এবং জঁা বসল আর একদিকে। কয়েকজন চাষীও হাজির হয়েছিল। যদি সস্তায় বিক্রি হয় তাহলে বাড়ী কেনবার একটা অস্পষ্ট ধারণা নিয়ে তারাও এসেছিল। কিন্তু লিসা এবং ফ্রানকয়েস একগুঁয়ের মতন ডাকতেই বাড়ীর দাম উঠল সাড়ে তিন হাজার ফ্রাঙ্ক এবং ওটাই বাড়ীখানার আসল দাম। ফ্রানকয়েস তিন হাজার আট শ' ফ্রাঙ্ক ডেকে থামল। চার হাজার ফ্রাঙ্ক ডাক হতেই বুড়ো সসিস রঙ্গমঞ্চে হাজির হল এবং দাম আরও পাঁচ শ' ফ্রাঙ্ক বাড়াল। ভয়ে বুতোরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। আর সম্ভব নয়, এত টাকার কল্পনা করে তাদের হৃদয় ভেঙ্গে গেল। তবু লিসা ছাড়তে চাইছিল না তাই সে পাঁচ হাজার ফ্রাঙ্ক পর্যন্ত ডাকল। কিন্তু লিসার মনের বাঁধ ভেঙ্গে পড়ল যখন বুড়ো চাষী সহসা ডাক দিল পাঁচ হাজার দু শ ফ্রাঙ্ক। বুতোরা গুটিয়ে গেল। ফ্রানকয়েস আর তার মরদ হেরে যাওয়ার পর এই টাকার অঙ্ক পাওয়ায় তারা আনন্দিত।

কিন্তু রগনীতে ফিরে যে-বাড়ীতে সে জন্মেছে, বড় হয়েছে সেই বাড়ীতে ঢুকে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। বুতো এমন অভিভূত হয়ে পড়েছিল যে, সে শেষ পর্যন্ত লিসার দোষ ধরল এবং সর্বস্ব এমন কি মাথার চুল পর্যন্ত বেচে নীলাম ডাকা উচিত ছিল বলে মনে করল, কিন্তু পারল না। এই নিষ্ঠুর মাগিগুলো মজা লোটার জন্যে যেমন ঠ্যাঙ ফাঁক করে শোয় তেমনি নিজের নিজের তবিল ফাঁক করে ধরল। কিন্তু এটা সর্বৈব মিথ্যেকথা কারণ সেই ত লিসাকে নীলাম ডাকা থেকে বিরত করেছিল। ব্যাস! ওদের মধ্যে লড়াই সুরু হয়ে গেল। বুতো এক ঘুঁষি কষিয়ে লিসাকে ফেলে দিল। কিন্তু লিসা উঠে দাঁড়াল এবং এমন জোরে লাথি মারল যে বুতোর ঠ্যাঙ ভেঙ্গে যাওয়ার মতন অবস্থা হল।

পরের দিন সন্ধ্যেবেলায় আরও খবর ছড়িয়ে পড়ল এবং যেন বজ্রপতন হল। সকালবেলা বুড়ো সসিস গিয়েছিল নীলামের কাগজ-পত্র সারতে এবং দুপুরবেলার মধ্যে সারা রগনি গ্রামে খবর ছড়িয়ে পড়ল যে, বুড়ো সসিস বাড়ী কিনেছে ফ্রানকয়েসের হয়ে এবং এই অধিকার তাকে দিয়েছে জঁা। এবং শুধু বাড়ী নয়, আসবাবপত্র, গাধাটা এবং গরুগুলোও সে কিনে নিয়েছে।

তাদের মাথায় বুঝি বাজ পড়েছে এমনি দুঃখের আঘাতে ওরা কেঁদে উঠল। স্বামী এবং স্ত্রী দুজনেই আছড়ে মাটিতে পড়ে চিৎকার করে কান্না জুড়ে দিল, মনে ওদের দারুণ হতাশা। ওই বদমাস মেয়েটা তাদের ঠকিয়েছে, তাদের সর্বনাশ হয়েছে। তারা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে কারণ তাদের কানে এসেছে যে, সারা গ্রামের লোক ওদের বোকার মতন আচরণের জন্য হাসাহাসি করছে। হায় ঈশ্বর! তাদের বাড়ী থেকে তাড়িয়ে ওরা এভাবে কৌশলে বাড়ী দখল

করবে! কিন্তু আমার কথা, একটু অপেক্ষা কর!

সেদিনই সন্ধ্যেবেলা ক্রানকয়েসের পক্ষ থেকে গ্রাণ্ডির বউ এল বুতোদের বাড়ী। ভদ্রভাবে জানতে চাইল যে, কবে তারা এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাচ্ছে। পরিণামের সব কথা ভুলে বুতো তখ্‌খুনি বুড়ীকে বাড়ী থেকে বার করে দিয়ে কেবল একটা শব্দ উচ্চারণ করল।

'ফুঃ!'

বেশ হাসি-হাসি মুখে বুড়ী বাড়ী থেকে বেরিয়ে এল, সরলভাবে চেঁচিয়ে বলল যে, পেয়াদা পাঠানো হবে। পরের দিনই পেয়াদা ভিমক্‌স্ শুকনো আর উদ্বিগ্ন মুখে এবং বেশ যন্ত্রণাক্লিষ্ট দেহে রাস্তা দিয়ে এল এবং সাবধানে দরজায় টোকা দিল। প্রতিবেশীদের বউরা দাঁড়িয়ে তাকে দেখছিল। কোনও জবাব নেই। এবার বেশ জোরে দরজায় টোকা দিল। মনে সাহস নিয়ে সজোরে ডাকল এবং বুঝিয়ে বলল যে, বাড়ী-ছাড়ার নোটিশ সে দিতে এসেছে। এবার পাশ-জানালা খুলে সেই একই কণ্ঠ সেই একই শব্দটা আওড়াল শুধু···কেবল একটাই শব্দ।

'ফুঃ!'

এক বালতি জল ঢেলে দিল ভিমক্‌সের দেহে, তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত গেল জলে ভিজে। কাজেই 'সমন' নিয়ে তাকে ফিরে যেতে হল এবং তারপর থেকে রগনির তামাম নারী পুরুষ এই তামাসা নিয়ে হাসাহাসি করে।

কিন্তু গ্রাণ্ডির বউ তখনি জাঁকে নিয়ে শাটোদুনে উকিলের সাথে দেখা করতে গেল। তিনি ওদের বুঝিয়ে বললেন যে, বাড়ী থেকে বার করতে হলে অন্ততঃ পাঁচ দিন সময় চাই। আইন অনুযায়ী অভিযোগ জানাতে হবে, আদালতের হুকুম বেরোবে, জারী হবে সেই হুকুম এবং সবশেষে ওদের তাড়ানো যাবে বাড়ী থেকে···শেষে যদি প্রয়োজন হয় তবে পেয়াদা পুলিশ সাথে করে নিয়ে আসবে। চব্বিশ ঘণ্টা সময় বাঁচাবার জন্যে গ্রাণ্ডির বউ আলোচনা করল। এবং মঙ্গলবার দিন গ্রাণ্ডির বউ গ্রামে ফিরে এল। সে রগনি গ্রামে ঘোষণা করে দিল যে, আগামী শনিবার সন্ধ্যেবেলায় চোর ডাকাতদের যেভাবে তাড়ানো হয় সেইভাবে তরবারি উঁচিয়ে বুতোদের বাড়ী থেকে রাস্তায় বার করে দেওয়া হবে যদি না ওরা স্বেচ্ছায় বাড়ী ছেড়ে যায়।

বুতোকে যখন বলা হল তখন ভয়ানকভাবে সে অঙ্গভঙ্গি করল। সবাইকে শুনিয়ে সে বলল যে, তাকে জীবন্ত বাড়ী থেকে বার করা যাবে না, সৈনিকদের এসে বাড়ীর দেওয়াল ভেঙ্গে তবে তাকে বার করতে হবে। কেউ জানত না, যে, সে সত্যিই পাগল হয়ে গেছে কি-না বা রাগের অমিতাচারের ভাণ করছে কি-না! এক সকালে দেখা গেল, বুতো বাড়ীর মধ্যে নিজেকে বন্দী করে বসে আছে এবং ভিতর থেকে লিসা ও মেয়ে দুটোর কান্নাকাটির আওয়াজ ভেসে আসছে। প্রতিবেশীরা দারুণ ঘাবড়ে গেল এবং শেষ পর্যন্ত অনেক সলা-

পরামর্শ করে একজন বুড়ো চাষী জানালায় মই লাগিয়ে দেখে আসতে রাজী হল। জানালাটা সহসা খুলে বুতো মইটা ঠেলে নীচে ফেলে দিল। বুড়ো চাষীও পড়ল মাটিতে। লোকটার পা প্রায় ভেঙ্গে গিয়েছিল আর একটু হলে। নিজের বাড়ীতে খুশি মতন সে কি কিছু করতে পারে না? বুতো ঘুঁষি উঁচিয়ে চিৎকার করে বলল, যে তাকে এমনিভাবে বিরক্ত করবে সে তাকে খুন করে ফেলবে। সবচেয়ে জঘন্য অবস্থা হল যখন লিসা তার বাচ্চা দুটোকে নিয়ে বেরিয়ে এসে গালাগালি দিতে লাগল এবং অপরে তাদের ব্যাপারে নাক গলাচ্ছে বলে অপমান করল। আর কেউ ওদের ব্যাপারে এগিয়ে যেতে সাহস করল না। প্রতিবার নতুন নতুন কুৎসিত আবেগের প্রকাশ শুনে প্রতিবেশীরা শঙ্কিত হয়ে উঠল, বাইরে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগল এবং এই সব বিদ্রোহাত্মক কথা শুনে তারা ভয়ে কাঁপছিল। কোন কোন বিজ্ঞ লোক ভাবছিল যে, বুতোর মাথায় হয় ত কোন একটা মতলব আছে, অন্যরা ধারণা করল যে, ওর মাথা হয় ত খারাপ হয়ে গেছে এবং পরিণামে হয় ত একটা খারাপ কিছু ঘটবে। এর প্রকৃত কারণটা কিন্তু কখনও জানা গেল না।

অবশেষে শনিবার এল। বুতো আরও উত্তেজিত হয়ে উঠল। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত উদ্দেশ্যহীনভাবে সে একবার গাড়ীতে ঘোড়া জুতল আবার গাড়ী থেকে ঘোড়া খুলল এবং যখন সে দুরন্তবেগে ভীতিজনকভাবে গাড়ী ছোটাচ্ছিল তখন লোকজনেরা ভয়ে রাস্তার পাশে ছুটে পালাচ্ছিল। শনিবার সকালবেলায় ঠিক আটটার সময় সে গাড়ীতে ঘোড়া জুতল কিন্তু বাইরে কোথাও গেল না। সে দরজায় দাঁড়িয়ে রইল এবং প্রতিবেশী পথচারীদের ডেকে ডেকে নাক-মুখ সিঁটকে ফোঁপাতে ফোঁপাতে খিস্তি করতে লাগল। ভারি মজা, পাঁচ বছর ধরে ওই খুদে নষ্ট মেয়ে মানুষটা আমার সাথে ঢলাঢলি করল, আবার এখন আমারই পিছনে লাগছে! হাঁ, ও একটা বেশ্যা মাগি, আর আমার বউটাও তাই। ওই দুই বোন, দু'জনেই খাসা মাল···কে আগে আমার সাথে বিছানায় যৌনাচার করবে তাই নিয়ে নিজেরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করত। প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে সে কর্কশ বিদ্রোহীর ভঙ্গিতে ওই সব মিথ্যে কাহিনী বলতে লাগল। লিসা বাইরে বেরিয়ে আসতেই ভয়ানক ঝগড়া সুরু হয়ে গেল। সকলের সামনেই বুতো লিসাকে বেদম মেরে আবার বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়ে দিল এবং এমনিভাবে বউকে উত্তম-মধ্যম দিয়ে খানিকটা সোয়াস্তি পেয়ে থামল। তারপর দরজায় দাঁড়িয়ে আইনের কবলের চেহারা দেখার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল, পেয়াদাকে ঠাট্টা তামাসা করল এবং দু'চারটে অপমানকর কথাও বলল। লোকটা রাস্তায় কোনও বেশ্যাবাড়ীতে ঢুকেছে না-কি? আর সে আসবে বলে বুতো আশা করতে পারল না এবং তাহলে বুতো জয়ী হল।

অবশেষে দু'জন পুলিশ নিয়ে ভিমক্স্ বেলা চারটের সময় হাজির হল।

বুতো তাড়াতাড়ি ফ্যাকাসে মুখে বাড়ীর উঠোনের দরজা বন্ধ করে দিল। অবশেষে পেয়াদা যে আসবে এ কথা সে বিশ্বাস করতেই পারে নি। সারা বাড়ীতে এখন মৃত্যুপুরীর মতন অবাধ্য নীরবতা বিরাজ করছে···আর সেই নীরবতা রক্ষা করছে সশস্ত্র পুলিশরা। ভিমকৃস্ ত্ব'হাতে এবার দরজায় আঘাত হানল। কোনও জবাব নেই। এবার পুলিশ কনেস্টবলরা যোগ দিল, তারা বন্দুকের কুঁদো দিয়ে দরজায় ধাক্কা দিল। নারী-পুরুষ শিশুর এক বিশাল জনতা তাদের অনুসরণ করল। এই বাড়ী দখল দেখার জন্যে সারা রগনি গ্রামের মানুষ-জন এসে হাজির হল। সহসা দরজা খুলে গেল। নজরে পড়ল বুতো তার গাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে আছে এবং চাবুক কষিয়ে গাড়ীখানা জনতার দিকে ছুটিয়ে দিল।

জনতার চিৎকার ছাড়িয়ে বুতোর কণ্ঠের আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ল—'ডুবে মরতে যাচ্ছি আমি! ডুবে মরব।'

সব শেষ হয়ে গেছে এখন, গাড়ী-ঘোড়া-সহ নিজে সে এ্যাজর নদীতে ঝাঁপ দিয়ে সে সব শেষ করে ফেলবে, ডুবে মরবে।

'এই দেখ্, সব! আমি ডুবে মরতে যাচ্ছি!'

ঘূর্ণায়মান চাবুক আর বেপরোয়া-গতি গাড়ীর সুমুখ থেকে কৌতূহলী জনতা ভয়ে ছুটে পালাতে লাগল। চড়াই বেয়ে বুতো যখন ত্বরন্ত বেগে গাড়ী ছোটাল, চাকাগুলো ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হল···তখন জনতাই আবার গাড়ীর পিছনে ছুটল তাকে থামাবার জন্যে। এই মাথামোটাটা সত্যি সত্যি জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে এবং সকলেই তাহলে একটা কেলেঙ্কারীর মধ্যে পড়বে। অবশেষে তারা ওকে পাকড়াও করল এবং ওর সাথে তাদের ধ্বস্তাধ্বস্তি সুরু হল। একদল ঘোড়ার মুখের লাগাম চেপে ধরল এবং আর এক দল গাড়ীতে উঠল। তারা যখন ওকে ধরে নিয়ে এল তখন আর সে কথা বলতে পারছে না, সারা দেহ টান-টান হয়ে গেছে, মাঝে মাঝে অক্ষম রাগ প্রকাশ করছে এবং দাঁতে দাঁত চেপে নিঃশব্দে প্রতিবাদ জানাচ্ছে।

ঠিক সেই সময়ে বাড়ীর দখল নেওয়ার জন্যে ফ্রানকয়েস এবং জাঁকে সঙ্গে নিয়ে গ্রাণ্ডির বউ সেখানে এসে হাজির হল। বুতো কেবল একবার তাদের দিকে তাকাল···বিয়োগান্ত ঘটনার শেষ পরিণতিকে সম্ভাষণ জানানোর জন্য তার ত্ব'চোখে ঘোরাল দৃষ্টি। কিন্তু এবার সুরু হল লিসার পালা, সে রাগে পাগলের মতন চেঁচিয়ে উঠল। পুলিশের লোকেরা সেখানে ছিল, তারা ওদের জিনিস-পত্র বাঁধা-ছাঁদা করে নিয়ে চলে যেতে বলল। তার স্বামী কাপুরুষ, তাকে ওদের হাত থেকে রক্ষা করার ক্ষমতা তার নেই কাজেই ওদের কথা লিসাকে শুনতেই হবে। পাছায় হাত রেখে সে সোজা হয়ে দাঁড়াল এবং স্বামীকে বলল তার সম্পর্কে তার ধারণা।

'তুমি একটা খাসা বেজন্মা, তোমার জন্যই আমরা আজ রাস্তায় দাঁড়ালাম!

তোমার কোন মুরোদ নেই? ওই বদমাসগুলোর মাথা গুঁড়িয়ে দিতে পারছ না? বেরো হতভাগা কোথাকার, তুই মরদ নস!'

ওর নীরবতায় আরও উত্তেজিত হয়ে লিসা তার মুখের সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করতে লাগল। অবশেষে বুতো তাকে এত জোরে ঠেলে দিল যে, লিসা আর্তনাদ করে উঠল, কিন্তু একটা কথাও উচ্চারণ করল না বুতো, শুধু জলজ্বলে চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

এবার বিজয়ীর মতন ভিমক্স্ বলে উঠল—'এস মা! তাড়াতাড়ি কর!'

তারপর লিসা সহসা রেগে-মেগে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল। গত তিন দিনের মধ্যে সে এবং বুতো অনেক জিনিস নিয়ে চলে গেছে তাদের প্রতিবেশীর বাড়ীতে, নিয়ে গেছে বসবার টুল এবং বড় বড় বাসন-পত্র। ফ্রিমাতের বউ তাদের প্রতিবেশী। এটা তারা বুঝতে পেরেছিল যে, এই উচ্ছেদ অনিবার্য। তাই বুড়ীর সাথে তারা একটা ব্যবস্থা করে নিয়েছিল। থাকবার একটা ব্যবস্থা না করে নেওয়া পর্যন্ত বুড়ী তাদের বাড়ীর একটা অংশ ওদের ভাড়া দেবে। বাড়ীখানা তাদের পক্ষে যথেষ্ট বড়, তাই পক্ষাঘাত-গ্রস্ত স্বামীর জন্য সে শুধু শোবার ঘরখানা রেখে দেবে। যেহেতু আসবাবপত্র-সহ এবং গৃহপালিত পশুগুলোশুদ্ধ বাড়ীখানা বেচে দেওয়া হয়েছিল তাই লিসা তার কাপড়-জামা বিছানা এবং ছোটখাট জিনিসগুলো নিয়ে গেল। প্রত্যেকটা জিনিস খোলা দরজা-জানালা দিয়ে উঠোনে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলল লিসা, যেন শেষ দিন আসন্ন তাই ছেলে-মেয়ে দুটো কাঁদতে লাগল। লরা মায়ের পিছনে পিছনে ঘুরছিল আর জুলি খোলা-মেলা মালগুলোর উপর কাঁদতে কাঁদতে শুয়ে পড়ল। যেহেতু বুতো গাড়ীতে মাল বোঝাইয়ের কাজে হাত লাগাল না, তাই পুলিশরা সাহায্য করতে এগিয়ে এল।

গ্রাণ্ডির বউয়ের পিছনে ফ্রানকয়েস এবং জঁা এসে দাঁড়িয়েছিল। ওদের দিকে নজর পড়তেই লিসার মেজাজ বিগড়ে গেল এবং অবস্থা আরও ঘোরালো হয়ে উঠল। সে ওদের দিকে তেড়ে গেল এবং ওদের মুখের উপর গালাগালি দিতে সুরু করল।

'মাদী কুকুর তুই। তোর রক্তচোষা মরদকে নিয়ে সব দেখতে এসেছিস। ঠিক আছে! তুই তাই দেখ। আমাদের কি হয়েছে দেখে নে। আমাদের রক্ত খাচ্ছিস। চোর! চোর! চোর তুই!'

কথাগুলো তার গলায় আটকে গেল। এক একটা জিনিস ঘর থেকে বার করে উঠোনে আনছিল আর প্রতিবার বোনকে গালাগালি দিচ্ছিল। ফ্রানকয়েস কোন জবাব দিল না। তার সারা মুখ ফ্যাকাসে, ঠোঁটে ঠোঁট চাপা আর দু'চোখে আগুন। কোন কিছু যাতে সরিয়ে নিয়ে না যায় তাই দাঁড়িয়ে দেখছে ফ্রানকয়েস···এবং এ ধরনের নজর রাখা যে একটা যন্ত্রণাদায়ক কাজ ফ্রানকয়েসের মুখে তেমনি একটা ভাব ফুটে উঠল। রান্নাঘরের একখানা টুল

নীলামী মালের তালিকায় রয়েছে···দেখেই সে চিনল।

কঠোর গলায় বলল ফ্রানকয়েস—'ওখানা আমার।'

টুলখানা নিয়ে সোজা পুকুরের জলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে জবাব দিল—'তোর? বেশ ত যা, নিয়ে আয়।'

বাড়ীখানা এখন খালি। বুতো ঘোড়ার লাগাম চেপে ধরল এবং লিসা তার শেষ বাণ্ডিল ছেলেমেয়ে দুটোকে তুলে নিল। তারপর বাড়ী ছেড়ে যাওয়ার শেষ মুহূর্তে লিসা সোজা ফ্রানকয়েসের দিকে এগিয়ে গেল এবং তার মুখে থুতু দিল।

'নে! এটা তোর!'

তার বোনও সঙ্গে সঙ্গে তার মুখে থুতু দিল।

'এবং এটা তোর।'

বিদায় মুহূর্তে বিষাক্ত ঘৃণার ছোবল! পরস্পরের মুখ থেকে নজর না সরিয়ে নিয়ে লিসা এবং ফ্রানকয়েস তাদের মুখ মুছে ফেলল। এবার চিরকালের জন্য ওরা আলাদা হয়ে গেল···একই যুদ্ধবাজ, বিদ্রোহী রক্তের ধারা বইছে তাদের দেহে, এছাড়া আর কোন মিল নেই তাদের মধ্যে।

অবশেষে বাড়ীখানার দিকে তাকিয়ে অঙ্গভঙ্গি করে বুতো তার শেষ কথাগুলো চেঁচিয়ে বলল।

'আমরা শিগগির ফিরে আসব!'

ওদের শেষ পর্যন্ত দেখার জন্যে গ্রাণ্ডির বউ ওদের অনুসরণ করল। কিন্তু বুতোরা পাহাড়ের তলদেশে পৌঁছে গেছে দেখে স্থির করল যে, এবার এদের পিছনে লাগতে হবে, এরা বড় তাড়াতাড়ি তার আশ্রয় ছেড়ে এসেছে। নিজের মনে বিচার করে সে বুঝেছে যে, এরা বেশ সুখী হয়েছে। অনেকক্ষণ ধরে লোকজনেরা দলে দলে জড়ো হয়ে মৃদুকণ্ঠে আলোচনা করতে লাগল। ফ্রানকয়েস এবং জঁা খালি বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করেছে।

ফ্রিমাতের বউয়ের বাড়ীতে বুতোরা যখন জিনিসপত্রের বাণ্ডিল খুলছিল এমন সময় ওরা দেখল, বুড়ো ফৌআন আসছে। যেন একটা ক্ষতিকারক শয়তান তাকে তাড়া করেছে তাই পিছন ফিরে একবার তাকিয়ে দেখে বুড়ো ভীরু এবং চাপা কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল:

'আমার জন্যে একটু জায়গা হবে? এখানে থাকতে এলাম।'

দারুণ ভয়ে ভীত হয়ে বুড়ো ফৌআন শাটো থেকে পালিয়ে এসেছে। রাত্রে যখনই তার ঘুম ভাঙ্গে দেখে, বোলডি রাতের জামা পরে আধা উলঙ্গ একটা রোগা ছোকরার মতন তার বিছানা আর ঘরের চারধারে হাতড়াচ্ছে, কাগজপত্রগুলো খুঁজছে সে···কিন্তু বুড়ো সেগুলো পাহাড়ের একটা গর্তে মাটি চাপা দিয়ে লুকিয়ে রেখেছে। মেয়েটার রোগা শরীর, খুব সহজেই চেয়ার আর বিছানার ফাঁক দিয়ে সাপের মতন সহজেই এঁকেবেঁকে ঘুরতে পারে তাই

যেসাস ক্রাইস্ট তাকে পাঠিয়েছে। সে আগ্রহভরে কাগজপত্র খোঁজে, তার ধারণা, বুড়ো তার পোশাকের মধ্যেই ওগুলো লুকিয়ে রেখেছে পোশাক পরবার সময়। কিন্তু শোবার আগে সেগুলো কোথাও সে রেখে দিচ্ছে, কিন্তু বোলভি জায়গাটার সন্ধান পাচ্ছে না, তাই রাগে সে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। নিশ্চয় বিছানার তলায় সে কিছু রাখে নি। বোলভি তার রোগা রোগা হাতে চারদিক হাতড়াচ্ছে খুব কৌশলে। ওর ঠাকুর্দা তখন ঘুমিয়েছিল, ওর উপস্থিতি বুঝতেই পারে নি।

বুড়ো ফোআন আবার বুতোকে জিজ্ঞাসা করল—'থাকবার জন্যে একটা কোণা পাব?'

পিতার অভাবিত আগমনে ছেলে মনে হল দারুণ খুশি। অর্থ ফিরে আসছে এবার।

'কেন, নিশ্চয়, বাপ! যেমন করে হোক একটা জায়গা তোমায় করে দেব। এতে আমাদের ভাগ্য ফিরবে। হায় ঈশ্বর! যদি করুণা প্রয়োজনীয় হয় তবে আমি এবার ধনী হব।'

ফ্রানকয়েস এবং জঁা ধীরে ধীরে খালি বাড়ীতে ঢুকল। অন্ধকার নামছে, নিথর, নিঃশব্দ ঘরগুলোর মধ্যে বিষণ্ন অপরাহ্নের রাঙা রোদ ছড়িয়ে পড়েছিল। বহু বছরের পুরোন এই বাড়ীতে পরিবারের লোকজনেরা তিন শতাব্দী ধরে বাস করেছে, হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেছে এবং ভোগ করেছে দারিদ্র্য। এবং সেই দারিদ্র্য ছিল এমন সীমাহীন, এমন তীব্র যে, এই বাড়ীখানা গ্রামের গীর্জার ছায়ার মতন বিষণ্নতায় ঢাকা। দরজাগুলো দো-হাট করে খোলা, বুঝি বাড়ীতে ঘূর্ণিঝড় বয়ে গেছে। আকস্মিক প্রস্থানের সময় চেয়ারগুলো যেখানে যেটা ছড়িয়ে পড়েছিল সেখানেই সেটা বিশৃঙ্খলভাবে পড়ে আছে। এটাকে দেখাচ্ছে যেন একটা মৃত্যুপুরী।

ধীরে ধীরে হাঁটতে হাঁটতে ফ্রানকয়েস প্রতিটি জিনিস দেখছিল, মনের ভাবগুলো সব এলোমেলো হয়ে গেল, অস্পষ্ট স্মৃতি সমূহ উথলে উঠল। এখানেই শৈশবে সে খেলা করেছে। রান্নাঘরে টেবিলখানার কাছে তার বাবার মৃত্যু হয়েছিল। শোবার ঘরে শুধু খাটখানা পড়ে আছে, বিছানা নেই। মনে পড়ছে, সেদিন সন্ধ্যেবেলায় লিসা এবং বুতো এই খাটের বিছানায় শুয়ে দারুণ কামক্রিড়ায় মেতেছিল, ছাদ ফুঁড়ে ওদের জোরালো নিঃশ্বাস পতনের শব্দ তার কানে বাজছিল। ও সব কি এখনও তাকে পীড়ণ করবে? তার দৃঢ় ধারণা হল যে, বুতো এখনও এখানে আছে। এই যে এখানে এক রাতে বুতো তাকে জাপটে ধরেছিল আর সে তাকে কামড়ে দিয়েছিল। ওখানে এবং ওখানেই আবার। বাড়ীখানার প্রতিটা কোণে এক একটা স্মৃতির চিহ্ন রয়েছে এবং এর জন্যে সে আরও অসোয়াস্তি ভোগ করছে।

তারপর ফিরে দাঁড়াতেই তার নজর পড়ল জঁায়ের উপর। এই অজানা

লোকটা তাদের বাড়ীতে কি করতে ঢুকেছে? তাকে লজ্জিত মনে হচ্ছে, মনে হচ্ছে সে যেন একজন আগন্তুক…এ বাড়ীর কোন কিছুতে হাত রাখতে তার সাহস হচ্ছে না। ফ্রানকয়েসের মনে সঙ্গীহীন অবস্থার হাহাকার আর গভীর হতাশার অন্ধকার তাই এই জয়লাভ করেও সে আনন্দিত হচ্ছে না। ভেবেছিল দিদিকে তাড়িয়ে বিজয়িনীর ভঙ্গিতে মহানন্দে এই বাড়ীতে সে প্রবেশ করবে। এখন এ বাড়ীখানা তার কাছে অর্থহীন, দুঃখের আঘাতে তার মন বিষণ্ণ। হয় ত বিষণ্ণ অপরাহ্ণের ছায়ান্ধকারের জন্যই এমন মনে হচ্ছে। শেষে অন্ধকার ঘন হল…সে আর তার স্বামী গাঢ় অন্ধকারে এ ঘর থেকে ও ঘরে আবার ও ঘর থেকে এ ঘরে হেঁটে বেড়াতে লাগল। একটা মোমবাতি জ্বালাবার সাহস তাদের হল না।

কিন্তু একটা শব্দ শুনে তারা রান্নাঘরে ফিরে এল। তারা তাদের গাধা গিদিয়নকে দেখে খুব খুশি হল। অভ্যাস মত ঘরে ঢুকে গিদিয়ন খোলা তাক-গুলো শুঁকছে। কলিচ্ গোয়ালে মৃদুকণ্ঠে ডাকছে।

তারপর জঁ। এক সময় ফ্রানকয়েসকে জড়িয়ে ধরল, আলতোভাবে তাকে চুম্বন করল। যেন সে বলতে চাইল, এ সব সত্বেও এখানে তারা আনন্দে বাস করবে।

পঞ্চম ভাগ

১

একদিন অপরাহ্নে লা কর্ণেইলে তার জমিতে একখানা গাড়ী-বোঝাই সার নিয়ে যাচ্ছিল। আজ মাস খানেক হল ফ্রানকয়েস এবং সে ওই বাড়ীতে বাস করছে, এবং একঘেয়ে কর্ম-চঞ্চল গ্রাম্য-জীবনের দৈনন্দিনতায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। জমিতে পৌঁছেই সে দেখল যে, আগের সপ্তাহে যে সারগুলো এনে বুতো জড় করেছিল সেগুলো এখন সে নিজের জমিতে ছড়াচ্ছে। দুই মরদ একবার আড়চোখে পরস্পরের দিকে তাকাল। মাঝে মাঝে তারা শত্রুভাবে পরস্পরের মুখোমুখি হয় এবং পাশাপাশি জমিতে দাঁড়িয়ে বাধ্য হয় কাজ করতে কেননা তারা ত প্রতিবেশী। এ ব্যাপারে বিশেষ করে বুতোই বেশী অখুশি…তার জমিখানা ফ্রানকয়েসের ভাগের জমিখণ্ড কেটে নেওয়ার জন্য দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে—ডানদিকে এক খণ্ড জমি আর বামদিকে আর এক খণ্ড। তাই ঘুরপথে তাকে অনবরত এ জমি থেকে ও জমিতে যেতে হয়। দু'জনের কেউ কারো সঙ্গে কখনও কথা বলে না। ওরা যদি ঝগড়া করত তাহলে এতদিন ওরা পরস্পরকে খুন করে ফেলত।

জঁা গাড়ী থেকে সার নামাতে সুরু করল। গাড়ীর উপর উঠে সে সারের গাদায় হাঁটু পর্যন্ত ডুবিয়ে বেলচা দিয়ে সার নীচে ফেলছিল, এমন সময় হোরদিকুইন সেই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। খামার-মালিক তার ভূতপূর্ব মজুর সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণ করে এখনও। তাই দাঁড়িয়ে পড়ে খামার-মালিক তার সাথে কথা বলতে লাগল, খামার এবং কাজ সম্বন্ধে নানা ধরনের উদ্বিগ্নতার জন্য সে অসুস্থ হয়ে পড়েছে তাই তাকে অনেকটা বুড়ো দেখাচ্ছে।

'তুমি ফসফেট ব্যবহার করছ না কেন, জঁা?'

জবাবের অপেক্ষা না করেই সে সমানে কথা বলতে লাগল কারণ সে নিজেই পাগলের মতন কাজ করতে ভালবাসে। উত্তম ফসলের প্রকৃত জবাব হচ্ছে সার এবং উদ্ভিদের খাদ্য। সে সব কিছু চেষ্টা করেছে এবং সারের জন্য অনেক পাগলামি করেছে এবং মাঝে মাঝে খামার-মালিকদের মধ্যে এই পাগলামি দেখা দেয়। সার নিয়ে হোরদিকুইন অনেক ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে…ঘাস, পাতা, মদের গাদ, সরষের খইল প্রভৃতি ব্যবহার করেছে‥ তারপর ব্যবহার করেছে হাড়ের গুঁড়ো, রান্না-করা এবং চূর্ণ-করা মাংস, এবং শুকনো রক্তের গুঁড়ো। সে দুঃখিত কারণ এ জেলায় কষাইখানা না থাকায় সে কাঁচা তরল রক্ত সারের সাথে মেশাতে পারে নি।

হোরদিকুইন বলতে লাগল—'ফসফেট ব্যবহার করে আমি সব সময় ভাল কাজ পেয়েছি।'

জঁা বললে—'কিনতে গিয়ে লোককে ঠকতে হচ্ছে।'

'হাঁ ঠকবে। শহরের ফেরিওলাদের কাছ থেকে কিনলেই ঠকতে হবে। খাঁটি ফসফেট সার পাওয়া খুবই কঠিন তাই প্রত্যেক হাটে একজন করে বিশেষজ্ঞ কেমিষ্ট থাকা দরকার, সে রাসায়নিক সার বিশ্লেষণ করে দিতে পারবে। নিশ্চয় ওরই উপর ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে, কিন্তু ভবিষ্যৎ সুরু হওয়ার আগেই আমরা ধ্বংস হয়ে যাব। অপরের জন্যে আমাদের কষ্ট স্বীকার করার সাহস থাকা দরকার।'

সারের গন্ধে মনে হল সে বেশ উৎসাহিত হয়ে উঠেছে। সারের গন্ধ সে ভালবাসে, এই গন্ধের মধ্যে রয়েছে যৌন সঙ্গমরতা ধরিত্রীর গন্ধ তাই গন্ধের মধ্যে সে পুরুষ-মনের প্রকৃত আনন্দের সন্ধান লাভ করেছে।

কিন্তু ঠিক তখনি একটা কণ্ঠস্বর শুনে জঁা ঘুরে দেখল। দেখে বিস্মিত হল যে, লিসা রাস্তার ধারে দাঁড় করানো গাড়ীর উপর দাঁড়িয়ে আছে। সজোরে সে বুতোকে ডাকছে।

'শোন! আমি ক্লয়েস যাচ্ছি মঁসিয়ে ফিনেতকে আনতে। বাবা ঘরের মধ্যে পড়ে গেছে। মনে হয়, তার অবস্থা খারাপ। বাড়ী গিয়ে তাকে দেখ।'

এবং জবাবের জন্য অপেক্ষা না করে সে ঘোড়াটাকে সজোরে চাবুক মারল।

গাড়ীখানা আবার ছুটতে লাগল। সোজা সরল রাস্তায় দূরে তাকে নর্তনরত ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর মূর্তি বলে মনে হচ্ছিল।

বুতোর মধ্যে কিন্তু ব্যস্ততা নজরে পড়ল না, সে ধীরে সুস্থে শেষ সারের গাদাটা ছড়াল। সে নানা ধরনের অনুযোগ করছিল। তাহলে তার বাবা অসুস্থ হল। এটা বিশ্রী ব্যাপার হল! এটা হয় ত একটা ভাণ হতে পারে, নিজের কোন একটা সুবিধে করে নেওয়ার জন্যে ফন্দি করেছে। তারপর ধারণা হল, হয়ত সঙ্গীন অবস্থাও হতে পারে। এবং যেহেতু তার বউ নিজের খরচে ডাক্তার আনতে ছুটেছে তাই সে জ্যাকেট পরে নিল।

ফ্রিমাতের বউয়ের বাড়ীতে বুতোরা এখনও আছে। পিছন দিকের একতলার ঘরখানা ছাড়া সারা বাড়ীখানা তারা দখল করে রেখেছে···পিছনের ঘরখানায় ফ্রিমাতের বউ তার পক্ষাঘাত-গ্রস্ত স্বামীকে নিয়ে থাকে। তারা দেখল যে, তাদের সংসারে লোকজনের সংখ্যা বড় বেশী। বিশেষ করে তরকারির ক্ষেতখানা তাদের হাতছাড়া হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই ফ্রিমাতের বউ এই ক্ষেতখানা নিজের দখলে রেখেছে কারণ এই ক্ষেত থেকেই পঙ্গু স্বামীকে নিয়ে তার সংসার স্বচ্ছন্দে চ'লে যায়। তাদের নৈকট্য ফ্রানকয়েসকে বিরক্ত করে তুলছে এটা যদি তারা বুঝতে পারত তবে এতদিন তারা এ বাড়ী ছেড়ে অন্য কোন বড় বাড়ীতে ভাড়া উঠে যেত। কেবল একটা সীমানা-পাঁচিল দুটো বাড়ীকে ভাগ করেছে। তারা তাই এমন জোরে চেঁচিয়ে কথা বলে যেন ওরা সে-সব শুনতে পায়। ওরা বলে, এ বাড়ীতে ওরা সাময়িকভাবে ডেরা পেতেছে। ওদের স্থির বিশ্বাস যে, ওরা আবার নিজেদের বাড়ীতে ফিরে যেতে পারবে এবং যাবেও একদিন। তাই নতুন করে আবার বাড়ী পাল্টানোর হাঙ্গামা করে কি হবে। কেমনভাবে এবং কেন তারা ফিরে আসবে তা' কিন্তু ব্যাখ্যা করতে পারে না। অজানা ঘটনার উপর নির্ভরশীল এই বিশ্বাস এবং উন্মত্ত নিশ্চয়তা দেখে ফ্রানকয়েস রাগে ফেটে পড়ে এবং এ-বাড়ীতে বাস করার আনন্দ লোপ পায়। মাঝে মাঝে লিসা পাঁচিলে মই লাগিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ফ্রানকয়েসকে উদ্দেশ্য করে কুৎসিত গালাগালি দেয়। মঁসিয়ে বেইলিহ্যাচির অফিসে সব হিসাব-পত্র কষা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তবু সে অভিযোগ জানায় যে, তার সর্বস্ব লুঠ করে নেওয়া হয়েছে এবং সেজন্যই এই উঠোন থেকে গালাগালি দেওয়া সে বন্ধ করে না।

বাড়ী ফিরে বুতো দেখল রান্নাঘরের পিছনে এক কোণায় খড়ের গাদার নীচে নিজের বিছানায় টান্ টান্ হয়ে বুড়ো ফৌআন পড়ে আছে। ছেলে-মেয়ে দু'টো বুড়োর উপর নজর রেখেছে···আট বছরের জুলি আর তিন বছরের জুলা বুড়োর কুঁজো থেকে খানিকটা জল ঢেলেছে মেঝের উপর।

বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে বুতো বলল—'আচ্ছা, এসব কি হচ্ছে?'

ফৌআনের জ্ঞান ফিরে এসেছে। তার ড্যাবডেবে দু'চোখের দৃষ্টি ধীরে ধীরে

ঘুরল···কিন্তু সে মাথা ঘোরাতে পারল না। এমনভাবে তাকিয়ে ছিল যেন সে পাথর হয়ে গেছে।

'না বাবা, আমাদের হাতে এখন অজস্র কাজ! তুচ্ছ কাজে মন দেওয়ার এখন আমাদের সময় নেই। আজ তোমার মরা চলবে না!'

প্রায় তখনি মঁসিয়ে ফিনেতকে নিয়ে ফিরে এল লিসা। ডাক্তার অনেকক্ষণ ধরে পঙ্গু বৃদ্ধকে পরীক্ষা করলেন এবং লিসা ও তার মরদ উদ্বিগ্নভাবে পাশে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। খুব তাড়াতাড়ি এখন যদি মারা যায় তবে তারা মুক্তি পাবে। কিন্তু দেখেশুনে মনে হচ্ছে যে, বুড়ো এখন অনেক দিন ধরে ভুগবে, তার মানে হয় ত বহু অর্থ খরচ করতে হবে বুড়োর জন্যে অথচ তার ঘরে তার সন্ধান পাওয়ার আগেই ত বুড়ো মরে যেতে পারত। এবার ফ্যানি আর যেসাস্ ক্রাইস্ট এসে হাজির হবে তাদের বিরক্ত করতে। পরীক্ষার শেষে ডাক্তারের নীরবতা তাদের আরও ঘাবড়ে দিল। তিনি যখন রান্নাঘরে ব্যবস্থাপত্র লিখতে বসলেন তখন তারা তাঁকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করবে ঠিক করল।

বুতো যখন দেখল যে, ডাক্তার একখানা পুরো কাগজ লিখে ভরে ফেললেন তখন সে ভয় পেল। জিজ্ঞাসা করল—'তাহলে কি খুব খারাপ অবস্থা? আপনার কি ধারণা এসব ওষুধ খাওয়ালে ভাল হবে?'

ডাক্তার কেবল কাঁধ নাচালেন। তিনি নিজেই খুব কৌতূহলী হয়ে পড়েছিলেন তাই আবার পরীক্ষা করলেন। অবাক হলেন যে, মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চয়ের পর সামান্য জ্বরভাব হয়েছে। তিনি বুড়োর নাড়ী দেখলেন, নিথর দেহে বুড়ো শুধু তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল বোকার মতন। যাওয়ার আগে ডাক্তার কেবল বলে গেলেন:

'সারতে সপ্তা তিনেক সময় লাগবে। কাল আবার আসব, ও যদি আজ ভুল বকে ত অবাক হয়ো না।'

তিন সপ্তাহ! বুতোরা আর কিছু শুনল না এবং তারা শুধু ভীষণ ভয় পেল। প্রতিদিন যদি এমনি লম্বা ওষুধের ফর্দ দেয় ডাক্তার তবে কত অর্থই না খরচ করতে হবে! আর সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার যে, তাকে এখনি গাড়ী নিয়ে ক্লয়েসে ওষুধের দোকানে যেতে হবে। সেদিন ছিল রবিবার। ফ্রিমাতের বউ তরি-তরকারি বিক্রী করে ঘরে ফিরল। দেখল, লিসা কোন কাজ না করে একা একা হতাশ মনে ঘর-বার করছে। খবরটা এর মধ্যে সারা রগনি গ্রামে ছড়িয়ে গেছে। বোলডি খুশিতে এ বাড়ী ছুটে এল দেখতে। ঠাকুরদার গায়ে হাত দিয়ে না দেখে সে কিছুতেই নড়তে রাজী হল না। তারপর ছুটল যেসাস ক্রাইস্টকে খবর দিতে যে, না বুড়ো এখনও মরেনি। সহসা ওই ঢঙি মেয়েটা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রাশুর বউ হাজির হল, স্পষ্টত বোঝা গেল যে, ফ্যানি তাকে পাঠিয়েছে। বুড়ী ভাইয়ের বিছানার ধারে দাঁড়িয়ে ঝকঝকে দৃষ্টিতে

তাকে দেখতে লাগল···সে যেন এ্যাজর নদীর একটা বাম মাছ। তারপর বুড়ী চলে গেল···নাকের গোড়ায় ভাঁজ পড়ল, তাকে হতাশ দেখাচ্ছিল, এখনও মারা যায় নি তাই। ব্যস! এর পর পরিবারের আর কেউ ওমুখো হল না। কেন তারা মাথা ঘামাবে, বুড়োর যখন বেঁচে থাকার সম্ভাবনাই বেশী রয়েছে?

দুপুর রাত পর্যন্ত সারা বাড়ীখানা নরক হয়ে রইল। বীভৎস মেজাজে বুতো ঘরে ফিরে এল। বুড়োর পায়ে সরষের পুলটিশ্ দিতে হবে, ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাওয়াতে হবে ওষুধ এবং ভাল থাকলে কাল সকালে মল অপসারণের ওষুধ দিতে হবে। ফ্রিমাতের বউ স্বেচ্ছায় সাহায্য করতে লাগল কিন্তু রাত দশটার সময় ক্লান্তিতে অর্ধ-মৃত অবস্থায় এবং আর কোন আগ্রহ না থাকায় সে বিছানায় শুতে গেল। বুতো নিজেও ঘুমোতে চায় তাই লিসাকে ওখান থেকে টেনে আনল। এসব শয়তানিতে কি বা মঙ্গল হবে? বুড়োর দিকে এভাবে তাকিয়ে বসে থেকে কোনও লাভ নেই। এতে ওর অবস্থারও কোনও উন্নতি হবে না। বুড়োর মন এখন এলোমেলো, ভুল বকছে এবং মনে হয় কল্পনা করছে যে, সে এখন ক্ষেতে কাজ করছে, যৌবনকালে যেমনভাবে খাটত তেমনিভাবে হাড়-ভাঙা খাটুনি খাটছে। তার বাবা যেমন মৃত্যুকণ্ঠে বক্ বক্ করেছিল সে কথা মনে পড়তে লিসা বিহ্বল হয়ে পড়ল···যেন এর মধ্যে সমাধিস্থ হলেও তাকে অনুসরণ করছে। সে তার স্বামীর সঙ্গে যেতে যেতে থামল। বুতো তখন পোশাক ছাড়তে সুরু করেছে, লিসার মনে হল রোগীর পোশাকগুলো গুছিয়ে রাখা প্রয়োজন। পোশাকগুলো চেয়ারের উপর রয়েছে। সে পোশাকগুলো সযত্নে ঝাড়ল, পকেটগুলো অনেকক্ষণ ধরে হাতড়াল কিন্তু একখানা ভোঁতা ছুরি আর এক টুকরো সুতো ছাড়া কিছুই পেল না। তারপর সে যখন পোশাকগুলো তাকের উপর গুছিয়ে রাখছিল তখন তাকের এক কোণে রাখা একতাড়া কাগজের দিকে তার নজর আটকে গেল। অমনি বারেকের জন্য থেমে গেল তার বুকের ধুকপুকুনি। এই সেই লুকোন সম্পত্তি। প্রায় এক মাস ধরে নানা অবাঞ্ছিত জায়গায় এই লুকোন সম্পত্তি তারা তন্ন তন্ন করে খুঁজছে অথচ তাদের চোখের সামনে হাতের কাছেই ওগুলো এখানে রয়েছে। বুড়ো হয় ত ওগুলো সরিয়ে কোন নতুন জায়গায় রাখতে যাচ্ছিল এবং ঠিক তখনি রোগ তাকে আক্রমণ করেছে।

'বুতো! বুতো!' এমন গলা চড়িয়ে লিসা ডাকল যে, কেবলমাত্র জামা পরেই বুতো এ ঘরে ছুটে এল। ভাবল, বাবা হয় ত মারা যাচ্ছে।

বুতো নিজেও প্রথমটায় বোবা হয়ে গেল। তারপর ওদের দু'জনের মনেই উন্মত্ত উত্তেজনা দেখা দিল। দু'জনে দু'জনের হাত জাপটে ধরে ছাগলের মতন লাফাতে লাগল, পঙ্গু বুড়োর কথা তারা ভুলে গেল। বুড়োর দু'চোখ বন্ধ, মাথাটা বালিশে শক্ত করে রাখা এবং সমানে সে ভুল বকে চলেছে।

ঘুরে একবার দেখে কেঁপে উঠল লিসা, বলল—'চুপ!'

জবাব দিল বুতো—'ওসব গ্রাহ্য করো না! জানবে কি করে এসব? দেখছ না ভুল বকছে?'

জয়ের আনন্দে ওদের পা অবশ হয়ে পড়ল তাই ওরা বিছানার ধারে বসল।

লিসা বলে উঠল—'তাছাড়া এসব খোঁজার জন্যে ওরা আমাদের দোষ দিতে পারবে না, ঈশ্বর জানেন, আমি ওর টাকার কথা ভাবছিলাম না, ওগুলো আমার হাতে পড়ল। এবার ওগুলো দেখা যাক।'

ইতিমধ্যেই কাগজগুলো খুলে টাকার অঙ্কগুলো যোগ করছিল বুতো।

'দু'শ এবং তিরিশ যুক্ত সত্তর, মোট তিন শ' হল। নিশ্চয় তাই, আমি ঠিক হিসেব করে দেখেছি। এরই চার ভাগের এক ভাগ, এটা আছে শতকরা পাঁচ সুদে। এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার···এই বাজে কাগজগুলো যোগ করলেই অর্থে পরিণত হবে, পাওয়া যাবে সত্যিকারের মুদ্রা।'

কাগজগুলোর দিকে তারা নীরবে তাকিয়ে রইল এবং ভাবতে লাগল।

অবশেষে লিসা বিড়-বিড় করে বলল—'আমরা এখন কি করব? মনে হয়, ওগুলো আবার ফিরে রেখে দেওয়াই ভাল!'

বুতো দারুণভাবে মুখভঙ্গি করে বলল 'না!'

'দেখ, আমাদের ওই করা উচিত। আমরা নিশ্চয় ফিরে রেখে দেব। বুড়ো ওগুলোর নিশ্চয় খোঁজ করবে। একটা গোলমাল বাধাবে। ফলে পরিবারের অন্য লোকেরাও আমাদের নানা বিপদে ফেলবার চেষ্টা করবে।'

বুড়োর ফোঁপানি শুনে লিসা বলতে বলতে তৃতীয় বার থামল। ভয়ানক হতাশায় আর নিদারুণ অবস্থার জ্বালায় বুড়ো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে, যেন তার সমগ্র অতীত জীবন মন্থন করে এই ফোঁপানি উথলে উঠছে, ক্রমে ক্রমে শূন্যতায় ভরে ওঠা তার কণ্ঠ থেকে বারে বারে এক গোছা শব্দ বেরিয়ে আসছে।

'সব শেষ হয়ে গেল! সব শেষ হয়ে গেল!'

ভয়ানক আবেগে বুতো বলতে লাগল—'তুমি কি মনে কর পাগল বুড়োকে যা' খুশি করতে দেওয়ার জন্যে আমি কাগজগুলো আবার রেখে দেব? সে ওগুলো ছিঁড়ে ফেলতে পারে অথবা পুড়িয়ে নষ্ট করতে পারে! না না, আমি নিশ্চয় তা' দেব না।'

লিসা ধীরে ধীরে বলল—'হাঁ, সে কথা সত্যি!'

'যাক, অনেক হয়েছে। এবার শুতে চল। যদি সে চায় তাহলে তাকে বলব, আমার কাছে আছে। ওগুলো নিয়ে আর কারো মাথা না ঘামানোই ভাল।'

পুরাণো একটা শ্বেত-পাথরের পাত্রের নীচে কাগজগুলো রেখে ওরা শুতে গেল, তালা-বন্ধ ড্রয়ারের নীচে রাখার চেয়ে এ জায়গাটা তাদের কাছে বেশী নিরাপদ বলে মনে হল। পাছে আগুন ধরে যায় তাই তার পাশে একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে না রেখে তারা বুড়োকে একা ফেলে চলে গেল। আর সারা

রাত-ভোর বুড়ো ভুল বকতে লাগল আর ফোঁপাতে লাগল।

পরদিন সকালে মঁসিয়ে ফিনেত বুড়োকে অনেকটা শান্ত এবং আশাতীত ভাবে সুস্থ দেখলেন। ওহো, এই বুড়ো লাঙল-টানা ঘোড়াগুলোর দেহে তাদের আত্মা পেরেক দিয়ে আঁটা থাকে! তিনি যে জ্বরের আশঙ্কা করেছিলেন তার বোধহয় উপশম হয়েছে। তাই লৌহ-চূর্ণ ঘটিত কুইনাইনের, তিনি ব্যবস্থা-পত্র দিলেন, তার মানে বড়লোকের ওষুধ, এত দামী যে, বুতো আর লিসা আবার ভীত হয়ে উঠল।

সপ্তাহ খানেক পরে মঁসিয়ে ফিনেত অবাক হয়ে দেখলেন যে, বুড়ো ফৌআন উঠে বসেছে। দেহে খুব বল না পেলেও জোর করে হাঁটছে। তাই তিনি বললেন যে, মরতে ইচ্ছে না থাকলে মরা যায় না। ডাক্তারের পিছনে দাঁড়িয়ে বুতো মুখ ভ্যাংচাল···দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্রের পর থেকে সে ওষুধ দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। বলেছে, রোগকে আপনা থেকে সেরে উঠতে দেওয়া উচিত এবং সেরেও যায়। হাটের দিন লিসা এত দুর্বলতা অনুভব করছিল যে, ওষুধ কিনে আনতে পারল না···বুড়ো ফৌআন আবার ফিরে রোগাক্রান্ত হতেই সোমবার ডাক্তার যখন শেষবারের মতন এসেছিলেন তখন বুতো বলেছিল:

'জানি না আপনার বোতলে কি আছে, ওটা খেয়েই আরও অসুস্থ হয়ে পড়েছে।'

সেদিন সন্ধ্যেবেলাতেই বুড়ো ফৌআন কথা বলতে চেষ্টা করল। ক'দিন ধরে উঠে বাড়ীময় উদ্বিগ্নভাবে ঘোরাঘুরি করছে বুড়ো···শূন্য মন, কোথায় যে কাগজ-পত্রগুলো লুকিয়ে রেখেছে তা' মনে নেই। চারধারে হাতড়াচ্ছে আর বেপরোয়াভাবে মনে করবার চেষ্টা করছে। শেষে খুব ক্ষীণ স্মৃতিশক্তি ফিরে এল। বোধ হয় সে সেগুলো কোথাও লুকিয়ে রাখে নি, ওই তাকের উপর রেখেছিল। কিন্তু, যদি সে ভুল করে থাকে, এবং কেউ যদি সেগুলো না পেয়ে থাকে, তাহলে নিজেই কি সে সন্দেহের উদ্রেক করবে এবং স্বীকার করবে যে, বহুকাল ধরে, সযত্নে আর অনেক জ্বালা-যন্ত্রণা সহ্য করে সে টাকা লুকিয়ে রাখছে? আরও দু'দিন ধরে তার মনের মধ্যে লড়াই চলল···এই আকস্মিক অবলুপ্তির জন্য একদিকে ভয়ানক রাগ এবং অন্য দিকে মুখ বন্ধ রাখার জন্য আত্ম-দমনের প্রয়োজন। তবু ঘটনাটা তার কাছে পরিষ্কার হল···মনে পড়ল সেদিন সকালে রোগাক্রান্ত হওয়ার আগে কাগজের প্যাকেটটা সে এখানে রেখেছিল, বিছানায় শুয়ে ঠিক তখনি ছাদের নীচে কড়িকাঠে একটা ফোকর তার নজরে পড়ায় ইচ্ছে ছিল প্যাকেটটা ওই ফোকরে লুকিয়ে রাখবে। ক্ষতির চিন্তায় সে এমন বিহ্বল হয়ে পড়েছিল যে, শেষ পর্যন্ত গোপনতা প্রকাশ করেই ফেলল।

কর্কশ চাপা গলায় বুড়ো জানতে চাইল—'কাগজপত্রগুলো কোথায়?'

যেন ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে অবাক হল এবং বুতো চোখ পিটপিট করে

তাকাল।

'কি? কি বলছ তুমি? কিসের কাগজ?'

'আমার টাকা।' বুড়ো চেঁচিয়ে উঠল, নিজেকে খাড়া করে তুলল, তার মুখে ভয় প্রদর্শনকারী ভাব!

'তোমার টাকা! তোমার তাহলে এখনও কিছু টাকা আছে, তাই না? অথচ তুমি ত জোর দিয়ে বলেছ আমাদের জন্যে যথাসর্বস্ব খরচ করেছ এবং তোমার কাছে এক কপর্দকও নেই! ও! তুমি তাহলে একটা মহা ধড়িবাজ বুড়ো। তোমার হাতে কিছু টাকা আছে?'

চেয়ারে বসে দুলতে দুলতে মুখভঙ্গি করছিল আর হাসছিল বুতো, বিজয়ীর মতন গর্ব অনুভব করল···কোন অতীতে সেই সব প্রথম গোপন সম্পদের সন্দেহ করেছিল, আজ তার সন্দেহ সত্যে পরিণত হয়েছে। বুড়ো ফৌআনের সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাঁপতে লাগল।

'আমাকে ফিরিয়ে দাও!'

'তোমাকে ফিরিয়ে দেব? আমি রাখব কেন? জানি না ত কোথায় তোমার টাকা রয়েছে!'

'তোরা আমার টাকা লুঠ করেছিস! আমার টাকা ফিরিয়ে দে। তোরা উচ্ছন্নে যা'। দে, নইলে জোর করে ছিনিয়ে নেব!'

বয়স হলেও বুড়ো ছেলের কাঁধ চেপে ধরে সজোরে নাড়া দিল। কিন্তু এবার ছেলের উঠে দাঁড়াবার পালা। ধীরে ধীরে বাপের হাত চেপে ধরল এবং তার মুখের উপর তেড়ে উঠে বলল:

'হাঁ, আমি নিয়েছি এবং রেখেও দিয়েছি। তোমার জন্যেই রেখে দিয়েছি, বুড়ো গর্দভ কোথাকার, বুঝতে পারছ? তোমার মাথা গেছে বিগড়ে! তোমার কাছ থেকে ওই কাগজগুলো কেড়ে নেওয়া আগেই উচিৎ ছিল, ওগুলো ত তুমি ছিঁড়ে ফেলছিলে! সত্যি তাই, লিসা, তাই না? বুড়ো কাগজগুলো ছিঁড়ে ফেলছিল।'

'আমি যেমন দাঁড়িয়ে আছি, এমনি সত্যি। কি করছ তা' যখন তোমার বোধ ছিল না তখনই ঘটনাটা ঘটে।'

এ কথা শুনে ফৌআন দারুণ ভয় পেল। সত্যি কি তার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল, কই সে ত কিছু মনে করতে পারছে না! বাচ্চা ছেলে যেমন ছবি ছেঁড়ে সে যখন তেমনিভাবে ওগুলো ছিঁড়ছিল তখন সে আর ওগুলো পাওয়ার যোগ্য নয়, এখন তার মরাই ভাল। তার শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। তার আর সাহসও নেই, শক্তিও নেই।

দু'চোখে জলের ধারা, তোতলাতে তোতলাতে বলল বুড়ো—'ওগুলো আমাকে দিয়ে দে', দিবি?'

'না!'

'আমি এখন ভাল আছি, দিয়ে দে'।'

'দিলে ওগুলো দিয়ে তুমি পাছা মুছবে আর না হয় পাইপ ধরাতে জ্বালাবে। না, ধন্যবাদ!'

এবং তারপর থেকে দলিলগুলো ফিরিয়ে না দেওয়ার জন্য বুতো গোঁ ধরে আছে। ওগুলো সম্পর্কে তারা খোলাখুলি কথা বলে, উপরন্তু নাটকের কাহিনী শোনায়। ঠিক যখন বুড়ো ওগুলো ছিঁড়ছিল ঠিক তখনি শেষ সময়ে ওরা দেখতে পেয়ে কেড়ে নেয়। লোকে ওদের কথা শুনে প্রকাশ্যে বিশ্বাস করলেও গোপনে সন্দেহ করে, ওরা নির্ঘাৎ মিথ্যে কথা বলছে। বিশেষ করে, যেসাস ক্রাইস্ট দারুণ রেগে গেল। ওই গোপন সম্পত্তি সে খুঁজে পায় নি অথচ তার ভাই সঙ্গে সঙ্গে খুঁজে পেল। কাগজগুলো সেও ত হাতে পেয়েছিল কিন্তু এমন বোকা যে, ফেরৎ দিয়ে দিল সবশুদ্ধ। তুমি ঠিক উচিৎ কাজ না কর ত লোকে তোমায় বদমাস বলবেই। মনে মনে সে শপথ করল যে, বাবার মৃত্যু হলে ভাইয়ের সাথে সে হিসাব মিটিয়ে নেবে কড়ায় গণ্ডায়।

বুড়ো ফৌআন বাড়ী বাড়ী ঘুরে ঘুরে প্রত্যেককে তার কাহিনী বলতে লাগল। পথে কারো সাথে দেখা হলে তাকে দাঁড় করিয়ে নিজের দুর্ভাগ্যের কথা শোনায়। এমনিভাবে একদিন সে পাশে তার ভাইঝির বাড়ী হাজির হল।

ফ্রানকয়েস তখন গাড়ীতে সার বোঝাইয়ের কাজে জঁ-কে সাহায্য করছিল। জঁ সারের গর্তে নেমে বেলচায় করে সার তুলে দিচ্ছিল আর ফ্রানকয়েস গাড়ীর উপর দাঁড়িয়ে বেলচা থেকে সার নিয়ে গাড়ীতে জমা করছিল। পায়ের গোড়ালি দিয়ে চেপে দিচ্ছিল যাতে অনেক বেশী পরিমাণ সার গাড়ীতে বহন করা যায়।

লাঠিতে ভর দিয়ে ওদের সামনে দাঁড়িয়ে বুড়ো তার অভিযোগ জানাল।

'এটা কি অন্যায় নয় ভাব যে, ওরা আমার টাকা কেড়ে নিয়েছে এবং ফিরিয়ে দিচ্ছে না! আমার অবস্থায় পড়লে তোমরা কি করতে?'

ফ্রানকয়েস বুড়োকে তিন তিনবার তার অভিযোগ বলতে দিল। বুড়ো তার কাছে এসব বলতে এসেছে দেখে সে মনে মনে ঘাবড়ে গেল তাই তাকে আমল দিতে চাইল না···বুতোদের সাথে কোন রকম বিতর্কের সম্ভাবনা সে এড়িয়ে থাকতে চায়।

অবশেষে সে জবাব দিল—'তুমি ত জান কাকা, এর সাথে আমাদের কোন সম্বন্ধ নেই। ওই নরক-কুণ্ড থেকে বেরোতে পেরেছি বলে আমরা আনন্দিত।' এবং বুড়োর দিকে পিছন ফিরে সে গোড়ালি টিপে টিপে গাড়ীতে সার বোঝাই করতে লাগল। সারের মধ্যে তার জানু পর্যন্ত ডুবে গেছে···তবু তার স্বামী বেলচার পর বেলচা সার তুলে দিচ্ছে। একসময় তার দেহ প্রায় সারের মধ্যে ডুবে গেল। সে যেন উষ্ণ বাষ্পের আড়ালে হারিয়ে গেল। সারের গাদা থেকে উত্তেজক গন্ধ বেরোচ্ছিল, কিন্তু গাড়ী চলতে সুরু করলে সে সোয়াস্তি

পাবে এবং মনে বিশ্বাস ফিরে আসবে।

ওর জবাব না শুনতে পেলেও ফৌআন বলতে লাগল—'এটা পরিষ্কার যে, আমি পাগল নই; সত্যি কি পাগল? আমার টাকা আমাকে ফিরিয়ে দেওয়া ওদের উচিৎ। তুমি কি ভাব যে, দলিলগুলো ছিঁড়ে ফেলতে পারি?'

ফ্রানকয়েস এবং জঁ। কেউ একটা কথাও বলল না।

'তুমি পাগল বলতে পার, কিন্তু আমি ত পাগল হই নি, তাই না? দেখছ ত, আমি পাগল হই নি।'

সহসা ফ্রানকয়েস সারে বোঝাই গাড়ীর উপরে উঠে দাঁড়াল। তাকে খুব দীর্ঘদেহী, পুষ্টাঙ্গী আর শক্তিমতী মনে হল। যেন এই সারের গাদায় তার জন্ম হয়েছে এবং এই বীর্য-সৌরভ তারই অঙ্গ হতে নিঃসারিত হচ্ছে। তার স্তন-যুগল এখন পুরুষ্টু হয়ে উঠেছে, নিতম্বে দু' হাত রেখে সে দাঁড়িয়ে আছে… এবং তাকে এখন পূর্ণদেহী সত্যিকারের নারী বলে মনে হচ্ছে।

'না কাকা, না। আমরা যথেষ্ট সহ্য করেছি। তোমাকে ত বলেছি যে, এসব কুৎসিত ব্যাপারে আর তুমি আমাদের জড়িয়ো না। এসব থেকে পালিয়ে এসে আমরা বেঁচে গেছি। তুমিও যদি আর আমাদের সাথে দেখা-টেখা না করতে আস ত ভাল হয়।'

বুড়ো কাঁপতে কাঁপতে বলল—'তোমরা আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছ!'

জঁ। ভেবে দেখল এবার তার কথা বলা উচিৎ।

'না, আমরা আর ঝগড়া করতে চাই না বলেই এ কথা বলছি। তোমাকে আমাদের এখানে দেখলে দিন তিনেক ধরে আমাদের মধ্যে লড়াই চলবে। প্রত্যেকেই শান্তি চায়, চায় না?'

ফৌআন নিথর দেহে বিবর্ণ ও ক্ষীণ-দৃষ্টিতে ওদের দু'জনের মুখের দিকে তাকাল। তারপর চলে গেল।

'বেশ, সাহায্যের দরকার হলে আমি আর কোথাও যাব। তোমাদের কাছে আসব না।'

তারা তাকে যেতে দিল। তারা এখনও অসৎ হয়ে ওঠে নি তাই দুঃখিত হল। কিন্তু তারা কি করতে পারে? কোনভাবেই তারা বুড়ো ফৌআনকে সাহায্য করতে পারে না, তাহলে তাদের খাওয়ার ইচ্ছে লোপ পাবে এবং ঘুম ছুটে যাবে। তার স্বামী গেল চাবুক আনতে আর ফ্রানকয়েস মাটিতে পড়ে যাওয়া সার বেলচায় করে গাড়ীতে তুলতে লাগল।

পরের দিন ফৌআন এবং বুত্তোর মধ্যে এক মারাত্মক দৃশ্যের অবতারণা ঘটল। প্রকৃতপক্ষে আজকাল প্রতিদিন দলিলগুলো নিয়ে তাদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ বাধছে আবার।

জেদ ধরে বাপ বলতে থাকে—'দে' আমার ওগুলো!' আর ছেলে রাজী হয় না, প্রতিবার চুপ করে থাকতে বলে।

কিন্তু ক্রমে ক্রমে ব্যাপারটা আরও ঘোরালো হয়ে উঠতে লাগল। ছেলেটা কোথায় তার সম্পদ লুকিয়ে রেখেছে বুড়ো সব সময় তা' অন্বেষণ করছে। এবার তার পালা সারা বাড়ী তন্ন তন্ন করে খোঁজা, তাকগুলো হাতড়ায়, দেওয়ালের কোথায় ফাঁক-ফোকর আছে টোকা মেরে দেখে, একা থাকলে ছেলে-মেয়েদের এড়িয়ে সে এদিকে ওদিকে সন্ধান চালায় ঠিক যেমন বাবা-মা বেরিয়ে গেলে ছোকরারা ঝি-মেয়ের সাথে কাম-ক্রীড়ার লালসায় এদিকে ওদিকে সুযোগ খোঁজে। একদিন বুতো অভাবিত সময়ে ঘরে ফিরে এল, দেখল বুড়ো ফৌআন উপুড় হয়ে শুয়ে আলমারির নীচে লুকিয়ে রাখার জায়গা আছে কিনা দেখছিল। তার বাবা প্রায় লুকোন জায়গাটার কাছাকাছি হাজির হয়েছে দেখে বুতো দারুণ রেগে গেল। আসলে শুয়ে পড়ে নীচে সে যেটা খোঁজ করছিল সেটাই উপরে শ্বেত-পাথরের তলায় চাপা দেওয়া ছিল।

'হায় ঈশ্বর, বুড়ো গর্দভ কোথাকার? তুমি এখন সাপ হওয়ার ভাণ করছ! উঠবে তুমি!'

সে বুড়োর ঠ্যাং ধরে হ্যাঁচকা মেরে টেনে দাঁড় করাল।

'এভাবে বাড়ীর কোণে কোণে হাতড়ানো থামাতে পার না? বাড়ী ঘর তন্ন তন্ন করে খুঁজছ দেখে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়ছি।'

এমনিভাবে সহসা ধরা পড়ে বুড়ো ফৌআন বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। তার দিকে তাকিয়ে আকস্মিক রাগে ফেটে পড়ল।

'আমাকে ওগুলো ফিরিয়ে দে!'

বুতো তার মুখের উপর চেঁচিয়ে বলল—'থাম!'

'ও, বড় কষ্টে আছি এখানে! আমি চলে যাচ্ছি।'

'বেশ হয় তাহলে! দূর হও। মুক্তি পাব আমি। আর যদি এখানে ঢোক ত তোমার দেহ আস্ত থাকবে না।'

বুড়োর হাত ধরে বুতো তাকে ঠেলে বার করে দিল।

২

পাহাড়ের ধার বরাবর হাঁটছিল ফৌআন। তার রাগ অল্পক্ষণের মধ্যেই শান্ত হয়েছে। আরও কিছুটা পথ গিয়ে সে থামল, বাড়ী থেকে বেরিয়ে কোথায় যাবে তা' বুঝতে না পেরে হতভম্ব হয়ে গেছে। গীর্জার ঘড়িতে তিনটে বাজল। শরৎকালের ধূসর অপরাহ্ন। ঠাণ্ডা স্যাঁৎস্তেতে হাওয়া একটানা বইছে। তার দেহ কেঁপে কেঁপে উঠছিল। সব কিছু এমন দ্রুত ঘটে গেল যে, টুপিটা তুলে আনতেও পারে নি।

নদীর ধারে হাজির হয়ে সেতুর আলসেতে ঝুঁকে সে এক মুহূর্ত থামল। এখনই অন্ধকার তার দেহ ঢেকে ফেলবে এবং তাই সে উদ্বিগ্ন হল। কোথায় ঘুমোবে সে? তার মাথার উপর এক চিলতে ছাদ ত নেই। বেকুর কুকুরটা

দেখে তার হিংসে হল, ওই জানোয়ারটারও খড়ের গাদায় একটা গর্ত আছে এবং সেখানে সে রাত কাটায়। আপনা থেকেই সে সেতু পার হল এবং ডেলহোম্মিদের ছোট্ট খামারের সামনে এসে হাজির হল। কোথায় এসেছে যখন বুঝতে পারল তখন পাছে কেউ তাকে দেখে ফেলে তাই একপাশ দিয়ে ঘুরে বাড়ীর পিছনে এসে দাঁড়াল। এখন কেউ তাকে দেখতে পাবে না। আস্তাবলের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল। সে শুনতে পাচ্ছে তার মেয়ে ফ্যানি ঘরের মধ্যে কথা বলছে। আচ্ছা সে কি তার মেয়ের বাড়ী ফিরে আসবার কথা ভাবছিল? সে এমন কি এটুকুও জানে না যে, তার পা দু'খানা স্বেচ্ছায় তাকে এখানে নিয়ে এসেছে। ফ্যানি ঘরের মধ্যে কি বলছে তা' সে বুঝতে পারছে না। সে নিশ্চয় কোনও চাকরের সাথে তর্ক করছে, তার কণ্ঠস্বর তীব্র হল। এবার সে শুনতে পেল, নীরস, কঠোর কণ্ঠে, অথচ কোন গাল নয়···সে একটা হতভাগিনী মেয়েকে ধমক দিচ্ছে এবং মেয়েটা এমন আঘাত পেয়েছে যে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। বুড়ো ফৌআন নিজেও আঘাত পেল। তার মনের কোমল ভাবটুকু উবে গেল। তার দেহ কঠিন হয়ে উঠল। বুঝতে পারল, এখন যদি সে দরজা ঠেলে ভিতরে ঢোকে তাহলে তার মেয়ে অমনি নিরানন্দ কণ্ঠে তাকে আবাহন জানাবে।

'বাবা হাঁটু গেড়ে আমাদের সামনে বসে অনুরোধ জানাবে তাকে আবার বাড়ীতে স্থান দেওয়ার জন্যে।' সে কল্পনা করল যে, তার মেয়ে আবার এই কথাগুলো উচ্চারণ করবে, যে কথাগুলো চিরকালের জন্যে যেন কুড়ুলের আঘাত হেনে তাদের মধ্যেকার যোগসূত্র ছিন্ন করে দিয়েছে। না, না। সে বরং কোন ঝোপের আড়ালে অনাহারে অনিদ্রায় মারা যাবে তবু ওই গর্বিতা নারী যে না-কি মনে মনে যাকে কেউ নিন্দা করতে পারে না তাকে বিজয়িনী হতে দেবে না। দেওয়ালের গা থেকে সে নিজেকে সরিয়ে নিল এবং অতি কষ্টে হাঁটতে লাগল।

ফৌআনের মনে হল যে, সবাই তার উপর নজর রেখেছে, তাই সদর রাস্তা এড়িয়ে সেতু পার হয়ে নদীর দক্ষিণ তীরের বাঁধ বরাবর হাঁটতে লাগল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই আঙুর ক্ষেতে পৌঁছে গেল। গ্রাম এড়িয়ে সে উঁচু সমতল ভূমিতে যেতে চাইল কিন্তু তার পা দু'খানা তাকে আপনা থেকে পল্লীনিবাসের কাছে টেনে আনল···যেমন কোন বুড়ো ভারবাহী জানোয়ার আপনা থেকেই আস্তাবলে, যেখানে সে দানা খেতে অভ্যস্ত, সেখানে ফিরে আসে। যে কোণটায় সে দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকে বুঝতে পারল যে, ভিতরে ভোজ-উৎসব চলছে। মাতালদের খানা-পিনা সেই ভোর পর্যন্ত চলবে। তার পেট খালি, অনুভব করল, সে আরও এগিয়ে যাচ্ছে। কণ্ঠস্বর চিনতে পারল। সিম দিয়ে মাংস রান্নার গন্ধ নাকে এল···বাপের কোনও বন্ধুর আগমনে খানা-পিনা হলে বোলডি এমনিভাবে সুন্দর রান্না করে। সে কেন ভিতরে যাবে না এবং ওই

বদমাস দুটোর সাথে একটু মজা লুটবে না ? সে শুনতে পাচ্ছিল ওরা পরস্পরের সঙ্গে চেঁচিয়ে রসিকতা করছে ধোঁয়া-ভরা ঘরের মধ্যে। ওরা আরামে উত্তাপ অনুভব করতে করতে মদ পান করছে···মনে মনে হিংসায় জ্বলতে লাগল বুড়ো ফৌআন। সে দরজার দিকে হাত বাড়াল কিন্তু তখ্‌খুনি বোলডির তীব্র হাসির শব্দ কানে আসতে তার দেহ যেন জমে পাথর হল। এখন ওই মেয়েটাই তার কাছে ভীতিজনক, কেননা সে এখনও দেখতে পাচ্ছে, ওই মেয়েটার নগ্ন দেহ সরীসৃপের মতন তার দিকে এগিয়ে আসছে, তার দেহ তল্লাস করছে, তাকে যেন ছিঁড়ে ফেলতে চাইছে। এবং তারপর ওর বাবা যদি ওকে একটু সাহায্য করে তাহলে ও কাগজগুলো তার কাছ থেকে কেড়ে নেবে। সহসা দরজাটা খুলে ওই চণ্ডি মেয়েটা বেরিয়ে এল, বোধ হয় বাইরে কারো উপস্থিতি ও টের পেয়েছে। সে শুধু একটা ঝোপের আড়ালে আত্ম-গোপন করার সময়টুকু পেল। তারপর সে আবার চলতে লাগল এবং অন্ধকারেও দেখতে পেল তার সবুজ চোখ দুটো জ্বল-জ্বল করছে।

মালভূমির উপরটায় উঠে এসে সে একটু সোয়াস্তি পেল, মুক্ত হল অপরের কবল থেকে···এবার আপন নির্জনতার মধ্যে সে আনন্দে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে পারবে। অনেকক্ষণ ধরে উদ্দেশ্যহীনভাবে সে ঘুরল। রাত বাড়ছে এবং ঠাণ্ডা হাওয়ার চাবুক তার দেহে আছড়ে পড়ছে। ছ'টা বাজল। এখন রগনি গ্রামে সবাই রাতের খানা-পিনা সারছে। তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো অবশ হয়ে আসছে···সে ধীরে ধীরে হাঁটতেও অক্ষম। সহসা এক পশলা বৃষ্টি নামল, তার দেহ যেন বৃষ্টির ঝাপটায় ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল। সারা দেহ ভিজে জবজবে হয়ে গেল, জোরে জোরে হাঁটতে লাগল বুড়ো ফৌআন। আরও দু'পশলা বৃষ্টি তার মাথার উপর ঝরে পড়ল। এক সময় সে দেখল অজানা টানে সে গীর্জার কাছে হাজির হয়েছে·· ওই ত পুরানো পাড়ার বাড়ীগুলো, ওখানেই ত বুতোরা থাকে।

না, ওখানে আর সে আশ্রয় পাবে না···ওরা তাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। খুব জোরে বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করতেই ওর মন থেকে সব সাহস উবে গেল। বুতোদের বাড়ীর খিড়কির দরজায় গিয়ে ও রান্নাঘরের মধ্যে উঁকি দিল·· বাঁধাকপির তরকারির গন্ধ ভেসে এল। হীনাবস্থায় দীর্ণতার দেহ বুঝি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের জন্য প্রস্তুত হল। দেহের জন্য এখন প্রয়োজনীয় খাদ্য এবং উষ্ণ পরিবেশের কামনা তাকে তাড়িয়ে এনেছে, কিন্তু বুতোরা খেতে খেতে কথা বলছে—ওদের কথা শুনে ও দাঁড়িয়ে পড়ল।

'ধর বাবা যদি না ফেরে ?'

'ভেব না, খাওয়ার প্রতি বুড়োর দারুণ লালচ, খিদে পেলেই ঠিক ফিরে আসবে!'

পাছে ওরা তাকে দেখতে পায় তাই বুড়ো ফৌআন ওখান থেকে সরে এল···

এ যেন চাবুক খাওয়ার পর কিছু খাবার পাওয়ার আশায় কুকুরের প্রত্যাগমন। লজ্জায় তার শ্বাসরোধ হয়ে এল। মনে মনে সে কঠিন শপথ করল, সে কোথাও শুয়ে মরণের প্রতীক্ষা করবে। তারা দেখবে সে সত্যিই ভোজন-প্রিয় কি না। উৎরাই পথে পাহাড় থেকে নেমে এল এবং ক্লউয়ের কামারশালার সামনে একখানা কাঠের গুঁড়ির উপর বসে পড়ল। এতক্ষণে সম্বিৎ ফিরে এল তার। দেখল, ডেলহোমিদের বাড়ী থেকে গ্রাণ্ডির বউ ফিরছে। চিনতে কষ্ট হল না। মোমবাতি জ্বালানোর দায় থেকে বাঁচার জন্যে সে ওদের বাড়ী গিয়েছিল। সে উঠে পড়ল, উঠবার চেষ্টায় তার হাত পায়ের হাড়ে শব্দ হল। একটু দূর থেকে সে তাকে অনুসরণ করে চলল, তাড়াতাড়ি হাঁটছে না কারণ ওর সাথে একই সময়ে সে ও বাড়ীতে ঢুকতে চায় না। বন্ধ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সে বারেক দ্বিধা করল—তার মনে গভীর হতাশা। অবশেষে সে দরজায় তিনবার টোকা দিল, এত আস্তে যে গ্রাণ্ডির বউ শুনতেই পেল না। শেষটায় বুড়ী বেরিয়ে এল।

জানতে চাইল—'কে ওখানে?'

'আমি।'

'কে তুমি?'

'আমি তোমার ভাই!'

তৎক্ষণাৎ কণ্ঠস্বর শুনে বুড়ী চিনতে পারল এবং তাই আর ব্যস্ততা দেখাল না। তাকে জোর করিয়ে কথা বলিয়ে আনন্দ লাভ করতে চায়। নীরবতা বিরাজ করতে লাগল।

সে জিজ্ঞাসা করল—'কি চাও তুমি?'

ভয়ে কাঁপছিল বুড়ো ফৌআন এবং জবাব দিতে তার সাহস হচ্ছিল না। বুড়ী সশব্দে দরজা খুলল। কিন্তু বুড়ো ফৌআন্ যেমনি ঢুকতে গেল ভিতরে অমনি তার রোগা হাত দিয়ে আড়াল করল এবং তাকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখল। অন্ধকারের পর্দা ভেদ করে তখনও বর্ষার জল-ধারা একটানা ঝরছে।

'জানি তুমি কি চাইছ! ওরা আমাকে বলে গেছে। বোকার মত তুমি তোমার সর্বস্ব লুঠ করে নিতে দিয়েছ। এমন কি গোপনে জমানো টাকা-পয়সাগুলোও রাখতে পার নি। এখন আমার এখানে থাকতে এসেছ, তাই না?'

তারপর বুড়ো ফৌআন যখন তোতলাতে তোতলাতে নিজের যুক্তি বলতে চেষ্টা করল তখন বুড়ী আরও রেগে বলল:

'তোমাকে আমি সাবধান করে দিই নি। অনেকবার তোমায় বলি নি যে, এভাবে নিজের জমি-জমা বিলিয়ে দেওয়া বোকামি আর কাপুরুষতা? ঠিক হয়েছে, যা ঘটবে বলেছিলাম তাই ঘটেছে, তোমার বদমাইশ ছেলেমেয়েরা তোমাকে কুকুরের মতন তাড়াচ্ছে, ভিখিরির মতন অন্ধকারে ঘুরছ, একখণ্ড

পাথরও নেই মাথা রাখবার।'

বুড়ো ফৌআন কাঁদতে কাঁদতে হাত বাড়াল তাকে দরজা থেকে সরিয়ে দিয়ে ভিতরে ঢোকবার জন্যে কিন্তু বুড়ী নিজের জায়গায় সোজা দাঁড়িয়ে রইল এবং তার যা বলবার ছিল বলে শেষ করল।

'না, না। যারা তোমার সর্বস্ব লুঠে নিয়েছে তাদের বলগে তোমাকে থাকবার জায়গা দিতে। তোমার কাছে আমি ধার করি নি। তাদের ব্যাপারে নাক গলাচ্ছি বলে পরিবারের সবাই আমাকে আবার দোষী করবে। এটাই সব নয় যদিও তুমি তোমার জমি-জমা বিলিয়ে দিয়েছ। তোমাকে আমি কিছুতেই ক্ষমা করবো না।'

তার শুকনো ঘাড় বাড়িয়ে দিল সে তার দিকে। তাকে একটা বাজপাখীর মতন মনে হচ্ছিল। এবং তার মুখের উপর সে সজোরে দরজা বন্ধ করে দিল।

'তোমার নিজের দোষ এটা! এখন পথে মরতে পার।'

দরজার বাইরে উত্তেজনায় কঠিন এবং নিথর দেহে বুড়ো দাঁড়িয়ে রইল। ওদিকে একটানা বর্ষণ চলতেই লাগল। অবশেষে সে ঘুরে দাঁড়াল এবং কাল রাতের অন্ধকার ভেদ করে আবার হাঁটতে লাগল। বরফের মতন ঠাণ্ডা জলের ধারা-বর্ষণ দুর্বার হয়ে উঠল।

এবার কোথায় যাবে সে? এর পর আর তার অবস্থা পরিচ্ছন্ন রইল না। একটা বেড়ার ধার বরাবর সে হাঁটতে লাগল···বুড়ো ফৌআন মাটিতে আছড়ে পড়ল। একটা গর্তের মতন শূন্যতার মধ্যে তার দেহ গড়িয়ে গেল। ভিতরটা উষ্ণ আর আরামদায়ক—এবং শুকনো। কিন্তু ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ তার কানে বাজল। একটা শুয়োরের খোয়াড়ের মধ্যে সে ঢুকেছে, শুয়োরটা উঠে পড়েছে। ভাবছে বোধ হয় খাবার এসেছে। বুড়ো ফৌআনের পাঁজরায় শুয়োরটা নাক দিয়ে ঢুঁ মারল, কিন্তু বড় দুর্বল তার দেহ, তাই পাছে তাকে জীবন্ত খেয়ে ফেলে তাই সেই ভয়ে সে পালিয়ে গেল। আর সে হাঁটতে পারছে না, দরজার কাছেই কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে পড়ল, জড়-সড় হয়ে রইল ছাদের নীচে বৃষ্টির ছাঁট থেকে বাঁচার জন্য। কিন্তু পা দু'খানা ভিজতে লাগল এবং ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়ায় ভিজে পোশাকটা তার দেহে লেপটে রইল।

পরের দিন একটা কথাই তার মনে বার বার উঁকি দিল—মরতে আর কত দেরী? এখন আর ঠাণ্ডায় তার তত কষ্ট হচ্ছে না। তাকে সবচেয়ে পীড়ন করছে উদরের ক্ষুধা। সে নিশ্চয় ক্ষিধের জ্বালায় মরবে। আর একটা রাত, হয়ত আরও একটা দিন। দিনের বেলা তার মন একটুও দুর্বল হল না, ঠিক করল যে এমনিভাবে সে বরং শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবে তবু বুতোদের বাড়ী ফিরে যাবে না। কিন্তু আঁধার নামার সঙ্গে সঙ্গে তার দারুণ মনস্তাপ সুরু হল। এই অবিরাম বর্ষণের মধ্যে আর একটা রাত কাটাতে তার খুব ভয় হল।

কনকনে হাওয়া যেন তার হাড়ের মধ্যে ঢুকছে, ক্ষিধের পোকারা তার বুকের ভিতরটা কুরে কুরে খাচ্ছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হতেই ওর মনে হল ও যেন এই স্যাঁৎস্তেতে আঁধারের স্রোতে ডুবে যাচ্ছে। মগজের উপর ওর আর দখল নেই, আপনা থেকে দু'খানা পা হেঁটে চলেছে, এবং তার ভিতরের জানোয়ার-স্বভাব তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তারপরই, এমনটা ইচ্ছা না থাকলেও সে বুতোদের বাড়ীর দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল, রান্নাঘরে গিয়ে দাঁড়াল আবার।

বুতো এবং লিসা ঠিক তখনি কালকের রান্না-করা বাঁধাকপির তরকারি খেয়ে উঠল। দরজায় আওয়াজ শুনে ঘুরে দেখল ফৌআনকে···সে নিথরভাবে দাঁড়িয়ে আছে, ভিজে পোশাক থেকে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছে। ঘরের মধ্যে দীর্ঘক্ষণের নীরবতা বিরাজ করতে লাগল।

অবশেষে বুতো মুখ খিঁচিয়ে বলল—'জানি, তোমার আর ক্ষমতা নেই।'

নিথর নিস্পন্দ দেহে বুড়ো ফৌআন সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। একটা কথাও তার মুখ দিয়ে সরল না।

'ওগো বউ, এবার ওকে খেতে দিতে পার। ক্ষিদের জ্বালায় ফিরে এসেছে।'

লিসা ইতিমধ্যেই উঠে পড়েছিল, এক প্লেট বাঁধাকপির ঝোল আনল। কিন্তু বুড়ো ফৌআন টেবিলে ছেলেমেয়েদের পাশে না বসে একধারে একখানা টুলে বসল। যেন সে ওদের সাথে এক টেবিলে বসতে রাজী নয়। লোভীর মতন চামচে করে ঝোলটুকু নিঃশেষ করল, এমন ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছিল যে, ওর সারা দেহ কাঁপতে লাগল। বুতো ধীরে ধীরে তার খাওয়া শেষ করল। চেয়ারের উপর দোল খেতে খেতে ছুরির ডগায় দূর থেকে পনীরের টুকরো তুলে মুখে পুরছিল। বুড়ো লোভীর মতন গিলছে···সেদিকে নজর রেখেছিল বুতো। চামচের উঠা-নামা দেখতে দেখতে তাকে ঠাট্টা করছিল।

'শোন আমার কথা! বাইরের টাটকা হাওয়ায় ঘুরে তোমার বেশ ক্ষিদে পেয়েছে দেখছি। তবে রোজ এমনটা করো না, তাহলে তোমার খাদ্য জোগাতে অনেক খরচ পড়বে।'

তার বাবা শব্দ করে খাদ্য গিলতে লাগল কিন্তু মুখে 'রা' কাড়ল না। ছেলে সমানে বক্‌বক্ করতে লাগল॥

'তাহলে বুড়ো শয়তান তুমি সারারাত বাইরে কাটালে। বোধ হয় সুন্দরী ছুকরিদের বাড়ী গিয়েছিলে। বোধ হয় সেজন্যেই এত ক্ষিদে পেয়েছে, তাই বুঝি?'

তবুও মুখে জবাব নেই, সেই অবাধ্য নীরবতা···শুধু চামচ চামচ ঝোল গেলার একটানা আওয়াজ হচ্ছে।

এবার বিরক্ত হয়ে বুতো বলে উঠল—'ওহে, তোমাকে বলছি আমি। অন্ততঃ ভদ্রতা দেখিয়ে আমার কথার একটা জবাব দিতে ত পার।'

ঝোলের প্লেট থেকে বুড়ো ফৌআন তার দৃষ্টি সরাল না। তাকে মনে

হচ্ছিল অন্ধ বোবা একজন মরদ…বহু দূরে সে রয়েছে। এবং বোঝাতে চাইছে যে, কেবল খাদ্যের আশায় সে এখানে এসেছে। ভাণ করছে যে, তার উদর এখানে এসেছে কিন্তু দিল আসে নি। তারপর তলানি ঝোলটুকু খাওয়ার জন্যে সে চামচ দিয়ে প্লেট চাঁচতে লাগল। বুড়োকে এমন ক্ষুধার্ত দেখে লিসার হৃদয় বিচলিত হল, সে এবার বাধা দিয়ে বলল :

'ও যদি নীরব থাকতে চায় ত থাকুক। ছেড়ে দাও।'

বুতো এবার রেগে বলল—'এবার আমি ছেড়ে দিচ্ছি, কিন্তু ভবিষ্যতে আমার সঙ্গে এ রকম নোঙরামি করা আর চলবে না। ওহে অবাধ্য বুড়ো শয়তান, আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? এতেই যেন তোমার শিক্ষা হয়। আর কখনও আমার সঙ্গে নোঙরামি করলে রাস্তায় বার করে দেব, ক্ষিধের জ্বালায় মরবে।'

খাওয়া শেষ হলে অতিকষ্টে চেয়ার ছেড়ে উঠল বুড়ো ফৌআন, মৃত্যুর মতন নীরবতা বজায় রাখল। মনে হচ্ছে, নীরবতা আরও বাড়ল। ঘুরে দাঁড়াল এবং সিঁড়ির নীচে নিজের বিছানার দিকে এগিয়ে গেল। পোশাক পরেই টান্‌টান্ হয়ে শুয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ঘুম তার সারা দেহ মন আচ্ছন্ন করল। ক্লান্তিতে অবসন্ন দেহ…নিঃশ্বাস পড়ছে কিনা তাও বোঝা কঠিন। লিসা তাকে দেখবার জন্যে উঠে গেল এবং স্বামীকে বলল, বোধ হয় মারা গেছে। বুতোও উঠে গেল দেখতে…তারপর কাঁধ নাচাল। না, না। বুড়োরা এভাবে মরে না, এমন অবস্থা হয়েছে কারণ অনেক পথ হেঁটেছে তাই।

পরের দিন সকালবেলায় ওরা দেখতে গেল, কিন্তু বুড়ো তখনও ওঠে নি। সন্ধ্যেবেলাতেও বুড়ো অমনিভাবে ঘুমিয়ে রইল। পরের দিন সকালের আগে বুড়োর ঘুম ভাঙল না…প্রায় ছত্রিশ ঘণ্টা সে অচেতনভাবে পড়ে ছিল।

বুতো মুখ ভেঙচে বলল—'ও তাহলে আবার তুমি উঠলে! ভাবছিলাম, তুমি বোধ হয় ঘুমিয়েই থাকবে এবং আর রুটি গিলবে না।'

বুড়ো ফৌআন ছেলের দিকে তাকাল না, কথাও বলল না, বাড়ীর বাইরে গিয়ে রাস্তার ধারে বসে হাওয়া খেতে লাগল।

তারপর থেকে ফৌআন অবাধ্য হয়ে উঠল। যে দলিলগুলো তারা তাকে দেয়নি সেগুলো সম্পর্কে আর সে কোন কথা বলল না। সেগুলো সে একবারও খোঁজ করল না, কথাও পাড়ল না। বোধ হয় সে এখন উদাসীন তাই ওগুলোর প্রতি তার কোনও লোভ নেই। কিন্তু বুতোর সাথে তার সম্পর্কের সূত্র সম্পূর্ণ ছিন্ন হয়ে গেছে। সে নীরব, যেন সম্পূর্ণ একাকী এবং সমাধিস্থ। না, কখনও না। কোন অবস্থায় এবং কোন কারণেই সে আর তাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করবে না। পারিবারিক জীবনধারা অটুট রয়েছে ঠিকই…সে এখানে ঘুমোয় এবং খাওয়া-দাওয়া করে। দিন-রাত তারা পরস্পরকে দেখছে, কাছাকাছি রয়েছে, কিন্তু সে তাদের মুখের দিকে তাকায় না, কথাও বলে না। তাকে

মনে হয় অন্ধ এবং বোবা। জীবন্তদের মধ্যে একটা প্রেতাত্মার মতন সে নিজেকে টেনে নিয়ে বেড়ায়। তারা বারবার তার দিকে মন দিয়ে, তার সম্বন্ধে জানতে চেয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ে…কিন্তু তবু কোনও জবাব মেলে না। তারা ওকে আর ঘাঁটায় না। বুতো এবং এমন কি লিসাও এখন তার সাথে কথা বলা বন্ধ করেছে। সরিয়ে রাখা হয়েছে এমনি ধরনের একখানা আসবাব-পত্রের মতন তারা তাকে সহ্য করে আছে, এবং ক্রমে ক্রমে তারা তার উপস্থিতি গেল ভুলে। ঘোড়া এবং গোরু দুটো তাদের কাছে অনেক বেশী প্রয়োজনীয় এবং জরুরী।

বুতো বাবার হয়ে কাজ করতে লাগল। টাকা পয়সা গ্রহণ করছিল, স্বাক্ষর দিচ্ছিল…সে কারণ দেখাল যে, তার বাবার মাথা এখন দুর্বল হয়ে পড়েছে। বুড়ো কোন কিছু মনে রাখতে পারে না। বাড়ী বিক্রির দরুণ দেড়শ' ফ্রাঙ্ক বৃত্তি মঁসিয়ে বেইলিহ্যাচি সোজাসুজি তার হাতে তুলে দিচ্ছেন। কেবল ডেলহোমিকে নিয়ে তার অসুবিধে হচ্ছে—সে শ্বশুরের হাতে ছাড়া তার দেয় দু'শ' ফ্রাঙ্ক আর কারো হাতে দিতে অস্বীকার করেছে। ডেলহোমি দাবি করেছে, তাকে উপস্থিত থাকতে হবে। কিন্তু ডেলহোমি পিছন ফেরার সঙ্গে সঙ্গে বুতো তার হাত থেকে মুদ্রাগুলো কেড়ে নেয়। মোট সাড়ে তিন শ' ফ্রাঙ্ক হল। কিন্তু তবু বুতো অভিযোগ করছে যে, বুড়োকে খাওয়াতে তার এর চেয়েও খরচ বেশী পড়ে। তারা আর দলিলের কথা তোলে না। ওখানেই তারা থেমে রয়েছে—পরে তারা এ নিয়ে কথা বলবে। সুদ দেওয়ার ব্যাপারে সে অভিযোগ করছে যে, চুক্তি অনুযায়ী বুড়ো সসিস পাওনা দিতে হচ্ছে। সওয়া একর জমি কেনার জন্য প্রতি দিন সকালে পনের সউ দেওয়ার কথা। সে জোর দিয়ে বলছে যে, এই চুক্তি লঙ্ঘন করা যাবে না কারণ বহু অর্থ এর মধ্যেই জড়িয়ে পড়েছে। তবে একটা গুজব রটেছে যে, বুতো তাকে শাসিয়েছে তাই বুড়ো সসিস প্রদত্ত অর্থের অর্ধেক ফেরৎ দিয়ে চুক্তি বাতিলে রাজী হয়েছে—দু'হাজারের মধ্যে এক হাজার ফ্রাঙ্ক ফেরৎ পাবে। এ ব্যাপারে এই অসাধু লোকটা চুপ করে আছে কারণ অহঙ্কারী বুড়ো বদমাসটা তার এই অন্যায় কাজে ধরা পড়তে চায় না। বুতো বুঝতে পেরেছিল এবং আন্দাজ করেছিল যে বুড়ো ফৌআন আগে মরবে কেননা বুড়োর যা' দেহের অবস্থা তাতে তাকে একটা ঠেলা মেরে ফেলে দিলে আর উঠতে পারবে না।

ফৌআনের মনের উদ্ধত অহঙ্কার তাকে ডেলহোমিদের বাড়ী যাওয়ায় বাধা দিচ্ছে, কারণ কন্যার মন্তব্য তাকে বীতশ্রদ্ধ করে তুলেছে—তাই বুতোর সংসারে পড়ে থেকে গালাগালি থেকে মারধোর সবই সহ্য করেছে। অন্য ছেলে আর মেয়ের কথা সে ভাবে না। এমন উদাসীনভাবে সে এসব পীড়ন সহ্য করছে এবং মেনে নিয়েছে যে, এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা সে আর চিন্তাই করে না। আচরণ এর চেয়ে ভাল আর কোথাও হবে না, কাজেই কেন সে যাবে।

বাপের সাথে দেখা হলে ফ্যানি কোন রকম কথা না বলে অবিচলিতভাবে চলে যায় যেন মেয়েটা শপথ করেছে, আগে সে কিছুতেই বাপের সঙ্গে কথা বলবে না। যেসাস ক্রাইস্ট দিলখোলা, তবে অমনিভাবে বিশ্রী একটা ঘটনায় পল্লী-নিবাস ছেড়ে চলে আসার জন্ত সে বাপের উপর রেগে আছে। কিন্তু একদিন লেঙ্গানির ভাঁটিখানায় নিয়ে গিয়ে বাপকে আকণ্ঠ মদ গিলিয়েছিল, তারপর হাত ধরে তাকে বুতোদের বাড়ী পৌঁছিয়ে দিয়েছিল ফলে বুতোদের বাড়ীতে ভয়ানক দৃশ্যের অবতারণা ঘটেছিল এবং সোরগোল সৃষ্টি হয়েছিল।

আর যখন চলা ফেরার ক্ষমতা রইল না তখন বুড়ো ফৌআন জীবনের প্রতি সব আকর্ষণ হারাল। চলাফেরা করাটা এত যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠল যে, গ্রাম ছেড়ে সে কোথাও যেত না। রোদ ঝলমল দিনে বসবার জন্তে দু' তিনটে আরামদায়ক জায়গা সে খুঁজে বার করেছিল···ক্লউয়ের কামারশালার সামনেকার কাঠের গুঁড়ি, এ্যাজর নদীর সেতু আর স্কুলবাড়ীর সামনেকার পাথরের বেঞ্চি। ধীরে ধীরে সে একটা থেকে উঠে আর একটায় গিয়ে বসে। দু'শ' গজ পথ হাঁটে এক ঘণ্টায়—যেন গাড়ী টানছে এমনিভাবে ভারী জুতো টেনে চলে, এমনিভাবে অসম পা ফেলে চলার সময় তার সারা দেহ বেঁকে চুরে কুৎসিত হয়ে যায়। কোন কোন দিন সারা বিকেল ধরে সে আত্মভোলা হয়ে বসে থাকে কাঠের গুঁড়ির এক প্রান্তে এবং বসে বসে রৌদ্রস্নান করে। নিথরদেহে এবং বিস্ফারিত চোখে ওখানে বসে বসে ঝিমোয়। পথচারীরা আর তাকে সম্ভাষণ জানায় না কেননা এখন সে তাদের কাছে একটা দর্শনীয় বস্তু মাত্র। তামাকের পাইপটা এখন তার কাছে ক্লান্তিকর বস্তু। তার মাড়িতে পাইপের ভার পড়ে তাই আর সে ধূমপান করে না, তাছাড়া পাইপে তামাক ভরা এবং বারে বারে জ্বালানো তার কাছে বিরক্তিকর কাজ। সে আজকাল কেবল চুপচাপ বসে থাকতে ভালবাসে···দুপুর রোদেও এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যেতে সে ঠাণ্ডা অনুভব করে, শীতে দেহ ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে থাকে। ইচ্ছা-শক্তি নষ্ট হয়েছে, টুটে গেছে কর্তৃত্বের অধিকার···এখন সে বুড়ো, যন্ত্রণাক্লিষ্ট এবং পরিত্যক্ত একটা জানোয়ার ··তার জীবনের অন্তিম অধঃপতন এবার সুরু হয়েছে, একসময় যে মানুষ ছিল আজ হীনাবস্থার এক জানোয়ার এই ভাবনায় সে সদা শঙ্কিত।

একবার এক প্রতিবেশী তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল—'আচ্ছা ফৌআন, তুমি এখনও সবল রয়েছ?'

সে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বলেছিল—'ও! কেবল শয়তানদেরই মরতে দেরী হয়, মরতে চাই না বলে এ কথা অবশ্য বলছি না।'

যা সে বলল সেটাই তার মনের কথা। যেদিন থেকে সে তার জমি-জমা হারিয়েছে সেদিন থেকেই চাষী-সুলভ বৈরাগ্য-ভরা মনে মৃত্যুর জন্ত অধীরভাবে অপেক্ষা করছে। মাটি তাকে ধারণ করার জন্ত আবার দাবি জানাচ্ছে।

৩

শীতে জমিতে লাঙল দেওয়ার কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ফেব্রুয়ারী মাসের এক বিকেল। অন্ধকার ঘন হচ্ছে, কনকনে ঠাণ্ডা আবহাওয়া। জাঁ ঠিক তখন লাঙল নিয়ে লা কর্ণেইল গ্রামে তার বড় জমিখানায় হাজির হল··· এবার এখানে আরও ঘণ্টা দু'য়েক তাকে কাজ করতে হবে। এই জমিখানার এক দিকে সে স্কট-দেশীয় গমের বীজ ছড়াতে চায়। তার প্রাক্তন খামার-মালিক তাকে এই চাষটা পরীক্ষা করতে বলেছেন।···আর এর জন্যে হোরদি-কুইন কিছু গমের বীজ আলাদা করে রেখেছে। জাঁ খুব সযত্নে জমির একটা দিকে লাঙল চালিয়ে সমান চতুষ্কোণ করল···দেখলে মনে হয় যেন দড়ি ফেলে চারটে কোণ মাপ-জোক করা হয়েছে। তার ঘোড়াটার মাথা অবনত, কাদায় প্রোথিত চারখানা পা তবু সমান তালে ফেলে সে লাঙল টেনে চলেছে। যখনই লাঙলের ফলা মাটিতে পুঁতে যাচ্ছে তখনই সে কাদা ছাড়াবার জন্যে দু'হাতের কব্জি সজোরে ঝাড়ছে···তারপর আবার লাঙলের মুঠি শক্ত করে ধরে এগিয়ে যাচ্ছে। পিছনে উল্টে পড়ছে মাটির একটার পর একটা চাঙড়···যেন এ মাটি জীবন্ত সম্পদশালিনী নির্ভরযোগ্যা···উলঙ্গ এই মাটির বুক।

কর্ষিত জমির শেষ প্রান্তে পৌছে আবার সে ঘুরল, সুরু হল আবার হল-কর্ষণ। অজস্র মাটি লাঙলের ফলায় কর্ষণ করে সে যেন অল্পক্ষণের মধ্যেই মাতাল হয়ে উঠল। কর্ষিত মাটি থেকে হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে এক ধরনের তীব্র সুবাস ···মাটির গোপন বুকের অভ্যন্তরে এই সুবাসে বীজের অঙ্কুর উদ্গম হয়। এই গুরু পদক্ষেপ আর একাগ্র দৃষ্টি তাকে যেন হতবুদ্ধি করে ফেলল। সে কখনও সত্যিকারের চাষী হতে পারবে না। মাটির বুকে সে ত জন্মায় নি, সে একজন প্রাক্তন নগর শ্রমিক, ইতালি অভিযানকারী একজন সৈনিক। সে এমন কিছু দেখতে পায় অনুভব করে যা' চাষীরা দেখতেও পায় না অনুভবও করে না··· বিশাল, বিষণ্ণ সমতল প্রান্তরের প্রশান্তি, রৌদ্রে আর বর্ষায় ধরিত্রীর গভীর শ্বাসগ্রহণ। সব সময় সে স্বপ্ন দেখত যে, সৈনিক জীবন থেকে বিশ্রাম নিয়ে সে আশ্রয় নেবে গ্রামের বুকে, কত বোকার মত কল্পনা করেছিল যে, হাতের বন্দুক আর ব্যাঁদা ছেড়ে জীবনে শান্তি ও নির্জনতা লাভের ইচ্ছা মেটানোর জন্য লাঙলের মুঠি চেপে ধরবে! ধরিত্রীকে যারা ভালবাসে তাদের কাছে ধরিত্রী শান্ত ও সুন্দর! কিন্তু পোকামাকড়ের বাসার মতন যে গ্রামগুলো মাটির বুক আঁকড়ে রয়েছে, যে মানুষ-পোকাগুলো তার মাংস কুরে কুরে খাচ্ছে··· তারাই তাকে অসম্মান করছে, বিষাক্ত করছে তার পরিবেশ। এই লা বর্ডেরি গ্রামে আসবার আগে আর কখনও এমন দুর্ভোগ তাকে ভুগতে হয়েছে কিনা তা আজ তার স্মরণে পড়ে না।

হাঁ, বাস্তবিকই! এই দশ বছর ধরে কি-না দুর্ভোগ সে ভোগ করছে।

প্রথম ফ্রানকয়েসকে লাভ করার জন্য দীর্ঘ দিনের অধীর প্রতীক্ষা···তারপর বুতোদের সঙ্গে বিরোধ। কোন না কোন নিরানন্দ ঘটনা ঘটা ছাড়া কোন একটা দিনও পার হয় নি, এবং এখন সে ফ্রানকয়েসকে লাভ করেছে, দু'বছর তাদের বিয়েও হয়েছে···কিন্তু তবু কি সে বলতে পারে যে সে সুখী হয়েছে? সে ফ্রানকয়েসকে ভালবাসে কিন্তু সে পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে যে, ফ্রানকয়েস তাকে ভালবাসে না এবং যেমন মুক্ত হৃদয় দিয়ে, সপ্রেম আলিঙ্গনের মাধ্যমে সে ভালবাসার কাঙাল তেমনভাবে কোনদিন ফ্রানকয়েস তাকে ভালবাসবে না। তারা এক সঙ্গে সুখে বাস করছে, তাদের সংসারে উন্নতিও হয়েছে, তারা এক সঙ্গে খাটছে···সঞ্চয়ও করছে। কিন্তু তবু এসবে তৃপ্তি পাচ্ছে না জঁা···তাই রাতে শয্যায় যখন সে গভীর আশ্লেষে ফ্রানকয়েসকে বুকে জড়িয়ে ধরে তখন অনুভব করে অতি নিকটে থেকেও দূরবর্তিনী ফ্রানকয়েস, কামশীতল তার দেহ এবং অন্যের প্রতি নিবদ্ধ অন্যমনস্ক তার মন। এখন ফ্রানকয়েস পাঁচ মাসের পোয়াতি। নিরানন্দের মাঝে এই সন্তানের বীজ উপ্ত হয়েছে এবং এর একমাত্র কারণ মায়ের মনের নিরানন্দ অবস্থা। এই সন্তান আগমনের বার্তা তাদের দু'জনকে পরস্পরের কাছে আকৃষ্ট করে তুলতে পারে নি। মনের একটা বদ্ধমূল ধারণার জন্যই বিশেষ করে জঁাকে কষ্ট পেতে হচ্ছে···ধারণাটা তার কাছে খুবই পরিষ্কার। যে-রাতে তারা প্রথম বাড়ীতে প্রবেশ করে সে-রাতেই এই ধারণাটা তাকে শঙ্কিত করে তোলে। সে অনুভব করেছিল যে তার স্ত্রীর কাছে সে চিরদিন অপরিচিত হয়ে থাকবে। সে ভিন্ন জেলার মানুষ, কোথায় সে লালিত পালিত হয়েছে কেউ জানে না। রগনি গ্রামের মানুষদের চিন্তা-ভাবনা-আচরণের সঙ্গে তার কোনও মিল নেই। মনে হয় সে ভিন্ন ধাতুতে গড়া তাই এই শিশুকে দিলেও স্ত্রীর সঙ্গে তার কোন সম্ভাব্য যোগ-সূত্র নেই। বিয়ের পর এক শনিবার বুতোদের উপর দারুণ ক্ষেপে গিয়ে ফ্রানকয়েস ক্লয়েস থেকে একখানা স্ট্যাম্প লাগানো কাগজ নিয়ে এল। উইল করে সে তার সব জমি-জমা স্বামীকে দান করবে। কেননা সে জানতে পেরেছিল যে উত্তরাধিকারী না রেখে সে যদি মারা যায় তবে সব জমি-জমা আবার তার দিদি পেয়ে যাবে···শুধু টাকা-পয়সা আর আসবাব-পত্র স্বামী-স্ত্রীর দু'জনের সম্পত্তি। তারপর কোন রকম কারণ ব্যাখ্যা না করেই মনে হয় সে তার মন বদলাল। সেই সাদা কাগজখানা এখনও তাকের উপর পড়ে আছে। এ ব্যাপারটার জন্য জঁায়ের মনে একটা দুঃখ লুকিয়ে আছে। যদিও এতে তার স্বার্থ রয়েছে কিন্তু সে এই কাজের মধ্যে স্নেহ-ভালবাসার অভাব দেখতে পাচ্ছে। জঁা একটু দাঁড়াল ঘোড়াটাকে একটু বিশ্রাম দেওয়ার জন্য ···তখনি রগনি থেকে নতুন রাস্তা দিয়ে বুড়ো ফৌআনকে আসতে দেখে সে বিস্মিত হল।

জঁায়ের লাঙল দেওয়ার কাজ শেষ হয়েছে এমন সময় সে দেখল ডেলহোম্নি,

পাশের খামার থেকে পদব্রজে ফিরতে ফিরতে মাঠের কিনারায় দাঁড়িয়ে পড়ল।

'করপোরাল, তুমি কি খবর শুনেছ? বোধহয় লড়াই বাধছে।'

'লড়াই? কার সাথে?'

'ওরা বলছে, প্রুসিয়ানদের সাথে। কাগজে বেরিয়েছে।'

জঁা তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। ইতালির স্মৃতি তার মনের পটে ভেসে উঠল। ভাগ্যগুণে যেখান থেকে সে অক্ষত অবস্থায় ফিরে এসেছে সেই হত্যার বিভীষিকাভরা লড়াইয়ের ছবি সে আবার দেখতে পেল। যে সময়ে গভীর আগ্রহের সঙ্গে শান্ত জীবন গড়ে তুলতে ব্যগ্র ঠিক তখনি একজন পথচারীর মুখে লড়াইয়ের খবর শুনে তার রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

'হায় ঈশ্বর! প্রুসিয়ানরা আমাদের সর্বনাশ করবে তাও ত আমরা সহ্য করতে পারি না।'

ডেলহোমি কিন্তু তার কথায় সায় দিতে পারল না। সে মাথা নাড়ল, নেপোলিয়নের পতনের পর কসাক সেনারা যেমনভাবে এ দেশের উপর চড়াও হয়েছিল তেমনিভাবে ওরা যদি আবার চড়াও হয় তবে গ্রামগুলো উচ্ছন্নে যাবে। লড়াই কখনও কারো মঙ্গল করে না, সকলে মিলে-মিশে থাকাই সুবিবেচকের কাজ।

'মনে হয় অন্য লোকেরা লড়াই করতে চায়। মঁসিয়ে বেইলিহাচির কাছে আমি টাকা পয়সা সঞ্চয় করছি। যুবকরা এখন বহু অর্থ রোজগার করতে পারবে। তবে যাই ঘটুক না কেন নিনেসে যুদ্ধে যাবে না।'

জঁা এখন অনেকটা শান্ত হয়েছে, বলল—'হঁা, নিশ্চয়। আমারও ত একই অবস্থা। দেশের কাছে আমার আর কোন ঋণ নেই। এবং এখন আমি বিয়ে করেছি তাই লড়াই বাধলেও আমি আর ওদিকে মন দিচ্ছি না। তাহলে এবার আসছে প্রুসিয়ানরা! বেশ, ওরাও মার খাবে, তাহলেই মিটবে সব!'

'বিদায় করপোরাল!'

'বিদায়!'

লাঙল দেওয়ার কাজ শেষ হল জঁায়ের এবং ঠিক করল, কথা মতন সে বীজ নিয়ে আসতে সোজা লা বর্ডেরি গ্রামে চলে যাবে। ক্ষেতের ধারে লাঙল ফেলে রেখে সে ঘোড়ার পিঠে লাফ দিয়ে উঠল। ঘোড়া ছুটিয়ে যাওয়ার সময় বুড়ো ফৌআনের কথা তার মনে পড়ল। কিন্তু ঘাড় ঘুরিয়ে সে কোথাও তাকে দেখতে পেল না। ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচবার জন্যে বুড়ো নিশ্চয় বুতোর জমিতে কোন খড়ের গাদার আড়ালে আশ্রয় নিয়েছে।

লা বর্ডেরি খামারে পৌঁছে জঁা ডাকল, কিন্তু কেউ জবাব দিল না। প্রত্যেকেই বোধ হয় মাঠের কাজে বেরিয়েছে। জঁা ফাঁকা রান্নাঘরে ঢুকল, টেবিলে টোকা দিল। এবার নীচে দুধের চোর-কুঠরি থেকে জ্যাকুলিন সাড়া দিল। সিঁড়ির তলায় একটা খোলা মেঝের দরজা দিয়ে তার কণ্ঠস্বর ভেসে এল। আর এই দরজাটা এমনভাবে বসানো যে সবাই এটার জন্য একটা দুর্ঘটনা

ঘটার ভয়ে ভীত হয়।

'হ্যালো, কে গা ?'

খাড়াই, সংকীর্ণ সিঁড়ির শেষ ধাপের উপর হাঁটু গেড়ে বসে জঁা নীচের দিকে মুখ বাড়াল এবং জ্যাকুলিন তাকে নীচ থেকে চিনতে পারল।

'আচ্ছা, তুমি এসেছ করপোরাল !'

এবার জঁা তাকে দেখতে পেল। দুধের ঘরে ছোট একটা জানালা দিয়ে ভিতরে আলো ঢুকছে···তাই ঘরখানা স্বল্প আলোকিত। জ্যাকুলিন ওখানে দুধের পাত্রগুলো নিয়ে কাজ করছে। জামার হাতা কনুই পর্যন্ত নিয়েছে গুটিয়ে, খোলা হাত দু'খানায় দুধের সর মাখানো।

'নেমে এস এখানে···তুমি ত আর আমাকে ভয় পাও না, পাও না কি ?'

অতীতে যেমন একান্ত জনের মতন কথা বলত তেমনি সোহাগ-ভরা কণ্ঠে ডাকল এবং স্বাভাবিক মোহিনী ভঙ্গিতে হাসল। কিন্তু সে লজ্জা পেল, তাই নড়ল না।

'মালিক আমাকে গমের বীজ দেবেন বলেছিলেন, তাই নিতে এসেছি।'

'ও হাঁ। জানি আমি···একটু দাঁড়াও। আমি উপরে আসছি।'

সে আবার যখন উপরে ভরা রোদে বেরিয়ে এল তখন তাকে খুব সজীব মনে হল। দু খানা আদুল সাদা হাত এবং দেহ ঘিরে দুধের সৌরভ। তার অনুপম আয়ত দু'চোখের দৃষ্টি সে তার মুখের উপর স্থাপন করল।

অবশেষে তামাসাচ্ছলে সে বলল—'কি গো, আমাকে একটা চমু দেবে না ? বিয়ে করেছ বলে ত তুমি অভদ্র হতে পার না।'

ঠোক্কর দেওয়ার ভঙ্গি করে সে তার দু' গালে চুমু দিল। বোঝাতে চাইল যে, এখনও তারা সত্যিকারের বন্ধু। কিন্তু জ্যাকুলিন তাকে বিব্রত করল, তার দৈহিক স্মৃতি জঁাকে দারুণ উত্তেজিত করে তুলল, তার সারা দেহে মৃদু শিহরণ জাগল। যদিও জঁা তার বউকে খুবই ভালবাসে তবু বউকে আলিঙ্গন করে সে এত যৌন উত্তেজনা উপভোগ করে না।

জ্যাকুলিন বলল—'আচ্ছা, এস আমার সঙ্গে। তোমাকে বীজ-দানা দেখিয়ে দিচ্ছি। একবার ভাব ত, রান্নাঘরের ঝি-টা পর্যন্ত বাজারে গেছে।'

উঠোন পার হয়ে সে গোলাবাড়ীতে ঢুকল এবং বস্তার স্তূপের আড়ালে গেল। দেওয়ালের ধারে কাঠের তক্তার ঘেরের মধ্যে বীজ ঢালা রয়েছে। জঁা তার পিছনে পিছনে এল এবং এই নির্জন স্থানে ওকে একা পেয়ে সে মনে মনে বিব্রত হল। তখখুনি সে বীজ-গমের প্রতি তার নজর দিয়ে এমন একটা ভাণ করল···খাসা স্কট জাতীয় বীজ-গমের দানা।

'আ, কি বড় বড় বীজের দানা !'

কিন্তু সোহাগভরে হেসে উঠল জ্যাকুলিন এবং যে-বিষয়ের প্রতি তার আগ্রহ সেই বিষয়ের অবতারণা করল।

'শুনেছি, তোমার বউ পোয়াতি। তুমি বেশ ক্ষমতাবান এখন তাই না? বল না গো, ওর সহবাস ভাল লাগছে? আমার চেয়ে ওর সঙ্গ কি বেশী সুন্দর?'

জঁা গভীর লজ্জায় পড়ল, এবং জঁায়ের উপর তার প্রভাবের ফল দেখে জ্যাকুলিন মনে মনে খুশি হয়ে উঠল।

'এখনও কি ট্রনের সাথে আসনাই চালাচ্ছ না কি?'

জ্যাকুলিনকে বিব্রত মনে হল না, পুরানো বন্ধুর মতন তার আচরণ। তাই খোলা মনে বলতে লাগল।

'আ, সে খাসা আছে। বিশাল বপু এক নিরেট বোকা। জান ত, লোকটার দারুণ বোধশক্তি। অর্ধেকের জন্য সে হিংসা করে না। হঁা, সে মাঝে মাঝে বড় বিশ্রী কাণ্ড করে বসে। মালিক ছাড়া আর কারো সাথে আমাকে সহবাস করতে দেবে না। এবং এমন কি মাঝে মাঝে এটাও তার পছন্দসই নয়। মনে হয় রাতে ও আমাদের দেখতে আসে, আমরা ঘুমুচ্ছি কি-না!'

জঁা হেসে উঠল। কিন্তু জ্যাকুলিন হাসতে পারল না, কেননা মনে মনে ওই ভয়ানক দানবকে সে ভয় করে, বলে অমন কৌশলী লোককে বিশ্বাস করা যায় না অন্য সব নাগরদের মতন। লোকটা তাকে শাসিয়েছে, ওর প্রতি অবিশ্বাসিনী হলে গলা টিপে তাকে খুন করে ফেলবে। ওর লম্বা-চওড়া দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখে ভাল লাগলেও ওর সঙ্গে বাইরে গেলে ভীত হয় জ্যাকুলিন। কেননা সে এত ক্ষীণাঙ্গী যে সে তাকে দু' আঙুলে টিপে গুঁড়িয়ে দিতে পারে। কিন্তু জ্যাকুলিন সুন্দরভাবে কাঁধ নাচাল; যেন সে বলতে চায়, এর চেয়েও জঘন্যতার সঙ্গে সে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে।

হাসি ছড়িয়ে বলল জ্যাকুলিন—'জান করপোরাল, তোমার সঙ্গ-ই উত্তম ছিল, খুব খাসা ছিলাম আমরা।'

জ্যাকুলিন মোহিনী দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল এবং বীজ-গমের গাদায় দু' হাত ঢুকিয়ে দিল। এবার ধরা পড়ল জঁা···খামার ছেড়ে এসেছে ভুলে গেল, ভুলে গেল সে বিবাহিত এবং তার বউ অন্তঃস্বত্বা। বীজ-দানার মধ্যেই জঁা তার দু'হাতের কব্জি চেপে ধরল, তার দু' বাহু উঁচু করে ধরল, ময়দার গুঁড়োয় মাখামাখি। মেয়েসুলভ স্তন-যুগলেও ময়দার ছোপ···অতিমাত্রায় কাম-ক্রীড়ার ফলে ওর স্তন-যুগল নিটোল আর কঠিন। জঁা সহজেই বুঝতে পারল। মেঝের দরজার ওপারে তাকে দেখার পর থেকে জ্যাকুলিন এটাই চাইছিল। সে আবার জঁাকে চায়, চায় ওই অন্য নারী, যে তার বিয়ে-করা বউ, তার কাছ থেকে তাকে কেড়ে এনে, লম্পট আনন্দ উপভোগ করতে। জঁা তাকে জড়িয়ে ধরল এবং তাকে ধাক্কা দিয়ে শস্যের গাদায় ফেলল। জ্যাকুলিন দারুণ খুশি হল এবং আনন্দে কলধ্বনি করল।

সহসা বস্তাগুলোর পিছন থেকে দীর্ঘকায় শীর্ণ একজন মানুষ সামনে এল

দাঁড়াল। ও মেষ-পালক সৌলাস···ভয়ানকভাবে কাসছে আর থুতু ফেলছে। জ্যাকুলিন লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল এবং জঁা হাঁপাতে হাঁপাতে বলল :

'আচ্ছা, বেশ। তাহলে আমি এসে নিয়ে যাব বীজ-দানা খাসা বড় বড়।'

জ্যাকুলিন ভয়ঙ্করী হয়ে উঠল। মেষ-পালক কিন্তু নড়ল না।

লোকটার পিঠের উপর নজর বুলিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে জ্যাকুলিন আওড়াল —'এবার সত্যিই খুব বাড়াবাড়ি সুরু করেছে লোকটা। এমন কি যখন ভাবি একা রয়েছি ঠিক তখনি ও আমাকে জ্বালাতে আসে। ঠিক আছে, এবার ওকে এখান থেকে তাড়াব।'

জঁা এবার শান্ত হল। তাড়াতাড়ি খামার-বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে ঘোড়ায় উঠল। জ্যাকুলিনের ইসারা-ইঙ্গিত গ্রাহ্য করল না—যুবতী নিজের আনন্দ ত্যাগ করার বদলে তাকে নিয়ে মালিকের শোবার ঘরে ঢুকতেও বরং রাজী ছিল। কিন্তু সে ওর হাত থেকে পালাতে চায় তাই ফের বলল যে, কাল আসবে। ঘোড়ার লাগাম ধরে হাঁটতে লাগল জঁা। কিন্তু গেটের কাছে পৌঁছে সে দেখল সৌলাস তার জন্যে অপেক্ষা করছে।

বুড়ো মেষ-পালক বলল—'তাহলে কি সংসারে সততা বলে কিছু থাকবে না—যদি তুমি এর কাছেও আস? আমার সঙ্গে যেন ও এসব না করতে চায়, দয়া করে ওকে চুপ করে থাকতে বল। একটু থেকে যাও, সোরগোল বাধবে।'

কেবল কঠিন মুখভঙ্গি করে জঁা তার কথার জবাব দিল, আর গোলমালে পড়তে সে রাজী হল না। প্রায় যা' সে করতে চলেছিল তার জন্য নিজের কাছে নিজে লজ্জিত হল, রাগ করল। সে ভেবে দেখল, ফ্রানকয়েসকে সে ভালবাসে কিন্তু ফ্রানকয়েসের উপস্থিতি তার মনে আদিম কামনার আবেগ জানায় না। তার মানে কি জ্যাকুলিনকে সে বেশী ভালবাসে? ওই মাদী কুকুরটার কি তার উপর বেশী প্রভাব? সমস্ত অতীত স্মৃতি তার মনে ফিরে এল। যখন বুঝতে পারল, বিতৃষ্ণা সত্ত্বেও সে ওই মাগির কাছে আবার আসবে তখন সে আরও ক্ষেপে গেল। ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে ওঠার সময় তার দেহ কেঁপে উঠল এবং রগনি গ্রামে তাড়াতাড়ি ফেরবার জন্যে সে সবেগে ঘোড়া ছোটাল।

সেদিনই বিকেল বেলা ঘটনাটা ঘটল। ফ্রানকয়েস ঠিক করল, গোরু-গুলোর জন্যে কিছু লুসার্ণো ঘাস কেটে আনবে। ঘাস কাটার কাজ সে নিজেই করে রোজ। এবং বেরিয়েই ভাবল কাছের মাঠে তার স্বামী লাঙল দিচ্ছে, একবার তার সঙ্গে দেখা করে যাবে। একা সে ওখানে যাওয়ার ঝুঁকি নেয় না কারণ পাশের ক্ষেতে বুতোও কাজ করে···তার সঙ্গে দেখা হলে সে ভীত হয়। সম্পূর্ণ জমি-জমার মালিকানা হাতছাড়া হয়েছে বলে বুতোরা তার উপর রেগে আছে তাই দেখলেই নানা ধরনের বিশ্রী রসিকতা করে এবং কথার হুল ফোটায়। জঘন্য বিবাদ বাধে। লা কর্ণেইলের মাঠে পৌঁছে জঁাকে কোথাও দেখতে না পেয়ে খুব অবাক হল ফ্রানকয়েস···অবশ্য সে তাকে বলে নি যে, সেও

মাঠে যাবে। লাঙল পড়ে আছে, তাহলে কোথায় সে যেতে পারে? বুতোকে দেখে সে মনে মনে দারুণ বিব্রত হল, মাঠে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে তাকে শাসাচ্ছে। মুহূর্তের জন্য ফ্রানকয়েস ভাবল, চরে যাবে সে এখান থেকে। কিন্তু তারপরই ওকে দেখে ভয় পাওয়ার জন্য বিরক্ত হল···নিজের জমিতে যাওয়ার অধিকার তার নিশ্চয় আছে। কাজেই কাস্তেখানা কাঁধে নিয়ে সে এগিয়ে চলল।

ব্যাপারটার সত্য হচ্ছে, এমনিভাবে যখনই বুতোর সঙ্গে ফ্রানকয়েসের দেখা হয়, বিশেষ করে বুতো যখন একা থাকে, তখন নিজেকে খুবই সে অসহায় মনে করে। বিগত দু' বছর সে বুতোর সাথে একটা কথাও বলে নি, কিন্তু যখনই তার সঙ্গে তার চোখাচোখি হয় তখনই ভয়ের শিহরণ বয়ে যায় তার দেহের মধ্যে। হয়ত এটা রাগ, কিংবা হয়ত এটা আর অন্য কিছু। আগে আরও অনেক দিন লুসার্ণোর ক্ষেতে যাওয়ার পথে এমনিভাবে ফ্রানকয়েস দেখতে পেয়েছে বুতোকে। সে মাথা ঘুরিয়ে ফ্রানকয়েসকে দেখেছে···একবার, দু'বার, তিনবার···এবং তাকিয়ে থেকেছে তার হলুদ-ধূসর দৃষ্টিতে। অমনি অল্প অল্প কেঁপে উঠেছে ফ্রানকয়েসের দেহ এবং তাড়াতাড়ি পা চালিয়েছে, যদিও বুতো তখন ধীরে ধীরে হাঁটছে। শেষ যেদিন ওদের দু'জনের দেখা হয়েছিল সেদিন এত ভয় পেয়েছিল ফ্রানকয়েস এবং নিজের বিশাল পেট নিয়ে এমন হাঁসফাঁস করছিল যে, রাস্তা থেকে লুসার্ণো ক্ষেতে নামতে গিয়ে একদম উল্টে পড়ে গিয়েছিল। তাই দেখে হাসিতে ফেটে পড়েছিল বুতো।

সেদিনই রাতে অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে বুতো লিসাকে বলল যে, কিভাবে তার বোন আছাড় খেয়েছে···তখন তারা দু'জনেই পরস্পরের দিকে যে দৃষ্টিতে তাকাল তাতেই তাদের মনের একই চিন্তা প্রকাশ পেল...ওই আছাড়ে যদি মাদি কুকুরটা মরতো এবং মরতো তার পেটের বাচ্চাটা তাহলে তার স্বামী জমিজমার অধিকারী হত না এবং বাড়ীখানা আবার তাদের দখলে ফিরে আসতো। গ্রাণ্ডির বউ তাদের কাছে বলেছে যে, দলিল তৈরী করার কাজ মুলতুবি হয়ে রয়েছে কারণ সন্তানের আগমন সম্ভাবনার জন্য দলিল এখন অর্থ-হীন বলে'বিবেচিত। একবার ভাব ত উত্তরাধিকারী না রেখে ফ্রানকয়েস মারা গেল, তাহলে কত আনন্দের হবে সেটা, ঈশ্বরের সুন্দর বিচারের নিদর্শন হবে সেটা। লিসার মনে ঘৃণা এমন তীব্র ও বিষাক্ত হয়ে উঠেছে যে বোনের প্রতি তার স্নেহ মন থেকে উবে গেছে এবং সে শপথ করেছে, ওই জঘন্য ও ন্যক্কারজনক অবস্থার মধ্যে রক্তখেগো মেয়েটা তাদের যে জমি-জমাগুলো কেড়ে নিয়ে তাদের বাড়ীছাড়া করেছে সেগুলো উদ্ধারের জন্য দরকার হলে বোনের মাথা জহ্লাদের হাড়িকাঠে বাড়িয়ে ধরতে সে প্রস্তুত। বুতো কিন্তু অতটা চাইছে না এবং সে বলছে যে সন্তানটা জন্মাবার আগেই যদি মরে যায় তবে ভাল হয়।

তারপর বাত্তির আলো নিভিয়ে ওরা শুয়ে পড়ল, লিসা বিচিত্র গলায় হেসে উঠল, বলল, বাচ্চাটা জন্মাবার আগে তার জীবন্ত আগমন বন্ধ করা যায়। নীরবতা নেমে এল ওদের মধ্যে। এক সময় বুতো জানতে চাইল, কেন সে একথা বলছে। স্বামীর গা লেপটে শুয়ে তার কানে কানে লিসা একটা ব্যাপার স্বীকার করল। আবার সে নিজে পোয়াতি হয়েছে বুঝতে পেরে গত মাসে দারুণ বিচলিত হয়ে লিসা তাকে না জানিয়ে ম্যাগনোলিস গ্রামে সাপিনের বউয়ের সাথে দেখা করতে গিয়েছিল। বুড়ী ডাইনী। লিসাও পোয়াতি হয়েছে একথা যদি সে বুতোকে বলত তাহলে বুতোও খুশি হত, তাই না। সামান্য একটা ছুঁচ ঢুকিয়ে সাপিনের বউ তার পেট খসিয়ে দিয়েছে। বুতো সব শুনল···সমর্থন বা অসমর্থন কিছুই করল না···কেবল খুশিতে ডগমগ হয়ে তামাসা করে বলল যে, সেই ছুঁচটা তার কেড়ে নিয়ে আসা উচিত ছিল ফ্রানকয়েসের উপর ব্যবহার করার জন্য। সে এবার হেসে উঠল এবং স্বামীর গলা দু হাতে জড়িয়ে ধরে তার কানে কানে বলল যে, অন্য উপায়ে ফ্রানকয়েসের ব্যবস্থা করার কথা সাপিনের বউ বলেছে···সে এক আজব উপায়! ওটা কেমন? একজন মরদ যা' করেছে আর একজন মরদ তা' নষ্ট করতে পারে! অন্য মরদ মাগিটাকে মাটিতে শুইয়ে তার পেটের উপর তিনবার ক্রস চিহ্ন এঁকে দিয়ে তাকে বিপরীত প্রক্রিয়ায় ধর্ষণ করবে। ব্যস! তাহলে পেটে যদি সন্তান থাকে ত সে হাওয়ায় উবে যাবে! বুতো হাসি থামাল, তারা এমন ভাণ করল যে তারা এসব বিশ্বাস করে না কিন্তু তাদের হাড়ে-মাংসে মেশানো আদ্যিকালের কুসংস্কার মনে পড়তে তারা ভয়ে শিউরে উঠল। সবাই শুনেছে ম্যাগনোলিসের ওই বুড়ী ডাইনী একটা গোরুকে ভোঁদড়ে পরিণত করেছিল এবং একটা মরা লোককে একবার বাঁচিয়েছিল। যদি সে বলে থাকে এতে কাজ হবে তাহলে সত্যি কাজ হবে। লিসা লজ্জাবনত মুখে জানতে চাইল, ওমনিভাবে তার পেটের উপর ক্রস-চিহ্ন এঁকে দিয়ে তাকে বিপরীত প্রক্রিয়ায় ধর্ষণ করবে কি-না। তাহলে মেয়েটার কোন কিছু হয় কি-না পরখ করা যাবে! না কিছু না! কাজেই তখন ছুঁচের খেলা দেখতে হবে। এতে ফ্রানকয়েসের নির্ঘাৎ ক্ষতি হবে। হাসল বুতো এবং এমন কাজ সে করতে পারবে কি-না ভাবতে লাগল। ও, আচ্ছা, কেন করতে পারবে না? সে কি এর মধ্যেই তাকে ধর্ষণ করেছে? কখনও না! এবার সে নিজেই প্রতিবাদ করল আর তার বউ হিংসের জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে সজোরে তার দেহে নখ বসিয়ে দিল। এক সময় পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে তারা ঘুমিয়ে পড়ল।

সেই রাত থেকে এই আসন্ন সন্তানের চিন্তা, যে তাদের বাড়ী-ঘর জমি-জমা তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেবে, তাদের মন অবিরাম বিষণ্ণ করে তুলল এবং মেয়েটার সঙ্গে দেখা হলেই তারা পেটের দিকে নজর দিতে লাগল। তাকে এখন রাস্তা বরাবর আসতে দেখে তারা তাকে ভাল করে দেখল এবং তার

গর্ভসঞ্চারের কাল যে আসন্ন প্রসবের দিনের কাছাকাছি পৌছেছে তা' বুঝতে পারল। এরপর আর কোনও কিছু করার সময় থাকবে না।

লাঙল দেওয়া জমি পরখ করে ফিরে আসতে আসতে বুতো চীৎকার করে উঠল—'হায় ঈশ্বর! চোরটা আমার প্রায় ফুটখানেক জমি দখল করে নিয়েছে দেখছি। সীমানা চিহ্ন রয়েছে ও অস্বীকার করতে পারবে না।'

ফ্রানকয়েস ওই রাস্তা দিয়ে মনের ভয় লুকিয়ে রেখে শান্ত মনে এগিয়ে আসছিল। তখন সে বুঝতে পারল জাঁ লাঙল দিতে দিতে ওদের জমিতে ঢুকে পড়েছে বলে ওদের এই রাগ। এ ধরনের সীমানা নিয়ে গোলমাল প্রায় প্রতি মাসেই ওদের মধ্যে বাধছে এবং এ নিয়ে ওরা চারজন দারুণ ঝগড়া করে। এসবের জন্য নির্ঘাৎ ওদের মধ্যে একদিন মারামারি বাধবে এবং মামলা স্বরু হবে।

বুতো বেশ চড়া-স্বরে বলল—'এই শুনছিস? তোরা আমার জমি দখল করেছিস এর জন্যে তোদের গুণাগার দিতে হবে।'

ফ্রানকয়েস শুনেও ফিরে তাকাল না এবং নিজের ঘাসের জমিতে নেমে গেল।

এবার লিসাও মেজাজ খারাপ করল। চেঁচিয়ে উঠল—'তোকে বলছি! এসে সীমানা দেখে যা, মিথ্যে বলছি কিনা আমরা নিজের চোখে দেখ। আমাদের এই ক্ষতি তোকে দেখতেই হবে।'

বোনের এই শান্ত এবং স্পষ্টত আত্মতুষ্টি ভাব দেখে তার মনের সামঞ্জস্য-বোধ উবে গেল। ঘুঁষি পাকিয়ে লিসা বোনের দিকে তেড়ে এল।

'শোন, কি করছিস তা' তোরা জানিস? আমি তোর দিদি, আমার কথা তোর শোনা উচিৎ। আমার সঙ্গে যে সব বদমাইসি করছিস তার জন্যে আমার পায়ে ধরে তোকে ক্ষমা চাইতে হবে।'

সে তার সামনে রাগে অন্ধ হয়ে দাঁড়াল।

'এই মাদি কুকুর, ক্ষমা চা আমার কাছে!'

ফ্রানকয়েস একটি কথাও বলল না। কেবল সেদিন বাড়ী ছেড়ে চলে আসবার সময় ওরা যেমন তার মুখে থুতু ছিটিয়ে দিয়েছিল তেমনিভাবে দিদির মুখে থুতু ছিটিয়ে দিল। লিসা তীব্রকণ্ঠে চীৎকার করে উঠল। তখন বুতো তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে এগিয়ে এল।

'ওকে ছাড়! এটা আমার কাজ!'

ও, হাঁ, মেয়েটার সাথে এবার সে টক্কর লড়তে পারে। ওর ঘাড় মুচড়ে একখানা শুকনো কাঠের মতন ওর শিরদাঁড়াটা ভেঙ্গে দিতে পারে। ওর দেহটা কেটে টুকরো টুকরো করে কুকুরদের মুখে ছুঁড়ে দিতে পারে অথবা ওর মাংস দিয়ে চাটনি বানাতেও পারে। লিসা তার স্বামীকে বাধা দেবে না বরং আনন্দের সঙ্গে তাকে সাহায্য করবে। এবং সেই মুহূর্তে লিসা সরে

দাঁড়াল এবং নজর রাখল যাতে কেউ না তার স্বামীকে বাধা দেয়।

'এবার তাহলে ওই কাজটা করো, কেউ কোথাও নেই।'

বুতো এগিয়ে এল ফ্রানকয়েসের দিকে। ওর মুখে কঠিন দৃষ্টি এবং উত্তেজনায় অধীর হাত দেখে ফ্রানকয়েস ভাবল, তাকে হয়ত মারবে। সে তার কাস্তে নামাল না, তবে ভয়ে কাঁপতে লাগল। বুতো কাস্তেখানার হাতল ধরে ওখানা কেড়ে নিল এবং লুসার্নো ঘাসের জঙ্গলে ছুঁড়ে ফেলল। এখন তার কাছ থেকে পালিয়ে যাওয়ার একমাত্র রাস্তা হচ্ছে ফিরে যাওয়া, সে পাশের ক্ষেতে ছুটে গেল, ওখানে খড়ের গাদার দিকে ছুটল—যেন ওই গাদাটা তাকে বাঁচাবে। বুতো কিন্তু একটুও ব্যস্ত হল না, সেও তাকে ওই দিকে তাড়িয়ে নিয়ে চলল, সে তার দু হাত আরও আরও প্রসারিত করে ধরল, তার নীরব আনন্দের হাসিতে দাঁতের মাড়ি বেরিয়ে এসেছে। সহসা ফ্রানকয়েস বুঝতে পারল যে, সে তাকে মারতে চায় না। না, সে আর কিছু চায়, এতদিন ধরে সে তাকে যে বস্তু দিতে চায় নি সেই বস্তু চায়। তারপর সে ভয়ে আরও কাঁপতে লাগল, সে অনুভব করল, তার শক্তি ফুরিয়ে আসছে অথচ সে অতীতে কত শক্ত ছিল, কত কঠিনভাবে তার সঙ্গে লড়াই করেছে এবং কিছুতেই তার কাছে ধরা দেবে না বলে লড়াই করেছে। তবুও সে এখন আর ছেলেমানুষ নয়, সেণ্ট মার্টিনস্ ডে-তে তার তেইশ বছর বয়স পূর্ণ হয়েছে, সে এখন একজন পূর্ণ যুবতী নারী, লাল টুকটুকে অধর-যুগল, রৌপ্য মুদ্রার মতন বড় বড় দুটো চোখ। নিজের বিগলিত আত্মসচেতনতা সম্বন্ধে সে সজাগ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো উষ্ণ আর কোমল যেন সে হাঁটতেই অক্ষম।

কিন্তু বুতো তখনও তাকে পিছন দিকে ঠেলে নিয়ে চলেছে।

অবশেষে সে মৃদু কামনার্ত স্বরে বলল—'জান ত, তোমার আমার মধ্যে এখনও সব কিছু শেষ হয়ে যায় নি। তোমাকে আমি চাই এবং তোমাকে পাবই।'

খড়ের গাদায় পিঠ-রাখা ফ্রানকয়েসকে অবশেষে ধরতে পারল বুতো। ফ্রানকয়েসের কাঁধ ধরে সে তাকে মাটিতে ফেলে দিল। তারপর সে বুতোর সঙ্গে ঠিক আগে যেমনভাবে তাকে বাধা দিত তেমনিভাবে উন্মত্তের মতন ধস্তাধস্তি করতে লাগল। বুতো তাকে জড়িয়ে ধরে তার লাথি এড়াচ্ছিল।

'বোকা কোথাকার, তোর ত ছেলেপিলে হবে, আর কোনও বিপদের ঝুঁকি নেই। এটা ত ঠিক তোকে আর একটা বাচ্চা দিতে পারব না।'

ফ্রানকয়েস কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল, তার দেহে আক্ষেপ দেখা দিল, আর সে নিজেকে বাঁচাতে পারছে না, তার হাত-পা ভয়ে অবশ হয়ে পড়ছে। বুতো কিন্তু তাকে কিছুতেই বাগাতে পারছে না, প্রতিবারেই সে তাকে একপাশে ঠেলে ফেলে দিচ্ছে···প্রত্যেকবারের চেষ্টা বিফল হচ্ছে। রাগ তাকে জানোয়ারে পরিণত করল, তাই বউয়ের দিকে তাকিয়ে সে খিচিয়ে উঠল।

'অভিশপ্ত কুঁড়ের মতন দাঁড়িয়ে থেক না! ওভাবে কেবল দাঁড়িয়ে থেকে লাভ কি হবে? ওই কাজটা যদি আমাকে করতেই হয় তবে সাহায্য কর, মাগির ঠ্যাঙ দু'খানা চেপে ধর।'

গজ দশেক দূরে লিসা নিথর দেহে দাঁড়িয়েছিল। একবার দিগন্তের দিকে আর একবার ওদের দিকে নজর ফেরাচ্ছিল। তার সারা মুখমণ্ডল ভাবলেশহীন। তার স্বামী যখন ডাকল তখন আর সে দ্বিধা করল না। এগিয়ে এল, বোনের বাম পা চেপে ধরল, টেনে ফাঁক করে পায়ের উপর দেহের সব ভার রেখে চেপে বসল। মাটির উপর কীলক-বিদ্ধ হয়ে যেন পড়ে রইল ফ্রানকয়েস···এখন সে পঙ্গু, তার স্নায়ুতন্ত্র ছিন্ন-ভিন্ন, দু'চোখ বন্ধ। তবু সে সচেতন। বুতো তার সঙ্গে সঙ্গমে রত হতেই আনন্দের শিহরণ অনুভব করল ফ্রানকয়েস এবং দু'হাতে সজোরে তাকে জড়িয়ে ধরল। তীব্র দীর্ঘ কান্নার স্বর ফুটল তার কণ্ঠে। আর তার সেই কান্নার আওয়াজে মাথার উপর উড্ডীয়মান কাকগুলো ভয় পেল। খড়ের গাদার ওপাশ থেকে বুড়ো ফৌআন উঁকি দিল···ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচার জন্যে সে অনেকক্ষণ ওখানে বসে আছে। সে সব কিছু দেখছে এবং সে ভয় পেল। তাই খড়ের গাদার আড়ালে আবার আত্মগোপন করল।

বুতো উঠে দাঁড়াল, লিসা স্বামীর দিকে তাকিয়ে রইল। কেবল একটা ব্যাপার জানার জন্যই সে ব্যগ্র···বুতো প্রয়োজনীয় সব কিছু করেছে কি-না এটাই সে নিশ্চিতভাবে জানতে চায়। মরদটার মন এত তন্ময় ছিল যে, সে আসল করণীয়গুলো গেছে ভুলে। ভুলে গেছে ক্রুশ-চিহ্ন আঁকতে এবং বিপরীত-প্রক্রিয়ায় সঙ্গম করতে। এবার লিসার মন ভেঙ্গে পড়ল। তাহলে বুতো নিজের আনন্দ উপভোগের জন্যই এই সঙ্গম করল।

তাকে বোঝবার সময় না দিয়ে ফ্রানকয়েস তাকে ছেড়ে দিল। ভীষণ সঙ্গমানন্দে আপ্লুত হয়ে সে কয়েক মুহূর্তের জন্য মাটিতে নিথরভাবে পড়ে রইল—এমন আনন্দ সে এর আগে কখনও উপভোগ করে নি। সহসা সত্য তার সামনে উদ্ঘাটিত হল···সে বুতোকে ভালবাসে, এমনভাবে সে আর কাউকে ভালবাসে নি, এবং ভালবাসবেও না। এই আবিষ্কার তার মনে গভীর লজ্জা এবং ভয় সৃষ্টি করল, মনে দেখা দিল বিচার-বোধ। ওই মরদ তার নয়, যে দিদিকে সে ঘৃণা করে ওই মরদ তার স্বামী···একমাত্র কুকুরী-স্বভাব না হলে সে ওই মরদকে লাভ করতে পারে না। এবং ফ্রানকয়েস তাকে রমণ-ক্রিয়া শেষ করতে দিল। এত গভীর আশ্লেষে সে বুতোকে জড়িয়ে ধরেছিল রমণের সময়ে যে, বুতো নির্ঘাৎ বুঝতে পেরেছে সে তাকে ভালবাসে।

বিস্রস্ত এবং উন্মত্তপ্রায় বুতো লাফিয়ে উঠল, ভাঙ্গা ভাঙ্গা শব্দে নিজের লাঞ্ছনা প্রকাশ করল।

'নোঙরা শুয়োরের বাচ্চা কোথাকার! হাঁ, তোরা দু'জনেই তাই! তোরা আমাকে ধর্ষণ করলি!'

'তোর মতন মরদের মৃত্যুদণ্ডও কম শাস্তি! বেজন্মা কোথাকার! ওঁকে আমি সব বলব! সে তোর উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করবে।'

রমণে চরম আনন্দ উপভোগ করে দারুণ খুশি বুতো, অবশেষে সে মেয়েটাকে ভোগ করেছে।

'সোরগোল পাকিও না, বাপু! তুমিও ত মরে যাচ্ছিলে এমন রমণের আনন্দ না পেয়ে, বুঝতে পারলাম তুমিও উপভোগ করেছ। কি বল, আবার একদিন করব!'

এই রসিকতা লিসার মনের ক্রমবর্ধমান রাগ মাথায় চড়ল, এবং স্বামীর আচরণের জন্য সঞ্চিত রোষ ভেঙ্গে পড়ল ছোট বোনের মাথায়।

'সত্যি কথাই, তুই একটা বেশ্যা। নিজের চোখেই ত দেখলাম। তুই ওকে আঁকড়ে ধরে রমণ করতে বাধ্য করেছিস। তাই ত সব সময় বলতাম আমার সব বিপদ-আপদের মূল তুই। আর এখন তুই কিনা বলছিস যে, আমার মরদকে তুই পাপে প্রলুব্ধ করিস নি, হাঁ তুই করেছিস। আমাদের বিয়ের পর তখনও তোর নাক মুছিয়ে দিতে হত তখন থেকেই তুই ছিনালি করছিস।'

বুতোকে ধর্ষণের কাজে সাহায্য করার পর বিচিত্রভাবে তার মনের মধ্যে হিংসা দেখা দিল এবং এইমাত্র যা' ঘটল তার কারণেই এই হিংসা নয়···আসলে তার যা' ছিল তার অর্ধেক তার বোন ছিনিয়ে নিয়েছে বলেই এই হিংসার ভাব। যদি এই বোনটা তার না জন্মাত তবে আজ এভাবে তার সবকিছুর অর্ধেক সে ছিনিয়ে নিতে পারত না। তাকে সব কিছু ভাগ করে নিতে হত না। সে তাকে ঘৃণা করে কারণ সে কমবয়সী, তরুণী এবং তার চেয়ে বেশী কাম্য।

ফ্রানকয়েস তীব্রকণ্ঠে বলল—'তুই মিথ্যে কথা বলছিস, আর তুই যে মিথ্যে কথা বলছিস তা' তুই ভালভাবেই জানিস!'

'ও, মিথ্যে কথা, তাই নাকি? তাহলে তুই ওর জন্যে হ্যাংলামি করিস নি, চোর-কুঠরিতে ওর পিছনে যাস নি?'

'আমি? তাহলে এখন এটাও আমি করেছি, করেছি তাই না? তুই একটা গোরু, আমাকে ধরেছিলি, আমার পা-খানা প্রায় ভেঙ্গে দিয়েছিস। বুঝতে পারি নি, তুই একটা ঘৃণ্য জীব আর না হয় তুই আমাকে খুন করতে চাস, তুই একটা মাদি কুত্তা!'

লিসা ওর গালাগালির জবাবে ওকে প্রচণ্ড জোরে ঘুঁষি মারল। এই নৃশংসতায় একেবারে ক্ষেপে গেল ফ্রানকয়েস। তার দিকে তেড়ে গেল। এখন আর বুতো ওদের ব্যাপারে নাক গলালো না, পকেটে দু'হাত ঢুকিয়ে মুখ ভ্যাংচাতে লাগল···যেন দুটো মুরগী লড়ছে আর গর্বিত মোরগ তাকিয়ে দেখছে। লড়াই চলতে লাগল, ক্রমে ক্রমে লড়াই ভীষণ এবং বিষাক্ত হয়ে উঠল। ওড়না ছিঁড়ে হল টুকরো টুকরো, রমণী দু'জন পরস্পরের দেহের যেখানে পারল নখ বসিয়ে দিল। পরস্পরকে তারা ঠেলতে ঠেলতে লুসার্ণো

ঘাসের মাঠে নিয়ে এল। লিসা কঁকিয়ে উঠল, ফ্রানকয়েস তার ঘাড়ে নখ বসিয়ে দিয়েছে। নখ বসে কেটে গেছে···রক্ত ঝরছে। বেপরোয়াভাবে বোনকে খুন করার ইচ্ছা জাগল তার মনে। ফ্রানকয়েসের বাঁ-দিকে কাস্তেখানা দেখতে পেল লিসা···হাতলটা জড়িয়ে আছে এক আঁটি ঘাসে এবং কাস্তের ধারালো মুখ উপর দিকে উঁচানো। দেহের সমস্ত শক্তি জড় করে লিসা সজোরে ফ্রানকয়েসকে মারল এক ধাক্কা। হতভাগিনী মেয়েটা টলে পড়ে গেল মুখ থুবড়ে। বাঁ-দিকে পড়ে যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠল।

কাস্তের আঘাতে তার দেহের পাশ কেটে দু'ভাগ হয়ে গেল।

বুতো তোতলাতে লাগল—'হায় ঈশ্বর! হায় ঈশ্বর।'

সব শেষ। মাত্র একটা সেকেণ্ড সময় লাগল ঘটনাটা ঘটতে, অপূরণীয় ক্ষতিকর কাজটা শেষ হল। তার ইচ্ছা এত দ্রুত ফলবতী হল দেখে দারুণ ভীত হল লিসা, দেখল ছেঁড়া জামাটা রক্তে ভেসে যাচ্ছে। ধারালো কাস্তেখানা বোধ হয় পেটের বাচ্চাটাকেও কেটে ফেলেছে, নইলে এত রক্ত আসছে কোথা থেকে? আর একবার খড়ের গাদার উপর দিয়ে বুড়ো ফৌআনের মুখখানা উঁকি দিল। যা' কিছু ঘটল সব সে দেখেছে, এবং সে উদ্বিগ্নভাবে চোখ পিট পিট করে দেখতে লাগল।

ফ্রানকয়েস আর নড়ছে না, বুতো তার কাছে এগিয়ে এল কিন্তু তার দেহ স্পর্শ করতে সাহস করল না। এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া বইল এবং তার হাড়ের ভিতরে মজ্জা পর্যন্ত জমাট বেঁধে গেল। তার মাথার চুলগুলো খাড়া হয়ে উঠল এবং সারা দেহ ভয়ে কাঁপতে লাগল। সে লিসার হাত চেপে ধরল এবং এক অজানা শক্তি তাদের দু'জনকে রাস্তা দিয়ে তাড়িয়ে নিয়ে চলল। মনে হচ্ছে, বিষণ্ণ আকাশ তাদের মাথার উপর নেমে এসেছে। দ্রুত পদক্ষেপ তাদের··· বুঝি একদঙ্গল মানুষ তাদের অনুসরণ করছে। কর্তিত ফসল নির্জন মাঠের উপর দিয়ে তারা ছুটে চলেছে। বুতোর ঢিলা জামাটা হাওয়ায় উড়ছে। লিসা মাথার ওড়নাখানা নিয়েছে হাতে। তার মাথার চুলগুলো খুলে হাওয়ায় উড়ছে। হাঁপাতে হাঁপাতে দু'জনেই একই কথা বলছে।

বিতাড়িত জানোয়ারের মতন তারা চেঁচিয়ে উঠল—'ও মারা গেছে। হায় ঈশ্বর! চল পালাই আমরা।'

মুখে আর কোন কথা নেই, ওরা জোরে ছুটতে লাগল···ছুটতে ছুটতে ওরা মুখ দিয়ে অচেতনভাবে বিচিত্র শব্দ করছিল।

নাকী সুরে ওরা মাঝে মাঝে আর্তনাদ করছিল—'হায় ঈশ্বর, ও মারা গেছে! মৃত!'

তারা ওখান থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কয়েক মুহূর্ত পরে জাঁ ওখানে ঘোড়া ছুটিয়ে ফিরল। অবস্থা দেখে সে দারুণ ভয় পেল।

'এ রকম কি করে হল তোমার ?'

ফ্রানকয়েস আবার চোখ মেলে তাকাল কিন্তু নড়তে পারল না। অনেকক্ষণ ধরে বিষণ্ণ-দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকিয়ে রইল। সে কোনও জবাব দিল না, বুঝি ইতিমধ্যে সে বহুদূরে চলে গেছে, অন্য বিষয়ে সে চিন্তা করছে।

'তুমি আহত হয়েছ, রক্ত ঝরছে তোমার, আমার কথার জবাব দাও।'

বুড়ো ফৌআন এগিয়ে এল এবং জঁা তার দিকে তাকাল।

'তুমি ত ওখানে ছিলে, কি হয়েছে বল ত ?'

তখন ধীরে ধীরে জবাব দিল ফ্রানকয়েস।

'ঘাস কাটতে এসেছিলাম। কাস্তের উপর পড়ে গেছি···আ, সব শেষ হয়ে গেল !'

ফ্রানকয়েস তাকাল বুড়ো ফৌআনের দিকে, তার দু'চোখ যেন বুড়োকে আর কিছু বলল, সেই আর কিছু জানবে শুধু ফৌআন আর পরিবারের মানুষরা। দু'চোখে তন্দ্রাচ্ছন্ন দৃষ্টি, তবু ওই কথা বুঝতে পারল ফৌআন।

সে শুধু আবার বলল—'হাঁ, কথাটা সত্যি। পড়ে গিয়ে সে নিজেই আহত হয়েছে। আমি ছিলাম, দেখেছি।'

একখানা স্ট্রেচারের জন্য জঁা রগনিতে ছুটে এল। আনবার সময় ফ্রানকয়েস আবার চেতনা হারাল। তাদের ভয় হল, তারা হয়ত জীবিত অবস্থায় ওকে গ্রামে আনতে পারবে না।

৪

পরের দিন রবিবার। রগনি গ্রামের যুবকরা ক্লয়েস শহরে চলেছিল সেনাবাহিনীর কাজে ভাগ্য নির্ণয় করতে। গ্রাণ্ডির বউ আর ফ্রিমাতের বউ তখন ফ্রানকয়েসের পোশাক বদলে তাকে শুইয়ে দিচ্ছিল, ঠিক তখনি রাস্তায় ঢাক বেজে উঠল···বিষণ্ণ আকাশের তলায় এ যেন ধরিত্রীর শবযাত্রার বাদ্যধ্বনি।

জঁায়ের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। সে ডাক্তার ফিনেতকে আনতে ছুটল। পথে গীর্জার ধারে গো-বদ্যি মঁসিয়ে পাতয়ের সাথে তার দেখা হল···তিনি বুড়ো সসিসের একটা ঘোড়ার অসুখের জন্য এসেছেন। তিনি আসতে রাজী নন; তবু জঁা তাঁকে ধরে নিয়ে এল, আহত রমণীকে দেখাবার জন্য। সেই ভয়াবহ ক্ষত দেখে সোজা বললেন, তিনি কিছু করতে পারবেন না। এখন সবই অর্থহীন, কোনও কিছুই আর করা যাবে না। ঘণ্টা দুয়েক পরে জঁা গিয়ে ডাক্তার ফিনেতকে নিয়ে এল। ডাক্তার একই অভিমত দিলেন। কোনও আশা নেই, তিনি কেবল যন্ত্রণা লাঘবের জন্য ঘুমের ওষুধ দিতে পারেন। পাঁচমাস অন্তঃসত্বা থাকার জন্যেই অবস্থাটা আরও ঘোরালো হয়ে উঠেছে, বাচ্চাটা নড়া-চড়া করছে, মায়ের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চাটাও মারা যাবে··· কেননা দেহের অভ্যন্তরস্থ সন্তানোৎপাদী অঙ্গ কেটে গেছে। ডাক্তার রোগিনীর

আহত স্থানে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিতে চেষ্টা করলেন, পরের দিন আবার আসবেন বলে শপথ করেও ঠিক চলে যাওয়ার আগে বলে গেলেন যে, হতভাগিনী রমণীর রাত কাটবে না। কিন্তু ফ্রানকয়েস মারা গেল না। পরের দিন সকাল পর্যন্ত বেঁচে রইল।

তখন সকাল ন টা। সামরিক বিভাগের ড্রাম বেজে উঠল—সেনাদলে নাম লেখানোর জন্য যুবকদের আহ্বান জানানো হচ্ছে স্কুলবাড়ীর মাঠে।

সারা রাত ধরে বৃষ্টি হয়েছে। শোবার ঘরের পিছনে তন্দ্রাচ্ছন্নভাবে বসে সে সারা রাত এই প্রলয়ঙ্কর ধারাবর্ষণের শব্দ শুনেছে···তার দু'চোখের কানায় কানায় অশ্রু জমেছে। এবার সে ড্রামের আওয়াজ শুনল, যেন স্যাঁৎস্তেতে, শান্ত, সকালের হাওয়া চুঁইয়ে ওই আওয়াজ ভেসে আসছে। বৃষ্টি থেমেছে, কিন্তু সারা আকাশ এখন সীসের মতন ধূসর।

সকাল দশটার আগে অবশ্য ডাক্তার ফিনেত আসতে পারলেন না এবং তখনও ফ্রানকয়েসকে জীবিত দেখে তিনি অবাক হলেন। তিনি ভেবেছিলেন হয় ত 'ডেথ সারটিফিকেট' লেখা ছাড়া তার আর কোনও কাজ থাকবে না। তিনি ক্ষতস্থান পরখ করে মাথা নাড়লেন, অবশ্য তিনি কোনপ্রকার সন্দেহ না করলেও শোনা কাহিনী তাঁর মনে গাঁথা রয়েছে। আবার তারা তাঁকে ঘটনাটা বলল। আচ্ছা, কাস্তের ধারালো মুখের উপর এই হতভাগিনী মেয়েটা পড়ল কি করে? তিনি আবার চলে গেলেন। এই ঘোলাটে ব্যাপারটা তাঁকে ক্ষিপ্ত করে তুলল। তাঁকে আবার 'ডেথ সারটিফিকেটে' স্বাক্ষর করতে আসতে হবে—আর কোন কাজ থাকবে না। বিষণ্নমনে জাঁ দেখছিল ফ্রানকয়েসকে। যখনই স্বামীর জিজ্ঞাসু দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টি মিলছে তখনই ফ্রানকয়েস চোখ বুজিয়ে, নিথর দেহে নীরব থাকছে—একটি কথাও বলছে না। জাঁ অনুমান করছে, কেউ একজন মিথ্যে বলছে। এবং ফ্রানকয়েস তার কাছ থেকে কিছু লুকোচ্ছে। ভোরবেলা কয়েক মুহূর্তের জন্য সে লুসার্ণো ঘাসের মাঠে পরখ করবার জন্যে গিয়েছিল। নির্দিষ্ট কিছুই নজরে পড়ে নি। রাতের বৃষ্টিতে পদচিহ্নগুলো ধুয়ে-মুছে গেছে। মাঠের একটা জায়গায় অনেক পায়ের চাপে মাটি বসে গেছে—নিঃসন্দেহে ওখানটায় পড়ে গিয়েছিল ফ্রানকয়েসের দেহ। ডাক্তার ফিনেত চলে গেলেন—একাকী মরণোন্মুখ মেয়েটির বিছানার পাশে নিঃশব্দে সে বসে রইল—ফ্রিমাতের বউ খাওয়ার জন্যে ঘরে গেছে এবং গ্রাণ্ডির বউ গেছে নিজের বাড়ী-ঘর দেখতে।

'তোমার কি যন্ত্রণা হচ্ছে? বল না গো!'

ফ্রানকয়েস সজোরে চোখ বন্ধ করে রাখল, কোন জবাব দিল না।

'বল না গো, তুমি আমার কাছ থেকে কিছু লুকোচ্ছ না, লুকোচ্ছ?'

যন্ত্রণাদায়ক দ্রুত শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, নইলে এতক্ষণ মারা যেত ফ্রানকয়েস! গত পরশু থেকে একভাবে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে সে···যেন নিথরতা ও

নীরবতার হাতে সে বন্দিনী। প্রচণ্ড জ্বরে দেহ পুড়ে যাচ্ছে, কিন্তু ইচ্ছাশক্তির জোরে সে প্রলাপের প্রবণতা বন্ধ করে রেখেছে। কেননা প্রলাপ বকতে সে ভয়ার্ত···কত কথা সে বলে ফেলবে। এই মেয়েটির চরিত্র বড় বিচিত্র, সে ভীষণ একরোখা, অবাধ্য। গ্রামের লোক বলাবলি করে, অন্য ফৌআনদের মতন সেও জেদী, অন্যরা যা' করতে বলবে তা' সে কিছুতেই করবে না এবং এমন সব বিচিত্র ধারণা আছে তার যা' শুনলে অপরে ভিরমি যাবে। বোধহয় গভীর পারিবারিক-প্রেমে তার মন আচ্ছন্ন, ঘৃণা এবং প্রতিহিংসা গ্রহণের ইচ্ছার চেয়েও এই প্রেম অনেক বেশী তীব্র। সে যখন মরতে চলেছে তখন আর প্রয়োজন কি ? পরিবারের সঙ্গে এই বোধগুলোও এখানে কবরস্থ হয়ে রয়েছে ···এই জেলায় তারা সবাই লালিত-পালিত হচ্ছে, এখানেই তাদের আজন্মের ঘর···তাদের মনোভাবের কথা কোন মূল্যেই তারা একজন বিদেশীর কাছে বিকিয়ে দিতে পারে না। এবং জাঁ একজন বিদেশী, এই যুবককে সে কোনদিন ভালবাসতে পারে নি, আর তারই সন্তান তার গর্ভে, অবশ্য সে সন্তান কোনদিন ভূমিষ্ঠ হবে না, সেও এখন মরতে চলেছে···যেন এই কাণ্ড সুরু করার জন্যই সে শান্তিলাভ করল।

ফ্রানকয়েসকে মরণাপন্ন অবস্থায় বয়ে আনার সময় থেকেই উইলখানার কথা জাঁ ভাবছে। সারারাত ধরে তার মাথায় এই একই চিন্তা ঘুরে ফিরে এসেছে, এমনিভাবে যদি ফ্রানকয়েস মারা যায় তবে সে শুধু আসবাব-পত্রের অর্ধেক এবং তাকের উপর রাখা অর্ধেক টাকা তার মানে একশ পঁচিশ ফ্রাঙ্ক পাবে। সে ফ্রানকয়েসকে খুবই ভালবাসে, তার জন্যে সে তার নিজের চোখ দুটো উপড়ে দিতে পারে কিন্তু তার দুঃখকে আরও গভীর করছে এই চিন্তা যে তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সে এই বাড়ী, এই জমি হারাবে। কিন্তু তবু এখনও পর্যন্ত সে এসব তাকে সাহস করে বলতে পারে নি, কথাগুলো বড় নিষ্করুণ···তার ওপর সব সময় ওর কাছে লোকজন থাকে। অবশেষে জাঁ যখন বুঝতে পারল যে, দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ সে কখনই জানতে পারবে না তখনই সে অন্য সমস্যাটা বলল।

'বোধহয় একটা ব্যাপারের সমস্যা তোমাকে মেটাতে হবে।'

ফ্রানকয়েস নীরবে শুয়ে রইল এবং মনে হল, সে কিছুই শুনতে পাচ্ছে না। তার বন্ধ চোখদুটোয় আর রহস্যময় মুখমণ্ডলে কোনও পরিবর্তন হল না।

'তুমি ত জান, তোমার দিদি থাকার জন্যে তোমার কোনও ক্ষতি হতে পারে। তাকের উপর কাগজ-পত্র লেখাই আছে নিয়ে আসব।'

জাঁ তাকে কাগজ-পত্র এনে দিল এবং কুণ্ঠিত-স্বরে বলতে লাগল :

'তোমাকে কি সাহায্য করব? তুলে ধরব? তোমার লেখবার মতন দেহে ক্ষমতা আছে কি না তা' ত জানি না। আমার জন্য বলছি না, যা'রা তোমার যথেষ্ট ক্ষতি করেছে তাদের ত তুমি কিছু দিতে চাও না তাই এ কথা

বলছি।'

তার চোখের পাতা দুটো মৃদু কাঁপল···তার কথাগুলো সে শুনেছে। কিন্তু ফ্রানকয়েস রাজী হল না, কিছুই বুঝতে না পেরে সে অবাক হল। হয়ত সে নিজেই বলতে পারছে না কেন কফিনে তার দেহ বন্ধ হওয়ার আগে সে এমনভাবে মৃতের ভাণ করছে! এই যে মানুষটা পথচারীর মতন তার জীবনে সহসা আবির্ভূত হয়েছে, এই জমি ও এই বাড়ি ত তার নয়···এ সবের উপর তার কোন অধিকার নেই। তার কাছে ফ্রানকয়েস ঋণী নয়···বাচ্চাটা ত তার সঙ্গেই যাবে। তাহলে কোন অধিকারে এই সম্পত্তি পরিবারের বাইরের একজনের হস্তগত হবে? তার মনের শিশুসুলভ অবাধ্য-বিবেচনা প্রতিবাদ করে উঠল। এটা আমার আর এটা তোমার···এবার আমাদের ছাড়াছাড়ি হোক···বিদায়! হাঁ এটাই আসল কথা। এছাড়া আরও কতকগুলো অস্পষ্ট বিষয় আছে···তার দিদি লিসার মূর্তি এখন অস্পষ্ট হতে হতে অতীতে পরিণত হয়েছে···এখন বুতোর উপস্থিতি স্পষ্ট, নৃশংসতা সত্ত্বেও ফ্রানকয়েস তাকে ভালবাসে, তাকে চায় এবং তাকে তাই সে ক্ষমা করেছে।

কিন্তু এই মাটির জন্য আজ জাঁয়ের মন লালায়িত, তার আত্মা বিষাক্ত··· তাই জাঁয়ের মেজাজ বিগড়ে গেল। তাই সে ফ্রানকয়েসকে তুলে বসাবার চেষ্টা করল এবং তার দু' আঙুলের মাঝে একটা কলম গুঁজে দিল।

'এখন শোন, এটা অসম্ভব! নিশ্চয় তুমি আমার চেয়ে ওদের বেশী ভালবাসা না। জান, ওই বদমাস দুটো সব জমি-জমা পেয়ে যাবে।'

অবশেষে ফ্রানকয়েস তাকাল এবং তার দৃষ্টি দেখে লজ্জিত হল জাঁ···তার সব আশা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। ফ্রানকয়েস বুঝতে পেরেছে যে সে মরতে চলেছে। তার দু'চোখ মনে হচ্ছে আরও বড় হয়ে উঠেছে এবং সেই বড় বড় চোখে ফুটে উঠেছে গভীর হতাশা। কেন জাঁ তাকে পীড়ন করছে? সে পারে না, সে করবেও না। সে শুধু গভীর যন্ত্রণায় মৃদুস্বরে কঁকিয়ে উঠল। তারপর ফ্রানকয়েস আবার লুটিয়ে পড়ল, তার দু'চোখ বন্ধ হল এবং বালিশের মাঝখানে তার মাথা অনড় হয়ে পড়ে রইল।

নিজের নৃশংসতায় জাঁ দারুণ লজ্জিত হল। মনে তার অসোয়াস্তি। গ্রাণ্ডির বউ যখন ফিরে এল তখনও সে কাগজগুলো হাতে নিয়ে বসে আছে। বুঝতে পারল গ্রাণ্ডির বউ, তাই তাকে একপাশে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল যে, কোন দলিল আছে কি না। তোতলাতে তোতলাতে সে একটা মিথ্যে কথা বলল, পাছে ফ্রানকয়েসের মন আকুল হয়ে ওঠে তাই সে দলিলখানা সরিয়ে রেখেছে। গ্রাণ্ডির বউ বিশ্বাস করলেও বুতোদের জন্য তার ভয় হল ···ওরা যদি উত্তরাধিকারী হয় তবে সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটবে। তাই টেবিলে বসে বুড়ী বলতে লাগল:

'দেখ, আমি নিজে কাউকে বিপদে ফেলব না···অনেক দিন আগেই আমি

আমার দলিল সম্পাদন করেছি। প্রত্যেকেই তার ভাতা পেয়েছে···কাউকে বেশী সুবিধে দিলে সেটা আমার অসৎ কাজ করা হবে—বাছারা তোমরাও ভাগ পাবে। একদিন ত আমার দলিল প্রকাশ পাবেই।'

জঁা কিছুই শুনছিল না। সে জানালার বাইরে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। সকাল থেকেই তার নজরে পড়েছে, বুড়ো ফৌআন অনেকবার এল এ বাড়ীতে—দু'খানা লাঠিতে ভর দিয়ে সে কোন রকমে দেহটাকে টেনে টেনে আনছে। সহসা জঁা আবার তাকে দেখতে পেল। একটা জানালার সার্সিতে মুখ রেখে শোবার ঘরের মধ্যে কি হচ্ছে বোঝবার চেষ্টা করছে। জঁা জানালাটা খুলল এবং বুড়ো ফৌআন চমকে গেল। ধীরে ধীরে আওড়াল, কি হচ্ছে তাই সে জানতে এসেছে। খুবই খারাপ অবস্থা, অন্তিম সময় ঘনিয়ে আসছে। তারপর সারসের মতন সে গলা বাড়িয়ে দিল। দূর থেকে অনেকক্ষণ ধরে ফ্রানকয়েসকে দেখতে লাগল। যেন মনে হল কিছুতেই সে তার দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিতে পারছে না। গ্রাণ্ডির বউ আর ফ্যানি যখন বুড়োকে দেখতে পেল তখন তাকে গিয়ে লিসাকে পাঠিয়ে দিতে বলল। এসময় পরিবারের প্রত্যেকের আসা উচিৎ। এভাবে সমাপ্তি ঘটতে পারে না। কিন্তু ওরা যখন তাকে ডাকতে পাঠাতে চাইল তখন সে ভয় পেল, কাঁপতে কাঁপতে চলে গেল। ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথায় মাড়ির ফাঁক দিয়ে আওড়াল বুড়ো ফৌআন:

'না, না। অসম্ভব, অসম্ভব!'

জঁা বুড়োর ভীতভাব দেখে ভয় পেল আর মেয়েরা তাদের প্রচেষ্টা বন্ধ করল। এটা যা' হোক ওদের দু'বোনের ব্যাপার, কেউ জোর করে তাদের মধ্যে মিল ঘটাতে পারে না। ঠিক সেই সময় একটা আওয়াজ ভেসে এল—প্রথমে খুব অস্পষ্ট, যেন কতকগুলো বড় বড় মৌমাছি গুনগুন শব্দে উড়ছে—ক্রমে ক্রমে আওয়াজ তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে—বুঝি গাছ-গাছড়ার মাথা দুলিয়ে হাওয়া বইছে।

চমকে উঠে ফ্যানি বলল—'ড্রাম বাজছে। ওই আসছে। বিদায়!'

শেষ সময়ে জ্যেঠতুতো বোনের হস্তচুম্বন না করেই ফ্যানি অদৃশ্য হল।

গ্রাণ্ডির বউ এবং ক্রিমাতের বউ দরজায় গিয়ে দাঁড়াল দেখবার জন্যে। ফ্রানকয়েস ও জঁায়ের কাছে আর কেউ নেই। হয় ত এই অবাধ্যতা এবং নিথর নিস্তব্ধতার মধ্যে প্রত্যেকটি কথাই ফ্রানকয়েসের কানে গেছে। যেমনভাবে কোন জানোয়ার মাটির তলায় তার গর্তের গভীরে ঢুকে মারা যায় তেমনিভাবে সেও মরতে চায়। খোলা জানালার ধারে দাঁড়াল জঁা। অনিশ্চয়তার জ্বালায় ছিন্নভিন্ন তার মন। ওই বিশাল বিস্তৃত প্রান্তর থেকে মানুষের দেওয়া বস্তু-সমূহের দেওয়া গভীর দুঃখ যেন তাকে নিমজ্জিত করে ফেলছে ধীরে ধীরে। ও হো, ড্রামের বাজনার আওয়াজ ক্রমে ক্রমে বাড়ছে, তার দেহের মধ্যে তালে তালে ধ্বনিত হচ্ছে। শাশ্বত এই শব্দ—বর্তমানের দুঃখের সাথে অতীত স্মৃতি

মিশিয়ে যাচ্ছে—ব্যারাক-জীবনের যুদ্ধের এবং যাদের ভালবাসার জন্য বউ নেই, বাচ্চা নেই সেই সব হতভাগ্য পুরুষদের দুঃখময় জীবন-কাহিনীর স্মৃতি তার মন গভীর বিষণ্ণতায় ভরে তুলছে।

তারপর সে শুনতে পেল রমণীরা ঘরের মধ্যে ঘুরছে এবং ফিস ফিস করে কথা বলছে। ওই সব সাড়াশব্দে তার দেহ কেঁপে উঠল। ফ্রানকয়েস মারা গেছে। সে আর তার চোখ খুলল না এবং কথাও বলল না। সে যেন ঘুমিয়ে পড়েছে, তার মুখমণ্ডল অতিমাত্রায় সাদা, ক্ষীণ এবং কঠিন।

জানালার ধার থেকে একটা ছায়া-শরীর সরে গেল এবং দ্রুত মিলিয়ে গেল অন্ধকারের মধ্যে। জঁা ভাবল হয় ত কোনও কুকুর শিকারের খোঁজে এসেছিল। বুতো—সে লিসাকে খবর দিতে ছুটল যে, তার বোন মারা গেছে।

৫

পরের দিন সকালবেলায় ফ্রানকয়েসের মৃতদেহ বার করা হল। শোবার ঘরের মাঝখানে দু'খানা চেয়ারের উপর শবাধার রাখা হয়েছিল। লিসা এবং বুতোকে একে একে বাড়ীর মধ্যে ঢুকতে দেখে জঁা বিস্মিত হল এবং রেগে গেল। ওদের মেরে বাড়ী থেকে তাড়াবার জন্যে তার মনে প্রথম একটা ইচ্ছা জাগল···কেননা এই হৃদয়হীন আত্মীয়রা মেয়েটার অন্তিম সময়ে তাকে একবার দেখতে অথবা হস্ত-চুম্বন করতে আসে নি, যখন দেখল যে শবাধারে পেরেক বসানো হয়ে গেছে এবং আর কখনও মেয়েটাকে দেখা যাবে না তখন গভীর সোয়াস্তিতে এখানে এসেছে। ফ্যানি এবং গ্রাণ্ডির বউয়ের মতন পরিবারের লোকেরা জঁাকে বাধা দিল। মৃতদেহ নিয়ে বিবাদ-বিসম্বাদ দুর্ভাগ্যের লক্ষণ, অতীতের তিক্ততা নিরসনের জন্য লিসা যদি এখন ছোট বোনের মৃতদেহ দেখে অধিবাস করে তবে কেউ তাকে বাধা দিতে পারে না।

মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের ইচ্ছা নিয়ে বুতোরা তাই বাড়ীতে ঢুকল। তারা একবারও বলল না যে, তারা এ-বাড়ী দখল করছে। ফ্রানকয়েস যখন আর বেঁচে নেই, তখন তারা যে অধিকার করবে এটাই স্বাভাবিক···কাউকে বলবার দরকার নেই। লিসা খানিকক্ষণ বসল, তারপর যেন ভুলে গেছে এমনিভাবে উঠে গিয়ে আলমারি খুলে দেখল যে যা রেখে গিয়েছিল, সে সব ঠিক আছে কি না, তার অনুপস্থিতিতে কিছু নষ্ট হয় নি ত! ইতিমধ্যে বুতো আস্তাবল আর গোয়াল দেখে এল, এমন একটা ভাব যেন এসবের অধিকারী সে। সন্ধ্যের মধ্যেই ওরা বাড়ীতে বেশ জঁাকিয়ে বসল। শুধু শবাধারটা দেখে ওরা লজ্জিত হল। শোবার ঘরের মাঝখানটা জুড়ে রয়েছে সেটা। তবে আর একটা রাতের জন্য ওদের শান্ত হয়ে থাকতে হবে। কাল সকাল থেকেই বাড়ীতে যথেষ্ট জায়গা থাকবে।

পরিবারের লোকজনদের মধ্যে জঁা পায়চারি করছিল। সে দিশেহারা হয়ে

পড়েছে, নিজেকে নিয়ে যে কি করবে তা' বুঝতে পারছে না। প্রথম প্রথম এই বাড়ী, আসবাবপত্র এবং ফ্রানকয়েসের মৃতদেহ তার দখলে বলে মনে হয়েছিল কিন্তু যত সময় পার হচ্ছে ততই মনে হচ্ছে এ সবই অপরের হাতে চলে যাচ্ছে। রাত হল। ওরা কেউ তার সঙ্গে একটাও কথা বলল না। এ বাড়ীতে সে একজন বিদেশী—তাকে তারা সহ্য করছে। সে যে বিদেশী এই ভাবনাটা এর আগে আর তাকে এমনভাবে আশঙ্কিত করে নি। পারিবারিক সম্বন্ধের বিচারে এদের মধ্যে তার কোন আত্মীয় নেই অথচ তার অবস্থা নিয়ে এরা যখন ভাবছে তখন এরা সবাই পরস্পরের আত্মীয়। তাই এদের ভিতর থেকে সে বাদ পড়েছে। তার হতভাগিনী মৃতা স্ত্রীও আর তার দখলে রইল না। অধিবাসের কথা উঠতেই ফ্যানি কৌশলে তাকে ঘর থেকে বার করে দিল, বলল, ঘরে বড় বেশী লোকজন রয়েছে। কিন্তু সে ওখানে থাকবে বলে জেদ ধরল এবং পাছে ওরা কিছু সরিয়ে নেয় তাই আলমারি থেকে একশ' পঁচাত্তর ফ্রাঙ্ক নিয়ে নিজের কাছে রেখে দেবে ঠিক করল। ড্রয়ার খুলবার সময় লিসা নির্ঘাৎ মুদ্রাগুলো আর স্ট্যাম্প-লাগানো কাগজখানা দেখেছে। গ্রাণ্ডির বউ ফিস ফিস করে বলছিল। যখন সে নিশ্চিত হয়েছে যে, কোন উইল-টুইল করা হয় নি তখনই সে এ বাড়ীতে চেপে বসেছে। খানিকটা মনে মনে আরাম পেয়েছে। কিন্তু টাকাগুলো পাওয়ার অধিকার তার নেই। আগামীকাল যে কি ঘটবে তারই ভাবনায় জঁায়ের মন শঙ্কিত এবং মনে মনে ঠিক করল যে, অন্ততঃ টাকাগুলো সে কাছে রেখে দেবে। তারপর সে সারা রাত ধরে চেয়ারে বসে কাটাল।

পরের দিন ঠিক সকাল ন'টা থেকে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কাজ সুরু হল। চার্লসরা এলেন এবং এল ডেলহোমি আর নিনেসি। শ্রদ্ধাবনত এই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এবং বাড়াবাড়ি কিছু ঘটল না। জঁা কান্নাকাটি করছিল, বুতো দু'চোখ মুছল। শেষ মুহূর্তে লিসা বলল, তার পা-দুটো অবশ হয়ে আসছে, ছোটবোনের শবানুগমন করতে সে পারছে না। কাজেই সে একা বাড়ীতে রইল—গ্রাণ্ডির বউ, ফ্যানি, ফ্রিমাতের বউ এবং বেকুর বউ ও অন্যান্যরা কবরখানা পর্যন্ত শবাধারের অনুগমন করল। ফেরবার পথে তারা ইচ্ছে করেই গীর্জার সামনে খানিকটা সময় দাঁড়ালো এবং আগের দিন থেকে তারা যা আশঙ্কা করছিল তাই ঘটতে দেখল।

বুতো এবং জঁা দু'জন মরদই তখন পর্যন্ত পরস্পরের দৃষ্টি এড়িয়ে চলছিল কেননা তাদের মনে ভয় ছিল তাহলে ফ্রানকয়েসের মৃতদেহ ঠাণ্ডা হওয়ার আগেই তাদের মধ্যে লড়াই বেঁধে যাবে। এখন দু'জনেই গোঁয়ারের মতন বাড়ীর দিকে হাঁটছিল এবং অপাঙ্গে পরস্পরকে দেখছিল। তারা দেখছিল। জঁা তখনি বুঝতে পারল যে, লিসা কেন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দেয় নি। সে নিজে বাড়ীতে থেকে জিনিসপত্র এ বাড়ীতে বয়ে আনতে পারবে তাহলে। এক ঘণ্টা সময় পেলেই যথেষ্ট হবে। ফ্রিমাতের বাড়ী থেকে জিনিসপত্র পাঁচিলের ওপাশ থেকে এ বাড়ীতে ফেলে দিল এবং ভজুর জিনিসগুলো নিয়ে এল দু'

চাকার গাড়ীতে করে। সে লরা এবং জুলিকেও এ বাড়ীর উঠোনে নিয়ে এল, এবং তাঁরা ঝগড়া করছিল বলে তাদের ছুটো থাবড়াও মারল। বুড়ো ফৌআনকেও ঠেলতে ঠেলতে এ বাড়ীতে নিয়ে এসেছে লিসা। সে এখন বেঞ্চিতে বসে বসে ঝিমোচ্ছে। সারা বাড়ী এখন সে আবার দখল করে নিয়েছে।

বাড়ীর সামনে, জাঁয়ের পথ আটকে কর্কশ গলায় বুতো বলল—'কি হে, কোথায় চললে?'

'বাড়ী যাচ্ছি।'

'বাড়ী? তুমি কি এটা তোমার বাড়ী পেয়েছ? এটা আর তোমার নয়, আমাদের বাড়ী।'

লিসা ছুটে এল এবং তাকে আরও তীব্র ভাষায় অপমান করল।

'আরে ওই বদমাসটা কি চায় এখানে? আমার ছোট বোনের মন সে অনেক বিষাক্ত করেছিল, কথাটা একেবারেই স্পষ্ট, নইলে দুর্ঘটনায় সে কিছুতেই মরত না। তার মনের ভাব সে বুঝিয়ে দিয়ে গেছে, ওকে সে কিছুই দিয়ে যায় নি। বুতো, ওকে মেরে তাড়াও। ভেতরে না ঢোকে যেন, আমাদের মধ্যে ও রোগ ছড়িয়ে দেবে!'

এই কর্কশ ঝগড়া শুনে জাঁয়ের মন ভেঙ্গে খান্‌খান্ হয়ে গেল এবং সে সব ব্যাপারটা আলোচনা করতে চাইল।

'জানি, জমি-জমা এবং বাড়ী আবার তোমরা ফিরে পাবে কিন্তু টাকা-পয়সা আর গৃহপালিত পশুগুলোর অর্ধেক ত আমার!'

তাকে বাধা দিয়ে লিসা বলতে লাগল—'অর্ধেক? তোর ত খুব সাহস! একটা নোঙরা ইতর কোথাকার, অর্ধেক চাইছিস, তোর সাহস ত কম নয়! ওই গায়ের জামাটা ছাড়া তুই ত এখানে একখানা চিরুণি নিয়েও ঢুকিস নি। মেয়েমানুষের আনা সম্পত্তি ভোগ করতে চাস, ইতর কোথাকার, তাই নিয়ে বেঁচে থাকবি!'

বুতো বউকে সমর্থন করল এবং হাতের ইঙ্গিতে তাকে রাস্তা দেখিয়ে দিল।

'বউ ঠিকই বলেছে, তুমি এবার পথ দেখ। তোমার জামা আর প্যান্ট যা' আছে সে সব নিয়ে যাও। ওগুলো আমরা কেড়ে নেব না।'

পরিবারের লোকেরা, বিশেষ করে মেয়েরা, ফ্যানি আর গ্রাণ্ডির বউ গজ তিরিশ দূরে দাঁড়িয়েছিল। নীরব থেকে ওরা তার কথাই সমর্থন করল। এই অপমানে জাঁয়ের মুখ সাদা হয়ে গেল, এই সব নোঙরা কথায় তার মনে দারুণ আঘাত লাগল। সে ওদের আচরণ বুঝতে পারল। তার মেজাজ গেল বিগড়ে এবং ওদের মতন চেঁচিয়ে বলল:

'বেশ, তোমরা যখন গোলমাল চাইছ তাই হবে! এখন প্রথমে আমি বাড়ীতে ঢুকব! যতক্ষণ সম্পত্তি ভাগ না হচ্ছে ততক্ষণ এ বাড়ী আমার।

তারপর ম'সিয়ে বেইলিহাচির কাছে যাব, তিনি বাড়ীতে তালা লাগিয়ে আমাকে অভিভাবক নিযুক্ত করবেন। এ বাড়ী আমার, তোমরা বেরিয়ে যাও।'

সে এমন ভয়ঙ্করভাবে তেড়ে গেল যে, লিসা ভয়ে দরজা থেকে সরে গেল। কিন্তু বুতো সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সুরু হয়ে গেল লড়াই। দু'জন মরদই রান্নাঘরের মধ্যে সবেগে ঢুকল এবং ঘরের মধ্যে ওদের বিবাদ তুমুল হয়ে উঠল।

'এ বাড়ীর অধিকার যে তোমার তার কাগজপত্র দেখাও।'

'উচ্ছন্নে যাক কাগজপত্র! আমার অধিকারে আছে এটাই যথেষ্ট।'

'আমরা যেমন পেয়াদা আর পুলিশ এনেছিলাম সে রকম আনাও তাহলে।'

'পেয়াদা আর পুলিশে আমার দরকার নেই। অপরাধীদের ওসব দরকার হয়। সৎ লোকেরা নিজেদের সমস্যা নিজেরাই মেটায়।'

জাঁ টেবিলের পিছনে সরে গেল, সে বিজয়ী হওয়ার জন্য বেপরোয়া। যে বাড়ীতে সবেমাত্র তার স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে, যে বাড়ী তার সুখের স্মৃতিতে ভরা, এমন সুখ সে জীবনে আর কোথাও কখনও উপভোগ করে নি···সেই বাড়ী সে কিছুতেই ছেড়ে যেতে চায় না। যে বাড়ী সে আবার দখল করতে পেরেছে সেই বাড়ী বুতোও ছাড়তে রাজী নয়—এবং সে বুঝতে পেরেছে, এ ব্যাপারটা তাকে মেটাতেই হবে।

সে বলতে লাগল—'তারপর এটাই সব কাহিনী নয়, তোমার ব্যাপারে আমরা পুরোপুরি নিরাশ হয়েছি।'

সহসা বুতো টেবিলের উপর লাফিয়ে উঠে ওর ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল, জাঁ তৈরীই ছিল। একখানা চেয়ার তুলে সজোরে তার পায়ে মারল। সে নীচে পড়ে গেল। তারপরেই সে শোবার ঘরে ঢুকে পড়ল। পাশেই ও ঘরের দরজা। নিজেকে ঘরের মধ্যে বন্দী করল। তারপর সহসা লিসার সেই এক শ' সত্তর ফ্রাঙ্কের কথা মনে পড়ল, কাল আলমারির ড্রয়ারে সে মুদ্রাগুলো দেখেছিল। লিসা ভাবল হয় ত জাঁ সেই মুদ্রাগুলো নিতেই ঘরে ঢুকছে। সে ছুটে আগে ঘরে ঢুকল এবং ড্রয়ার খুলেই দারুণ রাগে চেঁচিয়ে উঠল।

'টাকা! বেজন্মাটা কাল রাতে টাকাগুলো চুরি করেছে।'

সেই মুহূর্ত থেকেই জাঁ পরাজিত হল, কেননা তাকে তার পকেট সামলাতে হচ্ছিল। জাঁ চেঁচিয়ে বলল, এগুলো তার টাকা। সে হিসেব নিকেশ করতে রাজী আছে। তাদের কাছে তার আরও পাওনা আছে। কিন্তু বুতো আর লিসা তার কথা শুনতে চাইল না। লিসা তার দিকে তেড়ে এল এবং স্বামীর চেয়েও বেশী জোরে তাকে আঘাত করল। প্রচণ্ড ধাক্কায় জাঁ শোবার ঘর থেকে ছিটকে পড়ল রান্না ঘরে আবার, ওখানেই তিনজনে দঙ্গল পাকিয়ে ঘুরতে লাগল, আসবাবপত্রগুলোতে লাগল ধাক্কা। এক লাথি কষিয়ে জাঁ মুক্তি পেল লিসার কবল থেকে। লিসা আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং জাঁয়ের

পিঠে দিল সজোরে নখ বসিয়ে। বুতো সজোরে লাথি ছুঁড়ল এবং তার দিকে তেড়ে এল। মাথা দিয়ে ঢুঁ মারল। জাঁ ছিটকে পড়ল রাস্তায়।

ওরা দু'জনে তখন দোরগোড়ায় পথ আটকে দাঁড়াল।

ওরা চেঁচাতে লাগল—'তুই একটা চোর! আমাদের টাকা চুরি করেছিস! চোর! চোর! চোর তুই!'

জাঁ উঠে দাঁড়াল।

যন্ত্রণায় আর রাগে তোতলাতে তোতলাতে জাঁ বলল—'ঠিক আছে! আমি শ্যাতোদুনে বিচারকের কাছে যাচ্ছি এবং তিনি নিশ্চয় আমাকে আমার বাড়ীর দখল পাইয়ে দেবেন। তোমাদের নামে আমি মামলা করব, ক্ষতিপূরণ চাইব। আবার ফিরে আসব।'

শেষবারের মতন ওদের ভয় দেখিয়ে জাঁ চলে গেল সমতলভূমির দিকে।

আর তখন বুতোরা জয়ের আনন্দে বন্য-চিৎকার জুড়ে দিল। অবশেষে তারা ওই ভিনদেশী, অন্যায়ভাবে অধিকারকারী জাঁ-কে রাস্তায় বার করে দিয়ে নিজেদের বাড়ী দখল করতে পেরেছে। তারা তাই ত বলত যে, তারা আবার ফিরে আসবে। বাড়ী! তাদের বাড়ী! নিজেদের পরিবারের পুরানো বাড়ীতে ফিরে আসার ফলে তাদের মনে আনন্দের উন্মত্ত-আবেগ সৃষ্টি হল, নিজেদের বাড়ীতে সজোরে চিৎকার করার আনন্দ উপভোগ করার জন্যই তারা দু'জনে ঘরে ঘরে ছুটতে আর চিৎকার করতে লাগল। ছেলেমেয়ে দু জন, লরা আর জুলি, ছুটে এসে একটা পুরানো সস্‌-প্যান ড্রামের মতন পিটতে লাগল। বুড়ো ফৌআন বাইরে পাথরের বেঞ্চিতে নীরবে বসে আছে, তার দৃষ্টিতে বিরক্তির রেশ, মুখে হাসি নেই।

জাঁ হেঁটেই চলেছে—মহাশূন্যে নিবদ্ধ তার দৃষ্টি, জানে না তার পা-দু'খানা তাকে কোথায় টেনে নিয়ে চলেছে। প্রথমে ভেবেছিল, সে ক্লয়েস শহরে গিয়ে মঁসিয়ে বেইলিহ্যাচির সাথে দেখা করবে এবং বাড়ীতে থাকার তার অধিকার তিনি নিশ্চয় প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন। তারপর তার রাগ শান্ত হল। আজ যদি সে ও বাড়ীতে বাস করার অধিকার পায়ও তবু ত কাল তাকে চলে আসতেই হবে। তাহলে এই ভয়ঙ্কর দুঃখের আঘাত সে সহজভাবে গ্রহণ করবে না কেন—সবই ত এখন চুকে-বুকে গেছে। এবং ওই বেজন্মারা ঠিকই বলেছে—গরীব সে এসেছিল, এখন গরীব সে চলে যাচ্ছে। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা, মনে সে বড় আঘাত পেয়েছে তাই ত এই অবস্থা সে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হল। তার নামে এই সম্পত্তি লিখে না দেওয়ার অর্থই হল, ফ্রানকয়েসও হয় ত এমনটাই চেয়েছিল—তাই এখনি কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা থেকে সে বিরত হল। এবং হাঁটতে হাঁটতে আবার যখন তার মনে রাগ জ্বলে উঠল, তখন সে শপথ করল, বুতোদের নামে মামলা করবে এবং সাধারণ আইন অনুযায়ী অর্ধেক আদায় করে নেবে। এভাবে তাকে উলঙ্গ করে সব

কিছু আত্মসাৎ করার জন্য সে ওদের এক হাত দেখে নেবে।

সামনে তাকাল জাঁ এবং লা বর্ডেরির খামারের ধারে নিজেকে দেখে অবাক হল। বুঝতে না পেরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মাথা গুঁজবার জন্য এই খামারে চলে এসেছে। এবং এটাও সত্যি সে যদি এই জেলা ছেড়ে চলে না যেতে চায় তবে এটাই তার সুনিশ্চিত আস্তানা হবে···এখানে সে কাজ পাবে, থাকবার জায়গাও পাবে। তার সম্পর্কে হোরদিকুইন সবসময় উচ্চ ধারণা পোষণ করে···সে নিশ্চয় তাকে সাদরে গ্রহণ করবে।

কিন্তু জ্যাকুলিনকে উঠোনময় পাগলের মতন ছুটোছুটি করতে দেখে জাঁ মনে মনে শঙ্কিত হল। এগারটা বাজল। অথচ সে যেন একটা ভয়ানক আকস্মিক দুর্ঘটনার মধ্যে এসে হাজির হয়েছে। সকালবেলায় দোতলা থেকে নীচে নামতেই জ্যাকুলিন দেখল, সিঁড়ির নীচে ফাঁদ-দরজাটা বিশ্রীভাবে খোলা রয়েছে··· নীচে চোর-কুঠরিতে যাওয়ার ওটাই দরজা এবং বেশ বিপজ্জনক স্থানে বসানো। নীচে হোরদিকুইনের মৃতদেহ লুটিয়ে রয়েছে···সিঁড়ির ধাপের উপর আছড়ে পড়ায় তার মেরুদণ্ড চুরমার হয়ে গেছে। জ্যাকুলিন চিৎকার করে উঠল, সব মরদরা উপরে ছুটে এল···সারা খামার ভয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল। এখন খাবার ঘরে গদির উপর খামার-মালিকের দেহ রয়েছে শোয়ানো···জ্যাকুলিন রান্নাঘরে বসে আছে। তার সারা দেহ আলুথালু, মুখের ভাব বিকৃত এবং দু'চোখ শুকনো।

যেমনি জাঁ ভিতরে এল অমনি সে কথা বলতে সুরু করল···যেন এমনিভাবে রুদ্ধস্বরে কথা বলে সে সান্ত্বনা লাভ করতে চায়।

'অনেকবার ওকে বলেছিলাম! চেয়েছিলাম ওই ফাঁদ-দরজাটা ওখান থেকে সরাতে। কিন্তু কে ওই দরজাটা খুলে রেখেছিল? কিন্তু মনে আছে, কাল রাতে যখন উপরে আসি তখন ওটা বন্ধই ছিল। তাই ত সকাল থেকেই মগজ হাতড়ে জানতে চাইছি কেমন করে এমনটা ঘটল।'

এই দুর্ঘটনার কাহিনী শুনে জাঁ দারুণ ভয় পেয়েছিল, সে জিজ্ঞাসা করল—'আচ্ছা, মালিক কি তোমার আগে নীচে নেমেছিল?'

'হাঁ। তখন সবে ভোর হচ্ছে। ঘুমিয়ে আছি আমি বিছানায়। মনে হল নীচ থেকে কেউ একজন কর্তাকে ডাকছে। হয় ত আমি স্বপ্ন দেখছিলাম। কর্তা প্রায়ই এভাবে বিছানা ছেড়ে উঠে আলো না নিয়ে নীচে নেমে আসত, লোকজনরা যখন জেগে উঠছে তখন তাদের উপর নজর রাখা ছিল কর্তার স্বভাব। ফাঁদ-দরজাটা যে খোলা তা' নজরে না পড়ায় কর্তা নীচে পড়ে গেছে। কিন্তু কে, এখানে এমন কে আছে যে ওই দরজাটা খুলে রেখেছিল? ওহো, আমি এবার মারা পড়ব!'

জাঁয়ের মনে একটা সন্দেহ দেখা দিল কিন্তু এই মুহূর্তে সে মন থেকে সন্দেহটা সরিয়ে রাখল। এই মৃত্যু জ্যাকুলিনের কাছে লাভজনক নয় তাই

তার হতাশা অকপট।

ধীরে ধীরে আওড়াল সঁা—'এটা এক বিয়োগান্ত ঘটনা।'

'ওহো হাঁ, বিয়োগান্ত! আমার কাছে এটা ভয়ানক দুঃখজনক!'

একখানা চেয়ারের ওপর সে ভেঙ্গে পড়ল। বিহ্বল অবস্থা। যেন তার মাথার ওপর ছাদ ভেঙ্গে পড়েছে। সে ঠিক করেছিল, মালিককে সে শেষটায় বিয়ে করবে! আর মালিক শপথ করেওছিল যে, দলিল করে তাকেই সব দিয়ে যাবে! এবং এখন দলিলে স্বাক্ষর করার আগেই সে খতম হয়ে গেল। সে তার মজুরি পাবে না এরপর—মালিকের ছেলে এসে তাকে নির্ঘাৎ লাথি মেরে তাড়াবে কেননা ছেলেটা এর আগেই শপথ করে তাই বলছিল। না, কিছুই পাবে না। খানকয়েক হীরে-জহরতের গহনা আর পোশাক-পরিচ্ছদ …এগুলো সে ব্যবহার করে। ব্যস! এগুলো ছাড়া আর কিছুই তার নিজস্ব বলতে নেই। বড় সাংঘাতিক আর প্রবল আঘাত!

একটা ব্যাপার ভুলে যাওয়ার দরুণ জ্যাকুলিন উল্লেখ করতে ভুলে গিয়েছিল …আগেরদিন সে মেষ-পালক সৌলাসকে বরখাস্ত করার ব্যবস্থা করেছিল। তার অভিযোগ যে সৌলাস বুড়ো হয়ে পড়েছে, কাজকর্মে অনুপযুক্ত। বুড়ো সব সময় তার পিছনে লেগে থাকে আর গোয়েন্দাগিরি করে বলেই জ্যাকুলিন তার উপর রেগে ছিল। যদিও প্রথমটায় এ প্রস্তাবে হোরদিকুইন রাজী হয় নি তবু শেষ পর্যন্ত তাকে মেনে নিতেই হল কেননা সে এখন জ্যাকুলিনের হুকুমের চাকরে পরিণত হয়েছে, সম্পূর্ণভাবে সে পরাজিত। প্রতি রাতে যৌন-আনন্দ উপভোগের জন্য সে এখন এই রমণীর ক্রীতদাস। সৌলাসকে নানারকম সদয় বাক্য এবং শপথ জানিয়ে বিদায় করা হল…কিন্তু সৌলাস সারাক্ষণ একভাবে বিবর্ণ চোখে মালিকের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। তারপর ধীরে ধীরে সে ওই নষ্টা মাগির কীর্তি-কাহিনী বলল এবং জানাল যে এরই জন্য তাকে বরখাস্ত করা হল। একের পর এক সে নাগর জোটায় এবং এখন তার নাগর হচ্ছে ট্রন। এই সর্বশেষ লোকটার কাহিনী এবং খামারের মধ্যে এই যে অপমানজনক নির্লজ্জ নাগরীবৃত্তি চলছে তার কথা সারা জেলার লোক জানে। সবাই বলাবলি করে খামারের মালিক নিত্যনতুন মজুরকে তাড়াতে ভালবাসে। সব শুনে হোরদিকুইন দারুণ উদ্বিগ্ন হল এবং বৃথাই বুড়োকে রাখবার বহু চেষ্টা করল। এ ব্যাপারটায় সে অন্ধকারে থাকতে চায়। সে কিছুই জানতে চায় না কেননা তার মনে বড় ভয় যে, হয়ত সে সব জানলে শেষ পর্যন্ত জ্যাকুলিনকে খামার থেকে তাড়িয়ে দিতে বাধ্য হবে। সামান্য একটা ঘটনাও বাদ না দিয়ে বুড়ো শেষ পর্যন্ত গুছিয়ে সবকিছু বলতে লাগল। বলল, কেমনভাবে সে তাকে হঠাৎ পর-পুরুষের সঙ্গে অশালীন অবস্থায় দেখেছে, তার মনের বহুদিনের সঞ্চিত তিক্ততা এমনিভাবে উজাড় করে দিয়ে বুড়ো খানিকটা সোয়াস্তি লাভ করল। এমনিভাবে তার চরিত্র

প্রকাশ হয়ে পড়বে তা জ্যাকুলিন ভাবতেও পারেনি। হোরদিকুইন ভয়ে মাঠে পালিয়ে গেল কেননা রাগে হয়ত সে জ্যাকুলিনকে গলা টিপে খুন করে ফেলবে এখনি। জ্যাকুলিনকে দেখে রাগ তার মাথায় চড়ে গিয়েছিল। তারপর খামারে ফিরে হোরদিকুইন সোজাসুজি ট্রনকে বরখাস্ত করল···কারণ খামারের উঠোনটা সে নোংরা করে রেখেছে। তখন জ্যাকুলিনের মনে একটা সন্দেহ জেগেছিল···কিন্তু রাখাল-ছোকরাকে রাখবার চেষ্টা করতে তার মনে সাহস হল না। শুধু এইটুকুই ব্যবস্থা করল যে, ছোকরা রাতটুকুর জন্য খামারে থাকবে এবং সকালে গোলমাল মেটাবার সে চেষ্টা করবে। হয়ত শেষ পর্যন্ত বলে-কয়ে জ্যাকুলিন ছোকরার চাকরি বজায় রাখতে পারবে। এবং এখন এই ভয়ানক এবং মারাত্মক আঘাতের পর তার মন থেকে দশ বছরের পরিকল্পনা-মাফিক কাজের ফল নস্যাৎ করে দিল। ছোকরাকে রাখবার কথাটাও তার মন থেকে উবে গেল।

রান্নাঘরে জাঁয়ের সাথে বসেছিল জ্যাকুলিন, এমন সময় ট্রন এসে ঘরে ঢুকল। গতকাল থেকেই ট্রনকে খামারে দেখতে পায়নি জ্যাকুলিন। অন্য খামার-মজুররা উদ্বিগ্ন মনে চারধারে ঘুরছিল, কারো কাজে মন লাগছিল না। লা পারচি থেকে আগত সাদা চামড়ার এই বোকা-সোকা জীবটাকে দেখেই জ্যাকুলিন তীব্রকণ্ঠে চিৎকার করে উঠল। লোকটাকে এমনি বিসদৃশভাবে খামারে ঢুকতে দেখেই জ্যাকুলিনের কাছে সব কিছু জলের মতন পরিষ্কার হয়ে গেল।

'তুই, তুই ফাঁদ-দরজাটা খুলে রেখেছিলি!'

সহসা জ্যাকুলিন স্পষ্ট সবকিছু জানতে পারল···লোকটার মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেল, দু'চোখে পলক পড়ছিল না এবং ঠোঁট দু'খানা কাঁপছিল।

'তুই ফাঁদের দরজা খুলে রেখে কর্তাকে নীচে থেকে ডেকেছিলি যা'তে কর্তা পড়ে যায়।'

এই দৃশ্য দেখে জাঁ ভীত হয়ে উঠল এবং সরে এল। কিন্তু ওরা দু'জনের কেউ তার উপস্থিতিতে শঙ্কিত হল না, তাদের দু'জনেরই মন দারুণ আবেগের উত্তেজনায় ভরে গেল। ট্রন মাথা নীচু করে রুদ্ধস্বরে সবকিছু স্বীকার করল।

'হাঁ, আমি করেছি। কর্তা আমাকে বরখাস্ত করেছিল। আর তোমাকে দেখতে পাব না এবং এই বিচ্ছেদ আমি সহ্য করতেও পারব না। এবং তারপর ভেবে দেখলাম যে কর্তা যদি মারা যায় তবে আমরা দু'জনে একসাথে সুখে থাকতে পারব।'

উত্তেজনায় এবং স্নায়বিক দুর্বলতায় ভরপুর মন নিয়ে জ্যাকুলিন তার কথা শুনছিল।

'কাজটা যখন হয়ে গেল, ভাবলাম তুমি খুব খুশী হয়েছ। তোমাকে ব্যাকুল করতে চাইনি বলে আগে তোমাকে এসব বলি নি। এবং এখন কর্তা মরেছে,

তোমাকে নিতে এসেছি। চল আমরা অন্য কোথাও গিয়ে বিয়ে-থা' করে সুখে থাকব।'

জ্যাকুলিন নিষ্ঠুর গলায় চিৎকার করে উঠল—'তুই! কিন্তু আমি তোকে একটুও ভালবাসি না, তোকে আমি চাই না! তুই আমাকে পাওয়ার জন্যে তাহলে কর্তাকে খুন করেছিস! যা' ভাবছিলাম, এখন দেখছি তুই তার চেয়েও বোকা! কর্তা আমাকে বিয়ে করে উইল করে সম্পত্তি দেওয়ার আগে তুই এক মজার কাণ্ড বাধিয়ে বসলি। তুই আমার ক্ষতি করলি, আমার মুখের অন্ন কেড়ে নিলি। দেখছিস না, আমার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিলি, জানোয়ার কোথাকার। আমার কথা তোর মাথায় ঢুকছে না? আর এখন ভাবছিস, আমি তোর সাথে যাব। এবার আমার দিকে দেখ! ভাবছিস অমনি ভাবে আমার সঙ্গে আর আচরণ করতে পারবি?'

লোকটা হাঁ করে তার কথা শুনছিল, এই অদ্ভুত প্রতিক্রিয়ায় সে বিহ্বল হয়ে পড়েছিল।

'যেহেতু তোর সাথে ভাল ব্যবহার করেছিলাম আর আমরা মজাসে ছিলাম তাই ভাবছিস কি আমি সারা জীবন তোকে সহ্য করব? বিয়ে করব তোকে? ওহো, না। না। কিছুতেই না। মরদ যদি কখনও খুঁজি ত তোর মতন বোকা মরদ খুঁজব না। দূর হ' এখান থেকে, তোকে দেখলে আমার শরীর খারাপ হচ্ছে। তোকে আমি ভালবাসি না, চাই-ও না তোকে। দূর হ'!'

লোকটা রাগে কাঁপছিল। সে কি শুধু-শুধু খুন করল? এই মাগিটা ত তার। ঘাড় ধরে ওই মাগিটাকে সে নিয়ে যাবে।

বলল লোকটা—'তুমি বড় অহঙ্কারী। সবই সমান। তোমাকে যেতেই হবে। যদি না যাও ত মালিকের যেমন অবস্থা করেছি তোমারও তাই করব।'

জ্যাকুলিন ঘুঁষি পাকিয়ে ওর দিকে তেড়ে গেল।

'তাহলে চেষ্টা কর্।'

লোকটা দীর্ঘদেহী, সুগঠিত আর শক্তিমান। আর জ্যাকুলিনের রোগা, ছোটখাট সুন্দর, তন্বী দেহ। কিন্তু তবু লোকটা পিছিয়ে গেল। লোকটা ভয় পেল, কেননা মাগিটার দাঁতগুলো ধারাল, চোখদুটো ইস্পাতের মত ঝকঝকে··· ঠিক যেন চকচকে ছুরির ফলা।

'সব শেষ! এবার দূর হ'। তোর সঙ্গে পালানোর চেয়ে আমি বরং কোন মরদের কাছেই আর শোব না! বেরো! দূর হ'।'

ট্রন পিছোতে লাগল···যেন একটা ভীরু শিকারী জানোয়ার···ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে এবং কৌশলে পরে প্রতিহিংসা গ্রহণের ইচ্ছে গোপন রাখছে! সে ওর দিকে তাকিয়ে বলল:

'মৃতই হোক জীবন্তই হোক, তোমাকে নিয়ে যাবই!'

মার্চ মাসের বর্ষাস্নাত আকাশ-পট। জাঁ রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে সমতল-

ভূমির উপর এসে দাঁড়াল। কিন্তু কিছুই তার চোখে পড়ছিল না। নিজের দুর্ভাগ্য ত ছিলই তার ওপর এই ভয়ানক ঘটনার আঘাত তাকে বিহ্বল করে ফেলল। হোরদিকুইনের দুর্ভাগ্য তার মনে দুঃখ দিল যদিও তার মন নিজের দুর্ভাগ্য এবং উদ্বিগ্নতায় কানায় কানায় ভরা ছিল ··সে আরও জোরে হাঁটতে লাগল। রগনি গ্রামের প্রথম বাড়ীখানার সামনে হাজির হয়ে তবে সে শ্বাস নিতে পারল। মনে মনে সে আওড়াল, মালিকের পাপ তাকে খুন করল। এবং সেই মহাসত্য তার মনের পটে ভেসে উঠল, নারী ছাড়া পুরুষের জীবন আরও সুখের হত। ফ্রানকয়েসের স্মৃতি তার মনে উজ্জ্বল হয়ে উঠল···দুঃখিত হল জাঁ।

তারপর সে ধীরে ধীরে চলতে লাগল···বুঝতে পারছে না এবার সে কোথায় কাজ পাবে। স্ত্রীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য ক্রস এবং কবরখানার কবরের খরচ বাবদ সে ইতিমধ্যে এক শ' সাতাশ ফ্রাঙ্ক থেকে খরচ করেছে। প্রায় অর্ধেক মুদ্রা এখন তার কাছে আছে। ওতে এখন তার সপ্তাহ তিনেকের খরচ চলবে এবং তারপর সে একটা ব্যবস্থা করে নেবে। দৈহিক কষ্টের জন্য সে ভীত নয়। তার একমাত্র ভাবনা মামলা লড়তে হলে সে এখন রগনি ছেড়ে যেতে পারে না। তিনটে বাজল—তারপর চারটে—তারপর বাজল পাঁচটা। প্রত্যেক জায়গায় একই কাহিনী—অর্থ এবং নারী, ওরা মৃত্যু আনে এবং জীবন সৃষ্টি করে। ওরাই যে তার জীবনের দুঃখের মূল একথা বললে বিচিত্র কিছু বলা হবে না। তার পা দু'খানা অক্ষম হয়ে পড়ছে। এতক্ষণে সে বুঝতে পারল যে, তার পেটে এখনও পর্যন্ত কিছু পড়ে নি। গ্রামের দিকেই সে আবার হাঁটতে লাগল। ঠিক করল লেঙ্গাইনের চা-খানায় সে একখানা ঘর নিয়ে থাকবে। গীর্জার চত্বর পার হতেই যে বাড়ী থেকে সকালে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে সেই বাড়ীখানা তার নজরে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে তার মনে জীবনের চাঞ্চল্য জেগে উঠল। ওই বেজন্মাদের কাছে তার প্যাণ্ট আর ওভারকোট ফেলে যাবে কেন? ওগুলো ত তার নিজের, যদি আর একবার লড়াই করতে হয় তবু ওগুলো তার চাই।

রাত বাড়ছে। অন্ধকার ঘোরালো এখন। বুড়ো ফৌআন বাইরের পাথরের বেঞ্চিতে বসেছিল। জাঁ অন্ধকারে বুড়োকে চিনতে পারল না। রান্নাঘরে একটা মোমবাতি জ্বলছে, ও দরজার কাছে হাজির হতেই বুতো ওকে চিনতে পারল এবং তেড়ে এল তার দিকে। পথ আটকে দাঁড়াল।

'হায় ঈশ্বর। আবার তুই এসেছিস! কি চাই তোর?'

'আমার প্যাণ্ট দুটো আর ওভারকোটটা নেব।'

ভীষণ ঝগড়া বাধল। জাঁ একরোখার মতন বলল যে, পোশাকের আলমারি খুলে সে তার পোশাকগুলো বার করে নেবে। বুতো একখানা কাস্তে হাতে নিয়ে শাসাচ্ছিল, ভিতরে ঢোকবার চেষ্টা করলে সে কাস্তে চালিয়ে গলাটা দু' ফাঁক করে দেবে। অবশেষে ভিতর থেকে লিসার কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

'দিয়ে দাও, ওর এই ছেঁড়া পোশাক-টোশাক ত পরবে না, তোমার স্নেহে

রোগ ছড়াবে।'

মরদ দু'জন এবার চুপ করল, জঁা একটু অপেক্ষা করল। ঠিক ওর পিছনে পাথরের বেঞ্চিতে বুড়ো ফোআন ঝিমোচ্ছিল আর স্বপ্ন দেখছিল।

সে মোটা গলায় চেঁচিয়ে উঠল—'তুমি বরং পালাও! ওরা যেভাবে মেয়েটাকে খুন করেছে তেমনিভাবে তোমাকেও খুন করবে।'

সহসা সব কিছু জঁা জলের মতন বুঝতে পারল। ফ্রানকয়েসের মৃত্যু এবং তার একগুঁয়ে নীরবতার অর্থ তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। ইতিমধ্যেই সে খানিকটা সন্দেহ করেছিল এবার আর তার বুঝতে অসুবিধে হল না যে, সে তার পরিবারের লোকদের গিলোটিনে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাল। ভয়ে তার মাথার চুলগুলো খাড়া হয়ে উঠল, সে নড়তেও পারল না কিংবা মুখ দিয়ে কথাও সরল না। সহসা লিসা খোলা দরজা দিয়ে সোজা ওর মুখের উপর প্যাণ্ট আর ওভারকোটটা ছুঁড়ে ফেলে দিল।

'এই নে' তোর নোঙরা জিনিসপত্র! ওগুলো থেকে যা দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে মনে হয় ওতে প্লেগের বীজাণু লেগে রয়েছে!'

পোশাকগুলো কুড়িয়ে নিয়ে সে সরে এল। আবার উঠোন থেকে রাস্তায় নেমেই জঁা ঘুঁষি পাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল—এবং তার একটা কথা অন্ধকার ভেঙে খানখান করে দিল।

'খুনীর দল!'

তারপর অন্ধকারের মধ্যে সে অদৃশ্য হল।

বুতো দারুণ ভয় পেল। বুড়ো ফোআন তন্দ্রার ঘোরে যা বলছিল তা সে শুনেছে—আর জঁা যা' চিৎকার করে বলে গেল তা' তার পেটে বন্দুকের গুলির মতন দৈহিক আঘাত হেনেছে। সে ভেবেছিল, ফ্রানকয়েসের দেহ সমাধিস্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু চুকে গেছে, কিন্তু এখন এই ঘটনাটা কি আবার আইনের আওতায় পড়বে? আজ সকালে যখন সে ফ্রানকয়েসের কবরে মাটি ছড়াতে দেখেছিল তখন সে সোয়াস্তিতে নিঃশ্বাস নিয়েছিল, কিন্তু এখন বুঝতে পারল যে, বুড়ো সব জানে। তাই কি ওদের উপর নজর রাখার জন্যে বুড়ো এখন বোকার ভাণ করছে? বুতো মনে মনে দারুণ ঘাবড়ে গিয়েছিল তাই অসুস্থ হয়ে পড়ল এবং বাড়ীর ভিতরে এসে রাতের খাবার আধ-খাওয়া অবস্থায় ফেলে দিল। লিসাও এসব কথা শুনে ভয়ে কাঁপতে লাগল। সে কিছুই খেতে পারল না।

বাড়ী ফিরে পাওয়ার প্রথম রাতটুকুর স্মৃতি তারা মন্থন করল···বড় ভয়ঙ্কর আর দুঃখজনক রাত। পোশাকের আলমারির সামনে একটা বিছানায় তারা লরা আর জুলিকে শুইয়েছিল···তারাও ঘুমোয় নি, জেগে আছে। আর তাদের বাবা-মা-ও দু'চোখের পাতা এক করতে পারছে না···বিছানায় এ-পাশ ও-পাশ করছে, যেন জলন্ত কয়লার ওপর ওরা শুয়ে আছে। তারপর এক সময়

তারা নীচুগলায় কথা বলতে লাগল। দ্বিতীয়বার শিশুতে পরিণত হওয়ার ফলে বুড়ো আজ তাদের জীবনে কি ভয়ানক একটা বোঝা হয়ে উঠেছে! সে সত্যি তাদের জীবনে সত্যিকারের একটা আপদ এবং তার জন্যে তাদের এত খরচ হচ্ছে যে হাতে একটা কপর্দকও থাকছে না। এটা অবিশ্বাস্য যে, কি পরিমাণ রুটি গেলে বুড়ো এবং কি ভয়ানক লোভী হয়ে উঠেছে, অথচ মাংস খাওয়াতে তাকে সাহায্য করতে হয়, মদ পান করার সময় মদ চলকে পড়ে তার দাড়িতে। এমন নোঙরা চেহারা হয় যে ওকে দেখলে ঘেন্না করে। আর এখন, সবচেয়ে জঘন্য ব্যাপার বুড়ো প্রায় সময় প্যান্টের বোতাম খুলে হাঁটে। প্রায়ই বাচ্চা মেয়েদের সামনে তাকে উলঙ্গ দেখা যায়। বুড়ো জানোয়ারটা একেবারে গোল্লায় গেছে, প্রথম জীবনে যে লোক অপর কারো চেয়ে খারাপ ছিল না আজ শেষ জীবনে তার এই অবস্থা সত্যই বিরক্তিজনক। যেহেতু সে এখন নিজের ইচ্ছেয় মরতে পারছে না তাই ওকে টাঙির আঘাতে খুন করা উচিৎ।

বুতো আওড়াল—এমন অবস্থা বুড়োর যে নিঃশ্বাসের ধাক্কায় পড়ে যাবে! অথচ এখনও ঠিক চলে-ফিরে বেড়াচ্ছে। আমাদের জীবন-পথে বাধা হতে ওর এতটুকু লজ্জা হচ্ছে না। এই নরকের বুড়োগুলো খাটতে পারে না তাই রোজগারও করে না অথচ তোমার ঘাড়ে চেপে বসে থাকবে। কখনও মরবে না।

লিসা চিৎ হয়ে শুয়েছিল, ধীরে ধীরে বলতে লাগল:

'অমঙ্গল বয়ে নিয়ে আবার আমাদের বাড়ী ফিরে এসেছে বুড়ো। ও এখন বেশ আরামে আছে। আবার ওর নতুন জীবন সুরু হবে। ঈশ্বরের কাছে সব সময় প্রার্থনা করছি বুড়ো যেন আর একটা রাত-ও আমাদের বাড়ীতে না কাটায়।'

ওদের কেউ সত্যিকারের উদ্বিগ্নতার কথা বলল না, বলল না ওই ধারণার কথা যে বুড়ো ঘটনাটা জানে এবং নিরীহভাবে সবকিছু প্রকাশ করে দিতে পারে। এটাই হচ্ছে সত্যিকারের ঘটনার সীমা। বুড়োর জন্যে তাদের অর্থ খরচ হচ্ছে, বুড়ো তাদের জীবনে এখন একটা আপদ, চুরিকরা দলিলের সুবিধে ভোগ করা থেকে বুড়ো তাদের বঞ্চিত করছে, এবং বহুদিন ধরে বুড়ো ওই দলিলগুলো তাদের কাছ থেকে সরিয়ে রেখেছিল, কিন্তু এখন ভাবতে হচ্ছে ওর মুখের একটা কথা ওদের গিলোটিনে পাঠাতে পারে। ওহো, না না। এটা বড্ড বেশী হবে। একটা কিছু করতেই হবে।

লিসা সহসা বিছানা ছেড়ে উঠে বলল—'দেখে আসছি বুড়ো ঘুমিয়ে পড়ল কি-না।'

আবার মোমবাতি জ্বালাল লিসা, দেখে নিশ্চিত হল যে, লরা এবং জুলি ঘুমিয়েছে। তারপর বিটের শিকড় রাখা ঘরখানায় গিয়ে ঢুকল। বুড়োর শোবার লোহার খাটখানা আবার ওই ঘরে পাতা হয়েছে। শীতে ঠক্-ঠক্ করে

কাঁপতে কাঁপতে লিসা ফিরে এল। টালির মেঝেতে তার পা-দু'খানা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। সে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল, স্বামীর দিকে সরে গেল। তার স্বামী তার দেহ গরম করার জন্য তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল।

'আচ্ছা?'

'আচ্ছা জান, সে ঘুমোচ্ছে। মাছের মতন হাঁ করে আছে, শ্বাস নিতে পারছে না।'

পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে তারা নিঃশব্দে শুয়ে ছিল, কিন্তু তাদের বুকের নীচে যে চিন্তা কাজ করে চলেছে তা' তারা জানতে পারছিল। যে বুড়োর শ্বাস টানতে কষ্ট হয় তাকে খুব সহজেই ত খতম করে দেওয়া যায়…একখানা রুমাল কিংবা তোমার একটা আঙুল ওর গলায় ঢুকিয়ে দিলেই ও খতম হয়ে যাবে। বাস্তবে তারা বুড়োর একটা মহা উপকার করে দেবে। পরের ঘাড়ে একটা বোঝা হয়ে থাকা কিংবা নিজের কাছে একটা আপদ হওয়ার চেয়ে কি এখন শান্তিতে কবরে ঘুমিয়ে থাকা অধিক ভাল নয়?

বুতো লিসাকে আরও জোরে বুকের কাছে জড়িয়ে ধরল। এখন ওদের দু'জনেরই দেহ গরম হয়ে উঠেছে…যেন একটা ইচ্ছায় তাদের দেহের রক্ত গরম হয়ে উঠেছে। সহসা বুতো বউকে ছেড়ে লাফিয়ে মেঝেয় নামল।

'আমিও গিয়ে একবার দেখে আসি।'

মোমবাতিটা হাতে নিয়ে খালি পায়ে বুতো অদৃশ্য হয়ে গেল। আর লিসা অন্ধকারে দু'চোখ মেলে শ্বাসরোধ করে শুনতে লাগল। মিনিটের পর মিনিট কেটে গেল কিন্তু পাশের ঘর থেকে কোন শব্দ ভেসে এল না। অবশেষে সে শুনতে পেল মোমবাতি রেখে এঘরে আসছে বুতো। শুনল, সে নরম পায়ে মেঝের উপর হাঁটছে এবং সে এত উত্তেজিত হয়ে উঠেছে যে, সে তার ভারি নিঃশ্বাস-পতনের শব্দ বন্ধ করতে পারছে না। তারপর সে বিছানার ধারে এল, হাত বুলিয়ে লিসার দেহ স্পর্শ করল এবং তার কানে কানে বলল:

'তোমাকে আসতেই হবে। একা আমার সাহস হচ্ছে না।'

লিসা তাকে অনুসরণ করে হাত বাড়িয়ে হাঁটতে লাগল পাছে জিনিসপত্রের সঙ্গে তার ধাক্কা লাগে। আর তাদের শীত করছে না, তবে রাতের পোশাকে তাদের কাজের ব্যাঘাত হচ্ছে। বুড়োর ঘরের এক কোণায় মেঝেতে মোমবাতিটা জ্বলছে। স্বল্প আলোকেও তাদের চোখে পড়ছে, বুড়ো হাঁ করে চিৎ হয়ে ঘুমোচ্ছে আর তার মাথাটা বালিশ থেকে গড়িয়ে পড়েছে। বয়সের ভারে বুড়োর দেহ এমন শক্ত আর শুকিয়ে গেছে যে, এই যন্ত্রণাদায়ক শ্বাস-কষ্টের আওয়াজ তার হাঁ-করা মুখ থেকে যদি বেরিয়ে না আসত তবে মনে হত বুড়ো সত্যি সত্যি মারা গেছে। তার দাঁতগুলো পড়ে গেছে, দু'ঠোঁটের মাঝখানে এখন তাই শুধু একটা অন্ধকার গর্ত। ওরা দু'জনে নীচু হয়ে দেখতে চেষ্টা করল যে, ওই অতল অন্ধকারের নীচে জীবনের অস্তিত্ব আছে কি-না!

পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ওরা অনেকক্ষণ ধরে দেখতে লাগল, ওদের জানুতে জানুতে ঠোকাঠুকি হচ্ছে। কিন্তু ওদের হাত দু'খানা এখন বড় দুর্বল। একটা কিছু তুলে নিয়ে ওই গর্তটা বুজিয়ে দেওয়া কত সহজ কাজ তবু এই মুহূর্তে ওদের কাছে কাজটা কত কঠিন! সরে গেল ওরা, আবার ফিরে এল। ওদের জিভ শুকিয়ে গেছে, একটা কথাও বলতে পারছে না···শুধু ওদের চোখে ভাবার ইঙ্গিত। চোখের ইসারায় ওরা বালিশটা দেখাল। চলে এস তাহলে, আর দেরী করছে কেন বুতো? লিসাকে ঠেলে সরিয়ে নিজের জায়গায় আসার সময় বুতোর চোখের পাতা কেঁপে উঠল। সহসা দারুণ উত্তেজনায় লিসা বালিশটা তুলে নিয়ে বুড়োর মুখের উপর চেপে ধরল সজোরে।

'রক্তখেগো ভীতু কোথাকার! মেয়েমানুষরা সব সময় তোমার হয়ে কাজ করে দেবে?'

তখন বুতো ছুটে গেল আর বালিশটা খুব জোরে চেপে ধরল। লিসা বিছানায় উঠে পাছা চেপে বসল···তার উলঙ্গ পাছার ভার পড়ল বালিশের ওপর। ওরা দু'জনেই তখন উন্মত্ত। দু'হাতের মুঠো দিয়ে, কাঁধ আর জানু দিয়ে ওরা ঠেসে ধরল। বুড়োর দেহ কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। একটা স্প্রিঙ ভাঙ্গার মতন বুড়োর পা-দু'খানা সশব্দে সোজা হয়ে গেল। ঘাসের উপর যেমন মাছ আছড়ায় তেমনিভাবে বুড়োর দেহটা লাফিয়ে উঠল। কিন্তু এমন আক্ষেপ বেশীক্ষণ বজায় রইল না। ওরা বড় কড়া হাতে বুড়োকে ঠেসে ধরেছিল, ওরা অনুভব করল প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বুড়োর দেহ পাত হয়ে গেল। অনেকক্ষণ ধরে কাঁপতে লাগল দেহটা···সেই শেষ আক্ষেপ, তারপর আর কিছুই নয়। সব শেষ। একখানা কাপড়ের মতন বুড়োর দেহ পাত হয়ে পড়ে রইল।

বুতো হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—'ব্যস! মনে হয় শেষ হয়ে গেছে!'

লিসা তখনও বিছানার উপর গুটিশুটি হয়ে বসেছিল, সে আর লাফাচ্ছে না···বুড়োর দেহে এখনও প্রাণ আছে কি-না দেখবার জন্যে সে বসে আছে।

'ব্যস! সব শেষ হয়ে গেছে!'

সে বিছানা থেকে লাফিয়ে পড়ল, তার রাত-পোশাকটা পাছার উপর গুটিয়ে রয়েছে। বুড়োর মুখ থেকে সে বালিশটা তুলল। কিন্তু ভয়ে আর্তনাদ করে উঠল।

'হায় ঈশ্বর, ওর সারা মুখ কালো হয়ে গেছে। আমরা এবার গেলাম!'

বুড়ো নিজেই নিজের এ অবস্থা করেছে বলা অসম্ভব। তারা পাগলের মতন হয়ে বুড়োকে এমনভাবে খুন করেছে যে, বুড়োর নাকটা মুখের ওপর ভেঙ্গে উল্টে গেছে, মুখখানা হয়েছে কালচে-গোলাপী আর সারা দেহের রঙ হয়েছে নিগ্রোদের মতন কালো। মুহূর্তের জন্য মনে হল, ওদের পায়ের নীচে মাটি কাঁপছে। ওরা শুনতে পাচ্ছে পুলিশ ছুটে আসছে, জেলখানার শিকলে ঝনঝন

আওয়াজ হচ্ছে আর নামছে গিলোটিনের ধারালো অস্ত্রখানা। এমন বিশ্রীভাবে কাজটা করার জন্য ওরা ভয়ে মূহ্যমান হয়ে পড়ল। এখন এটাকে তারা কি করে মানানসই করে তুলবে? ওর সারা দেহ এখন সাবান মাখিয়ে ধুলেও ওর দেহ আর কখনও সাদা হবে না।

তার মুখমণ্ডলের কালি-মাখানো অবস্থা দেখে ওদের মনে দৈহিক যন্ত্রণা দেখা দিল।

কিন্তু তারপর ওদের মনে একটা মতলব দেখা দিল।

লিসা আওড়াল—'আমরা ওর দেহে আগুন ধরিয়ে দিতে পারি ত!'

বুতো তাই শুনে সোয়াস্তি পেল এবং গভীর শ্বাস নিল।

'ঠিক ত! আমরা বলতে পারব যে, ও নিজেই এ কাজ করেছে!'

তারপর দলিলের কথাটা মনে হতেই সে খুশিতে হাততালি দিল এবং জয়ের হাসিতে তার সারা মুখে আলো ছড়াল।

'হায় ঈশ্বর! হাঁ! ওর সঙ্গে ও দলিলখানাও পুড়িয়েছে। তখন আর কাউকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে না।'

বুতো সঙ্গে সঙ্গে মোমবাতি খুঁজতে গেল। কিন্তু লিসা ভয় পেল, এতে সারা বাড়ীতে আগুন ধরে যেতে পারে। তাই প্রথমে তাকে বিছানার কাছে মোমবাতি আনতে নিষেধ করল। ঘরের এক কোণে বিটের শিকড়ের সাথে কয়েক আঁটি খড় রাখা ছিল, লিসা এক আঁটি খড় এনে তাতে আগুন ধরালো। তারপর সেই আগুনে বুড়োর সাদা চুল আর লম্বা দাড়ি পুড়িয়ে দিল। চর্বি পোড়ার গন্ধ, পট্‌-পট্‌ শব্দ আর হলদেটে আলোয় ঘর ভরে গেল। সহসা ওরা সভয়ে লাফিয়ে সরে এল যেন বরফ-ঠাণ্ডা হাতে কেউ ওদের চুলের মুঠি চেপে ধরেছে। ওদের বাবার সম্পূর্ণ শ্বাস রোধ হয় নি, পোড়ার ভয়ানক যন্ত্রণায় বুড়ো চোখ মেলে তাকাল এবং ভয়ালো ভাঙ্গা নাক ও পোড়া দাড়ি-সহ কালো মুখোশ মুখে দুটো চোখ মেলে তাকাল। তাকাল ওদের দিকে। তার মুখে ফুটে ওঠা যন্ত্রণা ও ঘৃণার ভাব হয়ে উঠল ভয়ঙ্কর ভীতিজনক, তারপর তার মুখখানা পাত হয়ে গেল। অবশেষে বুড়ো ফোঁআন মরল।

বুতো ভয়ে বুনো জানোয়ারের মতন হয়ে গর্জে উঠল এবং দরজার কাছে ফুঁপিয়ে কান্নার আওয়াজ শুনল। শোবার ঘরের দরজা দিয়ে জ্বলন্ত আগুন দেখে আর গোলমাল শুনে লরা আর জুলি জেগে উঠে এসেছে···রাতের পোশাক ওদের পরণে। ওই ছেলেমেয়ে দুটোই কাঁদছিল। তারা সব দেখেছে। এখন ভয়ে তারা কান্না জুড়ে দিয়েছে।

তাদের দিকে তেড়ে গিয়ে বুতো চীৎকার করে উঠল—'রক্তখেগো পোকা কোথাকার! একটা কথাও যদি বলবি ত গলা টিপে মেরে ফেলব। কথাটা মনে রাখবি।'

বুতো তাদের মারতে মারতে ফেলে দিল। একটা শব্দও তারা করল না।

উঠে ছুটে পালাল নিজেদের বিছানায় এবং জড়াজড়ি করে শুয়ে পড়ল।

এবার কাজটা শেষ করতে চাইল বুতো…তার বউ বলা সত্ত্বেও সে বিছানার খানিক অংশ আগুনে পুড়িয়ে দিল। সৌভাগ্যবশত ঘরখানা বড় স্যাঁতস্তেতে তাই খড়ের আঁটি ধীরে ধীরে জ্বলতে লাগল। গাঢ় ধোঁয়া উঠছিল। শ্বাস রোধ হয়ে আসছে ওদের তাই ওরা ঘরের স্কাইলাইট খুলে দিল। তারপর আগুনের শিখা জ্বলে উঠল…আগুন ছাদ পর্যন্ত লেলিহান হয়ে উঠল। ওদের পিতার পোড়া দেহে পট্-পট্ শব্দ হচ্ছিল এবং মাংস পোড়ার গন্ধ তীব্র হল। খড়ের আঁটি আবার নিভে গেল এবং ধোঁয়া উঠছিল…নইলে ওদের এই পুরোন বাড়ীখানা খড়ের গাদার মতন পুড়ে ছাই হয়ে যেত। পোড়া মাংস গলে আগুন নিভে গেল। লোহার খাটিয়ায় কেবল আধ-পোড়া কালো ও বিকৃত মৃতদেহটা রইল পড়ে। এখন আর দেখলে বুড়ো ফৌআনের দেহ বলে চেনা যায় না। বিছানার একটা দিক এখনও আগুন স্পর্শ করে নি এবং চাদরের কোণ ঝুলছে।

আগুনের এমন তীব্র তাত, কিন্তু তবু লিসার দেহ কাঁপছে, সে বলল—'চল, এবার চলে যাই আমরা!'

বুতো জবাব দিল—'দাঁড়াও! জিনিস-পত্রগুলো একটু গুছিয়ে রাখি!'

বিছানার ধারে সে একখানা আসন পাতল, বুড়োর মোমবাতিটা রাখল তার ওপর। এক পাশে এমনভাবে শুইয়ে রাখল যেন মনে হয় জ্বলন্ত বাতিটা কাৎ হয়ে বিছানায় পড়ে গেছে। সে খুব ধড়িবাজ তাই খানকয়েক কাগজের টুকরো মেঝের ওপর পোড়াল। তাহলে এখানে ছাই পড়ে থাকবে এবং সে বলতে পারবে যে, কাল দলিলখানা খুঁজে পেয়ে বুড়ো নিজের কাছেই রেখে দিয়েছিল।

'ব্যস! সব কাজ শেষ। চল, এবার শুতে যাই।'

বুতো আর লিসা তাড়াতাড়ি এ ঘরে এসে বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু বিছানার চাদর বরফের মতন ঠাণ্ডা…তাই ওরা দেহ গরম করার জন্যে পরস্পরকে গভীর আশ্লেষে জড়িয়ে ধরল। ওরা ঘুমিয়ে পড়ার আগেই ভোর হল। ওদের মুখে কোন কথা ছিল না। কাঁপছিল এবং নিজেদের বুকের শব্দ শুনতে পাচ্ছিল। সজোরে বুক ঢিপ্-ঢিপ্ করছে। পাশের ঘরের দোরটা হুাট করে খোলা, আর এর জন্যেই তারা উদ্বিগ্ন হচ্ছে বেশী। কিন্তু উঠে গিয়ে দরজা বন্ধ করতে তাদের ভয় হচ্ছে। অবশেষে অমনিভাবে জড়াজড়ি করে শুয়ে তারা ঘুমিয়ে পড়ল।

সকাল বেলায় বুতোর সাহায্যের আবেদন শুনে পাড়া-প্রতিবেশীরা সবাই ছুটে এল। ফ্রিমাতের বউ আর অন্য বৌ-ঝিরা কাৎ হয়ে পড়া মোমবাতিটা দেখল। দেখল বিছানাটার অর্ধেক পুড়েছে আর কাগজ-পত্র ছাই হয়ে গেছে। তারা আর্তনাদ করে উঠল, এমনটা যে একদিন ঘটবে তা' তারা শতবার বলেছে, কেননা বুড়োর ভীমরতি ধরেছিল। ভাগ্যি ভাল যে সারা বাড়ীখানা আগুন

লেগে পুড়ে যায় নি!

৬

দুটো দিন পার হয়েছে। আজ সকালে বুড়ো ফৌআনকে কবর দেওয়া হবে। জঁা এখনও লেঙ্গাইনের কফিখানায় থাকে। সারা রাত জেগে থাকার দরুণ আজ সকালে ঘুম থেকে উঠতে তার খুব দেরী হয়ে গেছে। শাটোতুনে এখনও তার মামলা রুজু করতে যাওয়া হয় নি। অথচ এই কাজের জন্যই সে এতদিন রগনি গ্রামে রয়েছে। প্রতি সন্ধ্যায় ভাবে, আসছে কাল সকালে সব ব্যবস্থা করবে এবং যেহেতু দিন দিন মনের রাগ পড়ে যাচ্ছে তাই সে ইতঃস্তত করছে। মনের মধ্যে শেষ লড়াই চলছে তাই সে সারা রাত ঘুমোতে পারে না, জ্বরতপ্ত দেহে শুয়ে থাকে···কি স্থির করবে তা সে জানে না।

বুতোরা হচ্ছে খুনী জানোয়ার, সৎ লোকের উচিৎ তাদের মাথা কেটে ফেলা। যখন শুনল যে বুড়ো ফৌআন মারা গেছে তখন এই জঘন্য কাজের কারণ সে স্পষ্ট বুঝতে পারল। বুড়ো যাতে সব কথা প্রকাশ করতে না পারে তাই ওই ঘুমন্ত বুড়োকে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছে। ফ্রানকয়েসকে খুন করার পর তারা বুড়ো ফৌআনকে খুন করতে বাধ্য হয়েছে। এবার কার পালা? বুঝতে পারল সে, এবার তার পালা। ওরা ঠিক অনুমান করেছে যে, সে গোপন কথা সব জানে। এ জেলায় সে যদি থাকে তবে কোনও নির্জন জায়গায় ওরা তাকে নির্ঘাৎ গুলি করে হত্যা করবে, কাজেই এখনি সে কেন তাদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করছে না? সে তাই করবে ঠিক করল। আজ উঠেই পুলিশের কাছে গিয়ে সব কিছু খুলে বলবে। কিন্তু এই এত বড় মামলায় সাক্ষী হবার কথা ভাবতেই তার মনে স্নায়বিক দুর্বলতা দেখা দিল। ওই অপরাধীদের মতন তাকেও হয়ত বহু ঝঞ্ঝাট সহ্য করতে হবে। নিজের জন্য আরও বিপদ ডেকে এনে লাভ কি হবে? এটা খুব সাহসের কথা হচ্ছে না ঠিকই তবে কিছু না প্রকাশ করে সে বরং তার স্ত্রীর শেষ ইচ্ছাই পূরণ করছে। রাতের বেলায় বার কুড়ি সে মনে মনে ঠিক করল যে, এগিয়ে যাবে তারপর স্থির করল যাবে না··· এবং এই যে সে তার কর্তব্য করছে না এই চিন্তাই তাকে বিহ্বল করল।

তারপর বেলা ন'টার সময় জঁা বিছানা ছেড়ে উঠল এবং ঠাণ্ডা জলে মাথা ধুয়ে ফেলল। সহসা সে একটা স্থির সিদ্ধান্তে এল···সে কিছুই প্রকাশ করবে না। এমন কি আসবাব-পত্রের অর্ধেক পাওয়ার জন্যও সে মামলা করবে না। এটা এমন কিছু মূল্যবান নয়। তার ফিরে পাওয়া মনের অহঙ্কার তার বিশ্বাসকে দৃঢ় করল এবং সে খুশি হল এই ভেবে যে, এই দুষ্ট পরিবারের সে একজন মানুষ নয়। সে আনন্দিত কারণ সে একজন বিদেশী। এরা যদি পরস্পরের সাথে লড়াই করে নিজেদের ধ্বংস করে ফেলে তবে সংসার এদের হাত থেকে মুক্তি পাবে। একটিমাত্র দম্পতিকে অনুসরণ করে কি লাভ যখন সমস্ত বংশকে

নির্মূল করাই প্রয়োজন? চলে যাওয়াই তার কাছে সমীচিন বলে মনে হল।

ঠিক তখনই খবরের কাগজের একখানা পাতায় জাঁয়ের নজর আটকে গেল···কাগজখানা কাল সে কফিখানা থেকে এনেছিল। আসন্ন যুদ্ধ সম্বন্ধে একটা লেখা তার মনে আগ্রহ সৃষ্টি করেছিল···আর এই যুদ্ধ সম্পর্কে চারধারে নানা ধরনের গুজব ছড়িয়ে পড়ছে কয়েক দিন ধরে। সে বুঝতে পারে নি যে, এতদিন ধরে যে ইচ্ছেটা তার মনের মধ্যে অচেতনভাবে বিরাজ করছিল তা' এই যুদ্ধের খবরে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে এবং সেই ইচ্ছেটা তার মনের মধ্যে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে তাই এই যে এখান ছেড়ে চলে যাওয়ার শেষ-ইচ্ছেটা কেমন করে দেখা দিল তা' সে বুঝতে পারছিল না, বুঝতে পারছিল না কোথায় যাবে···এবার ইচ্ছের প্রচণ্ড বাতাসে সে যেন উড়ে চলল। হাঁ, সে যুদ্ধে যাবে, আবার সে সেনাবাহিনীতে যোগ দেবে। এখানকার লোকেরা বড় বদমায়েস, জনা কয়েক প্রুসিয়ানকে হত্যা করার কল্পনা তার মনে সোয়াস্তি দিল। যেহেতু এই জেলায় সে শান্তির সন্ধান পায় নি, তাই সে আবার কষাইখানায় ফিরে যাবে কেননা এখানে একই পরিবারের মানুষরা পরস্পরের রক্ত শোষণ করে পান করে।

নীচ তলায় নেমে এসে জাঁ দুটো ডিম আর এক টুকরো গো-মাংস খেল। তারপর লেঙ্গাইনকে ডেকে তার পাওনা মিটিয়ে দিল।

'তুমি কি চলে যাচ্ছ, করপোরাল?'

'হাঁ।'

'আর ফিরে আসবে না?'

'না।'

কফিখানার মালিক অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল, নিজের ভাবনা সে নিজের মনেই রাখল। তাহলে নিজের অধিকার ছেড়ে যাচ্ছে যখন তাহলে লোকটা কি বোকা?

'এবার তুমি কি করবে? আবার কি ছুতোরের কাজ করবে?'

'না, সেনা-বাহিনীতে যোগ দিচ্ছি।'

কাফিখানার মালিক এত অবাক হয়ে গিয়েছিল যে ঘৃণাপূর্ণ হাসি না হেসে পারল না। লোকটা একেবারে আধ-পাগলা!

ইতিমধ্যে ক্লয়েসের পথেই হাঁটছিল জাঁ, কিন্তু ভালবাসার অন্তিম আকর্ষণে সে থামল এবং আবার চড়াইয়ের পথ বেয়ে উঠতে লাগল। ফ্রানকয়েসের সমাধিতে শেষ বিদায় না জানিয়ে সে রগনি গ্রাম ছাড়তে পারে না। আরও একটা ব্যাপার আছে···দীর্ঘক্ষণ ধরে একক পরিশ্রমের মাধ্যমে যে বিশাল শান্ত চাষ-ভূমিকে সে প্রাণভরে ভালবেসেছে তাকে একবার শেষ দেখা দেখে নেবে।

কবরখানার সারির মাঝ বরাবর ফ্রানকয়েসের সমাধি। সে সেখানটায় দাঁড়াল। ওরই পাশে বুড়ো ফৌআনের জন্যে কবর খোঁড়া হয়েছে। কবর-

খানাটা ঝোপ-জঙ্গলে ভরা। কবরখানা পরিষ্কার রাখার জন্যে পঞ্চাশ ফ্রাঙ্ক করে দেওয়া হয়, কিন্তু স্থানীয় সংস্থার কেউ এদিক মাড়ায় না। মরচেধরা ক্রস আর রেলিঙ দাঁড় করানোই রয়েছে, দু' চারখানা পাথরের ওপর মরচে ঝরে ঝরে জমেছে। কিন্তু এই পরিত্যক্ত ভূমিখণ্ডের নির্জনতা ও অপরিমিত প্রশান্তি তাকে আকর্ষণীয় করে রেখেছে, মাঝে মাঝে শুধু গীর্জার চূড়ায় চক্রাকারে উড্ডীয়মান বুড়ো কাকগুলোর ডাক এ জায়গার নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে খানখান করে দিচ্ছে। মৃত্যুর প্রশান্তি সম্পর্কে জাঁ অবহিত। সে তাকিয়েছিল বিশাল চাষ-ভূমির পানে—ওখানে বীজ থেকে অঙ্কুর মাথা তুলছে, সৃষ্টি করছে জীবনের স্পন্দন। তারপর গীর্জার ঘণ্টাটা ধীরে ধীরে বাজতে লাগল—প্রথমে তিনবার তারপর দু'বার—তারপর সবগুলো একসঙ্গে বাজতে লাগল। ফৌআনের মৃতদেহ ওরা কবরখানায় বয়ে আনছে।

কবরখানার মানুষটা—বাঁকা দু'খানা পা, সকলের আগে সে লাফাতে লাফাতে এল এবং কবরের দিকে তাকাল।

জাঁ নিজে বিচলিত হয়ে পড়েছিল। সে অন্ত্যেষ্টি দেখবার জন্যে দাঁড়াল। বলল—'কবরটা বড় ছোট খুঁড়েছ!'

খোঁড়া লোকটা জবাব দিল—'নিজেকে পোড়ান'র ফলে ওর দেহ কুঁকড়ে গেছে।'

বড় তাড়াতাড়ি হলেও এটা গাম্ভীর্যপূর্ণ মিলন-সভা। শেষ হল সভা। হাতে হাতে সবাই জল ছিটোল। শোক-সভা যাত্রা গঠিত হল। একজন ক্রস ঘাড়ে করল, গায়ক-ছোকরা ক্লউ তার শিঙা বাজাতে শুরু করল, মোটাসোটা যাজক তাড়াতাড়িতে হাঁপাচ্ছিলেন, চারজন চাষী বহন করছিল কফিনটা, তার পর হাঁটছিল পরিবারের লোকেরা এবং সবশেষে অন্যান্যরা। বেকু আবার এত জোরে জোরে ঘণ্টাটা বাজাতে লাগল যে, কাকগুলো গীর্জার মাথা থেকে উড়তে উড়তে সভয়ে ডাকতে সুরু করল। অল্পক্ষণের মধ্যেই শোভাযাত্রা কবরখানায় হাজির হল—গীর্জার চত্বরের কোণ ঘুরতেই ত কবরখানা। চারধারে গভীর প্রশান্তি। কুয়াশার আবরণ ভেদ করে রোদ ছড়িয়ে পড়েছে। সঙ্গীতের সুর ধীরে ধীরে উচ্চগ্রামে উঠল। সহসা ছোট্ট কফিনটা দেখা গেল। প্রত্যেকটা মানুষ অবাক হল। জাঁ-ও দাঁড়িয়েছিল, তার মন ভেঙ্গে গেল। হায় হতভাগ্য বৃদ্ধ! বয়সের ভারে দীর্ণ, জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে জীর্ণ, তাই বোধ হয় ওই খেলনার বাক্সের মত ছোট্ট কফিনে ওর দেহটা ধরেছে। সে আরামে শুয়ে আছে। সে বেশী জায়গা নেবে না, এই মাটির বুকে সে ভার-স্বরূপ হবে না—অথচ যতদিন তার মাংসপেশী সবল ছিল তত দিন এই মাটি ছিল তার আবেগের আধার—সে মাটিকে উপভোগ করেছে। খনিত কবরের ধারে মৃতদেহ পৌছল। জাঁয়ের দৃষ্টি অনুসরণ করছিল ওই শবাধার—এবার তার দৃষ্টি প্রাচীর ছাড়িয়ে লোজ্ঞা বসি উপত্যকার বুকে ছড়িয়ে পড়ল, একখানার পর একখানা চাষ-

জমি ওখানে ছড়ানো। বহু দূরে তার নজরে পড়ল বীজ-বপনকারীরা বীজ বুনছে। জীবন্ত বীজের দানা যেভাবে বিস্ফারিত সীতামুখে ঢালা হয় তেমনিভাবে ওরাও দেহকে দোলাচ্ছে অবিরাম।

জাঁকে দেখতে পেল বুতো, তাদের দৃষ্টি বিনিময় হল। দৃষ্টিতে উদ্বিগ্ন ভাব। ওই হতভাগা বেজন্মাটা কি একটা গোলমাল পাকাবার জন্যে এখানে অপেক্ষা করছে না কি? যতদিন ধরে ওই লোকটা রগনি গ্রামে থাকবে তারা শান্তিতে ঘুমোতে পারবে না। ক্রস-বাহক কবরের পায়ের দিকে ক্রস-খানা পুঁতে রাখল। যাজক এ্যাবি গডার্ড ক্রসখানার দিকে দাঁড়িয়ে শেষ প্রার্থনা উচ্চারণ করলেন। কিন্তু যখন এখানে দেরীতে আসা ম্যাকেরণ আর লেঙ্গাইন ব্যাকুল দৃষ্টিতে চাষ-ভূমির দিকে তাকাতে লাগল তখন প্রত্যেকের মন বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ল। তারা সবাই তাকাল ওই দিকে—বিশাল ধোঁয়ার কুণ্ডলি উঠছে আকাশে। নিশ্চয় ওই ধোঁয়া লা বর্ডেরির দিক থেকে আসছে। মনে হচ্ছে খড়ের গাদার আড়ালে খামার-বাড়ীতে আগুন লেগেছে।

যাজক সভয়ে বলতে লাগলেন—'শান্তি, শান্তি—'

সব মুখগুলো আবার তাঁর দিকে ফিরল, দৃষ্টি নিবদ্ধ হল মৃতদেহের দিকে।

গায়ক ছোকরা পবিত্র জল আনছিল, সজোরে বলল—'স্বস্তি! স্বস্তি!'

এ্যাবি গডার্ড তৎক্ষণাৎ তাঁর রাগত-কণ্ঠে বলতে লাগলেন:

'হে যাত্রী, তোমার পদযুগল শান্ত হোক—।'

তিনি যখন প্রার্থনা করছিলেন তখন যেসাস ক্রাইস্ট এসে হাজির হল। ফ্যানিকে এক ধারে ডেকে নিয়ে গিয়ে সে বুতোকে ভয়ানকভাবে আক্রমণ করে কথা বলতে লাগল।

'সেদিন যদি ওভাবে মদ খেয়ে মাতাল না হতাম। কিন্তু এভাবে আমাদের সর্বস্ব লুটে নেওয়া খুবই অন্যায়!'

ফ্যানি আওড়াল—'আমরা সত্যিই লুণ্ঠিত হয়েছি!'

যেসাস ক্রাইস্ট বলতে লাগল—'ওই বেজন্মাদের কাছেই দলিল আছে, অনেকদিন ধরে ওরা টাকা পাচ্ছে। জানি, বুড়ো সসিসের সাথে ওরা একটা চুক্তি করে নিয়েছে। হায় ঈশ্বর, এর জন্যে আমরা ওদের আদালতে টেনে নিয়ে যেতে পারি না?'

ফ্যানি সরে গেল এবং দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করল।

'ওহো, না না। আমি মামলা-টামলা করব না। আমার নিজের অনেক কাজ আছে করবার। তোমার ইচ্ছে হলে মামলা করতে পার।'

ভয় আর সহিষ্ণুতায় মুখ ভ্যাঙ্গাল যেসাস ক্রাইস্ট···বোনকে সে মামলায় ঠেলে দিতে পারল না আবার আদালতের সঙ্গে তার নিজের সম্পর্কও ভাল নয়।

'বেশ ভাল, প্রত্যেকেই আমাকে খারাপ ভাবে। আমি ওসব গ্রাহ্য করি না। সৎ লোক তার পুরস্কার পাবেই। সে তার মাথা উঁচ করেই চলবে।

গ্রাণ্ডির বউ তার কথা শুনছিল, সে সোজাসুজি গম্ভীরভাবে আর সাহসের সঙ্গে তার দিকে তাকাল। তাই ত গ্রাণ্ডির বউ প্রায়ই বলে, ছেলেটা বদমাইস হলেও খুব সরল। তার জন্যে সে দুঃখিত হল। এমন একটা বলিষ্ঠ ছোকরা নিজের ভাগ আদায়ের জন্য ভাইয়ের সঙ্গে লড়াই করছে না কেন! তার এবং ফ্যানির সম্পর্কে গ্রাণ্ডির বউ নিজের ধারণার কথা বার বার বলা শপথের মতন আবার আওড়াল, যেন কথাগুলো শূন্য থেকে ভেসে আসছে।

- 'ওহে, তোমরা নিশ্চিত থাকতে পার আমি কারো ক্ষতি করব না। উইল ঠিকই আছে, অনেকদিন আগেই সম্পাদন করিয়েছি। প্রত্যেকেই নিজের নিজের ভাগ পাবে। কাউকে পক্ষপাত দেখালে আমি নিজে শান্তিতে মরতে পারব না। হায়াসিনথ ত আছেই আর ফ্যানি তুমিও আছ। এখন আমার বয়স নব্বই। আগামী কোন একদিন তোমাদের ছেড়ে আমি চলে যাব।'

কিন্তু এর একটা বর্ণও সে বিশ্বাস করে না, কেননা তার দৃঢ়বিশ্বাস সে কখখনো মরবে না। সে ওদের সকলকে কবরে দেবে। এক ভাই আগেই চলে গেছে···অন্য জনও গেল। সব কিছুই এখানে রয়েছে, শবাধার, খনিত কবর আর এই শেষ অন্তিমকালের প্রার্থনা···এসব যেন পড়শীদের, তার সঙ্গে যেন কোন সম্পর্কই নেই। লম্বা আর রোগা শরীর, বগলে একখানা লাঠি··· ভাবলেশহীন মুখে সমাধিস্তূপগুলোর মধ্যে বুড়ী দাঁড়িয়ে আছে·· শুধু অপার কৌতূহল নিয়ে ভাবছে, কেন অন্যরা মরতে দুঃখ পায়।

তোতলাতে তোতলাতে যাজক স্তোত্রের শেষ চরণ আওড়ালেন।

'হে পথিক ইসরায়েল তোমার যাত্রা মহান হয়ে উঠুক।'

পবিত্র জলাধার থেকে জল নিয়ে তিনি কবরের উপর ছড়িয়ে দিলেন।

'এগিয়ে চল, এগিয়ে চল!'

গায়ক-ছোকরারা বলে উঠল—'স্বস্তি! স্বস্তি!'

এবার শবাধার কবরে নামানো হল। কবর খননকারীরা দড়ি দিয়ে শবাধার বাঁধল, দু'জন লোকই যথেষ্ট, কেননা মৃতদেহটা একটা বাচ্চা ছেলের চেয়ে বেশী ভারি নয়। আবার শোভাযাত্রা কবর ঘুরল। প্রত্যেকেই কবরের উপর ক্রস আঁকল এবং জল ছিটিয়ে দিল।

জাঁ কাছে এগিয়ে এল এবং মঁসিয়ে চার্লসের হাত থেকে জলের পাত্র নেওয়ার সময় কবরের নীচে তাকাল। অনেকক্ষণ ধরে প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে থাকার দরুণ তার এখন ঝিমুনি আসছে—ওই ত ওখানে আগামী দিনের খাদ্যের জন্য বীজ বপনকারীরা গমের বীজ বুনছে। মাটির গহ্বরে জাঁ শবাধারটা দেখতে পাচ্ছে, ওটা এখন আরও ছোট দেখাচ্ছে, শস্যের দানার মতন হলদেটে রঙ, পাইন-কাঠের সরু একফালি ঢাকনা। বৃষ্টির ধারার মতন মাটির চাঙড়া পড়ে গহ্বরটা অর্ধেক ভরে গেছে, খানিকটা হালকা-রঙের দাগ ছাড়া আর কিছুই তার চোখে পড়ছে না···এ যেন একমুঠো শস্যের দানা···যেমন দানা ওই

প্রান্তরের সীতা-মুখে তার বন্ধুরা ছড়িয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছে। জাঁ জল ছিটিয়ে দিয়ে পাত্রটা যেসাস ক্রাইস্টের হাতে এগিয়ে দিল।

'লা বর্ডেরির খামারে আগুন লেগেছে।

ও সম্বন্ধে আর কোনও সন্দেহ নেই, কেননা ছাদের উপর দিয়ে আগুনের শিখা লেলিহান হয়ে উঠেছে। মৃদু মৃদু কাঁপছে উজ্জ্বল রোদের মধ্যে। গাঢ় ধোঁয়ার মেঘ ভেসে যাচ্ছে উত্তরদিকে। ঠিক তখনি ওদের নজরে পড়ল বোল্‌ডি খামারের দিক থেকে বরাবর ছুটে আসছে। মেয়েটা তার হাঁসগুলোকে খুঁজতে গিয়ে প্রথম আগুনের ফুলকি দেখে দাঁড়িয়ে পড়েছিল, তারপর আগুন লেলিহান হচ্ছে দেখে সবাইকে বলতে ছুটে আসছে। সে নীচু পাঁচিলের উপর লাফিয়ে উঠে দু'পা ঝুলিয়ে বসে মেয়েলি-কণ্ঠে তীব্র স্বরে বলতে লাগল:

'ওহো, ওটা আধ-পোড়া হয়নি। এটা ওই শয়তান ট্রনের কাজ। সে ফিরে এসে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। গোলাবাড়ী, আস্তাবল, রান্নাঘর এই তিন জায়গায় আগুন দিয়েছে। সে যখন খড়ে আগুন ধরাচ্ছিল তখনই ওরা তাকে দেখতে পায়। মালগাড়ীর লোকেরা ওকে ধরে খুব পিটিয়েছে। ঘোড়া, গোরু আর ভেড়াগুলো আগুনে পুড়ছে। হায় হায়! তোমরা ওদের চিৎকার শুনতে পাচ্ছ না?'

তার সবুজ চোখ দুটো ঝিকমিক করছিল এবং সে হাসিতে ফেটে পড়ল।

'এবং জ্যাকুলিনও! জান ত, কর্তা মরার পর থেকে মাগিটা বিছানা নিয়েছে। ও যে বিছানায় শুয়ে আছে লোকজনেরা তা ভুলে গিয়েছিল। সেও পড়েছিল ওই আগুনের মধ্যে—কোন রকমে রাতের জামাটা গায়ে দিয়ে মাগি পালিয়ে আসতে পেরেছে। ওহো, ন্যাংটো হয়ে মাগি মাঠের উপর দিয়ে ছুটছে দেখতে ভারি মজা লাগছিল। এবড়ো খেবড়ো জমির ওপর মাগি লাফাচ্ছিল আর তার সামনের ও পিছনের দিক নজরে পড়ছিল। এবং প্রত্যেকে ওকে হেই! হেই! শব্দ করে তাড়াচ্ছিল কেননা ওরা কেউ ওকে দেখতে পারে না। একটা বুড়ো বলল—যেমন শেমিজ পরে এখানে ঢুকেছিল তেমনি শেমিজ গায়ে চলে যাচ্ছে।'

বোলডি আবার হাসিতে দুলে দুলে উঠল।

'ভারি মজা তোমাদের দেখা উচিৎ। আমি ফিরে যাচ্ছি।'

পাঁচিল থেকে লাফিয়ে পড়ে সে আবার লা বর্ডেরির দিকে ছুটল।

তখনও খামারে আগুন জ্বলছে।

মঁসিয়ে চার্লস, ডেলহোমি, ম্যাকেরণ এবং প্রায় সব চাষীরা মেয়েটার পিছনে চলল এবং ব্যাপারটা আরও ভালভাবে দেখবার জন্যে গ্রাণ্ডির বউয়ের সাথে মেয়েরা রাস্তার দিকে হাঁটাহাঁটি সুরু করল কবরখানা ছেড়ে। বুতো এবং লিসা পিছনে দাঁড়িয়েছিল। লিসা লেঙ্গাইনকে থামতে বলল। জাঁয়ের ব্যাপারটা সে তার কাছ থেকে প্রশ্ন করে জানতে চায়। সে যখন এই অঞ্চলে

বাসা নিয়েছে তাহলে সে কি কোন কাজ পেয়েছে? সরাইখানার মালিক যখন বলল যে, সে আবার সেনা-বাহিনীতে যোগ দিচ্ছে তখন বুতো এবং লিসা মনে মনে দারুণ সোয়াস্তি লাভ করল। এবং তারা একই মন্তব্য করল।

'লোকটা কি বোকা।'

এখন সব শেষ। এবার তারা সুখী জীবন সুরু করতে পারবে। তারা একবার ফৌআনের কবরের দিকে তাকাল···কবর খননকারীরা তখন কবর মাটি দিয়ে ভরছিল। ছেলেমেয়ে দুটো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল। তাদের মা ডাকল।

'জুলি, লরা এস! ভাল হবে, যা' বলব তাই শুনবে। নইলে ওরা ধরে নিয়ে গিয়ে তোমাদের অমনিভাবে মাটিতে কবর দেবে।'

বুতোরা ছেলেমেয়ে দুটোকে সামনে তাড়িয়ে নিয়ে চলল···ছেলেমেয়েরা ত সবই জানে, ওরা ভারি বুদ্ধিমান আর ওদের ডাগর ডাগর কালো গভীর ভাব-লেষহীন চোখ।

অনুবাদঃ **ভৈরবপ্রসাদ হালদার**

ইয়ামা : একটি নরককুণ্ড

Yama, The Hell-Hole

আলেকজান্দ্র কুপরিণ

প্রথম খণ্ড

১

প্রাচীনকালে—রেলপথ প্রবর্তিত হবার অনেক আগে—রাশিয়ার দক্ষিণ অঞ্চলের একটি বড় শহরের উপকণ্ঠে একদল 'ইয়াম্‌স্তচিকি' (সরকারী ও বেসরকারী গাড়োয়ান) বংশ বংশ ধরে বাস করত। সেই জন্যই অঞ্চলটাকে বলা হত ইয়াম্‌স্কায়া স্লোবোদা—গাড়োয়ান পল্লী; অথবা সোজা ভাষায় ইয়াম্‌স্কায়া; অথবা আরও সংক্ষেপে—ইয়ামা। পরবর্তীকালে যখন ঘোড়ার পিঠে চড়ে যাতায়াতের বদলে রেলপথে যাতায়াত প্রচলিত হল তখন সেই সাহসী গাড়োয়ান জাতিটাই ক্রমে ক্রমে তাদের উদ্দাম সাহসিকতা হারিয়ে অন্য সব কাজে লেগে গেল, দল ভেঙে গেল, এক সময়ে হারিয়েও গেল। কিন্তু তারপরেও অনেক কাল ধরে, এমন কি আজকের দিন পর্যন্তও, উদ্দাম ফূর্তি, মাতলামি ও ঝগড়া-ঝাটির কেন্দ্র হিসাবে ইয়ামা তার অখ্যাতিকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে; রাতের বেলায় জায়গাটা আজও নিরাপদ নয়।

এবং ঠিক যে রকমভাবে ঘোড়াকে সরিয়ে রেলপথ তার জায়গা করে নিয়েছে, সেই ভাবেই যে সব পুরনো বাড়িতে একদা সৈনিকদের গোলাপি-গাল স্ত্রীরা এবং গাড়োয়ানদের ফূর্তিবাজ বিধবারা ভদকা বিক্রি করত আর বিনামূল্যে প্রেম বিলোত তাদেরই ভগ্নস্তূপের উপর ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে নতুন নতুন পতিতালয়। সে সব পতিতালয়ই সরকারী নিয়ন্ত্রণের অধীনে পরিচালিত। অত্যন্ত কড়া নিয়ম-কানুন তাদের মেনে চলতে হয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ইয়ামার দুটো বড় রাস্তা—বড় বল্‌শায়া ও ছোট মালয়া ইয়াম্‌স্কায়া-তে কেবলমাত্র কুখ্যাত বাড়ি ছাড়া আর কিছু ছিল না। বাকি পাঁচ ছ'টা বেসরকারী বাড়িতে ছিল শুঁড়িখানা, বিয়ারের দোকান ও মুদিখানা; ইয়ামার পতিতালয়গুলির প্রয়োজনই তারা মেটাত।

এ ধরনের একত্রিশটা প্রতিষ্ঠানের জীবনযাত্রা, চাল-চলন, রীতিনীতি সবই ছিল একসুরে বাঁধা। তাদের মধ্যে তফাত ছিল শুধু ক্ষণিক প্রেমের দামে, নির্বাচিত সুন্দরীদের রূপের কম-বেশীতে, পোষাকের তুলনামূলক আধুনিকতায়,

ঘরের জাঁকজমকে এবং আসবাবপত্রের বিলাসিতায়।

ত্রেপ্পেল-এর বাড়িটাই সর্বাপেক্ষা আধুনিক। বল্‌শায়া ইয়াম্‌স্কায়া দিয়ে ঢুকতেই বাঁ-হাতি প্রথম বাড়িটা। অনেক দিনের পুরনো প্রতিষ্ঠান। তার বর্তমান মালিকের নামটাও একেবারে নতুন। সে নিজে নগর-পরিষদ এবং নগর-বোর্ডের সদস্য। ত্রেপ্পেল-এর বাড়িটা দোতলা, অধুনা অপ্রচলিত নকল রুশ রীতিতে সবুজের উপর সাদা লাইন টানা; নানারকম কারুকার্যে সাজানো। সিঁড়িতে টানা সাদা রঙের কার্পেট পাতা; ঢুকবার মুখে একটা খড়-ভর্তি ভালুক থাবা মেলে দাঁড়িয়ে আছে; তার থাবায় ধরা আছে ভিজিটিং-কার্ড রাখবার জন্য একটা কাঠের ট্রে। নাচ-ঘরের মেঝে নকশা-কাটা, জানালায় জরির কাজ-করা র‍্যাস্পবেরি-রঙের পর্দা, সোনালি ফ্রেমের আয়না ঝোলানো, দেয়াল বরাবর সোনালি ও সাদা রঙের চেয়ারগুলি সাজানো। কার্পেট, সোফা ও সাটিনে মোড়া নরম মোটা গদী দিয়ে সাজানো দুটি ছোট ঘরও আছে। শোবার ঘরগুলোতে আছে লাল-নীল বাতি, সিল্কের ভারী কম্বল ও পরিষ্কার বালিশ। বাড়ির লোকজনদের পরনে হয় লোমের পাড় লাগানো লো-কাট সান্ধ্য পোষাক, আর না হয় তো অশ্বারোহী সৈনিক, জমিদার বাড়ির ভৃত্য, বা হাই স্কুলের ছাত্রদের ব্যয়বহুল ঝকমকে পোষাক। তাদের অধিকাংশই বাল্টিক রাষ্ট্র থেকে আনীত জার্মান স্ত্রীলোক—সুন্দরী, বিপুলা, উদ্ধত বুক ও সাদা মাংস। ত্রেপ্পেল-এ ঢুকবার দর্শনী তিন রুবল, আর এক রাতের জন্য দশ রুবল।

সোফিয়া ভাসিলিয়েভ্‌নার বাড়ি, বুড়ি কীভ-এর বাড়ি আর আন্না মার্কভ্‌নার বাড়ি—এই তিনটিতেই দর্শনী দুই রুবল করে; অবশ্য সেখানকার ব্যবস্থাও অপেক্ষাকৃত খারাপ, কিছুটা গরীবানা ভাব। বল্‌শায়া ইয়াম্‌স্কায়ার অন্য সব বাড়িরই দর্শনী মাত্র এক রুবল; আসবাবপত্রও সাধারণ। আর মালয়া ইয়াম্‌স্কায়াতে যে সব বাড়ি আছে সেখানকার দর্শনী পঞ্চাশ কোপেক বা আরও কম; সেখানে আসে যত সৈনিক, ছিচকে চোর, মজুর ও সাধারণ মানুষ। স্বভাবতই বাড়িগুলো নোংরা। আসবাবপত্রও বাজে; বসবার ঘরের মেঝে এবড়ো-খেবড়ো ও চটা-ওঠানো, জায়গায়-জায়গায় রং-চটা। জানালায় লাল রঙের মোটা সুতীর পর্দা ঝুলছে; শোবার ঘরগুলো ছোট দোকানের মত, পাতলা পার্টিশন দেওয়া, তাও শিলিং পর্যন্ত ওঠে নি। বিছানা পুরনো খড়ের গদির উপর ভাঁজ-করা, ছেঁড়া, দাগ-লাগা, বিবর্ণ পুরনো চাদর পাতা, তাও গর্তে ভরা। মদের গন্ধ ও মানুষের মলমূত্রের গন্ধ মিশে বাতাসে কেমন একটা ধোঁয়াটে কটু গন্ধ। মেয়েগুলোর পরনে জীর্ণ ক্যালিকো-প্রিন্টের পোষাক, অথবা নাবিকদের পোষাক। তাদের অধিকাংশেরই নাক পচা, কথা বলে কর্কশ নাকি সুরে। তাদের চোখ-মুখে গত রাতের মারধোর ও আঁচড়ের দাগ, কিন্তু তার উপরেই নতুন প্রসাধনের চটক লাগানো। একমাত্র

"পবিত্র সপ্তাহ"-এর শেষ তিনটি দিন এবং কুমারী মেরির "ঘোষণা"র সন্ধ্যা ছাড়া—ঐ দিনগুলিতে কোন পাখি বাসা বাঁধে না ও কোন মেয়ে চুল বাঁধে না—সারা বছর ধরে প্রতিটি সন্ধ্যায় বাইরে আঁধার নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে পতিতালয়গুলির তাঁবুর মত বাঁকানো ফটকে-ফটকে লাল লণ্ঠন জ্বলে ওঠে। বাতাসে ছুটির দিনের আমেজ লাগে। জানালা-পথে ভেসে আসে বেহালা ও পিয়ানোর সুর। অনবরত গাড়ির পর গাড়ি আসা-যাওয়া করে। প্রতিটি বাড়ির সদর দরজা হাট করে খুলে দেওয়া হয়; রাস্তা থেকেই যে কোন লোকের চোখে পড়বে, একটা খাড়া সিঁড়ি, তার শেষ প্রান্তে একটা সংকীর্ণ করিডর, আলোর বহুমুখী "রিফ্লেক্টর"-এর উজ্জ্বল সাদা ঝলক, এবং সুইজারল্যাণ্ডের নিসর্গ দৃশ্য আঁকা সবুজ দেয়ালের ঘর। সকাল না হওয়া পর্যন্ত শত শত, হাজার হাজার মানুষ সেই সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করে। এখানে সকলেই আসে—মুখে লালা-ঝরা অথর্ব বুড়োরা আসে কৃত্রিম উত্তেজনার খোঁজে; আসে শিক্ষানবীশরা আর হাই স্কুলের পুঁচকে ছেলেরা; দাড়িওয়ালা সব লোক যাদের পরিবার-পরিজন আছে; সোনার চশমা-পরা সমাজের হোমড়া-চোমড়ারা, নব-বিবাহিতরা; মোহাচ্ছন্ন প্রেমিকের দল; নাম-করা সব বিখ্যাত অধ্যাপকরা; চোর ও খুনীরা; উদার উকিলবাবুরা; এমন কি নৈতিক জীবনের কড়া অভিভাবকরা পর্যন্ত। আরও আসে ধর্ম-প্রচারক ও উদার-হৃদয় লেখকরা—স্ত্রী-জাতির সম-অধিকার নিয়ে যারা অগ্নিগর্ভ উচ্ছ্বাসপূর্ণ প্রবন্ধ লেখে তারা; গোয়েন্দা ও গুপ্তচররা; পলাতক কয়েদীরা। আসে পদস্থ কর্মচারি ও ছাত্ররা; সমাজতন্ত্রী গণতন্ত্রবাদীরা, নৈরাজ্যবাদীরা, আর ভাড়াটে দেশপ্রেমিকরা। একের পর এক তারা আসে—লাজুক আর সাহসী, রুগ্ন ও সুস্থদেহ; যারা জীবনে প্রথম নারী-সান্নিধ্যে এল, আর সব রকম পাপকর্মে অভ্যস্ত পুরনো লম্পটের দল। আসে খোলা-চোখ সুদর্শন পুরুষ, আর বিকৃত-দেহ রাক্ষসের দল। আসে কালা, বোবা ও কানা; যাদের নাক নেই, আর যাদের ফুলো-ফুলো শরীর ঝুলে পড়েছে; যাদের নিঃশ্বাসে তীব্র দুর্গন্ধ; যাদের মাথায় টাক, আর যাদের শরীর সব সময় কাঁপে; এমন কি যাদের দেহময় আব সেই সব ভুঁড়িওয়ালা রক্ত-ঝরা বাঁদররা পর্যন্ত আসে। তারা প্রকাশ্যে সহজভাবেই আসে, যেন কোন রেস্তোরাঁয় বা ডিপোতে ঢুকছে। তারা বসে, তামাক খায়, মদে চুমুক দেয়, খুশি হবার ভাণ করে। উদ্দাম ভঙ্গীতে নাচে। কখনও মনোযোগ দিয়ে, কখনও বা তাড়াহুড়ো করে একটি মেয়েকে বেছে নেয়; কেউ যে ফিরিয়ে দেবে না সেটা তারা ভাল করেই জানে। অধৈর্যভাবে তারা মজুরিটা আগাম দিয়ে দেয়; তারপর পূর্ববর্তী লোকের শরীরের তাপে তখনও গরম একটা সরকারী বিছানায় তারা পৃথিবীর মহত্তম ও সুন্দরতম রহস্যময় কাজটি সমাধা করে—সে রহস্য একটি নবজীবন সৃষ্টির। আর সেই সব মেয়েরা নিরুত্তাপ প্রস্তুতি, একঘেয়ে বাক-বিন্যাস ও অভ্যস্ত ভঙ্গীতে যন্ত্রের মত

তাদের কামনা পরিতৃপ্ত করে। এইভাবে একই রাত্রে, একই কথা, হাসি ও ভঙ্গীতে তারা পর পর তৃতীয়, চতুর্থ, এমন কি বসবার ঘরে সুযোগের প্রতীক্ষায় অপেক্ষমান দশম ব্যক্তিকেও গ্রহণ করে।

এই ভাবে সারারাত চলে: তারপর ভোরের দিকে ইয়ামা শান্ত হয়। সকালের পরিষ্কার আলোয় দেখা যায় ইয়ামা পরিত্যক্ত; গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, দরজা শক্ত করে বন্ধ, জানালার খড়খড়ি টেনে নামানো। কিন্তু সে শুধু কিছু সময়ের জন্য। সন্ধ্যার দিকে মেয়েদের ঘুম ভাঙে, আসন্ন রাতের জন্য তারা আবার প্রস্তুত হয়।

আর এই ভাবেই দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরে শেষহীনভাবে চারশ' নির্বোধ, অলস, উচ্ছৃংখল, বন্ধ্যা নারী তাদের সরকারী হারেমে একটা অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য নৈশ জীবন যাপন করে চলেছে; সমাজ তাদের ঘৃণায় পরিত্যাগ করেছে, পরিবারের লোকেরা তাদের অভিশাপ দিয়েছে, সামাজিক প্রয়োজনের তারা শিকার হয়েছে; মহানগরের বাড়তি লাম্পট্যের তারা কেন্দ্র-ভাণ্ডার, কত পরিবারের মর্যাদার তারা রক্ষাকর্ত্রী।

২

বিকেল দুটো বাজে। আন্না মার্কভ্নার দুই রুবল মজুরির দ্বিতীয় শ্রেণীর পতিতালয়টি গভীর ঘুমে অচেতন। সোনালি ফ্রেমে-বাঁধানো আয়না, দেয়াল জুড়ে সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো খান বিশেক দামী চেয়ার, মাকভ্স্কির আঁকা "অভিজাত শ্রেণীর ভোজসভা" ও "স্নান" ছবি দু'খানির ছাপানো প্রতিলিপি, সিলিং-এর মাঝখান থেকে ঝোলানো কাঁচের ঝাড়বাতি—এই সব কিছু দিয়ে সাজানো চৌকোনা বড় বসবার ঘরটিও ঘুমে ঢুলছে। স্তব্ধ আধো-অন্ধকারে ঘরটাকে অস্বাভাবিক রকমের চিন্তামগ্ন, কঠোর ও বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। আগের রাতেও যথারীতি উজ্জ্বল আলো জ্বলেছে। চটুল ফুর্তিবাজ গানের ঝড় বয়ে গেছে। তামাকের নীল ধোঁয়া মাথার উপর ছড়িয়ে পড়েছে, আর নৃত্যপর যুগলরা নিতম্ব নাচিয়ে, পা ঠুকে ঠুকে ঘরময় ঘুরে বেরিয়েছে। ফটকের মাথায় জ্বালানো লাল লণ্ঠনের আলোয় গোটা পথটাই আলোকিত হয়েছে; জানালা দিয়েও আলো এসে পথে পড়েছে; ভোর পর্যন্ত লোকজন ও গাড়ি-ঘোড়া গিজগিজ করেছে।

এখন পথটা ফাঁকা। বসন্তকালের সূর্যের আলোয় খুশিতে ঝলমল করছে। কিন্তু বসবার ঘরের পর্দা নামানো; ভিতরটা অন্ধকার ও ঠাণ্ডা। সে শূন্যতা দেখলেই দিনের বেলায় জনশূন্য রঙ্গমঞ্চ, ফাঁকা ঘোড়দৌড়ের মাঠ ও আদালতের কথাই মনে পড়ে যায়।

পিয়ানোর কালো, বাঁকানো চকচকে দিকটা সেই অন্ধকারেও কিছুটা ঝিকমিক করছে। তার হলদে, ভাঙা, জরাজীর্ণ চাবিগুলো থেকে একটা

আবছা আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। স্তব্ধ জমাট বাতাসে তখনও গতদিনের গন্ধ লেগে রয়েছে—আতর, তামাক, বড় খালি ঘরটার স্যাঁতা গন্ধ, স্বাস্থ্যহীন নোংরা মেয়েদের শরীরের ঘাম; পাউডার ও বোরিক-থাইমল সাবান; আর আগের দিন যে গলানো হলুদ মোম দিয়ে মেঝেটা পালিশ করা হয়েছে তার গন্ধ। আর কী আশ্চর্য, এই সব গন্ধের সঙ্গে শুকনো শ্যাওলার গন্ধ মিশে কেমন একটা নেশার আমেজ সৃষ্টি করেছে। আজ "ত্রিমূর্তি দিবস"। স্ত্রীলোকরা সব ঘুমিয়ে থাকলেও পুরনো প্রথামত এখানকার দাসীরা সকালেই কেনাকাটা করতে বাজারে চলে গিয়েছিল এবং এক গাড়ি বোঝাই করে লতাপাতা কিনে এনেছে। তারপর সেই লতাপাতা সব জায়গায় ছড়িয়ে দিয়েছে। করিডরে ও হলে তার উপর দিয়ে হেঁটে বেড়িয়েছে, ছোট ঘর দুটিতে আর বসবার ঘরেও পুরু করে সাজিয়েছে। খৃস্ট-মূর্তির সামনেও তারা তেলের প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়েছে, কারণ প্রচলিত প্রথা অনুসারে এ কাজটা মেয়েদের করা নিষিদ্ধ। রাতের বেলা তাদের হাতগুলি অশুচি হয়েছে।

ইতিমধ্যে দরোয়ান দুটো ছোট বার্চগাছের ডাল এনে অর্ধবৃত্তাকার রুশ ফটকটাকে সাজিয়ে দিয়েছে; আর রাস্তার সর্বত্র পতিতালয়গুলির মাথায়, সিঁড়ির উপরে ও দরজায় পাতা-ঝরা সাদা গাছ সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আন্না মার্কভ্নার পুরো বাড়িটাই শান্ত, ফাঁকা ও ঘুমন্ত। রান্নাঘর থেকে মাংস কাটার শব্দ আসছে। লিউব্‌কা নামে একটি মেয়ে ভিতরের উঠোনে এসেছে। তার খালি পা, রাতের পোষাক পরা, সুন্দর খোলা হাত দুটোতে ছিট-ছিট দাগ, কিন্তু শরীরটা মজবুত ও তাজা। গত রাতে তার ঘরে মাত্র ছ' জন অতিথি এসেছিল; তার মধ্যে কেউই সারা রাত থাকে নি। কাজেই মস্ত বড় বিছানায় একা শুয়ে সে চমৎকার ঘুমিয়েছে।

এখন সে তার শেকলে বাঁধা কুকুর "আমোর"-কে নাড়িভুড়ি ও মাংসের ছাঁট খাওয়াচ্ছে। লম্বা চকচকে লোম আর কালো নাকওয়ালা পিঙ্গল রঙের মস্ত বড় কুকুরটা সামনের দুই পা তুলে মেয়েটার গায়ের উপর লাফিয়ে উঠে থুতনিটা শক্ত করে তুলে ধরছে, লেজ আর পিছনটা নাড়ছে; আর উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে। মেয়েটা মাংসের টুকরোগুলো শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে রাগের ভাণ করে চেঁচিয়ে বলছে:

"এই নে, দুষ্টু কোথাকার; দেখাচ্ছি মজা! কী আস্পর্ধা!"

কিন্তু আমোর-এর এই উত্তেজনা ও আদর আর কুকুরটার উপর তার সাময়িক আধিপত্য মেয়েটি বেশ ভালই উপভোগ করছে। তাছাড়া তার মেজাজও বেশ খুশি ছিল, কারণ সে ভালভাবে ঘুমিয়েছে, কোন লোক ছাড়াই রাতটা কাটিয়েছে; তাছাড়া আজ "ত্রিমূর্তি দিবস", এ দিনটির কিছু কিছু শৈশবের স্মৃতি আজও অস্পষ্টভাবে তার মনে পড়ে; এবং এ রকম একটা রৌদ্রোজ্জ্বল দিন কদাচিৎ চোখে পড়ে।

রাতের অতিথিরা সব চলে গেছে। এখন সাধারণ কাজকর্মের দিকে নজর দেবার সময়।

বাড়ির মালকিনের ঘরে কফি দেওয়া হচ্ছে। সেখানে পাঁচ জন হাজির হয়েছে। একজন মালিক যার নামে বাড়িটা রেজিস্ট্রি করা হয়েছে—আন্না মার্কভ্‌না। বয়স প্রায় ষাট বছর। খুব বেঁটে ও মোটা। জেলির মতন নরম তিনটে বলকে—একটা বড়, একটা মাঝারি ও একটা ছোট—নীচ থেকে উপরে পর পর ঠেসে সাজিয়ে দিলেই তার চেহারার একটা কল্পনা করা যেতে পারে, বল তিনটা হল তার ঘাঘরা, দেহ ও মাথা। আরও আশ্চর্য—তার আবছা নীল চোখ দুটি যেন কোন কুমারীর, এমন কি কোন শিশুর, আর তার মুখখানি যেন কোন বৃদ্ধ পুরুষের: নীচের ভেজা ব্যাম্পবেরি-রঙের ঠোঁটটি অলসভাবে ঝুলে পড়েছে। তার স্বামী ইসায়া সাব্বিচ্‌ও দেখতে ছোটখাট, গায়ের রং ধূসর, চুপচাপ, শান্ত বুড়ো মানুষটি। স্ত্রীর খুব বশংবদ। আন্না মার্কভ্‌না এ বাড়ির মালিক, আর বুড়ো ছিল দরোয়ান। যাতে নিজেকে এখানে কোন কাজে লাগাতে পারে তাই সে বেহালা বাজানো শিখে নিয়েছে; এখন সে সন্ধ্যেবেলা নাচের সুর বাজায়—আর যে মাতাল করণিকরা অল্পতেই কেঁদে ফেলে তাদের জন্য বাজায় শবযাত্রার সুর।

আরও দু'জন বাড়িউলি সেখানে হাজির আছে—একজন বড়, একজন ছোট। বড় এম্মা এডোয়ার্ডভ্‌না লম্বা, শক্ত সমর্থ, বয়স ছেচল্লিশের মত, বাদামী চুল, মস্ত বড় গলগণ্ড ও তিনটি থুতনি। তার চোখের চারপাশে রক্ত জমে কালো কালো দাগ পড়েছে। কপাল থেকে কপোল পর্যন্ত ঠেলে বেরিয়ে আসা নাসপাতির মত দেখতে মুখটা পাণ্ডুর। নাকটা দেখতে কুঁজের মত, ঠোঁট দুটো শুকনো, সারা মুখে একটা শান্ত ব্যক্তিত্বের ছাপ। এ বাড়ির সকলেই জানে, আন্না মার্কভ্‌না দু'এক বছরের মধ্যেই অবসর নেবে এবং সব স্বত্ব ও আসবাবপত্রসহ তার ব্যবসাটা এই শর্তে বড় বাড়িউলিকে বেচে দেবে যার ফলে প্রাপ্য টাকার একটা অংশ সে নগদে নেবে এবং বাকীটা হাণ্ড-নোটে নেবে। সে জন্যে এ বাড়ির মেয়েরা তাকে মালকিনের মতই সম্মান করে এবং ভয়ও করে। কেউ দোষ করলে সে তাকে মারধোর করে; অবিচলিত মুখে ঠাণ্ডা মাথায় নির্মমভাবে মারে। মেয়েদের মধ্যে কেউ না কেউ সব সময়ই তার খুব প্রিয় হয়, আর নিষ্ঠুর ভালবাসায় এবং অদ্ভুত ঈর্ষায় সে তাকে জ্বালিয়ে মারে। তার মারের চাইতেও সে ভালবাসা সহ্য করা কঠিন।

অপরটির নাম জোসিয়া। সবেমাত্র সে সাধারণ মেয়েদের স্তর থেকে উঠে এসেছে; মেয়েরা এখনই তাকে নাম ধরে ডাকে না, বরং ভালবেসে তোষামোদের সুরে "ছোট বাড়িউলি" বলে ডাকে। জোসিয়া দেখতে লিকলিকে, অস্থির, ঈষৎ টেরা। তার গাল দুটি গোলাপি, চুল খুব বেশী কোকড়ানো। সে অভিনেতাদের খুব ভক্ত, বিশেষ করে মোটাসোটা হাস্যরসের অভিনেতাদের।

এম্মা এডোয়ার্ডভ্‌নাকে খুশি রাখতে সে সদাই ব্যস্ত।

পঞ্চম লোকটি স্থানীয় জেলা পুলিশের কের্বেশ। সে একজন খেলোয়াড়, মাথায় সামান্য টাক, পাখার মত লাল দাঁড়ি। তার নীল চোখ দুটিতে ঘুম-ঘুম ভাব, উচ্চ কণ্ঠস্বর ঈষৎ কর্কশ হলেও মনোরম। সকলেই জানে, এক সময়ে সে গোয়েন্দা বিভাগে কাজ করত, এবং তার প্রচণ্ড দৈহিক শক্তি ও জেরার সময়কার নিষ্ঠুরতার জন্য দুষ্কৃতকারীদের কাছে সে ছিল ত্রাসস্বরূপ।

কয়েকটি দুষ্কর্মের দাগ তার বিবেকের উপরেও পড়েছিল। সারা শহর জানে, দু' বছর আগে সে একটি ধনবতী সত্তর বছর বয়স্কা স্ত্রীলোককে বিয়ে করে পরের বছরই তাকে গলা টিপে মেরে ফেলেছে; অবশ্য যে ভাবেই হোক ব্যাপারটাকে সে ধামা-চাপা দিতে পেরেছে। কিন্তু সে কথা ধরতে গেলে বাকি চারজনও তো তাদের বিচিত্র জীবনে অনেক খারাপ কাজ করেছে, আর চিরকালের ষণ্ডাগুণ্ডাদের মতই তাদের শিকারদের জন্য কোন রকম অনুশোচনা বোধ না করে তাদের সেই অশুভ রক্তাক্ত অতীতকে অনিবার্য ও কিছুটা অশোভন বলেই মনে করে।

তারা গরম দুধ মেশানো কফি খাচ্ছিল; পুলিশটি খাচ্ছিল একটি বিশেষ পানীয় "বেনেডিক্টাইন।" আসলে সে দেখাতে চাইছিল যে কেবলমাত্র অন্যের মন রাখতেই সে পান করছে।

ইঙ্গিতপূর্ণভাবে মালকিন বলল, "আচ্ছা, আপনি কি বলেন ফোমা ফোমিচ? ব্যাপারটার কিন্তু এক কানা কড়িও মূল্য নেই...কাজের মধ্যে আপনাকে শুধু বলতে হবে একটি কথা..."

তেলতেলে কড়া তরল পদার্থটা প্লেটে ঢেলে কের্বেশ আধা গ্লাস মদ ধীরে ধীরে চাটতে লাগল; সেটা শেষ করে ধীরে সুস্থে এক কাপ কফি খেল; তারপর বাঁ হাতের অনামিকা দিয়ে গোঁফ জোড়াকে বাঁ থেকে ডান দিকে ভাল করে মুছল।

হাত দু'খানি ছড়িয়ে দিয়ে টেবিলের উপর এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে বলল, "ভেবে দেখুন মাদাম শোয়বেস, আমি এখানে কতটা ঝুঁকি নিচ্ছি সেটা ভেবে দেখুন। মেয়েটাকে ভুলিয়ে ফাঁকি দিয়ে এঁর মধ্যে...এটাকে কি বলব...এক কথায় একটা খারাপ বাড়িতে...তাও তো বেশ ভাল কথায় বলা হল। এখন ওর বাপ-মা ওকে যেখানে-সেখানে, পঞ্চম থেকে দশম স্থানে খুঁজতে খুঁজতে... শেষ পর্যন্ত এখানে তার হদিস পেয়েছে! আর সব চাইতে বড় কথা...সেটাই ভাল করে ভেবে দেখুন...এটা আমার এলাকা। আমি কি করতে পারি?"

মালকিন বলল, "মিঃ কের্বেশ, ওর তো বয়স হয়েছে।"

ইসায়া সাব্বিচ সে কথারই পুনরাবৃত্তি করে বলল, "ওর তো বয়স হয়েছে। একটা কাগজে সে লিখে দিয়েছে, নিজের ইচ্ছায় সে এ কাজ করেছে।"

এম্মা এডোয়ার্ডভ্‌না সে কথা সমর্থন করে নীচু গলায় বলল:

"ঈশ্বরের নামে বলছি, এখানে তাকে এমনভাবে রাখা হয়েছে যেন সে আমাদের নিজের মেয়ে।"

পুলিশের লোকটি ভুরু কুঁচকে বিরক্তির সঙ্গে বলল, "আহা, সে কথা তো আমি বলছি না। আমার অবস্থাটা ভেবে দেখুন।...এটাও তো আমার কাজের মধ্যেই পড়ে। হে ভগবান, এ ছাড়াও আরও কত যে গোলমাল আছে!'

মালকিন হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। চটিতে পা ঢুকিয়ে দরজার কাছে গিয়ে তার অবিচল অলস চোখ দুটিতে কিসের যেন ইঙ্গিত করে বলল:

"মিঃ কের্বেশ, আমরা যে সব নতুন ব্যবস্থা করেছি সেটা আপনাকে দেখাতে চাই। জায়গাটাকে একটু বাড়িয়ে নিয়ে..."

"বেশ তো। খুব ভাল কথা।"

দশ মিনিট পরে কেউ কারও দিকে না তাকিয়ে তারা ফিরে এল। পকেটে হাত রেখে কের্বেশ একটা আনকোড়া একশ রুবলের নোট মুঠো করে ধরল। ভুলিয়ে আনা মেয়েটার কথা আর উঠল না। পুলিশটি তাড়াতাড়ি "বেনেডিক্টাইন"-টা শেষ করে আজকালকার আচার-ব্যবহারের তীব্র নিন্দা করতে লাগল।

"আমার ছেলে পল হাই স্কুলে পড়ে। সে শয়তানটা আমাকে এসে বলে: 'বাবা, ছাত্ররা আমাকে গালাগালি দিয়ে বলে যে তুমি পুলিশের লোক, ইয়াম্‌স্কায়া তোমার এলাকা, আর তুমি সব বেশ্যাবাড়ি থেকে ঘুষ খাও।' ঈশ্বরের দোহাই, আপনি বলুন মাদাম শোয়বেস, এটা কী রকম বেয়াদবি!"

"আই, আই, আই!...ঘুষ আবার কোথায়...এই তো, আমিও তো..."

"কাজেই আমিও তাকে বলেছি: 'পাজি ব্যাটা, তোদের প্রিন্সিপ্যালকে গিয়ে এ ধরনের কথাবার্তা বন্ধ করতে বল্; নইলে সেখানকার গভর্ণর জেনারেলের কাছে আমি স্কুলের নামে রিপোর্ট করব।' আরে, কী শুনবেন! সে এসে বলে: 'আমি আর তোমার ছেলে নই, তুমি অন্য ছেলে দেখ!' কী কথার ছিরি! আচ্ছা, আমিও তাকে এমন ঝেড়েছি যে বেশ কিছুদিন মনে থাকবে। ওহো! তারপর থেকে সে আর আমার সঙ্গে কথা বলে না। কিন্তু আমিও তাকে মজা দেখাব!"

"আহা, ও কথা আমাদের কাছে বলবেন না।" আন্না মার্কভ্‌না দীর্ঘশ্বাস ফেলল; তার র‍্যাস্পবেরি-রঙের ঠোঁট আরও ঝুলে পড়ল, ম্লান চোখ দুটি জলে ভরে এল। "এই তো আমাদের বার্থা খুনির কথাই ধরুন—সেও তো ক্লীশার-এর হাই স্কুলে পড়ে। আমরা ইচ্ছা করেই তাকে শহরে একটা সম্ভ্রান্ত পরিবারে রেখেছি। আপনি তো বোঝেনই। ব্যাপারটা তো গোলমেলে। আর সে হাই স্কুলে থেকে যে সব কথাবার্তা শিখে আসে সে শুনে আমিই বীট-এর মত লাল হয়ে যাই।"

ইসায়া সাব্বিচ তাকে সমর্থন করে বলল, "ঈশ্বরের দিব্যি, আনোচ্‌কা সত্যি লাল হয়ে যায়।"

পুলিশটিও সাগ্রহে সে কথা মেনে নিয়ে বলল, "লাল হওয়াই স্বাভাবিক। সত্যি বলছি, আপনার মনোভাব আমি সম্পূর্ণ বুঝতে পারি। হে ভগবান, আমরা কোথায় চলেছি ? কোন্ পথে ? আমি জিজ্ঞাসা করি : এই সব বিপ্লবীরা, এই সব ছাত্ররা…তাদের যাই বলুন না…তারা কি করতে চায় ? নিজেদের ছাড়া আর কাউকে তারা দোষ দিতে পারে না। সর্বত্রই দুর্নীতি চলেছে ; নৈতিক জীবন ভেঙে পড়ছে ; বাপ-মার প্রতি শ্রদ্ধা নেই। তাদের গুলি করা উচিত !"

এবার জোসিয়া কথায় যোগ দিল। "দেখুন, গত পরশু একটা ঘটনা ঘটেছে। একজন অতিথি এল, মোটাসোটা মানুষ…"

"খুব হয়েছে !" এম্মা এডোয়ার্ডভ্‌না মাথাটা একদিকে কাত করে নাড়তে নাড়তে একমনে পুলিশের কথা শুনছিল। এখানকার খিস্তি করে সে জোসিয়াকে থামিয়ে দিল। "তুমি বরং মেয়েগুলোর প্রাতরাশের ব্যবস্থা দেখ গে।"

মালকিন তেমনি গোসা করেই বলতে লাগল, "কারও উপর ভরসা করতে পারবেন না ; এমন একটা দাসী পাবেন না যে পাজী ও ফাঁকিবাজ নয়। আর মেয়েগুলোও তেমনি ; তাদের যত ভাবনা নাগরদের নিয়ে ; যত চিন্তা নিজেদের সুখ-সুবিধা নিয়ে ; আর কর্তব্য—সে কথা একবারও ভাবে না।"

একটা অদ্ভুত নীরবতা। দরজায় একটা টোকা পড়ল। ও পাড়া থেকে একটা জোরালো নারী-কণ্ঠ শোনা গেল।

"ছোট বাড়িউলি, টাকাটা নিয়ে আমাকে রসিদটা দাও। পেতে চলে গেছে।"

পুলিশটি উঠে তরবারি ঠিক করে নিল।

"আমারও কাজের সময় হয়ে গেছে। নমস্কার আন্না মার্কভ্‌না। বিদায় ইসায়া সাব্বিচ।"

ইসায়া সাব্বিচ চোখে ভাল দেখতে পায় না। টেবিলটা হাতড়াতে হাতড়াতে সে বলল, "যাবার আগে আর এক পাত্র হবে না ?"

"আপনাকে ধন্যবাদ। আর পারব না। ভর-পেট হয়েছে। আচ্ছা, এবার চলি।"

"আপনার আসার জন্য ধন্যবাদ। যখনই সুবিধা হবে আসবেন।"

"আপনাদের অতিথি হওয়া তো সুখের কথা।"

দরজায় দাঁড়িয়ে সে ইঙ্গিতপূর্ণভাবে বলল :

"তবু আমি পরামর্শ দিচ্ছি, সময় নষ্ট না করে মেয়েটাকে অন্য কোথাও চালান করে দিন। অবশ্য এটা আপনাদের ব্যাপার, তবু বন্ধু হিসাবেই

আপনাদের সতর্ক করে দিচ্ছি।"

সে চলে গেল। সিঁড়িতে তার পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল। সদর দরজা সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। তখন এম্মা এডোয়ার্ডভ্না নাকি সুরে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলে উঠল:

"দু'মুখো খচ্চর! দু'দিকেই ভাগ বসাতে চায়।"

একে একে তারা ঘর থেকে চলে গেল। বাড়িটা অন্ধকার, স্তব্ধ, লতাপাতার মিষ্টি গন্ধে ভরা।

৩

ছ'টার সময় খাবার দেওয়া হয়। তার আগে পর্যন্ত সময়টা দুঃসহ একঘেয়েমির মধ্যে কাটে। অনেকটা ছুটির দিনে মেয়েদের বোর্ডিং স্কুলের নিষ্প্রাণ, নিষ্কর্মা সময়টুকুর মত; ছাত্রীরা অধিকাংশই বাড়ি চলে যায়, আর যারা বোর্ডিং-এ থেকে যায় তাদের হাতে থাকে অঢেল সময়; কাজেই এক ধরনের খুশিতে ভরা একঘেয়েমিতে তাদের দিনগুলি কাটে। আন্না মার্কভ্নার বাড়ির মেয়েরা শুধু পেটিকোট আর শেমিজ পরে, মুখ না ধুয়ে, চুল না আঁচড়ে, খোলা হাতে, কখনও বা খালি পায়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে এ-ঘরে ও-ঘরে ঘুরে বেড়ায়; কখনও পিয়ানোর চাবিতে টুং-টাং করে, কখনও অলসভাবে তাস বিছিয়ে ভাগ্য-গণনা করে, অকারণে ঝগড়া-ঝাটি করে, আর শ্রান্ত খিটখিটে মেজাজে সন্ধ্যার জন্য অপেক্ষা করে।

খাবার করে লিউব্কা বাড়তি রুটি ও মাংসের টুকরো নিয়ে আমোর-কে খেতে দিল; কিন্তু বেশীক্ষণ ভাল লাগল না। সে আর নিউরা মিলে সুগন্ধি মিছরি ও সূর্যমুখীর ফল কিনল; তারপর তাদের বাড়ি ও রাস্তার মাঝখানের বেড়ার পাশে দাঁড়িয়ে সূর্যমুখীর ফলগুলি খেতে লাগল আর খোসাগুলিকে থু-থু করে ফেলতে লাগল; কিছু কিছু খোসা তাদের থুতনি ও বুকেই লেগে রইল। সারাক্ষণ তারা আপন মনেই রাস্তার লোকজনদের সম্পর্কে নানা রকম মন্তব্য করছিল: বাতি-বরদার রাস্তার বাতিতে কেরোসিন ভরছে; একটি পুলিশ বগলে রেজিস্ট্রি-বই নিয়ে চলেছে; অন্য কোন বাড়ির বাড়িউলি মুদি-দোকানের দিকে ছুটে চলেছে।

নিউরা দেখতে ছোটখাট, গাঢ় নীল ঘূর্ণিত চোখ, শনের মত চুল, আর কপালে ছোট ছোট নীল শিরা। তার মুখে বোকা-বোকা সরল মানুষের ছাপ; দেখলেই ঈস্টার-কেকের উপরকার চিনির তৈরি সাদা মেষ-শাবকের কথা মনে পড়ে। সে প্রাণবন্ত, অস্থির, কৌতূহলী, সব ব্যাপারে নাক গলায়, সকলের কথায় সায় দেয়, সকলের আগে তার কানেই সব খবর পৌঁছয়, আর যখন সে কথা বলে তখন এমন থরথর করে যে ছোট ছেলেমেয়ের মত তার লাল ঠোঁট থেকে লালা গড়ায়

রাস্তার ও-পাশে একটি চাকর বীয়ারের দোকান থেকে বেরিয়ে ছুটে পাশের শুঁড়িখানায় ঢুকে গেল। চাকরটা যুবক, মাথায় কোঁকড়ানো চুল, মাতালের মত মুখ, ঘোলাটে চোখ।

নিউরা চেঁচিয়ে ডাকল, "প্রোখর আইভানিচ, হেই প্রোখর আইভানিচ, সূর্যমুখীর ফল খাবি?"

লিউব্‌কা বলে উঠল, "আয় না, দেখে যা।"

দম-আটকে-আসা হাসি হাসতে হাসতে নিউরা নাকি সুরে বলল :

"তোর পা দুটো গরম করে দেব।"

তাদের পিছনে সদর দরজাটা খুলে গেল ; বড় বাড়িউলির দুর্জয় কঠোর মূর্তিটা চৌকাঠের উপর দেখা দিল।

জোর গলায় আদেশের সুরে সে বলল "কী লজ্জার কথা! কতবার তোমাদের বলতে হবে যে দিনের বেলা কখনও রাস্তায় যাবে না, আর···ধিক তোমাদের! তাও এই পোষাকে! তোমাদের কি লজ্জাসরম নেই? ভাল মেয়ে বা, যাদের আত্মসম্মানের জ্ঞান আছে, তারা কখনও সদরে এসে এ রকম ব্যাভার করে না! তোমাদের মনে রাখতে হবে যে, তোমরা সৈনিকদের পাকড়াও করবার মত সস্তা বাড়িতে থাক না, তোমরা আছ একটা অভিজাত বাড়িতে। মালয়া ইয়াম্স্কায়াতে নয়!"

মেয়েরা বাড়ির ভিতরে ঢুকে সোজা রান্নাঘরে চলে গেল। সেখানে একটা টুলের উপর পা ঝুলিয়ে বসে অনেকক্ষণ ধরে খিটখিটে রাঁধুনি প্রাস্কোভিয়াকে দেখতে লাগল আর নিঃশব্দে সূর্যমুখীর ফল চিবুতে লাগল।

কয়েকটি মেয়ে ছোট মাংকার ঘরে জমেছে। তাকে কুৎসা-কুটনি-মাংকা এবং ছোট সাদা মাংকা বলেও ডাকা হয়। মাংকা এবং জোয়া নামে আর একটি মেয়ে বিছানার এক কোণে বসে তাসের "ছেষট্টি" খেলছে। জোয়া লম্বা, সুন্দরী, ভুরু দুটি বাঁকানো, কিছুটা ঠেলে-ওঠা ধূসর চোখ, আর মুখটা রুশ বেশ্যাদের মতই কিছুটা বিবর্ণ ও দয়ালু। মাংকার ঘনিষ্ঠ বন্ধু জেনি তাদের পিছনে বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। ধূমপান করতে করতে সে দুমা-র "রাণীর নেকলেস (The Queen's Necklace)" নামক একটা ছেঁড়া বই পড়ছে। এ বাড়িতে একমাত্র সেই পড়তে ভালবাসে, এবং যা পায় তাই নির্বিচারে একনাগাড়ে পড়ে। কিন্তু এ অবস্থায় যে রকমটা আশা করা যায় তা হয় নি। অনবরত দুঃসাহসিক উপন্যাস পড়া সত্ত্বেও তার মনে কোন রকম ভাবালুতা জন্মে নি, আর তার কল্পনাকেও উদ্দাম করে তোলে নি। উপন্যাসের মধ্যে তার সব চাইতে ভাল লাগে খুব কৌশলে পাকিয়ে তোলা, দীর্ঘস্থায়ী ষড়যন্ত্র, আবার দক্ষতার সঙ্গে সে রহস্যের উন্মোচন ; সেই সব দ্বৈত-যুদ্ধ যেখানে ভাইকাউণ্ট প্রথমেই এমন ভাবে জুতোর ফিতে খুলে ফেলবে যাতে মনে হবে যে তার জায়গা থেকে সে এক পাও নড়বে না, আর মার্কুইস তার তলোয়ারের

ফলাটা কাউন্টের শরীরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে তার সুন্দর নতুন ওয়েস্টকোটটা ফুটো করার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে। তার ভাল লাগে, উপন্যাসের নায়করা থলি-ভর্তি মোহর নিয়ে ডাইনে-বাঁয়ে ছড়িয়ে দেবে; চতুর্থ হেনরির প্রেমের ব্যাপার ও সরস কথাবার্তা—এক কথায়, ফরাসি ইতিহাসের সোনা ও লেস-ঘটিত যত রাজ্যের বীরত্ব-গাথা। কিন্তু প্রাত্যহিক জীবনে জেনির মাথা বেশ ঠাণ্ডা, লোককে ব্যঙ্গ করতে একটু ভালবাসে, বাস্তববুদ্ধি আছে, আর কিছুটা ঈর্ষাপরায়ণও বটে। অন্য মেয়েদের সঙ্গে তার সম্পর্ক অনেকটা বোর্ডিং স্কুলের সব চাইতে শক্তিমান ছেলে, বা একই ক্লাসে পিছিয়ে থাকা ছেলে, অথবা ক্লাসের সব চাইতে সুন্দরী মেয়েটির মত—তার স্বেচ্ছাচারিতাকে সকলেই ভালবাসে। তার চেহারা লম্বা, একহারা; পিঙ্গলবর্ণা, দুটি সুন্দর বাদামী চোখে অগ্নিজ্বালা, ছোট, গর্বিত মুখে উপরের ঠোঁটে ঈষৎ গোঁফের আভাষ, গালের গাঢ় লাল রঙে অসুস্থতার ইঙ্গিত।

সিগারেটটা মুখ থেকে না নামিয়ে, ধোয়া থেকে চোখদুটোকে বাঁচিয়ে ভেজা আঙুল দিয়ে সে বইয়ের পাতা উল্টে চলেছে; ঠ্যাং দুটো হাঁটু পর্যন্ত খোলা, আর প্রকাণ্ড বড় কুৎসিত দুটো পায়ের বুড়ো আঙুল থেকে খানিকটা কদাকার কিম্ভূতকিমাকার মাংসপিণ্ড ঠেলে বেরিয়ে এসেছে।

বিছানার উপর আর বসে আছে তামারা; পা দুটো ভেঙে মাথা নীচু করে সেলাই করছে। মেয়েটি শান্ত, সুন্দরী, মিশুক; মাথার গাঢ় লাল চুল শীতকালীন শেয়ালের পিঠের লোমের মত চকচক করছে। লোকে বলে, তার আসল নাম ছিল গ্লিকেরিয়া বা লুকেরিয়া। কিন্তু পতিতালয়গুলিতে প্রচলিত নিয়মানুসারে মাত্রেনা, আগাফিয়া, সাইক্লিতিনিয়া প্রভৃতি সাধারণ নামকে আরও শ্রুতিমধুর, এবং সম্ভব হলে বিদেশী নামে বদলে দেওয়া হয়। তামারা আগে সন্ন্যাসিনী ছিল; হয়তো কোন মঠে শিক্ষানবীশ ছিল; তার বিবর্ণ ঘোলাটে মুখে এখনও অল্পবয়স্কা সন্ন্যাসিনীদের মত একটা ভীত, সতর্ক, শান্ত ভাব আছে। সে একা-একা থাকে, অন্য মেয়েদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতায় না, অতীত জীবনের গোপন কথাও কাউকে বলে না। সম্ভবত সন্ন্যাসিনী হওয়া ছাড়াও অতীত জীবনের আরও অনেক কীর্তি তার আছে। তার দ্রুত কথা বলা, দৃঢ় সন্নিবদ্ধ সোনালি চোখের দীর্ঘ আনত পল্লব, এবং একটি বিনম্র অথচ অধঃপতিত বাকসর্বস্ব সাধ্বীর মত দন্তবিকাশ ও উচ্চারণ-ভঙ্গী—এ সব কিছুর মধ্যে একটি রহস্যময়, স্বল্পবাক অপরাধীর আভাষ যেন পাওয়া যায়। একদা ঘটনাচক্রে মেয়েরা সশ্রদ্ধ আতংকে অভিভূত হয়ে তামারাকে গড়গড় করে ফরাসি ও জার্মান ভাষায় কথা বলতেও শুনেছিল। তামারার ভিতরে একটা সুসংহত শক্তি আছে। তার বাইরেকার ঠাণ্ডা মেজাজ ও সকলকে মেনে চলার স্বভাব সত্ত্বেও এ বাড়ির সকলেই তাকে সম্মানের চোখে দেখে—মালাকন, মেয়েরা, দু'জন বাড়িউলি, এমন কি সেই দরোয়ানটি পর্যন্ত যে এই পতিতালয়ের

আসল সুলতান—এখানকার পবিত্র আতংক ও নায়ক।

যে তুরুপের তাসটা উল্টো করে পাতা ছিল সেটাকে তুলে নিয়ে জোয়া বলে উঠল, "এই চেপে দিলাম, আর চল্লিশ ফেললাম। তারপর খেললাম ইস্কাবনের টেক্কা; অতএব মানিচ্‌কা, আমাকে দশ-করাটা দিয়ে দাও বাপু। আমি বেরিয়ে গেলাম! সাতান্ন, এগারো, আটষট্টি। তোমার কত আছে?"

অভিমানক্ষুব্ধ আহত গলায় মাংকা জবাব দিল, "ত্রিশ। তুমি তো খুব ভাল খেলছ। প্রতিটি চাল তোমার মনে থাকে। ঠিক আছে, তাস বেটে দাও। তারপর কি হল তামারচ্‌কা?" সে বন্ধুকে ডেকে বলল, "তুমি বলে যাও, আমি শুনছি।"

জোয়া পুরনো তেলচিটে তাসগুলি শাফ্‌ল্ করে দিলে মাংকা কেটে দিল এবং আঙুলে থুতু লাগিয়ে সে তাসটা বেটে দিল।

এদিকে সেলাই থেকে চোখ না তুলেই তামারা নীচু গলায় মাংকার সঙ্গে কথা বলতে লাগল।

"জড়ির মোটা সেলাইর সাহায্যে আমরা বেদীর আসন, পানপাত্রের ঢাকনা, আর্কবিশপের পোষাক—সব কিছুতে নক্সা করে দিতাম। ছোট ছোট ঘাস, ফুল ও ক্রুশ-চিহ্নের নক্সাও আঁকতাম। শীতের সময় আমরা জানালার পাশে বসতাম। জাফরি-বসানো ছোট ছোট জানালা দিয়ে বেশী আলো ঢুকত না; ঘরটা তেল, ধুনো ও সাইপ্রেসের গন্ধে ভরা থাকত। আমাদের কথা বলতে দেওয়া হত না; বড় মাতাজি ছিল ভারী কড়া। তাই আমাদের মধ্য থেকে একজন কেউ "লেন্তেন" মন্ত্রের প্রথম কলিটা গেয়ে উঠত···'হে স্বর্গবাসী, আমার স্তব ও গান তুমি শোন।' আমরা ভাল গাইতাম, সুন্দর গাইতাম; জীবন ছিল শান্ত, গন্ধ ছিল মনোরম, আর জানালার বাইরে পড়ত বরফ···ঠিক যেন স্বপ্নের মত···"

জেনি ছেঁড়া বইটা পেটের উপর রেখে জোয়ার মাথার উপর দিয়ে একটা সিগারেট ছুঁড়ে দিয়ে ঠাট্টা করে বলে উঠল:

"তোমার শান্ত জীবনের সব কথাই আমরা জানি! বাচ্চাগুলোকে তোমরা স্নানের ঘরে ছুঁড়ে ফেলে দিতে! তোমাদের ওই সব পুণ্যস্থানে শয়তান সর্বদাই ঘুরে বেড়ায়।"

"আমি চল্লিশ দিয়ে শুরু করলাম। আমার ছেচল্লিশ ছিল! এ খেলায়ও আমার জিত!" উত্তেজনায় হাততালি দিয়ে মাংকা বলে উঠল। "এবার আমি তিন দিয়ে শুরু করছি।"

জেনির কথায় তামারা একটুখানি মৃদু হাসল; তাতে তার ঠোঁট দুটিও নড়ল না, শুধু তার মুখের কোণে এমন কতকগুলি ছোট, লাজুক, রহস্যময় টোল পড়ল যা লিওনার্দো দা ভিঞ্চির আঁকা মোনালিসা-র ছবিতেই দেখা যায়।

সে বলল, "সাধারণ মানুষ সন্ন্যাসিনীদের নিয়ে গাল-গল্প বানাতে ভালবাসে। আর পাপ যদি কিছু ঘটেই থাকে তাতেই বা কি?"

"যদি পাপ না কর, তাহলে প্রায়শ্চিত্তও করতে হয় না," গম্ভীরভাবে কথাগুলি বলে জোয়া আঙুল ভেজাবার জন্য মুখে ঠেকাল।

"জড়ি দেখতে দেখতে চোখ ব্যথা না করা পর্যন্ত তোমরা ঠায় বসে সেলাই কর, আর সকাল বেলাকার প্রার্থনার সময় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমাদের পিঠ ও পা ব্যথা করে। সন্ধ্যায় আবার প্রার্থনা। বড় মাতাজির দরজায় টোকা দিয়ে তোমরা গাও : 'প্রভু আমাদের সন্তদের প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হয়ে আমাদের কৃপা কর!' আর বড় মাতাজি তার ঘরের ভিতর থেকেই গম্ভীর গলায় বলে 'আ-মেন!"

জেনি এক দৃষ্টিতে তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল, তারপর মাথা নেড়ে জোর গলায় বলল :

"তুমি একটি অদ্ভুত মেয়ে তামারা। তোমাকে দেখে আমি অবাক হয়ে যাই। সোংকার মত মেয়েরা কোন প্রেমে পড়ে সেটা আমি বুঝতে পারি। তার কারণ তারা বোকা। কিন্তু আমি তো জানি, তোমাকে আগুনে পোড়ানো হয়েছে, ক্ষারজলে ধোয়া হয়েছে, তথাপি তুমি এ রকম বোকার মত কাজ করছ? এই শার্টটায় তুমি ফুল তুলছ কেন?"

তামারা ধীরে সুস্থে কাপড়টা আবার হাঁটুর উপর রাখল, অঙ্গুলিত্রান দিয়ে সেলাইয়ের জোড়টাকে ভাল করে সমান করল, এবং ঘাড়টাকে সামান্য বেঁকিয়ে ছোট চোখ দুটো না তুলেই কথার জবাব দিল।

"কিছু একটা তো করতে হবে। নইলে যে বড়ই একঘেয়ে লাগে। আমি তাস খেলি না। খেলতে ভালও লাগে না।"

জেনি মাথা নাড়তে লাগল।

"তুমি একটি অদ্ভুত মেয়ে তামারা। সব সময়ই তুমি খদ্দেরদের কাছ থেকে আমাদের চাইতে বেশী পাও। কিন্তু সে টাকা না জমিয়ে বোকার মত তুমি এক বোতল সাত রুবল দামের আতর কিনে সে টাকা খরচ কর। কেন কর? তাছাড়া, পনেরো রুবল দিয়ে সিল্ক কিনেছ। সেটা তো তোমার সেংকার জন্য, তাই না?"

"সেনেচকার জন্য তো বটেই।"

"তুমি কি গুপ্তধন পেয়েছ? একটা ছিঁচকে চোর। এখানে আসে যেন প্রধান সেনাপতি! তোমাকে যে সে মারধোর করে না সেটাই আশ্চর্য। এই সব চোররা তো তাই করতে ভালবাসে। অবশ্য, সে তোমাকে ভালই দোহন করে।"

দাঁতে সুতো কাটতে কাটতে সে শান্তভাবেই বলল, "আমার যা ইচ্ছা হয় শুধু তাই তাকে দেই।"

"তাতেই তো আমি অবাক হই। তোমার মত বুদ্ধি, তোমার মত চোখ যদি আমার থাকত তাহলে আমি তো এমন একটি ধনী মক্কেলকে পাকড়াও করতাম যে আমাকে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে রাখত। তাহলে আমার নিজের গাড়ি থাকত, হীরে-জহরৎ থাকত।"

"ওটা যার যার রুচির ব্যাপার জেনিচ্কা। তুমিও তো সুন্দরী, ভাল মেয়ে। তোমার একটা স্বাধীন সাহসী সত্তা আছে। তবু আমরা, তুমি আর আমি, এখানে আন্না মার্কভ্নার মাটি কামড়ে পড়ে আছি।"

জেনি জ্বলে উঠল; তিক্ত গলায় জবাব দিল।

"হ্যাঁ, ঠিক তাই! তোমার কপাল ভাল। ভাল খদ্দেরগুলোই তোমার জোটে। তাদের নিয়ে তোমার যা ইচ্ছা তাই কর। আর আমার বেলা—হয় কোন বুড়ো, নয়তো কোন খোকা। আমার কপালই খারাপ। কারও নাক দিয়ে সিকনী ঝরছে। অন্যগুলোকে দেখলেই হলুদ-মুখ মুরগির ছানার কথা মনে পড়ে। দেখ, আমার সব চাইতে খারাপ লাগে তরুণ বয়সের ছেলেগুলোকে। ছোকরারা ভয়ে-ভয়েই ঘরে ঢোকে, তাড়াহুড়ো করে, ভয়ে কাঁপে, আর কাজ সারা হলে এতই লজ্জা পায় যে চোখ তুলে তাকাতে পর্যন্ত পারে না। মনে হয় দেই একটা চড় কসিয়ে। রুবলটা দেবার আগে সেটাকে পকেটের মধ্যে এমন শক্ত করে মুঠোর মধ্যে ধরে রাখে যে রুবলটা গরম হয়ে যায়, ঘামে চটচট করে। বোলোগ্না-মশলা লাগানো একটা ফরাসি রুটির জন্য মা হয় তো তাকে দশ কোপেক দিল; তার থেকেই টাকা বাঁচিয়ে সে মেয়েদের কাছে আসে। সেদিন একটি শিক্ষানবীশ সৈনিক এসেছিল। তাকে বললাম: 'দেখ ডিয়ার, তোমার জন্য মিছরি এনে রেখেছি; এটা খেয়ে সৈনিক-বিদ্যালয়ে ফিরে যাও।' প্রথমটা সে গোসা করল, কিন্তু তারপরই সেটা হাতে নিল।—উপর থেকে তাকে আমি লক্ষ্য করেছিলাম। বাইরে বেরিয়েই সে একবার চারদিকে তাকাল, তারপর তড়িঘড়ি মিছরিটা গপ্ করে মুখের মধ্যে ফেলে দিল। শুয়োরের বাচ্চা।"

"দেখ, বুড়োদের ব্যাপার আরও বাজে।" নরম গলায় কথাটা বলে মাংকা কৌতুকভরে জোয়ার দিকে তাকাল। "তুমি কি বল জোয়া?"

খেলা শেষ করে জোয়া তখন একটা হাই তুলছিল। মাঝপথেই হাইটা ভেঙে গেল। সে বুঝতে পারল না, রাগবে না হাসবে। তার একজন বাঁধা খদ্দের আছে, একজন পদস্থ সরকারী কর্মচারি; বেশ বুড়ো; তার কতকগুলি বিকৃত রতি-রীতি আছে। বাড়ির সকলেই তাকে নিয়ে মজা করে।

শেষ পর্যন্ত জোয়া হাইটা শেষ করল।

হাই তোলার দরুন কর্কশ গলায় বলল, "আঃ, থামো তো। নরকে পচে মরুক, ব্যাটা জারজ!"

জেনি গম্ভীর গলায় বলল, "আর এসব থেকে—জেংকা, তোমার বুড়ো ডিরেক্টারের চেয়ে, আমার শিক্ষানবীশ সৈনিকের চেয়েও খারাপ হল তোমার

সাগর। মদ খেয়ে আসে, হৈ-হল্লা করে, টিটকিরি দেয়, বড়লোকের ভাব দেখায় —কিন্তু আসলে ঠন্-ঠন্। হা-ঘরের হা-ঘরে, নোংরা, পচা, শরীরময় ঘা, থাকার মধ্যে আছে শুধু তামারার দেওয়া সিল্কের শার্টটা! এসেই শাপ-মন্যি শুরু করে, গালাগাল করে, ব্যাটা কুকুরীর বাচ্চা! একটা ঝগড়া পাকাবার তালেই আছে। উঃ! না!" হঠাৎ সে উত্তেজিত খুশির সুরে বলে উঠল, "আমি যাকে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে সত্যি ভালবাসি, চিরদিন ভালবাসব, সে আমার মানেচ্‌কা. সাদা মাংকা, ছোট মাংকা, আমার কুৎসা-কুটনি-মাংকা!"

অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ সে দুই হাতে মাংকার গলা জড়িয়ে ধরে তাকে কাছে টেনে নিল, তারপর তাকে বিছানায় ফেলে তার চুলে, চোখে, ঠোঁটে সমানে চুমু খেতে লাগল। মাংকা অনেক কষ্টে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল; তার পরিপাটি ঝকঝকে চুল এলোমেলো হয়ে গেল, মুখ লাল হয়ে উঠল, হতবুদ্ধি হয়ে হাসতে হাসতে তার আনত চোখ দুটি ভিজে উঠল।

"থাম জেনিচ্‌কা, আমাকে ছেড়ে দাও। তোমার হল কি? আমাকে ছেড়ে দাও.।"

সারা বাড়িতে ছোট মানিয়া হল সব চাইতে শান্ত ও নরম মেয়ে। সে সকলের সঙ্গে সদয় ব্যবহার করে, সকলের কথা শোনে, কারও অনুরোধ অমান্য করে না; তাই সকলেই তাকে খুব ভালবাসে। যে কোন তুচ্ছ ব্যাপারেই তার চোখ-মুখ লাল হয়ে ওঠে; তখন যে কোন নীল-নয়না সুন্দরীর মতই সে মনোরমা হয়ে ওঠে। কিন্তু তার প্রিয় পানীয় "বেনেডিক্টাইন" তিন-চার গ্লাস খেতে দাও, অমনি আর তাকে চেনা যাবে না; এমন হৈ-হল্লা বাঁধিয়ে বসবে যে বাড়িউলিরা ছুটে আসবে, দরোয়ান ছুটে আসবে, এমন কি পুলিশ পর্যন্ত ছুটে আসবে। যে কোন খদ্দেরের মুখে থাপ্পড় বসানো, বা তার চোখে এক গ্লাস মদ ছিটিয়ে দেওয়া, বা বাড়িউলিকে শাপ-শাপান্ত করা তার কাছে কিছুই না। তথাপি জেনি তার প্রতি অদ্ভুত নরম ব্যবহার করে, আদিম সরলতায় তাকে ভালবাসে।

করিডর দিয়ে ছুটে যেতে যেতে বাড়িউলি জোসিয়া হাঁক দিতে লাগল, "ওগো মেয়েরা! খাবার দেওয়া হয়েছে, খাবার!" ছুটতে ছুটতেই সে মাংকার ঘরের দরজা খুলে সংক্ষেপে জানাল:

"খাবার, ওগো মেয়েরা, খাবার দেওয়া হয়েছে।"

সেই রকম স্বল্পবাসে, হাত মুখ না ধুয়েই কেউ চটি পায়ে, কেউ বা খালি পায়ে গিয়ে রান্না-ঘরে ঢুকল।

প্রথমে পরিবেশন করা হল শুয়োরের চর্বি ও টোমাটোর একটা সুস্বাদু ঝোল, তারপর মাংসের বড়া ও মাখন ভর্তি বিস্কুট। কিন্তু একে তারা সারাদিন শুয়ে বসে কাটিয়েছে, তার উপর ছুটির দিনে বোর্ডিং-স্কুলের ছাত্রদের মত অধিকাংশ মেয়েই দোকানে লোক পাঠিয়ে তুর্কী খাবার, বাদাম, চাটনি ও মাখন-

মিছরি আনিয়ে পেট ভরিয়েছে; কাজেই এখন কারওই খিদে নেই। শুধু নিনা বলে একটি ছোটখাট থাঁদা নাক, নাকি-সুর চাষীর মেয়ে চারজনের খাবার একাই খেয়ে নিল। মাস দুয়েক আগে একটি ভ্রাম্যমান সেলসম্যান মেয়েটিকে ভুলিয়ে এনে একটা পতিতালয়ে বেচে দিয়েছে। সাধারণ মানুষের অপরিমিত, বিবেচনাহীন ক্ষুধা এখনও তার পেট থেকে চলে যায় নি।

জেনি সবে মাংসের বড়াটা একটুখানি ঠুকরে খেয়েছে আর অর্ধেকটা পিঠে খেয়েছে; নকল আদরের সুরে সে বলল, "দেখ নিনা, আমার মাংসের বড়াটাও তুমি খাবে। খাও বাছা, খাও। লজ্জা করো না, তোমাকে আরও শক্তসমর্থ হতে হবে। কেন এ কথা বলছি জান কি মেয়েরা?" সঙ্গীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে সে বলতে লাগল, "আমাদের নিনার পেটের মধ্যে নিশ্চয় ফিতে-ক্রিমি আছে। পেটে ফিতে-ক্রিমি হলেই লোকে দু জনের মত খায়, নিজের জন্য আর ফিতে-ক্রিমির জন্য।"

নিনা ভীষণ রেগে গিয়ে এমন গভীর নাকি সুরে কথার জবাব দিল যেটা তার মত চেহারার মানুষের পক্ষে খুবই বিস্ময়কর!

"ফিতে-ক্রিমি আমার নেই, আছে তোমার; তাই তোমার ও রকম শুটকি চেহারা।"

সে কিন্তু নির্বিকারভাবে খেতে লাগল। খাবার পর অজগর সাপের মতই তার ঘুম পেয়ে গেল। সে ঢেঁকুর তুলল, জল খেল, হেঁচকি খেল। তারপর যখন দেখল কেউ আর তার দিকে তাকিয়ে নেই তখন অভ্যাস মত মুখের উপর একটা ক্রশ চিহ্ন আঁকল।

কিন্তু ততক্ষণে করিডরে ও ঘরে ঘরে জোসিয়ার কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হতে লাগল:

"মেয়েরা, সাজগোজ কর, সাজগোজ কর···আর বসে থেকো না···এবার কাজে যাও!"

কয়েক মিনিট পরেই সেই বাড়ির প্রতিটি ঘর ভিজে চুল, বোরিক সাবান আর সস্তা প্রসাধন-সামগ্রির গন্ধে ভরে উঠল। মেয়েরা সন্ধ্যার জন্য সাজগোজ করছে।

৪

বিলম্বিত গোধূলি নেমে এসেছে পৃথিবীর বুকে। তারপর নামল উষ্ণ গাঢ় অন্ধকার। তবু আকাশে তখনও একটা গাঢ় লাল রঙের ঝলকানি রয়ে গেছে, বুঝি বা মাঝ রাত পর্যন্তই সে রং ধিকিধিকি জ্বলতে থাকবে। বাড়ির দরোয়ান সাইমিয়ন বৈঠকখানা ঘরের দেয়ালের সবগুলো আলো জ্বেলে দিয়েছে; ঝাড়-লণ্ঠনটা এবং ফটকের উপরকার লাল লণ্ঠনটাও জ্বেলে দিয়েছে। সাইমিয়ন লোকটি ঈষৎ কুঁজো, স্বল্পভাষী ও কড়া প্রকৃতির; তার কাঁধ দুটো চওড়া, চুল কালো, মুখে বসন্তের দাগ। তার ভুরু ও গোঁফের মাঝে মাঝেও ফাঁক—সেও

বসন্ত রোগেরই চিহ্ন ; বড় বড় চোখ দুটি কালো ও ঘোলাটে। সারাদিন তার কোন কাজ থাকে না, পড়ে-পড়ে ঘুমোয় ; কিন্তু রাত হতেই সামনের হলে ঝকঝকে আলোর নীচে সে খাড়া পাহারায় থাকে ; খদ্দের এলেই তাদের কোট খুলতে সাহায্য করে ; কোন গোলযোগ হলে তাতে হাত লাগায়।

পিয়ানো-বাদক আগেই এসেছে—লম্বা, সুদর্শন যুবক, ভুরু ও চোখের পল্লব শনের মত প্রায় সাদা, ডান চোখে ছানি পড়েছে। খদ্দেররা এসে পড়বার আগেই সে আর ইসায়া সাব্বিচ একটা স্পেনীয় নাচের গৎ মহলা দিতে লাগল ; এ-নাচটা সে সময় খুব চলতি হয়েছে। খদ্দেররা যে কোন নাচের বাজনার ফরমাস করলেই তারা হাল্কা নাচের জন্য ত্রিশ কোপেক আর কোয়াড্রিলের জন্য পঞ্চাশ কোপেক করে পায়। সে টাকা অর্ধেক যায় মালকিন আন্না মার্কভ্‌নার হাতে, আর বাকি অর্ধেকটা তাদের দু জনের মধ্যে ভাগ হয়। এইভাবে পিয়ানো-বাদকটি পায় উপার্জনের মাত্র সিকি ভাগ ; সেটা মোটেই সঙ্গত নয়, কারণ ইসায়া সাব্বিচ নিজে নিজে শিখেছে, তাছাড়া সুরের কানও তার নেই। পিয়ানো-বাদক বাধ্য হয়ে অনবরতই তাকে নতুন নতুন সুর শিখিয়ে দেয়, তার ভুল শুধরে দেয়, এবং সজোরে বাজিয়ে সে সব ভুল চাপা দিয়ে দেয়। মেয়েরা খদ্দেরদের কাছে গর্ব করে বলে যে পিয়ানোবাদক স্কুলে বাজনা শিখত, আর ক্লাসে সব সময় প্রথম হত, কিন্তু যেহেতু সে ইহুদি, আর যেহেতু সেই সময় তার চোখের গোলমাল হল, তাই সে বাজনার কোর্সটা শেষ করতে পারে নি। সকলেই তার প্রতি সদয় ব্যবহার করত, তার দুঃখে সহানুভূতি দেখাত। এই সব কুখ্যাত বাড়ির ভিতরকার পশ্চাৎ-মঞ্চে এ দৃশ্য হামেসাই দেখা যায় ; সেখানকার বাহ্যিক কর্কশতা ও উদ্ধত অশ্লীলতার অন্তরালে বয়ে চলে সেই মধুর, উচ্ছ্বসিত আবেগের ধারা যেমনটি দেখা যায় মেয়েদের প্রতিষ্ঠানে আর কঠোর শ্রম-কেন্দ্র কারাগারে।

আন্না মার্কভ্‌নার বাড়ির সব মেয়েই সেজেগুজে খদ্দের ধরবার জন্য তৈরি হয়েছে। যদিও সাধারণতই তারা পুরুষদের সম্পর্কে খুবই উদাসীন, তবু প্রতিটি সন্ধ্যার প্রথম দিকে তাদের বুকও অস্পষ্ট আশায় জীবন্ত হয়ে ওঠে। তারা কেউ জানে না কে কাকে পছন্দ করবে ; অসাধারণ, হাস্যকর অথবা উত্তেজনাপূর্ণ কিছু ঘটবে কি না ; কোন খদ্দেরের উদারতা কি তাদের বিস্মিত করে দেবে ; অথবা কোন অলৌকিক ঘটনা কি তাদের জীবনের গতি-পথকেই ঘুরিয়ে দেবে ? তাদের মনের এই বাসনা ও আশা অনেকটা খেলা শুরু করবার আগে পাড় জুয়ারির মনের ভাবনারই অনুরূপ। তাছাড়া যৌন-প্রেরণা যতই থাকুক তবু তারা তো নারীর প্রধান প্রবৃত্তিতে কামনাকে হারিয়ে ফেলে নি—সে কামনা হল সকলের মনে প্রশংসা জাগিয়ে তোলা।

সত্যি কথা বলতে কি, এ সব বাড়িতেও মাঝে মাঝে বিচিত্র সব লোকের আবির্ভাব ঘটে ; ঘটে অপ্রত্যাশিত সব অভিনব ঘটনা। যেমন, হঠাৎ পুলিশ

এল ; সঙ্গে সাদা-পোষাকের লোকজন ; একজন সম্ভ্রান্ত-দর্শন লোককে গ্রেপ্তার করে মারতে মারতে নিয়ে গেল। কখনও বা মাস্তান বদমাসদের মধ্যে লড়াই বেধে গেল, আর সব বাড়ি থেকে দরোয়ানরা ছুটে এল সাহায্য করতে। এই সব লড়াইতে জানালার কাঁচ ও পিয়ানোর ঢাকনা ভাঙে ; ভাল চেয়ারগুলোর পায়া অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হয় ; মেঝে আর সিঁড়ি রক্তে মাখামাখি হয় ; সদর দরজার সামনে আহত লোকগুলি কাদার মধ্যে গড়াগড়ি যায়। জেনি তখন উল্লসিত জন্তুর মত জলন্ত চোখে তীব্রভাবে হাসতে হাসতে সেই মারামারির মধ্যে ছুটে যায়, আর দুই উরু চাপড়াতে চাপড়াতে কুৎসিত সব মন্তব্য করে তাদের লড়াইতে উৎসাহ জোগায়। বাকি মেয়েরা ভয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে বিছানার নীচে লুকিয়ে পড়ে।

কখনও-সখনও সার্কাসের কোন খেলোয়াড় এসে হাজির হয়। নীচু সিলিং-এর ঘরগুলিতে তাকে শোবার ঘরে ঘোড়ার মতই বড়ই বেমানান লাগে। কখনও বা আসে নীল কুর্তা, সাদা মোজা ও লম্বা বেণী ঝোলানো কোন চীনাম্যান ; কখনও বা নাইট ক্লাব থেকে কোন নিগ্রো আসে ; তার পরণে "টুকেসডো" ও চেক-কাটা ট্রাউজার, বোতামের ঘরে ফুল গোঁজা, মার-দেওয়া সাদা শার্ট গায়ে ; মেয়েরা দেখে অবাক হয়ে যায় যে, সাদা শার্টটা কালো চামড়ার ছোঁয়া লেগে নোংরা হয়ে যায় না, বরং সাদা রংটা আরও ঝকঝক করে।

এই সব বিরল খদ্দেররা বারবনিতাদের পরিতৃপ্ত কল্পনাকে উদ্দীপিত করে, তাদের অপস্থত যৌন-ক্ষুধা ও বৃত্তিগত কৌতূহলকে উত্তেজিত করে, আর প্রায় মোহাচ্ছন্নের মত তারা সকলেই ঈর্ষান্বিত হৃদয়ে এদের পিছনে পিছনে ছোটে।

একদিন সাইমিয়ন বসবার ঘরের দরজা খুলে দিলে শহরের লোকের মত সাদাসিদে পোষাক পরা একটি বয়স্ক লোক ঘরে ঢুকল। তার চেহারায় বৈশিষ্ট্য কিছু ছিল না ; একটা কড়া সরু মুখ, চোয়ালের শক্ত হাড় দুটো দুষ্ট লোকের মত ঠেলে বেরিয়েছে, নীচু কপাল, পেনার মত আকারের দাড়ি, ঘন ভুরু, একটা চোখ আরেকটা চোখের তুলনায় উপরে বসানো। ঘরে ঢুকেই সে ক্রুশ-চিহ্ন আঁকবার জন্য তিনটে আঙুল কপালে তুলল, কিন্তু ঘরের কোণগুলিতে চোখ ফেলে কোন দেব-মূর্তি না দেখতে পেয়েও মোটেই বিচলিত বোধ করল না। হাত নামিয়ে থুতু ফেলল। এবং কাজের লোকের মত পতিতালয়ের সব চাইতে মোটা মেয়ে কাত্‌কার দিকে এগিয়ে গেল।

"এস," সংক্ষেপে নির্দেশ জানিয়ে মাথা হেলিয়ে সে দরজাটা দেখিয়ে দিল।

কিন্তু তার অনুপস্থিতিতে সর্বঘটে বিরাজমান সাইমিয়ন রহস্যময় গর্বিত ভঙ্গীতে তার বর্তমান সঙ্গী নিউরাকে সাত তাড়াতাড়ি জানিয়ে দিল যে এই লোকটির নাম ভাদ্‌চেংকো, ফাঁসির জল্লাদ অনুপস্থিত থাকায় স্বেচ্ছায় এগারো জন হাঙ্গামাকারীকে ফাঁসি দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল এবং মাত্র দুটি সকালেই

নিজের হাতে তাদের সকলকে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছিল। নিউরাও সঙ্গে সঙ্গে সব মেয়ের কাছ থেকেই কথাটা গোপন রাখবার প্রতিশ্রুতি আদায় করে ভয়ে চোখ গোল-গাল করে ফিস্‌ফিস্ করে খবরটা সকলকে বলে দিল। আর খুব ভয়ংকর ব্যাপার হলেও কাত্‌কাকে এ জন্য ঈর্ষা করল না এবং মাথা ঘুরিয়ে দেবার মত ভীতিজনক কৌতূহল অনুভব করল না সারা বাড়িটাতে এমন একটা মেয়েও ছিল না। আধ ঘণ্টা পরে ভ্যাদ্‌চেংকো যখন কঠোর, গম্ভীর মুখ করে চলে গেল তখন সব মেয়েগুলো বাক্যহারা হয়ে হাঁ করে সদর দরজা পর্যন্ত তার সঙ্গে সঙ্গে গেল এবং তারপর জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল সে রাস্তা ধরে হেঁটে চলেছে। তারপর তারা ছুটে গেল কাত্‌কার ঘরে; প্রশ্নে-প্রশ্নে তাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। সে তখন পোষাক বদলাচ্ছিল। মেয়েরা সবিস্ময়ে তার লাল, মোটা, খোলা বাহু ও দুমড়ানো বিছানাটার দিকে তাকিয়ে রইল। কাত্‌কা মোজার ভিতর থেকে বের করে একটা পুরনো তেলচিটে রুবল-বিল তাঁদের দেখাল। তাদের সে বেশী কিছু বলতে পারল না। "যে কোন মানুষের মত, অন্য সব মানুষের মতই একটি মানুষ"—বিব্রত হয়ে শুধু এইটুকুই সে তাদের বলতে পারল। কিন্তু পরে যখন সে জানতে পারল তার এই খদ্দেরটি কে ছিল তখন হঠাৎ নিজের অজ্ঞাতেই সে কেঁদে উঠল।

এই লোকটি, সমাজ-পরিত্যক্ত এই যে লোকটি অকল্পনীয় অধঃপতনের পথে নেমে গিয়েছে, এই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত জল্লাদটি তার প্রতি পাশবিক ব্যবহার করে নি; কিন্তু এমন দয়াহীন ব্যবহার করেছে, এত ঘৃণা ও কাষ্ঠ-কঠিন ঔদাসীন্য দেখিয়েছে যা কোন মানুষের প্রতি কেউ করে না, এমন কি কুকুর, ঘোড়া অথবা ছাতা, কোট বা টুপির প্রতিও মানুষ সে রকম ব্যবহার কখনও করে না। সে যেন একটা নোংরা জীব, তার জন্য একটি সাময়িক অনিবার্য প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল, আর যেই সে প্রয়োজন মিটে গেল অমনি সে হয়ে পড়ল অপ্রয়োজনীয় ও বিরক্তিকর। এই চিন্তাজনিত আতংক মোটা কাত্‌কার বুদ্ধির অতীত, কারণ তার মস্তিষ্কটা একটা মোটা তুর্কী মুরগির মত; আর তাই বিনা কারণে বিনা উদ্দেশ্যেই সে কাঁদতে লাগল।

এমনি আরও অনেক ঘটনাই ঘটে যার ফলে এই সব অসহায়, রুগ্ন, নির্বোধ অসুখী মেয়েগুলোর অন্ধকার জীবনে আলোড়ন দেখা দেয়। অসংযত ঈর্ষার ফলে রিভলবার থেকে গুলি ছোটে, বিষ খাওয়ানো হয়। খুব কদাচিৎ হলেও এই গোবরেই কখনও কখনও প্রেমের ফুল ফোটে। কখনও বা কোন মেয়ে তার ভালবাসার মানুষের সঙ্গে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যায়, অবশ্য প্রায়ই আবার ফিরেও আসে। দু'তিনবার এমনও হয়েছে যে পতিতালয়ের একটি মেয়ে গর্ভবতী হয়েছে; বাইরে থেকে দেখলে ব্যাপারটা হাস্যকর ও নিন্দনীয়, কিন্তু তার গভীরেও হয়তো থাকে হৃদয়স্পর্শী ঘটনা।

কিন্তু যাই ঘটুক না কেন, প্রতিটি সন্ধ্যাই একটি প্রত্যাশা নিয়ে আসে;

প্রতিটি সন্ধ্যাই এমন উত্তেজনাপূর্ণ, উৎকণ্ঠ ও সরস হয়ে দেখা দেয় যে এর পরে অন্য যে কোন জীবনযাত্রাই এই সব অলস, দুর্বলচিত্ত মেয়েদের কাছে নিরুত্তাপ ও একঘেয়ে লাগে।

৫

রাতের গন্ধে-ভরা অন্ধকার যাতে ঘরের মধ্যে ঢুকতে পারে সে জন্য জানালাগুলি পুরো খুলে দেওয়া হয়েছে ; জরির পর্দাগুলি ঈষৎ বাতাসে দুলছে। বাড়ির সামনেকার ছোট বাগান থেকে শিশির-ভেজা ঘাসের গন্ধ আসছে ; লিলাক-ফুলের মৃদু গন্ধ এবং ত্রিমূর্তি-দিবস উপলক্ষ্যে ফটকে সাজানো দুটো ছোট বার্চ-গাছের শুকনো পাতার গন্ধও ভেসে আসছে। লিউবা পড়েছে খুব নীচু কাটের গাঢ় নীল রঙের ভেলভেটের ব্লাউজ, আর নিউরা পড়েছে হাঁটু পর্যন্ত ঝোলানো লাল রঙের পিঠ-খোলা ব্লাউজ, জানালার গোবরাটে বসে দু জন দু জনের গলা জড়িয়ে ধরে তৎকালে গণিকাদের অত্যন্ত পরিচিত হাসপাতালকে নিয়ে রচিত একটা গানের কলি নীচু গলায় গাইছিল। নাকি সুরে প্রথম গাইছিল নিউরা, আর লিউবা তার দোহারকি করছিল :

"সোমবার এসেছে আবার,
সময় হয়েছে হাসপাতাল ছাড়বার,
কিন্তু ডাক্তার ক্রাসনভ্ অনুমতি দিল না যাবার···"

সবগুলো বাড়ির জানালাতেই আলো ঝলমল করছে, ফটকের মাথায় লাল লণ্ঠন ঝুলছে। ঠিক উল্টো দিকে অবস্থিত সোফিয়া ভাসিলিয়েভ্না-র বাড়ির বসবার ঘরের ভিতরটা ওরা দু'জনই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। ঝকঝকে হলুদ রং-করা মেঝে, দরজায় গাঢ় চেরি-রঙের পর্দা দড়ি দিয়ে বাঁধা, ঝলমলে পোষাক পরা মেয়েরা কখনও জানালায় আসছে, কখনও অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, আয়নায় তাদের ছায়া পড়ছে। ডান দিকে ত্রেপ্লেল-এর বাড়ির বাঁকা সদর দরজা একটা বড় গোলাকৃতি বাল্বের নীলাভ বৈদ্যুতিক আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

সন্ধ্যা বেলাটা শান্ত ও উষ্ণ। অনেক অনেক দূরে, রেল রাস্তা পেরিয়ে, কতকগুলি বাড়ির কালো ছাদ ও মাটির উপর নুয়ে-পড়া সরু সরু গাছগুলির ও পারে—সূর্যাস্তের একটা সোনালি লাল আভা গাঢ় নীল কুয়াশাকে ভেদ করে চলে গেছে। শহরের গোলমাল ভেসে আসছে ; অ্যাকর্ডিয়নের শ্রান্ত সুর, গাভীর ডাক, ফুটপাথের পাথরে কারও পায়ের শব্দ আর লাঠির ঠকঠকানি, কোন 'দ্রুস্কি'র চাকার মন্থর অসমান ঘড়-ঘড় শব্দ, সব মিলিয়ে তন্দ্রাতুর সন্ধ্যার একটা বিষণ্ণ আমেজ।

"এবার নার্স আসছে,
রুটি ও চিনি আনছে,
সমানভাবে সবাইকে তা বাটছে।"

বীয়ারের দোকানের ঝাকড়া-চুল চাকরটা এক দৌড়ে রাস্তা পার হচ্ছিল। নিউরা হঠাৎ তাকে ডাকতে লাগল, "প্রোখর আইভানিচ, হেই প্রোখর আইভানিচ!"

কর্কশ গলায় সে জবাব দিল, "কী ঝামেলা। কি চাই তোমার?"

"তোমার একটি বন্ধু তোমার কথা বলেছে। আজই তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে।"

"কোন্ বন্ধু?"

"খুব সুন্দর দেখতে। কালো চুল, বেশ পছন্দসই। বরং জিজ্ঞাসা কর তাকে কোথায় দেখেছি।"

"সত্যি, তাকে কোথায় দেখলে?" প্রোখর আইভানিচ এক মিনিটের জন্য থামল।

"বলছি কোথায়—পাঁচ নম্বর তাকের উপর যেখানে পুরনো টুপি রাখা হয় সেখানে গজাল মেরে আটকে রেখেছি. মরা বিড়ালগুলোকে আমরা তো সেখানেই রাখি।"

"উঃ, কী ফিচ্‌কে পাজি!"

নিউরার কর্কশ হাসির শব্দ রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ল। জানালার গোবরাটে শুয়ে পড়ে সে কালো মোজা পরা পা দুটো ঠুকতে লাগল। তারপরেই হঠাৎ বিস্মিত চোখে চারদিক দেখে নিয়ে ফিসফিস করে কথা বলল।

"ব্যাপার কি জান? গত বছরের আগের বছর সে একটি মেয়ের গলা কেটেছিল—হ্যাঁ, এই প্রোখর। ঈশ্বরের দিব্যি!"

"বল কি? মেয়েটা কি মারা গিয়েছিল?"

যেন দুঃখিত হয়েছে এমনিভাবে নিউরা বলল, "না, মারা যায় নি। সেরে উঠেছিল। কিন্তু তাহলেও দু'মাস তাকে এলেকজাণ্ড্রভ্‌স্কি হাসপাতালে কাটাতে হয়েছিল। ডাক্তাররা বলেছিল, আর একটু বেশী কাটলেই সে মরে যেত। বুঝলে?"

"এ কাজ করেছিল কেন?"

"তা আমি কেমন করে জানব! হয়তো টাকা ধার করে শোধ দেয় নি, বা তাকে ফাঁকি দিয়েছিল। সে ছিল মেয়েটার নাগর, তার কোট্‌না।"

"তার কি শাস্তি হয়েছিল?"

"কিছুই না। কোনরকম প্রমাণই ছিল না। একটা খোলা লড়াইয়ের ব্যাপার; একশো জন মিলে লড়াই করছিল। তাছাড়া মেয়েটা নিজে পুলিশকে বলেছে যে কে তাকে মেরেছে তা সে জানে না। প্রোখরই পরে বুক ফুলিয়ে বলেছে…'সেদিন ডাংকাকে খুন করি নি. কিন্তু আর একদিন বাগে পেলে শেষ করে দেব। আমি ছেড়ে দেব না—তার পাওনা তাকে পেতেই হবে।"

নিউরার শিরদাঁড়ার ভিতরটা কেঁপে উঠল।

আতংকিত নীচু গলায় সে বলল, "এই কোট্নায়া বড়ই বেপরোয়া জীব।"

"জান, পুরো একটা বছর আমি সাইমিয়নের সঙ্গে প্রেম চালিয়েছিলাম। কী বণ্ডা! কী দুরাচার! আমার সারা দেহে জায়গা ছিল না, মেরে-মেরে একেবারে লাল করে দিয়েছিল। অথচ তার রাগ করবার মত কিছুই আমি করি নি। না, না, মজা করবার জন্যই সে এ রকম করত। সকালে আমার ঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিয়ে অত্যাচার শুরু করত। হাত মুচড়ে দিত, মাই ধরে টানত, গলা টিপে ধরত। অথবা ভীষণভাবে চুমু খেতে শুরু করত, তারপর ঠোঁট কামড়ে রক্ত বের করে দিত, হ্যাঁ, ফিন্কি দিয়ে রক্ত ঝরত। আমি তখন কেঁদে ফেলতাম, আর ঠিক সেটাই সে চাইত। বুনো পশুর মত সে—আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত, তার সারা শরীর কাঁপত। শেষ সেণ্টটি পর্যন্ত আমার সব টাকা সে নিয়ে যেত! এক প্যাকেট সিগারেট কিনবার পয়সাও হাতে থাকত না। সাইমিয়ন লোকটা খুব কঞ্জুস; সব টাকা জমায়···সে বলে, এক হাজার রুবল জমলেই মঠে চলে যাবে।"

"তারপর বল!"

"ঈশ্বরের দিব্যি। তার ঘরে গিয়ে দেখ, দেব-মূর্তির সামনে দিন-রাত একটা তেলের বাতি জ্বলছে। ঈশ্বরের ব্যাপারে সে খুব সজাগ। কি জান, আমার মনে হয় তার পাপের বোঝা বিবেকের উপর চেপে বসেছে বলেই সে এরকমটা হয়েছে। সে একটা খুনী।"

"কি বলছ তুমি?"

"থাক, তার কথা থাক লিউবচ্কা। এস আমরা গান করি।"

গলা তুলে নিউরা গাইতে শুরু করল:

> "ওষুধের দোকানকে যাব,
> বিষ কিনব,
> বিষ খাব।"

বসবার ঘরে দুই হাত বুকের উপর ভেঙে জেনি ঢুলে ঢুলে হাঁটছে, আর প্রতিটি আয়নায় নিজেকে দেখছে। ছোট মাংকা তাস খেলতে খুব ভালবাসে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সে একটানা খেলতেও রাজী। এখন সে পাশা-র সঙ্গে "ছেষট্টি' খেলছে। মাংকার পরনে বাদামী রঙের একটা সাধারণ পোষাক। পোষাকটি তার ছোট মাথা ও ছোট শরীরে বেশ মানিয়েছে। তাকে হাই স্কুলের উঁচু ক্লাসের ছাত্রীর মত তরুণী দেখাচ্ছে।

তার সঙ্গিনী পাশা একটি বিচিত্র দুঃখী মেয়ে। পতিতালয়ের বদলে অনেক আগেই তাকে কোন হাসপাতালের মানসিক রোগীদের ওয়ার্ডে পাঠানো উচিত ছিল, কারণ এমন একটা ভয়ানক স্নায়বিক রোগে সে ভুগছে যার ফলে যে কোন পুরুষের কাছে, এমন কি অত্যন্ত বিরক্তিকর কোন পুরুষের কাছেও সে অকাতরে নিজেকে সমর্পণ করে দিতে বাধ্য হয়। সঙ্গিনীরা এ নিয়ে তাকে ঠাট্টা করত,

এমন কি এই দোষের জন্ত তাকে ঘৃণা করত ; তারা মনে করত, পুরুষ জাতের প্রতি তাদের যে সমবেত বিরূপতা আছে এটা তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাস্বরূপ। শোনা যায়, প্রয়োজন, লোভ অথবা কারও প্রলোভনে পরে পাশা পতিতালয়ে আসে নি, এসেছে স্বেচ্ছায়, নিজের ভয়াবহ অতৃপ্ত প্রবৃত্তির তাড়নায়। বাড়ির মালকিন এবং দুই বাড়িউলি পাশার প্রতি খুব সদয় ; তার এই ভয়াবহ দুর্বলতাকে তারা প্রশ্রয় দেয়। কারণ তার ফলে পাশার চাহিদা খুব বেশী ; অন্ত যে কোন মেয়ের চাইতে সে চার-পাঁচ গুণ বেশী উপার্জন করে। আসলে সে এত বেশী উপার্জন করত যে ছুটিছাটার ভীড়ের দিনগুলিতে অসুস্থতার অজুহাত দেখিয়ে সাধারণ খদ্দেরদের তার কাছে ঘেঁসতেই দেওয়া হত না, কারণ সে অন্ত মানুষের সঙ্গে রয়েছে একথা জানালে তার পয়সাওয়ালা বাঁধা খদ্দেররা অসন্তুষ্ট হয়। এ রকম বাঁধা খদ্দের পাশার অনেক ছিল ; কেউ কেউ জানোয়ারের মত হলেও সত্যি সত্যি তাকে ভালবাসত ; কিছুদিন আগে তো দু'জন লোক একই সঙ্গে তাকে মর্যাদার সঙ্গে সেখান থেকে নিয়ে যেতেও চেয়েছিল। তাদের একজন জর্জিয়ার লোক, একটা মদের দোকানের করণিক, অপর জন রেলপথের এজেন্ট ; যেমন গর্বিত তেমনি গরীব এক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক ; লোকটার একচোখ কানা, একটা কালো ঢাকনা দিয়ে চাপা দেওয়া। একমাত্র নৈর্ব্যক্তিক যৌন-কামনা ছাড়া আর সব কিছুর প্রতিই পাশা সমান উদাসীন, কাজেই হয় তো যে কেউ ডাকলেই তার সঙ্গে যেত, কিন্তু পতিতালয়ের কর্তৃপক্ষ খুবই সতর্কভাবে তার নিজের স্বার্থ বজায় রেখে চলত। তার আকর্ষণীয় মুখের উপর এর মধ্যেই আসন্ন পাগলামির ছায়া পড়েছে, তার আধ-বোঁজা চোখ, নরম ভেজা ঠোঁটের উপর অবিরাম লাজুক হাসির রেখা, মাঝে মাঝে বোকার মত উচ্ছ্বসিত হাসি—সব কিছুতেই পাগলামীর লক্ষণ ফুটে উঠত। অথচ সমাজ ব্যবস্থার এই অসহায় শিকারটি কিন্তু দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় সৎ-স্বভাব, টাকার প্রতি নিস্পৃহ এবং অত্যধিক যৌন-লালসার জন্য লজ্জিত। সঙ্গিনীদের সে ভালবাসে, তাদের চুমু খায়, আলিঙ্গন করে, তাদের সঙ্গে এক বিছানায় শোয়। অথচ তারা কেউ তা পছন্দ করে না।

মানিয়ার হাত ধরে পাশা আবেগের সঙ্গে বলে উঠল, "মানেচ্কা, লক্ষীটি, আমার হাতটা দেখে দাও, সোনা আমার!"

মানিয়া ছোট মেয়ের মত ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, "আমাদের আর একটু খেলতে দাও।"

"মানেচ্কা, লক্ষীটি, সোনামণি, আদরের ধন আমার···"

শেষ পর্যন্ত মাংকা তার কথামত কোলের উপর তাসগুলি পাততে লাগল। হরতনের টেক্কা মানে কারও বাড়ি হবে, চিড়িতনের সাহেব মানে কেউ টাকা পাবে আর কোন বাড়িতে প্রচুর হৈ-হল্লা হবে, লোকজন আসবে।

পাশা আনন্দে দুই হাত তুলে বলে উঠল, "তাহলে আমার লেভান্টিক

আসবে। সে কথা দিয়েছিল আজ আসবে। নির্ঘাৎ লেভান্চিক।"

"সেই জর্জিয়ার মানুষ?"

"হাগো, আমার ছোট্ট জর্জিয়ার মানুষ। সে কী ভাল। তাকে সব সময় কাছে রাখতে ইচ্ছা করে, দূরে যেতে দিতে মন সরে না। শেষ বার সে কি বলে গেছে জান? সে জোর গলায় বলেছে: 'এই খারাপ বাড়িতে তুমি যদি এখনও থাক তাহলে আমি তোমাকেও শেষ করব, আমাকেও শেষ করব!' তার দুই চোখে যেন আগুন জ্বলতে লাগল।"

জেনি পাশে দাঁড়িয়ে শুনছিল; এবার উদ্ধত স্বরে বলে উঠল:

"কে বলেছে এ কথা?"

"আমার ছোট্ট জর্জিয়ার মানুষ লেভান্। 'তোমার মরণ আর আমার মরণ।' "

"তুমি মুখ্খু। সে মোটেই জর্জিয়ার লোক নয়, আর্মেনিয়ার একজন সাধারণ মানুষ। তুমি তো বোকার ডিম।"

"না, না, সে জর্জিয়ার মানুষ। কী আশ্চর্য, তুমি কি না···"

"আমি বলছি সে আর্মেনিয়ার লোক। আমার থেকে বেশী কেউ জানে না। তুমি একটা মুখ্খু।"

"তুমি নাক গলাতে এসেছ কেন জেনি? আমি তো তোমার কথায় যাই নি।"

"এসেই দেখ না! নাক গলাও না একবার। তুমি তো মুখ্খু! সে যাই হোক, তাতে তোমার কি? তুমি কি তার সঙ্গে প্রেমে পড়েছ?"

"যদি পড়েই থাকি, তাতে কি?"

"তাতে তুমি যে বোকা তারই প্রমাণ। আর টুপিতে ফুল গোঁজা সেই এক-চোখোটা, তুমি কি তার প্রেমে পড়েছ?"

"বেশ তো, তাতে হলো কি? আমি তাকে শ্রদ্ধা করি। সে কত ধীরস্থির।"

"তুমি তাহলে হিসাবরক্ষক কোল্কা-কেও ভালবাস? আর কণ্ট্রাকটারকে? আন্তোশ্কা—কারতোশ্কাকে? সেই মোট্কা অভিনেতাকে? ওঃ, কী বেহায়া মেয়েমানুষ!" জেনি হঠাৎ চিৎকার করে উঠল। "তোমাকে দেখলেও ঘৃণা হয়। তুমি একটা কুক্কুরী! আমি যদি তোমার মত হতাম তাহলে আত্মহত্যা করতাম, করসেটের ফিতে গলায় বেঁধে ঝুলে পড়তাম। জানোয়ার!"

পাশা নীরবে চোখের পাতা নামাল। তার চোখ জলে ভরে উঠেছে। তার পক্ষ নিল মাংকা।

"তোমার কি হয়েছে জেনিচ্কা···ওর পিছনে লেগেছ কেন···?"

জেনি কড়া গলায় ঝাঁঝিয়ে উঠল, "আহা! মানিক-জোড় এলেন! আত্মসম্মান বলে কিছু নেই! রাস্তা থেকে কে-না-কে এসেই তোমাদের কিনে

নিল—যেন মাংসের টুকরো, এক ঘণ্টার প্রেম করার জন্য বাঁধা দরে ভাড়া করল যেন ভাড়াটে গাড়ি, আর তোমরাও আহ্লাদে গলে গেলে 'আহারে নাগর আমার, সোনার চাঁদ আমার!' বলে। উঃ!"

রাগে মুখ ঘুরিয়ে জেনি আবার মাজা দুলিয়ে আয়নায় চোখ ঘুরিয়ে ঘরময় পায়চারি করতে লাগল।

ওদিকে পিয়ানো-বাদক আইজাক ডেভিডোভিচ মাথা-মোটা বেহালাদারকে নিয়ে পড়েছে।

"হচ্ছে না ইসায়া সাব্বিচ, হচ্ছে না। এক মিনিট বেহালাটা রাখ। আমার দিকে একটু কান দাও। সুরটা এই রকম হবে।"

এক আঙুল দিয়ে সুরটা বাজাতে বাজাতে গর্দভ-রাগিণীতে সে সেটা গুন গুন করে গাইতে লাগল। সে-গান শুধু ব্যাণ্ড-মাস্টাররাই গাইতে পারে, আর তাই সেও একদিন হতে চেয়েছিল।

"এস্-তাম, এস্-তাম, এস্-তিয়াম-তিয়াম। নাও, এই প্রথম অংশটা আমার মত করে একবার বল।"

দুটি মেয়ে মনোযোগ দিয়ে তাদের মহলা দেখছিল। পিয়ানোতে হেলান দিয়ে জোয়া ও ভেরা দাঁড়িয়েছিল। শেষ পর্যন্ত অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে দুই সঙ্গীত-শিল্পী যখন এক সুরে বাজাতে শুরু করল, তখন বেঁটে ভেরা আর ঢ্যাঙা জোয়া পরমানন্দে ঘরময় নাচতে শুরু করে দিল।

চটপটে নিউরা সব সময়ই সকলের আগে খবর আনে। হঠাৎ জানালার গোবরাট থেকে লাফ দিয়ে নেমে সে উত্তেজনায় হাঁপাতে হাঁপাতে চিৎকার করে উঠল।

"ত্রেপ্পেল—এ গো···একটা ঢাউস গাড়ি এসে লেগেছে···ইলেকট্রিকের আলো ·আহা, মরে যাই আর কি···গাড়িতে ইলেকট্রিক জ্বলছে গো···"

জেনি ছাড়া আর সব মেয়েই জানালা দিয়ে ঝুঁকে পড়ল। নিউরা ঠিকই বলেছে। ত্রেপ্পেল-এর দরজায় একটা সুন্দর গাড়ি; ঘোড়াটা আরও সুন্দর। আনকোরা নতুন সুদৃশ্য "দ্রশকি" খানা নতুন বার্নিশের জন্য ঝকঝক করছে; শকট-দণ্ডের দুই প্রান্তে দুটো ছোট বৈদ্যুতিক বাতি থেকে হলুদ আলো জ্বলছে; নাকের উপর লাল ফোঁটাওয়ালা বড় সাদা ঘোড়াটা পা ঠুকছে, কান নাড়ছে; মোটা কোচয়ানটি দুই হাঁটুর উপর হাত রেখে চুপচাপ গাড়ির উপর বসে আছে।

জানালা দিয়ে অনেকটা ঝুঁকে নিউরা বলে উঠল, "আহা, একবারও যদি গাড়িটায় চড়তে পারতাম! হেই, ও চাচা, ও মোটা কোচয়ান···বেচারি মেয়েটাকে একটু গাড়িতে চড়াও না···দয়া করে একটি বার চড়াও না।"

কোচয়ান জবাবে একটুখানি হেসেই আঙুলটাকে সামান্য একটু নাড়ল। সঙ্গে সঙ্গে সাদা ঘোড়াটা জোর কদমে গাড়ি ও কোচয়ানকে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

"ধিক! কী লজ্জার কথা!" ঘরের মধ্যে এম্মা এডোয়ার্ডভ্‌নার ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর শোনা গেল। "কোথায় দেখছ যে সম্ভ্রান্ত মেয়েরা এভাবে জানালা দিয়ে গলা বার করে রাস্তাময় হাঁকডাক করে। আঃ, বড়ই জঘন্য ব্যাপার! নিশ্চয় নিউরার কাজ, সাংঘাতিক মেয়ে নিউরা!"

হলদে মোটা শরীরে কালো পোষাকে তাকে বেশ ভারিক্কী দেখাচ্ছে। মেয়েরা সব চুপচাপ এসে দেয়াল ঘেঁসে চেয়ারে বসেছে। শুধু জেনি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখছে। আরও দু'খানা "দ্রুশ্‌কি" এসে উল্টো দিকের সোফিয়া ভাসিলিয়েভ্‌না-র বাড়ির সামনে দাঁড়াল। ইয়ামা জেগে উঠছে। তারপর আর একখানা গাড়ি আন্না মার্কভ্‌না-র বাড়ির দরজায় এসে থামল।

সামনের হলে দরোয়ান সাইমিয়ন একজনকে কোট খুলতে সাহায্য করছিল। দুই হাতে দরজার হাতলটা ধরে জেনি মুখ বাড়িয়ে দেখল, আর সঙ্গে সঙ্গে মুখ ঘুরিয়ে কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে ফিরে এল।

নীচু গলায় বলল, "আমি চিনি না; নতুন লোক, আগে কখনও এখানে আসে নি। বেশ মালদার লোক; মোটাসোটা, সোনালি ফ্রেমের চশমা, ইউনিফর্ম পরা।"

অশ্বারোহী বাহিনীর বিউগলের মত স্বরে এম্মা এডোয়ার্ডভ্‌নার কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল।

"মেয়েরা সব, বসার ঘরে যাও! বসার ঘরে যাও মেয়েরা!"

একে একে সকলেই বসবার ঘরে জড় হল। তামারা, কাত্‌কা, নিনা, অন্ত মাংকা—তাকে বড় মাংকা বা কুমীর মাংকাও বলা হয়, আর সকলের শেষে সোংকা। সোংকা ইহুদি মেয়ে; নাকটা খুব বড় বলে তাকে সকলে "হাল" সোংকা বলে ডাকে। তার চোখ দুটি বড় বড়, কিছুটা ভীরু ও বিষণ্ণ হলেও দীপ্ত; এ রকম চোখ শুধু ইহুদিদেরই থাকে।

৬

দাতব্য বিভাগের ইউনিফর্ম-পরা একটি প্রৌঢ় লোক ধীরে ধীরে, ইতস্তত-ভাবে, প্রতিটি পদক্ষেপে শরীরটাকে সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকিয়ে ঘরে ঢুকল। সে এমনভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হাত দু'খানি ঘসছিল যেন হাত ধুচ্ছে। মেয়েগুলি তখনও তাকে দেখতে পায় নি; গম্ভীরভাবে তারা চুপচাপ বসেছিল। লোকটি ঘরটা পেরিয়ে লিউবার পাশে গিয়ে বসল। ভদ্রতার রীতি হিসাবে মেয়েটি তার স্কার্টটা সামান্য একটু সরিয়ে নিল মাত্র; এই ভাবে সম্ভ্রান্ত ঘরের কোন মেয়ের মতই একটা নির্বিকার ও স্বাধীন ভাব দেখাল।

লোকটি বলল, "কি খবর মেয়ে?"

লিউবা সংক্ষেপে জবাব দিল, "আপনার খবর কি?"

"কেমন আছ?"

"ধন্যবাদ, আপনাকে ধন্যবাদ। দয়া করে একটা সিগারেট দিন।"

"দুঃখিত—আমি ধূমপান করি না।"

"তাহলে, তাহলে, তাহলে···আমাকে একটা লাফিত্তে-লেমনেড খাওয়ান। লাফিত্তে-লেমনেড আমি বড় ভালবাসি।"

লোকটি চুপ করে রইল।

"ওঃ, কী কিপ্টে দাদু আপনি! কোথায় কাজ করেন? আপনি কি সরকারী কর্মচারি?"

"না, আমি একজন শিক্ষক। আমি জার্মান ভাষা শেখাই।"

"আপনাকে যেন কোথায় দেখেছি দাদু। মুখটা চেনা লাগছে। কোথায় দেখেছি বলুন তো?"

"তা তো বলতে পারি না। হয়তো রাস্তায়···।"

"রাস্তায় হতে পারে। অন্তত একটা কমলা তো খাওয়াতে পারেন। একটা কমলার অর্ডার দেব?"

আবার সে চুপ করে চারদিকে তাকাল। তার মুখটা ঘামে চিকচিক করছে, কপালের ফুস্কুরিগুলো লাল হয়ে উঠেছে। মনে মনে সে মেয়েগুলিকে যাচাই করছিল, কোন্ মেয়েটি তার পক্ষে মানানসই হবে তাই বেছে নিচ্ছিল, আবার সঙ্গে সঙ্গে নিজে চুপচাপ থাকার জন্য কেমন যেন অস্বস্তিও বোধ করছিল। কিন্তু কি কথাই বা বলা যায়। লিউবার নির্বিকার পীড়াপীড়িতে সে বিরক্তি বোধ করছিল। মোটা কাতিয়া-র গরুর মত বড়সড় শরীরটা তার মনকে টানল, কিন্তু সে ভাবল, সব শক্ত-পোক্ত মেয়েমানুষের মতই সেও ভালবাসার ব্যাপারে নেহাৎই আড়ষ্ট হবে। ভেরা-র ছেলের মত মুখ ও সাদা রঙের আঁটোসাটো ব্রীচেস্ পরা শক্ত উরুও তাকে উত্তেজিত করে তুলল। আর আছে সরলা স্কুলের মেয়ের মত দেখতে ছোট মাংকা এবং সুন্দরী গাল-ফোলা জেনি। একবার তো জেনিকে প্রায় পছন্দ করে সে উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু পরক্ষণেই দ্বিধাগ্রস্ত হল। তার উদ্ধত, উদাসীন ভাব দেখে মনে হল, সে এখানকার সব চাইতে দুষ্টু মেয়ে; অতিথিদের অনেক বেশী টাকা খসাতেই সে অভ্যস্ত। সে নিজে মিতব্যয়ী লোক; একটা বড় পরিবার তার ঘাড়ে; তার যৌন দাবী মেটাবার পক্ষে সম্পূর্ণ ভগ্নস্বাস্থ্য ও নানাবিধ স্ত্রী-রোগে আক্রান্ত স্ত্রী আছে ঘরে। একই সঙ্গে সে একটা মেয়েদের হাই স্কুলে এবং একটা মেয়েদের সেমিনারিতে পড়ায়; ফলে একটা গোপন যৌনবিকারে সে সব সময়ই ভোগে; তবু জার্মানসুলভ সংযম, তার কৃপণ ও ভীরু স্বভাবের জন্যই তার সেই অবিরাম প্রজ্জলিত লালসাকে সে সংযত করে রাখতে পারে। অবশ্য রাতে মনের মত এক গ্লাস বীয়ার থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে এবং অনেকটা পথ পায়ে হেঁটে গাড়ি-ভাড়ার খরচ বাঁচিয়ে কোন রকমে সে তার স্বল্প আয় থেকে বছরে দু তিন বার করে পাঁচ-দশ রুবল সে জমাতে পারে। সেই অর্থ সে নারী-সঙ্গের জন্য সরিয়ে রাখে আর নিজের

সুখের জন্য রসিয়ে রসিয়ে কিছু কিছু করে খরচ করে।

লিউবা কোভের সঙ্গে বলে উঠল, "অন্তত বাজিয়েদের একটা পল্‌কা-র সুর বাজাতে তো বলতে পারেন। মেয়েরা তাহলে একটুখানি নাচতে পারে।"

কথাটা তার মনে ধরল। তার মনে হল, এই চুপচাপ বসে থাকা মেয়েদের ভিতর থেকে একজনকে ডেকে নেওয়ার চাইতে সকলে যখন বাজনার তালে তালে ঘুরে ঘুরে নাচতে থাকবে তখন একটি মেয়েকে নিয়ে সরে পড়া অনেক বেশী সুবিধাজনক হবে।

সতর্কতার সঙ্গে সে প্রশ্ন করল, "তাতে কত খরচ লাগবে?"

"একটা কোয়াড্রল-এর জন্য আধা রুবল, আর সাধারণ নাচের জন্য ত্রিশ কোপেক। চলবে তো?"

"তা···নিশ্চয়···ঠিক চলবে ··তাতে আমার আপত্তি নেই···" উদারতার ভাণ করে সে সম্মত হল। "কাকে বলতে হবে?"

"ঐ যে বাজনাদাররা রয়েছে, ওদের বললেই হবে।"

"কেন বলব না? ··আনন্দের সঙ্গে···মশাইরা, দয়া করে একটু হাল্কা নাচের সুর বাজান।" বাজনাদারদের উদ্দেশে কথাগুলি বলে কয়েকটি রৌপ্য মুদ্রা সে পিয়ানোর উপর রাখল।

মুদ্রাগুলি পকেটে পুরে ইসায়া সাব্বিচ জিজ্ঞাসা করল, "আপনার কি পছন্দ? ওয়াল্‌জ্‌, পল্‌কা, না পল্‌কা-মাজুর্কা?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ···ঐ রকম যে কোন একটা···।"

ভেরা নাচতে খুব ভালবাসে। সে চেঁচিয়ে উঠল, "ওয়াল্‌জ্‌, ওয়াল্‌জ্‌।"

"না, একটা পল্‌কা ··একটা ওয়াল্‌জ্‌", অন্যরাও দাবী জানাতে লাগল।

খুশি-খুশি গলায় লিউবা রায় দিল, "একটা পল্‌কাই হোক। ইসায়া সাব্বিচ, দয়া করে একটা পল্‌কা বাজান।···ইনি আমার সোয়ামী; আমার জন্য এটাই ইনি ফরমাস করছেন।" সে শিক্ষকটির গলা জড়িয়ে ধরল। "তাই না দাদু?"

শিক্ষকটি মেয়েটির আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে কচ্ছপের মত মাথাটা ভিতরে টেনে নিল। অন্যরাও এতে কিছু মনে করল না। লিউবা ও নিউরা একসঙ্গে নাচতে লাগল। আরও তিনটি যুগল ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগল। সেই হট্টগোলের সুযোগে শিক্ষকটি ছোট মাংকার দিকে এগিয়ে গেল।

হাত বাড়িয়ে বলল, "যাবে তো?"

সে হেসে জবাব দিল, "চলুন।"

মেয়েটি তাকে নিজের ঘরে নিয়ে গেল। একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর পতিতালয়ের শোবার ঘরের মতই ঘরটা সুন্দরভাবে সাজানো। ক্রোচেট-এর কাজ-করা ঢাকনায় ঢাকা একটা দেরাজ-আলমারি, একটা আয়না, একগুচ্ছ কাগজের ফুল, বনবন-এর কয়েকটা খালি বাক্স, পাউডারের কৌটো, একটি যুবকের আবছা

ফটোগ্রাফ একখানি। লাল কম্বলে ঢাকা বিছানার উপর কতকগুলি ভিজিটিং কার্ড ছড়ানো। দেয়ালের গায়ে পেরেকে ঝোলানো তুরস্কের সুলতানের একটা ছবিও রয়েছে, হারেমে মৌজ করে বসে আছে, মুখে গড়গড়ার নল। পরিচারক ও অভিনেতা ধরনের কয়েকজন ফুলবাবুর ফটোও দেয়ালে ঝুলছে। একটা গোলাপি লণ্ঠন সিলিং থেকে শিকল দিয়ে ঝোলানো। সুদৃশ্য ঢাকনা দিয়ে ঢাকা একটা গোল টেবিল, কারুকার্য-করা তিনটে চেয়ার, আর বিছানার পিছনে একটা টুলের উপর এনামেলের মুখ ধোবার পাত্র ও একটা কুঁজোও রয়েছে।

পোষাকের বোতাম খুলতে খুলতে ছোট মাংকা বলল, "নাগর হে, লাফিত্তে-লেমনেডের অর্ডার দাও এবার। সেটাই এখানকার রীতি।"

শিক্ষকটি কড়া গলায় বলল, "পরে হবে। সবই তোমার উপর নির্ভর করছে।...তাছাড়া এখানে কেমন লাফিত্তেই বা মিলবে? নিশ্চয় ভাল কিছু পাওয়া যাবে না।"

মেয়েটি আহত হয়ে পাল্টা জবাব দিল, "এখানে খুব ভাল লাফিত্তে পাওয়া যায়। এক বোতলের দাম দুই রুবল। আর তুমি যদি এতই কেপ্পন হও তো নিদেন পক্ষে কিছু বীয়ারই কেনো।"

"আচ্ছা...বীয়ারই ভাল।"

"আর আমার জন্য লেমনেড ও কমলা। ঠিক আছে?"

"এক বোতল লেমনেড, ঠিক আছে, কিন্তু কমলা না। পরে হয়তো তোমাকে শ্যাম্পেনও খাওয়াতে পারি। বলেছি তো, সবই তোমার উপর নির্ভর করছে। তুমি যদি আমাকে খুশি করতে পার।"

"তাহলে চার বোতল বীয়ার ও দুই বোতল লেমনেড অর্ডার দেই, কেমন? আর আমার জন্য একটা ছোট চকোলেটের টুকরো। ঠিক আছে?"

"দুই বোতল বীয়ার ও এক বোতল লেমনেড, আর কিছু না। দরাদরি আমি পছন্দ করি না। কিছু দরকার হলে আমি নিজেই অর্ডার দেব।"

"আমার একটি বন্ধুকে ডাকতে পারি কি?"

"না, দয়া করে কোন বন্ধু-টন্ধু নয়।"

মাংকা করিডরে মাথাটা বের করে হাঁক দিয়ে উঠল।

"ছোট বাড়িউলি, আমার জন্য দু' বোতল বীয়ার ও এক বোতল লেমনেড।"

সাইমিয়ন ট্রে নিয়ে ঢুকল এবং অভ্যস্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বোতলের কর্কগুলো খুলে ফেলল। বাড়িউলি জোসিয়া তার পিছন পিছন ঢুকল।

"বেশ, তোমরা এখানে বেশ আরামেই আছ দেখছি। তোমাদের শুভ বিবাহে অভিনন্দন জানাই।"

মাংকা বলল, "দাদু, ছোট বাড়িউলিকে এক গ্লাস বীয়ার খাওয়াও। খাও ছোট বাড়িউলি।"

"খুব ভাল। এর জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। মিষ্টার, আপনার স্বাস্থ্য পান করছি। আপনার মুখটা যেন চেনা-চেনা লাগছে।"

বীয়ারে চুমুক দিয়ে জার্মান লোকটি তার গোঁফজোড়া চাটতে লাগল। কখন বাড়িউলি চলে যাবে সে জন্য সে অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু গ্লাসটা নামিয়ে রেখে তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বাড়িউলি বলল :

"বীয়ারের দরুন এবং এখানে যতটা সময় কাটাবেন তার দরুন টাকাটার জন্য আপনাকে একটু কষ্ট দেব মিষ্টার। ও ব্যাপারটা এখনই মিটিয়ে ফেললে আপনার ও আমাদের উভয়ের পক্ষেই সুবিধা।"

টাকা চাওয়ায় জার্মান লোকটি চটে উঠল ; তার উদ্দেশ্যের আবেগটাই মাটি হয়ে গেল। সে রেগে গেল।

"এটা কী ধরনের অভদ্রতা! আমি এখান থেকে পালিয়ে যাচ্ছি না। তা ছাড়া, অতিথিদের ঠিকমত চিনতে পারা চাই। তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না, একজন ইউনিফর্মধারী সম্ভ্রান্ত লোক এখানে এসেছে, কোন ভবঘুরে নয়। ও সব চাপাচাপি ছাড়।"

বাড়িউলি স্বর নরম করল।

"আপনি রাগ করবেন না মিষ্টার। অবশ্য বসবার টাকাটা আপনি তো মেয়েটিকেই দেবেন ; আশা করি সে ব্যাপারে আপনি অনুদার হবেন না, কারণ মেয়েটি বড় ভাল। কিন্তু বীয়ার ও লেমনেডের দামটা দয়া করে আমাকে দিয়ে দিন। আপনি তো জানেন, আমাকে এ সবের হিসাব মালকিনকে দিতে হয়। পঞ্চাশ কোপেক করে দু'বোতল বীয়ার—এই হল এক রুবল, আর লেমনেড ত্রিশ কোপেক, তাহলে হল মোট এক রুবল ত্রিশ।"

"হা, ভগবান, এক বোতল বীয়ার পঞ্চাশ কোপেক?" জার্মানটি ক্ষুব্ধ গলায় বলল। "যে কোন বীয়ারের দোকানে তো বারো কোপেকে পাওয়া যায়!"

"বেশ তো, সস্তা হয় তো বীয়ারের দোকানেই যান না।" জোসিয়া বিরক্ত গলায় বলল। "কিন্তু একটা ভদ্র জায়গায় যখন এসেছেন তখন আধ রুবলই ন্যায্য দাম। আমরা কখনও বেশী নেই না। ঠিক আছে। ভাঙানি কুড়ি কোপেক পাঠিয়ে দিচ্ছি, কেমন?"

জার্মান শিক্ষকটি জোর দিয়ে বলল, "হ্যাঁ, ভাঙানিটা অতি অবশ্য চাই। আর দয়া করে দেখবেন, কেউ যেন আমাদের বিরক্ত না করে।"

তাড়াতাড়ি দরজার দিকে যেতে যেতে জোসিয়া বলল, "সে কি, নিশ্চয়, নিশ্চয়…। যেমন খুশি আরাম করুন, মজা লুটুন। এতো মজার ক্ষিদে।"

মাংকা দরজা বন্ধ করে হুক লাগিয়ে দিল। জার্মান লোকটির হাঁটুর উপর বসে একটা খোলা হাত দিয়ে সে তার গলা জড়িয়ে ধরল।

বীয়ারে চুমুক দিতে দিতে সে বলল, "তুমি এখানে কত দিন আছ?" তার মনে হল, ভালবাসার যে প্রহসন এখনই এখানে অভিনীত হবে তার আগে

কিছুটা বন্ধুত্বপূর্ণ আবহাওয়া, একটু ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক গড়ে ওঠা দরকার। কাজেই অত্যন্ত অধৈর্য বোধ করা সত্ত্বেও সে মামুলি কথাবার্তা শুরু করে দিল। এখানে যারাই আসে তারাই এ ধরনের কথাবার্তা বলে থাকে ; তার ফলে মেয়েটি আপনা থেকেই সেই আদ্যি কালের ভঙ্গীতে বিছানায় গা এলিয়ে দেয়।

"বেশী দিন না ; এই তৃতীয় মাস চলছে।"

"তোমার বয়স কত ?"

"ষোল," মাংকা মিথ্যা করে পাঁচ বছর কমিয়ে বলল।

"ওঃ, এত অল্প বয়স!" লোকটি বিস্ময় প্রকাশ করল। সে নীচু হয়ে জুতোর ফিতে খুলতে লাগল।

"আমাদের দেশের শহরে একজন অফিসার ছিল···আর সেই আমাকে ফুসলেছিল। আমার মা ছিল ভয়ানক কড়া। সে যদি সব কথা জানতে পারত তাহলে আমাকে নিজের হাতে গলা টিপে মেরে ফেলত। তাই আমি পালিয়ে এসে এখানে উঠেছিলাম।"

"তোমার প্রথম নাগর সেই অফিসারটিকে তুমি কি ভালবেসেছিলে ?"

"ভাল না বাসলে তার কাছে যেতাম না। সেই বদমাসটা আমাকে বিয়ে করবে বলে কথা দিয়েছিল, কিন্তু তারপরে সে যা চেয়েছিল তা পাবার পরেই আমাকে ছেড়ে গেল···।"

"প্রথমবার কি তোমার খুব লজ্জা-লজ্জা করেছিল ?"

"নিশ্চয় করেছিল। আচ্ছা দাদু, তোমার কোন্‌টা পছন্দ, আলো জ্বালিয়ে না আলো ছাড়া ? আমি লণ্ঠনটা একটু কমিয়ে দিচ্ছি···ঠিক আছে ?"

"আচ্ছা, এখানে তোমার একঘেয়ে লাগে না ?' তোমার নাম কি ?"

"মাংকা। একঘেয়ে তো লাগেই। এই কি জীবন ?'

জার্মান লোকটি তার ঠোঁটে সজোরে চুমু খেয়ে আবার প্রশ্ন করল :

"তুমি কি পুরুষ মানুষকে ভালবাস ? তোমাকে সুখ দিতে পারে এমন পুরুষ কি আছে ? কারা তোমাকে সুখ দেয় ?"

মাংকা হেসে উঠল, "নিশ্চয় আছে। আমি সব চাইতে ভালবাসি তোমার মত লোককে, তোমার মত মোটাসোটা ভালমানুষকে।"

"তুমি তাদের ভালবাস ? অ্যাঁ···কেন তাদের ভালবাস ?"

"ভালবাসি তাই। তুমি খুব ভাল।"

বসে বসে চিন্তা করতে করতেই জার্মান লোকটি বীয়ারে চুমুক দিতে লাগল। তারপর আবার সে সেই কথাগুলিই বলতে লাগল যা প্রায় প্রত্যেকটি লোক একটি বেশ্যার দেহকে ভোগ করবার ঠিক আগে বলে থাকে।

"দেখ মারিচেন, তোমাকে আমার খুব ভাল লেগেছে। আমি তোমাকে উদ্ধার করতে চাই।"

তার হাতের আংটিটা দেখিয়ে মেয়েটি বলল, "তুমি তো বিবাহিত ?"

"হ্যাঁ ; তবে কি জান, আমার স্ত্রীর সঙ্গে আমি থাকি না। সে রুগ্ন ; স্ত্রীর কোন কর্তব্যই সে পালন করতে পারে না।"

"বেচারি ! তুমি কোথায় যাও তা জানতে পারলে সে নিশ্চয় কাঁদবে।"

"ও কথা থাক। দেখ মারিচেন, তোমার মত একটি মেয়েকেই আমি খুঁজছি—তোমার মতই নরম ও সুন্দরী। আমার কিছু সামর্থ্য আছে ; আগুন ও আলোর ব্যবস্থা-সমেত একটা বাসা ও খাবার ব্যবস্থা আমি তোমাকে করে দিতে পারি। তুমি কি যাবে ?"

"কেন যাব না ? নিশ্চয় যাব।"

লোকটি তীব্রভাবে তাকে চুমু খেল। সঙ্গে সঙ্গে তার ভীরু মনের মধ্যে একটা গোপন ভয় ঝলসে উঠল।

কাঁপা গলায় সে জিজ্ঞাসা করল, "তোমার শরীর নীরোগ তো ?"

"অবশ্য নীরোগ। এখানে প্রতি শনিবার ডাক্তারি পরীক্ষা হয়।"

পাঁচ মিনিট পরে সে বিছানা ছেড়ে উঠল। বাইরে যেতে যেতেই উপার্জনের টাকাটা মোজার ভিতরে গুঁজে রাখল ; কিন্তু সেটাই তার প্রথম খদ্দেরের কাছ থেকে পাওনা বলে এখানকার সংস্কার মত টাকাটা রেখে দেবার আগে তার উপর থুতু ছিটিয়ে দিল। সে যে সুন্দরী বা জার্মানটি যে তাকে রক্ষিতা রাখতে চায় এ সব বিষয়ে আর কোন কথাই হল না। মাংকার ঠাণ্ডা ভাব দেখে লোকটি অসন্তুষ্ট হয়েছে। সে বাড়িউলিকে ডেকে দিতে বলল।

বসবার ঘরে এসে আয়নার সামনে চুল ঠিক করতে করতে মাংকা বলল, "ছোট বাড়িউলি, আমার সোয়ামি তোমাকে ডেকেছে।"

জোসিয়া ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আবার তখনই ফিরে এসে পাশাকে ডেকে নিয়ে করিডরে ঢুকল। তারপর আবার সে একাই ফিরে এল।

হাসতে হাসতে বলল. "এটা কি করে হল ছোট মাংকা যে তোমার খদ্দেরকে তুমি খুশি করতে পারলে না ? সে তো তোমার নামে নালিশ করল। সে বলল, 'ও তো মেয়েমানুষ নয়, যেন একটা কাঠ, একখণ্ড বরফ।' আমি পাশাকে তার কাছে পাঠিয়েছি।"

"উঃ ! বিরক্তিকর পুরুষ।" মাংকা মুখ বেঁকিয়ে খানিকটা থুতু ফেলল। "কথা বলে বলে পাগল করে দিয়েছে। খালি কথা : 'চুমু খেতে তোমার কেমন লাগল ? তোমার কি বেশ সুখ-সুখ বোধ হল ?' বুড়ো ন্যাকা ! বলে কিনা 'আমি তোমাকে উদ্ধার করতে চাই।"

জোসিয়া শান্তভাবে বলল, "ওরা ওই রকম বলে থাকে।"

জেনি সকাল থেকেই মন-মরা হয়ে ছিল। এবার সে জ্বলে উঠল।

"উঃ, নরকের কুত্তা। অসহ্য বাউণ্ডুলে !" মুখ লাল করে পাছায় থাপ্পড় মারতে মারতে সে চেঁচাতে শুরু করে দিল। "আমি হলে সেই অথর্ব চারপেয়ে-টাকে কান ধরে টানতে টানতে আয়নার কাছে নিয়ে তার বদনখানা একবার

দেখিয়ে দিতাম। কিগো, তোমাকে খুব সুন্দর দেখতে, নয়? আর যখন একটা মেয়ের বুকের উপর পড়ে তোমার মুখ দিয়ে লালা গড়ায়, এবং নিঃশ্বাস আটকে গিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে টেরা হয়ে যাও তখন তোমাকে আরও সুন্দর দেখায়। আর একটা রুবল ছুঁড়ে দিয়ে তুমি আশা কর যে প্যানকেকের মত আমি তোমার সামনে চিৎ হয়ে পড়ব আর তোমার বিরক্তিকর ভালবাসা পাবার জন্য আমার চোখ দুটো মুখের ভিতর থেকে ছিঁটকে বেরিয়ে আসবে। কেন? ওর ওই থোঁতা মুখটাকে ভোঁতা করে দাও, জোর পিটুনি লাগাও, মেরে রক্ত বের করে দাও।"

জেনির অশ্রাব্য ভাষায় বিরক্ত হয়ে এম্মা এডোয়ার্ডভ্‌না তাকে থামিয়ে দিতে বলল, "ও জেনি চুপ কর।"

সেও পাল্টা জবাব দিল, "আমি চুপ করব না।" তবে আর কোন কথা না বলে সক্রোধে সে চলে গেল; তখন তার নাসারন্ধ্র থেকে আগুন ছুটছে, সুন্দর দুটি কালো চোখ আগুনের মত জ্বলছে।

৭

একে একে বসবার ঘরটা ভরে যেতে লাগল। অন্যদের সঙ্গে রলি-পলিও এসে হাজির হয়েছে। সারা ইয়ামাতে সে সুপরিচিত। বুড়ো লোকটি ঢ্যাঙা, শুটকো, পাকা চুলে ভর্তি মাথা, নাকটা লাল, বন-রক্ষকের পোষাক পরা, পায়ে উঁচু বুট। তার পাশ-পকেট থেকে সব সময়ই একটা গজ-কাঠি বেরিয়ে থাকে। দিন-রাত সে বৈঠকখানার বিলিয়ার্ড-রুমের চারধারে ঘুরঘুর করে, ঠাট্টা-মস্করা করে, ছড়া কাটে, চুটকি বলে; সব সময়ই আধা মাতাল হয়ে থাকে। এসব জায়গায় সে দরোয়ান, বাড়িউলি ও মেয়েদেরই সমগোত্রীয়। এই সব প্রতিষ্ঠানের মালকিন থেকে দাসী পর্যন্ত সকলেই তাকে ঘৃণা করে—মৃদু ঘৃণা, বিতৃষ্ণা, কিন্তু বিদ্বেষ নয়। অনেক সময় তাকে দিয়ে কাজও হয়—সে মেয়েদের চিঠি বা সংবাদ তাদের ভালবাসার মানুষদের কাছে পৌঁছে দেয়; বাজারে বা ওষুধের দোকানে যায়। প্রায়ই দেখা যায় আত্মসম্মানের বালাই না থাকায় এবং সেই সঙ্গে বাকপটুতার গুণটির জন্য সে একদল নবাগত লোকের সঙ্গে ভিড়ে গেছে এবং এই ভাবে শুধু যে তাদের খরচের বোঝা বাড়াচ্ছে তাই নয়, তাদের কাছ থেকে বেশ কিছু ধারও বাগিয়ে নিচ্ছে। সেই সব টাকার কিছু খুচরো সিগারেটের জন্য রেখে বাকিটা সে এখানেই মেয়েমানুষদের জন্য খরচ করে। কাজেই অভ্যাসবশতই সকলে তাকে মোটামুটি সহ্য করে চলে।

মাথার টুপিটা বেপরোয়াভাবে বেঁকিয়ে পরা তার ঢ্যাঙা চেহারাটা দরজায় হাজির হতেই নিউরা বলে উঠল, "এই যে রলি-পলি এলেন। সবে সে দরোয়ান সাইমিয়নএর সঙ্গে বন্ধুভাবে কর-মর্দন করেছে অমনি নিউরা বলল, "রলি-পলি, শুরু করে দাও।"

সামরিক কায়দায় অভিবাদন জানিয়ে একটি বিশেষ ভঙ্গীতে সে সঙ্গে সঙ্গে শুরু করে দিল। "নিজেকে পরিচিত করাবার সৌভাগ্য আমি পেয়েছি। স্থানীয়-প্রমোদ প্রতিষ্ঠানগুলি পরিদর্শনের জন্য আমি অবৈতনিক প্রিভি-কাউন্সিলর নিযুক্ত হয়েছি।" তারপর নানা রকম ব্যঙ্গ-কৌতুক করতে করতে সব মেয়েগুলোর কাছে ঘুরে ঘুরে শেষটায় সে মোটা কাতিয়ার পাশে গিয়ে বসল। কাতিয়া তার মোটা পাটা তার পায়ের উপর চাপিয়ে দিয়ে হাঁটুর উপর কনুইটা রেখে দুই হাতে থুতনিটা ধরে রলি-পলির সিগারেট পাকানো দেখতে লাগল।

একটু রাতের দিকে একদল নাপিত এসে হাজির হল; আজ তাদের ছুটির দিন। এসেই তারা হৈ-হল্লা শুরু করে দিল। কষ্ট করে উপার্জন করা টাকার যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার করবার জন্য তারা স্থির করেই এসেছে যে ইয়ামার সবগুলো বাড়ি তারা ঘুরবে; শুধু ত্রেপ্পেল-এ ঢুকতে সাহস করে নি—সেটা তাদের পক্ষে অনেক উঁচু দরের বাড়ি। কিন্তু এখানে এই আন্না মার্কভ্‌না-য় তারা বেশ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। একটা কোয়াড্রিল বাজনার ফরমাস করে তারা বেশ মৌজ করে নাচল। কিন্তু তারা মেয়েদের কাছে থাকল না, সবগুলো বাড়ি ঘুরে আবার ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলে গেল।

কিছু সরকারী করণিক এল, আবার চলেও গেল; কিছু ছাত্র এল; এখানকার সকলের চোখে কৌলিন্য হারাবার ভয়ে ভীত কিছু অফিসারও এল। ক্রমে ঘরের অবস্থা এতই গোলমেলে ও তন্দ্রাতুর হয়ে উঠল যে সকলেই বেশ স্বস্তি বোধ করতে লাগল। একজন স্থায়ী খদ্দের এল—সোংকার প্রেমিক। প্রায় প্রতিদিন সে আসে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রিয়ার পাশে বসে থাকে, অগ্নিগর্ভ প্রাচ্য চোখ মেলে তার দিকে তাকিয়ে থাকে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে, তাকে কামনা করে, আবার সঙ্গে সঙ্গে তার এই গণিকা-জীবনের জন্য তর্জন-গর্জনও করে।

এ রকমটা প্রায়ই ঘটে। বাড়িউলি জোসিয়া তখন তার কাছে গিয়ে ঠোঁট দুটো প্রায় না নেড়েই বলে:

"কিসের জন্য তুমি এখানে বসে আছ মিষ্টার? পাছা গরম করতে? উঠে গিয়ে তোমার ভালবাসার মেয়ের কাছে সময় কাটাও না কেন?"

তারা দু'জনই ইহুদি। ছিল গোমল-এর অধিবাসী। পরস্পরকে প্রাণ-মন দিয়ে ভালবাসার জন্যই ঈশ্বর তাদের সৃষ্টি করেছিল; কিন্তু ঘটনাচক্রে তাদের শহরে মড়ক দেখা দিল; সেই সঙ্গে দেখা দিল দারিদ্র্য, গোলমাল, আতংক; দু'জন দু'জনের কাছ থেকে কিছু দিনের মত বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। ছেলেটির নাম নীম্যান; একজন শিক্ষানবীশ ওষুধ প্রস্তুতকারক। তার প্রেম এতই দুর্জয় যে অনেক চেষ্টা করে, বহু লাঞ্ছনা সয়ে স্থানীয় ওষুধের দোকানে একটা চাকরি যোগাড় করে নিল এবং শেষ পর্যন্ত মেয়েটিকেও খুঁজে পেল। সে ছিল প্রকৃত গোড়া ইহুদি, প্রায় ধর্মোন্মাদ। সে জানতে পেরেছিল, তার মা সোংকাকে সাদা মানুষদের ক্রীতদাসী হিসাবে বিক্রি করে দিয়েছে। তার বিক্রি ও

পুনঃবিক্রির অনেক কুৎসিত শোচনীয় কাহিনী সে শুনেছে, আর তার পবিত্র, একনিষ্ঠ ইহুদি আত্মা সে সব কথা ভেবে ব্যথায় কুঁকড়ে উঠেছে, শিউরে উঠেছে। কিন্তু তার ভালবাসা ছিল সে সব কিছুর উর্ধ্বে। প্রতি সন্ধ্যায় সে আন্না মার্কভ্‌নার বসবার ঘরে হাজির হত। তার যৎসামান্য উপার্জন থেকে যদি কখনও অতি কষ্টে একটি রুবল বাঁচাতে পারত, তাহলে সোংকাকে তার ঘরে নিয়ে যেত; কিন্তু তাতে দু'জনের কেউই আনন্দ পেত না—দৈহিক মিলনের ক্ষণস্থায়ী সুখের পরেই দু'জন কাঁদতে শুরু করত এবং নাটকীয় ভঙ্গীতে একে অপরকে তিরস্কার করত। এই সব ক্ষণিক মিলনের পরে চোখের পাতা ফুলিয়ে লাল করে সোংকা বসবার ঘরে ফিরে যেত।

অবশ্য অধিকাংশ দিনই তার কাছে টাকা-পয়সা কিছু থাকত না; দীর্ঘ সন্ধ্যা সে তার প্রেমিকার পাশে শুধু বসে থাকত; যখন কোন খদ্দের তাকে পছন্দ করে নিয়ে যেত, তখনও সে মনে মনে ঈর্ষায় জ্বললেও ধৈর্য ধরে তার ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করে থাকত। তারপর মেয়েটি ফিরে এসে তার পাশে বসলে আবার এমনভাবে তার দিকে না তাকিয়েই তাকে বকাবকি করত যাতে অন্য কেউ তা টের না পায়। সেই সব মুহূর্তে মেয়েটির সুন্দর, ভীরু দুটি ইহুদি-চোখ অনেক দুঃখেও কেমন খুশি-খুশি দেখাত।

ইতিমধ্যে জনৈক চশমাওয়ালার কর্মচারি একদল জার্মান এসে হাজির হল। এল কেরেশ্‌কভ্‌স্কির মস্তবড় মনিহারী দোকানের কয়েকজন করণিক; এল ইয়ামা-তে অত্যন্ত পরিচিত দুটি যুবক; দু'জনেরই মাথায় টাক, চারদিক ঘিরে সরু একসারি চুল; এই সব পতিতালয়ে তারা হিসাব-রক্ষক কল্‌কা আর গায়ক মিশ্‌কা নামে পরিচিত। চশমার দোকানের কার্ল কার্লোভিচ ও মনিহারী দোকানের ভলদ্‌কা-র মতই তাদের দু'জনকেও মহাসমারোহে হৈ-চৈ করে চুমু খেয়ে অভ্যর্থনা করা হল। তারাও এই সাদর সম্মানে আত্ম-মর্যাদায় ফুলে উঠতে লাগল। প্রাণ-চঞ্চলা নিউর্কা সারাক্ষণ ছটফট করে ছুটে বেড়াচ্ছে আর নতুন কাউকে আসতে দেখলেই উত্তেজিতভাবে চেঁচিয়ে উঠছে:

"জেংকা, ওই তোমার নাগর এল।"

"ছোট মাংকা, তোমার প্রিয়তম এল।"

গায়ক মিশ্‌কা মোটেই গাইতে পারে না। সে একটা ওষুধের দোকানের মালিক। তবু ঘরে ঢুকেই সে থেমে থেমে কাঁপা-কাঁপা গর্দভ-রাগিণীতে গান শুরু করে দিল:

"স-ত্যে-র আ-লো-ও—
ও-ই প-ড়-লো-ও-ও!"

আন্না মার্কভ্‌নার বাড়িতে এলেই এ-কাজটি সে নির্ঘাৎ করবে।

বাজনাদাররা একটানা বাজিয়ে চলেছে—কোয়াড্রিল, ভাল্‌সে, পল্‌কা সব, আর অন্য সবাই একটানা নেচে চলেছে। তামারার প্রেমিক সেংকাও এসেছে,

কিন্তু অন্য দিনের মত আজ সে "দিল-দরিয়া" হাতে টাকা ওড়াল না, মেয়েদের চকোলেট দিল না···বা ইসায়া সাব্বিচকে শোক-যাত্রার সুরও বাজাতে বলল না। সেখানে না থেমেই সে মাথা নেড়ে তামারাকে ইসারা করল এবং দু'জনে তার ঘরে চলে গেল। অভিনেতা এগমন্ত্‌ লাভ্রেত্‌স্কিও হাজির হয়েছে।

কয়েকটা পতিতালয়ে দু'তিনটে লড়াইও হয়ে গেল। একটা লোক গায়ে-মুখে রক্ত মেখে শাপ-শাপান্ত করতে করতে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে, আর আঘাতের কথা ভুলে মারামারির সময় হারিয়ে যাওয়া টুপিটার খোঁজ করছে। মালয়া ইয়াম্স্কায়াতে সেনাবিভাগের কিছু করণিক একদল নাবিকের সঙ্গে লড়াই শুরু করে দিল। ক্লান্ত বাজনাদাররা অভ্যাসবশতই যেন বেপরোয়াভাবে তখনও বাজিয়েই চলেছে। রাত শেষে হতে চলেছে।

এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে সাতটি ছাত্র, একজন সরকারী অধ্যাপক ও স্থানীয় সংবাদপত্রের একজন প্রতিবেদক আন্না মার্কভ্‌নার পতিতালয়ে এসে ঢুকল।

৮

একমাত্র প্রতিবেদকটি ছাড়া আর সকলেই ভোর থেকে তাদের পরিচিত মেয়েদের নিয়ে একসঙ্গে যে দিবসের উৎসবে কাটিয়েছে। তারা নীপার নদীতে নৌকো চালিয়েছে, নদীর ওপারে ঘন সুগন্ধ জঙ্গলে বিশেষ ধরনের পরিজ রান্না করেছে, ছেলেরা এবং মেয়েরা আলাদা আলাদা ভাবে গরম স্রোতের জলে স্নান করেছে। তারা ঘরে-তৈরি মদ খেয়েছে, ইউক্রেন-এর সুমধুর সঙ্গীত গেয়েছে। তারপর একটু রাত করেই নৌকোর গায়ে চল্‌কে পড়া জলের ছলাৎ-ছলাৎ সুর শুনতে শুনতে, উপরে আকাশের তারা আর নীচে জলের রূপোলি ঢেউয়ের উপর বৈদ্যুতিক আলোর ঝিলমিল ও অন্ধকারে ভাসমান বয়াগুলি দেখতে দেখতে তারা নৌকো চালিয়ে ফিরে এসেছে। যখন তীরে এসে নেমেছে তখন বৈঠার ঘসায় হাত জ্বলছে, হাত-পায়ের মাংসপেশীগুলি ব্যথায় টন্‌টন্‌ করছে, সারা শরীরে কেমন একটা সুখকর ক্লান্তির আমেজ।

তারপর মেয়েদের বাড়ি পৌঁছে দিয়েছে, সদর দরজায় অনেকক্ষণ ধরে সাদরে তাদের বিদায় জানিয়েছে, আর এত জোরে কর-মর্দন করেছে যে কলে চাপ দিয়ে জল তোলার কথা তাদের মনে পড়ে গেছে।

সারাটা দিন হৈ-চৈতে কেটেছে ; কিছুটা ক্লান্তিকর হলেও সুখকর, যৌবনের নির্দোষ আনন্দে সিঞ্চিত। কেউ মাতাল হয় নি, কেউ ক্ষুন্ন বা ঈর্ষান্বিত হয় নি, কারও মনে কোন অভিযোগ নেই। সূর্যের আলো, নদীর তাজা বাতাস, ঘাস ও জলের মধুগন্ধ, সাঁতারে ও নৌকো চালনায় নিজের নিজের শক্তি ও দক্ষতার আনন্দময় অনুভূতি, আর বহুদিনের পরিচিত মধুর স্বভাব মেয়েদের বুদ্ধিদীপ্ত সংযমের প্রভাব—সব কিছু মিলিয়ে তাদের মন আনন্দে ভরে উঠেছে।

তবু কোন মেয়ের আকস্মিক একটু হাতের ছোঁয়া, নৌকোয় তুলতে বা নামাতে গিয়ে কোন মেয়ের কোমর জড়িয়ে ধরা, রোদে শুকোতে দেওয়া মেয়েদের পোষাকের মৃদু সৌরভ, সামোভারকে ঘিরে সবুজ ঘাসের উপর এলোমেলো পোষাকে শুয়ে থাকা মেয়েদের এক পলক দেখা—এক কথায় কোন বন-ভোজনে, প্রমোদ-ভ্রমণে বা নৌকা-বিলাসে অপরিহার্য ছোটখাট সব ঘটনা নিজেদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতেই তাদের ইন্দ্রিয়পরতা, কাল্পনিক ইন্দ্রিয়পরতা নয়, তরুণ মনের সুস্থ, স্বাভাবিক, প্রবৃত্তিগত ইন্দ্রিয়পরতা, অতি সংগোপনে তাদের বুকের গভীরে সেই চিরকালের শৃংখলহীন সুন্দর জন্তুকে জাগিয়ে তোলে যা প্রায়ই আতংকের সৃষ্টি করে, বিকৃত করে।

সেই জন্যই সকাল দুটো বাজলে ছাত্রদের নিরালা রেস্তোরাঁ "দি স্প্যারোজ" যখন বন্ধ হয়ে গেল তখন আটটি পুরুষ মদে ও প্রচুর খাদ্যে উত্তেজিত হয়ে ধোঁয়াটে ঘর থেকে রাস্তায় বেরিয়ে এল। তারা বেরিয়ে এল আকাশে ও মাটিতে মনোরম আলোয় সজ্জিত রাতের মধুর কাঁপা অন্ধকারে; বুক ভরে টানল গরম নেশা-লাগা বাতাস আর না-দেখা বাগান ও ফুলের বন থেকে ভেসে-আসা সুগন্ধ। আটজনেরই মাথায় দেখা দিল জ্বর-জ্বর ভাব, বুকের মধ্যে জাগল অস্পষ্ট কামনা। ক্ষণেক বিশ্রামের পরে আনন্দে ও গর্বে তাদের মন ভরে উঠল মাংসপেশীর নতুন শক্তিতে, ফুসফুসের গভীর শ্বাস-প্রশ্বাসে, শিরায় শিরায় লাল রক্তের প্রবাহে আর দেহের কাছে স্বাভাবিক আত্ম-নিবেদনে। আর—কোন কথা না বলে, কোন চিন্তা-ভাবনা না করে, একান্তই অচেতনভাবে—হঠাৎ তাদের মনে হল তন্দ্রাতুর বনের মধ্যে বিবস্ত্র হয়ে সারা রাত কাটিয়ে দেবে, শিশির-সিক্ত ঘাসের বুকে আর কারও উপস্থিতির সন্ধানে বাতাসের গন্ধ শুঁকবে; নির্ভীক কণ্ঠে কোন সঙ্গিনীকে কাছে ডাকবে।

তাই তারা কেউ কাউকে ছেড়ে যেতে পারে নি। সারাটা দিন এক সঙ্গে কাটিয়ে তারা যুথবদ্ধ হয়ে পড়েছে। মনে হচ্ছে, একজন কেউ দল ছেড়ে কেটে পড়লে সমস্ত দলটারই সুর কেটে যাবে, সে সুরকে আর ফিরিয়ে আনা যাবে না। তাই তারা রেস্তোরাঁর সামনে পথের উপর দাঁড়িয়েই সময় কাটাতে লাগল। বেশ গুরুতরভাবেই ভাবতে লাগল, বাকি রাতটা কোথায় কাটানো যায়। "তিভোলি গার্ডেন" এখান থেকে অনেকটা দূরে। তাছাড়া সেখানে ঢুকতে হলেই দর্শনী লাগে; মদের দামও অত্যন্ত চড়া; সেখানকার গান-বাজনাও অনেকক্ষণ বন্ধ হয়ে গেছে। ভলদয়া পাভলভ প্রস্তাব করল সকলে তার বাড়িতে যেতে পারে—সেখানে ডজনখানেক বীয়ারের বোতল ও কিছুটা "কগনাক" আছে। কিন্তু সকলেই একবাক্যে জানাল যে, কারও বাড়িতে গিয়ে পা টিপে টিপে সিঁড়ি দিয়ে ওঠা আর সারাক্ষণ ফিস্‌ফিস্ করে কথা বলা মোটেই পোষাবে না।

"তাহলে কি করবে বল বাছাধনরা। বরং ইয়ামা-তে চল, মেয়েদের

কাছে···সেটাই মোক্ষম হবে," একটি পুরনো ছাত্র লিখোনিন বলল। ছেলেটি লম্বা, দাড়িওয়ালা, ঈষৎ কুঁজো, বিষণ্ন। মতবাদের দিক থেকে সে নৈরাজ্যবাদী, কিন্তু পেশায় পাড় জুয়ারি—বিলিয়ার্ড, ঘোর দৌড়, তাস, সর্বত্রই সে একজন পাকা জুয়ারি। মাত্র আগের দিনই কমার্শিয়াল ক্লাবে সে এক হাজার রুবল জিতেছে। সে টাকা এখন তার পকেটে যেন ছ্যাঁকা দিচ্ছে।

একজন সায় দিয়ে বলল, "আপত্তি কি? সেই ভাল। চল হে বাছারা।"

বিজ্ঞতার ভাণ করে একজন বলল, "কিন্তু মজুরি পোষাবে তো? সারা রাতের ব্যাপার হবে যে!"

তৃতীয় জন একটা হাই তুলতে তুলতে বলল, "তার চাইতে বাড়ি চল মশাইরা···আ-আ-আ···বাই-বাই···আ-আ-আ। একদিনের পক্ষে অনেক হয়েছে!"

লিখোনিন মুখ বেঁকিয়ে বলে উঠল, "ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে কোন কাজ হয় না। হের প্রফেসার, আপনি যাচ্ছেন তো?"

সহকারী অধ্যাপক ইয়ারচেংকো একগুঁয়ে লোক; সে সত্যি রেগে গেছে; অবশ্য তার মনের অন্ধকার কোণে কোন্ কথা উঁকি দিচ্ছিল তা হয় তো সে নিজেই জানে না।

"আমাকে বাদ দাও লিখোনিন। বন্ধুগণ, আমি মনে করি, তোমরা যে প্রস্তাব করেছ সেটা অত্যাচার ছাড়া আর কিছু নয়। সারাটা দিন আমরা চমৎকার একটা খুশির মেজাজে কাটিয়েছি। কিন্তু, না, এখন তোমরা মাতাল জানোয়ারদের মত কাদায় ডুব দিতে চাইছ। আমি ওতে নেই!"

শান্ত অথচ তীব্র ব্যঙ্গের স্বরে লিখোনিন বলল, "আমার স্মৃতি-শক্তি যদি ক্ষুণ্ণ না হয়ে থাকে তাহলে আমার মনে পড়ছে যে, এই তো গত বারেই একজন হবু অধ্যাপককে নিয়ে আমরা কোন একটা জায়গায় পিয়ানোটাকে বুরিয়াতদের দেবতা মনে করে তার উপর বরফের সরবৎ ঢেলেছিলাম, পেট দুলিয়ে নেচেছিলাম এবং আরও কত কি করেছিলাম···।"

লিখোনিন ঠিকই বলেছে। ছাত্র জীবনে এবং পরে সে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করত তখন ইয়ারচেংকো অত্যন্ত উচ্ছৃংখল জীবন যাপন করত। শহরের শুঁড়িখানায়, ক্যাবারে নাচের আসরে, অন্য যে কোন আমোদ-প্রমোদের জায়গায়ই তাকে সব সময় দেখা যেত।

তার সহকর্মীরা বুঝতে পারত না সে পড়াশুনার সময় পেত কখন। অথচ বেশ কৃতিত্বের সঙ্গেই সে পরীক্ষায় পাশ করল। প্রতিবারেই সর্বোচ্চ নম্বর পেল এবং প্রথম সেমেস্টার থেকেই অধ্যাপকদের নজরে পড়ল। অবশ্য সম্প্রতি সে একটু একটু করে পুরনো বন্ধু ও বোতল-সঙ্গীদের কাছ থেকে সরে যেতে শুরু করেছে। অধ্যাপক ও তাদের পরিবারবর্গের মধ্যে সে তার পরিচয়ের গণ্ডীটাকে প্রসারিত করে চলেছে। আগামী বছর রোমের ইতিহাসের উপর কতকগুলি

বক্তৃতা দেবার আমন্ত্রণও সে পেয়েছে। বিভিন্ন আলাপ-আলোচনায় তার মুখে এখন যখন-তখন সহকারী অধ্যাপকদের মধ্যে প্রচলিত একটা কথা প্রায়ই শোনা যায়ঃ "আমরা বিজ্ঞানীরা!" ছাত্রদের অসংযত অশোভন জীবনযাত্রা, নিজের অপছন্দ সঙ্গী-সাথী, ছাত্রদের সব সভা-সমিতি, প্রতিবাদ ও বিক্ষোভে যোগদান—এ সব আর তার ভাল লাগে না। সে সবই এখন অসুবিধাজনক ও একঘেয়ে মনে হয়। কিন্তু ছাত্রদের মধ্যে জনপ্রিয় হবার মূল্য সে বোঝে, কাজেই হঠাৎই আগেকার সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করতে সে চায় না। যা হোক, লিখোনিন-এর কথাগুলো তার কানে খট্ করে লাগল।

ইয়ারচেংকো তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠল, "ছেলেবেলায় আমরা কি করেছি না করেছি তা ঈশ্বরই জানেন; মিছরি চুরি করেছি, প্যাণ্ট নোংরা করেছি, গুব্‌রে পোকার পাখা ছিঁড়েছি। কিন্তু সব কিছুরই একটা সময় আছে, একটা সময়-সীমাও আছে। অবশ্য আমি তোমাদের উপদেশ বা জ্ঞান দিতে চাই না, কিন্তু আমাদের কাজের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য থাকা চাই। আমরা সকলেই জানি, গণিকাবৃত্তি মানব সমাজের সব চাইতে বড় পাপ; আমরা আরও মানি, সে জন্য দায়ী নারীরা নয়, আমরা পুরুষরা, কারণ চাহিদাই সরবরাহের জনক। সুতরাং গ্লাসের পর গ্লাস মদ গিলে আমি যদি আমার দৃঢ় বিশ্বাস সত্বেও বেশ্যাবাড়ি যাই তাহলে আমি ত্রিবিধ পাপে লিপ্ত হইঃ প্রথম পাপ একটি ভাগ্যহীনা নির্বোধ স্ত্রীলোকের প্রতি, যাকে আমার রুবলের বিনিময়ে নিকৃষ্টতম ক্রীতদাসীত্বের পথে আমি ঠেলে দিয়েছি। দ্বিতীয় পাপ মানবতার বিরুদ্ধে, কারণ আমার কুৎসিত বাসনা পরিতৃপ্তির জন্য এক বা দু'ঘণ্টার জন্য একটি বেশ্যাকে ভাড়া করে আমি গণিকাবৃত্তিকেই সমর্থন করছি। আর শেষ পাপ আমার বিবেকের বিরুদ্ধে, আমার বিশ্বাসের বিরুদ্ধে। এবং যুক্তির বিরুদ্ধে!"

"তথাপি সমাজের জৈব প্রয়োজন মেটাবার কোন পথ তো খোলা রাখা চাই।" বরিস সোবাশ্‌নিকভ নামক একটি লম্বা, উদ্ধত যুবক গম্ভীরভাবে কথাগুলি বলল। তার পরনের খাটো জুতা (তাতে তার মোটা পাছাটা ভালভাবে ঢাকাও পড়ে নি), মিলিটারি-কাটের আধুনিক ট্রাউজার, চওড়া কালো ফিতেয় ঝোলানো পিঁস-নে, আর প্রুশীয় ধরনের টুপিতে একটা ফুলবাবুর আভাস ফুটে উঠেছে। "নিজের দাসীর সঙ্গে প্রেম করা, বা অন্য কারও স্ত্রীর সঙ্গে লুকিয়ে ব্যাপার স্যাপার চালানো কি এর চাইতে ভাল? মেয়েমানুষ যখন চাই-ই, তখন এ ছাড়া উপায় নেই!"

ইয়ারচেংকো বিরক্তির ভঙ্গী করে বলল, "উপায় আছে। এটা যেন ক্ষুধার ব্যাপার নয়। এটা একটা খেয়াল-খুশির ব্যাপার মাত্র।"

এই সময় রামসেস্ ডাক-নামের একটি ছাত্র কথা বলল। মিটমাটের সুরে সে বলল, "গাভ্রিলা পেত্রভিচ, জোর করে কেউ তো তোমাকে পাপ করতে বলছে না। ও রকম করুণ বিষণ্ণ সুরে কথা বলছ কেন? ব্যাপারটা তো খুবই

সাধারণ : একদল রুশ ভদ্রলোক বাকি রাতটা মিলেমিশে কাটাতে চায় ; তারা ফর্তি করবে, গান করবে, কয়েক গ্যালন মদ ও বীয়ার গিলবে। কিন্তু এ ধরনের কয়েকটা বাড়ি ছাড়া আর সব বন্ধ হয়ে গেছে। সুতরাং!"

তার প্রশ্ন দিয়েই তাকে ব্যঙ্গ করে ইয়ারচেংকো বলল, "অতএব ফর্তি করবার জন্য আমাদের যেতে হবে বেশ্যার কাছে? বেশ্যাবাড়িতে?"

"তাতে কি হল? একবার হয়েছিল কি, একজন দার্শনিককে অসম্মান করার জন্য খাবার টেবিলে তাকে একেবারে শেষ প্রান্তে বাজনাদারদের পাশে বসতে দেওয়া হয়েছিল। সেখানে বসতে বসতে আক্ষরিক অর্থে টেবিলটাকে ঘুরিয়ে দিয়ে সে বলে উঠল : 'সর্বশেষ আসনটিকে সর্বপ্রথম আসনে পরিণত করার এই হল নিশ্চিত উপায়।' সেই রকম আমিও বলি : তোমার কথামতই কোন স্ত্রীলোককে পয়সা দিয়ে কেনাটা যদি তোমার বিবেকে বাধে, বেশ তো, তুমি সেখানে চলে যাও এবং তোমার ফুটন্ত ফুলের মত নিষ্পাপ চরিত্রকে অক্ষুণ্ন রেখেই সেখান থেকে চলে এস।"

ইয়ারচেংকো বিরক্ত হয়ে বলল, "তুমি বাড়াবাড়ি করছ রামসেস্। সেই শহরে লোকদের কথা তুমি আমাকে মনে করিয়ে দিলে যারা একটি মৃত্যুদণ্ড দেখার জন্য রাত থাকতে এসে জড় হয়ে বলাবলি করছে : 'আমরা এ সবেতে নেই, আমরা মৃত্যুদণ্ডের বিরোধী! সরকার পক্ষের অ্যাটর্নি আর জল্লাদই এ জন্য দায়ী।"

"চমৎকার বলেছ গাভ্রিলা পেত্রভিচ, আর কথাটা আংশিক সত্যও বটে। কিন্তু তোমার উপমাটা আমাদের বেলায় মোটেই প্রযোজ্য নয়। রোগীকে না দেখে কখনও কোন খারাপ রোগের চিকিৎসা করা যায় না। আমরা যারা এখানে পথে দাঁড়িয়ে আছি কখনও না কখনও তাদের এই ভয়ংকর পতিতাবৃত্তির সম্মুখীন হতেই হবে—বিশেষ করে রাশিয়ার পতিতাবৃত্তির! লিখোনিন, আমি, বোরিয়া সোবাশ্নিকভ ও প্লাতনভ জুরী হিসাবে, পেত্রভস্কি ও তল্পিগিন ডাক্তার হিসাবে। এ কথা ঠিক যে ভেল্ত্মান-এর একটা বিশেষ দিক আছে—গণিত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে তো প্রচারকই হবে, একজন যুবনেতা, চাই কি গুরুও হতে পারে। তখন লোকজনদের অকারণে জুজুর ভয় না দেখিয়ে নিজের চোখে এখন সেটা দেখে নেওয়া ভাল নয় কি। আর তুমি গাভ্রিলা পেত্রভিচ, তুমি তো মৃত ভাষা বিশেষজ্ঞ, প্রত্নতাত্ত্বিক কবর-খনন কার্যের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। স্থানীয় কুখ্যাত বাড়িগুলির সঙ্গে, ধরো, পম্পাইয়ের কোন গণিকালয় অথবা থিবিস ও নিনেভে-র কোন পবিত্র পতিতালয়ের তুলনা করাটা কি তোমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও শিক্ষাপ্রদ হবে না?"

লিখোনিন গর্জন করে উঠল, "সাবাস রামসেস্, চমৎকার। বাজে কথায় আর সময় নষ্ট করো না বাছাধনরা। অধ্যাপককে জোর করে ধরে গাড়িতে তুলে নাও।"

ছাত্ররা হাসতে হাসতে ঠেলাঠেলি করে ইয়ারচেংকোকে ঘিরে ধরল এবং চ্যাংদোলা করে তুলে নিল। নারী-সঙ্গের ইচ্ছা সকলেরই আছে, কিন্তু লিখোনিন ছাড়া আর কারওই এগিয়ে যাবার সাহস নেই। কিন্তু এখন সমস্ত ব্যাপারটাই একটা ঠাট্টা-তামাসার রূপ নিল। ইয়ারচেংকো বাধা দিল, রাগ করল, আবার তাদের হাত থেকে ছাড়া পাবার চেষ্টা করতে করতে হাসতেও লাগল। ঠিক সেই মুহূর্তে একটি ঢ্যাঙা কালো গোঁফওয়ালা পুলিশ ছাত্রদের দিকে এগিয়ে এল। তীক্ষ্ণ প্রতিকূল দৃষ্টিতে সে অনেকক্ষণ থেকেই তাদের উপর নজর রেখেছিল।

"ছাত্রবাবুরা, দয়া করে ভিড় করবেন না। সেটা নিয়ম নয়। এগিয়ে চলুন।"

সকলে দল বেঁধে এগিয়ে চলল। ইয়ারচেংকো কিছুটা নরম হয়েছে।

"দেখ ভাই সব, আমি তোমাদের সঙ্গে যেতে রাজী আছি। মনে করো না যে তোমাদের এই মিশরের ফারাও রামসেস্-এর বাণী শুনে আমি মত বদলেছি। তবে আমি দলটা ভেঙে দিতে চাই না। কিন্তু একটা শর্ত—আমরা অল্প-সল্প পান করব, অল্প-সল্প হাসব, কিছু বাজে কথাও বলব···কিন্তু তার বেশী কিছু নয়, কোনরকম নোংরা কাজ নয়। রাশিয়ার বুদ্ধিজীবীদের পুষ্প ও অলংকারস্বরূপ আমরাও পথের পাশে প্রথম যে ঘাঘরাটি দেখব তার কাছেই মাথা নীচু করব, তাকে দেখেই আমাদের জিভে জল আসবে, সেটা ভাবতেও আমি লজ্জা ও অপমান বোধ করছি।"

হাত তুলে লিখোনিন বলল, "আমি শপথ করছি।"

"আমিও কথা দিলাম," রামসেস্ বলল।

"আমিও! আমিও। আমরা সকলেই প্রতিজ্ঞা করছি। ইয়ারচেংকো ঠিকই বলেছে!" সকলেই সায় দিল।

অনেকক্ষণ ধরেই এক সারি গাড়ি তাদের পিছন-পিছন আসছিল। ছাত্ররা দু'জন তিনজন করে গাড়িতে চেপে বসল। গাড়ি চলতে লাগল।

প্রথমে তারা সারারাত খোলা দরশেংকো রেস্তোরাঁতে থামল। ভিতরে ঢুকে বার-এর সামনে ভিড় করল। কিন্তু খাবার বা পান করবার ইচ্ছা তাদের ছিল না। প্রত্যেকেরই মনের মধ্যে একটা অস্পষ্ট ধারণা জন্মেছিল যে সে এমন একটা কিছু করতে যাচ্ছে যেটা অপ্রয়োজন ও ঘৃণ্য; এমন কিছু কৃত্রিম হৈ-হল্লা করতে যাচ্ছে যেটা সত্যিকারের আনন্দ নয়। প্রত্যেকেই নেশা করে এমন একটা আচ্ছন্ন ও মনোমুগ্ধকর অবস্থায় উপনীত হতে চাইছে যেখানে কিছুতেই কিছু যায়-আসে না; যেখানে হাত-পা কি করছে এবং জিভ কি বলছে তাও মাথাটা জানতে পারে না।

ছাত্ররা যখন কগনাক, বীয়ার ও ভদ্কা খাচ্ছিল তখন রামসেস্ ঘরের একেবারে এককোণে তাকিয়ে দেখতে পেল, দুটি লোক বসে আছে। একটি

বুড়ো, তার মাথায় এলোমেলো সাদা চুল। আর তার উল্টোদিকে বার-এর দিকে পিঠ দিয়ে বসে আছে ছোট করে চুল ছাটা ধূসর স্যুট পরা একটি লোক। টেবিলের উপর কনুই ছড়িয়ে দুটি মুষ্টিবদ্ধ হাতের মধ্যে থুতনি রেখে সে পিঠটা কুঁজো করে বসে আছে। বুড়ো লোকটি একটি তারের যন্ত্রের উপর আঙুল চালাতে চালাতে কর্কশ অথচ মনোরম কণ্ঠে ধীরে ধীরে গান করছে।

"আরে, এ যে আমাদের সংবাদপত্রের প্রতিবেদক," এই কথা বলে রামসেস ধূসর স্যুট-পরা লোকটির দিকে এগিয়ে গেল। পরমুহূর্তে বার-এর কাছে নিয়ে গিয়ে সঙ্গীদের কাছে তাকে পরিচয় করিয়ে দিল।

"ভদ্রমহোদয়গণ, সংবাদপত্রের কাজে আমার সহকর্মী সেরগেঅাইভানিচ প্লাতনভ্‌কে আপনাদের সামনে উপস্থিত করছি। ইনি সাংবাদিকদের মধ্যে সব চাইতে অলস এবং সর্বাপেক্ষা প্রতিভাবান ব্যক্তি।"

সকলেই তার নাম উচ্চারণ করে তার সঙ্গে করমর্দন করল।

"এবার সকলে একটু পান করা যাক," লিখোনিন প্রস্তাব করল।

সকলেই মদ খেল। আধ ঘণ্টা পরে লিখোনিন ও ইয়ারচেংকো কিছুতেই সেই প্রতিবেদককে যেতে দিল না; তাকে টানতে টানতে ইয়ামা-য় নিয়ে চলল। সেও অবশ্য খুব একটা আপত্তি করল না।

"আপনাদের অসুবিধা না হলে আমি আনন্দের সঙ্গেই যাব," শুধু এই কথাটুকুই সে বলল। "দ্‌নিপ্রভ্‌স্কো শ্লোভো" পত্রিকা আমাকে কাজের জন্য অনেক টাকা দিয়েছে। ক্ষমা করবেন, আমি আসছি।"

সে বুড়ো লোকটির কাছে ফিরে গেল। তার হাতের মধ্যে কিছু টাকা গুঁজে দিয়ে ভদ্রভাবে তার কাছ থেকে বিদায় নিল।

"আমি যেখানে যাচ্ছি আপনি সেখানে যেতে পারবেন না দাদু। কিন্তু কাল আবার ঠিক একই জায়গায় দেখা হবে। বিদায়।"

৯

আন্না মার্কভ্‌নার পতিতালয়ের সদর দরজায় পৌঁছে ইয়ারচেংকো আপত্তি জানাল। "দেখ ছেলেরা, এটা খুব বাজে চাল। এখানে আসাই যখন সাব্যস্ত হল তখন এই আস্তাকুড়ে না এসে অন্তত একটা ভাল জায়গায় তো আমরা যেতে পারতাম। চল, পাশের ত্রেপ্পেল-এ যাই; সেটা অনেক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আর আলোকোজ্জ্বল।"

দরবারী কায়দায় মাথা নীচু করে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে সহকারী অধ্যাপকের সামনে দরজাটা খুলে দিয়ে লিখোনিন বলল, "দয়া করুন, দয়া করুন সিনর; দয়া করে ভিতরে ঢুকুন।"

"এটা বাজে জায়গা।···ত্রেপ্পেল-এ মেয়েগুলো অন্তত দেখতে সুন্দরী।"

রামসেস্ পিছনেই ছিল। সে ব্যঙ্গভরে হেসে উঠল।

"ঠিক আছে, ঠিক আছে গাভ্রিলা পেত্রভিচ। নীতি হিসাবে এটাও মেনে নাও। ফেরিওয়ালার থালা থেকে যে ক্ষুধার্ত ছিঁচকে চোর আধখানা রুটি চুরি করেছে তাকে শাস্তি দাও, আর যে ব্যাংক-পরিচালক পাঁচ লক্ষ রুবল চুরি করে ঘোড়-দৌড় আর চুরুট খেয়ে উড়িয়ে দিল তার প্রতি সদয় হও।"

"আমি দুঃখিত, কিন্তু তোমার এ উপমার মানে আমি বুঝতে পারলাম না।" ইয়ারচেংকো সংযতভাবে জবাব দিল। "যাক সে কথা···ভিতরে চল।"

ইয়ারচেংকোকে পথ করে দিয়ে এক পাশে সরে লিখোনিন বলল, "ঠিক বলেছ! এই বাড়িটার অনেক ঐতিহাসিক ঐতিহ্য আছে বলেই কথাটা আরও ঠিক। কমরেডগণ, ঐ হ্যাট-র‍্যাক থেকে অনেক যুগের ছাত্ররা আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে; তাছাড়া, শিশু ও ছাত্ররা এখানে মাত্র অর্ধেক মূল্য দিয়ে থাকে। তাই নয় কি নাগরিক সাইমিয়ন?"

বড় বড় দলের অতিথি সমাগম সাইমিয়ন পছন্দ করে না—বড় দল মানেই অদূর ভবিষ্যতে গোলযোগ। বিশেষ করে ছাত্রদের বড় বড় কথা, হাল্কা ঠাট্টা তামাসা, এবং সরকার ও সব রকম প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অবিরাম বিদ্রোহের জন্য তাদের সে ঘৃণাই করে। যেদিন কসাকরা, কসাইরা আর ময়দা-ব্যবসায়ীরা মিলে ছাত্রদের বেসারাভ্‌স্কি স্ট্রীটে ঠেঙানি দিয়েছিল, সেদিন সাইমিয়ন সে সংবাদ শুনবার সঙ্গে সঙ্গে একটা "ড্রশ্‌কি"-তে লাফিয়ে উঠে পুলিশের বড় কর্তার মত গাড়িতে খাড়া দাঁড়িয়ে থেকে ঠেঙানিতে অংশ নেবার জন্য ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছিল। যে সব মালদার বয়স্ক বা মোটাসোটা লোক এখানে একলা সন্তর্পণে আসে, প্রথমেই বসবার ঘরে ঢুকে চারদিক ভাল করে তাকিয়ে দেখে পরিচিত লোকজন কেউ আছে কি না, তারপর খুব তাড়াতাড়ি এখান থেকে চলে যায়, আর যাবার সময় মোটা বকশিস দেয় সাইমিয়ন তাদেরই সমাদর করে, সব সময়ই "ইয়োর এক্সেলেন্সি" বলে তাদের সম্বোধন করে।

সুতরাং ইয়ারচেংকোর হাল্কা ধূসর রঙের ওভারকোটটা নিয়ে লিখোনিন-এর ঠাট্টার জবাবে সোজা বলে উঠল, "এখানে আমি নাগরিক নই। একটু লাফ-ঝাঁপ করি মাত্র।"

"এই উক্তির জন্য আপনাকে অভিনন্দন জানাতে পারি কি?" লিখোনিন বিনীতভাবে মাথা নীচু করল।

বসবার ঘরটা লোকে ভর্তি। অনেকক্ষণ ধরে নাচের ফলে সকলেই পরিশ্রান্ত হয়ে বসে পড়ে হাতের রুমাল নেড়ে নেড়ে হাওয়া খাচ্ছে। গায়ক মিশ্‌কা ও তার বন্ধু হিসাবরক্ষক তখনও শ্বেত পাথরের টেবিলের উপর কনুই রেখে মুখোমুখি বসে গলা মিলিয়ে গান করবার চেষ্টা করছে।

কিছু কিছু ছাত্রকে চিনতে পেরে মেয়েরা তাদের দিকে ছুটে গেল।

"তামারচ্‌কা, এই তো তোমার নাগর ভলোদেংকা। আর এই তো আমার নাগর মিশ্‌কা!" ঢ্যাঙা, লম্বা-নাক গম্ভীর মুখ পেত্রভ্‌স্কিকে জড়িয়ে ধরে

নিউরা চেঁচিয়ে উঠল। "আরে, মিশেংকা। কতকাল যে এদিকে মাড়াও নি। কতদিন যে তোমাকে দেখি নি।"

ইয়ারচেংকো হতভম্ব হয়ে চারদিক তাকাচ্ছিল।

এম্মা এডোয়ার্ডভ্‌না তার কাছে এলে সে আস্তে আস্তে বলল, "আমরা চাই···তুমি তো জান···একটা প্রাইভেট ঘর, বা ঐ রকম কিছু···আর কিছুটা লাল মদ···আর সুবিধা হলে একটু কফি···তুমি তো জানই···"

ইয়ারচেংকোর ভদ্র বিনীত ব্যবহার ও দামী পোষাক সকলকেই আকৃষ্ট করেছে। এম্মা এডোয়ার্ডভ্‌না সঙ্গে সঙ্গে সার্কাসের বুড়ো ঘোড়ার মত ঘাড় নাড়তে লাগল।

"নিশ্চয়, নিশ্চয়···ভদ্রলোকরা সব এদিকে ড্রয়িং-রুমে আসুন। সব কিছু করব, যা চাইবেন সব···কিছু ভাল মদ চাই তো? আমাদের অবশ্য শুধু 'বেনেডিক্টাইন'-ই আছে·· তাতে চলবে তো? খুব ভাল···মেয়েরাও এসে আপনাদের সঙ্গে বসবে তো?"

"তা, যদি একান্তই আসতে চায়···" ইয়ারচেংকো হাত বাড়িয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

তৎক্ষণাৎ মেয়েরা একে একে সার বেঁধে ছোট ড্রয়িং-রুমটাতে ঢুকল। ঘরটা সুন্দর আসবাবপত্রে সাজানো, নীল বাতি জ্বলছে। ঢুকেই পর পর প্রত্যেকের দিকে হাত বাড়িয়ে তারা চুপি চুপি সংক্ষেপে নিজেদের নামগুলো বলতে লাগল —মাংকা, কাতিয়া, লিউবা। তারপর ছেলেদের কোলের উপর বসে তাদের গলা জড়িয়ে ধরে অভ্যাসমত মিষ্টি মিষ্টি কথা বলতে লাগল।

"ছাত্রবাবু, তুমি কী সুন্দর···একটি কমলা খাওয়াও না?"

"ভলোদেংকা, আমাকে মিছরি কিনে দাও···কেমন?"

"আর আমার জন্য চকোলেট···"

ইয়ারচেংকোর কোলে চড়ে জকির মত পোষাক-পরা ভেরা আদুরে গলায় বলল, "শোন মটু, আমার একটি সখী আছে, অসুস্থ বলে এখানে আসতে পারে নি। তার জন্য কিছু আপেল আর চকোলেট দেবে কি? কি বল?"

"সখী-টখী সব বাজে কথা। তাছাড়া, এ সব ধাস্টামো আমি পছন্দ করি না। লক্ষ্মী মেয়ের মত এই চেয়ারটাতে বস আর হাত দুটো নামাও।"

আরও বেশী আদর করে গলা জড়িয়ে ধরে চোখ পাকিয়ে ভেরা বলল, "তাই কি পারি! তুমি কি জাননা তুমি কত বড় রসের নাগর আমার..."

এ সবই মেয়েদের অবশ্য কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে। শুধু বাড়িউলির একটু উদারতা বা মালকিনের একটু আদরের ঘাড় নাড়া ছাড়া এতে তাদের কোন বাড়তি লাভই নেই, তবু অলস দৈনন্দিন জীবনের একঘেয়েমি কাটাবার জন্যই তারা এসব করে।

সাইমিয়ন কফির পাত্র, কাপ, বেনেডিক্টাইন-এর বোতল, ফল ও মিছরি

নিয়ে হাজির হল। অনায়াসে সে বীয়ার ও মদের বোতলের কর্কগুলি খুলতে লাগল।

ইয়ারচেংকো প্রতিবেদক প্লাতনভকে বলল, "আপনিও কিছু পানীয় নিন। আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে তাহলে আপনি তো সের্‌গে আইভানিচ?"

"ঠিক।"

"এক কাপ কফি চলবে কি সের্‌গে আইভানিচ? অথবা এক গ্লাস লাফিত্তে?"

"না, ধন্যবাদ···যদি কিছু মনে না করেন আমি আমার ব্র্যাণ্ডটাই নিচ্ছি।··· সাইমিয়ন, দাও তো···"

নিউরা চেঁচিয়ে বলল, "কগনাক।"

"এই দিচ্ছি," বলে সাইমিয়ন কগনাক-এর বোতল খুলল।

লিখোনিন সবিস্ময়ে বলল, "এখানে কগনাক পরিবেশন করতে এই প্রথম দেখলাম।"

সোবাশ্‌নিকভ বেশ জোর দিয়ে বলল, "সেটা হয়তো সের্‌গে আইভানিচের বিশেষ সম্মানে।"

ঘাড় না ঘুরিয়ে বাঁকা চোখে সোবাশ্‌নিকভ-এর দিকে তাকিয়ে প্রতিবেদক জবাব দিল, "আমি ঘোড়ার মত মদ গিলেও মাতাল হই না, ঝগড়া করি না, বা কাউকে খোঁচাই না ; এর জন্য আর কত সম্মান দেখাবে? হয়তো আমার এই সব গুণের কথা এখানে সকলেই জানে, আর তাই তারা আমাকে বিশ্বাস করে।"

লিখোনিন সানন্দে বলে উঠল, "খুব ভাল কথা দাদা!" লোকটি কম কথা বলে, চাল-চলন একটু অদ্ভুত, আলসে, উদাসীন, অথচ আত্ম-বিশ্বাসে অটুট। "আপনার কগনাক-এর একটু ভাগ আমি পেতে পারি কি?"

"আনন্দের সঙ্গে", সাদরে জবাব দিয়েই প্লাতনভ হঠাৎ দুই ঠোঁটে শিশুর মত উজ্জ্বল হাসি ফুটিয়ে তার দিকে তাকাল। "আপনাকে দেখে আমারও ভাল লেগেছে। দরচেংকোতে আপনাকে দেখেই আমার মনে হয়েছিল, আপনাকে দেখতে যেমন কড়া আসলে আপনি তা নন।"

"ভাল, এবার তো প্রীতি-বিনিময় শেষ হল!" লিখোনিন হেসে উঠল। "আমার কাছে খুব আশ্চর্য লাগছে যে এর আগে এখানে আমাদের দেখা হয় নি। আন্না মার্কভ্‌নার এখানে আপনি তো মাঝে মাঝেই আসেন, তাই নয় কি?"

"হ্যাঁ, প্রায়ই আসি।"

নিউরা খোলাখুলি বলে ফেলল, "সেরগে আইভানিচ আমাদের একজন বড় অতিথ্‌। সেরগে আইভানিচ আমাদের দাদার মত।"

"তুমি একটা বোকার ডিম!" তামারা তাকে বকুনি লাগাল।

লিখোনিন তার কথাই বলতে লাগল, "সেই জন্যই আশ্চর্য লাগছে। আমিও এখানকার নিয়মিত খদ্দের। সে যাই হোক, আপনার জনপ্রিয়তা ঈর্ষার বস্তু।"

গ্লাস দিয়ে টেবিলের উপর গোল-গোল দাগ কাটতে কাটতে প্লাতনভ বলল, "আপনি কি ভাবতে পারেন, চার মাস ধরে প্রতিদিন আমি এই বাড়িতেই ভোজনটা সারি।"

"সত্যি বলছেন ?" বিস্ময়ে হাসতে হাসতে ইয়ারচেংকো বলল।

"নিশ্চয়। কি জানেন, এরা খাবারটা বেশ ভাল দেয়। খুব বেশী মশলাদার হলেও খাবারটা প্রচুর ও সুস্বাদু।"

"কিন্তু আপনি এখানে…"

"দেখুন, এই বাড়ির মালকিন আন্না মার্কভ্‌নার মেয়েকে হাই স্কুলের পরীক্ষার জন্য পড়াতেই আমি এখানে আসি। তখনই আমি ব্যবস্থা করে নেই যে আমার মাইনের কিছুটা দিয়ে আমি এখানে খাওয়াটা সেরে নেব।"

ইয়ারচেংকো বলল, "বিচিত্র খেয়াল!…আপনি কি স্বেচ্ছায় এই ব্যবস্থা করেছিলেন না কি…মাফ করবেন কথাটা একটু ব্যক্তিগত হয়ে যাচ্ছে…তবে আপনি কি সে সময় খুবই অভাবে পড়েছিলেন ?"

"মোটেই না। একটা ছাত্রদের খাবার ঘরে আমার যতটা খরচ হতে পারত আন্না মার্কভ্‌না তার তিন গুণ আমাকে দোহন করে থাকে। সে জন্য নয়, আসলে আমি চেয়েছিলাম এই ছোট আলাদা জগৎটাকে কাছে থেকে দেখতে, মানে ভাল করে জানতে, আরও ঘনিষ্ঠভাবে…"

ইয়ারচেংকোর মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। "আহা, এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি। আমাদের নতুন বন্ধুটি…নতুন বন্ধু বলে ডাকায় আপনি কিছু মনে করলেন না তো ?…আমাদের বন্ধুটি তাহলে কিছু মাল-মশলা সংগ্রহ করছেন। কয়েক বছরের মধ্যেই আমরা পড়তে পারব…"

"পতিতালয়ে ট্র্যাজিডি!" সোবাশ্‌নিকভ অভিনেতার মত উচ্চ করুণ কণ্ঠে কথাটা বলে উঠল।

প্রতিবেদক যখন ইয়ারচেংকোর কথার জবাব দিচ্ছিল তখন তামারা আস্তে উঠে টেবিলটা ঘুরে গিয়ে সোবাশ্‌নিকভ-এর কানে কানে বলল :

"সোনা বন্ধু আমার, এ ভদ্রলোককে তুমি ছেড়ে দাও। তাতে তোমারই ভাল হবে।"

ছাত্রটি রাগতভাবে তার দিকে তাকিয়ে দুই আঙুলে পিঁস-নেটা ঠিক করে নিল। "সে আবার কি ? সে কে ? তোমার প্রেমিক ? তোমার ইয়ে ?"

"দিব্যি করে বলছি, সে কখনও আমাদের কারও সঙ্গে থাকে নি। তবু তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি। ওকে চটিও না।"

সোবাশ্‌নিকভ পাল্টা জবাব দিল, "কেন বল তো! চটালে কি হবে! সমস্ত বেশ্যাপাড়াটাই ওর পক্ষ নিয়ে লড়বে! ইয়াম্স্কায়ার সব গুণ্ডা-বদমাশরাই

বুঝি ওর ঘনিষ্ঠ বন্ধু !"

তামারা তবু চুপি-চুপি বলতে লাগল, "সে কথা আমি বলি নি। আমি বলছি, সে তোমাকে কলার ধরে তুলে একটা কুকুরছানার মত জানালা দিয়ে ছুঁড়ে দিতে পারে। ও রকম লড়াই আমি দেখেছি। ঈশ্বর করুন, সে রকমটা যেন আর না ঘটে। ওটা খুবই লজ্জার কথা, আর স্বাস্থ্যের পক্ষেও খারাপ।"

কনুই তুলে ভয় দেখিয়ে সোবাশ্‌নিকভ চেঁচিয়ে বলল, "ভাগো হিঁয়া সে !"

"আমি চলেই যাচ্ছি প্রিয়তম," নরম স্বরে কথাগুলি বলে তামারা ধীরে ধীরে পা ফেলে চলে গেল।

সেই মুহূর্তে সকলেই ছাত্রটির দিকেই নজর দিয়েছিল।

লিখোনিন তার দিকে তর্জনী তুলে শাসিয়ে দিল, "ওহে কাঁটাওয়ালা ন্যাসপাতি, ভালভাবে চলতে শেখ।" তারপর প্রতিবেদকের দিকে ফিরে বলল, "ঠিক আছে, বলে যান। শুনতে খুব ভাল লাগছে।"

শান্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গে প্লাতনভ বলতে লাগল, "আমি কোন মাল-মশলা সংগ্রহ করছি না। কিন্তু প্রচণ্ড মাল-মশলা এখানে আছে; আগাগোড়া দুর্দমনীয়··· ভয়ংকর···নারী-ব্যবসা, সাদা চামড়ার দাসত্ব, বেশ্যাবৃত্তি বড় শহরের ক্ষতস্বরূপ, প্রভৃতি বড় বড় কথা নয়···না, না, সে সব তো পুরনো গল্প, সে একঘেয়ে গান শুনতে শুনতে লোকের কান পচে গেছে···আসলে যেটা ভয়ংকর সেটা হল রুটিন-বাঁধা দৈনন্দিন জীবন, দৈনন্দিন ব্যবসায়িক হিসাব-নিকাশ, ভালবাসার কাল-জীর্ণ সব প্রথা-পদ্ধতি, অনাদি কাল থেকে প্রচলিত সব ব্যবস্থা। সে সবই ভয়ংকর। এই সব জায়গা থেকে অপমান, আঘাত, লজ্জাকে ধুয়ে-মুছে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছে। শুধু পড়ে আছে একটা একঘেয়ে ব্যবসা, চুক্তি, স্বীকৃতি, অন্য আর যে কোন ব্যবসার মত একটা ব্যবসামাত্র, তার চাইতে বেশীও নয়, কমও নয়। আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না যে এদের মধ্যে কোন আতংকও নেই—শুধু একঘেয়ে কাজ, আর কিছু না।"

"ঠিক কথা," লিখোনিন তার কথায় সায় দিল। প্রতিবেদক চিন্তিতভাবে গ্লাসের উপর চোখ রেখে বলতে লাগল।

"খবরের কাগজে ও পত্রিকায় কিছু কিছু যন্ত্রণাদীর্ণ আত্মার আর্তনাদ আমরা পড়েছি। নারী-চিকিৎসকরাও এ ব্যাপারে কিছু কাজ করছেন—বরং কিছুটা বাড়াবাড়িই করছেন। কিন্তু এ সব হৈ-চৈতে তো কিছু হবে না। কথার চাইতে অনেক বেশী ভয়ংকর হয়ে দেখা দেবে—একশ' গুণ বেশী ভয়ংকর—যদি কেউ তুলির টানে জীবনের সেই দিকটা ফুটিয়ে তুলতে পারে যা আপনার মাথায় আঘাত হেনে আপনাকে অচৈতন্য করে ফেলবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, দরোয়ান সাইমিয়ন-এর কথাই ধরুন। দেখে মনে হবে এর চাইতে নীচে মানুষ নামতে পারে না,—সে একটা কুখ্যাত বাড়ির দরোয়ান, একটা জন্তু, হয় তো বা একটা খুনীও। সে বেশ্যাদের পয়সা লুট করে, তাদের চোখে কাজল পরিয়ে দেয়—

এটাই এখানকার ভাষা—তার অর্থ সে মেয়েদের ঠেঙানি দেয়। কিন্তু আপনি কি জানেন, সাইমিয়ন ও আমি পরস্পরের কাছাকাছি এলাম কেমন করে? আমরা আলোচনা করি আর্কবিশপের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত প্রার্থনা-অনুষ্ঠানের বিস্তারিত বিবরণ নিয়ে; ক্রীট দ্বীপের পাদরি সাধু অ্যাণ্ড-র বিধানাবলী নিয়ে; বাবা জন-এর গ্রন্থাবলী নিয়ে। সাইমিয়ন ধর্মাত্মা লোক—অসাধারণ ধর্মাত্মা। আমি ইচ্ছা করেই একটু উস্কে দেই, আর অমনি সাধারণ মানুষের সৎকার-অনুষ্ঠানের গান গাইতে গাইতে তার দুই চোখে জল ঝরতে থাকে। ভাবুন তো! একমাত্র কোন রুশ আত্মার মধ্যেই একসঙ্গে এই দুই বিরুদ্ধ ভাব পাশাপাশি থাকতে পারে।"

"ঠিক। এ ধরনের মানুষ প্রার্থনা করার পরেই একজনের গলা কাটতে পারে, এবং তারপরেই হাত ধুয়ে যীশুর মূর্তির সামনে মোমবাতি জ্বালাতে পারে।" রাম্‌সেস মন্তব্য করল।

"ঠিক তাই। এই যে একান্ত ভক্তি-চিত্ততা এবং অপরাধপ্রবণতার সংমিশ্রণ এর চাইতে ভয়াবহ আর কিছু আমার জানা নেই। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, যখন আমি সাইমিয়ন-এর সঙ্গে কথা বলি—ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার সঙ্গে গোপনে আলোচনা করি—তখনই আমার তীব্র ভয় জাগে, মনে হয় সন্ধ্যার অন্ধকারে একটা পচা পাতকুয়োর উপরে পাতা একটুকরো পাতলা ঝরঝরে কাঠের উপর আমি দাঁড়িয়ে আছি, আর সেই কুয়োর মধ্যে বিষধর সাপেরা কিলবিল করছে। আমি জানি, সাইমিয় যাই করুক না কেন আসলে সে ধর্মপরায়ণ; আমি বিশ্বাস করি, একদিন সে মঠে চলে যাবে। সে উপোস করবে, একটানা প্রার্থনা করবে। তার সেই সত্যিকারের ধর্মীয় আবেগ যে কেমন করে তার এই ঠক-বৃত্তি, নিষ্ঠুরতা, ঘৃণ্য কামনা বা অনুরূপ সব মনোবৃত্তির সঙ্গে খাপ খাবে তা একমাত্র শয়তানই বলতে পারে।"

চোখের ইসারায় মেয়েদের দেখিয়ে ইয়ারচেংকো বলল, "তোমার পর্যবেক্ষণের এই বিষয়বস্তুদের তুমি নিশ্চয় রেহাই দাও না।"

"তাতে কিছু যায় আসে না। সাইমিয়ন আর আমি যতখানি বন্ধু ছিলাম এখন আর ততটা নেই।"

আলোচনার শেষ কথাটা কানে যেতে ভলোদ্য়া জিজ্ঞাসা করল, "সেটা কেন হল?"

"ওঃ, দেখুন…সেটা বলবার মত কিছু নয়…" প্রশ্নটা এড়িয়ে যাবার জন্য প্রতিবেদক হেসে বলল। "তুচ্ছ ব্যাপার। আর এক গ্লাস দিন মিঃ ইয়ারচেংকো।"

কিন্তু নিউরা কোন কথা চেপে রাখতে পারে না। সে বকবক করে উঠল:

"তার কারণ সেবুগে আইভানিচ তার নাকে এক ঘুঁসি মেরেছিল…ঐ নিন্‌কার জন্য…একটা বুড়ো এসেছিল নিন্‌কার কাছে—রাতটা রয়েই গেল…

কিন্তু নিন্‌কা তখন লাল নিশান উড়িয়ে বসেছে···বুড়োটা তাকে জ্বালাতন শুরু করল···নিন্‌কা কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেল···"

মুখ বিকৃত করে প্ল্যাতনভ বলল, "থাম নিউরা···সেই এক গল্প···"

কিন্তু একবার শুরু করলে নিউরাকে থামানো অসম্ভব।

সে বলেই চলল। নিন্‌কা বলল, "কোন কিছুর জন্যই ওর কাছে আমি থাকব না। আমাকে কেটে টুকরো টুকরো করতে পার, কিন্তু আমি যাব না···মুখের লালা ছিটিয়ে আমার সারা শরীর ভিজিয়ে দিয়েছে। এ অবস্থায় বুড়োটা স্বভাবতই দরোয়ানের কাছে নালিশ করেছে আর দরোয়ানও যথারীতি নিন্‌কাকে ঠেঙিয়েছে। সেবৃগে আইভানিচ তখন আমার দেশের লোকজনদের কাছে আমার হয়ে একটা চিঠি লিখে দিচ্ছিল। নিন্‌কার চেঁচানি শুনে···"

"জোয়া, ওর মুখটা বন্ধ করে দাও," প্লাতনভ বলল।

"সে লাফিয়ে উঠে···" জোয়া তার মুখটা চেপে ধরায় নিউরার কথার স্রোত থেমে গেল।

রাম্‌সেস-এর কৌতূহল হল। "কোন্‌টি নিন্‌কা? সে এখানে আছে কি?"

"না, সে এখানে নেই। একটি ছোটখাট, নাক বোঁচা, সরল মেয়ে, কিন্তু ভারি রগ-চটা," বলতে বলতেই প্রতিবেদক হঠাৎ হো-হো করে হেসে উঠল। "মাফ করবেন, নিজের কথা ভেবেই আমি হাসছি।···সেই বুড়ো তখন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে জামা-জুতো হাতে নিয়ে যে ভাবে করিডর দিয়ে ছুটে গিয়েছিল সেই ছবিটা হঠাৎ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে মনে পড়ে গেল। এমন একজন শ্রদ্ধেয় বৃদ্ধ মানুষ, ধর্ম-প্রচারকের মত মুখখানি। কোথায় কাজ করে তাও জানি। আপনারা সকলেই তাকে চেনেন। সব চাইতে মজার ব্যাপার হল বসবার ঘরে পৌঁছে তবে সে নিরাপদ বোধ করল। সে কী দৃশ্য—বুড়ো লোকটি চেয়ারে বসে প্যান্ট পরবার চেষ্টা করছে, কিছুতেই পা গলাতে পারছে না, আর বাড়ি ফাটিয়ে চিৎকার করছে। 'অত্যাচার! মহা অনাচার!···আমি দেখে নেব···কালই—চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই।' বুঝতেই পারছেন, সকরুণ অসহায়তা আর ভয় দেখিয়ে এই চেঁচামেচির সংমিশ্রণ এতই হাস্যকর লাগল যে গম্ভীর সাইমিয়নও হাসতে লাগল। সে যাই হোক, সাইমিয়ন-এর কথা বলছিলাম। আগেই বলেছি, জীবনের এই বিচিত্র সামঞ্জস্যহীনতা দেখে আমি বিস্মিত, বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলাম। হাজার হাজার বড় বড় কথা দিয়ে নানা বিচিত্র চরিত্রের মানুষের বর্ণনা দেওয়া যায়, কিন্তু সাইমিয়ন-এর মত একটা লোককে কল্পনাও করা যায় না। জীবন এতই বিচিত্র ও বহুরূপী। এই পতিতালয়ের মালকিন আন্না মার্কভ্‌নার কথাই ধরুন না। রক্তলোভী হায়েনার মত এই ব্যাপিকা নারীই আবার পরম স্নেহময়ী জননী। তার একটি মেয়ে আছে—বার্থা, হাই স্কুলে পড়ে। কত চেষ্টায়, কত সতর্কতার সঙ্গে, সব দিক বাঁচিয়ে সে যে তার ব্যবসার স্বরূপটা মেয়ের কাছ থেকে ঢেকে রাখে তা যদি দেখতেন!

সব কিছুই বার্থার জন্য, যা কিছু করা হয় সবই তার জন্য। পাছে নিজের আজে-বাজে কথাবার্তার জন্য ধরা পড়ে যায় এই ভয়ে আন্না মার্কভ্‌না মেয়ের সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলতে পর্যন্ত ভরসা করে না। বার্থা কখন কি চায় সে আগে থেকেই বুঝতে পারে; পুরনো দাসীর মত, বিশ্বস্ত বুড়ি নার্সের মত, অনেক দিনের পোষা কুকুরের মত সব কিছু তাকে এনে দেয়। অনেক আগেই তার অবসর নেওয়া উচিত ছিল। টাকা আছে, আর কাজটাও কঠোর ও শক্ত। তার বয়সও হয়েছে। কিন্তু সে অবসর নিতে পারছে না, কারণ বার্থার জন্য এক হাজার রুবল বেশী দরকার, তারপর আর এক হাজার, আরও এক হাজার। সবই বার্থার জন্য। বার্থার একটা ঘোড়া আছে, ইংরেজ শিক্ষয়িত্রী আছে, প্রতি বছর সে বাইরে বেড়াতে যায়। চল্লিশ হাজার রুবল দামের হীরে-মুক্তো বার্থার আছে—সেগুলো যে কার হীরে তা শয়তানই জানে! কিন্তু একটা কথা আমি নিশ্চিতভাবেই জানি যে, বার্থার সুখের জন্য—না, কথাটা ঠিক মত বলা হল না—বরং বলা যাক, বার্থার কড়ে আঙুলে যদি আঙুল-হারা হয় তাহলে সেটাকে তুলবার জন্য দরকার হলে আন্না মার্কভ্‌না আমাদের সব বোন ও মেয়েকে গণিকাবৃত্তির জন্য বেঁচে দিতে, আমাদের ও আমাদের ছেলেদের রক্তে সিফিলিসের বীজাণু ঢুকিয়ে দিতেও রাজী হবে, তাতে তার চোখের পাতা এতটুকু কাঁপবে না। কী? আপনি বলছেন সে রাক্ষুসী? হয় তো তাই, কিন্তু আমি বলছি, যে তর্কাতীত, অন্ধ, স্বার্থপর অথচ মহৎ হৃদয়-বৃত্তি দিয়ে আমাদের মায়েরা আমাদের ভালবাসে, যার জন্য তাদের আমরা "সাধ্বী নারী" বলে থাকি, সেই একই হৃদয়-বৃত্তি তাকেও পরিচালিত করে।"

দাঁতের ফাঁক দিয়ে সোবাশ্‌নিকভ বলে উঠল, "চালিয়ে যান, জোরসে চালিয়ে যান।"

"আমি দুঃখিত। তুলনাটা করতে আমি চাই না। আমি শুধু হৃদয়-বৃত্তির গোড়াকার কথাটাই বলতে চেয়েছি। প্রাণী-জগতের নিঃস্বার্থ মাতৃ-স্নেহের দৃষ্টান্তও আমি দিতে পারতাম। কিন্তু আর নয়, এ কথা থাক।"

লিখোনিন বলল, "না, বাকিটাও শুনতে চাই। মনে হচ্ছে, এ সব বিষয়ে আপনার বেশ পুরো ধারণা আছে।"

"অতি সাধারণ ধারণা। একটু আগেই অধ্যাপক জানতে চেয়েছিলেন, বই লিখবার অভিপ্রায় নিয়ে এখানে আমি জীবনকে দেখে বেড়াচ্ছি কি না। আমি বলতে চাই, আমি সব কিছু দেখতেই পারি, পর্যবেক্ষণ করতে পারি না। দৃষ্টান্ত হিসাবে আমি সাইমিয়ন ও মাল্‌কিনের উল্লেখ করেছি। কেন করেছি তা জানি না, তবে এটা বুঝি যে, একটি ভয়ংকর দুর্জয় জীবন-সত্য তাদের মধ্যে লুকিয়ে আছে। অথচ সেটাকে কি করে বোঝাব, কি করে দেখাব তা আমি জানি না। সে-সত্যকে আমার নিজের মধ্যে আমি খুঁজে পাই নি। একটি তুচ্ছ ঘটনা, চরিত্রের একটি সাধারণ করুণ বৈশিষ্ট্যকে যদি এমনভাবে ব্যাখ্যা

করতে হয় যাতে তার অন্তরালবর্তী ভয়ংকর ও ভীতিপ্রদ সত্যটি উদঘাটিত হয়ে পড়ে, তাহলে তার জন্য আরও অধিকতর ক্ষমতা থাকা চাই।”

প্লাতনভ এতক্ষণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও ধীরে ধীরে কথা বলছিল। এবার সে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল :

“এই যে সব মেয়েদের নিয়ে আপনারা শোবার ঘরে ঢোকেন, তাদের দিকে তাকান। মন দিয়ে তাদের দেখুন। দেখুন, তারা তো সব শিশু, দেখলে মনে হবে তাদের বয়স এগারো বছর। ভাগ্য তাদের গণিকাবৃত্তির পথে ঠেলে দিয়েছে। সেই থেকে তারা একটা অদ্ভুত, অবাস্তব জীবনের মধ্যে যেন একটা পুতুল-ঘরে বাস করছে। তারা কোনদিন বড় হয় না, অভিজ্ঞতা তাদের সমৃদ্ধ করে না, তারা ছেলেমানুষই থেকে যায়, আধ ঘণ্টা পরে তারা কি করবে বা বলবে তাও জানে না। অত্যন্ত ঘৃণিত, জরাজীর্ণ, ন্যুব্জদেহ বুড়ি বেশ্যাদের মধ্যেও এই উজ্জ্বল কৌতুককর ছেলেমানুষের ছবি আমি দেখেছি। কিন্তু নির্যাতিত মানুষের প্রতি অকারণ সহানুভূতি, অসহায় সমবেদনা তাদের মন থেকে কখনও মুছে যায় না···দৃষ্টান্তস্বরূপ···”

প্লাতনভ ধীরে ধীরে চারদিকে তাকাল। তারপর হাত নেড়ে ক্লান্ত কণ্ঠে বলে উঠল, “এ সব কথার মাথায় বাড়ি···আজ একদিনে এত কথা বলেছি যে তাতে আমার দশ বছর চলে যাবে···আর তাতে কোন ফায়দাই হল না।”

ইয়ারচেংকো বলল, “কিন্তু দেখুন সেরগে আইভানিচ, আপনি এ নিয়ে লেখেন না কেন ? এ সমস্যার প্রতি তো আপনার ভীষণ আগ্রহ।”

মুখ বেঁকিয়ে প্লাতনভ বলল, “চেষ্টা করে দেখেছি ! কিন্তু কিছুই হয় নি। বিবরণগুলিকে মনে হয়েছে অকিঞ্চিৎকর, কথাগুলিতেও কোন উত্তাপ নেই। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, একদিন, এখন নয় বা খুব শিগগিরও নয়, হয়তো পঞ্চাশ বছর পরে, কোন প্রতিভাধর লেখকের আবির্ভাব হবে। এই জীবনের যন্ত্রণা ও পাপিষ্ঠতাকে সে বুঝবে, তার সঙ্গে একাত্ম হবে, এবং সরল, সূক্ষ্ম চিত্র-কল্পের সাহায্যে সব কিছু আমাদের বুঝিয়ে বলবে। আর তখন আমরা বলব, ‘সে কি, এসবই তো আমরা দেখেছি, জেনেছি, শুধু ভাবতে পারি নি যে এটা এত ভয়ংকর।’, সমস্ত অন্তর দিয়ে এমন একজন শিল্পীর আবির্ভাবে আমি বিশ্বাস করি।”

“আমেন,” লিখোনিন গম্ভীরভাবে বলল, “আসুন, তার উদ্দেশে আমরা পান করি।”

“ভ্যালা কথা,” ছোট মাংকা হঠাৎ বলে উঠল, “আমাদের মত হতচ্ছারী বেশ্যাদের জীবনের সব কথা নাকি কেউ আবার লিখতে পারে !”

দরজায় একটা টোকা পড়ল। কমলা-রঙের পোশাকে ঝলমল করতে করতে জেনি ঘরে ঢুকল।

১০

ঐ-বাড়িতে তার মর্যাদার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন বলেই সে সহজ আত্ম-প্রত্যয়ের সঙ্গে সকলকে অভ্যর্থনা জানাল এবং তারপরে সোজা আইভানিচ-এর পিছনে বসে পড়ল। দাতব্য বিভাগের সেই ইউনিফর্মধারী জার্মানটির সঙ্গেই সে ছিল যে একটু আগে ছোট মাংকাকে পছন্দ করে তারপরে বাড়িউলির পরামর্শে তার বদলে পাশাকে নিয়েছিল। কিন্তু জেনির উত্তেজক ও আত্ম-প্রত্যয়িত রূপ দেখে তার কামুক মন হয়তো ভয় পেয়ে গিয়েছিল। তাই প্রায় ঘণ্টা তিনেক বিভিন্ন বীয়ারের দোকানে ও রেস্তরাঁতে ঘুরে ঘুরে সাহস সঞ্চয় করে তারপর আন্না মার্কভনার বাড়িতে ফিরে এসেছিল। জেনির স্থায়ী খদ্দের (চশমার দোকানের কার্ল কার্লোভিচ) চলে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে তারপর তাকে নিয়ে ঘরে ঢুকেছিল।

তামারার চোখে একটা নিঃশব্দ প্রশ্ন ঝিলিক দিয়ে ওঠায় জেনি বিরক্তির সঙ্গে মুখ খিঁচিয়ে মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বলল :

"সে চলে গেছে···বাস।"

প্লাতনভ এক দৃষ্টিতে জেনির দিকে তাকিয়েছিল। জেনিকে সে অন্য মেয়ের তুলনায় আলাদা চোখে দেখত ; কঠিন, উদ্ধত, অনবনত চরিত্রের জন্য তার সম্পর্কে প্রতিবেদকের একা উঁচু ধারণা ছিল। মাঝে মাঝে তার দিকে তাকিয়ে জেনির জ্বলন্ত, সুন্দর চোখ, গালের উজ্জ্বল লাল দাগ ও দাঁতে কামড়ানো শুকনো ঠোঁট দেখে সে অনুমান করে নিয়েছিল যে একটা দীর্ঘ-সঞ্চিত তীব্র, তিক্ত বিদ্রোহ তার বুকের মধ্যে জ্বলছে, তার শ্বাসরোধ করে দিচ্ছে। তার মনে হল (পরবর্তীকালেও অনেকবার কথাটা তার মনে হয়েছে), জেনিকে এর আগে আর কখনও সে এত সুন্দর দেখে নি। সে লক্ষ্য করল, একমাত্র লিখোনিন ছাড়া আর সকলেই তীব্র আগ্রহের সঙ্গে তাকে দেখছে, কেউ প্রকাশ্যে, কেউ বা লুকিয়ে। এই নারীর সৌন্দর্য এবং তার সহজপ্রাপ্যতার চিন্তা সকলের কামনাকেই জাগিয়ে তুলেছে।

নীচু স্বরে প্লাতনভ বলল, "তোমার যেন কিসের অসুবিধা হচ্ছে জেনি।"

জেনি পরম আদরে আইভানিচ-এর হাতে আঙুল বুলোতে লাগল।

"ও নিয়ে ভাববেন না। ওটা মেয়েদের ব্যাপার। আপনার শুনতে ভাল লাগবে না।"

পরমুহূর্তে তামারার দিকে তাকিয়ে সে তীব্র আবেগের সঙ্গে অত্যন্ত দ্রুত হিব্রু, রোমর্ক ও রুমানীয় ভাষার একটা জগা-খিঁচুড়ির সঙ্গে এই কালো জগতের কিছু বকুনি মিশিয়ে পতিতালয়ের প্রচলিত ভাষায় কথা বলতে শুরু করল।

চোখের ইসারায় প্রতিবেদককে দেখিয়ে তামারা তাকে বাধা দিল।

সত্যি জেনির কথাগুলি প্লাতনভ বুঝতে পারছিল। তীব্র ক্ষোভের সঙ্গে সে

পাশার কথাই বলছিল। সেদিন রাতে সস্তা খদ্দেরদের ভিড় জমে গিয়েছিল, আর তাই ভিন্ন ভিন্ন লোক নিয়ে দশ বারেরও বেশী পাশাকে ঘরে ঢুকতে হয়েছিল। কয়েক মিনিট আগে সে বিকারগ্রস্ত হয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়েছিল। তাকে চাঙ্গা করে তুলবার জন্য কয়েক ফোঁটা বলদায়ক আরক খাইয়ে দেবার পরে সবে সে একটু সুস্থ হয়েছে অমনি এম্মা এডোয়ার্ডভ্না আবার তাকে বসবার ঘরে পাঠিয়েছে। জেনি তাতে আপত্তি করায় তাকে বকাবকি করেছে এবং শাস্তির ভয় দেখিয়েছে।

ভালভাবে বুঝতে না পেরে ইয়ারচেংকো জিজ্ঞাসা করল, "সে কি বলছে?"

কাঁপা গলায় জেনি জবাব দিল, "ও নিয়ে মাথা ঘামাবেন না···ও কিছু না ···আমাদের ভিতরকার ব্যাপার···সেরগে আইভানিচ, আপনার মদ একটু পেতে পারি কি?"

নিজেই আধ গ্লাস কগনাক ঢেলে নিয়ে সবটা সে গিলে ফেলল; তার সরু নাকের ফুঁটো দুটি ফুলতে লাগল।

প্লাতনভ শান্তভাবে উঠে দরজার দিকে গেল।

"এ নিয়ে বিচলিত হবেন না সেরগে আইভানিচ···যেতে দিন," জেনি তাকে থামাতে চেষ্টা করল।

প্রতিবেদক পাল্টা জবাব দিল, "কেন বিচলিত হব না? যেমন করে হোক পাশাকে এখানে নিয়ে আসব; দরকার হলে···যা টাকা লাগে দেব। সে এখানে এসে কোচে শুয়ে বিশ্রাম নিক।···নিউরা, যাও তো দৌড়ে একটা বালিশ নিয়ে এস।"

তার ধূসর স্যুট-পরা চওড়া দেহটার পিছনে দরজাটা বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গেই বরিস সোবাশ্নিকভ তীব্র ঘৃণার সঙ্গে কথা বলে উঠল।

"এ লোকটার সঙ্গে আমরা ভিড়ে গিয়েছি কেন? এই সব আজে-বাজে লোককে নিয়ে আমাদের এত মাথাব্যথা কেন? শয়তানই জানে সে কি। সে তো পুলিশও হতে পারে। কে তার জামিন হবে? এ সবই তোমার কাজ লিখোনিন।···"

লিখোনিন ভালমানুষের মতই বলল, "পুলিশকেই বা আমাদের ভয় কিসের বরিয়া?"

রাম্সেস বলল, "আমি তাকে সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছি। আমি জানি, সে খুব ভাল লোক, একজন ভাল সঙ্গী।"

"হুম! বাজে কথা! অন্যের ঘাড় ভেঙে মদ টানতে পারলে সকলেই ভাল সঙ্গী হতে পারে! তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ না, সে এখানকার নিয়মিত খদ্দের! খুব সম্ভব সে একটা দালাল; তার উস্কানিতে খদ্দেররা যত মদ আর খাবারের অর্ডার দেয় সে তার একটা শতকরা কমিশন পেয়ে থাকে।··"

ইয়ারচেংকো তিরস্কারের সুরে বলল, "বাজে কথা বলো না বরিয়া।"

কিন্তু বরিয়া থামল না। তার দুর্ভাগ্য, মদ খেলে তার মাথা বে-চাল হয় না, পা টলে না, কথা কাঁপে না ; বরং সে বিষণ্ণ, স্পর্শকাতর ও ঝগড়াটে হয়ে ওঠে।

"আর আমাদের সঙ্গে কথা বলার কী ভঙ্গি!" সোবাশ্‌নিকভ বকেই চলল। "কী আত্ম-বিশ্বাস! কী কৃপা-প্রদর্শন! অধ্যাপক যেন ছাত্রদের পড়াচ্ছেন! ব্যাটা হাড়-কঞ্জুস!"

জেনি একদৃষ্টিতে সব কিছু দেখছিল। হঠাৎ সে হাততালি দিয়ে উঠল।

"ঠিক হয়েছে! সাবাস ছাত্রবাবু! সাবাস, সাবাস, সাবাস! বলে যান! আচ্ছা করে লাগান! সত্যি, এটা অসম্মানকর। উনি ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। আমিই বলব, মুখের উপর বলে দেব!"

"যাও, চ-চলে যাও! ব-বল যা তো-মার ই-ইচ্ছা!" চাপা দাঁতের ফাঁক দিয়ে পাকা অভিনেতার মত সোবাশ্‌নিকভ কথাগুলি বলল।

জেনি আনন্দের সঙ্গে বলে উঠল, "এই তো চাই! সাবাস! প্যাঁচা চিনি উড়াল দেখে, আর ভালমানুষকে চিনি তার বাত্‌ শুনে!"

সাদা মাংকা ও তামারা সবিস্ময়ে জেনির দিকে তাকিয়েছিল; কিন্তু তার চোখে দুষ্টুমির ঝিলিক ও স্ফুরিত নাসারন্ধ্র দেখে তার কৌশলটা বুঝতে পেরে হাসতে লাগল।

সাদা মাংকা হাসতে হাসতে মাথা নাড়তে লাগল। জেনির উস্কে দেওয়া ঝগড়া যখনই বেশ পেকে ওঠে তখনই তার মুখে ওই ধরনের ভাব ফুটে ওঠে।

লিখোনিন বলল, "অত মেজাজ দেখিও না বরিংকা, এখানে আমরা সকলেই সমান।"

নিউরা বালিশ এনে কোচের উপর রাখল।

সোবাশ্‌নিকভ তার দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "ওটা দিয়ে কি হবে? এখুনি ওটা নিয়ে যাও। এটা কোন বাজে জায়গা নয়।"

তামারার পিঠের নীচে বালিশটা বসিয়ে দিয়ে জেনি মিষ্টি করে বলল, "এস নাগর। ওর কথা এখন থাক। একটু দাঁড়াও গো, আমি তোমার পাশে বসছি।"

টেবিলটা ঘুরে গিয়ে সে জোর করে বরিসকে বসিয়ে দিয়ে তার কোলের উপর বসে পড়ল। দুই হাতে তার গলাটা জড়িয়ে ধরে তার ঠোঁটে এত বেশীক্ষণ ধরে এমন জোরে চুমো খেতে লাগল যে তার দম বন্ধ হবার উপক্রম হল। তার চোখের খুব কাছে একটি স্ত্রীলোকের বড় বড়, কালো, জলন্ত, আবছা, নিশ্চল দুটি চোখ সে দেখতে পেল। একটি সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের জন্য তার মনে হল, এই দুটি নিষ্প্রাণ চোখে যেন তীব্র ঘৃণার আগুন জলছে। অনেক কষ্টে নিজেকে জেনির বাহু-বন্ধন থেকে মুক্ত করে তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে হাসতে হাসতে আরক্ত মুখে ঘন ঘন শ্বাস ফেলতে ফেলতে সে বলে উঠল: "মনে হচ্ছে তোমাকে ওরা জেংকা বলে ডাকে। তুমি একটি কথার পুটুলি।"

পাশাকে নিয়ে প্লাতনভ ফিরে এল। পাশাকে দেখলে যুগপৎ করুণা ও বিরক্তি বোধ না করে পারা যায় না। তার বিবর্ণ মুখে কালসিটে দাগ ফুটে উঠেছে; আধ-বোজা চোখে কেমন একটা আচ্ছন্ন অর্থহীন হাসি; তার ঠোঁট দুটি ফুলে ভেজা লাল কম্বলের মত দেখাচ্ছে; ভীত স্খলিত পায়ে সে হেঁটে এল; মনে হল সে একবার বড় করে ও একবার ছোট করে পা ফেলছে। নির্দেশ মত সে কোচের কাছে গেল এবং বালিশে মাথাটা রেখে শুয়ে পড়ে অস্পষ্ট উন্মাদের হাসি হাসতে লাগল। দূর থেকেই বোঝা যাচ্ছিল যে তার শরীরটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

"তোমরা কিছু মনে করো না, আমি কোটটা খুলে ফেলছি," এই কথা বলে লিখোনিন পাশার কাঁধের চারদিকে সেটাকে জড়িয়ে দিল। "তামারা, ওকে খানিকটা চকোলেট ও মদ খেতে দাও।"

বরিস সোবাশ্‌নিকভ আবার একটা পোজ নিল; ঘরের কোণে হেলান দিয়ে পা দুটোকে আড়াআড়ি রেখে মাথা উঁচু করে দাঁড়াল। হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে সরাসরি প্লাতনভকে লক্ষ্য করে বলে উঠল, "হেই···শুনুন···আপনার নাম কি···ও আপনার মেয়েমানুষ, তাই না?" জুতোর ডগা দিয়ে সে পাশাকে দেখিয়ে দিল।

"কী-ই-ই?" ভুরু কুঁচকে প্লাতনভ টেনে টেনে বলল।

"আর না হয়তো আপনি ওর প্রেমিক···একই কথা···এ রকম অবস্থাকে এখানে কি বলে—আপনি জানেন, যে পুরুষদের জন্য মেয়েরা শার্টে সুঁচের কাজ করে দেয়, যাদের নিজেদের উপার্জনের ভাগ দেয়—অ্যাঁ?"

ভুরু দুটোকে আরও কাছে এনে এক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে প্লাতনভ ধীরে ধীরে প্রতিটি শব্দের উপর জোর দিয়ে বলতে লাগল:

"আজ রাতেই যে প্রথম আপনি আমার সঙ্গে একটা ঝগড়া পাকিয়ে তুলতে চাইছেন তা নয়। যাই হোক, আপনাকে স্বাভাবিক দেখালেও আমি জানি যে আপনি মাতাল। সেটাই প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা, আপনার সঙ্গীদের জন্যই আপনাকে ছেড়ে দিতে চাই। কিন্তু আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি, আর কখনও আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলবার আগে চোখের চশমা খুলে ফেলবেন।"

কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে বরিস চেঁচিয়ে বলল, "রাবিশ! চশমা খুলব কেন?"

প্রতিবেদক নির্বিকারভাবে বলল, "কারণ আমি যখন আঘাত করব তখন ভাঙা কাঁচ লেগে আপনার চোখের ক্ষতি হতে পারে।"

"সে যখন হবে তখন দেখা যাবে! আঘাতের বদলে পাল্টা আঘাত করতে আমিও জানি, আর সেটা আপনার ভাল লাগবে না।" সোবাশ্‌নিকভ একটা বখাটে ছোট ছেলের মত চেঁচাতে লাগল। "তবে হাত ময়লা করে যে কোন—" আরও একটা অপমানসূচক শব্দ যোগ করতে গিয়েও সাহসে কুলোল

না—"যে কোন—। যাকগে, দেখ কমরেডরা, আমি আর এখানে থাকতে চাই না। এই সব লোকের সঙ্গে দহরম-মহরম করার মত শিক্ষা-সহবৎ আমার নয়।"

উদ্ধত ভঙ্গীতে সে দ্রুত পায়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

প্লাতনভ-এর একেবারে পাশ দিয়েই তাকে যেতে হল। মার্জারসুলভ একাগ্রতায় প্লাতনভ চোখ কুঁচকে তার সব গতিবিধিই লক্ষ্য করছিল। মুহূর্তের জন্য ছাত্রটির মনে হল, পাশ থেকে হঠাৎ প্রতিবেদককে একঘা মেরে লাফ দিয়ে সরে পড়বে। তাছাড়া, সে জানত সঙ্গী-সাথীরা তাদের ছাড়িয়ে দেবে, লড়াই করতে দেবে না। কিন্তু প্লাতনভ-এর দিকে না তাকিয়েও মনে মনে সে বুঝতে পারল, ঐ যে চওড়া হাত দুটি টেবিলের উপর শান্ত হয়ে পড়ে আছে, ঐ যে চওড়া কপালের উপর শক্ত মাথাটা, ঐ যে সদাসতর্ক শক্তিশালী দেহটা আরাম করে চেয়ারে বসে আছে। ওগুলো যে কোন মুহূর্তে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে একটা মোক্ষম আঘাত হানতে সর্বদাই প্রস্তুত হয়ে থাকে। দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে দিয়ে সোবাশ্‌নিকভ করিডর ধরে হাঁটতে লাগল।

"বাঁচা গেল," জেনি ঠাট্টার স্বরে বলে উঠল। "তামারচ্‌কা, দয়া করে একটু কগনাক ঢেলে দাও।"

ঢ্যাঙা ছাত্র পেত্রভ্‌স্কি আসন থেকে উঠে সোবাশ্‌নিকভ-এর পক্ষ সমর্থন করে কথা বলতে লাগল।

"বন্ধুগণ, এটা আপনাদের ব্যাপার, আপনাদের ব্যক্তিগত মতামতের ব্যাপার, কিন্তু নীতিগতভাবে আমিও বরিস-এর সঙ্গে চলে যাচ্ছি। তার ভুল হতে পারে। আমরা তাকে সে জন্য আড়ালে শাসন করব, কিন্তু আমাদের একজন কমরেডকে যখন অপরিচিত লোকদের সামনে অপমান করা হয়েছে তখন আমি এখানে থাকতে পারি না। আমি চললাম।"

অস্বস্তিকরভাবে মাথা চুলকোতে চুলকোতে লিখোনিন বলে উঠল, "হায় ভগবান, আজ সারাটা সন্ধ্যাই বরিস ইতর ও বোকার মত ব্যবহার করেছে। আমাদের সকলেরই সম্মান তাতে ক্ষুণ্ণ হয়েছে! তুমি কি সম্পাদকীয় আপিস থেকে, রাজনৈতিক সভা থেকে এবং পতিতালয় থেকে 'ওয়াক-আউট'-এর মহড়া দিচ্ছ? আমরা তো সামরিক অফিসার নই যে আমাদের প্রতিটি কমরেড-এর বোকামিকে ঢেকে চলতে হবে?"

"সে যাই হোক, সংহতি রক্ষার জন্যই আমি চলে যাচ্ছি," গুরুত্বের সঙ্গে এই কথা বলে পেত্রভ্‌স্কি চলে গেল।

"তুমি শান্তিতে মর গে,", জেনি বিদায়-বাসনা জানাল।

মানুষের মনের আচরণ অন্ধকার ও জটিল। উভয়েই আন্তরিকভাবে তাদের ক্ষোভকে প্রকাশ করেছে। তথাপি আসলে সোবাশ্‌নিকভ আধা আন্তরিক, আর পেত্রভ্‌স্কি তারও কম। মাতাল ও ক্রুদ্ধ হলেও সোবাশ্‌নিকভ মনে মনে

ভাবছিল যে একা হলেই জেনিকে ডেকে নিয়ে একটা ঘরে যাওয়া অনেক সহজ হবে। আর পেত্রভ্স্কি যখন তাকে অনুসরণ করল তখন সেও সেই মেয়েটির কথা ভেবেই বন্ধুর কাছ থেকে তিন রুবল ধার করতে চেয়েছিল। বসবার ঘরে গিয়ে তারা নিজেদের মধ্যে একটা মিটমাট করে নিল, আর তার দশ মিনিট পরেই বাড়িউলি জোসিয়া তার ট্যারা চোখের ধূর্ত মুখটা বের করে প্রাইভেট রুমের খোলা দরজা দিয়ে উঁকি মারল।

বলল, "জেনেচ্কা, তোমার জামা-কাপড় এসেছে, এসে গুণে নাও। আর তুমি নিউরা, কিছুটা শ্যাম্পেনের জন্য অভিনেতাটি তোমার সঙ্গে একটু দেখা করতে চেয়েছে। সে হেনরিয়েটা ও বড় মানিয়ার কাছে আছে।"

প্লাতনভ ও সোবাশ্নিকভ-এর এই ক্ষণস্থায়ী অর্থহীন ঝগড়া নিয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা হল। এ সব ক্ষেত্রে যে রকম হয়ে থাকে, প্রতিবেদকটি লজ্জিত, দুঃখিত ও বিবেকতাড়িত বোধ করতে লাগল। সকলে তার পক্ষ সমর্থন করলেও সে বলল, "ঈশ্বরের দিব্যি, মনে হচ্ছে আমার চলে যাওয়াই ভাল। আপনাদের বন্ধুত্বের ছোট গণ্ডীতে ভাঙন ধরিয়ে কি হবে। আমাদের দু'জনেরই দোষ। বিল নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। পাশাকে আনতে গিয়ে সেটা আমি সাইমিয়নকে দিয়ে দিয়েছি।"

হঠাৎ লিখোনিন উঠে দাঁড়াল।

"চুলোয় যাক সব, তাকে এখানেই টেনে নিয়ে আসছি। তোমরা তো জান বরিস ও ভাস্কা দু'জনই ভাল মানুষ। কিন্তু তারা এখনও ছেলেমানুষ, তাই কুকুরের বাচ্চার মত নিজেদের লেজ দেখেই ভৌ-ভৌ করে। তাদের দু'জনকেই নিয়ে আসছি। আমি কথা দিচ্ছি, বরিস ক্ষমা চেয়ে নেবে।"

বেরিয়ে গিয়ে কয়েক মিনিট পরেই সে ফিরে এল।

অসহায়ভাবে হাত ছুঁড়তে ছুঁড়তে গোমরা মুখে সে বলল, তারা বিশ্রাম করছে। দু'জনই।"

১১

ঠিক সেই মুহূর্তে একটা ট্রে হাতে নিয়ে সাইমন ঢুকল। ট্রে-র উপর সোনালি মদপূর্ণ দুটো পান-পাত্র আর একখানি বড় ভিজিটিং-কার্ড।

চারদিক তাকিয়ে সে বলল, "জিজ্ঞাসা করতে পারি কি, আমাদের মধ্যে মিষ্টার গাভ্রিলা পেত্রভিচ ইয়ারচেংকো কে?"

"আমি," ইয়ারচেংকো জবাব দিল।

"তাহলে দয়া করে গ্রহণ করুন, অভিনেতা ভদ্রমহোদয় এটি পাঠিয়েছেন।"

জমিদারি-মুকুট-শোভিত ভিজিটিং কার্ডটা তুলে নিয়ে ইয়ারচেংকো পড়ল:

এভমেনি পোলুকতভিচ

এগমন্ত—লাভ্রেত্স্কি

মেট্রোপলিটান থিয়েটারের নাট্যশিল্পী।

ভলদ্য়া পাভলভ বলল, "অসাধারণ; তবে সব রাশিয়ান অভিনেতাদেরই এই রকম অদ্ভুত নাম থাকে।"

"আর তাছাড়া তাদের মধ্যে যারা বিখ্যাত তারা হয় বক-বক করে বা আধো-আধো কথা বলে, অথবা তোত্‌লায়," প্রতিবেদক যোগ করল।

ইয়ারচেংকো বলল, "সে সবই সত্যি, কিন্তু তার চাইতেও অসাধারণ ব্যাপার হল, মেট্রোপলিটান থিয়েটারের এই শিল্পীটির সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য তো আমার হয় নি। দাঁড়ান···কার্ডটার উল্টোদিকে কি যেন লেখা আছে। হাতের লেখা দেখে মনে হচ্ছে, যিনি কলম চালিয়েছেন তিনি হয় মাতাল, আর নয়তো গো-মূর্খ।" সে পড়তে লাগল: 'রুশ বিজ্ঞানের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক গাব্রিলা পেত্রভিচ ইয়ারচেংকোর স্বাস্থ্য পান করছি। করিডর দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎই আজ তাকে দেখতে পেয়েছি। আপনার সঙ্গে গ্লাস ঠোকাঠুকি করি, সেটাই আমার বাসনা। আমার কথা যদি মনে না থাকে তাহলে পিপলস্ থিয়েটার, নাটক 'দারিদ্র্য লজ্জার নয়' এবং একজন আফ্রিকাবাসীর ভূমিকাভিনেতা সাধারণ শিল্পীটির কথা স্মরণ করুন।'

ইয়ারচেংকো, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক কথা। এক সময়ে পিপলস্ থিয়েটারে একটা 'বেনিফিট-নাইটে'র সংগঠনের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছিলাম। একটি পরিষ্কার-কামানো উদ্ধত মুখ আবছা মনে পড়ছে, কিন্তু···এখন আমরা কি করব বন্ধুগণ?"

লিখোনিন অমায়িকভাবে জবাব দিল:

"কেন, তাকে এখানে টেনে নিয়ে এস। লোকটি মজাদার হতে পারে।"

"আপনি কি বলেন?" সহকারী অধ্যাপক পাতনভ-এর দিকে মুখ ফেরাল।

"আপত্তি নেই। আমি তাকে সামান্য চিনি। লোকটি সত্যি মজাদার।"

কাতিয়ার ঘাড়ের পিছন থেকে ভলদ্য়া পাভলভ বলল, "সে আসুক।" কাতিয়া তার কোলের উপর বসে পা দোলাচ্ছিল।

"আর তুমি ভেল্‌ত্‌মান?"

"কি?" ছাত্রটি যেন হঠাৎ জেগে উঠল। সঙ্গীদের দিকে পিছন ফিরে পাশার উপর ঝুঁকে সে তার পাশে কোচে বসেছিল। বেশ কিছুক্ষণ হল বন্ধুত্ব ও সহানুভূতির ভাব দেখিয়ে সে পাশাকে আস্তে আস্তে চাপড়ে দিচ্ছিল, কখনও ঘাড়ে, কখনও গলার ঠিক উপরে চুলের উপর, আর মেয়েটিও চোখের পাতা কাঁপিয়ে কিছুটা লজ্জা, কিছুটা লজ্জাহীনভাবে বাসনাময় হাসি হাসতে শুরু করেছিল। "কি? ব্যাপার কি? ওহো, আমরা কি চাই যে অভিনেতাটি এখানে আসুক? আমার কোন আপত্তি নেই। এগিয়ে যান।"

সাইমিয়নকে দিয়েই ইয়ারচেংকো তাকে ডেকে পাঠাল, আর অভিনেতাটি এসেই তার স্বভাবসিদ্ধ অভিনয় শুরু করে দিল। বুকের উপর চকচকে রেশমের পট্টি লাগানো লম্বা ফ্রক-কোট পরে, বাঁ হাতে চকচকে অপেরা-হ্যাটটাকে বুকের

উপর ধরে সে দরজায় এসে দাঁড়াল, ঠিক যেন সমাজের কোন বয়স্ক সিংহ-পুরুষ বা ব্যাংকের ডিরেক্টরের প্রতিমূর্তি।

মাথাটাকে এক পাশে কাত করে অর্ধেকটা নুইয়ে সে বলে উঠল, "ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে প্রবেশের অনুমতি কি পেতে পারি?"

সকলে সম্মতি জানালে সে আত্ম-পরিচয় ঘোষণা করল। কর-মর্দনের সময় সে কনুইটা বের করে এতটা উঁচুতে তুলে ধরল যে তার হাতটা নীচে ঝুলে পড়ল। মেয়ে দুটিও তার সঙ্গে এসেছে—একটি হেনরিয়েটা, বয়সে আন্না মার্কভনার পতিতালয়ের সব চাইতে বড় মেয়ে হলেও এখনও সে বেশ সুন্দরী; সে সব কিছু জেনেছে, সব কিছু দেখেছে, সব কিছু সইতে শিখেছে; অপরটি বড় মাংকা বা কুমীর মাংকা। আগের রাত থেকেই হেনরিয়েটা অভিনেতাটির সঙ্গে সঙ্গেই আছে; সে তাকে নিয়ে একটা হোটেলে গিয়েছিল।

ইয়ারচেংকোর পাশে বসে অভিনেতাটি তৎক্ষণাৎ আর একটি ভূমিকায় অভিনয় শুরু করে দিল—এমন একজন দয়ালু বৃদ্ধ জমিদারের ভূমিকা যে এক সময়ে ছাত্র ছিল তার সেই জন্যই জানিয়ে দিল যে কোন ছাত্রকে দেখলেই তার মনে একটা শান্ত পিতৃ-ভাবের উদয় হয়।

বিকৃত ও নিষ্ঠুর মুখের উপর গভীর আবেগের অতিরিক্ত ভাব ফুটিয়ে সে বলতে লাগল: "বিশ্বাস করুন ভদ্রমহোদয়গণ, একমাত্র ছাত্রদের মধ্যে এলেই আমার মন জীবনের সব তুচ্ছতাকে ভুলে শান্তি লাভ করে। পবিত্র সব ধারণায় কী তাদের বিশ্বাস! কী পবিত্র ভাব! আমাদের রুশ ছাত্রদের চাইতে মহত্তর ও পবিত্রতর আর কী আছে···কেল্‌নার—শ্যাম্পেন!" হঠাৎ সে গলা ছেড়ে চেঁচিয়ে উঠে টেবিলের উপর মুষ্ট্যাঘাত করতে লাগল।

লিখোনিন ও ইয়ারচেংকোও পিছিয়ে রইল না। শুরু হল হৈ-হল্লা। গায়ক মিশ্‌কা আর হিসাব-রক্ষক কল্‌কা যে কেমন করে সেখানে ভিড়ে গেল তা ঈশ্বরই জানেন। এসেই তারা হেড়ে গলায় গান জুড়ে দিল। আর তাই শুনে ঘুম ভেঙে রলি-পলিও সেই দলে যোগ দিল।

দেখতে দেখতে ছোট ঘরটা ভিড়ে জম-জমাট হয়ে উঠল। হৈ-চৈ শুরু হল। ধোঁয়ায় বাতাস ভরে গেল। খদ্দেররা চলে যেতে মেয়েরাও সেখানে জুটে গেল; নাচের ফাঁকে ফাঁকে কারও কোলের উপর বসে পড়ল, সিগারেট টানল, বেসুরে গান গাইল, মদ খেল, এলোপাথারি যাকে-তাকে চুমু খেল, চলে গেল, আবার এল।

লিউবা তার ঘর থেকে ফিরে এল। একটু পরেই দেখা দিল পেত্রভ্‌স্কি। গম্ভীরভাবে সে জানাল, এতক্ষণ সে রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে আগেকার ঘটনাটার কথা ভেবে এই সিদ্ধান্তে এসেছে যে, বরিসেরই দোষ, তবে সে তখন মাতাল অবস্থায় ছিল বলে সে দোষ থেকে তাকে অব্যাহতি দেওয়া যেতে পারে। একটু পরেই জেনি ফিরে এল। সে একাই এসেছে। সোবাশ্‌নিকভ তার আগেই

ঘুমিয়ে পড়েছে।

দেখা গেল, অভিনেতাটি অনেক গুণের গুণমণি। জানালার কাঁচের উপর থেকে কোন মাতাল যখন একটা মাছিকে ধরবার চেষ্টা করে তখন মাছিটা যে রকম ফর্‌ফর্‌ করে শব্দ করে, সে চমৎকারভাবে সেটাকে নকল করে শোনাল। করাতের ঘস্‌ঘস্‌ আওয়াজও সে নিখুঁতভাবে নকল করল। ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে একটি মহিলার টেলিফোন করাটা চমৎকার নকল করে দেখাল। তারপর শোনাল গ্রামোফোন রেকর্ডের বাজনা। সবশেষে দেখাল একটি পার্সি ছেলের পোষা বাঁদর নিয়ে খেলা।

তারপর একটার পর একটা বলতে লাগল অশ্লীল গল্প—যেন ঝুলি ঝেড়ে উজাড় করে দিল। মেয়েটা খুশিতে ডগমগ, হেসে কুটিপাটি, চেয়ারে এলিয়ে পড়ল। সেই হল্লার সুযোগে ভেল্‌ত্‌মান সকলের অলক্ষ্যে সেখান থেকে সরে পড়ল; একটু পরেই সলজ্জ হাসি হেসে পাশাও তাকে অনুসরণ করল।

একমাত্র লিখোনিন ছাড়া আর সব ছাত্রই একে একে সরে পড়ল—কেউ প্রকাশ্যে, কেউ লুকিয়ে। বেশ কিছুক্ষণ তারা ফিরল না। ভলদ্যা পাভলভ বলল, সে নাচ দেখতে যাচ্ছে। তল্‌পিগিন জানাল তার মাথা ধরেছে, তাই তামারাকে মাথা ধোবার জায়গাটা দেখিয়ে দিতে বলল। গোপনে লিখোনিন-এর কাছ থেকে তিন রুবল ধার করে পেত্রভ্‌স্কি বেরিয়ে গেল এবং জোসিয়াকে দিয়ে সাদা মাংকাকে ডেকে পাঠাল। সদা-সতর্ক খুঁতখুঁতে রাম্‌সেস-ও জেনির অদ্ভুত, সুস্পষ্ট, ক্ষতিকর সৌন্দর্যের তীব্র উত্তেজনার হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারল না। সে জানাল, সকলেই একটা অত্যন্ত জরুরী কাজে যেতে হবে বলে অন্তত দু'তিন ঘণ্টা ঘুমিয়ে নেওয়া তার অবশ্য দরকার। কিন্তু বেরিয়ে যাবার সময় সে চোখের ইসারায় জেনিকে ডাকল, আর জেনিও সকলের অলক্ষ্যে চোখের পাতা নামিয়ে তার জবাব দিল। কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে জেনিও সকলের কাছে ক্ষমা চেয়ে তার খাটো কমলা রঙের স্কার্ট দুলিয়ে বেরিয়ে গেল।

প্রতিবেদক ঠাট্টা করে বলল, "আরে, এবার তো আপনার পালা লিখোনিন।"

জিভের একটা শব্দ করে লিখোনিম জবাব দিল, "না ভাই, আপনি ভুল করলেন। বিশ্বাসের জন্যই হোক আর নীতির জন্যই হোক, ও কাজ আমি করব না। না! নৈরাজ্যবাদী হিসাবে আমি বলে থাকি, অবস্থা যত খারাপ হবে, জীবন তত ভাল হবে। কিন্তু সৌভাগ্যবশত আমি একজন জুয়াড়ি, তাই জুয়া খেলতেই আমার সব পুরুষত্ব নিঃশেষ হয়ে যায়। আর সেই জন্যে আমার ভিতরে ওই সব তথাকথিত স্বর্গীয় আবেগ অপেক্ষা পেটের গোলমালের ডাকই বেশী শোনা যায়। কিন্তু এটা খুব বিস্ময়কর যে আমিও ঠিক ওই এক কথাই ভাবছিলাম। আপনাকেও ওই প্রশ্নটিই আমি করতে যাচ্ছিলাম।"

"আমি না। এটা ঠিক যে খুব শ্রান্ত হলে কখনও কখনও আমি এখানেই

রাত কাটাই। ইসায়া সাব্বিচ-এর কাছ থেকে তার ছোট ঘরের চাবিটা চেয়ে নিয়ে সেখানেই সোফার উপর ঘুমিয়ে পড়ি। অনেকদিন আগে থেকেই মেয়েরা বুঝে নিয়েছে আমি একটি তৃতীয় লিঙ্গের জীব।"

"সত্যি···কখনও না?"

"কখনও না।"

নিউরা বলে উঠল, "এটা বেদ-বাক্যের মত সত্য। সেবৃগে আইভানিচ একটি কুটিরবাসী মহর্ষি।"

প্লাতনভ বলতে লাগল, "আগে, বছর পাঁচেক হবে, এ ধরনের অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল। কিন্তু, কি জানেন, ব্যাপারটা আমার কাছে বিরক্তিকর ও একঘেয়ে লেগেছিল।···অভিনেতাটি যে মাছিগুলোকে নকল করল অনেকটা তাদের মত। এক মুহূর্তের জন্য তারা মিলিত হয়, পিঠ চুলকে দেয়, তারপর উড়ে যায়, আর কখনও একত্র হয় না। কিন্তু এখানে প্রেম করা? না, আমি তাদের মত নায়ক নই। আমি সুদর্শন নই, মেয়েদের সামনে আমি বড়ই লাজুক, তাদের কাছে আমি অস্বস্তি বোধ করি, আমি ভদ্র। এখানে তারা চায় বন্য উন্মাদনা, রক্তাক্ত ঈর্ষা, চোখের জল, বিষ, ঠ্যাঙানি, খুন···এক কথায় রোম্যান্টিক বিকার। অবশ্য সেটা আমি বুঝতে পারি। নারীর হৃদয় সব সময়ই চায় ভালবাসা, কিন্তু প্রতিদিন যে ভালবাসার কথা তারা শোনে সেগুলি লালা-গড়ানো ঠোঁটের টক-টক কথা। স্বভাবতই সে ভালবাসায় তারা লংকার গুঁড়ো ছড়িয়ে দিতেই চায়। তারা ভালবাসার কথা শুনতে চায় না, তারা চায় উচ্ছ্বসিত কষ্টদায়ক কাজ। তাই চোর, খুনী, বদমাসরাই তাদের প্রেমিক হয়···"

প্লাতনভ বলল, "তার চাইতেও গুরুতর কথা, অনেক কষ্টে যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে তার ফলে সেটাও নষ্ট হয়ে যায়।"

লিখোনিন সন্দিগ্ধ গলায় বলল, "আপনার কথা বিশ্বাস করি না। তাহলে দিন-রাত এখানে পড়ে থাকেন কেন? আপনি লেখক হলে না হয় আলাদা কথা ছিল। সহজেই বলা যেত—আপনি নানা রকম চরিত্র দেখে বেড়াচ্ছেন··· জীবনকে দেখছেন···"

"আপনাকে তো বলেছি আমি লেখক নই।"

"তাহলে কিসের জন্য আপনি এখানে ঘুর-ঘুর করেন? আমি তো স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি এখানকার অনেক কিছুই আপনাকে বিরক্ত করে, উৎপীড়ন করে, ব্যথা দেয়। যেমন, বরিস-এর সঙ্গে অর্থহীন ঝগড়া, স্ত্রীলোককে মারপিট, চোখের সামনে অনবরত এই সব আবর্জনা, কামনা, পাশবিকতা, কামাতুরতা, মাতলামি। তাই আপনি যখন বলেন যে, আপনি কামের বশবর্তী হন না, তখন আপনার কাজের উদ্দেশ্য আমি আরও বুঝতে পারি না।"

প্লাতনভ সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না।

তারপর থেমে থেমে, যেন এই প্রথম সে নিজের চিন্তাকে কান পেতে শুনে তার বিচার করছে এই ভাবে ধীরে ধীরে বলতে শুরু করল, "দেখুন, যা আমাকে এই জীবনের প্রতি আকর্ষণ করে, আমার আগ্রহকে জাগিয়ে তোলে তা হল··· কি ভাবে আপনাকে বোঝাব···তা হল এই জীবনের উলঙ্গ সত্য। সব বিধি-বিধানের আবরণ যেন ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। এখানে মিথ্যা নেই, ফাঁকি নেই, পবিত্রতার বালাই নেই ; কি জনমত, কি বংশগত কর্তৃত্ব, কি নিজের বিবেক, কারও সঙ্গেই কোন ব্যবসাদারি চালও নেই। কোন রকম ভ্রান্ত ধারণা নেই, ঢাক-ঢাকও নেই। শুধু আছে সে—একটি পতিতা, সর্বসাধারণের একটি আশ্রয়, শহরের বাড়তি যৌনতার গুদাম-ঘর। সে বলছে, 'এখানে এস ; তুমি যেই হও, তোমাকে ফেরাব না, কারণ এটাই আমার জীবনের কর্তব্য-কর্ম। কিন্তু এই মুহূর্তের যৌন-কর্মের জন্য তুমি আমাকে দেবে অর্থ, বিরক্তি, রোগ ও অপমান।' এই সব। মানব জীবনের আর কোন অধ্যায়েই মানুষের দ্বারা আরোপিত মিথ্যা বা চুণ-কামের আবরণে ঢাকা না পড়ে মৌলিক সত্য এমন দানবীয়, কুৎসিত, উলঙ্গ উজ্জ্বলতায় ফুটে ওঠে নি।"

লিখোনিন চিন্তিতভাবে বলল, "নৈরাজ্যবাদী হিসাবে এর কিছু কিছু আমি বুঝি। কিন্তু একটা জিনিস আমি বুঝতে পারছি না। মানবতার এই অবস্থা যদি আপনার কাছে এতই অসহ্য তাহলে কেন আপনি সহ্য করছেন এই"—টেবিলের উপর সে একটা বৃত্ত আঁকল—"এই মানুষের জঘন্যতম আবিষ্কারকে ?"

প্লাতনভ সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, "কেন তা আমি নিজেই জানি না। দেখুন, আমার স্বভাবটাই বাউণ্ডুলে ; জীবনকে আমি একান্তভাবে ভালবাসি। আমি কারখানায় কাজ করেছি, ছাপাখানায় টাইপ সাজিয়েছি। সস্তা 'মাখর্কা' তামাক বুনেছি, বিক্রি করেছি। আরব সাগরে জাহাজে কয়লা ঠেলার কাজ করেছি, কৃষ্ণ সাগরে মাছ ধরেছি। নীপার নদীতে তরমুজ ও ইট বোঝাই করেছি। সার্কাস-দলের সঙ্গে ঘুরেছি, অভিনয়ও করেছি। আরও কত কি যে করেছি সব মনেও নেই। দারিদ্র্যের চাপে পড়ে যে এসব করেছি তাও নয়। জীবনকে জানবার সীমাহীন তৃষ্ণা, অপূরণীয় কৌতূহলই এর কারণ। সত্যি কথা বলতে কি কখনও ঘোড়া হতে চেয়েছি, বা কোন গাছ, বা মাছ ; স্ত্রীলোক হয়ে সন্তানের জন্মদানের অভিজ্ঞতাও পেতে চেয়েছি ; যাকে যখন দেখেছি তারই সঙ্গে একাত্ম হয়ে তার চোখ দিয়ে পৃথিবীটাকে দেখতে চেয়েছি। তাই তো নগরে, প্রান্তরে আমি স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াই, যখন যে কাজ পাই তাই করি···ভাগ্য যে পথে টেনে নিয়ে যায় মনের আনন্দে সেই পথেই চলি। এমনি করেই একদিন এই পতিতালয়ে এসে পড়েছিলাম!···এটাকে যত দেখছি ততই আমার আতংক, দুর্বোধ্যতা ও তীব্র ক্রোধ বাড়ছে। কিন্তু শীঘ্রই এও শেষ হয়ে যাবে। এবার একটা রোলিং মিল-এ চলে যাব···সেখানে আমার একটি বন্ধু আছে···সে আমাকে একটা চাকরি করে দেবে। শুনুন লিখোনিন,

অভিনেতার কথা শুনুন···এখন তৃতীয় অংক চলছে।"

বুকের উপর ঘুঁসি মারতে মারতে সে বলছে, "এখন আমি একটা প্রহসনে অভিনয় করছি। একদল ক্লান্ত দর্শককে খুশি করবার জন্য ডোরা-কাটা আটো পাজামা পড়ে আমাকে ভাঁড় সাজতে হচ্ছে! অবহেলিত ভৃত্যের মত আমার মশাল নিভে গেছে, আমার প্রতিভা কবরে ঢুকেছে! কিন্তু অনেক বছর আগে···অনেক বছর আগে·· আমি ছিলাম···আমি ছিলাম মহানায়ক!"

চোখের জল ফেলে সে সহকারী অধ্যাপককে চুমো খেতে চেষ্টা করল।

"হ্যাঁ, আমাকে ঘেন্না করুন! আপনারা ভাল মানুষ, আমাকে গালাগালি দিন! আমি ভাঁড়ের অভিনয় করি—আমি মাতাল হই—নিজেকে বেঁচে দিয়েছি—প্রেরণার পবিত্র অগ্নিকে আমি নির্বাপিত করেছি। এখানে আমি 'জন্তু-জানোয়ারের' মত নিজেকে বিক্রি করছি। আর আমার স্ত্রী—সেই পবিত্র ছোট্ট পাখিটি আমার! সে যদি জানত, শুধু যদি জানত! সে কাজ করে, তার একটা পোষাকের দোকান আছে, তার আঙুলগুলি—আহা, পরীর মত আঙুলগুলি—সুঁচের খোঁচায়-খোঁচায় ছেয়ে গেছে···এদিকে আমি! ওহো, তুমি সতী সাধ্বী স্ত্রী···আর আমি...একটা স্কাউণ্ড্রেল! দেখ, তোমার বদলে কাকে সঙ্গী করেছি! কী ভয়ংকর!" অভিনেতা নিজের চুল টানতে লাগল। "অধ্যাপক, আপনার পণ্ডিত হাতে আমাকে চুমো খেতে দিন! একমাত্র আপনি আমাকে বুঝতে পারবেন। আসুন, আমার স্ত্রীর সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দেই। তাহলেই বুঝতে পারবেন সে কী রকম দেবদূতের মত মানুষ। সে আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে; রাতে সে ঘুমোয় না। আমার ছেলে-মেয়েদের হাতগুলিকে প্রার্থনার ভঙ্গীতে জোর করে দিয়ে তাদের সঙ্গে সেও ধীরে ধীরে বলছে: 'প্রভু, বাবাকে বাঁচিয়ে রেখো, তাকে নিরাপদ রেখো।"

সাদা মাংকা তখন মদে চুর হয়ে আছে। ঘৃণার দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে সে হঠাৎ বলে উঠল, "টুপির ভিতর থেকে যত সব গুল্ ঝারছ, শূয়োর কোথাকার! সে মোটেই কিছু বলছে না। তোমার বিছানায় একজন পুরুষকে নিয়ে শান্তিতে ঘুম দিচ্ছে।"

"চুপ কর্ বেশ্যা মাগী!" এগমন্ত-লাভ্রেৎস্কি ক্রোধে গর্জে উঠল; একটা বোতলের গলা চেপে ধরে সেটাকে মাথার উপরে তুলল। "আপনারা না ধরলে আমি ওর মাথাটা ভেঙে দিতাম; কুক্কুরী একটা! তোর পচা জিভকে আর পচাস নে—"

মেয়েটাও পাল্টা রুখে উঠল, "আমার জিভ পচা নয়, এ মুখে আমি প্রার্থনা করি। তুমিই হাঁদারাম, ভ্রষ্টা স্ত্রীর সোয়ামি। তুমি বেশ্যাদের নিয়ে মজা লুটবে, আর তোমার স্ত্রী তোমার প্রতি সতী হয়ে থাকবে! এর মধ্যে আবার ছেলেমেয়েদের টেনে এনেছ কেন হতভাগা? আমার দিকে চোখ পাকাবে না দাঁত কড়মড় করবে না। আমাকে ভয় দেখাতে পারবে না! তুমি নিজেও

তো বেশ্যা!"

অনেক চেষ্টা করে, অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তবে ইয়ারচেংকা অভিনেতা ও সাদা মাংকাকে ঠাণ্ডা করল। শেষ পর্যন্ত অভিনেতাটি একেবারেই ভেঙে পড়ল, অসহায় বুড়ো মানুষের মত অঝোরে কাঁদতে লাগল আর নাক ঝারতে লাগল। ক্রমে সে এতই দুর্বল হয়ে পড়ল যে হেনরিয়েটা তাকে ধরে নিজের ঘরে নিয়ে গেল।

সকলেই ক্লান্ত। ছাত্ররা একে একে শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এল, তাদের উপপত্নীরা দূরে দূরে ঘুরতে লাগল। সত্যি, তাদের ঠিক পুরুষ ও স্ত্রী মাছির মতই দেখাচ্ছিল; তারা যেন এই মাত্র পরস্পরকে ছেড়ে জানালা থেকে উড়ে এসেছে। তারা হাই তুলল, আড়মোড়া ভাঙল; ঘুমোতে না পারার দরুণ তাদের বিবর্ণ রুগ্ন মুখে ক্লান্তি ও বিরক্তির ছাপ ফুটে উঠেছে। পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় তাদের চোখের কোণে এমন একটা বৈরী-ভাব ঝিলিক দিয়ে উঠল যেন তারা একসঙ্গে একটা জঘন্য অদরকারী পাপ কাজ করে এসেছে।

লিখোনিন নীচু গলায় প্রতিবেদককে জিজ্ঞাসা করল, "এবার আপনি কোথায় যাবেন?"

"তা ঠিক জানি না। ইচ্ছা ছিল, ইসায়া সাব্বিচ-এর ঘরেই রাতটা কাটাব। কিন্তু এমন মনোরম ভোরবেলাটা নষ্ট করলে খুবই দুঃখের ব্যাপার হবে। ভাবছি, স্নানটা সেরে একটা নৌকো নিয়ে লিপ্‌স্কি মঠে চলে যাব। সেখানে আমার একটি বন্ধু থাকে—একটি মদো সন্ন্যাসী। কেন বলুন তো?"

"আমার ইচ্ছা, অন্য সবাই চলে যাবার পরেও আপনি একটু থেকে যান। একটা গুরুতর বিষয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই।"

"ঠিক আছে।"

সকলের শেষে গেল ইয়ারচেংকো। সে মাথাধরা ও ক্লান্তির কথা জানিয়ে গেল। কিন্তু সে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই প্লাতনভ লিখোনিন-এর হাত ধরে টানতে টানতে কাঁচে-ঢাকা বারান্দায় নিয়ে গেল।

রাস্তার দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলল, "দেখুন।"

কমলা রঙের কাঁচের ভিতর দিয়ে লিখোনিন দেখতে পেল, সহকারী অধ্যাপকটি ত্রেপ্পল-এর ঘণ্টা বাজাচ্ছে। এক মুহূর্ত পরেই দরজাটা খুলে গেল, আর ইয়ারচেংকো তার ভিতর দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

লিখোনিন বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল, "আপনি জানলেন কেমন করে?"

"খুব সহজে। আমি তার মুখটা দেখেছি, ভার্কা-র পায়ে তাকে টোকা মারতেও দেখেছি। অন্য সবাই অসংযত হয়েছিল। আর সে খুব চালাক।"

"ঠিক আছে, চলে আসুন। আপনাকে বেশীক্ষণ আটকাব না।"

১২

প্রাইভেট ঘরটাতে তখন দুটি মাত্র মেয়ে ছিল—রাতের পোষাক পরে জেনি ফিরে এসেছে, আর লিউবা মস্ত বড় হাতল-চেয়ারটায় গুড়িশুড়ি মেরে ঘুমিয়ে আছে। তামাকের ঘন ধোঁয়ায় ঘরের বাতাস নীল ও কটুগন্ধ; ঝাড়-বাতির মোমবাতিগুলো পুড়ে পুড়ে সলতেয় গিয়ে ঠেকেছে; টেবিলে কফি ও মদের দাগ পড়ে এবং কমলা লেবুর খোসা ছড়িয়ে থাকায় বিশ্রী দেখাচ্ছে।

কোচের উপর পা তুলে দু'হাতে হাঁটু চেপে ধরে জেনি বসে ছিল। প্লাতনভ আবার লক্ষ্য করল, তার কালো ভুরুর নীচে গর্তে-বসা চোখ দুটিতে যেন আগুন জ্বলছে।

"মোমবাতিগুলো নিভিয়েই দিই' লিখোনিন বলল।

খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে ভোরের আবছা আলো ঘরে এসে পড়েছে; নেভানো মোমবাতির সলতে থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলি পাক খেয়ে উঠছে; তামাকের নীল ধোঁয়ায় ঘরটা আচ্ছন্ন; তবু খড়খড়ির একটা হৃদপিণ্ডের আকারের ফোঁকরের ভিতর দিয়ে সূর্যের আলো বাঁকা হয়ে দেওয়ালের উপর ছড়িয়ে পড়েছে; যেন ধুলোর একটা উজ্জ্বল সোনালি তলোয়ার ঝল্‌সে উঠেছে।

লিখোনিন বসতে বসতে বলল, "এই ভাল। আমাদের আলোচনা দীর্ঘ হবে না···কিন্তু···কোথা থেকে শুরু করব জানি না।"

সে জেনির দিকে তাকাল।

জেনি বলল, "আমি কি চলে যাব?"

লিখোনিন-এর হয়ে প্রতিবেদকই জবাব দিল, "না, তুমি থাকতে পার।" ম্লান হাসি হেসে সে ছাত্রটির দিকে ঘুরল। "ও থাকলে কোন বাধা হবে না। আপনি তো পতিতাবৃত্তি নিয়েই কথা বলতে চান, তাই না?

"হ্যা—অনেকটা তাই বটে—"

"বেশ। ওর যা বলার আছে তাও আপনার শোনা উচিত। ওর মতামতগুলি খুবই দুঃখবাদীর মত শোনাবে, কিন্তু অনেক সময় তারও মূল্য আছে।

লিখোনিন হাতের তালু দিয়ে মুখটাকে জোরে জোরে ঘসতে লাগল; তারপর বার দুই আঙুলগুলো মটকাল। পরিষ্কার বোঝা গেল, বক্তব্য বিষয় নিয়ে সে খুবই বিব্রত ও অস্বস্তি বোধ করছে।

হঠাৎ সে রেগে বলে উঠল, "আঃ, তাতে কি আসে যায়! আপনারা আজ এই সব মেয়েদের নিয়ে কথা বলছিলেন। আমি সব শুনেছি—কিন্তু আমি আগে জানতাম না এরকম কোন কথাই শুনতে পাই নি। তথাপি—কথাটা শুনতে হয় তো আশ্চর্য লাগবে—আমার সুখ-সৌভাগ্যভরা জীবনে এই প্রথম আমি এ-প্রশ্নটাকে খোলা চোখে দেখতে পেলাম। আমাকে বলুন, শেষ পর্যন্ত পতিতাবৃত্তিটা কি? এটা কি? বড় শহরের একটা বিকার, নাকি একটা

প্রাচীন ঐতিহাসিক ঘটনা? কখনও কি এর অবসান ঘটবে? নাকি যখন মানবতা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে একমাত্র তখনই এর মৃত্যু হবে? এ প্রশ্নের জবাব কে দিতে পারে?"

চোখ দুটোকে ঈষৎ কুঁচকে প্লাতনভ একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল। সে যেন জানতে চেষ্টা করছে, অবচেতন মনের কোন্ চিন্তার ফলে লিখোনিন-এর এই আন্তরিক উদ্বেগ।

"কখন এর শেষ হবে তা কেউ বলতে পারে না। হয়তো তখন যেদিন সমাজবাদী ও নৈরাজ্যবাদীদের কল্পনার স্বর্গ বাস্তবে রূপায়িত হবে, অথবা যেদিন এই পৃথিবীটা কোন বিশেষ একজনের সম্পত্তি না হয়ে সকলের সম্পত্তি হবে; যেদিন ভালবাসা হবে সম্পূর্ণ মুক্ত, একমাত্র তার নিজস্ব অসীম উদ্দেশ্যের দ্বারা পরিচালিত, এবং আমার-তোমার ভেদ ভুলে গিয়ে মানবজাতি একটি বৃহৎ পরিবার হয়ে উঠবে; যেদিন মর্ত্যে স্বর্গ নেমে আসবে এবং মানুষ আবার উলঙ্গ, পবিত্র ও নিষ্পাপ হবে। হয়তো সেদিন এর অবসান হবে।"

"কিন্তু এখন? এখন?" আরও বেশী আগ্রহের সঙ্গে লিখোনিন প্রশ্ন করল। আমরা কি হাত জোড় করে চেয়ে থাকব? আমরা কি বলব যে এতে আমাদের কিছু যায়-আসে না? ওটা আমাদের কোন ব্যাপারই নয়। অনিবার্য পাপ হিসাবেই একে সহ্য করে যেতে হবে? এর সঙ্গে খাপ-খাইয়ে চলতে হবে? মেনে নিতে হবে? অথবা একে আশীর্বাদ করতে হবে?"

প্রতিবেদক জবাব দিল, "কিছুই করতে হবে না লিখোনিন। যতদিন ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকবে ততদিন দারিদ্র্যও থাকবে; যতদিন বিবাহ-প্রথা থাকবে ততদিন পতিতাবৃত্তি কখনও যাবে না। আপনি কি জানেন কারা চিরকাল পতিতাবৃত্তিকে সমর্থন করবে, রক্ষা করবে? তথাকথিত ভদ্রজনরা, পরিবারের শ্রদ্ধেয় পিতারা, নিন্দাতীত স্বামীরা, স্নেহময় দাদারা। অর্থের বিনিময়ে এই পাপ-কর্মকে আইনসঙ্গত, নিয়মসিদ্ধ ও বিধিবদ্ধ করবার একটা সাধু উদ্দেশ্য তারা সব সময় খুঁজে বের করবে, কারণ তারা জানে। অন্যথায় এই পাপ তাদের শয়ন-কক্ষে ও শিশু-রক্ষণ-কেন্দ্রে ফেটে পড়বে। তাদের কাছে, অন্যের ইন্দ্রিয়াসক্তির হাত থেকে নিজেদের ঘর-সংসারকে রক্ষা করবার একমাত্র রক্ষা-কবচ পতিতাবৃত্তি। বহু ক্ষেত্রেই সম্ভ্রান্ত পরিবারের মানুষ গোপন ব্যভিচারে কোন রকম আপত্তি করে না। কারণ চিরকাল একই জিনিস নিয়ে—স্ত্রী, দাসী ও মেয়ে-বন্ধু নিয়ে সকলেই ক্লান্তিবোধ করে। আসল কথা হল, মানুষ বহু-ভতৃক জীব, অতিমাত্রায় বহু-ভতৃক। ত্রেপ্পেল অথবা আন্না মার্কভনার মত উর্বর মুরগি-প্রজনন ক্ষেত্রেই তাদের মোরগ-সুলভ প্রেম-বৃত্তিগুলি স্বাধীন বিকাশের সুযোগ পায়। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে একটি শান্ত ও একনিষ্ঠ স্বামী অথবা ছয় কন্যার কোন সুখী জনকই পতিতাবৃত্তির ভয়ংকরত্ব নিয়ে সব চাইতে তারস্বরে চিৎকার-চেঁচামেচি করে থাকে। এমন কি পতিতাদের উদ্ধারের

জন্য সে হয়তো একটা সমিতি গড়বে, অথবা সেণ্ট ম্যাগ্‌দালেন-এর নামে একটা উদ্ধারাশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য নাটক-অভিনয় বা লটারির সাহায্যে টাকা তুলবে। আর এইভাবে পতিতাবৃত্তির অস্তিত্বকে সমর্থন করবে, আশীর্বাদ করবে।"

চিরকালের ঘৃণা মেশানো মৃদু হাসি হেসে জেনি কথাটার পুনরাবৃত্তি করল, "সেণ্ট ম্যাগ্‌দালেন আশ্রম।"

লিখোনিন বাধা দিয়ে বলল, "আমি জানি। এই সব নকল কপট ব্যবস্থা নিছক অর্থহীন ও তামাসামাত্র। লোকে হয়তো আমাকে বিদ্রূপ করবে, বোকা বলবে, কিন্তু যে দর্শক শুধুই মেনে নেয়···আগুনের দিকে তাকিয়ে বেঞ্চিতে বসে শুধু চেঁচায়, 'হে ঈশ্বর, এ যে আগুন! দেখ কী তার ঝলকানি। ওখানকার মানুষরা যে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে!' তাদের দলের একজন হতে আমি পারব না। সে তো কিছুই করে না, সে শুধু কাঁদে আর ঠ্যাং চাপড়ায়।"

প্লাতনভ কড়া গলায় বলল, "বেশ তো, আপনি কি করতে চান? বাচ্চাদের একটা বালতি নিয়ে সে আগুন নেভাতে চেষ্টা করবেন?"

"নিশ্চয় না," লিখোনিন আবেগের সঙ্গে বলে উঠল, "হয়তো···কে জানে··· অন্তত একটা প্রাণকে তো বাঁচাতে পারব! এ বিষয়েই আপনার সঙ্গে কথা বলতে আমি চেয়েছিলাম প্লাতনভ। আপনি আমাকে সাহায্য করুন। আপনার কাছে শুধু একটি প্রার্থনা, ঠাট্টা করবেন না। আমাকে ফেরাতে চেষ্টা করবেন না।"

"একটি মেয়েকে আপনি এখান থেকে নিয়ে যেতে চান? তাকে বাঁচাতে চান?" তার মুখের উপর চোখ রেখে প্লাতনভ বলল। আলোচনার ধারাটা সে ধরতে পেরেছে।

"হ্যাঁ...আমি জানি না···চেষ্টা করে দেখতে চাই···" দ্বিধাগ্রস্ত গলায় ছাত্রটা বলল।

প্লাতনভ বলল, "সে আবার এখানেই ফিরে আসবে।"

জেনি দৃঢ়স্বরে বলল, "নিশ্চয় আসবে।"

লিখোনিন তার কাছে এগিয়ে গেল। তার হাত দুটি ধরে আবেগ-কম্পিত গলায় বলল, "জেনেচ্‌কা···তুমি কি···কি? রক্ষিতা হিসাবে নয়···বন্ধুর মত ···ধর, ছ' মাসের বিশ্রাম···তারপর তুমি কোন একটা কাজ শিখে নেবে···এক সঙ্গে আমরা লেখাপড়া করব—দেখ—"

জেনি সক্রোধে হাত টেনে নিল।

"তোমার সঙ্গে ছাই-গাদায় ফিরে যাব!" সে প্রায় চিৎকার করে উঠল। "পুরুষদের আমি চিনি! তুমি চাও আমি তোমার মোজা সেলাই করব? তেলের স্টোভ জ্বালিয়ে তোমার জন্য রান্না করব? তুমি তোমার লম্বা-চুল বন্ধুদের সঙ্গে ফুর্তি মেরে বেড়াবে আর আমি তোমার প্রতীক্ষায় বিনিদ্র রাত কাটাব? আর তারপরে যখন ডাক্তার, বা উকিল, বা সরকারী অফিসার হয়ে বেরবে, তখন

আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। 'বেরিয়ে যা বেশ্যা, রাস্তায় চলে যা! আমার তরুণ জীবনকে তুই নষ্ট করেছিস। এবার আমি একটি ভদ্র, পবিত্র, নিষ্কলুষ মেয়েকে বিয়ে করব।"

লিখোনিন বিচলিতভাবে আমতা-আমতা করে বলল, "আমি বলছিলাম— ভাইয়ের মত ··আমি চাই না···তা নয়!"

"আমি তোমাকে চিনি ভাই! ও প্রথম রাতটাই চলবে, তারপরেই—কেটে পড়। বাজে বকো না···ভাল লাগে না।"

প্রতিবেদক গম্ভীরভাবে বলে উঠল, "থামুন লিখোনিন, এ বোঝা আপনি বইতে পারবেন না। পিপল্‌স্ পার্টির আদর্শবাদী কিছু সদস্যের কথা আমি জানি যারা নীতি হিসাবে অশিক্ষিত চাষী মেয়েদের বিয়ে করেছিল। তারা ভেবেছিল, আনকোরা নতুন, নরম কালো কাদার মত মেয়েগুলো বেশ ভালই হবে। কিন্তু এক বছরের মধ্যেই সেই সব কালো নরম কাদার তালগুলি মোটা-সোটা স্ত্রীলোকে পরিণত হল; সারাটা দিন তারা বিছানায় শুয়ে মিষ্টি বিস্কুট চিবোয়, নড়েচড়েও বসে না, আঙুল ভরে এক পেনি দামের আংটি পরে, তাই দেখে দেখে দিন কাটায়। অথবা রান্নাঘরে কোচয়ানের সঙ্গে বসে মিষ্টি মদ খায় আর প্রেম করে। দেখুন, আপনার বেলায় অবস্থাটা আরও খারাপ হতে পারে।"

তিনজনই চুপচাপ। লিখোনিন ফ্যাকাশে হয়ে গেল। রুমাল দিয়ে অনবরত কপাল মুছতে লাগল।

এবার সে একগুঁয়েভাবে চেঁচিয়ে উঠল, "না, চুলোয় যাক। আপনার কথা আমি বিশ্বাস করি না! বিশ্বাস করতে চাই না! লিউবা!" সে হাঁক দিল, "লিউবোচ্‌কা।"

লিউবা উঠে বসল। হাতের পাতা দিয়ে ঠোঁট মুছল, হাই তুলল, ছোট মেয়ের মত দুষ্টু হাসি হাসল।

বলল, "আমি ঘুমোই নি। সব শুনেছি।"

"লিউবা, তুমি কি আমার সঙ্গে যেতে রাজী আছ?" বলে লিখোনিন তার হাত ধরল। "চিরদিনের মত চলে যাবে, আর কোন দিন কোন বেশ্যালয়ে বা রাস্তায় ফিরে আসতে হবে না।"

বিচলিতভাবে লিউবা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে জেনির দিকে তাকাল, যেন এই ঠাট্টার কারণটাই সে নীরবে জানতে চাইছে।

সে চালাকি করে বলল, "বলে যাও। কিন্তু তুমি তো এখনও ছাত্র। একটা মেয়েকে রাখবে কেমন করে?"

"আমি সেকথা বলি নি লিউবা। আমি শুধু তোমাকে সাহায্য করতে চাই। এখানে তোমার জীবন তো সুখের নয়।"

"নিশ্চয়, এখানে কোন মধু নেই। আমি যদি জেনির মত অহংকারী হতাম

…অথবা পাশার মত মনোহারিণী…তাহলে…কিন্তু এ জায়গার সঙ্গে আমি মানিয়ে নিতে পারছি না।"

"তাহলে আমার সঙ্গে চল," লিখোনিন তাকে বোঝাতে চাইল। "তুমি নিশ্চয় কিছু হাতের কাজ জান…সেলাই…সুচের কাজ…ঐ রকম কিছু…"

লিউবা লজ্জিতভাবে বলল, "আমি কিছুই জানি না।" সে হেসে উঠে হাত দিয়ে মুখ ঢাকল। "একটা চাষীর মেয়ে যেটুকু কাজ জানে আমি শুধু তাই জানি, আর কিছু না। আমি একটু রান্না জানি। একজন পুরোহিতের কাছে রাঁধুনির কাজ করেছি।"

"চমৎকার! আশ্চর্য!" লিখোনিন খুশি হয়ে উঠল। "আমি তোমাকে সাহায্য করব। আমরা কম দামের একটা হোটেল খুলব! সে খবরটা ছাত্রদের মহলে জানিয়ে দেব…তারা আসবে…তুমি সব ব্যবস্থা করবে। চমৎকার!"

"আমাকে নিয়ে মস্করা করো না," লিউবার গলায় অভিমানের সুর। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আবার সে জেনির দিকে তাকাল।

একটু কাঁপা গলায় জেনি বলল, "উনি তো মস্করা করছেন না।"

বুকের উপর ক্রুশ-চিহ্ন এঁকে ছাত্রটি উচ্ছ্বসিত গলায় বলল, "আমি কথা দিচ্ছি, যা বলেছি ভেবে-চিন্তেই বলেছি। ঈশ্বরের দিব্যি!"

জেনি বলল, "ঠিক আছে। আপনি লিউবাকে নিয়ে যান, ও আমার মত নয়। আমি অশ্বারোহী বাহিনীর বুড়ো ঘোড়ার মত, খড় বা চাবুক কোনটাই আমাকে বদলাতে পারে না। লিউবা সরল, দয়ালু। সে এখনও আমাদের জীবনে অভ্যস্ত হতে পারে নি।" তারপর লিউবার দিকে ফিরে বলল, "আমার দিকে হাঁ করে চেয়ে আছিস কেন বোকা মেয়ে? যা জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে তার জবাব দে। তুই যাবি কি না?"

"মানে…সে যদি ধাপ্পা না দেয়…যদি সত্যি চায়। তুমি কি বল জেনেচ্কা?"

"কী মুগুড় রে বাবা!" জেনি রেগে গেল। "তুই কি মনে করিস নাকটা খুইয়ে এখানে খড়ের গাদায় পড়ে পচাই ভাল? বা বেড়ায় বন্দী কুত্তার মত মরা ভাল? তুই কি ভাল হতে চাস না? যেখানে তোর উচিত ওর হাত ধরে তাতে চুমো খাওয়া, সেখানে তুই যে খচ্চরির মত ব্যবহার করছিস!"

সরলা লিউবা সত্যি লিখোনিন-এর হাতে তার ঠোঁট চেপে ধরতে চেষ্টা করল।

উল্লসিত লিখোনিন বলে উঠল, "খুব ভাল! চমৎকার! সোজা মালকিনের কাছে চলে যাও; তাকে বল, চিরদিনের মত তুমি এ জায়গা ছেড়ে যাচ্ছ। যে সব জিনিস না হলে নয় শুধু তাই সঙ্গে নাও। সময় বদলে গেছে; একটি মেয়ে ইচ্ছা করলেই পতিতালয় ছেড়ে চলে যেতে পারে।"

জেনি তাকে বাধা দিল, "না, ওভাবে হবে না। ও চলে যেতে পারে

তা ঠিক, কিন্তু গোলমালের অন্ত থাকবে না। দেখুন ছাত্রবাবু, কি করতে হবে আমিই বলে দেব। দশ রুবল খরচ করতে আপত্তি নেই তো?"

"নিশ্চয় না। এই নাও।"

"লিউবা গিয়ে বাড়িউলিকে বলুক, আজ রাতের মত আপনি ওকে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছেন। তার জন্য বাঁধা দর দশ রুবল। তারপর কাল এসে আপনি ওর টিকিট আর জিনিসপত্র নিয়ে যাবেন। আমরাই সব ব্যবস্থা করে দেব, কিছু ভাববেন না। তারপর আপনাকে ঐ টিকিটটা নিয়ে পুলিশের কাছে গিয়ে বলতে হবে যে এই লিউবা নামের মেয়েটিকে আপনি দাসী হিসাবে ভাড়া করেছেন এবং টিকিটটা বদলে একটা পাসপোর্ট করাতে চান। ওরে লিউবা, তাড়াতাড়ি কর। টাকাটা নিয়ে চলে যা! মনে রাখবি, বাড়িউলির কাছে খুব সতর্ক থাকবি, নইলে সে যা কুত্তী, তোর চোখ দেখেই আসল কথা ধরে ফেলবে। আর মুখের রুজের দাগ ভাল করে ধুয়ে ফেলতে ভুলিস না; তা নাহলে গাড়োয়ানরা কিন্তু আঙুল তুলে তোকে দেখাবে।"

আধ ঘণ্টা পরে লিউবা ও লিখোনিন একখানি ড্রশ্‌কিতে চেপে বসল। জেনি ও প্রতিবেদক পথের পাশে দাঁড়িয়ে রইল।

প্লাতনভ অলস ভঙ্গীতে বলল, "কাজটা তুমি খুব বোকার মত করলে লিখোনিন. তবে তোমার সূক্ষ্ম মনোবৃত্তিকে আমি শ্রদ্ধা করি। যেমনটি ভেবেছ তেমনটি করেছ। তুমি সাহসী ও সৎ।"

জেনি হেসে বলল, "তোমাদের শুরুটা শুভ হোক! উৎসবে আমাকে নিমন্ত্রণ করতে যেন ভুল না হয়।"

"সে জন্য তো শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকতে হবে," হাসতে হাসতে লিখোনিন টুপিটা নাড়তে লাগলো।

গাড়ি ছেড়ে দিল। প্রতিবেদক জেনির দিকে তাকিয়ে সবিস্ময়ে দেখল, তার দুটি নরম চোখ জলে ভরে উঠেছে।

সে ফিস ফিস করে বলল, "ঈশ্বর ওদের মনোবাসনা পূর্ণ করুন।"

প্লাতনভ সাদরে বলল, "আজ তোমার কি হল জেনি? এ সব কি? তোমার মন কি দুঃখে ভারী হয়ে উঠেছে? আমি কি সাহায্য করতে পারি?"

তার দিকে পিছন ফিরে জেনি সিঁড়ির রেলিং ধরে ঝুঁকে দাঁড়াল।

বিচলিত গলায় বলল, "যদি দরকার হয়, কোথায় তোমাকে চিঠি লিখব?"

"খুব সোজা। 'প্রতিধ্বনি'-র সম্পাদকীয় বিভাগ। তাহলেই আমার হাতে পৌঁছবে।"

"আমি···আমি···আমি···" বলতে বলতে জেনি সহসা গভীর আবেগে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে দুই হাতে মুখ ঢাকল। "আমি তোমাকে লিখব।"

মুখ থেকে হাত না সরিয়েই সে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল; তার ঘাড়টা তখনও কাঁপছে; সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে সে বাড়ির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

দ্বিতীয় খণ্ড

১

প্যাসেঞ্জার ট্রেনটা সানন্দে উত্তরমুখে ছুটে চলেছে। সোনালি গমের ক্ষেত আর মনোরম ওক-বীথির ভিতর দিয়ে, স্বচ্ছ নদীর উপরকার সেতুগুলি সশব্দে পার হয়ে, ধোঁয়ার কুণ্ডলিকে পিছনে ফেলে দ্রুত এগিয়ে চলেছে।

সবগুলো জানালা খোলা থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরাটায় ভ্যাপসা গরম। ইঞ্জিনের কটু-গন্ধ ধোঁয়ায় গলা খস-খস করছে। গাড়ির ঝাঁকুনিতে আর গরমে সব যাত্রীই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, শুধু একজন ছাড়া—একটি সুবেশ সদানন্দ, উৎসাহী, মিশুক, বাচাল ও বিনীত লোক। তার সঙ্গে একটি যুবতী। দেখেই বোঝা যায় তারা নববিবাহিত দম্পতি, বিশেষ করে বরের প্রতিটি আদর-আপ্যায়নে কনের মুখ যেভাবে লাল হয়ে উঠছিল তাতেই ব্যাপারটা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। যুবকটির দিকে তাকাতেই মেয়েটির চোখ যেন তারার মত জ্বলছিল। প্রেমিকা যুবতীর মুখের মতই মুখখানি সুন্দর—মুখে তাজা গোপের আভা, সুন্দর ঠোঁট, কালো চোখ দুটি এত বড় যে মণির চারদিককার সাদা অংশটা প্রায় চোখেই পড়ে না।

কামরায় তিনজন অপরিচিত যাত্রী থাকা সত্ত্বেও সে কিছুটা অশোভন ভাবেই মেয়েটিকে আদর করছিল। একজন গর্বিত মালিকের প্রসন্নতায়, একজন প্রেমিকের আত্ম-শ্লাঘায় সে যেন জগৎকে বলছে—"দেখ, আমরা কত সুখী; এতে তোমরাও কি সুখী হও নি?"—পোষাকের উপরে দৃশ্যমান মেয়েটির সুগঠিত পায়ে সে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, গালটা নেড়ে দিচ্ছে, অথবা কালো, কড়া, পাকানো গোঁফ দিয়ে তাকে সুঁড়সুড়ি দিচ্ছে···তথাপি, খুশিতে ডগমগ হলেও, তার মিটিমিটি চাউনি, উপরের ঠোঁটের বাঁকা ভঙ্গী, পরিষ্কার-কামানো কঠিন চৌকো থুঁতনিতে কেমন যেন একটা অস্বস্তিকর লুঠেরার মনোভাব ফুটে উঠেছে।

প্রেমিক দম্পতির ঠিক উল্টো দিকে বসে আছে তিনটি যাত্রী—একজন অবসরপ্রাপ্ত সেনাপতি, শুকনো, পরিচ্ছন্ন বৃদ্ধ, মাথায় পরিপাটি পমেড-লাগানো চুল; একজন মজবুত চেহারার জোতদার, গলার মাড়-দেওয়া কলারটা খুলে ফেললেও তখনও গরমে হাঁপাচ্ছে এবং একটা ভিজে রুমাল দিয়ে অনবরত মুখ মুচছে; আর একজন পদাতিক বাহিনীর তরুণ অফিসার। গরমের দিনে বন্ধ জানালার কাঁচের উপর আছড়ে-পড়া মাছির গুনগুনানির মতই সেমিয়ন ইয়াকভ্‌লেভিচ্‌-এর (সে ইতিমধ্যেই সহযাত্রীদের জানিয়ে দিয়েছে যে তার নাম সেমিয়ন ইয়াকভ্‌লেভিচ্‌ গরিজন্ত) অবিশ্রাম বকবকানি যাত্রীদের ক্লান্ত ও

বিরক্ত করে তুলেছে। কিন্তু কেমন করে তাদের ফ‍ূর্তিতে রাখা যায় তা সে ভালই জানে। সে তাদের নানারকম ভেঙ্কি দেখাল, সূক্ষ্ম রসের কিছু গল্প বলল; একটুখানি ঠাণ্ডা হবার জন্য তার স্ত্রী যখন গাড়ির প্ল্যাটফর্মে চলে গেল তখন সে এমন সব গল্প জুড়ে দিল যাতে সেনাপতির ঠোঁটে হাসি ফুটল, জোতদারটি ঘোড়ার মত হ্যাঁ-হ্যাঁ করতে করতে ভুঁড়ি দোলাতে লাগল, আর সামরিক স্কুল থেকে সদ্য-প্রত্যাগত গোঁফহীন সেকেণ্ড লেফ্‌টেন্যাণ্টটি কৌতূহল ও হাসি চাপতে না পেরে পাছে সহযাত্রীরা তার লজ্জিত ভাবটা দেখে ফেলে তাই মুখটা ফিরিয়ে নিল।

গরিজন্ত-এর স্ত্রী বেশ খোলাখুলিভাবেই স্বামীর সেবা করতে লাগল; রুমাল দিয়ে মুখ মুছিয়ে দিল; পাখার হাওয়া করল; বার বার টাইটা বেঁধে দিল। সেই সময় পুরুষটির মুখে যে ভাব ফুটে উঠল তা যেমন হাস্যকরভাবে উদ্ধত, তেমনি বোকার মত আত্ম-তৃপ্ত।

বিনীতভাবে কাশতে কাশতে বৃদ্ধ সেনাপতি বলল, "আচ্ছা বাবা, আপনি কাজকর্ম কি করেন জানতে পারি কি?"

"হা ভগবান," সেমিয়ন ইয়াকভ্‌লেভিচ অতিমাত্রায় সরলভাবে বলে উঠল, "আজকের দিনে একটা গরীব মানুষ কি আর করতে পারে? এই একটুখানি ভ্রাম্যমান বেচনদারী ও দালালী করি আর কি। কিন্তু এখন আমি সে কাজে বের হই নি...বুঝতেই তো পারছেন...হা-হা-হা, এটা আমার মধু-চন্দ্রিমা। লজ্জার কি আছে সারোচ্‌কা...ওটা তো আর বছরে তিনবার করে আসে না। এর পরেই তো আছে হাড়-ভাঙা খাটুনি আর টো-টো করে ঘোরা। শহরে গিয়ে আমরা সারোচ্‌কার আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে দেখা করব, আর তারপরেই আবার পথে নামব। অবশ্য ভাবছি বিয়ের পর এই প্রথম যাত্রাটা স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়েই বেরব। বুঝতেই পারছেন, একটু বিবাহোত্তর ভ্রমণ আর কি। 'সিদ্রিস' ও আরও দুটো ইংরেজ ফার্মের আমি প্রতিনিধি। আমার সঙ্গে যে সব নমুনা আছে একটু দেখবেন না কি?" দ্রুত হাতে সে একটা সুন্দর, ছোট হলদে চামড়ার স্যুটকেস খুলে কয়েকটা কার্ডবোর্ডের ভাঁজ-করা বই বের করল। দর্জির মত দক্ষতার সঙ্গে সে এমনভাবে সেগুলির একটা দিক ধরল যাতে সামান্য শব্দ করে সেগুলো নীচের দিকে পরপর খুলে গেল।

"দেখুন কী চমৎকার সব নমুনা! আমদানি-করা জিনিস অপেক্ষা কোন অংশে খারাপ নয়! দয়া করে খেয়াল করুন, এটা রুশ, আর এটা ইংলিশ জার্সি, আর এগুলো সার্জ ও ওরস্টেড। মিলিয়ে দেখুন, হাত দিয়ে দেখুন, গুণের দিক থেকে রাশিয়ার মাল আমদানি-করা বাইরের মালের মতই ভাল। আর তার অর্থই প্রগতি, সংস্কৃতির অগ্রগতি! কাজেই ইওরোপ আর আমাদের অসভ্য রুশ বলতে পারবে না।

"এই ভাবে আমরা আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা করব; মেলা ও 'শাতু দ্য ফ্লুর্স'-এ

ঘুরব; একটু ফূর্তি করব, এদিক ওদিকে যাব; আর তারপরে ভল্‌গা ধরে জারিজিন যাব এবং কৃষ্ণ সাগরের তীর বরাবর অডেসায় দেশে ফিরে যাব।"

লেফ্‌টেন্যাণ্ট লাজুক গলায় মন্তব্য করল, "ভ্রমণটা বেশ ভালই হবে।"

সেমিয়ন ইয়াকভ্‌লেভিচ্‌ সায় দিয়ে বলল, "আমিও বলছি, ভ্রমণটা ভালই হবে। কিন্তু সব গোলাপেরই তো কাঁটা থাকে। ভ্রাম্যমান বেচনদারের কাজ বড় শক্ত; তার সব রকম জ্ঞান থাকা চাই; ব্যবসার জ্ঞান যতটা নয় তার চাইতে বেশী···কী বলে যে বোঝাব···মানুষের মনের জ্ঞান। ধরুন, কোন ব্যবসায়ী হয়তো অর্ডার দিতে চাইছে না; তখন হাতিকে বোঝানোর মত করে তাকে বোঝাতে হবে এবং যতক্ষণ সে আপনার কথা না মানবে ততক্ষণই বকে যেতে হবে। ভেবে দেখুন, আমি সব সময় সৎ পথে থেকে কাজ করি, ভাল জিনিস নিয়ে কাজ করি। লাখ লাখ টাকা দিলেও আমি কদাচ নকল বা বাজে জিনিসের কারবার করি না। যেখানে খুশি খোঁজ করবেন—পশম বা হোসিয়ারির যে কোন দোকানেঃ 'ময়র'-এ খোঁজ নেবেন, আমি তাদেরও প্রতিনিধি—বা যারা বোতামের ব্যবসা করেঃ যেমন 'হেলিয়োস'। তাদের জিজ্ঞাসা করবেন সেমিয়ন ইয়াকভ্‌লেভিচ গরিজন্ত কে, সর্বত্র একই জবাব পাবেন—সেমিয়ন ইয়াকভ্‌লেভিচ শুধু একটি মানুষ নয়—সে নিখাদ সোনা; সে শুধু নিজের সুবিধা খোঁজে না, সে হীরের মত মানুষ।" কথা বলতে বলতেই সে নানা রকম বাক্স খুলে 'সাসপেণ্ডার' দেখাতে লাগল, আর সারি সারি নানা রঙের বোতাম বসানো ঝকঝকে কার্ড চোখের সামনে মেলে ধরল।

আধ ঘণ্টা পরে সেমিয়ন ইয়াকভ্‌লেভিচ ও লেফ্‌টেন্যাণ্ট গাড়ির প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ধূমপান করছিল।

গরিজন্ত জিজ্ঞাসা করল, "লেফ্‌টেন্যাণ্ট, আপনি কি প্রায়ই কে-তে আসেন?"

"না, এই প্রথম যাচ্ছি, ভাবুন! আমাদের রেজিমেণ্টের ঘাঁটি চের্ণবব-এ। আমি আসছি মস্কো থেকে।"

"আই, আই, আই! বাড়ি থেকে এত দূরে চলে গেলেন কেন?"

"যেতে, হল। সামরিক স্কুল থেকে পাশ করবার পরে ঐ একটি মাত্র রেজিমেণ্টেই কাজ পেলাম।"

"কিন্তু চের্ণবব শহর—সেটা যে দেয়ালের গর্তের মত, সারা পদোলিয়া-র মধ্যে সব চাইতে খারাপ ছোট্ট শহর।"

"তা ঠিক, কিন্তু কোন উপায় ছিল না।"

"তাহলে তরুণ লেফ্‌টেন্যাণ্ট এখন কে-তে যাচ্ছেন ফূর্তি করতে?"

"হ্যাঁ, দু'তিন দিন সেখানে থাকবার ইচ্ছা আছে। মস্কোতেই ফিরে যাচ্ছি। আমার দু'মাসের ছুটি আছে। তাই ভাবছি ওখানে নেমে শহরটা দেখে যাব। শুনেছি জায়গাটা খুব সুন্দর।"

"আমিও তাই বলি! অপূর্ব শহর! সত্যিকারের ইওরোপীয় শহর! চওড়া রাস্তা, বিদ্যুৎ, মোটর গাড়ি, প্রথম শ্রেণীর থিয়েটার! নাইট-ক্লাব! আপনার ভাল লাগবে, খুব ভাল লাগবে! শাতু দ্য ফ্লর্স-এ এবং তিভোলি-তে অবশ্য যাবেন, এবং একবার দ্বীপ থেকে ঘুরে আসতে ভুলবেন না। ওটা একটা বিশেষ জায়গা, সাধারণ নয়। আর মেয়েমানুষ, আঃ, কী সব মেয়েমানুষ!"

তরুণ অফিসারটির মুখ লাল হয়ে উঠল ; মুখ ঘুরিয়ে ঈষৎ কাঁপা গলায় সে বলল : হ্যাঁ, আমিও সে কথা শুনেছি। তারা কি সত্যি এত সুন্দরী!"

"হেই। মরণ আমার! তবে এ-কথাও বলি, সেখানকার মেয়েরা মোটেই সুন্দরী নয়।"

"কি বলছেন?"

"বলছি, শুধু সুন্দরী নয়, তারা সৌন্দর্যের প্রতীক। পোল্যাণ্ড, ইউক্রেনিয়া ও ইহুদি—এই তিন রক্ত একত্রে মিশলে যা হয় তারা তাই। হে যুবক, আপনাকে আমার ঈর্ষা হচ্ছে! আমার কালে হলে একবার দেখতাম! এই মেয়েরা যে কত আবেগময়ী সে এক বিস্ময়! যেন আগুন! আর সেটা কি বস্তু জানেন?" অর্থপূর্ণ নীচু গলায় সে প্রশ্নটি করল।

"কি?" ভীত লেফ্‌টেন্যাণ্ট পাণ্টা প্রশ্ন করল।

"আসল কথা হল, কি প্যারিস, কি লণ্ডন কোন স্থানেই এমন সূক্ষ্ম প্রেম-কলা আপনি পাবেন না! আমার কথা বিশ্বাস করুন, দূরবিস্তার জগৎটা যারা দেখেছে এমন লোকের মুখে এ কথা আমি শুনেছি। ওটা সত্যি একটা বিশেষ ব্যাপার। এমন সব ছলা-কলা তারা জানে যার কথা আপনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না···আপনাকে একেবারে পাগলা করে ছেড়ে দেবে।"

দম বন্ধ করে নীচু গলায় লেফটেন্যাণ্ট বলল, "তা কি সম্ভব?"

"হেই, মরণ আমার! ভাল কথা, যুবক···আমি বলি···বুঝতেই পারছেন এতদিন আমি অবিবাহিতই ছিলাম, আর প্রত্যেক মানুষই তো পাপী···এখন তো দিন পাল্টে গেছে। আমি তো বুড়োদের দলে ভিড়ে গেছি। কিন্তু সেই সব অতীত সুখের দিনের স্মৃতি হিসাবে কিছু আশ্চর্য সংগ্রহ আমার কাছে আছে। দাঁড়ান, আপনাকে দেখাচ্ছি। দয়া করে দেখবার সময় খুব সাবধান থাকবেন।"

গরিজন্ত সতর্ক দৃষ্টিতে প্রথমে ডাইনে, পরে বাঁয়ে তাকাল ; তারপর একটা সরু লম্বা মরোক্কো-বাক্স পকেট থেকে বের করল—যে ধরনের বাক্সে সাধারণত তাস রাখা হয়। বাক্সটা সে অফিসারের হাতে দিল।

"এই নিন··দেখুন···কিন্তু খুব সাবধান।"

লেফ্‌টেন্যাণ্ট কালো ও রঙিন ফটোগ্রাফগুলো দেখতে লাগল। প্রেমের বহিরঙ্গের যে সব অবিশ্বাস্য ও বিকৃত রূপ মানুষকে বেবুন-এর চাইতে হাজার গুণ ঘৃণ্য করে তোলে তার যত রকম সম্ভব আর যত রকম কল্পনা করা যায় তত

রকম বিচিত্র সব ভঙ্গির ছবি সেখানে রয়েছে। গরিজন্ত তার ঘাড়ের উপর দিয়ে উঁকি মেরে মাঝে মাঝেই তাকে কনুই দিয়ে গুঁতো মেরে কানে কানে বলতে লাগল :

"কি বলেন, খুব ঝলমলে ব্যাপার নয়! নিশ্চয় প্যারিস ও ভিয়েনার মতই।"

লেফ্‌টেন্যাণ্ট ছবিগুলি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখল। ছোট বাক্সটা ফেরৎ দেবার সময় তার হাতটা কাঁপছে, মাথা ও কপাল ভিজে উঠেছে, চোখ ঝাপসা লাগছে, আর সারা মুখ লাল হয়ে উঠেছে।

খুশির চোটে গরিজন্ত হঠাৎ বলে উঠল, "এগুলো আপনাকে কেন দেখালাম জানেন? আমার কাছে তো এগুলোর আর কোন দাম নেই। আমার হাতে-পায়ে তো শিকল উঠেছে। সেকালের লোকের কথায় বললে, আমার সেতু আমি নিজের হাতেই পুড়িয়ে দিয়েছি। তাই কিছুদিন হল কার্ডগুলো হস্তান্তর করবার সুযোগ খুঁজছি···দামটা বড় কথা নয়···আমি যা দিয়ে কিনেছি তার অর্ধেক পেলেও চলে···মিঃ লেফ্‌টেন্যাণ্ট, আপনি কি ওগুলো সংগ্রহ করতে চান?"

"সেকি···আমি···মানে·· নাই বা কেন? ঠিক আছে!"

"চমৎকার। আপনার সঙ্গে পরিচয়ের খুশিতে আমি কার্ড প্রতি পঞ্চাশ কোপেক নেব! কি?···বড় বেশী হল? ঠিক আছে। ঈশ্বর আপনার ভাল করুন। আপনাকে ঠকাতে চাই না বলেই কার্ড প্রতি ত্রিশ কোপেক দামেই আপনাকে দিচ্ছি। কি, এখনও বেশী হচ্ছে? বেশ, আপনার কথাই থাক, হাত ধরুন—পঁচিশ কোপেকই হল। হেই! আপনি তো ভারি একগুঁয়ে লোক! ঠিক আছে, কুড়ি! পরে আমার কথা আপনার মনে পড়বে। আর একটা কথা। যখনই কে-তে যাই, আমি হার্মিটেজ হোটেলে-ই উঠি। আমাকে সেখানে পাবেন হয় খুব সকালে আর না হয় সন্ধ্যায় আটটা নাগাদ। অনেক সুন্দরী তরুণীকে আমি চিনি···আপনাকে তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব। মনে রাখবেন, সেজন্য আপনাকে কিছু খরচ করতে হবে না। আপনার মত একজন সুন্দর, স্বাস্থ্যবান যুবকের সঙ্গে কিছু সময় কাটাতে পারলেই তারা খুশি হবে। টাকার কোন কথাই নেই! এমন কি তারাই খুশি হয়ে মদ বা শ্যাম্পেনের দামটাও দিয়ে দেবে। কাজেই মনে রাখবেন, হার্মিটেজ! গরিজন্ত! সে সব ব্যাপারে যদি আগ্রহী নাও হন তাহলেও নাম-ঠিকানাটা স্মরণ রাখবেন। অন্য ভাবেও আপনার কোন কাজে লাগতে পারি। আর ওই কার্ডের ব্যাপারে···ওগুলোর বাজার সব সময়ই আছে। ওসব জিনিস যারা ভালবাসে তারা কার্ডপ্রতি তিন রুবল দিতেও রাজী হবে। অবশ্য তারা সকলেই ধনী লোক, বৃদ্ধ লোক। কিন্তু এও তো জানেন," অফিসারের কানের কাছে নীচু হয়ে চোখ ঠেরে গরিজন্ত চুপি চুপি বলল, "এমন অনেক মেয়ে আছে যারা এ ধরনের ফটোকে পুজো করে। আপনি যুবক, অনেক প্রেমের সুযোগ

আপনার হবে।"

টাকাটা ভাল করে গুণে পকেটস্থ করে গরিজন্ত লেফ্‌টেন্যান্টের সঙ্গে কর-মর্দন করল; সে কিন্তু লজ্জায় তার দিকে তাকাতেও পারল না। গাড়ির প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে গরিজন্ত এমনভাবে তার কামরায় ফিরে গেল যেন কিছুই হয়নি।

চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে গরিজন্ত বেশ কয়েকবার ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীর অংশটায় যাতায়াত করল। তৃতীয় শ্রেণীর দুটো কামরা ট্রেনের একেবারে দুই প্রান্তে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। তারই একটা কামরায় একটি কালো দাড়িওয়ালা বিষণ্ণ চুপচাপ লোকের সঙ্গে তিনটি সুন্দরী স্ত্রীলোক বসে ছিল। দুর্বোধ্য ভাষায় গরিজন্ত লোকটির সঙ্গে অল্প কিছু বাক্য-বিনিময় করল। স্ত্রীলোকরা সাগ্রহে তার দিকে তাকিয়েছে, যেন কিছু বলতেও চেয়েছে, কিন্তু সাহস পায় নি। শুধু দুপুরের দিকে মাত্র একবার তাদের মধ্যে একজন সাহস করে বলেছিল, "কথাটা ঠিক তো? সে জায়গাটা সম্পর্কে আপনি যা বলেছিলেন? বুঝতেই পারছেন, আমরা কিছুটা অস্বস্তি…"

"আ! তোমার হল কি মার্গারিতা আইভানভ্‌না। আমি যা বলেছি সেটা ন্যাশন্যাল ব্যাংক-এর বিবৃতির মতই মোক্ষম। লেজার শোন," সে দাড়িওয়ালা লোকটির দিকে ফিরে বলল, "এক মিনিটের মধ্যেই আমরা একটা স্টেশনে পৌঁছব। সেখানে নেমে মেয়েরা যত স্যাণ্ডুইচ চায় কিনে দিও। ট্রেনটা পঁচিশ মিনিট দাঁড়াবে।"

পাকা গমের মত চুল আর ভুট্টার মত চোখ সুশ্রী মেয়েটি বলল, "আমি কিছুটা ঝোল চাই।"

"যা তোমার ইচ্ছা বেলা, তাই পাবে! স্টেশনের বুফে-তে গিয়ে আমি তোমার জন্য মাংসের ঝোলের অর্ডার দেব; এমন কি কিছু পিরোস্কিও। তোমার যাবার দরকার নেই লেজার। আমি নিজেই সব ব্যবস্থা করব।"

তৃতীয় শ্রেণীর অপর কামরায় গরিজন্ত মেয়েদের একেবারে মেলা বসিয়ে দিয়েছে; প্রায় জন বারো; তাদের দেখাশুনা করছে হিংস্রদর্শন, ঘন কালো ভুরুওয়ালী একটা মোটা থলথলে বুড়ি। চাপা গলায় সে কথা বলে। ট্রেনের দোলানিতে তার মোটা থুতনি, বুক ও তলপেটের ভাঁজগুলি আপেলের জেলির মত তালে তালে নাচছে। কি বুড়িটা আর কি ছুঁড়িটা, কারও ব্যবসা সম্পর্কেই বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই।

বেঞ্চির উপর শরীর এলিয়ে দিয়ে মেয়েগুলি ধূমপান করছে, তাস খেলছে আর বীয়ার গিলছে। গাড়ির অন্য লোকরা মাঝে মাঝেই তাদের জ্বালাতন করছে, আর তারাও তাদের কর্কশ গলায় পাল্টা শাপ-শাপান্ত করছে। যুবকরা তাদের মদ খাওয়াচ্ছে, সিগারেট দিচ্ছে।

এখানে গরিজন্ত-এর সম্পূর্ণ ভিন্ন চেহারা: তার ব্যবহারে সাময়িক মর্যাদা

ফুটে উঠছে, কথাবার্তায় সদয় করুণার আভাষ। রুমানিয়াবাসিনী, ইহুদিনী, পোল্যাণ্ডবাসিনী ও রাশিয়াবাসিনীদের এই বিচিত্র মেলার উপর ভাল করে চোখ বুলিয়ে এবং সব কিছুই যে ঠিক আছে, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে গরিজন্ত তাদের জন্যও স্যাণ্ডুইচের অর্ডার দিয়ে গটগট করে সেখান থেকে চলে গেল। দেখাশোনার কাজ শেষ হলে সে আবার নিজের কামরায় ফিরে গিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে ছেলেমানুষি খেলা শুরু করে দিল এবং গল্পের ছালা খুলে বসল—তার মুখ থেকে রসাল কাহিনীগুলি যেন আলুর মত গড়গড় করে বের হতে লাগল। যে সব স্টেশনে ট্রেনটা বেশীক্ষণ দাঁড়ায় সেখানেই নেমে বুফোতে গিয়ে সে মহিলা মক্কেলদের জন্য অর্ডার দিতে দিতে চলল।

দূরের আকাশে অস্ত-সূর্যের গোলাপি উজ্জ্বলতার পশ্চাৎপটের উপর শহরের সোনালি গম্বুজ ও ক্রুশ-চিহ্নগুলি ঝলমল করছে। পাহাড়ের উপরে মনোহর সাদা গীর্জাগুলি যেন পরীদের দেশের বিচিত্র মরীচিকার মধ্যে ভাসছে। কোঁকড়ানো পাতাসমেত সুন্দর গাছের সারি ও ঝোপ-ঝাড় পাহাড়ের বুক বেয়ে নেমে গেছে; কোথাও বা খাদের উপর ঝুলে রয়েছে। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ছোট ছোট গাছের সারি নেমে গেছে; দেখলে মনে হয় যেন পাহাড়ের শিরা-উপশিরা ও আঁচিল। মনে হচ্ছে, আশ্চর্য সুন্দর প্রাচীন শহরটা বুঝি ট্রেনটাকে স্বাগত জানাতে এগিয়ে আসছে।

ট্রেনটা থামলে গরিজন্ত সব মালপত্র প্রথম শ্রেণীর প্রতীক্ষালয়ে নিয়ে যেতে কুলীদের হুকুম করল এবং তার স্ত্রীকে বলল তাদের সঙ্গে যেতে। কিন্তু সঙ্গের দুই দল মেয়ে চলে না যাওয়া পর্যন্ত সে দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে রইল। বারোটি মেয়ের তত্ত্বাবধায়িকা বুড়িকে সে বলল:

"মনে রেখ, মাদাম বারম্যান—হোটেল আমেরিকা, আইভানভস্কয়া স্ট্রীট, বাইশ নম্বর।"

আর লেজারকে নির্দেশ দিল:

"মেয়েদের ভাল ভোজনের ব্যবস্থা করতে ভুলো না; তারপর তাদের সিনেমায় নিয়ে যেয়ো। আজ রাত দশটায় আমার জন্য অপেক্ষা করো, কথা আছে। যদি কারও জরুরী দরকার হয়, আমার ঠিকানা তো জানই—দি হার্মিটেজ। টেলিফোনে ডেকো। যদি সেখানে না থাকি, তাহলে রীম্যান'স কাফে বা উল্টোদিকের রেস্তোরাঁতে খোঁজ করো। আমি সেখানেই খেতে যাব।"

২

ব্যবসায়িক ভ্রমণ সম্পর্কে গরিজন্ত যত গল্প বলেছে সবই তাহা মিথ্যা। পশমী কাপড়, হোসিয়ারী, বোতাম ইত্যাদির যত সব নমুনা সে দেখিয়েছে সবই তার আসলে ব্যবসার মুখোশ মাত্র—সে ব্যবসা শ্বেত-দাসত্ব। এ কথা ঠিক যে দশ বছর আগে কোন অজ্ঞাত ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের চোরাই মদ বিক্রির ব্যাপারে সে সারা রাশিয়া ঘুরে বেড়িয়েছে এবং সেই কাজ উপলক্ষ্যেই ভ্রাম্যমান বেচনদারদের মত সহজ ও স্বাভাবিক বাকপটুত্ব সে ভালভাবেই অর্জন করেছে। আগেকার সেই কাজ-কারবার থেকেই বর্তমান ব্যবসার হদিশ সে পেয়েছিল। একবার রস্তভ-অন-ডন যাবার পথে একটি তরুণী দর্জি তার প্রেমে পড়ে, আর সে তার সঙ্গে ফষ্টি-নষ্টি চালাতে থাকে। যদিও তখনও তার নাম সরকারীভাবে পুলিশের কাছে পতিতা হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হয় নি, তবু নিজের ভালবাসা ও দেহ সম্পর্কে মেয়েটির কোন বড় রকমের সংস্কার ছিল না। গরিজন্ত তখন অনভিজ্ঞ প্রেমিক, হাল্কা-স্বভাবের যুবক। মেয়েটিকে সে তার অজানা যাত্রা-পথের সঙ্গী করে নিয়ে গেল। কিন্তু দু মাস পরেই দর্জি-মেয়েটি তার কাছে ক্লান্তিকর হয়ে উঠল। একটা ভারী পাথরের মত সে এই উদ্যমশীল কর্মঠ যুবকটির গলায় ঝুলে রইল। তার সঙ্গে যুক্ত হল ঈর্ষা, চোখের জল, অবিশ্বাস, সন্দেহের মিছিল······বেশ কিছুদিন এক সঙ্গে থাকার অনিবার্য ফল। ক্রমে ক্রমে সে তাকে মারধোর করতে শুরু করল। মেয়েটি প্রথমে বিস্মিত হল, তারপর সে সব কিছু মেনে নিল। এটা তো জানা কথা যে "ভালবাসার মেয়েমানুষরা" প্রেমের ব্যাপারে মাঝামাঝি কিছু বোঝে না। হয় তারা হয়ে ওঠে মিথ্যাবাদী, ভণ্ড, প্রতারক; তাদের মন হয় বিকৃত, আত্মা হয় অন্ধকারের জীব; আর না হয় তো নিজেদের সম্পূর্ণ বিকিয়ে দেয়, অন্ধের মত অনুরাগিনী হয়, সরল ও বোকা জন্তুর মত সব কিছুকেই মেনে নেয়, নিজেদের অধঃপতনের একেবারে শেষ ধাপে নামিয়ে নেয়। মেয়েটি ছিল এই দ্বিতীয় শ্রেণীর, আর তাই উপার্জনের জন্য তাকে পথে নামিয়ে দিতে গরিজন্ত-এর কোন অসুবিধাই হয় নি। আর সেদিন রাতে প্রেমিকাটি যখন তারই ব্যবস্থামত প্রথম পাঁচটি রুবল কামিয়ে ঘরে ফিরল তখন থেকেই তার প্রতি গরিজন্ত-এর বিতৃষ্ণা সীমাহীন হয়ে উঠল। আরও উল্লেখযোগ্য যে, সেই দিন থেকে যত মেয়েমানুষের সঙ্গেই গরিজন্ত-এর দেখা হোক না কেন—আর তার হাত দিয়ে অমন কয়েক শ' মেয়ে পার হয়ে গেছে—সেই বিতৃষ্ণা ও পুরুষোচিত ঘৃণা গরিজন্ত-এর মন থেকে কখনও দূর হয় নি। কাজেই গরিজন্ত মেয়েটিকে যন্ত্রণা দিতে, বিদ্রূপ করতে, ও আঘাত করতে এতটুকু কসুর করত না। মেয়েটি চুপ করে থাকত, নিঃশ্বাস ফেলত, কাঁদত, তার পায়ে ধরত, তার হাতে চুমু খেত। এই নীরব আত্ম-নিবেদনের ফলে লোকটি আরও বিরক্ত হয়ে উঠত। সে তাকে তাড়িয়ে দিত। কিন্তু মেয়েটি তবু নড়ত না। তখন

সে তাকে ধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দিত, আর ঘণ্টা কয়েক পরে সে যখন ফিরে আসত তখন বৃষ্টির জলে তার টুপি ভিজে গেছে, সে ঠাণ্ডায় কাঁপছে। শেষ পর্যন্ত একটি স্বাভাবিক পরিস্থিতিকে মোক্ষম পরামর্শটি দিল—তার প্রেমিকাটিকে কোন পতিতালয়ে বেচে দেওয়া হোক।

গরিজন্ত প্রথমে ভাবতে পারে নি যে, এই নতুন কর্মক্ষেত্রে সে সাফল্য অর্জন করতে পারবে। কিন্তু তার আশংকাকে মিথ্যা প্রমাণ করে ব্যবসাটি বেশ জমাও হয়ে উঠল। পতিতালয়ের মালকিনটি (সেটা ছিল খারকভ-এ) সেমিয়ন ইয়াকভ্লেভিচকে ভালভাবেই চিনত। কাজেই সহজেই সে তার প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেল। কিন্তু মুস্কিল হল মেয়েটিকে নিয়ে। সে কিছুতেই প্রেমিককে ছেড়ে যেতে রাজী হল না, বরং ভয় দেখাল যে সে আত্মহত্যা করবে, ভিট্রিয়ল দিয়ে গরিজন্ত-এর চোখ পুড়িয়ে দেবে, এমন কি তার বিরুদ্ধে পুলিশের বড় কর্তার কাছে নালিশ করবে। অগত্যা গরিজন্ত অন্য পথ ধরল—সে আবার উৎসাহী, অনুরাগী প্রেমিক হয়ে উঠল। হঠাৎ সে ভীষণ মন-মরা হয়ে পড়ল। মেয়েটির কোন প্রশ্নের জবাব পর্যন্ত দিত না। তারই ফাঁকে একদিন কথা প্রসঙ্গে সে ইঙ্গিতে জানিয়ে দিল যে, এক সময়ে সে একটা মস্ত বড় ভুল করেছিল, আর তারই ফলে পুলিশ তাকে খুঁজছে; ধরা পড়লে তার জেল তো হবেই, এমন কি ফাঁসি পর্যন্ত হতে পারে। কাজেই কিছুদিনের জন্য তাকে বাইরে কোথাও গিয়ে লুকিয়ে থাকতে হবে; তবে তার এই বাইরে যাবার প্রধান কারণ হল, সেখানে সে এমন একটা ব্যবসার সন্ধান পেয়েছে যাতে তার হাজার হাজার রুবল উপার্জন হবে। মেয়েটি তার কথায় বিশ্বাস করল, প্রেমিকের জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল। এর পরে তাকে একথা বোঝানো মোটেই কঠিন হল না যে মেয়েটি সঙ্গে থাকলেই গরিজন্ত-এর বিপদ বাড়বে, কাজেই অবস্থা একটু ভালর দিকে মোড় না নেওয়া পর্যন্ত তার পক্ষে এখানে কোথাও অপেক্ষা করে থাকাই ভাল। তখন তাকে খুব সহজেই বোঝানো হল যে কোন পতিতালয়ে লুকিয়ে থাকাই তার পক্ষে সব চাইতে সুবিধাজনক, কারণ সেখানে পুলিশ ও গোয়েন্দা তার পিছনে লাগতে পারবে না। তখন গরিজন্ত তাকে এক বন্ধুর আস্তানায় নিয়ে গেল এবং সেখান থেকে তার পাশপোর্ট বদলে থানা থেকে একটা হলুদ টিকিট করিয়ে আনা হল। চোখের জলে বুক ভিজিয়ে প্রিয়াকে অনেকক্ষণ আলিঙ্গনে জড়িয়ে রেখে গরিজন্ত তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পতিতালয়ের মালকিনের ঘরে গেল এবং পঞ্চাশটি রুবল গুণে নিল (সে দু'শ রুবল চেয়েছিল)। কিন্তু এত অল্প দাম পেলেও সে মন খারাপ করল না, কারণ শেষ পর্যন্ত এই তো সে পথ খুঁজে পেয়েছে, তার ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির গোড়াপত্তন করতে পেরেছে।

একথা বলাই বাহুল্য যে সেই বিক্রিত মেয়েটি চিরদিনের মত পতিতালয়ের মুঠোয় আটকা পড়ে গেল। গরিজন্ত তাকে সম্পূর্ণ ভুলে গেল,—এক বছর

পরে তার মুখটা পর্যন্ত যে মনে করতে পারত না। কে জানে···হয়তো সেটাও তার ভণ্ডামি।

সে দক্ষিণ রাশিয়ার একজন প্রধান নারী-ব্যবসায়ী হয়ে উঠল। কনস্তান্তিনোপল ও আর্জেন্টিনার সঙ্গে তার ব্যবসায়িক লেন-দেন গড়ে উঠল। ওডেসার পতিতালয়গুলো থেকে সে দলে দলে মেয়েদের জাহাজে করে কিয়েভ-এ পাঠাত; কিয়েভ থেকে খারকভ-এ; আবার খারকভ থেকে মেয়েদের আনা হত ওডেসায়। তার তখন অনেক বড় বড় মক্কেল জুটেছে—তাদের মধ্যে লেফ্‌টেন্যাণ্ট-গভর্ণররা আছে, সেনাবাহিনীর কর্ণেলরা আছে, সফল উকিলবাবুরা আছে, খ্যাতিমান ডাক্তাররা আছে, ধনী-জমিদাররা আছে, মোটা ব্যবসায়ীরা আছে। এই ব্যবসায়ে নেমে দু তিনবার তার জেলও হয়েছে; কিন্তু তাতে তার ভ্রূক্ষেপ নেই; বরং জেলে যাবার ফলে সে যেন আরও উৎসাহী, আরও কাজের মানুষ হয়ে উঠেছে। যতদিন গেছে ততই তার ব্যবসায়িক দক্ষতা ক্ষুরধার হয়েছে।

এই সময়ে অন্তত পনেরো বার সে বিয়ে করেছে, আর প্রতিবারেই প্রচুর যৌতুক নিয়েছে। কিন্তু স্ত্রীর টাকা-পয়সা হাতিয়ে নেবার পরে হঠাৎ সে বেমালুম উধাও হয়ে গেছে, অথবা সম্ভব হলে স্ত্রীকে হয় কোন গোপন আড্ডায় নয় তো কোন বড় দরের পতিতালয়ে বিক্রি করে দিয়েছে। কখনও কখনও সেই সব মেয়েদের বাপ-মা পুলিশ দিয়ে তার অনুসন্ধানও করেছে। কিন্তু একটি নামে পুলিশ যখন তাকে সর্বত্র খুঁজে বেড়াচ্ছে সে হয়তো তখন অন্য একটা নাম নিয়ে এ-শহর সে-শহর করে বেড়াচ্ছে। এইভাবে এতবার এত নাম সে পাল্টেছে যে নিজেই সে সব ভুলে গেছে, - কোন্ বছর যে তার নাম ছিল ন্যাথেনিয়েলসন, আর কোন্ বছর ছিল বাকাল্‌য়ার তা সে নিজেই মনে করতে পারে না। এক সময়ে তার মনে হত, তার আসল নামটাও বুঝি ছদ্মনাম।

একটা কথা উল্লেখযোগ্য যে এই ব্যবসাকে সে অপরাধ বা পাপ বলে মনে করত না। সে মনে করত, ময়দা, গোমাংস, হেরিং মাছ, চুণ বা কাঠের ব্যবসার মত এও একটা ব্যবসামাত্র। সে আবার ধর্মপ্রাণ লোকও বটে। সময় পেলেই সে গীর্জায় প্রার্থনা করতে যেত। যখন যেখানেই থাকুক, সব পবিত্র দিনগুলি পালন করত। ওডেসাতে তার মা ছিল, একটি কুঁজো বোন ছিল; কখনও তাদের টাকা পাঠাতে তার ভুল হত না; যখন যে শহরে থাকত সেখান থেকেই কখনও মোটা টাকা, কখনও বা অল্প টাকা তাদের পাঠিয়ে দিত।

সে পরিমিত মদ খেত, তাও একা থাকলে কখনও খেত না। খাওয়ার ব্যাপারে সে খুবই উদাসীন। তবে ভাল পোষাক পরতে সে ভালবাসত, এবং সেজন্য প্রচুর অর্থও ব্যয় করত। কেতাদুরস্ত নানা রকমের কলার, টাই, হীরে-

বসানো কফ্-লিংক, ঘড়ি-চেন, সুন্দর তলবাস ও ভাল জুতো পরতে ভালবাসত।

স্টেশন থেকে গরিজন্ত সোজা দি হার্মিটেজ-এ চলে গেল। নীল কুর্তা ও একই রকমের টুপি-পরা হোটেলের কুলিরা তা'র মালপত্র নিয়ে বাইরের ঘরে তুলল। সুদৃশ্য পোষাকে সজ্জিত হয়ে সুদর্শন চেহারার স্ত্রীর হাত ধরে সেও ভিতরে ঢুকল। পরণে ঘণ্টাকৃতি ইংলিশ ওভারকোট, মাথায় নতুন পানামা হ্যাট, আর হাতে উলঙ্গ নারী-মূর্তি খোদিত রূপো-বাঁধানো ছোট বেতের ছড়ি—সত্যি তাকে অপূর্ব দেখাচ্ছিল।

প্রকাণ্ড দেহ, মোটা দরোয়ানটি নির্বিকার মুখে বলল, "বসবাসের অনুমতি-পত্র ছাড়া আপনার নাম রেজিস্ট্রি ভুক্ত করা যাবে বলে তো মনে হয় না।"

"আঃ, জাখার! আবার সেই 'মনে তো হয় না!' তার উঁচু কাঁধটা চাপড়ে দিয়ে গরিজন্ত বলে উঠল, "এই 'মনে তো হয় না'-র মানে কি? যখনই এখানে আসি তোমার মুখে ঐ এক কথা 'মনে তো হয় না।' মাত্র তিনটে দিন আমি এখানে থাকব। শয়তান তোমাকে ভর করুক! তাতে আমার কি! তারপরে সব ঘর তো তোমারই থাকবে। ভাল কথা, চেয়ে দেখ জাখার, তোমার জন্য ওডেসা থেকে এই খেলনাটা এনেছি। দেখলেই তোমার মুখ লাল হয়ে উঠবে।"

অভ্যস্ত ভঙ্গীতে সে একটি স্বর্ণ-মুদ্রা দরোয়ানের হাতে গুঁজে দিয়ে ছোট নৌকোর মত ভাসতে ভাসতে ভিতরে ঢুকে গেল।

৩

গরিজন্ত তিন দিন সেই হোটেলে থাকল এবং সেই সময় অন্তত তিনশ' লোকের সঙ্গে দেখা করল। তার আগমনে বড় সমুদ্র-বন্দরটিতে যেন নতুন জীবনের ছোঁয়া লেগেছে। যে সব কর্ম-সংস্থান প্রতিষ্ঠান গৃহস্থালির কাজের সহায়কদের নিয়ে কারবার করে তাদের পরিচালিকারা তার সঙ্গে দেখা করতে এল; এল লজিং-হাউসের মালকিনরা; ব্যবসায়ে চুল-পাকানো বহুদর্শী বুড়ি কোটনিরাও এল। লোভ অপেক্ষা ব্যবসায়িক গর্বের খাতিরেই গরিজন্ত চূড়ান্ত দরাদরি করে শতকরা বেশী হারে কমিশন আদায় করতে অথবা সস্তায় মেয়ে-মানুষ কিনতে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগল। অবশ্য দশ বা পনেরো রুবল কম-বেশীতে তার কিছু যায় আসে না, কিন্তু তার প্রতিদ্বন্দ্বী ইয়াম্পলস্কি অপেক্ষাকৃত বেশী দামে মাল বেচবে এই চিন্তাই তাকে ক্ষেপিয়ে তোলে।

পৌঁছবার পরদিনই সুন্দরী বেলাকে সঙ্গে নিয়ে সে ফটোগ্রাফার মেজের-এর কাছে গেল। তাকে নিয়ে নানান ভঙ্গীতে ফটো তুলল। প্রতিটি নিগেটিভের জন্য সে পেল পাঁচ রুবল করে, আর বেলা-কে দিল মাত্র এক রুবল করে; মোট কুড়িখানা ফটো তোলা হল। তারপর সে রাক্সকোভার সঙ্গে দেখা

করতে গেল।

সে একজন অবসরপ্রাপ্ত বেশ্যা—এ ধরনের মেয়েমানুষ একমাত্র রাশিয়ার দক্ষিণ অঞ্চলেই পাওয়া যায়: কতক পোল্যাণ্ডের, আর কতক ইউক্রেনিয়ার অধিবাসী। যথেষ্ট বয়স হলেও প্রচুর টাকার জোরে তারা একটি করে সুদর্শন পোলিশ যুবককে স্বামী হিসাবে পোষে (এবং একটি নাইট-ক্লাবও চালায়)। গরিজন্ত ও বারুস্‌কোভা পুরনো বন্ধুর মতই মিলিত হল।

"মাদাম বারুস্‌কোভা, আপনার জন্য বিশেষ উপহার নিয়েই আমি এসেছি। তিনটি মেয়ে আমি এনেছি—একটি বড়সড় পিঙ্গলবর্ণা কামিনী; আর একটি ছোটখাট নীলনয়না সুন্দরী, তাকে আপনি সব কাজে লাগাতে পারবেন; আর তৃতীয়টি রহস্যময়ী। সে শুধু হাসে, একটি কথাও বলে না, কিন্তু তাতেই কত কথাই না বলে। আর অপরূপ সুন্দরীও!"

বারুস্‌কোভা তার দিকে তাকিয়ে অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে মাথা নাড়তে লাগল।

"আরে, মিঃ গরিজন্ত! আপনি কি আমাকে বোকা বানাতে চাইছেন? গত বারের মত এবারও কি সেই একই চেষ্টা করছেন?"

"ঈশ্বরের দিব্যি, প্রাণ থাকতে আপনাকে ঠকাব না! আসল কথা হল, একটি শিক্ষিতা মেয়েও আপনাকে দিতে চাই। তাকে দিয়ে আপনি যা ইচ্ছা তাই করাতে পারবেন। আমি নিশ্চিত করে বলছি, সে একজন শিল্প-রসিক···"

তীক্ষ্ণকণ্ঠে হেসে উঠে বারুস্‌কোভা বলল, "আবার একটি স্ত্রী?"

"না, কিন্তু সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়ে।"

"তার মানেই আবার পুলিশী হাঙ্গামা।"

"হায় ভগবান, তাদের জন্য যে আমি অনেক টাকা চাইছি তাও নয়—চার জনের জন্য কুল্লে এক হাজার রুবল।"

"খোলাখুলি কথা হোক—পাঁচশ'। আমি দর-দাম পছন্দ করি না।"

"দেখুন মাদাম বারুস্‌কোভা, আপনার সঙ্গে এই প্রথম লেন-দেন হচ্ছে না। আপনাকে ঠকাব না। তাকে এখানে হাজির করে দিচ্ছি, তারপর শুধু মনে রাখবেন যে আপনি আমার মাসি, আর দয়া করে সেই ভাবেই কাজ করবেন। তিন দিন আমি এ শহরে আছি।"

বারুস্‌কোভা প্রাণ খুলে হাসতে লাগল। সে-হাসিতে তার থুত্‌নি, বুক ও পেট প্রচণ্ডভাবে ফুলতে লাগল।

"ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে দামাদামির কোন মানে হয় না। আমি আপনাকে ঠকাব না, আপনিও আমাকে ঠকাবেন না। মেয়েমানুষের এখন খুব কদর। মিঃ গরিজন্ত, এক গ্লাস মদ দিলে কি আপত্তি আছে?"

"ধন্যবাদ মাদাম বারুস্‌কোভা, কোন আপত্তি নেই।"

"আসুন। আমরা তো পুরনো বন্ধু। বছরে কি রকম হয়?"

"আঃ, মাদাম, ঠিক কেমন করে বলি···বারো হাজার, বিশ, বা ঐ রকম।"

কিন্তু ভেবে দেখুন যাতায়াতের খরচটা কত বেশী করতে হয়।"

"কিছু বাঁচে তো?"

"সামান্য···বছরে মাত্র দু'তিন হাজার।"

"আমি ভেবেছিলাম হয়তো দশ, বিশ···"

গরিজন্ত সতর্ক হল। মনে হল, তার কাছ থেকে কথা বের করবার চেষ্টা হচ্ছে। বলল, "এ বিষয়ে আপনার আগ্রহ কেন?"

বারুস্‌কোভা ঘণ্টাটা টিপল। একটি সুন্দর-দেখতে দাসী এলে তাকে ঘন মাখন দেওয়া কফি ও এক বোতল "চেম্বার্তিন" আনতে বলল। গরিজন্ত-এর পছন্দ সে জানে। তারপর বলল, "মিঃ শেপ্‌শেরোভিচ্‌কে চেনেন তো?"

গরিজন্ত প্রায় আর্তনাদ করে উঠল:

"হা ঈশ্বর! শেপ্‌শেরোভিচ্‌কে কে না চেনে! সে তো দেবতা, একটা প্রতিভা!"

অতি-উৎসাহে তার জন্য যে ফাঁদ পাতা হচ্ছে সেটা সে ভুলেই গেল; উত্তেজিতভাবে কথা বলতে শুরু করল।

"গত বছর শেপ্‌শেরোভিচ্‌ কী কাণ্ডটাই না করল ভাবুন! সে কোভ্‌নো, ভিল্‌না, ঝিতোমির থেকে ত্রিশটা মেয়েমানুষকে আর্জেন্টিনা নিয়ে গেল, আর প্রত্যেকটিকে বেচে দিল এক হাজার রুবল দামে। এখন গুণে দেখুন মাদাম—ত্রিশ হাজার রুবল! আপনি কি মনে করেন শেপ্‌শেরোভিচ্‌ তাতেই খুশি! মোটেই না। সে কয়েকটা নিগ্রো মেয়ে কিনল, তাদের নিয়ে এসে মস্কো, পিতার্সবার্গ, কিয়েভ ও ওডেসার বাজারে ঝেড়ে দিল—আর তাতেই তার যাতায়াতের খরচটা তুলে নিল। মাদাম, সে মানুষ না, একটা ঈগল পাখি! ব্যবসা কেমন করে করতে হয় তা সে জানে!"

বারুস্‌কোভা আস্তে তার হাঁটুর উপর হাতটা রাখল। এই সুযোগের অপেক্ষায়ই সে ছিল। বন্ধুত্বপূর্ণ গলায় বলল:

"দেখুন মিঃ গরিজন্ত, আমার একটা প্রস্তাব আছে···আমি বলতে চাই···কোন নিষ্পাপ মেয়ে কি আপনার হাতে আছে? এখন তাদের চাহিদা খুব বেড়েছে। মনে রাখবেন গরিজন্ত, ঠিক যে অবস্থায় তারা ছিল সেই অবস্থায়ই আপনার মক্কেলদের ফিরিয়ে দেওয়া হবে। বুঝতেই তো পারছেন···এও এক সূক্ষ্ম ধরনের ভ্রষ্টতা। আমি নিজেও ভাল বুঝি না···"

গরিজন্ত চোখ নামিয়ে মাথাটা ঘসতে ঘসতে বলল:

"দেখুন···মানে···আমার একটি স্ত্রী আছে আপনি হয় তো প্রায় বুঝতেই পেরেছেন···"

"আচ্ছা। কিন্তু প্রায় কেন?"

"কথাটা স্বীকার করতে লজ্জা করছে···বলতে গেলে···সে এখনও আমার প্রেমিকার মত···মানে এখন পর্যন্ত।"

বারুস্‌কোভা আবার হো-হো করে হেসে উঠল।

"জানেন গরিজন্ত. আপনি যে এত বড় পাপিষ্ঠ তা আমি ভাবি নি। ঠিক আছে, আপনার স্ত্রীকেই দিয়ে দিন। কিন্তু···এটা কি সত্যি সম্ভব যে আপনি এখনও রেহাই দিয়েছেন···"

গরিজন্ত গম্ভীর গলায় হাঁকল, "এক হাজার?"

"আহা, সেটা কোন কথাই না। ঠিক আছে, এক হাজারই হল। কিন্তু তাকে বাগে আনতে পারব কিনা সেটা বলুন?"

"সেজন্য ভাববেন না," গভীর আত্ম-প্রত্যয়ের সঙ্গে গরিজন্ত বলল। "আবারও মনে করুন যে আপনি আমার মাসি, আর আপনার কাছেই আমার স্ত্রীকে রেখে যাচ্ছি। দেখুন মাদাম বারুস্‌কোভা, এই মেয়েটি আমার জন্য পাগল। কাজেই তাকে যদি বলেন যে আমার জন্যই তাকে এ কাজ করতে হবে, তাহলে সে আর ওজর-আপত্তি তুলবে না।"

আর আলোচনার কিছু ছিল না। কাজেই বারুস্‌কোভা একখানা হ্যাণ্ডনোটের কাগজ এনে অনেক কষ্টে তাতে কি যেন লিখল। হ্যাণ্ডনোটের কোন দাম নেই, তবে সেটাই একটা চুক্তিপত্র, আর এ-ধরনের দুষ্কৃতকারীরা সেটাকে মেনে চলে। এসব লেন-দেন-এ কখনও তঞ্চকতা চলে না, কারণ তঞ্চকতার শাস্তি মৃত্যু, তা সে অপরাধী কারাগারে, রাজপথে, কি বেশ্যাবাড়িতে যেখানেই থাকুক না কেন।

তার কিছুক্ষণ পরেই বারুস্‌কোভার স্বামী একটা গাড়িতে চেপে ভূতের মত সেখানে এসে হাজির হল। সে পোল্যাণ্ডের যুবক, গোঁফ দু দিকে পাকানো, নাইট-ক্লাবের মালিক। তারা একসঙ্গে বসে মদ খেল এবং মেলা, প্রদর্শনী ও ব্যবসার মন্দার কথা নিয়ে আলোচনা করল। তারপর গরিজন্ত হোটেলে টেলিফোন করে স্ত্রীকে সেখানে আসতে বলল। তার মাসি ও তার ভাইয়ের সঙ্গে স্ত্রীর পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, গোপনীয় রাজনৈতিক কাজে সে তখনই বাইরে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে। সারাকে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে চোখের জল ফেলে সে চলে গেল।

৪

গরিজন্ত (ঈশ্বর জানেন তার আসল নাম কি—গোগলেভিচ, পিডালেভিচ, অকুনভ, রস্‌মিতাল্‌স্কি) আসার সঙ্গে সঙ্গেই ইয়াম্‌স্কায়া স্ট্রীটে অনেক রকম পরিবর্তন দেখা দিল। ব্যাপকভাবে ভাগ-বাঁটোয়ারা চলতে লাগল। ত্রেপেল থেকে মেয়েদের পাঠানো হল আন্না মার্কভ্‌নার বাড়িতে, আর তার বাড়ি থেকে বড় দরের রুবলওয়ালার বাড়িতে, এবং সে-বাড়ি থেকে পঞ্চাশ কোপেক দরের বাড়িতে। কারও পদোন্নতি ঘটল না, শুধুই পদাবনতি। প্রতি স্থান-পরিবর্তনের জন্য গরিজন্ত পাঁচ থেকে একশ' রুবল মুনাফা লুটল। আসলে তার

বর্ম-শক্তিকে একমাত্র ফিন্‌ল্যাণ্ডের ইমাত্রার মত একটা জল-প্রপাতের সঙ্গেই তুলনা করা যেতে পারে। একদিন বিকেলে আন্না মার্কভ্‌নার বাড়িতে বসে সিগারেটের ধোঁয়ার জন্য চোখটাকে পাকিয়ে ঠ্যাং দুটো নাচাতে নাচাতে সে বলল :

"প্রশ্ন হচ্ছে, ঐ সোংকাকে তোমার কিসের দরকার? একটা ভদ্রোচিত বাড়িতে তাকে মানায় না। এখন, তাকে যদি অন্যত্র চালান করে দিতে পারি, তাহলে তুমি পাবে একশ' রুবল, আর আমি—পঁচিশ'। সত্যি করে বল তো—তার কি খুব একটা চাহিদা আছে?"

"আঃ, মিঃ শাত্‌স্কি, লোকের মন ভোলাতে আপনি ভালই জানেন! কিন্তু, আপনি কি বুঝতে পারছেন না যে মেয়েটির জন্য আমি দুঃখিত···ও তো খারাপ মেয়ে নয়।"

গরিজন্ত (শাত্‌স্কি) এক মুহূর্ত চুপ করে রইল। সে মনে মনে একটা লাগ-সই কথা হাতড়ে বেড়াচ্ছিল; হঠাৎ সেটা পেয়ে চেঁচিয়ে বলল :

"যে এমনিতেই পড়ছে তাকে একটা ধাক্কা দাও! আমি জানি মাদাম শাইবেস, ওর কোন চাহিদা নেই।"

ইসায়া সাব্বিচ ছোটখাট, রুগ্ন, দুর্বল মানুষ, কিন্তু প্রয়োজনে সে বেশ কঠিন হয়ে উঠতে পারে। সেও গরিজন্তকে সমর্থন করল।

"ঠিক কথা। সত্যি তার কোন চাহিদা নেই। মনে কর আনেচ্‌কা, তার পোষাক-আসাকে পঞ্চাশ রুবল খরচ হয়েছে। পঁচিশ রুবল পাবেন মিঃ শাত্‌স্কি, আর আমরা পাব পঞ্চাশ। আর ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তার হাত থেকে আমরা রেহাই পাব। অন্তত সে আর আমাদের প্রতিষ্ঠানের কলংক হয়ে থাকবে না।"

কাজেই ব্যাপারটা এই দাঁড়াল যে রুবলওয়ালা বাড়ি পেরিয়ে সোংকা সেই রকম একটা পঞ্চাশ কোপেক-এর বাড়িতে জায়গা পেল যেখানে যত রাজ্যের চোর-ছ্যাচোড়রা জমায়েত হয়ে সারা রাত মেয়েগুলোকে জ্বালায়। সেখানে শক্ত শরীর ও সহ্য-শক্তির একান্ত দরকার। একদিন রাতে প্রায় তিনশ' পাউণ্ড ওজনের একটি বিপুলা স্ত্রীলোক যখন খদ্দের ধরবার জন্য বাইরে যাবার সময় বাড়িউলিকে দেখে চেঁচিয়ে বলে উঠল, "ভাই বাড়িউলি, শুনে রাখ—ছত্রিশটি খদ্দের পার হয়ে গেছে। ভুলো না যেন," তখন সোংকা ভয়ে কাঁপতে লাগল।

সৌভাগ্যক্রমে সোংকাকে অতটা জ্বালাতন হতে হল না, কারণ এ বাড়িতে তাকে সকলেই অত্যন্ত কুৎসিত মনে করত। তার ভাসা-ভাসা চোখ দুটির দিকে কেউ তাকাত না; একমাত্র আর কাউকে পাওয়া না গেলেই তাকে কারও সঙ্গে ঘরে যেতে হত। সেই ওষুধের দোকানের লোকটি এখানেও তার খোঁজ পেয়ে গেল এবং প্রতি সন্ধ্যায়ই তাকে দেখতে আসত। কিন্তু কাপুরুষতার

মরুণ, অথবা হয়তো দৈহিক বিতৃষ্ণার জন্তই সে তাকে এ বাড়ির বাইরে নিয়ে যেতে পারে নি। তার পাশে বসে সে সারা রাত কাটিয়ে দেয় এবং আগের মতই হঠাৎ কোন খদ্দের এসে পড়লে সে ফিরে আসা পর্যন্ত ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে। এখনও তার মনে ঈর্ষা জাগে, এখনও সে হৈ-চৈ করে, আবার তাকে ভালও বাসে। ওষুধের দোকানে দাঁড়িয়ে কোন বটিকা তৈরি করতে করতে সারাদিন সে তার কথাই ভাবে, তাকেই কামনা করে।

৫

কিছুটা একঘেয়েমিতে ক্লান্তিবশত আর কিছুটা নতুনত্বের খোঁজে বিখ্যাত গায়িকা এলেনা রোভিন্স্কায়া ও তার সদা-সঙ্গিনী ব্যারনেস ভন তেফলিং তাদের দু'জন বন্ধু উকিল রিয়াসানভ ও সখের কবি ভলোদ্যা চ্যাপলিন্স্কিকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সঙ্গে নিয়ে ইয়ামস্কায়া স্ট্রীট পরিভ্রমণে বেরিয়ে পড়ল।

পথে যেতে যেতে রোভিন্স্কায়া ভলোদ্যাকে বলল :

"প্রথমে আমাদের নিয়ে যাবে একটা জাঁকজমকপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে ; তারপরে একটা মাঝারি জায়গায় এবং শেষে একটা পচা বাড়িতে।"

ভলোদ্যা আবেগের সঙ্গে বলল, "প্রিয় এলেনা ভিক্তরভ্না, তোমার জন্ত আমি সব কিছু করতে পারি। তোমার হুকুমে জীবন পর্যন্ত দিতে রাজী আছি। ...কিন্তু এসব বাড়িতে তোমাকে নিয়ে যাবার ঝুঁকি নিতে আমি পারি না।... রুশ পন্থা ও চাল-চলন বড়ই মোটা দাগের। কখনও কখনও অসভ্যও বটে। আমার ভয় হয় কোন কড়া অশ্লীল কথায় তোমাকে অপমান করা হতে পারে, অথবা কোন খদ্দের হয়তো তোমার সামনেই কোন অশোভন আচরণ করে বসতে পারে।"

রোভিন্স্কায়া অধৈর্য হয়ে তাকে বাধা দিল, "কী আশ্চর্য! আমি যখন লণ্ডনে গান করতাম তখনও আমার অনেক স্তাবক ছিল, কিন্তু পছন্দমত কিছু সঙ্গীকে নিয়ে হোয়াইট চ্যাপেল অঞ্চলের অত্যন্ত কুখ্যাত পল্লী দেখতে যেতে আমি তো তখন ইতস্তত করতাম না। বরং আমি বলতে পারি, সেখানে সকলেই আমার প্রতি বিশেষ সৌজন্যপূর্ণ আচরণই করত। আমি আরও বলছি, আমাদের সঙ্গে তখন দুটি ইংরেজ লর্ড থাকত ; তারা ভাল ক্রিড়াবিদ, দৈহিক ও নৈতিক বিচারে খুবই শক্তিমান ; কখনও কোন স্ত্রীলোকের অসম্মান তারা বরদাস্ত করত না। কিন্তু ভলোদ্যা, তুমি হয় তো তাদের মত নও।"

'আরে না, না, এলেনা ভিক্তরভ্না। তোমাকে ভালবাসি বলেই সাবধান করে দিচ্ছি। কিন্তু তুমি হুকুম করলে, যেখানে বলবে সেখানেই যাব। শুধু এই অভিযানে নয়, মৃত্যুর দুয়ার পর্যন্তও যাব।"

ততক্ষণে তারা ইয়াম্স্কায়ার সব চাইতে কেতাদুরস্ত প্রতিষ্ঠান ত্রেপ্পেল-এ পৌছে গেছে। স্বাভাবিক ব্যঙ্গের হাসি হেসে রিয়াসনভ বলল :

"তাহলে এখান থেকেই চিড়িয়াখানা দেখা শুরু হল।"

একটা প্রাইভেট ঘরে তাদের নিয়ে যাওয়া হল। দেয়ালে র‍্যাস্পবেরি রঙের কাগজ লাগানো, তার উপর ছোট ছোট সোনালি মালার ছবি আঁকা। রভিন্‌স্কায়ার সূক্ষ্ম শিল্পী-মন সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করল যে তারা চারজন এইমাত্র নাইট-ক্লাবের যে ঘরে বসে খেয়ে এল তার দেয়ালেও এই কাগজ লাগানো ছিল।

বাল্টিক অঞ্চলের চারটি জার্মান মেয়ে ঘরে ঢুকল। সকলেরই শক্ত-সমর্থ চেহারা, উন্নত বুক, সুন্দর মুখে পাউডারের প্রলেপ, চাল-চলনে মর্যাদার অভাব। প্রথমে বিশেষ কিছু কথা হল না। মেয়েরা চুপচাপ পাথরের মূর্তির মত বসে রইল, তারা যে মহিলা এটা বোঝাবার জন্য যেন সাধ্যমত চেষ্টা করতে লাগল। রভিন্‌স্কায়াই প্রথম কথা বলে তাদের উদ্ধার করল। সাদা গোল পাউরুটির মত দেখতে সব চাইতে মোটা নীলনয়না মেয়েটিকে উদ্দেশ করে সে বলল:

"বল তো তোমরা কোথা থেকে এসেছ। জার্মানি বোধ হয়?"

"না ফ্রাউ, আমি এসেছি রিগা থেকে।"

"এখানে কাজ করতে এসেছ কেন? আশা করি অভাবে পড়ে নয়?"

"অবশ্য না ফ্রাউ। দেখুন, আমার প্রণয়ী হান্স একটা রেস্তোরাঁতে কাজ করে, আর আমরা এত গরীব যে এখনই বিয়ে করতে পারছি না। তাই ব্যাংকে যা পারি জমাচ্ছি, আর সেও তাই করছে। যখন প্রয়োজনীয় দশ হাজার রুবল জমবে তখন আমরা বিয়ে করব, একটা বীয়ারের দোকান খুলব এবং ঈশ্বর অনুগ্রহ করলে আমাদের ছেলেপুলেও হবে। দুটি—একটি ছেলে, একটি মেয়ে।"

রভিন্‌স্কায়া বিস্মিত হয়ে বলল, "শোন মেইন ফ্রাউলিন, তুমি যুবতী, সুন্দরী, দুটো ভাষা জান।"

জার্মান মেয়েটি সগর্বে বলল, "তিনটি ম্যাডাম। আমি ইস্থোনিয়ান ভাষাও জানি। আমি মিউনিসিপ্যাল স্কুল থেকে পাশ করেছি এবং হাই স্কুলেও তিন বছর পড়েছি।"

অধিকতর উত্তেজিতভাবে রভিন্‌স্কায়া বলল, "তাহলে বুঝতেই তো পারছ যে এতটা লেখাপড়া শিখে তুমি তো সব সময়ই থাকা-খাওয়া সমেত মাসে ত্রিশ রুবল মাইনের একটা চাকরি পেতে পার। যেমন ধর, গৃহস্থালির কাজ, ছেলে-মেয়ের নার্সের কাজ, কোন দোকানে প্রধান করণিক বা ক্যাসিয়ারের কাজ। আর যদি তোমার প্রণয়ী ফ্রিজ…"

"হান্স ম্যাডাম।"

"হান্স যদি পরিশ্রমী ও মিতব্যয়ী হয় তাহলে তো দু তিন বছরের মধ্যেই নিজেদের পায়ে দাঁড়ানো তোমাদের পক্ষে শক্ত হবে না। তা কি তোমরা ভেবে দেখেছ?"

"আপনার একটু ভুল হয়েছে ম্যাডাম। আপনি ভেবে দেখেন নি যে যদি

একটা বেশ ভাল চাকরিও পেয়ে যাই এবং সব কিছুতেই হাত টেনে চলি তাহলেও মাসে পনেরো কি বিশ রুবলের বেশী কখনও জমাতে পারব না। কিন্তু এখানে একটু টেনেটুনে চললে আমি সেভিংস ব্যাংকে এক শ রুবল রাখতে পারি। তারপর ভেবে দেখুন, কারও বাড়িতে চাকর থাকা কী অসম্মানের কাজ! সব সময় মনিবের খেয়াল খুশিমত চলতে হবে, তার সব রকম বোকামি সইতে হবে। ধিক! আর গিন্নি সব সময় দোষ ধরবে আর গালাগালি করবে!"

জার্মান মেয়েটির দিকে না তাকিয়ে মেঝেতে চোখ রেখে রভিন্‌স্কায়া চিন্তিত-ভাবে বলল, "দেখ···আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। এই সব···এগুলোকে কি যেন বলে···বাড়ি ··এখানে তোমাদের জীবন সম্পর্কে অনেক কথাই শুনেছি। সকলে বলে, এখানকার অবস্থা ভয়ংকর···অত্যন্ত বিরক্তিকর, বুড়ো, কুৎসিত লোকের সঙ্গে তোমাদের জোর করে মিলতে হয়···তোমাদের লুঠ করা হয়··· অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে তোমাদের শোষণ করা হয়।"

"না, না, ম্যাডাম। আমাদের প্রত্যেকের একটা করে হিসাবের খাতা আছে। সেখানে আমাদের আয়-ব্যয় সব লেখা থাকে। যেমন ধরুন, গত মাসে আমি পাঁচ শ' রুবলের বেশী আয় করেছি। নিয়ম মাফিক তার তিন ভাগের দুই ভাগ পায় বাড়িউলি থাকা, খাওয়া, আগুন, আলো, বিছানা বাবদ··· তাহলে আমার থাকল দেড়শ', তাই না? জামাকাপড় ও টুকিটাকি জিনিস কিনতে আমার খরচ হয় পঞ্চাশ, আর সেভিংসে জমাই এক শ'। আমিই আপনাকে শুধোই ম্যাডাম, এটা কি শোষণ? আর পুরুষের কথা—এ কথা ঠিক যে কিছু ভয়াবহ লোক আসে; তা কাউকে পছন্দ না হলে তো আমি বলে দিতে পারি যে আমার শরীর ভাল নেই, আর সেক্ষেত্রে কোন নতুন মেয়ে তাকে নিয়ে নেবে।"

"কিন্তু মাফ কর, তোমার নামটা জানি না।"

"এল্‌সা।"

"কিন্তু...এল্‌সা, আমি শুনেছি তোমাদের সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করা হয়···তোমাদের মারধোর করা হয়; যা তোমরা করতে চাও না, যে কাজ করতে ঘৃণা বোধ কর তাই তোমাদের দিয়ে জোর করে করানো হয়।"

এল্‌সা উদ্ধতভাবে বলে উঠল, "কখনও না ম্যাডাম। এখানে আমরা এক পরিবারের মত বাস করি; আমরা সকলেই বাল্টিক প্রদেশ থেকে এসেছি, বা একে অপরের আত্মীয়। আহা ঈশ্বর করুন, সব পরিবারই যেন আমাদের মত মিলে-মিশে থাকতে পারে। এ কথা ঠিক যে ইয়াম্‌স্কায়া স্ট্রীট যত রাজ্যের মন-কষাকষি, কুৎসাপ্রচার ও ঝগড়াঝাঁটি হয়। কিন্তু সে হয় ঐ সব··· রুবলওয়ালা বাড়িতে···কি জানেন, রুশ মেয়েগুলো প্রচুর মদ খায় আর সব সময়ই তাদের একটি করে ভালবাসার লোক থাকে···তারা ভবিষ্যতের কথা একদম ভাবে না।"

রভিন্‌স্কায়া মন-মরা ভাবে বলল, "তুমি বেশ বুদ্ধিমতী মেয়ে এল্‌সা। যা হোক, এ সবই তো বেশ ভাল। কিন্তু হঠাৎ অসুখ করলে বা ছোঁয়াচে রোগ হলে কি হবে? তার মানে তো মৃত্যু··· ভবিষ্যতের কথা কে বলতে পারে বল?"

"আপনি আবার ভুল করলেন ম্যাডাম। ভালভাবে ডাক্তারী পরীক্ষা না করিয়ে কোন লোককেই আমি বিছানায় শুতে দেই না। শতকরা পঁচাত্তর ভাগ আমি নিরাপদে থাকি।"

"কী আশ্চর্য!" হঠাৎ বিরক্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠে রভিন্‌স্কায়া টেবিলের উপর একটা কিল মেরে বলে উঠল, "কিন্তু তাহলে তোমার এলবার্ট···"

"হান্স," জার্মান মেয়েটি বিনীতভাবে ভুলটা শুধরে দিল।

"মাফ কর। কিন্তু তুমি যে এখানে থাক, অথবা তাকে ঠকিয়ে এভাবে তাতে হান্স নিশ্চয়ই খুশি নয়···"

"কিন্তু ফ্রাউ, আমি তো কখনও তাকে ঠকাই নি। সে করে ওই সব বাদ-বাকি মেয়েরা, বিশেষ করে রুশ মেয়েগুলো; তারা তো যথাসর্বস্ব তাদের ভালবাসার মানুষদের পায়েই ঢেলে দেয়। কিন্তু আমি কি কোনদিন অত নীচে নামব! ধিক!"

বিরক্ত হয়ে চেয়ার থেকে উঠতে উঠতে রভিন্‌স্কায়া জোর গলায় বলে উঠল, "মানুষ যে এত নীচে নামতে পারে তা আমি কল্পনাও করতে পারি না। মশাইরা দয়া করে বিল মিটিয়ে এখান থেকে চলুন।"

রাস্তায় নেমে ভলোদিয়া রভিন্‌স্কায়ার হাত ধরে অনুনয়ের সুরে বলল, "ঈশ্বরের দোহাই, এ রকম একটা অভিজ্ঞতাই কি তোমার পক্ষে যথেষ্ট নয়?"

"আঃ, কী ভয়ানক! কী বিরক্তিকর রকমের অশালীনতা!"

"সেই জন্যই তো বলি, এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছেড়ে দাও।"

"না না যে করেই হোক আমি এর শেষ দেখতে চাই। এবার আরও সাধারণ, আরও সহজ কিছু দেখাও।"

এলেনা ভিক্তরভ্‌নার জন্য চিন্তিত ভলোদিয়া কয়েক পা দূরবর্তী আন্না মার্কভ্‌নার প্রতিষ্ঠানের কথা বলল।

সেখানে কিন্তু তাদের কিছু অসাধারণ অভিজ্ঞতা হল। প্রথমত, সাইমিয়ন তাদের কিছুতেই ঢুকতে দেবে না; শেষ পর্যন্ত কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে তারা সে বাধা পার হল। ঠিক ত্রেপ্পেল-এর মতই একটা ঘর তাদের দেওয়া হল। শুধু এ-ঘরটা কিছু অগোছালো ও ময়লা। এম্মা এডোয়ার্ডভ্‌নার হুকুমে মেয়ে-গুলোকে সেই ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। যেন সোডা আর এসিড মিশিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু সব চাইতে বড় ভুল হল জেংকাকে পাঠানো—বিরক্ত, খেয়ালি, নির্লজ্জ জেংকা। সকলের শেষে ঘরে ঢুকল শান্ত মিষ্ট তামারা—তার ঠোঁটে মোনালিসা হাসি। শেষ পর্যন্ত বাড়ির প্রায় পুরো দলটাই সে ঘরে জমায়েত হল। "এ জীবনে তারা কেমন করে এল?' এ-প্রশ্ন এখানে করতে

রভিন্স্কায়ার সাহস হল না। মেয়েগুলো তার প্রতি একটা বাহ্যিক আতিথেয়তার ভাবই দেখাতে লাগল। তারা সাধারণত যে সব গান গেয়ে থাকে তাদের সে তাই গাইতে বলল। তারাও সানন্দে রাজী হল।

সবই ঠিকঠিক চলত, কিন্তু সহসা ছোট মাংকা শেমিজ ও সাদা লেস-বসানো প্যাণ্টি পরেই সে ঘরে ঢুকে পড়ল। সে একটি ধনী ব্যবসায়ীর সঙ্গে বসে মদ খাচ্ছিল। আগের দিনই সে একটি "স্বর্গীয় রাত্রি'র ব্যবস্থা করে গিয়েছিল এবং বেনেডিক্টাইনের ডিনামাইট-প্রভাব মেয়েটির উপর পুরোদস্তুরই কাজ করেছে। এখন আর সে সাদা মাংকা বা ছোট মাংকা নেই, এখন সে কুৎসাময়ী মাংকা। দৌড়ে ঘরে ঢুকেই এতগুলি মানুষকে দেখে হকচকিয়ে সে মেঝের উপর পড়ে গেল। চিৎ হয়ে শুয়ে সে এমনভাবে হাসতে শুরু করল যে তার ছোঁয়াচ লেগে সকলেই হাসতে লাগল। কিন্তু সে হাসি খুবই ক্ষণস্থায়ী। হঠাৎ উঠে বসে মাংকা চেঁচিয়ে উঠল :

"হুর্‌রা! অনেক নতুন মেয়ে আমাদের দলে যোগ দিয়েছে।"

তার কথাগুলি অপ্রত্যাশিত ও রূঢ় হলেও সকলে হয় তো সেটাকে উপেক্ষাই করত ; কিন্তু ব্যারনেস ভন তেক্‌লিং-এর একটা অবিবেচক মন্তব্য সব গোলমাল করে দিল। সে বলল :

"পতিতা নারীদের একটা কনভেণ্ট-এর আমি পৃষ্ঠপোষিকা ; তাদের জীবন-যাত্রা সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করাই আমার কাজ।"

জেংকা সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠল।

"বেরিয়ে যাও, এক্ষুণি বেরিয়ে যাও, বুড়ি ধাড়ি কোথাকার! যত সব ঘর-মুছুনির দল! তোমাদের ওই সব ম্যাগডালেন আশ্রম তো কারাগারের চাইতেও খারাপ। তোমাদের সচিবরা তো মেয়েদের মনে করে পচা মাংস! তোমাদের তত্ত্বাবধানকারিণীরা থাকে কোচয়ান ও দরোয়ানদের সাথে, আর মেয়েগুলো নিজেদের মধ্যে একটু হাসাহাসি আর ঠাট্টা-তামাসা করলেই তাদের শাস্তি দেওয়া হয়। আর তোমাদেরই বাবারা, স্বামীরা, দাদারা সবাই এখানে আসে এবং আমরা তাদের যত রকম ছোঁয়াচে রোগ বাঁধিয়ে দিই। তারা আবার তোমাদের মধ্যে সে রোগ ছড়িয়ে দেয়। কাজেই তোমরা যখন থিয়েটারে যাবার মতই এখানে এসেছ তোমাদের মুখের উপর খাঁটি কথাই বলতে হবে।"

তামারা শান্তভাবে বাধা দিল।

"থামো জেনি, আমি ওদের সঙ্গে কথা বলছি। ব্যারনেস, আপনি কি সত্যি মনে করেন যে আপনাদের তথাকথিত ভদ্র মেয়েদের চাইতে আমরা খারাপ? একজন পুরুষ আমার কাছে আসে, এক বারের জন্য দুই রুবল দেয়, রাত কাটাতে হলে দেয় পাঁচ রুবল ; সে-কথা আমরা গোপন করি না, সকলেই জানে। কিন্তু আমাকে বলুন তো ব্যারনেস, এ রকম একটি বিবাহিতা নারীর কথাও কি আপনি জানেন পরিবার থাকা সত্ত্বেও যে কাম চরিতার্থ করবার জন্য

কোন যুবকের কাছে, অথবা টাকার জন্য কোন বুড়োর কাছে গোপনে নিজেকে সঁপে দেয় না? আমি খুব ভালভাবেই জানি, আপনাদের মত মেয়েদের শতকরা পঞ্চাশ জনেরই ভালবাসার মানুষ আছে, আর বাকী পঞ্চাশ জনের বয়স বেশী বলে তারাই যুবকদের রাখে। আমি আরও জানি, আপনারা অনেকেই বাবার সঙ্গে, ভাইয়ের সঙ্গে, এমন কি ছেলের সঙ্গে বাস করেন, কিন্তু এ কথা গোপন রাখেন—অন্তরের গভীর গহনে এ সব কালো গোপন কথাকে লুকিয়ে রাখেন। আমাদের মধ্যে এক্মাত্র তফাৎ, আমরা পতিতারা মিথ্যা বলি না, ভাণ করি না, আর আপনারা পাপ করেন এবং জলজ্যান্ত মিথ্যা কথা বলেন। এবার সত্যি করে বলুন—এ পার্থক্য কার অনুকূলে যাচ্ছে?"

"সাবাস তামারচ্কা! আচ্ছা করে লাগাও!" মেঝেতে বসেই মাংকা চেঁচিয়ে বলে উঠল। তার বাদামি কোঁকড়া চুল এলোমেলো হয়ে উড়ছে। তাকে দেখাচ্ছে তেরো বছরের মেয়েটির মত।

জেংকা জ্বলন্ত চোখ তুলে বলল, "বলে যাও, বলে যাও।"

"কেন বলব না জেনেচ্কা? আরও এগিয়ে আমি বলতে পারি, আমাদের মধ্যে হাজারে একটাও গর্ভপাত করা হয় কিনা সন্দেহ। কিন্তু আপনারা সেটা বার বার করে থাকেন। এ কথা কি সত্যি নয়? তাছাড়া, দারিদ্র্য বা হতাশার চাপে আপনারা এ-কাজ করেন না, করেন পাছে আপনাদের চেহারা, আপনাদের রূপ নষ্ট হয়ে যায়,—কারণ সেটাই তো আপনাদের একমাত্র মূলধন! আপনারা চান শুধু বাসনা চরিতার্থ করতে, গর্ভ-ধারণ ও সন্তান পালন যে তাতে বাধার সৃষ্টি করে।"

রভিন্‌স্কায়া বিচলিত হয়ে পড়ল। তাড়াতাড়ি ফরাসি ভাষায় কানে কানে বলল: "সাবধানে ব্যারনেস, মনে হচ্ছে এই মেয়েটা বেশ কিছু লেখাপড়া জানে।"

"তুমি কি জান, ওর অসাধারণ মুখটা আমি লক্ষ্য করেছি। কোথায় যেন দেখেছি? স্বপ্নে কি···কোন স্বপ্ন-বিকারে···আমার প্রথম শৈশবে?"

তামারা উদ্ধতভাবে তাদের আলোচনায় বাধা দিয়ে ফরাসি ভাষায় বলল, "আমি আপনাকে সাহায্য করছি···খারাকভ-এর কথা মনে করুন; সেখানকার কোনিয়াকিন-এর হোটেলের একটা ঘর, নাট্য-প্রযোজক সাল্‌ভিচিক, আর একটি গানের সুর। সে সময় আপনি ব্যারনেস ভন—ছিলেন না, কিন্তু ফরাসি ভাষা থাক। সে সময় আপনি ছিলেন একটি গাইয়ে মেয়ে, আর আমরা একসঙ্গেই কাজ করতাম।"

"ঈশ্বরের দোহাই, মাদ্‌ময়জেল মার্গুরিত, আমাকে বল, তুমি এখানে এলে কেমন করে?"

"ওঃ, সে প্রশ্ন সব সময়ই লোকে করে। এখানে আসার কথা মাথায় এল, তাই চলে এলাম।"

তারপর বর্ণনাতীত বিদ্রূপের সুরে বলে উঠল, "আশা করি যে সময়টা আমরা এখানে কাটাচ্ছি আপনি তার দামটা দেবেন।"

"না, তুমি নরকে যাও," হঠাৎ মেঝে থেকে উঠে দাঁড়িয়ে পাগলা মাংকা চেঁচিয়ে বলল। দ্রুত হাতে মোজার ভিতর থেকে দুটো স্বর্ণ মুদ্রা বের করে সে টেবিলের উপর ছুঁড়ে দিল।

"এই নাও! এই তোমাদের ড্রশ্‌কি-র ভাড়া। এই মুহূর্তে এখান থেকে বেরিয়ে যাও, নইলে সব বোতল আর আয়না ভেঙে তচনচ করে দেব।"

রভিন্‌স্কায়া উঠে দাঁড়াল। দুই চোখে আন্তরিক উষ্ণ অশ্রু ঝরিয়ে বলল:

"নিশ্চয়ই চলে যাব, আর মাদ্‌ময়জেল মার্গুরিত-এর এ শিক্ষাও ভুলব না। কিন্তু তুমি আমাকে গালাগালি করলে, এবার আমি তোমাকে গান শোনাতে চাই।"

সে পিয়ানোর কাছে এগিয়ে গেল। একটুখানি বাজিয়ে দার্গোমিঝ্‌স্কি-র একটি মধুর গান গাইতে শুরু করল। একজন মহৎ শিল্পীর গলায় এই নরম আবেগ-বিধুর গানটি উপস্থিত সব মেয়ের মনেই জাগিয়ে তুলল তাদের প্রথম প্রেম, প্রথম পাপ; বসন্তের গভীর রাতে, ঊষার প্রথম লগ্নে ঘাসের বুক যখন শিশিরে ভিজে আছে, আকাশের রক্ত-রাগ বার্চ গাছের মাথায় মাথায় ছড়িয়ে পড়েছে, তখন তাদের বিদায়-সম্ভাষণ; শেষ গভীর আলিঙ্গন; "এই ক্ষণ আর কখনও ফিরে আসবে না, এর পুনরাবৃত্তি আর কখনও ঘটবে না" এ কথা জেনেই হৃদয়ের অস্পষ্ট দুঃখের কথাগুলি কানে কানে বলা; তাদের ঠোঁটগুলো তখন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, শুকিয়ে গেছে, চুলগুলি সকালের কুয়াসা লেগে ভিজে উঠেছে।

তামারা চুপ। কুৎসাময়ী মাংকাও চুপ। কিন্তু সকলের চাইতে বেপরোয়া জেংকা হঠাৎ গায়িকার কাছে ছুটে গেল, হাঁটু ভেঙে বসে তার পায়ের উপর পড়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

রভিন্‌স্কায়ার মনে দোলা লাগল। জেংকার মাথাটা জড়িয়ে ধরে বলল:

"সোনা, এস তোমাকে চুমু খাই।"

জেনি তার কানে কানে কি যেন বলল।

রভিন্‌স্কায়া বলল, "আরে, সেটা বড় কিছু নয়। কয়েকমাস চিকিৎসা করলেই ভাল হয়ে যাবে।"

"না, না, না···আমি চাই ওদের সকলকেই এ-রোগে ধরুক। সবাই পচে-গলে মরুক।"

"দেখ সোনা; আমি যদি তুমি হতাম তাহলে কিন্তু এ কথা বলতাম না।"

এবার গর্বিতা জেংকা গায়িকার হাত ও হাঁটুতে চুমু খেতে খেতে হাহাকার করে উঠল:

"মানুষ কেন আমার প্রতি এমন অন্যায় করেছে? কেন তারা আমাকে আঘাত করেছে? কেন? কেন?"

এই হল প্রতিভার ক্ষমতা। এই একমাত্র শক্তি যা শুধু কঠিন, কঠোর যুক্তিকে নয়, মানুষের আত্মাকেও জয় করতে পারে। গর্বিতা জেংকা এখন রভিনস্কায়ার পোষাকে মুখ লুকিয়ে আছে। সাদা মাংকা রুমালে মুখ ঢেকে চুপচাপ চেয়ারে বসে আছে। হাঁটুর উপর কনুই রেখে দুই হাতে মুখটা ধরে তামারা বাইরে তাকিয়ে আছে। একটা গোলযোগের আশংকা করে সাইমন এতক্ষণ দরজায় বসে সব দেখছিল; এখন সে বিস্ময়ে হাঁ করে আছে।

রভিনস্কায়া জেনির কানে কানে মৃদুস্বরে বলল:

"কখনও হতাশ হয়ো না। সময় সময় অবস্থা এমন শোচনীয় হয়ে ওঠে যে মৃত্যুকেই সমস্যার একমাত্র সমাধান বলে মনে হয়; তারপর হঠাৎ পরদিনই সব কিছু বদলে যায়, সব কিছু সুন্দর হয়ে ওঠে! সোনা, আজ আমি বিখ্যাত হয়েছি, কিন্তু যদি জানতে কী ভাবে আমি এখানে এসেছি,—কত অসম্মান, কত অধঃপতন পার হয়ে! কাজেই ভাল হয়ে ওঠ, ভাগ্যের উপর ভরসা রাখ।"

সে নীচু হয়ে জেংকার কপালে চুমো খেল। ভলোদ্য়া একাগ্র দৃষ্টিতে এই দৃশ্য দেখছিল। সেই মুহূর্তে গায়িকার টানা-টানা নীল মিশরীয় চোখে যে তপ্ত আলোক-শিখা উজ্জ্বল দীপ্তিতে জ্বলছিল তা সে কোন দিন ভুলতে পারবে না।

মন-মরা হয়ে দলটা উঠে পড়ল। রিয়াসানভ এক মুহূর্তের জন্য পিছিয়ে পড়ল। তামারার কাছে গিয়ে সশ্রদ্ধ আদরে তার হাতে চুমো খেয়ে বলল:

"আশা করি আমাদের এই অভিযানকে তুমি ক্ষমা করবে···অবশ্য আর কখনও এর পুনরাবৃত্তি ঘটবে না। যদি কখনও আমাকে তোমার দরকার হয়, মনে রেখ আমি তোমার সেবা করতে প্রস্তুত আছি। এই আমার কার্ড। এটাকে তোমার দেরাজে সেঁটে রেখ না, কিন্তু মনে রেখ, আজ রাত থেকে আমি তোমার বন্ধু।"

সে আবার তার হাতে চুমো খেয়ে চলে গেল।

৬

বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই চমৎকার বৃষ্টি পড়ছে; বাদাম, পপলার ও বাবলা গাছের পাতাগুলি বৃষ্টির জলে ধুয়ে আরও উজ্জ্বল সবুজ হয়ে উঠেছে। আবহাওয়ায় কেমন একটা স্মৃতির আমেজ, একটানা, একঘেয়ে।

মেয়েরা যথারীতি জেংকার ঘরে জমায়েত হয়েছে। কিন্তু আজ তার চাল-চলন অদ্ভুত। সে ঠাট্টা-তামাসা করছে না, হাসছে না, ছেঁড়া উপন্যাসটা পর্যন্ত পড়ছে না, সেখানা বুকের উপর পড়ে আছে। সে ভীষণভাবে খচে আছে, দুই চোখে ঘৃণার হলুদ শিখা জ্বলছে। ভক্ত সাদা মাংকা বৃথাই তার মনোযোগ আকর্ষণ করতে চেষ্টা করছে, কিন্তু জেংকা সেদিকে নজরই দিচ্ছে না। কথাবার্তা জমছে না। মন-মরা আবহাওয়া। হয়তো অগাস্ট মাসের কয়েক সপ্তাহব্যাপী অবিশ্রাম বর্ষণেরই এটা ফল।

তামারা জেনির পাশে বিছানায় বসে আছে। আস্তে জেনির গলা জড়িয়ে ধরে কানে কানে বলল, "তোমার কি হয়েছে জেনেচ্‌কা? লক্ষ্য করছি, কিছুদিন থেকেই তুমি যেন আর তোমাতে নেই। মাংকাও তাই ভাবছে। তুমি তো বুঝতেই পারছ, তুমি তার দিকে নজর দিচ্ছ না বলে সে কষ্ট পাচ্ছে। আমাকে বল কি হয়েছে। হয় তো আমি তোমাকে কিছুটা সাহায্য করতেও পারি।"

জেনি চোখ বন্ধ করে মাথা নাড়ল। তামারা একটু সরে বসে তার মাথায় হাত বুলোতে লাগল।

"এটা তোমার ব্যাপার জেনেচ্‌কা। আমি নাক গলাতে চাই না। আমি জিজ্ঞাসা করছি কারণ তুমি…"

দৃঢ়সংকল্প নিয়ে জেনি বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াল। তামারার হাত ধরে হঠাৎ বলে উঠল :

"ঠিক আছে। এস। এক মুহূর্তের জন্য এখান থেকে বাইরে যাই। সব তোমাকে বলব। মেয়েরা, আমরা বেশী দেরী করব না, তোমরা অপেক্ষা কর।"

করিডরে পৌঁছে সে জানালার পাশে দাঁড়াল। বন্ধুর কাঁধের উপর হাত রেখে হঠাৎ ফ্যাকাসে হয়ে যাওয়া বিকৃত মুখে বলল, "বেশ, তাহলে শোন। কেউ আমার মধ্যে সিফিলিস রোগ সংক্রামিত করেছে।"

"সে কি! অনেক দিন হল?"

"হ্যাঁ। যেদিন ছাত্ররা এখানে এসেছিল, আর প্লাতনভ-এর সঙ্গে সেই বাজে ঝগড়া হয়েছিল, তোমার মনে আছে। সেইদিনই প্রথম বুঝতে পারি। বিকেলে।"

তামারা নীচু গলায় বলল, "কি জান, আমিও এই রকম একটা কিছু অনুমান করেছিলাম, বিশেষ করে সেদিন রাতে যখন তুমি সেই গায়িকার কাছে হাঁটু ভেঙে বসে তার কানে কানে কথা বলেছিলে। দেখ জেনেচ্‌কা, এখন থেকেই তোমাকে সাবধান হতে হবে, চিকিৎসা করাতে হবে।"

জেনি সরোষে মাটিতে পা ঠুকল; হাতের সুন্দর রুমালখানাকে ছিঁড়ে দু টুকরো করে ফেলল।

"না! কখনও না! কিন্তু তোমাদের কাউকে আমি ছোঁয়াচ লাগাব না। তুমি হয়তো লক্ষ্য করেছ, গত কয়েক সপ্তাহ ধরে আমি খাবার টেবিলে বসে খাই না, আর আমার খাবারের ডিসগুলো নিজের হাতেই ধুয়ে-মুছে রাখি। সেই জন্যই মাংকাকে দূরে সরিয়ে রাখছি। আমি চাই আমার প্রতি তার এই আসক্তি কেটে যাক, সে আমার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে উঠুক, অথচ তুমি তো জান আমি তাকে কত ভালবাসি। আর এই পুরুষগুলো, এই দো-পেয়ে জন্তুগুলো, আমি ইচ্ছা করে তাদের ছোঁয়াচ লাগাচ্ছি। প্রতি রাতে কখনও দশজন, কখনও পনেরো জনকে সংক্রামিত করছি! তারা পচে মরুক, তাদের

স্ত্রীদের, রক্ষিতাদের, মায়েদের সিফিলিস হোক! হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাদের মায়েদেরও, বাবাদেরও···তাদের শিক্ষয়িত্রীদের, এমন কি তাদের ঠাকুরমার মায়েদেরও! তারা সব মরুক, জারজের দল!"

তামারা আদর করে ধীরে ধীরে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

"জেনেচ্‌কা, তুমি কি সত্যি তাই চাও?'

"হ্যাঁ। কোন দয়া-মায়া নেই! কিন্তু তোমরা মেয়েরা ভয় পেয়ো না। আমি লোক খুঁজে নেব। সব চাইতে বোকা, সব চাইতে সুন্দর, সব চাইতে ধনী, আর সব চাইতে মর্যাদাসম্পন্ন পুরুষ। কোন চিন্তা করো না, পরবর্তীকালে তারা যাতে তোমাদের কারও কাছে যেতে না পারে সে ব্যবস্থাও আমি করব। ওঃ, এতই তীব্র আবেগে আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠি যে তা দেখলে তোমরা হেসে মরে যাবে। আমি আঁচড়াই, কামড়াই, পাগলের মত সারাক্ষণ কাঁপতে থাকি। আর বোকারা তাই বিশ্বাস করে।"

বাইরে তাকিয়ে চিন্তিতভাবে তামারা বলল, "এটা তোমার ব্যাপার জেনেচ্‌কা। হয়তো তুমি ঠিকই করছ···কে জানে···কিন্তু ডাক্তারি পরীক্ষাকে তুমি ফাঁকি দিচ্ছ কেমন করে বল তো?"

জেংকা হঠাৎ সরে গেল, জানালার ফ্রেমে মুখটা চেপে ধরল, তারপর হু-হু করে কেঁদে উঠল। তিক্ত, অগ্নিময় চোখের জল, প্রতিহিংসা ও তীব্র ঘৃণায় চোখের জল ফেলতে ফেলতে কাঁপতে কাঁপতে সে অতি দ্রুত বলতে লাগল:

"কারণ···কারণ···ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমার ভাগ্য ভাল···এমন স্থানে আমি আক্রান্ত হয়েছি যা কোন ডাক্তার কোন দিন দেখতে পাবে না। তাছাড়া, আমাদের ডাক্তারটি বুড়ো ও হাবা।"

আর তারপরই যেমন হঠাৎ সে কাঁদতে শুরু করেছিল, প্রচণ্ড চেষ্টায় তেমনি হঠাৎই কান্না বন্ধ করে জেনি বলল, "আমার ঘরে চল তামারচ্‌কা। এ ব্যাপারে তুমি চুপ করে থাকবে এ ভরসা আমি নিশ্চয় করতে পারি।"

"অবশ্যই পার।"

বাইরে শান্ত ও সংযতভাবেই তারা ঘরে ফিরে গেল।

সাইমিয়ন ঘরে ঢুকল। যত সাহসীই হোক, জেনিকে সেও সমীহ করে চলে। বলল, "দেখ জেনেচ্‌কা, হিজ এক্সেলেন্সি ভান্দা-র সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। তাকে দশ মিনিটের জন্য পাঠিয়ে দাও।"

ভান্দার চোখ দুটি নীল, চুল বাদামি, বড় লাল মুখ, মুখের গড়নটা লিথুয়ানীয় ধরনের। সে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে জেনির দিকে তাকাল—জেনি যদি না বলত তাহলে ভান্দা ঘরেই থেকে যেত, কিন্তু জেনি কিছুই বলল না, ইচ্ছা করেই চোখ বুঁজে রইল। কাজেই ভান্দা শান্তভাবে ঘর থেকে চলে গেল।

হিজ এক্সেলেন্সি সেনাপতি মশায় মাসে দু'দিন করে নিয়মিত ভান্দার কাছে আসে (ঠিক জোয়া-র যেমন একজন উচ্চপদস্থ স্থায়ী খদ্দের আছে যে

রোজ আসে বলে মেয়েরা তার নাম দিয়েছে "ডিরেক্টর")।

সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে জেনি মাথার উপর দিয়ে পুরনো বইটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। তার বাদামি চোখে সোনালি শিখা জ্বলতে লাগল।

জেনি বলতে লাগল, "এই সেনাপতিকে ঘৃণা করার তো কোন কারণ তোমাদের নেই। তার চেয়েও অসভ্য লোক আমি দেখেছি। একবার আমার কাছে একটি খদ্দের এসেছিল, একটা আস্ত বোকার ডিম। সে আমাকে ভালবাসতে পারত না যদি না…যদি না…সাদা কথা বললে, যদি না আমার বুকে সে পিন ফোটাতে পারত। আবার ভিল্‌না-তে একটি পুরোহিত ছিল… সে আমাকে সাদা পোষাক পরিয়ে, আমার মুখময় পাউডার মাখিয়ে আমাকে নিশ্চুপ হয়ে বিছানায় শুইয়ে রাখত। তারপর বিছানার মাথার কাছে তিনটে মোমবাতি জেলে দিত। আর তারপর যখন তার মনে হত যে আমি মরে গেছি, তখন সে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত।"

সাদা মাংকা চেঁচিয়ে উঠল :

"সত্যি জেংকা! আমার কাছে একবার এক বুড়ো মুগুড় এসেছিল। সে জোর করে আমাকে দিয়ে নিষ্পাপ সাজবার ভাণ করাত, আমি কাঁদতাম, চেঁচাতাম…দেখ জেনেচ্‌কা, আমাদের মধ্যে তুমি সব চাইতে চালাক-চতুর, কিন্তু আমি বাজি রাখতে পারি, সে-লোকটি কে তা তুমিও অনুমান করতে পারবে না।"

"কারারক্ষী কি ?"

"অগ্নি-নির্বাপক দলের প্রধান।"

হঠাৎ কাতিয়া গলা ছেড়ে হেসে উঠল।

"আমার কাছে একজন শিক্ষক আসত। সে নাকি এক রকম অংক শেখাত, সেটা কি রকম অংক আমি জানি না—সে আমাকে এমন ভাণ করতে বলত যেন আমি পুরুষ আর সে মেয়েমানুষ এবং আমি—জোর করে—কী বোকা! ভেবে দেখ মেয়েরা, সারাক্ষণ সে চেঁচিয়ে বলত—'আমি তোমার—একান্তই তোমার—আমাকে নাও—আমাকে নাও—"

"পাষণ্ড!" নীল-নয়না ভার্কা অপ্রত্যাশিত রকমের চাপা গলায় বলে উঠল। "পাষণ্ড।"

শান্ত তামারা বলল, "পাষণ্ড কিসের ? সে তো পাগল নয়, সব পুরুষের মতই ভ্রষ্টরুচি। বাড়িতে সুখ নেই, তাই এখানে পয়সার বিনিময়ে যা মন চায় তাই করে। আমি তো এই বুঝি।"

জেংকা এতক্ষণ কোন কথাই বলে নি। এক ঝটকায় সে বিছানায় উঠে বসল।

চিৎকার করে বলে উঠল, "তোমরা বোকা, সব্বাই বোকা! ওদের এসব তোমরা ক্ষমা কর কেন ? প্রথম প্রথম আমিও বোকা ছিলাম, কিন্তু আর না।

আমি তাদের চারপায়ে হাঁটতে বাধ্য করি, আমার গোড়ালিতে চুমু খাওয়াতে বাধ্য করি···আর সে সব ওরা ভালবাসে! দেখ, আমি টাকার পরোয়া করি না, কিন্তু যতটা পারি ওদের চামড়া তুলে নি···ওরা বৌয়ের, প্রেমিকার, মেয়েদের ফটো এনে আমাকে দেখায়, বদমাসরা।···আমাদের টয়লেট-এর দেয়ালের আঁকিবুকিগুলো তোমরা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছ···জেনে রাখ মেয়েরা, নারী জীবনে একবারই ভালবাসে, কিন্তু পুরুষ···সে তো একটা কুত্তা···সে যে শুধু বিশ্বাসহন্তা তাই নয়,···নতুন বা পুরনো কোন রক্ষিতার প্রতিই তার সাধারণ কৃতজ্ঞতাটুকু পর্যন্ত নেই···লোকে বলে···অন্তত আমি তো তাই শুনেছি যে আজকালকার যুবকদের মধ্যে অনেক নিষ্পাপ ছেলে আছে···আর জেনে রাখ, সে রকম কোন ছেলেকে চোখে না দেখলেও সে-কথা আমি বিশ্বাস করি। আমি যাদের দেখেছি তারা সকলেই লম্পট, শয়তান, জানোয়ার। সম্প্রতি আমাদের শোচনীয় জীবন নিয়ে লেখা একটা বই পড়েছি···তাতে ঠিক আমি যে রকমটা বলছি তাই লেখা আছে।"

ভান্দা ফিরে এল। ধীরে ধীরে জেংকার বিছানায় বাতিটার আড়ালে গিয়ে বসল। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ও কঠোর শ্রমে দণ্ডিত কয়েদী এবং পতিতাদের গভীর অথচ বিকৃত স্পর্শকাতরতার জন্য মেয়েরা কেউই জিজ্ঞাসা করতে পারল না, আধা ঘণ্টা সময় সে কি ভাবে কাটিয়েছে। হঠাৎ পঁচিশটা রুবল টেবিলের উপর ছুঁড়ে দিয়ে সে জোর গলায় হুকুম করল:

"আমার জন্য কিছু সাদা মদ ও এক টুকরো তরমুজ এনে দাও।"

তারপর দুই হাতে মুখ ঢেকে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল। তখনও কেউ তাকে কোন প্রশ্ন করতে সাহস করল না। শুধু জেংকার মুখ রাগে বিবর্ণ হয়ে উঠল। নীচের ঠোঁটটাকে সে এত জোরে কামড়ে ধরল যে দাঁতের দাগ স্পষ্ট ফুটে উঠল।

ভান্দা বলল, "হ্যাঁ, এখন আমি তামারাকে বুঝতে পারছি। শোন তামারা, তোমার কাছে আমি ক্ষমা চাইছি। চোর সেংকার প্রতি তোমার ভালবাসা দেখে আমি অনেক সময় ঠাট্টা করেছি। কিন্তু এখন আমি বিশ্বাস করি, পুরুষদের মধ্যে চোর আর খুনীরাই সব চাইতে ভাল মানুষ। কোন মেয়ের প্রতি তার ভালবাসাকে সে লুকিয়ে রাখে না; দরকার হলে তার জন্য সে ডাকাতি করতে বা খুন করতেও পারে। কিন্তু বাদবাকিরা! সব মিথ্যুক, ফাঁকিবাজ, জঘন্য চালবাজ, নীচ কামুক। শয়তানটার তিনটে পরিবার, স্ত্রী ও পাঁচটি ছেলেমেয়ে আছে। একজন শিক্ষয়িত্রীসহ দুটি সন্তান বাইরে থাকে। স্ত্রীর প্রথম পক্ষের একটি মেয়ে ও একটি শিশুও আছে। ছোট ছেলেমেয়েরা ছাড়া শহরের আর সকলেই একথা জানে। এমন কি ছেলেমেয়েরাও হয়তো সন্দেহ করে, এ নিয়ে কানাকানি করে। আরও ভেবে দেখ, সে একজন বিশিষ্ট লোক, সকলে তাকে শ্রদ্ধা করে।···শোন মেয়েরা, এতদিন মন খুলে কোন কথা

আমরা বলি নি, কিন্তু আজ আমি তোমাদের বলতে চাই, আমার যখন দশ বছর বয়স তখন আমার নিজের মা আমাকে ঝিতোমির শহরের ডাক্তার তাবুকিন-এর কাছে বেচে দিয়েছিল। আমি তার হাত ধরে চুমো খেলাম, আমাকে ছেড়ে দিতে অনুরোধ করলাম, চেঁচিয়ে বললাম, 'কিন্তু আমি তো ছোট,' আর সে জবাব দিল, 'তাতে কিছু যায়-আসে না, বড় তো হবেই।'···দেখ, সব ব্যাপারটাই বেদনাদায়ক, বিরক্তিকর, নোংরা।···তারপর জান সে কি করল ? আমার অন্তরের সেই হতাশ কান্না যেন একটা মস্ত বড় তামাসার কথা এইভাবে সে সারা শহরময় কথাটা বলে বেড়াল।"

"দেখ, শুরু যখন হল, তখন সব কথাই বলি।" জসিয়া শান্তভাবে কথাগুলি বলে বিষণ্ণ হাসি হাসল। "মিউনিসিপ্যাল স্কুলের শিক্ষক আইভান পেত্রভিচ জুস্ আমাকে ফুঁসলিয়ে এনেছিল। তার বাড়ি যেতে সে আমাকে হুকুম করেছিল। সেটা বড় দিনের সময় ; তার স্ত্রী গিয়েছিল বাজারে হাঁস কিনতে। সে আমাকে মিছরি খেতে দিয়ে বলল, এসপার-ওসপার হয়ে যাক। হয় আমি তার সব কথা শুনব, আর না হয় সে আমাকে খারাপ ব্যবহারের অভিযোগে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেবে। মেয়েরা, তোমাদের নিশ্চয় মনে আছে, শিক্ষকদের আমরা কত ভক্তি করতাম। অবশ্য এখানে তাদের আমরা ভয় করি না, কারণ তাদের নিয়ে এখানে যা খুশি তাই করতে পারি, কিন্তু যখন স্কুলে পড়তাম তখন একজন শিক্ষককে মনে হত জার-এর চাইতে, এমন কি ঈশ্বরের চাইতেও বেশী শক্তিমান।"

"আমার বেলায় কিন্তু একটা ছাত্র···সে ছেলেদের পড়াত...যে বাড়িতে আমি দাসী ছিলাম..."

"আঃ আমার কথাটা শোন," বলেই নিউরা হঠাৎ থেমে গেল। কোন কারণে মুখ ঘুরিয়ে সে হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল। তার চোখের দৃষ্টি অনুসরণ করে জেনি হাত তুলল। দরজায় দাঁড়িয়ে লিউব্‌কা। শুকনো চেহারা, চোখের নীচে কালো দাগ। মন্ত্রচালিতের মত সে দরজার কড়াটা খুঁজছিল, নইলে সে বুঝি মাটিতেই পড়ে যাবে।

জেনি আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে উঠল, "লিউব্‌কা ? বোকা মেয়ে ! কী হয়েছে তোমার ? কি ব্যাপার ?"

"কি হয়েছে জান ? সে আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে।"

কেউ কোন কথা বলল না। জেনি দুই হাতে চোখ ঢাকল। ঘন ঘন শ্বাস টানতে লাগল। মুখ লাল হয়ে উঠল।

"জেনেচ্‌কা, তুমি আমার একমাত্র ভরসা," নিরুত্তাপ গলায় লিউব্‌কা বলল ; তার সারা শরীরে একটা গভীর অসহায়তার ছাপ। "সকলেই তোমাকে মান্য করে···দয়া করে আন্না মার্কভ্‌না অথবা সাইমিয়ন-এর সঙ্গে কথা বল···আমাকে যেন আবার এখানে ফিরে নেয়···"

জেংকা বিছানার উপর খাড়া হয়ে বসল। শুকনো, জ্বলন্ত চোখে গভীর মমতা ফুটিয়ে লিউব্‌কার দিকে তাকাল। তারপর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল :

"আজ কিছু খেয়েছ কি?"

"না। আজ না, কালও না।"

ভান্দা বলল, "শোন জেনেচ্‌কা, কিছুটা সাদা মদ কি ওকে দিতে পারি? ভার্কা ততক্ষণে ছুটে গিয়ে রান্নাঘর থেকে মাংস নিয়ে আসতে পারবে। কি বল?"

"যা ইচ্ছা কর। অবশ্য ওতে ওর ভালই হবে। কিন্তু চেয়ে দেখ, ওর সারা শরীর ভিজে জব-জব করছে। সাদা মাংকা বা তামারা, ওকে এক জোড়া শুকনো প্যান্ট, মোজা আর চটি এনে দাও।" তারপর লিউব্‌কার দিকে ফিরে বলল, "এবার বল বোকা মেয়ে, তোমার কি হয়েছে।"

৭

শেষ বসন্তের এক সকাল বেলা লিখোনিন নিজের কাছেও একান্ত অপ্রত্যাশিতভাবেই লিউবকাকে নিয়ে আন্না মার্কভনার ফূর্তি-ভরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল।

গাছের পাতায় তখনও সবুজের আভা লেগে আছে, কিন্তু ঘাস, পাতা ও বাতাসের গন্ধে যেন বহুদূর থেকে ভেসে-আসা আসন্ন শীতের একটা হালকা, বিষণ্ণ, অথচ মধুর আমেজ পাওয়া যাচ্ছিল। লিখোনিন অবাক হয়ে গাছপালার দিকে তাকাল; কী পরিষ্কার, কী শান্ত, কী নিষ্পাপ, যেন মানুষের অলক্ষ্যে রাতের অন্ধকারে ঈশ্বরই সেগুলি লাগিয়ে গেছে। আর গাছগাছালিরাও যেন খালে, বিলে, কাঠের পুলের নীচে আধা-ঘুমন্ত শান্ত নীল জলরাশির দিকে তাকিয়ে আছে, তারা যেন তাকিয়ে আছে মাথার উপরকার আকাশের দিকে, ভোরের আলোয় ঘুম-ঘুম চোখ মেলে খুশিভরা গোলাপি হাসি হেসে উদয়-সূর্যকে অভিবাদন করছে।

ধোঁয়া-ভরা ভিড়-করা একটা ঘরে বিনিদ্র রাত কাটিয়ে এখন সকালের তাজা মধুর বাতাস ফুসফুসে ভরে নিয়ে জীবনের আনন্দে ভরপুর এই মনোরম সকালের সৌন্দর্যে ছাত্রটির মনে হল তার হৃদয় বুঝি অনেকটা প্রসারিত হয়েছে। আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। তার চাইতেও বেশী, তার নিজের মহৎ কর্মের সৌন্দর্য ও মহত্ত্ব তাকে বিহ্বল করে তুলেছে।

তার মনে হল, হ্যাঁ, সে একটা মানুষের মত কাজ করেছে। সত্যিকারের অর্থে মানুষের মত কাজ করেছে। তখনও নিজের কাজের জন্য তার কোন রকম দুঃখ হয় নি। কোন অকলংক, বুদ্ধিমতী মেয়ের সঙ্গে বসে রুটি ও চাটনির সঙ্গে চা খেতে খেতে পতিতাবৃত্তির পাপের কথা নিয়ে আলোচনা করা ভাল কাজ। কিন্তু আজ পর্যন্ত তার কোন সহকর্মী কি একটি নারীকে সেই

নরক থেকে উদ্ধার করতে একটি পাও এগিয়েছে? এগিয়েছে কি? কিন্তু তার বেলায়, লিখোনিন-এর বেলায়, কথা ও কাজ এক সঙ্গে পা ফেলেছে।

লিউব্‌কার কোমর জড়িয়ে ধরে সে নরম ভালবাসার চোখে তার দিকে তাকাল। তবু সেই মুহূর্তে তার মনে হল, তার চোখে বুঝি পিতৃসুলভ দৃষ্টি।

লিউব্‌কার ভীষণ ঘুম পাচ্ছিল। কিছুতেই চোখের পাতা খুলে রাখতে পারছিল না। তাই পাছে ঘুমিয়ে পড়ে সেই ভয়ে সে জোর করে চোখের পাতা খুলে রাখল। তার ঠোঁটে তখনও সেই সরল শিশুর মত শ্রান্ত হাসি যা লিখোনিন সেই ঘরে তার ঠোঁটে দেখেছিল। তার মুখের কস বেয়ে সূক্ষ্ম একটা লালার ধারা গড়িয়ে পড়ছিল।

"লিউবা, প্রিয়তমা, বহু-লাঞ্ছিতা মিষ্টি মেয়েটি! দেখ, আমাদের চারদিকে সব কিছু কত সুন্দর! যেন জাগ্রত স্বর্গ! পাঁচ বছর হল আমি সূর্যোদয় দেখি নি। কোন না কোন বাধা এসে পড়েছে—হয় তাসের দল, বা মদের আসর, অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবার তাড়া। দেখ সখি, ভোরের আলো কেমন গোলাপি শিখায় ছড়িয়ে পড়েছে। সূর্য উঠছে। লিউবচ্‌কা, এ তোমার সূর্যোদয়। তোমার নতুন জীবনের শুভ সূচনা। আমার শক্ত হাতটাকে জোর করে ধর। আমি তোমাকে দেখাব সৎকাজের পথ; সাহসের সঙ্গে, নির্ভয়ের সঙ্গে জীবনের উত্থান-পতনের মুখোমুখি দাঁড়াতে শেখাব।"

লিউব্‌কা বাঁকা চোখে তার দিকে তাকাল। ভাবল, "আহা, বেচারির মাতলামি এখনও পুরো কাটে নি। কিন্তু তাতে কি। সে ভাল, দয়ালু শুধু একটু সাদাসিদে।" ঘুম-ঘুম চোখে সে একটু হাসল এবং খোঁচা-দেওয়া তিরস্কারের স্বরে বলে উঠল:

"হ্যাঁ, তুমিও আমাকে নির্ঘাৎ ঠকাবে। তোমরা পুরুষরা সব এক। তোমরা যা চাও তার পিছনেই ছোট, মজা লুটতে চাও···আর তারপর—বিদায়!"

"কী? আমি? কখনও না!" লিখোনিন চেঁচিয়ে বলে উঠল। হাত দিয়ে বুকটা একবার ঠুকল পর্যন্ত। "আমাকে তুমি চেন না! আত্মরক্ষায় অসমর্থ একটি মেয়েকে ঠকাতে আমার ভদ্রতায় বাঁধে! না! তোমার মনটাকে গড়ে তুলতে, তোমার দৃষ্টিকে প্রসারিত করতে, জীবন তোমার প্রতি যে অন্যায় করেছে, যে আঘাত হেনেছে, তোমার লাঞ্ছিত হৃদয় যাতে সে সব ভুলে যায়, তার জন্য আমি চেষ্টার ত্রুটি করব না, সমস্ত হৃদয়কে ঢেলে দেব! আমি তোমার কাছে হব বাবার মত, ভাইয়ের মত! তারপর তুমি যদি কাউকে ভালবাস, সত্যিকারের পবিত্র ভালবাসা, তাহলে যে লগ্নে তোমাকে আমি সেই অনাচারের নরক থেকে উদ্ধার করে এনেছি সে লগ্নকে আমি শুভক্ষণ বলে মনে করব!"

লিখোনিন যখন এই জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিচ্ছিল, বুড়ো কোচয়ানটি তখন নিঃশব্দে হাসছিল। বুড়ো কোচয়ানরা অনেক কিছু জানে। সামনে বসে তারা

যে যাত্রীদের সব কথাই শুনতে পায় যাত্রীরা তা সন্দেহও করে না। কে জানে এই কোচয়ানটি হয় তো অতীতে অনুরূপ বা আরও বড় বক্তৃতা শুনেছে?

লিউব্‌কা ভাবল, তার কথায় লিখোনিন রাগ করেছে, অথবা কোন কাল্পনিক প্রতিদ্বন্দ্বীর কথা ভেবে ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠেছে। এ কথা মনে হতেই তার ঘুম পালিয়ে গেল; লিখোনিনের দিকে মুখ ফিরিয়ে বিচলিত অথচ শান্ত চোখ মেলে সে তাকাল। তারপর তার কোমর জড়িয়ে ধরা লিখোনিনের ডান হাতটা আস্তে স্পর্শ করল।

"আমার উপর রাগ করো না ছোট্ট খোকাটি, আমি কখনও তোমাকে ছেড়ে অন্যের কাছে যাব না! ঈশ্বরের নামে দিব্যি করে বলছি! সত্যি বলছি, তা কখনও করব না! আমি কি জানি না তুমি আমার সব ব্যবস্থা করে দিতে চেষ্টা করছ! তুমি কি মনে কর আমি সে সব বুঝি না। তোমার মত পছন্দসই যুবক হয় না। তুমি যদি বুড়ো হতে, কুৎসিত হতে—"

"আমি সে কথা বলছি না!" লিখোনিন চেঁচিয়ে উঠল। তারপর বড় বড় কথা বলে নারীর সম-অধিকার, শ্রমের মর্যাদা, মানবিক ন্যায়, মুক্তি, প্রচলিত অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ইত্যাদি বোঝাতে লেগে গেল।

লিউব্‌কা তার কিছুই বুঝল না, একটি কথাও না। তবু তার মনে হতে লাগল তারই দোষ; তার মনে দুঃখ হল, সে কাঁপতে লাগল, এবং হয়তো বা কেঁদেই ফেলত, এমন সময় তারা গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেল।

"এই যে, আমরা বাড়ি পৌঁছে গেছি," ছাত্রটি বলল। "কোচয়ান, থামাও!"

ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে থিয়েটারি ভঙ্গীতে হাত বাড়িয়ে দিয়ে করুণ গলায় সে বলে উঠল:

"আমার ঘরে, নির্ভয় শান্ত পদক্ষেপে,
গৃহিণীর মত তুমি এস।"

কোচয়ানের বুড়োটে বাদামি মুখ একটা অতলস্পর্শ দূরদর্শী হাসিতে কুঞ্চিত হয়ে উঠল।

৮

ছ' তলার একটা ঘরে লিখোনিন থাকে। অনেক কষ্টে লিউব্‌কা সিঁড়ি বেয়ে উঠল। তার মনে হল, আর দুটো ধাপ উঠতে হলে সে সেখানেই পড়ে ঘুমিয়ে যেত। ইতিমধ্যে লিখোনিন বলে উঠল:

"বুঝতে পারছি তুমি পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছ। তাতে কি, আমার উপর ভর দাও। আমরা উপরে উঠছি। আরও, আরও উপরে। সব মানবিক আকাংখার কি এইটেই প্রতীক নয়? বন্ধু, কমরেড, আমার বাহুতে ভর দাও।"

এতে লিউব্‌কার অসুবিধা আরও বাড়ল। একা একাই তার উঠতে কষ্ট

হচ্ছিল, এবার তো তাকে লিখোনিনকেও টেনে তুলতে হচ্ছিল। কারণ সেও তো বেশ ভারি হয়ে উঠেছে। কিন্তু তার ভারের জন্য যতটা নয়, তার চাইতে অনেক বেশী বিরক্তি সে বোধ করছে লিখোনিনের বকবকানির জন্য। দাঁতের যন্ত্রণা, শিশুর কান্না বা ক্যানারি পাখির কর্কশ চিৎকারের চাইতেও তার বকবকানি অসহ্য।

অবশেষে তারা লিখোনিন-এর ঘরে পৌঁছে গেল। ঘরে চাবি দেওয়া নেই। কখনও থাকেও না। দরজা ঠেলে তারা ভিতরে ঢুকল। খড়খড়ি নামানো বলে ঘরটা অন্ধকার। ইঁদুর, কড়া তামাক, কেরোসিন, ও বহু-ব্যবহৃত বিছানার চাদরের গন্ধে ঘরটা ভরে আছে। সেই আধা-অন্ধকারে একটি অদৃশ্য প্রাণী নানা ভাবে নাক ডাকিয়ে চলেছে।

লিখোনিন খড়খড়িগুলো তুলে দিল। একটি গরীব, অবিবাহিত ছাত্রের মতই ঘরের আসবাবপত্র : একটি কুঁচকানো অগোছালো বিছানা ও অনুরূপ একখানা কম্বল; পা-ভাঙা টেবিলে একটা মোমবাতিদান। তাতে মোমবাতি নেই; মেঝেয় ও টেবিলে খান কয়েক বই; সিগারেটের না-পোড়া অংশ চারদিকে ছড়ানো; আর দেয়াল জুড়ে পাতা পুরনো সোফার উপর শুয়ে কালো কোঁকড়া চুল ও কালো গোঁফওয়ালা একটি যুবক ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হাঁ করে নাক ডাকাচ্ছে। তার শার্টের কলারের বোতাম খোলা থাকায় পার্সি ভেড়ার লোমের মত কালো কোঁকড়া লোমে ঢাকা তার বুকটা দেখা যাচ্ছে।

"নিঝেরাদ্‌জি! হেই নিঝেরাদ্‌জি! উঠে পড়!" ডাকতে ডাকতে লিখোনিন তার পাঁজড়ায় খোঁচা দিতে লাগল। "রাজপুত্তুর!"

"উ-হু-হু-হু-ম—"

"বলছি, উঠে পড়! ককেসীয় গর্দভ কোথাকার!"

"উ-হু-হু-হু-ম—"

"তোর বংশ নিপাত যাক, পূর্ব পুরুষ ও উত্তর পুরুষ সব! সুন্দর ককেসাস থেকে তারা বিতাড়িত হোক। ধন্য জর্জিয়ায় যেন আর তাদের স্থান না হয়! উঠে পড়্, পাজি কোথাকার। ওঠ্। আরবের এক-কুঁজ উট! উঠে পড়্!"

লিখোনিনকে বিস্মিত করে লিউব্‌কা এই সময় কথা বলল। তার হাত ধরে ভীরু গলায় বলল :

"প্রিয়তম, ওকে কষ্ট দিচ্ছ কেন? ও হয় তো ঘুমোতে চাইছে, ও হয় তো ক্লান্ত। ওকে ছেড়ে দাও। আমি বরং বাড়ি ফিরে যাই। দ্রুশ্‌কি ভাড়া বাবদ আমাকে পঞ্চাশ কোপেক দেবে কি? কাল আবার আমার সঙ্গে দেখা করতে যেও, কি বল?"

লিখোনিনের কেমন যেন খটকা লাগল। এই চুপচাপ ঘুম-ঘুম মেয়েটির কথা শুনে সে বিস্মিত হল। অবশ্য একটি ঘুম-কাতুরে লোকের অচেতন মনের প্রবৃত্তিগত সহানুভূতি এবং অন্যের ঘুমের জন্য নিজের ব্যবসাগত সুবিবেচনার

দ্বারাই যে সে প্ররোচিত হয়েছে এতকথা লিখোনিন বুঝতে পারে নি। কিন্তু তার সে বিস্ময় ক্ষণস্থায়ী। সে এতে যেন আহত বোধ করল। ঘুমন্ত লোকটার ঝুলে পড়া হাতে একটা নিভে-যাওয়া সিগারেট ছিল। সেই হাতটা তুলে ধরে লিখোনিন খুব জোরে নাড়া দিতে দিতে কঠোর গলায় বলে উঠল :

"শোন নিঝেরাদ্জি, আমি তোমাকে উঠতে বলছি। মল যা, আরে আমি একা নই, আমার সঙ্গে একটি মেয়েছেলে আছে। শুয়ার!"

তার এই কথাগুলি ম্যাজিকের মত কাজ করল। তার ভিতরকার একটা স্প্রিং যেন হঠাৎ খুলে গেছে এমনিভাবে ঘুমন্ত লোকটি লাফ দিয়ে উঠল। সোফার উপর বসে চোখ ও কপাল মুছতেই স্ত্রীলোকটিকে দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি শার্টের বোতাম লাগাতে লাগাতে বিচলিতভাবে আমতা-আমতা করে বলতে লাগল :

"আরে লিখোনিন, তুমি? তোমার জন্য অপেক্ষা করে করে শেষটায় ঘুমিয়েই পড়েছি। দয়া করে আমাদের নতুন কমরেডটিকে মিনিট খানেকের জন্য মুখ ফিরিয়ে থাকতে বল।"

তাড়াতাড়ি সে তার ধূসর রঙের কোটটা পড়ে নিল, আর দুই হাত দিয়ে মাথার ঘন কালো চুল কিছুটা ঠিক করে নিল। বয়স বা পরিবেশ, নির্বিশেষে মেয়েদের মধ্যে ছলা-কলার যে স্বাভাবিক বৃত্তি থাকে তারই প্রেরণায় লিউব্‌কা একটা আয়নার কাছে গিয়ে নিজের চুলটা ঠিক করে নিল। চোখের ইসারায় মেয়েটিকে দেখিয়ে নিঝেরাদ্জি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে লিখোনিন-এর দিকে তাকাল।

বন্ধু জোর গলায় বলে উঠল, "ওদিকে নজর দিও না। যা হোক, এক মিনিট বাইরে চল, সব বুঝিয়ে বলছি। লিউবচ্‌কা, মাফ কর, এক মিনিটের মধ্যেই ফিরে আসছি। তারপর তোমার আরামের ব্যবস্থা করে দিয়ে তবে যাব।"

লিউব্‌কা পাল্টা জবাব দিল, "ও নিয়ে মাথা ঘামিও না। এই সোফাতেই আমার বেশ কেটে যাবে, তোমরা বিছানাটা নিতে পার।"

"না গো না, তা হয় না। আমার এক সহকর্মী এই বাড়িতেই থাকে। তার কাছেই রাতটা কাটিয়ে দেব। মিনিট কয়েকের জন্য একটু আসছি।"

ছাত্র দুটি করিডরে বেরিয়ে গেল।

প্রায় ভেড়ার মত দেখতে প্রাচ্যদেশীয় চোখ মেলে নিঝেরাদ্জি প্রশ্ন করল, "এই মনোরম শিশু, এই পেটিকোট-পরা কমরেডটিকে কোথা থেকে জোটালে?"

বন্ধুর মুখের দিকে না তাকিয়ে তার কোটের বোতাম নিয়ে খেলা করতে করতে সে বিব্রতভাবে বলল, "তুমি বুঝতে পার নি রাজপুত্তুর; তুমি ভুল করছ, ও পেটিকোট-পরা কমরেড নয়।...কিন্তু...মানে, বন্ধুদের সঙ্গে...অর্থাৎ... মিনিট খানেকের জন্য আমরা আন্না মার্কভ্‌নার বাড়িতে ঢুকেছিলাম..."

নিঝেরাদ্জি গভীর আগ্রহে বলল, "কোথায় ঢুকেছিলে?"

"দেখ, তা শুনে তুমি কি করবে? সেখানে তল্‌পিগিন ছিল, রামসেস্ ছিল, ইয়ারচেংকো নামে একজন সহকারী অধ্যাপক ছিল…বোরিয়া সোবাশ্‌নিকভ ও আরও অন্য কয়…সকলকে মনেও নেই। সারাদিন নদীতে নৌকো চালিয়ে সন্ধ্যায় একটা রেস্তোরাঁতে গেলাম, আর শেষ পর্যন্ত শূয়োরের পালের মত ইয়াম্‌স্কায়াতে গিয়ে ঠেকলাম। তুমি তো জান ওসবে আমার রুচি নেই; কাজেই আমার পরিচিত একজন প্রতিবেদকের সঙ্গে বসে শুধু কগ্‌নাক গিলেছি। তবে হ্যাঁ, বাকিরা কেউ ছেড়ে কথা বলে নি। আর ভোরের দিকে কেন জানি না আমার মনটাও নরম হয়ে উঠল। ওই সব দুর্ভাগিনীদের জন্য খুব দুঃখ হল। নিজেদের বোনদের কথা মনে পড়ল; তাদের আমরা ভালবাসি, বিপদে রক্ষা করি, নজর রাখি; মায়েদের কথা মনে পড়ল; তাদের আমরা ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি। কেউ কখনও তাদের প্রতি রুক্ষ হলে, তাদের ধাক্কা দিলে, আঘাত করলে, সঙ্গে সঙ্গে আমরা দুষ্কৃতকারীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ি, তার গলা কাটতেও প্রস্তুত থাকি। তাই নয় কি?"

"হুম-ম" জর্জিয়াবাসীটি চোখ কুঁচকে বলে উঠল।

"দেখ, আমি ভাবলাম, যে কোন বদমাস, যে কোন খুনে-মস্তান, যে কোন ন্যুব্জদেহ বৃদ্ধ খেয়ালমাত্রই এদের যে কোন একটি মেয়েকে কয়েক মিনিটের জন্য অথবা সারা রাতের জন্য বেছে নিতে পারে এবং তারপরে অসংখ্যবার মানুষের সর্বাপেক্ষা পবিত্র অনুভূতি ভালবাসাকে নষ্ট করতে পারে, কলংকিত করতে পারে। তুমি কি বুঝতে পারছ না, এই ভাবে ভালবাসাকে কলংকিত করে, তাকে পায়ের নীচে দলে, আর তার বিনিময়ে কিছু দর্শনী দিয়ে পকেটে দুই হাত ঢুকিয়ে শিস দিতে দিতে চলে যাওয়া কী নৃশংস কাজ! আর সব চাইতে ভয়ংকর কি জান, পুরুষ ও নারী দু'য়ের কাছেই এটা একটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে; দু'জনই সমান নির্বিকার, সমান উদাসীন। তাদের অনুভূতি ভোঁতা হয়ে গেছে, তাদের মন কঠিন হয়ে গেছে। তাই নয় কি? এই ভাবে প্রতিটি নারীর মধ্যে একটি আশ্চর্য ভগ্নি, একটি দেবপ্রতিম জননীর মৃত্যু ঘটছে। আমি কি ঠিক বলি নি?"

"মানে" বাঁকা চোখে তাকিয়ে নিঝেরাদ্‌জি তো-তো করে বলল।

"দেখ, তখন আমি ভাবলাম—শুধু কথা বলে আর অকারণে হৈ-চৈ করে কি লাভ! সভা-সমিতিতে ঐ সব কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন চুলোয় যাক! (এখানে প্রতিবেদকের কথাগুলি হঠাৎ লিখোনিন-এর মনে পড়ে গেল।) চুলোয় যাক পতিতালয়ে বাইব্‌ল্ বিতরণ আর ম্যাগ্‌দালেন আশ্রয়-শিবির! ভাবলাম, আমি কাজ করব একজন সত্যিকারের সৎ লোকের মত। ঐ পুতিগন্ধের ভিতর থেকে একটি মেয়েকে উদ্ধার করব, শক্ত মাটিতে শিকড় গাড়তে তাকে সাহায্য করব, তাকে আশা দেব, উৎসাহ দেব, তার প্রতি দয়ালু হব।"

"হুম" বলে জর্জিয়াবাসী মুখ বিকৃত করল।

"আঃ রাজপুত্তুর, তোমার মন বড়ই নোংরা! তুমি কি বুঝতে পারছ না যে আমি একটি নারীর কথা বলছি না, বলছি একটি মানুষের কথা; দেহের কথা নয়, বলছি আত্মার কথা।"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে বন্ধু। বাকিটা বল।"

"বাকিটা হল—আমি যেমনটি ভেবেছি সেই মত কাজও করেছি। আন্না মার্কভ্‌নার বাড়ি থেকে বের করে একটি মেয়েকে সাময়িকভাবে এখানে নিয়ে এসেছি। তারপর—যা থাকে কপালে! প্রথমে তাকে কিছু লেখাপড়া শেখাব, তারপর একটা খাবারের দোকান, অথবা টিফিনের দোকান, বা হয় তো একটা মুদিখানা দোকান তাকে খুলে দেব। আমি জানি, আমার কমরেডরা আমাকে সাহায্য করবে। প্রিয় বন্ধু, মানুষের মন, যে কোন মানুষেরই মন চায় হৃদয়ের উত্তাপ, চায় দয়া। তোমরা দেখ, দু'এক বছরের মধ্যেই আমি সমাজকে ফিরিয়ে দেব এমন একটি সুন্দর, সক্ষম, পরিশ্রমী মানুষ যার অকলংক আত্মার সম্মুখে খোলা থাকবে সব রকম সম্ভাবনার দ্বার। এই মেয়েটি তার দেহটাকেই দান করে এসেছে, তার আত্মা আজও নিষ্পাপ ও পবিত্র।"

"চু, চু, চু," রাজপুত্তুর জিভ দিয়ে শব্দ করল।

"এটা কি হল তিফ্‌লিসের গর্দভ?'

"তুমি কি ওকে একটা সেলাই-কলও কিনে দেবে?"

"সেলাই-কল কেন? তোমার কথা বুঝতে পারলাম না।"

"কারণ, বন্ধু হে, উপন্যাসে সেই রকমই করা হয়। যে মুহূর্তে নায়ক কোন মিষ্টি অথচ নষ্ট আত্মাকে উদ্ধার করে সঙ্গে সঙ্গেই সে তাকে একটা সেলাই-কল এনে দেয়।"

"বাজে কথা থামাও", 'লিখোনিন রেগে বলল। "তুমি একটি ভাঁড়!"

জর্জিয়াবাসীটি হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল; তার কালো চোখে আগুনের ঝিলিক দেখা দিল; কণ্ঠে লাগাল ককেসাস-এর ছোঁয়া:

"না, না, বাজে কথা নয়। দুটোর যে কোন একটা ঘটবে, তবে তার ফল হবে একই। হয় তুমি তার সঙ্গে বাস করবে আর পাঁচ মাস পরেই তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে; ফলে সে আবার পতিতালয়ে ফিরে যাবে বা পথে পথে ঘুরে বেড়াবে। এটাই ঘটনা। আর না হয় তার সঙ্গে বাস না করে তুমি তার ঘাড়ে কিছু দৈহিক বা মানসিক কাজ চাপিয়ে দেবে। তার অশিক্ষিত অজ্ঞান মনকে তুমি গড়ে তুলতে চেষ্টা করবে, ফলে সে বিরক্তিতে চোখের জলে ভাসবে এবং পালিয়ে গিয়ে আবার পতিতালয়ে ঢুকবে বা পথে পথে ঘুরে বেড়াবে। এটাও ঘটনা। অবশ্য আরও একটি সম্ভাবনাও আছে। ল্যান্সিলট-এর মত ভাই হিসাবে তুমি তার দেখাশুনা. করবে, আর সে অন্য একজনের প্রেমে পড়বে। বিশ্বাস কর বন্ধু, নারী সব সময় নারীই থাকবে। আর নারী কখনও ভালবাসা ছাড়া বাঁচতে পারে না। কাজেই সে তোমার কাছ থেকে পালিয়ে তার

প্রেমিকের কাছে চলে যাবে, আর সেও কিছুদিন তাকে নিয়ে, তার দেহটা নিয়ে মজা লুটবে। তিন মাস পরে সেও তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে।"

ভারাক্রান্ত মনে লিখোনিন দীর্ঘশ্বাস ফেলল। নিজের মনের অবচেতনের অতলে সে অনুভব করল, নিঝেরাদ্জির কথা সত্য হতেও পারে। কিন্তু অতি দ্রুত সে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেল; মাথা নেড়ে বন্ধুর দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বিজয়দৃপ্ত ভঙ্গীতে কথা বলে উঠল।

"আমি বাজি রেখে বলছি, ছ মাসের মধ্যে তোমাকে কথা ফিরিয়ে নিতে হবে এবং ক্ষমা চাওয়ার বদলে এক ডজন বোতল ককেসীয় মদ আমাকে খাওয়াতে হবে, বুঝলে জর্জিয়ার ছাগল।"

ককেসাস-এর ছাত্রটি সজোরে লিখোনিন-এর হাত চেপে ধরে বলল, "বেশ, রইল বাজি! কিন্তু যদি আমি জিতি, তাহলে তোমার পালা।"

"নিশ্চয় আমার পালা। আ রিভোয়া, রাজপুত্তুর। ভাল কথা, তুমি রাতটা কোথায় কাটাবে?"

"এখানে, একই করিডরে, সলোভিয়েভ-এর কাছে। আর তুমি নিশ্চয়ই মধ্য যুগের নাইটের মত তোমার আর মনোহারিণী রোজমুণ্ডার মধ্যে একখানা দু'মুখো তরবারি রেখে দেবে, কি বল?"

"বাজে কথা। আমি ভেবেছিলাম সলোভিয়েভ-এর ওখানেই রাতটা কাটাব। কিন্তু তুমি যখন সেখানেই যাচ্ছ, তখন আমি কিছুক্ষণ রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরব, আর তারপরে জাইচেভ্স্কি, বা ফ্রাঙ্গ-এ চলে যাব। বিদায়, রাজপুত্তুর।"

৯

লিখোনিন একা। তার মনে এমন একটা ভাব জাগল যা যুগপৎ নির্জীব ও সজীব। দীর্ঘদিন নিদ্রাহীন অবস্থায় কাটালে সে রকম ভাব প্রত্যেকের মনেই দেখা দেয়। তার মনে হল, দৈনন্দিন জীবনের সীমানা ছাড়িয়ে সে বহুদূর চলে এসেছে; সে জীবন এখন তার কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গেছে; তার প্রতি কোন আকর্ষণও সে বোধ করছে না। সেই সঙ্গে তার চিন্তা-ভাবনায়ও দেখা দিয়েছে এক ধরনের শান্ত স্বচ্ছতা ও সুস্পষ্ট বৈরাগ্য। এই নির্বাণের অবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে একটা আকর্ষক অথচ একঘেয়ে নির্জীবতা। তারপর তার মনে পড়ল লিউব্কার কথা। চৈতন্যের গভীর থেকে কে যেন তাকে বলতে লাগল, ভিতরে গিয়ে তার আরামের ব্যবস্থা কর, প্রাতরাশের জোগার কর; কিন্তু এ ব্যাপারে তার কিছু করণীয় আছে তা সে কিছুতেই মেনে নিল না। সে পথে নামল।

উদ্দেশ্যহীনভাবে পথে পথে সে অনেক ঘুরল। হঠাৎ এক সময় তার খেয়াল হল, সূর্য আকাশে অনেকখানি উঠে এসেছে।

সে ভাবল, "এতক্ষণে নিশ্চয় তার ঘুম ভেঙেছে; কিন্তু যদি সে না জেগে

থাকে তাহলে আস্তে সোফায় শুয়ে একটু ঘুমিয়ে নেব।"

লিখোনিন-এর ঘরের দরজায় তখনও তালা ছিল না। নিঃশব্দে দরজা খুলে সে ভিতরে ঢুকল। জানালার ফ্রেম আর পর্দার ফাঁক দিয়ে এক ঝলক নীলাভ আলো ঘরের মধ্যে এসে পড়েছে। লিখোনিন ঘরের মাঝখানে থামল; একান্ত আগ্রহে লিউব্‌কার শান্ত শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে লাগল। তার ঠোঁট এত গরম ও শুকনো হয়ে উঠতে লাগল যে সে বার বার ঠোঁট ভেজাতে লাগল। তার হাঁটু কাঁপতে লাগল।

"তার কোন কিছু লাগবে কি না আমার জানা দরকার," কথাটা হঠাৎ তার মনে উঁকি দিল।

মাতালের মত হাঁ করে ঘন ঘন শ্বাস টানতে টানতে স্খলিত পায়ে সে বিছানার দিকে এগিয়ে গেল।

লিউব্‌কা চিৎ হয়ে ঘুমিয়ে আছে। তার একটা খোলা হাত রয়েছে পাশে, আর একটা রয়েছে বুকের উপর। লিখোনিন তার মুখের উপর অনেকখানি ঝুঁকল। লিউব্‌কা একভাবে শ্বাস টেনে চলেছে। তার স্বাস্থ্যদীপ্ত যুবতী দেহের ঘ্রাণ পরিচ্ছন্ন ও সুগন্ধ। সে অতি যত্নসহকারে মেয়েটির হাতের উপর আঙুল বুলিয়ে দিল, তার কণ্ঠার হাড়ের ঠিক নীচে বুকের উপর টোকা দিতে লাগল। তার শংকিত বিবেক চিৎকার করে বলল, "এ আমি কী করছি?" আবার লিখোনিন-এর হয়েই কে যেন জবাব দিল, "আমি তো কিছু করছি না, আমি শুধু জানতে চাইছি তার ভাল ঘুম হয়েছে কি না, তার একটু চা চাই কি না।"

হঠাৎ লিউব্‌কার ঘুম ভেঙে গেল। সে চোখ খুলল, কয়েক সেকেণ্ডের জন্য বন্ধ করল, তারপর আবার খুলল। আরাম করে শরীরটাকে টান-টান করল, তারপর ঘুম-ঘুম মিষ্টি হাসি হেসে দুই শক্ত হাতে তার গলাটা জড়িয়ে ধরল।

"আমার মনের মানুষ! আমার নাগর!" পরম সুখে সে ফিসফিসিয়ে বলল, ঘুমের জন্য গলার স্বর তখনও ঈষৎ কর্কশ। "তোমার জন্য আমি কতক্ষণ অপেক্ষা করে ছিলাম। একটু রাগও করেছিলাম। তারপর ঘুমিয়ে পড়লাম। সারা রাত তোমাকেই স্বপ্নে দেখেছি। এস, এস আমার আদরের ধন"। সে লিখোনিনকে বুকের উপর চেপে ধরল।

লিখোনিন বাধা দিল না। আস্‌পেন পাতার মত সে তখন কাঁপছে। দাঁতে দাঁত লেগে শব্দ হচ্ছে। তবু তারি ফাঁকে বারবার অস্পষ্ট স্বরে সে বলতে লাগল:

"না লিউবা, না, এ সব করো না···সত্যি লিউবা, এ কাজ করো না···আঃ, আমাকে যেতে দাও···আমাকে একা থাকতে দাও···আমাকে জ্বালিও না ···নিজের কথা আমি বলতে পারছি না···আমাকে যেতে দাও লিউবা, ঈশ্বরের দোহাই···"

মেয়েটি হেসে উঠল, "কি বোকা ছেলে। কাছে এস, আমার সুখ।" তারপর লিখোনিন-এর সামান্য বাধাকে জয় করে তার ঠোঁট দিয়ে লিখোনিন-এর ঠোঁটকে চেপে ধরে সমস্ত হৃদয় দিয়ে তাকে চুমো খেতে লাগল, জীবনে এই প্রথম, বুঝি বা এই শেষ বারের মত একান্ত আবেগে তাকে চুমো খেতে লাগল।

"আঃ, আমি কী পাষণ্ড! এ আমি কী করছি?" লিখোনিন-এর ভিতর থেকে সৎ, সতর্ক, কিন্তু অলীক কে যেন বলে উঠল।

"দেখ তো, এবার—আরও ভাল লাগছে না?" পুনরায় সাদরে চুমো খেয়ে লিউব্‌কা বলল। "আঃ, তুমি, তুমি আমার ছোট্ট ছাত্রটি।"

১০

পোষাক না ছেড়েই লিখোনিন-ঝুলে-পড়া সোফাটার উপর আছড়ে পড়ল। যন্ত্রণায়, ক্রোধে এবং নিজের প্রতি, লিউব্‌কার প্রতি, এমন কি সারা পৃথিবীর প্রতি বিতৃষ্ণায় তার মন ভরে উঠেছে। লজ্জার অগ্নি-জ্বালায় সে দাঁতে দাঁত ঘসতে লাগল। ঘুম এল না। লিউব্‌কাকে উদ্ধার করে আনার কথাটাই বার বার মনে পড়তে লাগল। কী বোকার মত কাজ সে করেছে—সস্তা প্রহসন আর গম্ভীর নাটকের কী কদর্য সমাবেশ।

তার মাথাটা জ্বলছে, চোখের পাতা পুড়ছে, ঠোঁট শুকিয়ে গেছে। একটার পর একটা সিগারেট টানতে লাগল। টেবিলের কাছে গিয়ে কুজো শুদ্ধই গলায় ঢেলে দিল। শেষ পর্যন্ত অনেক চেষ্টায় গত রাতের ঘটনাটাকে মন থেকে তাড়িয়ে দিল। গাঢ় স্বপ্নবিহীন ঘুম এসে একখানি ঘন কালো পর্দার মত তাকে ঢেকে দিল।

বিকেল তিনটে-চারটে নাগাদ ঘুম ভাঙল। কিছুক্ষণ সে কিছুই ভাবতে পারল না। আবছা দৃষ্টি মেলে চারদিক দেখল। তার মনটা ফাঁকা হয়ে গেছে, গত রাতে কি ঘটেছিল তার কিছুই মনে নেই। কিন্তু সে যখন দেখতে পেল মাথাটা নীচু করে দুই হাত ভাঁজ করে লিউব্‌কা শান্ত, নিশ্চলভাবে বিছানার উপর বসে আছে, তখন সে লজ্জায় ও বিরক্তিতে আর্তনাদ করে উঠল। সব কিছু মনে পড়ে গেল। আর সেই মুহূর্তে সে বুঝতে পারল, আগের রাতের বোকামির ফলের কথা সকালে চিন্তা করা কতদূর অসহ্য।

লিউব্‌কা আদরের গলায় বলল, "বন্ধুর ঘুম ভাঙল?"

সে বিছানা ছেড়ে সোফার কাছে গেল এবং লিখোনিন-এর পায়ের কাছে বসে আস্তে আস্তে তার পায়ে টোকা দিতে লাগল।

বলল, "আমার ঘুম অনেকক্ষণ ভেঙেছে। পাছে তোমার ঘুম ভাঙে, তাই চুপচাপ বসে ছিলাম। তুমি তো খুব ঘুমিয়েছ।"

সে ঝুঁকে পড়ে লিখোনিন-এর গালে চুমো খেল। লিখোনিন মুখ বেঁকিয়ে তাকে আস্তে সরিয়ে দিল।

"দাঁড়াও লিউবচ্‌কা, দাঁড়াও। এর কোন দরকার নেই। তোমাকে বুঝতে হবে যে, এ জিনিস আর ঘটবে না। গতকাল, দেখ—ওটা একটা দুর্ঘটনা মাত্র। আমারই দুর্বলতা। হয় তো তার চাইতেও খারাপ কিছু—সাময়িক বিশ্বাসঘাতকতা। কিন্তু, ঈশ্বরের দোহাই, আমার কথা বিশ্বাস কর, তোমাকে রক্ষিতা করে রাখবার ইচ্ছা আমার কখনও ছিল না। আমি চেয়েছিলাম তুমি হবে আমার বন্ধু, আমার বোন, আমার কমরেড। কিন্তু কিছু ভেব না, সব ঠিক হয়ে যাবে। শুধু আমাদের শক্ত হতে হবে। এবার দয়া করে জানালার কাছে গিয়ে একটু বাইরে তাকিয়ে থাক। আমি একটু সাফ-সাফাই হয়ে নি।"

একটুখানি ঠোঁট ফুলিয়ে লিউব্‌কা জানালার কাছে গিয়ে লিখোনিন-এর দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল। তার সরল চাষী আত্মা আর অনগ্রসর মন বন্ধুত্ব, ভ্রাতৃত্ব, কমরেডত্ব প্রভৃতি কথার মানে ঠিক ধরতে পারছিল না। সে শুধু এইটুকু জেনেই খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠেছিল যে, তার সব ভার যে নিতে যাচ্ছে সে যেমন-তেমন লোক নয়, সে একটি ছাত্র, একটি শিক্ষিত লোক, একজন হবু ডাক্তার, উকিল, অথবা বিচারক। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, সে তার খেয়াল মিটিয়েছে, যা চেয়েছিল তা পেয়েছে, আর এখন পিছু হটছে। এই পুরুষগুলো সব সমান!"

লিখোনিন তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। কয়েক আঁজলা জল মুখে ছিটিয়ে পুরনো তোয়ালে দিয়ে মুখটা মুছে ফেলল। তারপর পর্দাগুলি তুলে দিয়ে খড়খড়িগুলো খুলে দিল। সোনালি রোদ, নীল আকাশ, শহরের গুঞ্জন, লেবু ও বাদাম গাছের সবুজ পাতা, ট্রলি-গাড়ির ঘড়্‌-ঘড়্‌ শব্দ, ধুলোমাখা রাস্তার শুকনো গন্ধ—সব এক সঙ্গে এই উপরতলার ছোট ঘরটার মধ্যে যেন হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল। লিখোনিন লিউব্‌কার কাছে গিয়ে তার ঘাড়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

"কিছু মনে করো না মিষ্টি মেয়ে। যা হবার তা হয়ে গেছে। কিন্তু এর থেকে আমরা যেন ভবিষ্যতের শিক্ষা গ্রহণ করি। তুমি প্রাতরাশের কথা বলে দিয়েছ কি?"

"না, তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। তাছাড়া, কাকে বলতে হবে তাও আমি জানি না। তুমি কত ভাল! বন্ধুর সঙ্গে কথা বলে তুমি ফিরে এলে, দরজার সামনে দাঁড়ালে, সব আমি শুনতে পেয়েছিলাম। অথচ তুমি আমাকে শুভ-রাত্রিও জানালে না। এটা কি ভাল?"

মুখে জলের ছিঁটে, সোনালি, নীল, দক্ষিণ আকাশের শোভা, লিউব্‌কার অর্ধেক শান্ত অর্ধেক বিরক্ত, সরল মুখ এবং যতই যা হোক সে পুরুষ মানুষ, কাজেই যে জট তারা পাকিয়ে তুলেছে সে জন্য সেই দায়ী, লিউব্‌কা নয়, এই উপলব্ধি—সব কিছু যেন এক সঙ্গে তার মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করল; জোর

করে সে নিজেকে সংযত করল। দরজা খুলে আবছা আঁধারে ঢাকা করিডর থেকেই সে হাঁক দিল।

"আ—লেক—জান্দ্রা! সামো—ভার! দুটো রুটি, মাখন ও বলগ্‌না—আর একটা ছোট বোতল ভদ্‌কা।"

করিডরে চটির ফট্‌ফট্‌ শব্দ শোনা গেল। বুড়ো গলায় কে যেন বলে উঠল :

"চেঁচাচ্ছ কেন? বলি চেঁচাচ্ছ কেন? আস্তাবলের ঘোড়া যেন। দেখে তো মনে হয় বিয়ের বয়স হয়েছে, কিন্তু চেঁচাচ্ছ যেন রাস্তার ছোকরা। কি চাই?"

একটি বুড়ি ঘরে ঢুকল। লাল পাতার নীচে গর্তের মত দুটো চোখ, কাগজের মত সাদা মুখের উপর একটা খাড়া নাক দুর্লক্ষণের মত ঠেলে উঠেছে। এই হল আলেকজান্দ্রা, ছাত্রদের এই বাসা-বাড়ির পুরনো দাসী, বান্ধবী ও সব ছাত্রের মহাজন। বয়স পয়ষট্টি বছর, তর্ক করতে ভালবাসে, তার নালিশ-ফরিয়াদের শেষ নেই।

লিখোনিন অর্ডারের পুনরাবৃত্তি করে একটা রুবলের নোট তার হাতে দিল। বুড়ি কিন্তু নড়ল না, আলোর দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়ানো মেয়েটির দিকে বিরূপ দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল।

লিখোনিন হেসে বলল, "ব্যাপার কি আলেকজান্দ্রা, তুমি কি পাথর হয়ে গেলে, না কি প্রশংসায় গলে গেলে? আরে, এ হচ্ছে আমার বোন, জ্ঞাতি, লিউবভ,"...এক মুহূর্ত ইতস্তত করে সে সজোরে বলে উঠল, "লিউবভ ভাসিলিয়েভ্‌না, আমি ডাকি লিউবচ্‌কা। ও যখন এই এতটুকু তখন থেকেই ওকে চিনি।" সে নিজের হাতটা মেঝে থেকে বারো ইঞ্চি তুলে দেখাল। "অবাধ্য হলে ওকে কত কান মুলে দিয়েছি, সাজা দিয়েছি।...কত ঝিঁঝিঁ পোকা ও ফড়িং-প্রজাপতি ধরে দিয়েছি...আচ্ছা আলেকজান্দ্রা, এবার তাহলে এস হে আমার মিশরদেশের মমি, অতীত শতাব্দীর টুকরোটি। জলদি যাও—এক পা এখানে, আরেক পা ওখানে।"

বুড়ি কিন্তু নড়ল না। তীক্ষ্ণ দুটো চোখে লিউব্‌কার দিকে তাকিয়ে তোবড়ানো মুখ খুলল।

"জ্ঞাতি বোন...ও সব জ্ঞাতি বোন আমরা চিনি...বাদাম গাছে অমন কত আছে...আঃ, কুত্তার দল, কিছুতেই আশ মেটে না!"

"হেই, ভাঙা নৌকো! বাঁচতে চাও তো পালাও। ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ করো না।" লিখোনিন খেঁকিয়ে উঠল। "নইলে তোমার বন্ধু ত্রিয়াসভ যেমন করেছিল সেই রকম চব্বিশ ঘণ্টা টয়লেটে আটকে রেখে দেব।"

আলেকজান্দ্রা চলে গেল। বেশ কিছুক্ষণ তার চটির শব্দ আর বকবকানি শোনা গেল। উগ্র অথচ দয়ালু স্বভাবের জন্য ছাত্রদের অনেক কিছুই সে চল্লিশ

বছর ধরে ক্ষমা করে এসেছে। মাতলামি, জুয়া খেলা, লড়াই, হৈ-হল্লা-হুজ্জুৎ—সব সে ক্ষমা করতে পারে; কিন্তু সে চিরকুমারী, তাই চারিত্রিক অধঃপতন সে সইতে পারে না।

১১

"এই তো বেশ…চমৎকার…এই তো সুন্দর হল…" পা-ভাঙা টেবিলটার চারদিকে ঘুরে ঘুরে চায়ের সরঞ্জামগুলি অকারণে নতুন করে সাজাতে সাজাতে লিখোনিন কথাগুলি বলতে লাগল। "আমি বুড়ো কুমীর কতদিন এমন পারিবারিক পরিবেশে সৎ খৃস্টানের মত প্রাতরাশ খাই নি। লিউবা, এখানে বস। এখানে সোফায় বসে চা ঢেলে দাও। এই সাত-সকালে তুমি বোধ হয় ভদ্‌কা খাবে না, কিন্তু আমি খাব…। ওটা স্নায়ুর পক্ষে ভাল, উত্তেজক। দয়া করে আমার চাটা একটু কড়া করে বানাও, একটুকরো লেবু দাও। আঃ, সুন্দরী নারীর হাতে ঢালা এক গ্লাস গরম চায়ের চাইতে সুস্বাদু আর কি হতে পারে?"

এমন হড়বড় করে সে কথাগুলি বলল যেটা মোটেই স্বাভাবিক নয়। তবু লিউব্‌কা সেটা শুনতে শুনতে হাসতে লাগল। সে হাসিতে প্রথম কিছুটা সতর্কতা ও সন্দেহ ফুটে উঠলেও ক্রমেই তা নরম ও উজ্জ্বল হয়ে উঠল। একে সে ভাল চা বানাতে পারে না, তার উপরে লিখোনিন-এর হৈ চৈ-র ফলে সে আরও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল।

লিখোনিন তখনও বলেই চলেছে, "দেখ, চা তৈরি একটা খুব বড় আর্ট। সেটা মস্কো গিয়ে শিখতে হয়। প্রথমে, চায়ের শুকনো পাত্রটাকে ঈষৎ গরম করতে হবে। তার মধ্যে চা দিয়ে দ্রুত হাতে তাতে ফুটন্ত জল মেশাতে হবে। জলটা সঙ্গে সঙ্গে ঢালতে হবে। দেখ, ফুটন্ত জলে চা পরিষ্কার হয়, সুগন্ধ হয়; তাছাড়া, জানই তো চীনারা মূর্তিপূজা করে আর চায়ের পাতাও অপরিষ্কার থাকে। তারপর টি-পটের সিকি ভাগ ফুটন্ত জলে ভরে একখানা তোয়ালে দিয়ে ঢেকে সাড়ে তিন মিনিট রেখে দিতে হবে। তারপরে পুরো পটটা জলে ভর্তি করে আবার ঢেকে দিয়ে অল্পক্ষণ রেখে দিতে হবে। বাস, তৈরি হয়ে যাবে স্বর্গীয় পানীয়—সুগন্ধ, সতেজ, উত্তেজক।"

লিউব্‌কার ছিট্‌ছিট্‌ তিল-ভরা সাদাসিদে অথচ আকর্ষণীয় মুখখানি ম্লান হয়ে গেল।

"ঈশ্বরের দোহাই, আমার উপর রাগ করো না…তোমার নাম তো ভাসিল ভাসিলিচ, তাই না? দয়া করে আমার উপর রাগ করো না ভাসিল ভাসিলিচ। তোমাকে কথা দিচ্ছি, আমি শিখে নেব।…খুব তাড়াতাড়ি পারব…আর…অত বিনীতভাবে আমার সঙ্গে কথা বলো না। আমরা তো অপরিচিত নই।"

সে ভীরু চোখ তুলে তাকাল। তার এই সংক্ষিপ্ত দুঃখময় জীবনে আজ সকালেই সর্বপ্রথম তার দেহ দান করেছে কৃতজ্ঞতায় ও করুণায়, অর্থের জন্য নয় স্বেচ্ছায়, বাধ্য হয়ে নয়, বিতাড়িত হবার বা অপমানিত হবার ভয়েও নয়। যে শাশ্বত নারী-হৃদয় সূর্যের দিকে সূর্যমুখী ফুলের মত অনন্ত কাল ধরে ভালবাসার দিকে তাকিয়ে থাকে, আজ বুঝি তার জাগরণ ঘটেছে।

কিন্তু লিখোনিন-এর মন হঠাৎ একটা তীব্র লজ্জায় এবং এই নারীটির প্রতি শত্রুতার অনুভূতিতে ভরে গেল। এই নারী কালও তার কাছে ছিল অপরিচিতা, আর আজই আকস্মিকভাবে হয়েছে তার রক্ষিতা। উঠে লিউব্‌কার দিকে যেতে যেতে সে ভাবল, "পারিবারিক জীবনের সুখ শুরু হয়ে গেছে।" মেয়েটির হাত ধরে কাছে টেনে নিয়ে সে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

বিগলিত অথচ নকল গলায় বলতে লাগল, "প্রিয় বান্ধবী আমার, প্রিয় বোনটি আমার, আজ যা ঘটেছে সে রকমটা আর কখনও ঘটবে না। সব দোষ আমার; তুমি যদি চাও তাহলে নতজানু হয়ে তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে আমি প্রস্তুত। বিশ্বাস কর, দয়া করে বিশ্বাস কর, এটা ঘটেছে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, অকস্মাৎ, বিস্ফোরণের মত···এ রকমটা যে হবে তা আমি কখনও ভাবি নি···কি জান··· দীর্ঘদিন কোন মেয়ের সঙ্গে আমি ঘনিষ্ঠভাবে মিশি নি··· আর নিজেকে সামলাতে পারি নি···ভিতরকার পশুটা জেগে উঠেছিল ··একটা অশুভ, উচ্ছৃংখল পশু ··আমি সামলাতে পারলাম না···কিন্তু, হে ঈশ্বর, আমার দোষ কি এতই বড়? পবিত্র ঋষিরা, সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীরা, নিঃসঙ্গ মানুষরা, শহীদরা, অন্তরের ধৈর্যশীলতার দিক থেকে যাদের সঙ্গে আমার তুলনাই হয় না, দেহের সঙ্গে সংগ্রামে তারাও তো অনেক সময় লোভের বশীভূত হয়েছে···তুমি যাকে বলবে তার নামেই আমি প্রতিজ্ঞা করব যে এ রকমটা আর কখনও ঘটবে না···তাহলে তুমি খুশি হবে তো?"

যতক্ষণ ধরে সে কথাগুলি বলেছে ততক্ষণই লিউব্‌কা প্রাণপণে হাতটা ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করেছে। ঠোঁট দুটো ফুলিয়ে সরিয়ে নিয়েছে, চোখ দুটো মিটমিট করেছে।

একগুঁয়ে ছোট মেয়ের মত সে হেঁকে বলল, "হু—ব। আমি বেশ বুঝতে পারছি, আমাকে তোমার পছন্দ নয়। সে কথা খোলাখুলি বললেই তো হয়··· যদি ইচ্ছা হয় তো দ্রশ্‌কি-ভাড়া ও আর যা খুশি আমাকে দিয়ে দাও। রাতের টাকা তো দিয়েই দিয়েছ···এখন শুধু ফিরে যেতে যেটুকু দরকার তাই চাই··· বাস।"

লিখোনিন মাথার চুল চেপে ধরে ঘরময় ঘুরতে ঘুরতে করুণ স্বরে বলে উঠল, "আঃ, না, সে কথা নয়! সে কথা আমি বলি নি! তুমি কি আমার কথা বুঝতে পারছ না লিউবা? আজ সকালে যা ঘটেছে তাই যদি চলতে থাকে···

সে যে···সে যে নোংরামি, সে যে অধঃপতন, কোন আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন মানুষেরই উপযুক্ত নয়। ভালবাসা! ভালবাসা হল মনের, হৃদয়ের, চিন্তার, স্বার্থের পরিপূর্ণ মিলন···শুধু দেহের মিলন নয়! ভালবাসা এক মহৎ গম্ভীর অনুভূতি, পৃথিবীর মত শক্তিশালী, শুধু বিছানার আরামটুকুই নয়। লিউবচ্‌কা, তোমার-আমার মধ্যে সে রকম ভালবাসা তো নেই। তা যদি থাকত, তাহলে আমাদের উভয়ের পক্ষেই সে হত এক আশ্চর্য সুখ। কিন্তু আপাততঃ, আমি তোমার বন্ধু, তোমার জীবন-পথের বিশ্বস্ত সঙ্গী। সেই তো যথেষ্ট···তা নিয়েই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে···যদিও মানবিক দুর্বলতা আমারও আছে, তবু নিজেকে আমি সৎ লোক বলে মনে করি।"

লিউব্‌কাকে খুবই বিষণ্ণ মনে হল। সে ভাবতে লাগল, "এই লোকটি ভেবেছে আমি চাই সে আমাকে বিয়ে করুক···কিন্তু আমি তা মোটেই চাইনা ···বিয়ে না করেই আমরা বেশ চলতে পারি। অনেক রক্ষিতাই তো রয়েছে ···তারা তো বলে গীর্জায় যাওয়ার থেকে সেটা অনেক ভাল। তাতে ক্ষতি কি? বেশ শান্ত, সম্মানের জীবন। আমি তার মোজা সেলাই করে দেব, ঘর মুছব, সাধারণ রান্না করে দেব। স্বাভাবিকভাবেই পরে হয় তো সে কোন ধনী মেয়েকে বিয়ে করে বসবে···কিন্তু নিশ্চয়ই সে তখন আমাকে কিছু না দিয়েই পথে ঠেলে দেবে না। হয় তো সে সরল মানুষ, একটু বেশী কথা বলে, তবু সে লোক ভাল।···সে নিশ্চয়ই আমার একটা ব্যবস্থা করে দেবে···যাহোক একটা কিছু···অথবা কে জানে, আমাকে হয় তো তার ভাল লাগবে···ক্রমে মনে ধরবে। আমি একটি সরল, সাধারণ মেয়ে, কখনও তার প্রতি বিশ্বাসঘাতিনী হব না। লোকে বলে, অনেক সময় তাও হয়···যাই হোক, আমার মনের কথা তাকে আমি জানতে দেব না···আর বিছানায় আসার ব্যাপারে, সে কি, ঈশ্বরের পবিত্রতা যেমন সত্যি ঠিক তেমনি আজ রাতেই সে অবশ্য আসবে।"

লিখোনিনও চুপচাপ চিন্তায় ডুবে গেল। সেও ক্লান্ত বোধ করছে। সে যেন বুঝতে শুরু করেছে, যে দায়িত্ব সে ঘাড়ে নিয়েছে তা বহন করা তার সাধ্যের অতীত। কাজেই যখন দরজায় টোকা পড়ল এবং সলোভিয়েভ ও নিঝেরাদ্‌জি ঘরে ঢুকল তখন সে বেশ খুশিই হল।

"এই গৃহের প্রতি এবং যারা ধর্মপথে, শান্তিতে ও বিনা পাপে এখানে বাস করে তাদের প্রতি," আর্কডিয়েকন-এর মত উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেই সলোভিয়েভ হঠাৎ থেমে গেল। সবিস্ময়ে সে আমতা-আমতা করে বলে উঠল, "হায় ধর্মের বাপ! একি···এ যে···এ যে···আরে চুলোয় যাক···এ তো সোনিয়া···না, ভুল করলাম···এ তো নাডিয়া···না, না, এবার চিনতে পেরেছি—এ তো আন্না মার্কভ্‌নার বাড়ির লিউবা।"

লিউব্‌কা অভিভূতভাবে কেঁদে ফেলল; দুই হাতে মুখ ঢাকল। লিখোনিন সেটা লক্ষ্য করল, বুঝল, এমন কি মেয়েটির উত্তেজনা ও বিচলিত ভাবটি

অনুভবও করল, এবং তাকে রক্ষা করতে এগিয়ে গেল। বেশ কড়া করে সলোভিয়েভকে দু'কথা শুনিয়ে দিল।

"তুমি খাঁটি কথা বলেছ সলোভিয়েভ। ঠিক সিটি-ডাইরেক্টরী-তে যেমনটি থাকে: ইয়াম্‌স্কায়ার লিউবা, একটি প্রাক্তন বেশ্যা। কালও সে বেশ্যাই ছিল। কিন্তু আজ থেকে সে আমার বান্ধবী, আমার বোন। আর আমার প্রতি যার শ্রদ্ধা আছে তাকে ওর প্রতিও সেই শ্রদ্ধা দেখাতে হবে, নইলে—"

সলোভিয়েভ সঙ্গে সঙ্গে আন্তরিকভাবে লিখোনিনকে জড়িয়ে ধরে তার পিঠ চাপড়ে দিল।

"ঠিক আছে ভাই, পাগলামি করো না...তাড়াতাড়িতে বোকার মত ভুল করে ফেলেছি...কেমন আছ বিষাদমুখী বোনটি আমার?" টেবিলের উপর দিয়ে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে সে লিউবার হাতটা চেপে ধরল। "আমাদের এই দীন কুটীরে তোমাকে পাওয়া তো পরম সৌভাগ্য। তোমার উপস্থিতি আমাদিগকে সঞ্জীবিত করবে, শান্ত ও সংযত জীবন-যাপনে আমাদের অনুপ্রাণিত করবে। আলেকজান্দ্রা! বীয়ার!" একটা হাঁক দিয়েই সে আবার লিউব্‌কাকে উদ্দেশ করে বলতে লাগল, "স্বীকার করছি, আমরা অসামাজিক ও রূঢ় হয়ে উঠেছি; মাতলামি, আলস্য ও অন্যবিধ নানা পাপের মধ্যে আমরা গড়াগড়ি যাই। আর এ সব কিছুরই কারণ, একটি নারী-হৃদয়ের স্নিগ্ধ স্পর্শ থেকে আমরা বঞ্চিত। আর একবার তোমার সুন্দর ছোট্ট হাতখানি মর্দণ করতে দাও। বীয়ার!"

"যাই!" দরজার ওপাশে আলেকজান্দ্রার ক্ষুব্ধ গলা শোনা গেল। "আমি যাচ্ছি। মেলা হল্লা করো না। ক'টা আনব?"

বীয়ারের হুকুম দেবার জন্য সলোভিয়েভ করিডরে গেল। লিখোনিন সকৃতজ্ঞ হাসি হেসে তার দিকে তাকাল। জর্জিয়াবাসী পিছন থেকে তার পিঠে একটা চাপড় দিল। সলোভিয়েভ-এর বিলম্বিত সুবুদ্ধি তাদের দু'জনকেই খুশি করেছে।

ঘরে ফিরে একটা পুরনো চেয়ারে বেশ সতর্কভাবে বসে সলোভিয়েভ বলল, "এস, এবার দিনের ব্যবস্থার কথা ভাবা যাক। কি ভাবে তোমাদের সেবা করতে পারি? আমি কি করতে পারি? আমাকে আধ ঘণ্টা সময় দাও, তাহলেই আমি এক দৌড়ে কাফেতে গিয়ে একজন সেরা দাবারুকে ধরে আনতে পারি। এক কথায়, আমি তোমাদের হুকুমের অপেক্ষায় আছি।"

লিখোনিন বলল, "সে সবের দরকার হবে না। এখনও আমি ভয়ংকর রকমের ধনী। আমি মনে করি, এখান থেকে আমাদের একটা ছোট রেস্তোরাঁয় যাওয়া দরকার। কয়েকটা ব্যাপারে তোমার পরামর্শও নিতে হবে। যত যাই বলি, তুমি আমার বড় বন্ধু, এবং প্রথম দৃষ্টিতে যতটা মনে হয় আসলে তুমি ততটা বোকা ও অনভিজ্ঞ নও। তারপর আমাকে ওর জন্য...

মানে লিউবার জন্য পাশপোর্টের ব্যবস্থা করতে হবে। তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করো, আমার বেশী দেরী হবে না।...তুমি তো সবই বুঝতে পারছ, কাজেই এ নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা করবে না তো ?" এখানে তার কণ্ঠস্বর আবেগে কাঁপতে লাগল। "কিছু দায়িত্ব তোমাকেও দেব...রাজী আছ তো ?"

"বাঃ! আমরা রাজী!" রাজপুত্তুর হাঁক দিল এবং যে কারণেই হোক লিউব্‌কার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে গোঁফে চাড়া দিল। লিখোনিন বাঁকা চোখে তার দিকে তাকাল। কিন্তু সলোভিয়েভ সরলভাবে বলল :

"ভাল কথা। লিখোনিন, তুমি একটা আশ্চর্য রকমের বড় কাজে হাত দিয়েছ। রাজপুত্তুর গত রাতেই আমাকে সব কথা বলেছে। আরে, যৌবনের ধর্মই তো এই—বীরত্বপূর্ণ ভুল করা। বোতলটা আমাকে দাও আলেকজান্দ্রা। আমি নিজেই ওটা খুলছি। তোমার হাত কেটে রক্ত বেরবে। তোমার নতুন জীবনের জন্য লিউবচ্‌কা...মাফ করো...লিউবভ···লিউবভ···"

"লিখোনভ্‌না···কিন্তু লিউবাই ভাল"

"ঠিক আছে। লিউবা। রাজপুত্তুর। আলাভার্দি!"

"ইয়াক্‌শি—অল!" বলে নিঝেরাদ্‌জি গ্লাসে হাত দিল।

গ্লাস নামিয়ে রেখে গোঁফ চাটতে চাটতে সলোভিয়েভ বলল, "বন্ধু লিখোনিন, আমি আবার বলছি, তোমার কাজে আমি ভারী খুশি হয়েছি। সেই খুশিতে তোমাকে অভিবাদন জানাই। এ ধরনের খাটি রুশ বীরত্ব প্রদর্শনে একমাত্র তুমিই সক্ষম—তোমার বীরত্বের প্রকাশ সরল, বিনীত ও অযথা বাকবাহুল্যবর্জিত।"

"বাজে কথা রাখ—এতে বীরত্বের কিছু নেই।" লিখোনিন মুখ গম্ভীর করল।

নিঝেরাদ্‌জি তাকে সমর্থন জানাল। "ঠিক কথা। তুমি সব সময়ই বল যে আমি বেশী কথা বলি, কিন্তু এখন তুমিই আজে-বাজে বকছ।"

সলোভিয়েভ পাল্টা জবাব দিল, "তাতে কি হয়েছে। হয় তো আমার ভাষাটা একটু অলংকারবহুল হয়েছে, কিন্তু তাতে কি। আমাদের এই রুচি-সম্পন্ন সমাজের বয়োজ্যেষ্ঠ হিসাবে আমি ঘোষণা করছি, লিউবা এই সমাজের একজন সম্মানিত ন্যায্য সভ্য হল।"

উঠে দাঁড়িয়ে ডান হাতটা উপরে তুলে সে করুণ সুরে বলে উঠল :

"আমাদের ঘরে, নির্ভয় শান্ত পদক্ষেপে,
গৃহিণীর মত তুমি এস।"

লিখোনিন-এর স্পষ্ট মনে পড়ল, আজ ভোরে এই একই করুণ সুরে এই কথাগুলিই সেও বলেছিল ; লজ্জায় সে চোখ দুটি বন্ধ করল।

"অনেক হয়েছে। এবার চল। পোষাক পরে নাও লিউবা।"

১২

রেস্তোরাঁ "দি স্প্যারোজ" বেশ কাছেই, তাদের বাসা থেকে দু'শ' ফুটের বেশী নয়। যাবার পথে সকলের অগোচরে লিউবা লিখোনিন-এর আস্তিন ধরে টান দিল এবং তারা দু'জন সলোভিয়েভ ও নিঝেরাদ্‌জি থেকে কয়েক পা পিছিয়ে পড়ল।

কালো শান্ত চোখ দুটি তুলে সে জিজ্ঞাসা করল, "প্রিয় ভাসিল ভাসিলিচ, তুমি যা বললে সেটা কি তোমার মনের কথা? আমাকে নিয়ে ঠাট্টা কর নি তো?"

"এখন তো ঠাট্টার সময় নয় লিউবচ্‌কা। এ সব ব্যাপার নিয়ে ঠাট্টা করবার মত অতটা নীচ আমি নই। আবার বলছি, আমি তোমার বন্ধুর চাইতেও বেশী কিছু হতে চাই, হতে চাই তোমার ভাই, তোমার কমরেড। কিন্তু সে সব কথা এখন থাক। তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আজ সকালে যা ঘটে গেছে তা আর কখনও ঘটবে না। আজ থেকেই তোমার জন্য একটা আলাদা ঘর ভাড়া নেব।"

উদারতা, সৎস্বভাব ও তৎপরতার সঙ্গে সব বিল মিটিয়ে দেবার জন্য "দি স্প্যারোজ" এ লিখোনিন-এর খুব খাতির। তাদের একটা ছোট কেবিন দেওয়া হল: এ সুবিধা কম ছাত্রই পেয়ে থাকে। নীচের দিককার একটা জানালা দিয়ে আসা এক ফালি গ্যাসের আলোয় এ ঘরটা দিনের বেলায় আলোকিত থাকে। সেই আলোয় পাশের পথ দিয়ে যাতায়াতকারীদের কেবলমাত্র জুতো, ছাতা ও বেতের ছড়িই দেখতে পাওয়া যায়।

আর একটি ছাত্র সাইমানভ্‌স্কির সঙ্গে দেখা হওয়ায় তাকেও সঙ্গে নিতে হল। লিউব্‌কা ভাবল, "মনে হচ্ছে সে যেন আমার বিদায়ের আয়োজন করছে।" এক সময় সুযোগ বুঝে তার দিকে ঝুঁকে পড়া লিখোনিন-এর কানে কানে সে বলল:

"শোন মিতা, এখানে এত লোক কেন? আমি অস্বস্তি বোধ করছি। অনেক লোকের ভিড়ে আমি স্বস্তি পাই না।"

লিখোনিন আদরের সুরে বলল, "ঠিক আছে, ঠিক আছে, সকলেই জানুক। তোমার অতীত নিয়ে লজ্জা পাবে কেন, কেন সেটাকে লুকোতে চেষ্টা করবে? এক বছর পরে তুমি যে কোন লোকের চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে নির্ভীক-ভাবে বলতে পারবে 'যার পতন নেই তার উত্থানও নেই।' হাত চালাও লিউবচ্‌কা, হাত চালাও।"

নানারকম সুখাদ্য পরিবেশন করা হতে লাগল; কিন্তু একমাত্র সাইমানভ্‌স্কি ছাড়া আর সকলেই কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। যা হোক, ভোজনের মাঝামাঝি পৌঁছে শুধু লিউব্‌কা ছাড়া আর সকলেরই জিভ খুলে গেল। সব প্রশ্নের জবাবেই সে শুধু 'হ্যাঁ' আর 'না' বলেই কাজ সারল; কোন খাবারে হাতই দিল না। বেশী কথা বলতে লাগল লিখোনিন, সলোভিয়েভ ও

নিঝেরাদ্‌জি। মেয়েটির বিচিত্র নিয়তি সকলেরই মনে আগ্রহ সৃষ্টি করেছে; প্রত্যেকেই যার যার মন্তব্যের প্রতি সাইমানভ্‌স্কির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে লাগল; কিন্তু সে প্রায় কোন কথা না বলে মাথাটাকে উঁচু করে পিঁস-নে-র নীচ দিয়ে বক্তার দিকে শুধু তাকাতে লাগল।

শেষ পর্যন্ত টেবিলের উপর আঙুল বাজাতে বাজাতে বলল, "তা বটে, তা বটে, তা বটে। লিখোনিন আশ্চর্য সাহসের সঙ্গে কাজ করেছে। সলোভিয়েভ ও রাজপুত্তুর যে তাকে সাহায্য করতে ইচ্ছুক সেটাও খুব ভাল কথা। তোমাদের এই ব্রতে সহযোগিতা করতে আমিও ইচ্ছুক। কিন্তু আমাদের নতুন বান্ধবীটিকে তার ক্ষমতা ও পছন্দমত একটা কাজে লাগিয়ে দেওয়াই কি ভাল নয়? তুমিই বল না গো, তুমি কি করতে পার? মানে, আমি বলতে চাইছি, কি ধরনের কাজ···মানে···সেলাই, ক্রচেট, নক্সা-বুনুনি···?"

ভীষণ লজ্জা পেয়ে আঙুলগুলো মোচড়াতে মোচড়াতে চোখ নীচু করে সে আস্তে আস্তে বলল, "আমি কিছু জানি না। আর এ সব কি হচ্ছে তাও বুঝতে পারছি না।"

লিখোনিন বাধা দিল, "দেখ, আমরা উল্টো দিক থেকে শুরু করেছি। ওর সামনেই আলোচনাটা তুলে ওকে অস্বস্তির মধ্যে ফেলা হয়েছে। দেখতে পাচ্ছ না, বেচারি এতই বিচলিত হয়ে পড়েছে যে কথাই বলতে পারছে না। চল লিউবা, আমরা এখান থেকে চলে যাই। তোমাকে বাসায় রেখে দশ মিনিটের মধ্যেই আমি এখানে ফিরে আসব। তারপর স্থির করব, আমরা কি করব, কি ভাবে তোমাকে সাহায্য করব।"

অস্পষ্ট গলায় লিউব্‌কা জবাব দিল, "তোমার যেমন ইচ্ছা। তুমি যা বলবে তাই করব ভাসিল ভাসিলিচ! শুধু ওই বাড়িটায় ফিরে যেতে চাই না।"

"কেন?"

"সেখানে একা থাকতে আমার খুব খারাপ লাগে···আমি বরং বাড়ির সামনে রাজপথের বেঞ্চিতে বসে তোমার জন্য অপেক্ষা করব।"

লিখোনিন বলল, "ও হো, এবার বুঝতে পেরেছি। আলেকজান্দ্রা তোমাকে ভয় দেখিয়েছে। দাঁড়াও, সেই বুড়ি টিকটিকিটাকে একবার পেলে হয়, আচ্ছা করে ধমকে দেব! চল লিউবচ্‌কা।"

ভয়ে ভয়ে সকলের সঙ্গে কর-মর্দন করে সে লিখোনিন-এর সঙ্গে চলে গেল।

কয়েক মিনিট পরেই ফিরে এসে লিখোনিন বসে পড়ল। সে বুঝতে পারল তার অনুপস্থিতিতে তাকে নিয়ে আলোচনা হয়েছে; ফলে কিছুটা অস্বস্তির সঙ্গে সে সঙ্গীদের দিকে তাকাল। তারপর দুই হাত টেবিলের উপর রেখে কথা বলতে শুরু করল।

"আমি জানি তোমরা আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু" এখানে সে বাঁকা চোখে সাইমানভ্‌স্কির দিকে একবার তাকাল, "এবং প্রয়োজন হলে তোমরা দ্রুত ও

আন্তরিকতার সঙ্গেই আমার ডাকে সাড়া দেবে। আমিও আন্তরিকভাবেই চাই যে আমার সাহায্যে তোমরা এগিয়ে এস। স্বীকার করছি, সব দিক না ভেবে-চিন্তে একটু তাড়াহুড়ো করেই আমি কাজটা করে ফেলেছি, কিন্তু আমার অভিপ্রায় নিষ্পাপ ও আন্তরিক।"

"সেটাই তো আসল কথা," সলোভিয়েভ মন্তব্য করল।

"আমার বন্ধুরা ও অপরিচিত লোকরা কি বলবে আমি থোরাই কেয়ার করি। কিন্তু মেয়েটিকে উদ্ধার করবার—মাফ কর, এই বোকা কথাটা ঠোঁট ফস্কে বেরিয়ে গেছে—মেয়েটিকে উৎসাহ দেবার, সাহায্য করবার অভিপ্রায় আমি ত্যাগ করব না। আপাতত তার জন্য একটা সস্তার ঘর ভাড়া করব, খাওয়া-দাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় টাকা দেব, কিন্তু তারপর যে কি করব সেটাই বুঝতে পারছি না। টাকাটা বড় কথা নয়। তার প্রয়োজনমত টাকার ব্যবস্থা আমি সব সময়ই করতে পারব। সে খাবে, পরবে, আর কিছুই করবে না। কিন্তু বুঝতেই তো পারছ, এর ফলে তার জীবনে দেখা দেবে আলস্য, ঔদাসীন্য ও বিরক্তি···আর তার ফল কি দাঁড়াবে তা তো বোঝই। সুতরাং তার জন্য একটা কাজের ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে। আর এই ব্যাপারেই তোমাদের পরামর্শ আমার দরকার। তোমরা ভাই একটা কিছু ভাবতে চেষ্টা কর।"

সাইমানভ্‌স্কি প্রশ্ন করল, "কিন্তু সে কি কাজ জানে? পতিতালয়ে ঢুকবার আগে সে নিশ্চয় কিছু করত।"

অসহায়তার ভঙ্গীতে হাত মেলে ধরে লিখোনিন বলল, "প্রায় কিছুই করত না। যে কোন চাষী মেয়ের মতই একটু-আধটু সেলাই জানে। পনেরো বছর বয়সেই কোন সরকারী করণিক তাকে ফুঁসলিয়ে বাড়ি থেকে বের করে আনে। সে ঘর ঝাঁট দিতে পারে, কাচাকাচি করতে পারে, সাধারণ ঝোল ও 'কাশা' রাঁধতে পারে। তার চাইতে বেশী কিছু জানে বলে মনে হয় না।"

জিভ্‌ দিয়ে একটা শব্দ করে সাইমানভ্‌স্কি বলল, "সে তো কিছুই না।"

"তাছাড়া সে লেখাপড়াও জানে না।"

এবার লিউবার পক্ষ নিয়ে সলোভিয়েভ বলল, "সেটা বড় কথা নয়। সে যদি কোন শিক্ষিতা মেয়ে, অথবা তার চাইতেও খারাপ কোন অর্ধ-শিক্ষিতা মেয়ে হত তাহলেই বরং আমাদের সব পরিকল্পনা সাবানের ফেনার মত উবে যেত, কিন্তু এখানে আমরা কাজ করছি নতুন মাটি নিয়ে।"

"হি-হি"। নিঝেরাদ্‌জি একটা অর্থবাচক শব্দ করল।

তামাসার পরিবর্তে সলোভিয়েভ এবার রেগে বলে উঠল, "শোন রাজপুত্তুর, যে কোন পবিত্র চিন্তা ও সৎ কাজকেই বিকৃত করা যায়। কিন্তু সেটা বুদ্ধিমানের কাজও নয়, প্রশংসার যোগ্যও নয়। আমাদের প্রচেষ্টার প্রতি তোমার যদি এই মনোভাব হয়, তাহলে দরজা খোলাই আছে, কেটে পড়।"

জর্জিয়াবাসীটি বিচলিতভাবে বলল, "কিন্তু···এইমাত্র···ঘরের মধ্যে তুমিই

তো বললে…।”

সলোভিয়েভ শান্ত হয়ে অনুশোচনার সুরে বলল, “হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। হঠাৎ বোকার মত কথা বলে ফেলেছি, সেজন্য আমি দুঃখিত। আমি স্বেচ্ছায় বলছি, লিখোনিন খুব ভাল ও সাহসী ছেলে আর আমার সাধ্যমত সব কিছু আমি করব। আমি আবার বলছি, লেখাপড়া জানাটা গৌণ ব্যাপার। সেটা তো সহজেই পারা যায়। লিউবার মত সরল মেয়ের পক্ষে পড়তে, লিখতে ও গুণতে শেখা, বিশেষ করে স্কুলে না গিয়ে স্বেচ্ছায় ও স্বাধীনভাবে, তো একটা বাদামকে ভেঙে দু' টুকরো করার মতই সোজা। আর খেয়ে-পরে বাঁচবার মত কোন কাজের কথাই যদি বল, সে রকম অনেক কাজ আছে যা দু' সপ্তাহেই শিখে নেওয়া যায়।”

“যেমন ?” রাজপুত্তুর প্রশ্ন করল।

“যেমন…যেমন…ধরো…কাগজের ফুল। অথবা আরও ভাল, কোন ফুলের দোকানে কাজ। যেমন পরিষ্কার কাজ, তেমনি মনের মত।”

সাইমানভ্স্কি প্রসঙ্গত বলল, “তাতেও রুচির প্রশ্ন আছে।”

লিখোনিন চিন্তিতভাবে দাড়িতে হাত বুলোতে লাগল। “আমি ভেবেছিলাম তার জন্য একটা খাবারের দোকান খুলে দেব, প্রথমটায় খুবই ছোট, সব রান্নাই হবে সরল, স্বাদু ও পরিচ্ছন্ন। অনেক ছাত্রই কোথায় খাচ্ছে, কি খাচ্ছে তা ভেবেও দেখে না। ছাত্রদের খাবার ঘরে তো সব সময়ই ভিড় উপ্‌চে পরে। আমি আসা করছি, আমাদের পুরনো বন্ধু ও পরিচিত সবাইকে তার খাবার ঘরে নিয়ে আসতে পারব।”

জর্জিয়াবাসী সায় দিয়ে বলল, “ভেবেছ ভালই, কিন্তু একটু অবাস্তব। আমরা এখনই ধারে খেতে শুরু করব, আর আমরা যে কতদূর অ-ভরসা তা তো তুমি জানই। এসব কারবারে একজন বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন ধুরন্ধর লোকের দরকার; আর সে যদি স্ত্রীলোক হয় তাহলে তার চোখ দুটিকে হতে হবে সুঁচের মত তীক্ষ্ণ, আর তার পিছনে একজন পুরুষ মানুষেরও দরকার। তোমরা নিশ্চয়ই আশা করতে পার না যে, লিখোনিন তার ক্যাসিয়ার হয়ে চারদিক নজর রাখবে যাতে কেউ টাকা না দিয়ে সরে পড়তে না পারে।”

লিখোনিন যেভাবে তার দিকে তাকাল তাতেই তার বিরক্তি ফুটে উঠল; কিন্তু সে কোন কথা না বলে ঠোঁট দুটো সজোরে চেপে ধরল।

পিঁস্-নেটা নাড়তে নাড়তে সাইমানভ্স্কি মাপা সুরে বলল, “ভাইসব, তোমাদের অভিপ্রায় খুবই ভাল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু বিষয়টির একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক কি তোমরা ভেবে দেখেছ ? একটা খাবার-ঘর খুলতে বা অন্য কোন ব্যবসা করতে প্রথমেই দরকার টাকার ও সাহায্যের, আর তার অর্থই হল একজন কাউকে পিছনে দাঁড়াতে হবে। লিখোনিনএর সঙ্গে আমিও একমত যে টাকাটা বড় কথা নয়, কিন্তু একটা কারবারের গোড়া থেকেই যদি

প্রতিটি পদক্ষেপ পূর্ব-নির্ধারিত ব্যবস্থা মতই চলতে থাকে, তাহলে কি অনিবার্য-ভাবেই শৈথিল্য ও যত্নহীনতা দেখা দেয় না, এবং শেষ পর্যন্ত সমগ্র কারবারটির প্রতিই উদাসীনতা ও আধ-খেঁচড়া মনোভাব গড়ে ওঠে না? তোমরা তো জান, অন্তত পঞ্চাশবার মাটিতে না পড়ে কোন শিশু হাঁটতে শেখে না। না, তোমরা যদি সত্যি এই অসহায় মেয়েটিকে সাহায্য করতে চাও তাহলে তাকে নিজের পায়ে দাঁড়াবার সুযোগ দাও। তাকে পর-নির্ভর অলস মানুষের মত না দেখে একজন সত্যিকারের শ্রমজীবীর মত দেখ। এটা তার পরীক্ষা। কাজটা শক্ত হবে, প্রথমে টাকা-পয়সা খুবই কম থাকবে, কিন্তু সে বাধা যদি সে অতিক্রম করতে পারে তাহলে অন্য সব বাধাই সে পার হতে পারবে।"

সলোভিয়েভ সন্দেহের সুরে বলল, "তুমি কি চাও যে সে থালা-বাটি ধোবে?"

সাইমানভ্স্কি শান্তভাবে পাল্টা জবাব দিল, "হ্যা, তাই, থালা-বাটি ধোবে, কাপড় কাচবে, রাঁধবে। যে কোন কাজই তার পক্ষে ভাল।"

লিখোনিন মাথা নাড়ল।

"এ তো সোনার কথা! সাইমানভ্স্কি তোমার মুখ দিয়ে বুঝি প্রজ্ঞাই কথা বলছে। বাসন-মাজা দাসী, রাঁধুনি, গৃহকর্ত্রী···কিন্তু প্রথমেই আমার সন্দেহ আছে এ সব কাজ সে করতে পারবে কি না; দ্বিতীয়তঃ, সে তো দাসীই ছিল, আর বাড়ির গৃহিণীর মুখে বকুনি শোনা এবং দরজার আড়ালে বা হলের পথে বাড়ির কর্তার খুনসুটির সুখ তার ভালই জানা আছে। তুমি কি জান না যে, শতকরা নব্বুইটি পতিতাকেই সংগ্রহ করা হয় দাসীদের ভিতর থেকে? সুতরাং বেচারি লিউবার প্রতি যখনই অন্যায় করা হবে, যখনই সে কাজ করে উঠতে না পারবে, তখনই যেখান থেকে তাকে তুলে এনেছি সেখানেই সে স্বেচ্ছায় ছুটে যাবে।"

সলোভিয়েভ সায় দিল, "ঠিক কথা।"

সাইমানভ্স্কি ঘৃণার ভাব দেখিয়ে বলল, "এ সব তোমাদের ব্যাপার।"

রাজপুত্তুর বলল, "আমার কথা যদি শুনতে চাও, তোমার বন্ধু ও কৌতূহলী দর্শক হিসাবে এই পরীক্ষায় উপস্থিত থেকে অংশ নিতে আমি রাজী। কিন্তু আজ সকালেই আমি তোমাকে সতর্ক করে দিয়েছি যে এ ধরনের পরীক্ষা এর আগেও করা হয়েছে এবং আমরা যতদূর জানি সে সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে।—তবে তুমি যখন এ কাজে হাত দিয়েছ লিখোনিন, তখন এগিয়ে যাও। আমরা সকলেই তোমাকে সাহায্য করব।"

লিখোনিন টেবিলে একটা ঘুসি মারল।

অনমনীয় জেদের সঙ্গে সে বলে উঠল, "না। একজন কাউকে ঠেকনো হিসাবে দাঁড় করানোর সমূহ বিপদ সম্পর্কে সাইমানভ্স্কি যা বলেছে সেটা অনেকাংশে সত্য। কিন্তু আমি তো আর কোন পথ দেখতে পাচ্ছি না।

গোড়ার দিকে আমি তাকে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়ে সাহায্য করব—তার করার মত কোন সরল, সহজ কাজের জোগাড় করে দেব। দরকারী জিনিসপত্রও আমিই কিনে দেব। তাকে কিছুটা শিখিয়ে-পড়িয়ে নিতে আমরা সকলেই সাধ্যমত চেষ্টা করব। তার হৃদয়, তার আত্মা যে সুন্দর সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। এ বিশ্বাসের কোন কারণ আমার জানা নেই, কিন্তু তবু আমি তা জানি। নিঝেরাদ্‌জি, তোমার বাঁদরামি থামাও!" রাগে লাল হয়ে সে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল। "তোমার এই সব ইয়ার্কি আমি অনেকক্ষণ সহ্য করেছি। আমি জানতাম তোমার বুদ্ধি আছে, অনুভূতি আছে, বিবেক আছে। যদি এ ধরনের বাজে ইয়ার্কি আর একবার দেখি, আমার অভিমত পাল্টে যাবে আর সেটা হবে শেষ কথা!"

"কিন্তু আমি খারাপ কিছু তো বলি নি···সত্যি বলছি···আরে ভাই, অত চটে যেয়ো না···আমার হাসি-খুশি ভাব যদি তোমার ভাল না লাগে, তো ঠিক আছে, আমি চুপ করলাম। হাত বাড়াও লিখোনিন, এস, একটু পান করা যাক।"

"আচ্ছা, ঠিক আছে···আমার কথা ছেড়ে দাও—তোমার স্বাস্থ্য পান করছি···কিন্তু আর কখনও ছাগলছানার মত ব্যবহার করো না—আমাদের বন্ধুত্বকে বজায় রেখে চলো। অন্যের সাহায্য ছাড়া স্বাধীনভাবে কাজ করবার মর্যাদা সম্পর্কে সাইমানভ্‌স্কি যা বলেছে সে রকম কোন কাজের ব্যবস্থা যদি না করতে পারি, তাহলে আমার ব্যবস্থায়ই আমি লেগে থাকব: লিউবাকে যতটা সম্ভব লেখাপড়া শেখাব; তাকে থিয়েটারে নিয়ে যাব, প্রদর্শনীতে নিয়ে যাব, সহজবোধ্য বক্তৃতার মিউজিয়মে নিয়ে যাব; তাকে পড়ে পড়ে শোনাব; সরল ও সহজ সঙ্গীত শুনবার সুযোগ করে দেব। অবশ্য আমি একা এসব করতে পারব না। তোমাদের সাহায্য চাই। তারপর দেখা যাবে কি হয়।"

সাইমানভ্‌স্কি বলল, "দেখ, এ রকম মহৎ কাজ এর আগে কেউ করে নি। কে জানে লিখোনিন, হয়তো একটি সুন্দর নতুন মানুষের তুমিই হবে আধ্যাত্মিক জনক। আমি তোমাকে সাহায্য করব।"

"আমিও। আমিও।" অপর দু'জনও বলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে সেই টেবিলের পাশে দাঁড়িয়েই চারটি ছাত্র একত্র মিলে লিউব্‌কার শিক্ষা ও আলোক লাভের একটি বিস্তারিত ও অসাধারণ কর্ম-সূচী প্রণয়ন করে ফেলল।

তাকে ব্যাকরণ ও লিখতে শেখানোর ভার নিল সলোভিয়েভ; একঘেয়ে পড়া পড়তে গিয়ে যাতে সে ক্লান্ত হয়ে না পড়ে সে জন্য তার পড়াশুনার অগ্রগতির পুরস্কার স্বরূপ সে স্থির করল যে রাশিয়া ও ইউরোপের ভাল ভাল সরল উপন্যাস সে তাকে পড়ে শোনাবে। লিখোনিন বলল, সে শেখাবে গণিত, ভূগোল ও ইতিহাস।

রাজপুত্তুরও এবার আগড়ম-বাগড়ম না বলে তার মনের কথাই বলল।

"দেখ বাবারা, আমি কিছু জানি না, আর যেটুকু জানি তাও ভাল করে জানি না। কিন্তু আমি তাকে জর্জিয়ার বড় কবি রুস্তাভেলির কবিতা পড়ে শোনাব, তার অনুবাদ করে দেব। স্বীকার করি, আমি ভাল শিক্ষক নই। শিক্ষকতার চাকরির চেষ্টা আমি করেছিলাম, কিন্তু দ্বিতীয় পাঠের পরেই সবিনয়ে আমাকে সে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দিয়েছিল! কিন্তু গীটার, ম্যাণ্ডোলিন ও বাঁশী বাজাতে আমি তাকে যেমন শেখাতে পারব তেমন আর কেউ পারবে না।"

জর্জিয়াবাসী বেশ গম্ভীরভাবে কথাগুলি বললেও লিখোনিন ও সলোভিয়েভ দু'জনই হেসে উঠল। কিন্তু তাদের বিস্মিত করে সাইমানভ্স্কি তাকে সমর্থন করল।

"রাজপুত্তুর ঠিক কথাই বলেছে। যে কোন বাদ্যযন্ত্র বাজাতে শিখলে মানুষের রুচি উন্নত হয় এবং তা জীবনে অনেক কাজে লাগে। তবে, ভদ্র-মহোদয়গণ, আমি তাকে পড়াব মার্কস-এর 'ক্যাপিটাল' ও মানব সংস্কৃতির ইতিহাস; তাছাড়া আমি পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্রও পড়াব।"

লিখোনিন ফিরে গিয়ে লিউব্কাকে রাজপথের বেঞ্চির উপরেই দেখতে পেল। তার সঙ্গেও ঐ বাড়িতে ফিরে যাবার ইচ্ছা লিউব্কার ছিল না। লিখোনিন ঠিকই ধরেছে—বকবক-করা আলেকজান্দ্রার সঙ্গে আবার দেখা হয়ে যাবে এটাই তার ভয়। তাছাড়া লিখোনিন তার অতীত জীবনকে লুকিয়ে রাখতে অস্বীকার করায়ও তার মন খারাপ হয়েছে। কিন্তু কোনরকম আপত্তি না করে অনুগতভাবেই সে তার সঙ্গে ফিরে গেল; নিজের ইচ্ছাশক্তি ও ব্যক্তিত্বকে সে অনেকদিনই হারিয়ে ফেলেছে; যে কোন অপরিচিতের ডাকে সাড়া দিতেই যে সে অভ্যস্ত।

ধূর্ত আলেকজান্দ্রা ইতিমধ্যেই সেখানকার সুপারিনটেণ্ডেণ্টের সঙ্গে দেখা করে নালিশ জানিয়েছে যে, লিখোনিন একটা মেয়েকে নিয়ে এসে তার সঙ্গে একঘরে রাত কাটিয়েছে। মেয়েটি কে তা আলেকজান্দ্রা জানে না, তবে লিখোনিন তাকে জ্ঞাতিবোন বলে পরিচয় দিয়েও এখনও তার পাশপোর্ট দেখায় নি। সুপারিনটেণ্ডেণ্ট কড়া ধাতের মানুষ; এ বাড়ির ভাড়াটেদের সে নিজের জয়-করা রাজ্যের অধিবাসীর মতই দেখে। নিজের ঘরে মাত্র কয়েকটি দরজা পরের আর একটা ঘর লিউব্কার জন্য ভাড়া করে তবে লিখোনিন তাকে শান্ত করল। ছাদের ঢালের নীচে বলে ঘরটা নীচু; তাতে একটিমাত্র ছোট জানালা।

"মিঃ লিখোনিন, পাশপোর্টটা কিন্তু কাল অবশ্য এনে দেবেন," সুপারিনটেণ্ডেণ্ট চাপ দিয়ে বলল। "শুধু আপনার জন্যই কাজটা করলাম। কারণ আপনি একজন শ্রদ্ধেয় পরিশ্রমী মানুষ। অনেককাল ধরে আপনাকে চিনি, আর ভাড়াও ঠিকমত দিয়ে থাকেন। জানেন তো, দিনকাল বড় খারাপ। কেউ যদি কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে লাগায়, তাহলে আমার অর্থদণ্ড তো হতেই পারে, এমন

কি এখান থেকে চালান করেও দিতে পারে। আজকাল তারা ভয়ানক কড়া হয়ে গেছে।"

সন্ধ্যায় লিখোনিন ও লিউব্‌কা পার্কে বেড়াল। নোবল'স ক্লাবে বাজনা শুনল। তারপর সকাল-সকাল বাড়ি ফিরল। তাকে তার ঘরের দরজায় পৌঁছে দিয়ে সেখানে কোনরকম বিলম্ব না করেই তাকে শুভরাত্রি জানাল। অবশ্য আদর করে তার কপালে একটা চুমো খেল, পিতৃসুলভ চুমো। কিন্তু দশ মিনিট পরে সে সবে পোষাক ছেড়ে বিছানায় শুয়ে একখানা আইনের বই পড়তে শুরু করেছে, এমন সময় হঠাৎ বিড়ালের মত দরজা আঁচড়াতে আঁচড়াতে লিউব্‌কা ঘরে ঢুকল।

"তোমাকে বিরক্ত করলাম বলে ক্ষমা করো। একটা সুঁচ ও সুতা আমার দরকার। দয়া করে আমার উপর রাগ করো না। এক মিনিটের মধ্যেই আমি চলে যাব।"

"লিউবা, এক মিনিট নয়, তুমি এখুনি চলে যাও। শুনতে পাচ্ছ! আমার হুকুম।"

"আহা, মিষ্টি ছেলে, সুন্দর ছেলে!" ব্যঙ্গভরা করুণ সুরে লিউব্‌কা সুর করে বলে উঠল। "সব সময়ই আমাকে এমন করে বকো কেন?" তারপরই হঠাৎ সে মোমবাতিটা নিভিয়ে দিয়ে লিখোনিনকে জড়িয়ে ধরে হাসতে হাসতে কেঁদে উঠল।

"না লিউবা, এ অসম্ভব, এ চলতে পারে না।" মিনিট দশেক পরে দরজায় দাঁড়িয়ে লিখোনিন কথাগুলি বলল। তার গায়ে তখন একটা কম্বল জড়ানো। "কালই তোমার জন্য অন্য বাড়িতে একটা ঘর ভাড়া করে দেব। আবার বলছি, আমি চাই না যে এ ঘটনা আবার ঘটে। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। শুভ রাত্রি। কিন্তু আমাকে কথা দাও যে, আমাদের সম্পর্ক হবে শুধুই বন্ধুত্বের। আর কিছু নয়।"

লিউব্‌কা খলখলিয়ে হেসে উঠল, "কথা দিলাম মিষ্টি ছেলে, দিলাম, দিলাম।" তারপরই হঠাৎ তার ঠোঁটে ও হাতে সশব্দে চুমো খেতে লাগল।

১৩

রুশ বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এমন অনেক আশ্চর্য মানুষ আছে যারা সংস্কৃতির খাঁটি সন্তান, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াতেও যাদের একটি মাংসপেশীও কাঁপে না, আদর্শের জন্য যারা ধৈর্যের সঙ্গে অবর্ণনীয় দুঃখ, বেদনা ও নির্যাতন সহ্য করতে পারে। অথচ তারাই আবার একটা দরোয়ানের উদ্ধত ব্যবহারে রাগে লাল হয়ে ওঠে, কোন ধোবানী চড়া গলায় কথা বললে চটে যায়, থানায় যেতে হলে ভিতরে ভিতরে কাঁপতে থাকে। লিখোনিন তাদেরই একজন। পরদিন সকালে (আগের দিনটা ছুটি থাকায় সে-কাজটা হয়নি) সে খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠল।

মনে পড়ল, লিউব্‌কার পাশপোর্টের ব্যবস্থা করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে তার মন খারাপ হয়ে গেল ; স্কুলে পড়বার সময় যেদিন পরীক্ষা থাকত এবং সে নিশ্চিত জানত যে ফেল করবে সেদিনও তার মন এই রকম খারাপ হত। তার মাথা ধরল। হাত-পা যেন তার বশে নেই। তার উপরে সকাল থেকেই ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। ধীরে ধীরে পোষাক পরতে পরতে সে ভাবল, "যখনই অবাঞ্ছিত কোন কাজ করতে হয় তখনই বৃষ্টি নামে।"

ইয়াম্‌স্কায়া স্ট্রীট তার বাসা থেকে বেশী দূরে নয়, এক মাইলেরও কম। শহরের ও-অঞ্চলে সে মাঝে মাঝে যায়, কিন্তু দিনের বেলা কখনও যায় না। পথ চলতে চলতে তার মনে হতে লাগল, প্রতিটি যাত্রী, প্রতিটি কোচয়ান, প্রতিটি পুলিশই বুঝি কৌতুহল, নিন্দা ও ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকে দেখছে। যেন তার উদ্দেশ্যটা সকলেই ধরে ফেলেছে। আর এই ধরনের মেঘাচ্ছন্ন দিনে যেমনটা ঘটে থাকে, তার মনে হতে লাগল যে প্রত্যেকটি মানুষের মুখই বিবর্ণ, বীভৎস, নানা বিকৃতিতে ভরা।

শহরের গো-চারণ ভূমিতে পৌছে দেখল, বেড়ার ধার বরাবর কাঠের পথের পাশে পাশে গরুগুলি চরে বেড়াচ্ছে। ছোট ছোট নদী ও নালার উপর নড়বড়ে ছোট ছোট সেতু। তারপরেই ইয়াম্‌স্কায়া। আন্না মার্কভ্‌নার বাড়ির সবগুলো জানালাই খড়খড়িশুদ্ধ বন্ধ ; সবগুলির মাঝখানেই হৃদপিণ্ডের আকারের কিছুটা জায়গা খোলা। রাস্তার অন্য বাড়িগুলোও বন্ধ ; দেখলেই মনে হয় বুঝি মহামারীতে সব ছারখার হয়ে গেছে। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে লিখোনিন ঘণ্টা বাজাল।

একটি দাসী দরজা খুলে দিল। তার খালি পা, স্কার্টটা গুটিয়ে তোলা, হাতে একটা ভেজা তোয়ালে। সে মেঝে মুছছিল ; মুখে ময়লা লেগে আছে।

সে ভয়ে-ভয়ে বলল, "আমি জেনির সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

"মিস্ জেনি খদ্দেরকে নিয়ে ব্যস্ত আছে, তারা এখনও ঘুম থেকে ওঠে নি।"

"তাহলে তামারার সঙ্গে।"

দাসী সন্দেহের চোখে তার দিকে তাকাল।

"মিস্ তামারা···আমি জানি না···মনে হচ্ছে সেও ব্যস্ত আছে···আপনি কি চান—তার সঙ্গে দেখা করতে, না আর কিছু?"

"আহা, সে যাই হোক। ঠিক আছে, দেখা করতেই চাই।"

"আমি জানি না। গিয়ে দেখে আসছি। আপনি অপেক্ষা করুন।"

সে চলে গেল। আধো-অন্ধকার বসবার ঘরে লিখোনিন একা। ঘরের চার দিক থেকে খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে আসা ধুলোর নীল স্তম্ভগুলি ঘরের ঘন অন্ধকারকে বিদীর্ণ করছে। রং-করা আসবাব ও দেয়ালের মুদ্রিত তৈলচিত্রগুলি ঘরের ঘন ধূসরতায় অদ্ভুত দেখাচ্ছে। গত রাতের তামাক ও বাসি খাবারের টক গন্ধে ঘরটা ভরে আছে। তাছাড়া সাময়িকভাবে ব্যবহৃত বাড়ি অর্থাৎ

শূন্য থিয়েটার, নাচের হল ও প্রেক্ষাগৃহে যে ধরনের একটা অস্পষ্ট গন্ধ থাকে তেমনি গন্ধও ঘরময় ছড়িয়ে আছে। দূরে রাস্তা দিয়ে একটা "দ্রশ্‌কি" ঘড়ঘড় করে চলে যাচ্ছে। দেয়ালের ঘড়িটা একঘেয়ে টিক্‌টিক্‌ শব্দ করছে। লিখোনিন ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে কাঁপা হাতদু'টি ঘসতে লাগল, ঘাড়টা কুঁজো করল; তার শীত-শীত করছে।

জেনি ঘরে ঢুকল; এলোমেলো চুল, ঘুম-ঘুম চোখ, পরনে সাদা বেড-জ্যাকেট ও সাদা পেটিকোট।

"আ-হা!" হাই তুলতে তুলতে সে লিখোনিন-এর দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিল। "গুডমর্ণিং ছাত্রবন্ধু। তোমার নতুন বাড়িতে তোমার লিউবচ্‌কা কেমন আছে? দয়া করে আমাকে নেমন্তন্ন করো, দেখে আসব। নাকি কোন সাক্ষী না রেখে নীরবেই মধুচন্দ্রিমা যাপন করছ?"

"বাজে কথা রাখ জেনেচ্‌কা। আমি পাশপোর্টের ব্যাপারে এসেছি।"

"ও-হো। পাশপোর্টের ব্যাপারে", জেনি চিন্তিতভাবে বলল। পাশপোর্ট তো এখানে নেই। বাড়িউলির কাছ থেকে একটা সাদা রসিদ নিতে হবে। বেশ্যাদের সাদা রসিদই থাকে। থানায় নিয়ে গেলেই তারা বদলে একটা পাশপোর্ট দিয়ে দেবে। দেখ ভাই, এ ব্যাপারে আমি তোমাকে বেশী সাহায্য করতে পারব না। বাড়িউলি বা দরোয়ানকে এ-কথা বললে তারা আমাকে মারতে আসবে। তোমাকে কি করতে হবে সেটা বলে দিচ্ছি। দাসীকে দিয়ে বাড়িউলিকে খবর পাঠাও, তাকে বলে দাও সে যেন গিয়ে বলে যে একজন স্থায়ী খদ্দের এসে তার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলতে চাইছে। আমাকে ক্ষমা কর, আমি কেটে পড়ছি; রাগ করো না যেন। বুঝতেই তো পারছ, আগে নিজের কথা ভাবতে হবে। এখানে অন্ধকারে একা দাঁড়িয়ে থাকবে কেন? একটা ঘরে চল। তোমার জন্য বীয়ারের অর্ডার দেব কি? অথবা কফি? অথবা—" এখানে তার চোখে চাতুরি ফুটে উঠল, "একটা মেয়ে চাই কি? তামারা ব্যস্ত আছে, কিন্তু নিউরা বা ভার্কা-কে চলবে কি?"

"বাজে কথা রাখ জেনি। আমি এসেছি একটা গুরুতর ব্যাপার নিয়ে, আর তুমি…'

"ঠিক আছে, ঠিক আছে, আর কিছু বলব না। ওটা কথার কথা…আমি তো জানি তুমি বিশ্বস্ত মানুষ। সেটা তোমার মহত্ত্ব। এস।"

তাকে নিয়ে একটা ঘরে ঢুকে সে জানালার কাছে এগিয়ে গেল এবং হুড়কোটা তুলে খড়খড়িটা খুলে দিল। লাল-সোনালি দেয়ালে, ঝাড়-লণ্ঠনে এবং লাল ভেলভেটের সোফা-চেয়ারে দিনের আলো ছড়িয়ে পড়ল।

তীব্র অনুশোচনার সঙ্গে লিখোনিন ভাবল, "এখান থেকেই সব কিছুর শুরু।"

জেনি বলল, "আমি চললাম। বাড়িউলি বা সাইমিয়নকে ছেড় না।

তাদের আচ্ছা করে শুনিয়ে দিও, দাঁত খিঁচুনি দিও…এখন দিনের বেলা তারা তোমার কিছু করতে সাহস পাবে না। আর যদি কিছু ঘটে, তাহলে বলে দিও তুমি সোজা গভর্ণরের কাছে গিয়ে রিপোর্ট করে দেবে। বলে দিও, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই এ-বাড়ি বন্ধ করে দিয়ে তাদের অন্যত্র চালান করে দেওয়া হবে। জোর চাপ দিলেই দেখবে তারা রেশমের মত নরম হয়ে যাবে। আচ্ছা, তোমার সৌভাগ্য কামনা করি।"

সে চলে গেল। দশ মিনিট পরে বাড়িউলি এম্মা এডোয়ার্ডভ্না নীল শাটিনের পোষাকে সজ্জিত হয়ে যেন ভাসতে ভাসতে ঘরে ঢুকল; শক্ত-সমর্থ, জাঁকজমকপূর্ণ মেয়েমানুষ; বিকৃতাকার ফলের মত মুখটা কপাল থেকে গালের দিকে ক্রমাগত চওড়া হয়ে গেছে; থুতনিতে কয়েকটা ভাঁজ পড়েছে; মস্ত বড় বুক, লোমহীন ছোট দুটি সদাসতর্ক কালো চোখ, চাপা ঠোঁট। লিখোনিন অর্ধেকটা উঠে তার আংটি-পরা মোটা হাতটাতে ঝাঁকুনি দিয়ে হঠাৎ বিরক্তির সঙ্গে ভাবল: "চুলোয় যাক। এই ঘৃণ্য প্রাণীটির যদি কোন আত্মা থাকত, আর কারও দৃষ্টি যদি সেখানে পৌছত, তাহলে কত যে খুন সে দেখতে পেত কে জানে।"

বলে রাখা ভাল, ইয়াম্স্কায়ায় যাবার সময় লিখোনিন শুধু টাকাই সঙ্গে নেয় নি, একটা রিভলবারও নিয়েছে; পথে যেতে যেতে অনেক বারই সে পকেটে হাত ঢুকিয়ে ঠাণ্ডা ধাতবযন্ত্রটাকে স্পর্শ করেছে। সে জানে, অপমান ও হিংসাত্মক ঘটনা ঘটতে পারে, আর সে জন্য সে তৈরি হয়েই এসেছে। অবশ্য সে সবিস্ময়ে বুঝতে পারল, তার সে সব আশংকা ও ভয় ভীরু কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। কিছুটা গোলমালের ভিতর দিয়ে হলেও কাজটা বেশ সহজ, সরল-ভাবেই মিটে গেল।

হাতল-চেয়ারে বসে একটা সিগারেট ধরিয়ে বাড়িউলি নিরাসক্ত অথচ অভয়দানের ভঙ্গীতে বলে উঠল, "দেখুন হের, এক রাতের টাকা দিয়ে মেয়েটিকে আরও একটা দিন ও রাত আপনি রেখেছেন। কাজেই আপনার কাছে আরও পঁচিশ রুবল পাওনা হয়েছে। কোন মেয়েকে এক রাতের জন্য ছাড়লে আমরা দশ রুবল নেই, আর চব্বিশ ঘণ্টার জন্য পঁচিশ রুবল। ধূমপান করবেন কি?" সে সিগারেট-কেসটা খুলে ধরতে লিখোনিন একটা সিগারেট তুলে নিল।

"আমি অন্য বিষয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই।"

"আহা, কিছুই বলতে হবে না। আমি সব জানি। একটি যুবক এই মেয়েটিকে, এই লিউব্কাকে নিয়ে গিয়ে তাকে নতুন করে—মানে…রুশ ভাষায় আপনারা কি যেন বলেন…তাকে রক্ষা করতে চায়। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। পঁচিশ বছর আমি পতিতালয়ে কাটালাম, বেশ প্রথম শ্রেণীর পতিতালয়ে; আমি জানি এই সব নির্বোধ যুবকদের কপালে কি ঘটে। আমি নিশ্চিত করেই বলছি, এতে কোন লাভ হবে না।"

"লাভ হবে কি না সেটা আমার ব্যাপার।" লিখোনিন জবাব দিল। তার আঙুলগুলি কাঁপছে।

"নিশ্চয় সেটা আপনার ব্যাপার।" এম্মা এডোয়ার্ডভ্‌নার বসে-যাওয়া গাল ও মস্ত বড় থুতনি নিঃশব্দ হাসিতে কাঁপতে লাগল। "সমস্ত অন্তর দিয়ে আপনার সৌভাগ্য ও সুখ কামনা করি।···কেবল সেই নির্লজ্জ মেয়ে লিউব্‌কাকে ব'লে দেবেন, আপনি যেদিন তাকে কুকুরের মত পথে ছুঁড়ে দেবেন সেদিন যেন সে এখানে মুখ দেখাতে সাহস না করে। সে যেন বেড়ার ধারে বসে বক-বকম্ করে, আর না হয় সৈনিকদের জন্য খোলা পঞ্চাশ কোপেকের বাড়িতে গিয়ে ঢোকে।"

"বিশ্বাস করুন, সে কোনদিন এখানে ফিরবে না। আমি শুধু তার সার্টিফিকেটটা চাই, আর এই মুহূর্তে চাই।"

"তার সার্টিফিকেট? আঃ! নিশ্চয়, আপনি চাইলে এই মুহূর্তেই পাবেন। শুধু তার হিসাবটা আগে মিটিয়ে ফেলুন। ইচ্ছা করেই হিসাবের বইটা আমি নিয়েই এসেছি। আমি জানতাম, আমাদের আলোচনা কোথায় গিয়ে শেষ হবে।" পোষাকের ভাঁজের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে মুহূর্তের জন্য তার সুপুষ্ট, হল্‌দে, মস্ত বড় বুকটা লিখোনিনকে দেখতে দিয়ে কালো মলাটের একখানা ছোট বই সে বের করল; তাতে লেখা: 'ইয়াম্‌স্কায়ার এত নম্বর বাড়িতে আন্না মার্কভ্‌না শেইবেস কর্তৃক পরিচালিত পতিতালয়ে ইরিনা ভস্‌চেংকভা (লিউব্‌কা)-র হিসাব।' বইটা সে টেবিলের উপর দিয়ে লিখোনিনের হাতে দিল। প্রথম পাতাটা খুলে সে ছাপানো নিয়ম-কানুনগুলো পড়তে লাগল। সেখানে সংক্ষেপে লেখা আছে, হিসাবের দুটো বই রাখা হয়—একটা থাকে পতিতালয়ের মালকিনের কাছে, অপরটা থাকে বেশ্যার নিজের কাছে; দুটো বইতেই সব উপার্জনের অংক আর খরচের অংক লেখা থাকে, চুক্তি অনুসারে বেশ্যাটি থাকা, খাওয়া, আলো, উত্তাপ, বিছানা, স্নান ইত্যাদি সব কিছু পাবে, আর তার বিনিময়ে সে মোট উপার্জনের দুই-তৃতীয়াংশের বেশী দেবে না। বাকি টাকাটা খরচ হয়েছে প্রধানত পোষাক-আসাকে, কারণ সে ভালভাবে সাজ-পোষাক করতে ভালবাসে এবং তার দু' দুটো ভাল পোষাক আছে। আরও লেখা আছে যে, প্রতি মাসের শেষেই একবার করে হিসাবপত্র মিটিয়ে দেওয়া হয়। সকলের শেষে লেখা আছে, কোন বেশ্যার টাকা বাকি থাকলেও সাধারণ দেওয়ানী আইন অনুসারে সে যদি সে-টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দেয় তাহলেই সে পতিতালয় ছেড়ে যেতে পারে।

শেষ লেখাটার উপর আঙুলটা ধরে লিখোনিন বইটা বাড়িউলির মুখের সামনে মেলে ধরে সানন্দে বলে উঠল:

"এটা দেখুন। এতে লেখা আছে, যখন ইচ্ছা একটা মেয়ে পতিতালয় ছেড়ে যেতে পারে! ফলে এই পচা আবর্জনার স্তূপ থেকে, এই অন্যায় ও নির্যাতনের

অভিশপ্ত খাঁচা থেকে…"

লিখোনিন আরও কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বাড়িউলি শান্তভাবে তাকে বাধা দিল :

"আহা, আমি তো তা অস্বীকার করছি না। সে চলে যাক না, তবে সব দেনা তাকে শোধ করে যেতে হবে।"

"সে একটা হাত-চিঠি দিলেই হবে তো? সেই ব্যবস্থাই তো রয়েছে।"

"বাঃ! হাত-চিঠি! সে তো নিরক্ষর…ও-চিঠির কি দাম আছে? কিছু না। সে একজন বিশ্বাসযোগ্য জামিনদার নিয়ে আসুক। তাহলেই আমি রাজী।"

"এখানকার এই সব নিয়ম-কানুনে তো জামিনদারের কথা লেখা নেই।"

"ওখানে অনেক কিছুই লেখা নেই। মালকিনকে আগে থেকে না জানিয়ে কোন যুবক যে একটা মেয়েকে নিয়ে যেতে পারে তাও তো লেখা নেই।"

"যাই হোক, তাহলে তার সাদা রসিদই আমাকে দিন।"

"ওরকম বোকামি আমি কখনও করব না! একজন দায়িত্বসম্পন্ন লোক আর পুলিশ নিয়ে আসুন, আর পুলিশ বলুক যে আপনার পরিচিত সেই লোকটি গণ্যমান্য। সেই লোক বলুক যে কোন লাভের জন্য অথবা অন্য কোন পতিতালয়ে বিক্রি করার জন্য আপনি মেয়েটিকে নিয়ে যাচ্ছেন না। তবেই আপনি তাকে পাবেন।"

লিখোনিন চেঁচিয়ে উঠল, "এ কী নরক! আমি কেন জামিনদার হতে পারব না? এই মুহূর্তে আমি আপনাকে হাত-চিঠি লিখে দিচ্ছি—"

"যুবক! আপনাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে কি শেখায় আমি জানি না, কিন্তু আপনি আমাকে এত বোকা ভাবলেন কেমন করে? ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, যে প্যান্ট আপনি পরে আছেন তাছাড়া আরও একটা প্যান্ট আপনার হোক, আর আগামীকাল মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য কিছুটা 'বলোগ্না' মদ কিনবার মত পয়সা যেন আপনার পকেটে থাকে! আর সেই আপনি কিনা হাত-চিঠির কথা বলছেন। আমাকে ধাপ্পা দিতে চেষ্টা করবেন না।"

লিখোনিন এবার সত্যি চটে গেল। পকেট থেকে টাকার থলিটা বের করে সে টেবিলের উপর ছুঁড়ে দিল।

"তাহলে আমি নগদেই সব মিটিয়ে দিচ্ছি!"

কিছুটা অবিশ্বাসের ছোঁয়া থাকলেও বাড়িউলি মিষ্টি স্বরে বলে উঠল, "আঃ, এই তো অন্য রঙের ঘোড়া দেখা দিয়েছে। পাতা উল্টে আপনার প্রেয়সীর হিসাবটা একবার দেখবেন না?"

যুবকটি চেঁচিয়ে উঠল, "থাম, কুত্তী কোথাকার।"

স্ত্রীলোকটি শান্তভাবে জবাব দিল, "আমি তো থেমেই আছি বোকারাম।"

বইটার লাইন-টানা পাতায় মেয়েটির উপার্জনের অংক লেখা আছে, আর ডান দিকে লেখা আছে তার খরচ।

লিখোনিন পড়তে লাগল। "১৫ই ফেব্রুয়ারি পেলাম দশ রুবল; ১৬ই—চার রুবল; ১৭ই—বারো রুবল; ১৮ই—অসুস্থ; ১৯শে—অসুস্থ; ২০শে—ছ' রুবল; ২১শে—চব্বিশ রুবল…"

গভীর বিতৃষ্ণায় লিখোনিন ভাবল, "হা ভগবান! এক রাতে বারো জন'!"

এক মাসে মোট আয় তিন শ' ষাট রুবল।

"সর্বশক্তিমান প্রভু! এ যে দুঃস্বপ্ন!…একশ' পঁয়ষট্টি জন খদ্দের!" পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে নিজের মনে হিসাব কসেই লিখোনিন আতংকিত হয়ে উঠল। তারপর বইয়ের ডান দিকে মনোযোগ দিল।

"লেস-বসানো লাল রেশমের পোষাকের জন্য দর্জি এভ্‌দকিনভাকে দেওয়া হল—চুরাশি রুবল; ঢিলে গাউনের জন্য দর্জি এভ্‌দকিনভাকে দেওয়া হল—পঁয়ত্রিশ রুবল; ছ' জোড়া রেশমের মোজার দরুণ—ছত্রিশ রুবল, ইত্যাদি। ফুশ্‌কি ভাড়া, মিছরি, গন্ধদ্রব্য ইত্যাদি—মোট দু'শ' পঞ্চাশ রুবল।" তারপর তিন শ ত্রিশ রুবল থেকে মালকিনের পাওনা দু'শ' বিশ রুবল কেটে নেওয়া হয়েছে। ফলে ইরিনা ভস্‌চেংকভার দেনা রইল পঁচানব্বই রুবল। তার সঙ্গে গত বছরের কর্জবাবদ চার শ' আঠারো রুবল যোগ করে হল মোট পাঁচ শ' তেরো রুবল।

লিখোনিন হতাশ হয়ে পড়ল। প্রথমে সে বেশী দামের জিনিসপত্র সরবরাহ করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে চেষ্টা করল; কিন্তু বাড়িউলি জানাল যে সেটা তার কোন ব্যাপারই নয়; পতিতালয়ের প্রয়োজনেই এখানকার মেয়েদের সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েদের মতই সাজপোষাক করতে হয়। পতিতালয়ের কাজ শুধু দরকার মত টাকাটা তাকে আগাম দেওয়া; বাকি ব্যাপারে তাদের মাথাব্যথা করবার কিছু নেই।

লিখোনিন বেপরোয়া হয়ে চেঁচিয়ে বলল, "তোমাদের দর্জি একটা খাণ্ডারণী, মানুষের চেহারায় একটা মাকড়সা! তার সঙ্গে তোমারও যোগসাজস আছে, তুমি তো একটা রক্তচোষা জোঁক। তুমি রক্তচোষা বাদুড়! তুমি ক্রিমি-কীট! তোমার কি বিবেক বলে কিছু নেই?"

সে যত উত্তেজিত হয়ে ওঠে, এম্মা এডোয়ার্ডভ্‌না ততই শান্ত ও বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গীতে কথা বলে।

"বলেছি তো ওটা আমার ব্যাপারই নয়…আর ও ধরনের ভাষা ব্যবহার করো না, নইলে আমি দরোয়ানকে ডাকব আর সে তোমাকে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেবে।"

এই কঠোর প্রকৃতির স্ত্রীলোকটির সঙ্গে ভয়ংকরভাবে দরকষাকষি করতে করতে এক সময় লিখোনিন-এর গলাও সপ্তমে চড়ল। শেষ পর্যন্ত স্থির হল, নগদে দু'শ' পঞ্চাশ রুবল ও দু'শ' রুবলের হাত-চিঠি দেওয়া হবে, আর তাতেই স্ত্রীলোকটি রাজী হল, তবে তার আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাগজপত্র দেখিয়ে

লিখোনিনকে প্রমাণ করতে হল যে এই বসন্তকালে পাশ করে সে একজন উকিল হয়ে বসবে।

শেষ পর্যন্ত এমা এডোয়ার্ডভ্‌নার সঙ্গে সব কাজ চুকল। নগদ টাকাটা নিয়ে সে একটা রসিদ লিখল; তারপর রসিদ ও টিকিটটা লিখোনিন-এর হাতে দেবার সময় উভয়ে উভয়ের দিকে এমনভাবে তাকাতে লাগল যেন কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না। দলিল দুটো থলেতে ভরে লিখোনিন বেরিয়ে গেল। বাড়িউলি তার সঙ্গে সঙ্গে সদর দরজা পর্যন্ত গেল। লিখোনিন রাস্তায় নেমে যাবার পরে সে পিছন থেকে হাঁক দিল:

"ছাত্রবাবু, হেই ছাত্রবাবু।"

লিখোনিন ঘুরে দাঁড়াল।

"আবার কি?"

"আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে তোমার লিউব্‌কা একটা বাজে মেয়ে, চোর, তার সিফিলিস আছে! কোন সম্ভ্রান্ত খদ্দেরই তাকে নিতে চাইত না। তুমি না নিয়ে গেলে কাল আমরাই তাকে তাড়িয়ে দিতাম। তাছাড়া, সে দরোয়ান, পুলিশ আর ছিঁচকে চোরদের সঙ্গে কারবার চালাত। তোমাদের আইন মাফিক বিয়েতে আমার অভিনন্দন রইল!"

"উ-উ! রক্তচোষা বাদুর!" লিখোনিন গর্জে উঠল।

"তোমার মাথাটা কাঁচা গোবর-ভরা!" সেও চেঁচিয়ে উঠে সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

একটা ভ্রূকুটি নিয়ে লিখোনিন থানায় চলে গেল। পথে তার মনে পড়ল, যে দুর্ভাগা হলুদ টিকিটের কথা সে এত শুনেছে সেটা কোন দিন চোখে দেখে নি। আসলে সেটা খামের মাপের একটা সাধারণ সাদা কাগজ। তার এক দিকে লেখা লিউব্‌কার পুরো নাম ও তার পেশা—পতিতাবৃত্তি, আর অপর দিকে আচার-আচরণ এবং বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ শুচিতা সম্পর্কে কতকগুলি কুখ্যাত, কপট বিধি-নিষেধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। এক জায়গায় লেখা আছে, "যে ডাক্তার পতিতাটিকে সর্বশেষ পরীক্ষা করেছে তার লিখিত সার্টিফিকেট দাবী করবার অধিকার প্রত্যেক অতিথির আছে।" আবার সেই করুণার উচ্ছ্বাস লিখোনিন-এর ঘাড়ে চাপল।

সত্যিকারের দুঃখের সঙ্গেই সে ভাবল, "বেচারি নারী, তারা তোমাদের নিয়ে কী না করে! যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা একেবারে নির্বিকার হয়ে কলের ঘোড়ার মত ঘুরতে শুরু না কর ততক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের খাটায়, যন্ত্রণা দেয়!"

থানায় পৌঁছে পুলিশ অফিসার কের্বেশ-এর সঙ্গে লিখোনিন-এর দেখা হল। আগের দিন ছিল তার রাতের কাজের পালা, তাই ভাল ঘুম না হওয়ায় তার মেজাজ ছিল খারাপ। তার পাখার মত দেখতে প্রচুর লাল দাড়ি এলোমেলো

হয়ে আছে। একটা চামড়ার কুশনে শুয়ে রাত কাটানোর দরুন মুখের তার দিকটা লাল হয়ে আছে, আর সুন্দর চোখ দুটি উজ্জ্বল, কর্কশ ও নীল চীনা মাটির মত স্বচ্ছ দেখাচ্ছে। কাল রাতে একদল মাতাল বাউণ্ডুলেকে ধরে আনা হয়েছিল। সে এতক্ষণ পর্যন্ত তাদের জেরা করে, বিবরণ লিখে, অভদ্র খিস্তি-খেউড় করে এবার বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠাবার ব্যবস্থা করছিল। চামড়ার সোফাটায় হেলান দিয়ে দুটো হাতকে ঘাড়ের নীচে রেখে প্রকাণ্ড শরীরটাকে এমনভাবে টানটান করল যে হাত-পায়ের সবগুলি গিঁট কট-কট করে উঠল। লিখোনিন যেন একটা নিষ্প্রাণ পদার্থ এমনিভাবে তার দিকে তাকিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল :

"কি ব্যাপার ছাত্রমশায় ?"

লিখোনিন অল্প কথায় ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলল।

"সুতরাং আমি চাই", কথার শেষে সে বলল, "তাকে···মানে—কি বলে যে আপনাকে বোঝাই,···মানে···সে যেন আমার চাকরাণী। অথবা, আপনি যদি ভাল মনে করেন···আমার আত্মীয়···মোট কথা আপনি বলে দিন কি ভাবে ব্যাপারটা করা যায়।"

"তার মানে তাকে রক্ষিতা বা স্ত্রী হিসাবে রাখতে চান"···নামের সংক্ষিপ্ত আদ্য অক্ষর ও ছোট ছোট মূর্তি খোদাই-করা রূপোর সিগারেট কেসটা নিয়ে খেলা করতে করতে সম্পূর্ণ উদাসীনভাবে কের্বেশ কথাগুলি বলল। "আপনার জন্য আমি তো কিছু করতে পারছি না···অন্তত এখন তো নয়ই···আপনি যদি তাকে বিয়ে করতে চান তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আপনাকে একটা অনুমতি-পত্র আনতে হবে। কিন্তু তাকে যদি রক্ষিতা হিসাবে রাখতে চান, তাহলে তো এসবের কোন মানেই হয় না। পাপাচারের কেন্দ্র একটা পতিতালয় থেকে একটা মেয়েকে আপনি নিয়ে এসেছেন তার সঙ্গে পাপাচারী সহবাসের জীবন যাপন করতে।"

আমি তাকে চাকরাণীর মত রাখব," লিখোনিন বলল।

"চাকরাণীর বেলায়ও ঐ একই ব্যবস্থা। বাড়ির মালিকের কাছ থেকে আপনাকে একটা সার্টিফিকেট আনতে হবে। আপনার নিজের বাড়ি আছে বলে তো মনে হয় না···কাজেই একটা চাকরাণী রাখবার মত অবস্থা যে আপনার আছে সেই মর্মে একটা সার্টিফিকেট, নিজের যে পরিচয় আপনি দিয়েছেন প্রকৃতই আপনি যে সেই লোক তা প্রমাণ করাবার জন্য প্রয়োজনীয় সব দলিল-পত্র, আপনার অঞ্চলের থানার একটা সার্টিফিকেট, একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট, ইত্যাদি। আশা করি আপনার নাম রেজিস্ট্রি করা আছে···নাকি আপনি···তাদের একজন···মানে বে-আইনী অধিবাসীদের একজন ?"

"না আমার নাম রেজিস্ট্রি করা আছে," লিখোনিন বলল। তার মাথা গরম হবার উপক্রম হয়েছে।

"খুব ভাল কথা। আর যে মেয়েটির হয়ে আপনি এসেছেন তার

অবস্থা কি?"

"তার নাম এখনও রেজিস্ট্রি করা হয় নি। তবে তার টিকিট আমার কাছে আছে; সেটা বদলে আমি একটা পাশপোর্ট করাতে চাই। তারপরেই তার নাম রেজিস্ট্রি করিয়ে নেব।"

কের্বেশ হাত দুটি ছড়িয়ে দিয়ে আবার সিগারেট-কেস নিয়ে খেলা করতে লাগল।

"ছাত্রমশায়, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি প্রয়োজনীয় দলিল-পত্র না আনছেন ততক্ষণ আপনার জন্য আমি কিছু করতে পারব না, কিছু না। আর মেয়েটির বেলা, যেহেতু তার কোন বাসস্থানের অনুমতি-পত্র নেই তাকে থানায় নিয়ে যাওয়া হবে এবং যেখান থেকে আপনি তাকে এনেছেন সে যদি সেখানে ফিরে যেতে না চায় তাহলে তাকে থানায়ই রেখে দেওয়া হবে। শুভ দিন।"

লিখোনিন চোখের উপর টুপিটা টেনে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। এমন সময় হঠাৎ একটা ধূর্ত বুদ্ধি তার মাথায় খেলে গেল। তার কাছে বুদ্ধিটা খুবই বিস্বাদ লাগলেও টেবিলের কাছে ফিরে গিয়ে সে নির্বিকার অথচ থতমত স্বরে বলল :

"আমি দুঃখিত অফিসার, একটা গুরুতর কথা আমি ভুলে গিয়েছিলাম। আমাদের পরস্পরের পরিচিত একজন লোক আমাকে বলে দিয়েছিল, আপনি তার কাছে যে টাকাটা পাবেন সেটা দিয়ে দিতে।"

"হুম। পরিচিত লোক?" নীল চোখ তুলে কের্বেশ বলল। "লোকটি কে?"

"বার···বারবারিসভ্।"

"ওহো, বারবারিসভ্। বটে···বটে···হ্যাঁ, মনে পড়েছে।"

"কাজেই এই দশটি রুবল কি নেবেন?"

কের্বেশ ঘাড় নাড়ল। দশ রুবলের নোটটা সে নিল না।

"দেখুন, আপনার···আমাদের সেই বারবারিসভ্ একটি নেড়ি কুত্তা। দশ রুবল নয়, পঁচিশ রুবল সে আমার কাছ ধারে। ব্যাটা-বেজন্মা। পঁচিশ আর কিছু খুচরো।···খুচরোটা না হয় ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে। বিলিয়ার্ড খেলায় সে টাকাটা আমার কাছে হেরেছিল।···তাও বলি, খেলার ব্যাপারেও লোকটা একটু বাঁকা···রাস্কেল···কাজেই মশায়, আরও পনেরো রুবল ছাড়ুন।"

"আপনি বড় কড়া ব্যবসাদার অফিসার," টাকাটা বের করে লিখোনিন বলল।

"সবই তো বোঝেন!" ভাল মানুষের মত, কের্বেশ বলল। "আমারও তো স্ত্রী-পুত্রকন্যা আছে।···কী মাইনে পাই তাও জানেন। এই নিন আপনার পাশপোর্ট। একটা রসিদ দিন। শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।"

মানব প্রকৃতি কী বিচিত্র! পাশপোর্টটা পকেটে এসে গেছে, এই অনুভূতির

ফলে লিখোনিন হঠাৎ শান্ত ও উৎসাহিত হয়ে উঠল।

কিন্তু সে যখন সাড়ম্বরে লিউব্‌কাকে পাশপোর্টটা দেখাল তখন সে মোটেই বিস্মিত বা আনন্দিত হল না দেখে সে নিজেই বিস্ময়বোধ করল। তবে তাকে ফিরতে দেখে সে খুবই খুশি হল। এই সরলা বালিকাটি তার উপকারী বন্ধুর প্রতি খুবই অনুরক্ত হয়ে পড়েছে। সে ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরতে চাইল। কিন্তু তাকে বাধা দিয়ে লিখোনিন খুব নিম্নস্বরে প্রায় তার কানে কানে বলল:

"লিউবা, আমাকে বল···সত্য কথা বলতে ভয় পেয়ো না···তা সে যাই হোক···সেখানে আজ আমাকে বলেছে যে তোমার নাকি রোগ আছে···কি রোগ তুমি তো বোঝই···খারাপ রোগ···যদি আমাকে তিলমাত্রও বিশ্বাস কর তাহলে আমাকে বল, দয়া করে বল সে কথা ঠিক কি না···"

লিউব্‌কার মুখ লাল হয়ে উঠল। দুই হাতে মুখ ঢেকে সোফার উপর উপুড় হয়ে সে কেঁদে উঠল।

"প্রিয় আমার! আমার আদরের ভাসিল ভাসিলিচ, ভাসিংকা···ঈশ্বরের দিব্যি! শপথ করে বলছি, ও রকম কিছু কখনও ছিল না। আমি সর্বদাই খুব সাবধান হয়ে চলি···ওটাকে আমি মৃত্যুর মত ভয় করি···তোমাকে এত ভালবাসি···নিশ্চয় জেন, সে রকম কিছু হলে তোমাকে আগেই বলতাম···"

লিখোনিন-এর দুটি হাত নিজের মুখের উপর চেপে ধরে সে কিছুটা হাস্যকরভাবে একান্ত আন্তরিকতার সঙ্গে তাকে কথাটা বোঝাতে লাগল; অন্যায়ভাবে অভিযুক্ত হলে ছোট শিশু যে রকম করে থাকে অনেকটা সেই ভাবে।

লিখোনিন সঙ্গে-সঙ্গে তার কথা বিশ্বাস করল।

আস্তে আস্তে তার চুলে হাত বুলোতে বুলোতে সে বলল, "তোমার কথা আমি বিশ্বাস করেছি লক্ষ্মী মেয়ে। উত্তেজিত হয়ো না, কেঁদ না। শুধু দেখ, আমরা যেন দুর্বল না হই।···যা ঘটেছে তা ঘটেছে, কিন্তু সে রকমটা আর ঘটতে দিও না।"

কখনও তার হাতে, কখনও তার কোটের কাপড়ে চুমো খেতে খেতে লিউবকা বলল, "তোমার যেমন ইচ্ছা। আমাকে যদি তুমি না চাও, বেশ তো, তাই হবে।"

তথাপি সেই রাতেই সে আবারও প্রলোভনের কাছে হার মানল। এই ভাবেই চলতে লাগল; আর শেষ পর্যন্ত এ ব্যাপারে লজ্জার কোন বালাই রইল না। সেটা অভ্যাসে পরিণত হল, আর সে অভ্যাস অনুশোচনাকে গ্রাস করল।

১৪

লিখোনিন-এর প্রতি ন্যায়বিচারের খাতিরে একথা বলতেই হবে যে লিউব্‌কার সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সে সাধ্যমত চেষ্টা করেছে। সে বুঝতে

পারল শেষ পর্যন্ত এই চিলে-কোঠা, শহরের একেবারে চূড়ায় অবস্থিত এই পাখির বাসা তাদের ছাড়তেই হবে ; ঘরটা অস্বাচ্ছন্দ্যকর বা জায়গাটা খুব ভিড় সে জন্য যতটা নয় তার চাইতে বেশী আলেকজান্দ্রার জন্য ; সে যেন দিনের পর দিন আরও হিংস্র ও খুঁতখুঁতে হয়ে উঠছে। তাই সে শহরের প্রান্তে একটা ছোট অ্যাপার্টমেণ্ট ভাড়া করল—দুটো ঘর ও একটা রান্না ঘর। বাসাটা ব্যয়-বহুল নয়, গরম করবার কাঠ ছাড়া মাসে নয় রুবল ভাড়া। এ কথা ঠিক, ছাত্র পড়াতে তাকে অনেক দূর দূর যেতে হবে ; কিন্তু নিজের সহনশীলতা ও স্বাস্থ্যের উপর তার যথেষ্ট ভরসা আছে। সে প্রায়ই বলে :

"আমার পা দুটো তো আমারই। তাদের রেহাই দেবার কোন দরকার নেই।"

অবশ্য ততদিনে লিউব্‌কার সঙ্গে তার সম্পর্কের আসল চেহারাটা বন্ধু-বান্ধবদের কাছে গোপন থাকে নি। তথাপি তাদের সামনে সে এমন ভাণ করত যেন মেয়েটির সঙ্গে তার সম্পর্ক বন্ধুত্বের, ভ্রাতৃত্বের। এই ভাবে মিথ্যা না বলা বা ভাণ না করাই যে তার পক্ষে অনেক বেশী বুদ্ধি-বিবেচনার কাজ হত যে কারণেই হোক সেটা সে বুঝতে পারে না, বা বুঝতে চায় না। অথচ হয় তো বুঝতে পারলেও এক দিনের অভ্যাস কি করে বদলাবে সেটা সে জানে না···লিউব্‌কার সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে সব সময়ই সে গৌণ, নিষ্ক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। প্রেম-ভালবাসা প্রকাশের ব্যাপারে অগ্রণীর ভূমিকা নেয় লিউব্‌কা (সে এখনও লিউব্‌কাই রয়ে গেছে ; লিখোনিন ভুলেই গেছে যে পাশপোর্টে সে তার আসল নাম দেখেছিল—ইরিনা)। যে মেয়েটি এই সেদিন পর্যন্ত নির্বিকারভাবে অথবা নকল আবেগের সঙ্গে শত শত মানুষকে দেহদান করেছে, সেই আজ তার সমস্ত সত্তা দিয়ে—ভালবাসা ও ঈর্ষা দিয়ে লিখোনিন-এর প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েছে ; তার দেহ, তার অনুভূতি, তার চিন্তা দিয়ে তাকেই আঁকড়ে ধরেছে। সহজভাবেই সে তার বন্ধুদেরও গ্রহণ করেছে ; জর্জিয়াবাসী রাজপুত্তুর বেশ মজার মানুষ, হৃদয়বান সলোভিয়েভও তার বেশ কাছাকাছি এসেছে, কিন্তু সাইমানভ্‌স্কির কঠোর সক্রিয়তাকে সে অন্ধের মত ভয় করে। অবশ্য লিখোনিন তার কাছে প্রভু ও দেবতা ; সঠিক না হলেও সে মনে করত লিখোনিন তারই সম্পত্তি, তাকে পেয়ে সে খুশি।

লিখোনিন-এর মন কিন্তু ভেঙে পড়ছে। লিউব্‌কার প্রতি একটা গোপন বিদ্বেষ তার অন্তরকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে। নিজেকে মুক্ত করবার নানা পরিকল্পনা প্রায়ই তার মাথায় আসে। তার মধ্যে কতকগুলি অসৎ পন্থাও থাকে ; পরে সে সব কথা ভাবলে তার বুকের ভিতরটা মুচড়ে ওঠে।

"নৈতিক ও মানসিক দিক থেকে ক্রমেই আমি নীচে—আরও নীচে তলিয়ে যাচ্ছি', মাঝে মাঝে এই কথা ভেবে সে আতংকে শিউরে ওঠে। "একজন সংস্কৃতিবান পুরুষ ও একটি অশিক্ষিতা নারীর মধ্যে যখন যোগাযোগ ঘটে, তখন

সে নারীকে কখনও পুরুষটির বুদ্ধিদীপ্ত জীবনের স্তরে তোলা যায় না, আর পুরুষটি সব সময়ই সেই নারীর স্তরে নেমে যায়: এই মর্মে কোন লোকের যে কথা সে পড়েছে বা শুনেছে সেটা একান্তভাবেই সত্য।"

দুই সপ্তাহের মধ্যেই অবস্থা এমন দাঁড়াল যে লিউব্‌কা তার মনে আর উত্তেজনা সৃষ্টি করে না। যেন দায়ে পড়ে, কখনও বা করুণাবশতই সে তার দীর্ঘ আদর-যত্ন ও আকুতি-মিনতিকে মেনে নেয়।

এদিকে জীবনে এই প্রথম কঠিন মাটিতে পা রাখতে পেরে এবং বিশ্রামের সুযোগ পেয়ে লিউব্‌কা অতি দ্রুত পরিপূর্ণ সৌন্দর্যে ফুটে উঠতে লাগল: যে কুঁড়িটি একদিন আগেও শুকিয়ে ঝরে যাচ্ছিল আজ সে প্রচুর উষ্ণ বারিপাতের ফলে শত দল মেলে ফুটে উঠেছে। তার নরম মুখের ফুটফুট দাগগুলো মিলিয়ে গেছে; বাচ্চা দাঁড়কাকের মত বিহ্বল ও বিচলিত দৃষ্টি মিলিয়ে গেছে তার কালো চোখ থেকে; চোখ দুটি এখন স্বচ্ছ ও ঝকঝকে। শরীর আরও মজবুত ও ভরন্ত হয়ে উঠেছে; ঠোঁট দুখানি হয়েছে আরও লাল। প্রতিদিন দেখে বলে লিখোনিন-এর সে সব নজরে পড়ে না; তার বন্ধুরা লিউব্‌কার প্রতি যে প্রগলভ প্রশস্তি উচ্চারণ করে তাও সে বিশ্বাস করে না। ভ্রূকুটি করে সে ভাবে, "এসব বোকা ঠাট্টা ছাড়া আর কিছু না; ছেলেগুলো ওকে বিরক্ত করছে।"

গৃহস্থালির ব্যাপারেও লিউব্‌কা নিজের গুণপনা প্রমাণ করতে পারে নি। এ কথা ঠিক, সে ভাল বাঁধাকপির ঝোল রাঁধতে পারে, তবে সে ঝোল এত ঘন যে একটা চামচে তার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে; সে বড় বড় এবড়ো-খেবড়ো মাংসের বড়া বানাতে পারে; এবং লিখোনিন-এর তত্ত্বাবধানের ফলে চা (পঁচাত্তর কোপেক পাউণ্ড দামের) তৈরির কায়দাটা খুব তাড়াতাড়ি শিখে নিয়েছে। কিন্তু তার বেশী কিছু নয়—হয় তো সব মানুষের পক্ষেই সব আর্ট শেখার একটা সীমা থাকে যেটা পেরিয়ে সে যেতে পারে না। কিন্তু মেঝে ধুতে সে খুব ভালবাসে এবং এত ঘন ঘন সে কাজ করে যে বাসাটাতে স্যাঁতসেঁতে ভাব দেখা দিয়েছে এবং কাঠে ঘুণ ধরতে শুরু করেছে।

একবার খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনে আকৃষ্ট হয়ে লিখোনিন একটা মোজা বুনবার যন্ত্র কিনে আনল। সেটা চালাতে কোন দক্ষতারই দরকার হয় না। লিখোনিন, সলোভিয়েভ ও নিঝেরাদ্‌জি অনায়াসেই সেটা চালাতে শিখে গেল, কিন্তু লিউব্‌কা কিছুতেই রপ্ত করতে পারল না। প্রতিবারেই সে ভুল করে বা সুতো জড়িয়ে ফেলে, আর ওদের কাছে ছুটে যায়। কিন্তু নকল ফুল বানানোটা সে খুব তাড়াতাড়ি ও এমন সুরুচি ও সুন্দরভাবে শিখে ফেলল যে এক মাসের মধ্যেই মাথার ফিতে সরবরাহকারী ও টুপির দোকানদাররা তার তৈরি মাল কিনতে শুরু করল। সব চাইতে আশ্চর্যের ব্যাপার, একজন শিক্ষকের কাছে মাত্র দুটো পাঠ শিখে নিয়ে বাকিটা একটা বই পড়ে ও তার

ছবি দেখেই সে শিখে নিয়েছে। সপ্তাহে সে যতগুলি ফুল বানাতে পারে তার দাম এক রুবলের বেশী হয় না; কিন্তু তাতেই তার কত গর্ব; প্রথম উপার্জিত পঞ্চাশ কোপেক দিয়ে সে লিখোনিনকে একটা সিগারেট-হোল্ডার কিনে দিল।

কয়েক বছর পরে আন্তরিক বেদনা ও বিষণ্ণ বাসনার সঙ্গে লিখোনিন নিজের কাছে স্বীকার করত যে সেই সময়টাই ছিল ছাত্র হিসাবে, উকিল হিসাবে তার সারা জীবনের সব চাইতে শান্ত, নিরুপদ্রব ও মধুর অধ্যায়। বুদ্ধিমতী না হলেও একটা প্রবৃত্তিগত গার্হস্থ্য বুদ্ধি লিউব্‌কার ছিল; একটা শুদ্ধ, শান্ত পারিবারিক আবহাওয়া সৃষ্টির ক্ষমতাও ছিল। তার জন্যই দেখতে দেখতে লিখোনিন-এর বাসাটা এমন একটা শান্তির কুঞ্জ হয়ে উঠল যেখানে এসে তার বন্ধুরা জীবনের কঠোর বাস্তবের সঙ্গে তিক্ত সংগ্রামের দুঃখ, যন্ত্রণা, অভাব ও বুভুক্ষা সহ্য করবার পরে একটা পারিবারিক পরিবেশের মধ্যে নিজেদের শ্রান্ত দেহকে স্বচ্ছন্দে এলিয়ে দিতে পারত। একটা সামোভারকে ঘিরে তারা সকলে যখন আলোচনায়, বিতর্কে ও স্বপ্ন-দর্শনে মেতে উঠত, তখন লিউব্‌কার বন্ধুত্বপূর্ণ সেবা, তার ভীত নীরবতাকে লিখোনিন সকৃতজ্ঞ বিষণ্ণতার সঙ্গে স্মরণ করত।

পড়াশুনার ব্যাপারটা বেশ ধীর গতিতে এগোতে লাগল। এই সব স্ব-নিযুক্ত শিক্ষকরা একযোগে এবং আলাদা আলাদা ভাবেও বলত যে মানুষের মনের শিক্ষা ও উন্নতি প্রত্যেকের ব্যক্তিগত রুচি-পদ্ধতি অনুসারেই চলা উচিত, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তারা যে সব বিষয় দরকারী ও অনিবার্য বলে মনে করত তা দিয়েই লিউব্‌কার মনকে ঠেসে ভরে দিত এবং এমন সব বৈজ্ঞানিক সমস্যা নিয়ে তার সঙ্গে আলোচনা করত যেগুলি বাদ দিলেই ভাল হত।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, অংক শেখাতে গিয়ে লিখোনিন গণনার আদিম পদ্ধতিটা কিছুতেই মানে না। লিউব্‌কা শুধু এক, দুই, তিন ও পাঁচকেই একক হিসাবে ব্যবহার করে। যেমন তার কাছে বারো হল দুটো তিনকে দু'বার নেওয়া; আবার উনিশ হল—তিনটে পাঁচ ও দুটো দুই। কিন্তু লিখোনিনও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে এই পদ্ধতিতে লিউব্‌কা নামতার মত দ্রুততার সঙ্গেই এক থেকে একশ' পর্যন্ত গুণতে পারে। অবশ্য তার বেশী সে যেতে পারে না, আর বাস্তব ক্ষেত্রে তার কোন প্রয়োজনও নেই। লিখোনিন অনেক চেষ্টা করল তাকে দশকে একক ধরে গণনা শেখাতে, কিন্তু সবই পণ্ডশ্রম হল। ফলে সে মাথা গরম করে লিউব্‌কাকে বকাবকি শুরু করে দিত, আর মেয়েটি বিস্মিত অপরাধী দৃষ্টি মেলে নীরবে তার দিকে চেয়ে থাকত, তার চোখের জলে ভেজা পাতার লোমগুলি দীর্ঘ কালো তীরের মত ঝুলে পড়ত।

শিক্ষক হিসাবে নিঝেরাদ্‌জি অপেক্ষাকৃত বেশী সফল হয়েছিল। খাবার ঘরের পেরেকের সঙ্গে তার গীটার ও ম্যাণ্ডোলিন সব সময়ই ঝোলান থাকত। ম্যাণ্ডোলিন অপেক্ষা গীটারের নরম সুরই লিউব্‌কার বেশী ভাল লাগত।

নিঝেরাদ্‌জি আসা মাত্রই (সপ্তাহে তিন-চারদিন সন্ধ্যাবেলা আসত)

লিউব্‌কা দেয়াল থেকে গীটারটা নামিয়ে রুমাল দিয়ে মুছে তার হাতে দিত। সেও কয়েক মিনিট সুর বেঁধে গলা খাঁকারি দিয়ে গান শুরু করে দিত। গানের তালে তালে এক সময়ে লিউব্‌কাও গলা মিলিয়ে দিত। দ্বৈত কণ্ঠে গান শুরু হয়ে যেত। ধীরে ধীরে লিউব্‌কা আড়ষ্টতা কাটিয়ে বেশ সহজ হয়ে উঠল। তারপর থেকে প্রায়ই তারা একসঙ্গে গলা মিলিয়ে গান করত।

কখনও কখনও নিঝেরাদ্‌জিকে দুষ্টামিতে পেয়ে বসত। সে এমন ভাব দেখাত যেন সে লিউব্‌কাকে জড়িয়ে ধরতে চায়, আবেগ-মধুর চোখে তার দিকে তাকিয়ে নাটকীয় ভঙ্গীতে অস্পষ্ট গুঞ্জনে সে বলে উঠত :

"আমার প্রাণ! আল্লার বাগানের সেরা গোলাপটি! তোমার ঠোঁটে দুধ আর মধু, ভাজা মেষ-মাংসের চাইতেও সুগন্ধি তোমার নিঃশ্বাস। ওগো ককেসিয়ার শ্রেষ্ঠ অঙ্গা-সুন্দরী, তোমার ঠোঁটের পাণ-পাত্র থেকে আমাকে নির্বাণ-সুধা পান করতে দাও।"

লিউব্‌কা হেসে উঠে তাকে বকুনি দিত, তার হাত চাপড়ে দিত, লিখোনিনকে বলে দেবে বলে ভয় দেখাত।

লিউব্‌কাকে পড়াতে সবচেয়ে বেশী আনন্দ পেত সলোভিয়েভ। এই সাদাসিদে শক্ত-সমর্থ মানুষটি অনিচ্ছাকৃতভাবে নিজের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতেই নারীত্বের সেই গোপন, অদৃশ্য, পরম আকর্ষণ অনুভব করতে শুরু করেছিল যা প্রায়ই বাহ্যত কঠোর ও বিরূপ পরিবেশের মধ্যেই জন্মলাভ করে থাকে। এখানে ছাত্রীই চালায়, শিক্ষক সেই পথে চলে। লিউব্‌কার অন্তরের জন্মগত গুণাবলী নিজেই নিজের শিক্ষার পদ্ধতি স্থির করে নেয়, অন্যের দেখানো পথে চলে না। এইভাবে ছোট ছেলে মেয়েদের মত সে প্রথমে লিখতে শিখল, তারপর পড়তে শিখল। সলোভিয়েভও তাকে বাধা দিত না, তার ইচ্ছামত পথেই তাকে শেখাত। যে মেয়েটির সঙ্গে তার হঠাৎই দেখা হয়েছে এবং হয়তো ভবিষ্যতে আর কোন দিনই দেখা হবে না, এই দেড় মাসেই তার প্রতি একটা মমতা তার মনে গড়ে উঠেছে। একটা দয়ালু হাতি একটি অসহায় ছোট মোরগছানার প্রতি যে সতর্ক ও বিস্ময়কর মনোভাব পোষণ করে, তার সর্বত্র প্রসারিত বিরাট অন্তরও তেমনি এক বিস্ময়কর, উদার, গভীর মমতায় ভরে উঠেছে।

১৫

লিউব্‌কার মন ও আত্মাকে শিক্ষিত করে তোলার ব্যাপারে জর্জিয়ার রাজপুত্তুর ও উদার-হৃদয় সলোভিয়েভকে যদি বা সে জাগতিক অভিজ্ঞতার কাঁটার আসনের মধ্যে একটি নরম কুশন বলে ভেবে থাকে ; যদি বা লিখোনিন-এর প্রতি ঐকান্তিক সীমাহীন ভালবাসার জন্য তার পণ্ডিতিকে সে ক্ষমা করে থাকে—ঠিক যেভাবে স্বেচ্ছায় সে ক্ষমা করত তিরস্কার, প্রহার, এমন কি আরও গুরুতর কোন অপরাধ ; সাইমানভ্‌স্কির পড়ানো কিন্তু তার কাছে মনে হত

নির্ভেজাল অত্যাচার, মনের উপর একটা ভারী বোঝাস্বরূপ। অন্য সব স্ব-নিযুক্ত শিক্ষকদের মধ্যে সেই ছিল সব চাইতে নিয়মিত, মাইনে-করা কোন যথার্থ শিক্ষকের চাইতেও অধিকতর নিয়মিত।

তার মতামত অখণ্ডনীয়, তার বক্তব্য সুস্পষ্ট, প্রতিটি কথা নীতিশিক্ষায় পরিপূর্ণ। লিউব্‌কাকে কি ভাবে পড়াতে হবে তাও তার কাছে স্ফটিকস্বচ্ছ ও অপরিবর্তনীয়। সে প্রথমেই তাকে আগ্রহী করে তুলতে চায় পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নশাস্ত্রের কতকগুলি পরীক্ষা-নিরীক্ষায়।

সে ভাবল, "এ সব দেখে একটি সরল নারী-হৃদয় বিস্মিত না হয়ে পারবে না। এইভাবে আমি তার মনোযোগ আকর্ষণ করব। ছোট ছোট পরীক্ষা ও কলা-কৌশলের ভিতর দিয়ে আমি তাকে জ্ঞান-রাজ্যের সেই অন্দর-মহলে নিয়ে যাব যেখানে কোন কুসংস্কার নেই, পূর্ব-সংস্কার নেই, আছে শুধু প্রকৃতিকে বুঝবার একটা ব্যাপক ক্ষেত্র।"

একদিন সে একবাক্যে ঘোষণা করল যে ঈশ্বর নেই, আর সেটা সে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই প্রমাণ করে দিতে পারে। একথা শুনে লিউব্‌কা তার আসনে লাফ দিয়ে উঠে শক্ত গলায় বলল, আগে বেশ্যা থাকলেও সে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে এবং তার সামনে কাউকে সে ঈশ্বরকে অসম্মান করতে দেবে না। সে আরও বলল, সাইমানভ্‌স্কি যদি এর পরেও এই সব বাজে কথা বলে তাহলে সে ভাসিলি ভাসিলিচ-এর কাছে নালিশ করে দেবে।

অশ্রুসিক্ত গলায় সে বলতে লাগল, "আমি তাকে আরও বলব, পড়াবার বদলে তুমি শুধু আজে-বাজে কথা বল, আর সারাক্ষণ আমার হাঁটুর উপর হাত রাখ। আর সেটা মোটেই রুচিপূর্ণ নয়!" তাদের পরিচয় হবার পরে এই প্রথম স্বভাবতই লাজুক প্রকৃতির লিউব্‌কা হঠাৎ তার কাছ থেকে দূরে সরে গেল।

এ-কথা কিন্তু বলা যায় না যে মেয়েরা সাইমানভ্‌স্কিকে পছন্দ করে না। তার প্রচণ্ড আত্ম-প্রত্যয়, তার সুদৃঢ় কণ্ঠস্বর সব সময়ই সরল মানুষদের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে থাকে। লিউব্‌কার নীরব, দুর্নিরীক্ষ্য অথচ অবিরাম প্রতিরোধ তাকে বিরক্ত ও উত্তেজিত করে তুলল। যেটা বিশেষভাবে তাকে বিক্ষুব্ধ করল সেটা হল যে লিউব্‌কা একদিন সকলের কাছেই সহজলভ্যা ছিল, মাত্র দু'রুবলের বিনিময়ে যে এক রাতে বহু পুরুষকে দেহদান করত, সেই এখন সকলকে বোঝাতে চেষ্টা করছে যে লিখোনিন-এর প্রতি তার ভালবাসা পবিত্র ও নিঃস্বার্থ।

সে মনে মনে বলল, "বাজে কথা! এটা সত্য হতে পারে না। সে তো অভিনয় করছে···আর যে কারণেই হোক তার মনের ঠিক সুরটা আমি ধরতে পারি নি।"

যত দিন যেতে লাগল ততই সে আরও কঠোর, ছিদ্রান্বেষী হয়ে উঠল, ততই তার দাবী বাড়তে লাগল।

একদিন লিউব্‌কা লিখোনিন-এর কাছে নালিশ জানাল।

"সে আমার প্রতি বড়ই কঠোর হয়ে উঠেছে ভাসিল ভাসিলিচ। সে যা বলে তার একটি বর্ণও আমি বুঝতে পারি না। আমি তার কাছে আর পড়ব না।"

তাকে তখনকার মত শান্ত করে লিখোনিন সাইমানভ্‌স্কির সঙ্গে কথা বলল। অত্যন্ত ঠাণ্ডা গলায় সে জবাব দিল:

"তোমাদের যেমন ইচ্ছা ভাই। আমার পড়ানো যদি তোমার ও লিউবি্‌কার পছন্দ না হয় আমি ছেড়ে দিচ্ছি। তার শিক্ষার মধ্যে শৃংখলা-বোধকে নিয়ে আসতেই আমি চেয়েছিলাম। যেখানে আমার কথা সে বুঝতে পারে না, সেখানেই তাকে মুখস্থ করতে বলেছি। কালক্রমে এটা আর দরকার হবে না, কিন্তু এখন এ ব্যবস্থা অনিবার্য। মনে কর লিখোনিন, গণিত থেকে বীজগণিতে যেতে আমাদের কত কষ্ট হয়েছিল; সংখ্যার বদলে যখন অক্ষর বসানো হল, তখন আমরা তার কারণ কিছুই বুঝতে পারি নি। অথবা গল্প-কবিতা লেখার বদলে আমাদের কেন যে ব্যাকরণ শেখানো হত তাও আমরা বুঝতাম না।"

আর তার ঠিক পরদিনই লিউব্‌কার দিকে ঝুঁকে পড়ে তার বুকের প্রায় কাছাকাছি গিয়ে তার দেহের সুগন্ধ প্রশ্বাসের সঙ্গে টানতে টানতে সে বলল:

"একটা ত্রিভুজ আঁক—হ্যাঁ, ঠিক আছে, এবার আমি ওটার মাথার উপর লিখছি 'ভ' অক্ষর (মানে ভালবাসা), আর বাকি কোণ দুটোতে লিখছি 'প' ও 'ন' অক্ষর দুটি—তার মানে দাঁড়াল পুরুষ ও নারীর ভালবাসা।"

প্রধান পুরোহিতের কঠোর, অপরিবর্তনীয় ভঙ্গীতে গড়গড় করে একগাদা ভালবাসার কথা আউড়ে হঠাৎ সে অপ্রত্যাশিতভাবে শেষ কথায় গিয়ে পৌঁছল:

"শোন লিউব্‌কা, ভালবাসার বাসনাও খাওয়া, পান করা ও শ্বাস-প্রশ্বাসের ইচ্ছার মতই।" সে তার পায়ের হাঁটুর উপরটা টিপতে লাগল। লিউব্‌কা অস্বস্তি বোধ করলেও পাছে তার মনে আঘাত লাগে তাই ধীরে ধীরে পাটা সরিয়ে নিল।

সাইমানভ্‌স্কি কিন্তু বলেই চলল, "আচ্ছা, ধরো তুমি যদি ঘটনাচক্রে বাড়িতে খেতে না বসে কোন রেস্তোরাঁতে বা হোটেলে যাও এবং সেখানে ক্ষুন্নিবৃত্তি কর, তাহলে কি তোমার বোন, বা মা, বা স্বামী অসন্তুষ্ট হবেন বলে তুমি মনে কর? ভালবাসার ব্যাপারেও ঠিক তাই, এতটুকু কম নয় বেশী নয়, একটা দৈহিক ভোগ-সুখমাত্র। হয়তো সে ক্ষুধা অন্য ক্ষুধার চাইতে আরও জোরদার, আরও তীব্র, কিন্তু তার বেশী কিছু নয়। এই ধরো না, আমি তোমাকে মেয়েমানুষ হিসাবে দেখতে চাই!"

বিরক্ত হয়ে লিউব্‌কা এবার বাধা দিল, "ও কথা রাখ তো মশাই। ঐ

এক কথা তো অনেকবার বলেছ। যত সব ছাতাছে পাখির কিচির-মিচির। আমি তো কতবার বলেছি, না। তুমি কি ভাব, তুমি কি বলতে চাও তা আমি বুঝি না? ভাসিল ভাসিলিচ আমার উপকার করেছে, কাজেই তার প্রতি কখনও আমি অবিশ্বাসের কাজ করব না। সমস্ত প্রাণ দিয়ে আমি তাকে ভালবাসি।...তাকে পূজা করি। তোমার এই প্রলাপ শুনতে ভাল লাগে না।"

একদিন সাইমানভ্‌স্কি লিউব্‌কাকে গভীরভাবে আঘাত করল, তাকে বেশ বিপদের মধ্যে ফেলে দিল। লিখোনিন যে একটি মেয়েকে কুখ্যাত অঞ্চল থেকে তুলে এনে তার নৈতিক উন্নতি বিধানের জন্য চেষ্টা করছে, এ খবর বিশ্ববিদ্যালয় মহলেও রটে গিয়েছিল। স্বভাবতই ছাত্রীরাও খবরটা শুনেছিল। সাইমানভ্‌স্কি একদিন চারটি মেয়েকে নিয়ে এল লিউব্‌কার কাছে। দু জন ডাক্তারি পড়ে, একজন ইতিহাসের ছাত্রী। আর চতুর্থটি একজন উদীয়মানা কবি। অত্যন্ত গম্ভীর অথচ আপত্তিকরভাবে সে পরিচয়-পর্ব ঘোষণা করল।

প্রথমে অতিথিদের এবং পরে লিউব্‌কাকে দেখিয়ে সে বলল, "দেখ কমরেডগণ, তোমরা পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হও। লিউব্‌কা, তোমার নবজীবনের উজ্জ্বল পথে এরা তোমাকে প্রকৃত বন্ধুর মত সাহায্য করবে। আর তোমরা কমরেড লিজা, নাদিয়া, সাশা ও র‍্যাচেল, একে বড় বোনের মত দেখবে। আমাদের সমাজ ব্যবস্থা আধুনিক নারীকে যে ভয়াবহ অন্ধকারে নিক্ষেপ করেছে এই মেয়েটি সগুই সেখান থেকে উঠে এসেছে।"

হয়তো ঠিক এই কথাগুলিই সে ব্যবহার করে নি, কিন্তু তার বক্তব্য এইটেই ছিল। লজ্জায় লাল হয়ে লিউব্‌কা তাদের সঙ্গে কর-মর্দন করল, তাদের চা ও জ্যাম পরিবেশন করল, তাদের সিগারেটে আগুন ধরিয়ে দিল, আর অনেক অনুরোধেও বসতে রাজী হল না, দাঁড়িয়েই রইল। সারাক্ষণ সে জিভ্‌ বন্ধ করে রাখল, শুধু "হ্যাঁ" "না," আর "তোমাদের যেমন ইচ্ছা" ছাড়া আর কোন কথাই বলল না। একজনের হাত থেকে রুমালটা পড়ে গেলে ছুটে গিয়ে সেটা তুলে দিল।

একটি মেয়ে ঘৃণামিশ্রিত চোখে বার বার তাকে আপাদমস্তক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। তাতে লিউব্‌কা খুবই অস্বস্তি বোধ করল। আর একটি মেয়ে তো সরাসরিই জানতে চাইল সে কেমন করে ও-পথে গিয়েছিল।

"কিন্তু বলতো, কে সেই পাষণ্ড, মানে যে প্রথম...বুঝতেই তো পারছ?"

তার আগেকার বান্ধবী জেংকা ও তামারার মুখ লিউব্‌কার চোখের সামনে ভেসে উঠল; এই সব মেয়েদের চাইতে তারা কত বেশী গর্বিত, সাহসী ও উপস্থিতবুদ্ধিসম্পন্ন; কত বেশী চতুর। অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবেই সে সোজা জবাব দিয়ে বলল:

"সে তো অনেক...ভুলেই গেছি...কল্‌কা, মিশ্‌কা, ভলদ্‌কো, সেরেজ্‌কা, ঝর্জিক, ত্রস্‌কা, পেত্‌কা। তারপর কুস্‌কা, গুস্‌কা ও তাদের বন্ধুরা। কিন্তু

সে কথা শুনে তোমাদের লাভ কি?"

"মানে, অর্থাৎ···আমি চেয়েছিলাম···তোমাকে ভাল লেগেছে বলেই···"

"তোমার কোন নাগর আছে?"

"মাফ কর, তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না। মেয়েরা, আমাদের যাবার সময় হয়ে গেছে।"

"আমার কথা না বুঝতে পারার তো কিছু নেই। কোন পুরুষের সঙ্গে কখনও শুয়েছ কি?"

"কমরেড সাইমানভ্স্কি, এ রকম একটা মানুষের কাছে তুমি আমাদের নিয়ে আসবে তা আশা করি নি। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ! তোমার বিবেচনাকে বলিহারি!"

লিউব্কা সেই দলের মানুষ যারা ধৈর্যের সঙ্গে অনেক সহ্য করে এবং তারপরে হঠাৎ একদিন জ্বলে ওঠে।

সক্রোধে সে বলে উঠল, "কিন্তু আমি জানি, তোমরা আমার চাইতে ভাল কিছু নও। তোমাদের বাবা আছে, মা আছে। তোমাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা আছে; আর দরকার পড়লে তোমরা গর্ভপাতও করাতে পার—অনেকেই করে থাকে। কিন্তু তোমরা যদি আমার জায়গায় পড়তে, খাবার ব্যবস্থাটা পর্যন্ত নেই, একটা নির্বোধ ছাগলছানা যেন—কারণ আমি নিরক্ষর—আর পাগলা কুকুরের মত পুরুষ মানুষরা তোমাদের যদি ঘিরে ধরত—তাহলে তোমরাও বেশ্যালয়েই ঢুকতে। একটা অসহায় মেয়েকে বিদ্রূপ করতে তোমাদের লজ্জা পাওয়া উচিত!"

গণ্ডগোল বুঝে কিছু বড় বড় বুলি আউড়ে সাইমানভ্স্কি ছাত্রীদের নিয়ে সেখান থেকে কেটে পড়ল।

লিউব্কার স্বাধীন জীবনে একটা লজ্জাজনক, হীন, চূড়ান্ত ভূমিকায় অভিনয় করা তখনও সাইমানভ্স্কির বাকি ছিল। তার বিরুদ্ধে লিউব্কা অনেকবার লিখোনিন-এর কাছে নালিশ করেছে, কিন্তু সে সব মেয়েলি কথায় সে বিশেষ কান দেয় নি। বাকবিলাসী সাইমানভ্স্কির প্রভাবও লিখোনিন-এর উপর খুবই বেশী। তাছাড়া লিউব্কার সঙ্গে প্রতিনিয়ত সহবাসের ফলে সে ক্রমেই শ্রান্ত ও নির্যাতিত বোধ করছিল। সে প্রায়ই ভাবত! "ও আমার জীবনটা নষ্ট করে দিচ্ছে। ক্রমেই আমি ইতর ও একঘেয়ে হয়ে যাচ্ছি।·· একটা অর্থহীন পুণ্যকর্ম আমাকে গিলে ফেলেছে···আর এসবের পরিণতিতে আমার ওকে বিয়ে করতে হবে, আবগারি বিভাগে বা বেওয়ারিশদের আদালতে একটা চাকরি নিতে হবে, অথবা মাস্টারি করতে হবে; আমি ঘুষ নিতে শুরু করব; আড্ডা মেরে বেড়াব, ধীরে ধীরে একটা সেকেলে শহুরে বুড়োতে পরিণত হব। আর মনের শক্তি, জীবনের সৌন্দর্য, মানুষের প্রতি ভালবাসা, সাহসিক কর্মধারা—আমার সে সব স্বপ্ন কোথায় থাকবে সেদিন?" ·কখনও বা সে

চেঁচিয়েই এসব কথা বলে, চুল টানে। কাজেই লিউব্‌কার নালিশে কান তো দেয়ই না, বরং মেজাজ খারাপ করে চেঁচায়, পা ঠোকে, আর ধৈর্যশীলা, ভীরু লিউব্‌কা চুপ করে রান্নাঘরে গিয়ে গোপনে কাঁদে।

প্রায়ই এই ধরনের পারিবারিক ঝগড়া মিটে গেলে সে লিউব্‌কাকে বলে :

"দেখ লিউব্‌কা, বুঝতেই তো পারছ আমরা কেউ কারও উপযুক্ত নই। এই একশ' রুবল দিচ্ছি, তোমার গাঁয়ে ফিরে যাও। আত্মীয়-স্বজনরা তোমাকে দেখে খুশি হবে। সেখানে থেকে অপেক্ষা কর। ছ' মাসের মধ্যে আমি তোমাকে নিয়ে আসব। এই সময়টা তুমি বিশ্রাম পাবে, শহরের যত কিছু ময়লা-আবর্জনা তোমার মধ্যে জমেছে সেগুলি ঝরে পড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তখন কারও সাহায্য ছাড়াই তুমি একাকি সগর্বে নতুন জীবন শুরু করতে পারবে!"

কিন্তু যে নারী এই প্রথম এবং—তার মতে—এই শেষ বারের মত প্রেমে পড়েছে তাকে নিয়ে কি করা যায়? তাকে কি বোঝানো যায় যে তাদের ছাড়াছাড়ি হওয়া দরকার? সে কি কোন যুক্তি শুনবে? লিউব্‌কা থেকেই গেল।

লিউব্‌কার প্রতি বন্ধু সাইমানভ্‌স্কির আসল মনোভাব সে ঠিকই অনুমান করতে পেরেছে। তাই লিউব্‌কার হাত থেকে ছাড়া পাবার জন্য, তার পক্ষে অত্যন্ত বেশী ভারী বোঝাটাকে কাঁধ থেকে নামাবার জন্য মাঝে মাঝেই অত্যন্ত হীনভাবে সে ভাবে : "সাইমানভ্‌স্কি তাকে পছন্দ করে, আর আমিই হই, আর সেই হোক, বা অন্য যে কেউ হোক, তাতে তার কি যায়-আসে? বন্ধুর সঙ্গে আমি বন্ধুর মত খোলাখুলি কথা বলব, সে যেন লিউব্‌কাকে নেয়। কিন্তু এই আকাট মুখ্‌খু তো যেতে চাইবেন না। সে তো হট্টগোল বাধাবে।

সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হল, "একটা বিশেষ অবস্থায় দু'জনকে যদি একসঙ্গে ধরতে পারি···তাহলেই আমি হৈ-চৈ বাধিয়ে দিতে পারি···তারপর উদারতা দেখিয়ে বলতে পারি···কিছু টাকা ছাড়···আর কেটে পড়।"

সে মাঝে মাঝেই বাসা থেকে দিন কয়েকের জন্য কেটে পড়তে লাগল। কিন্তু ফিরে এলেই শুরু হয়ে যেত জেরা, হট্টগোল, চোখের জল, আর মৃগীরোগীর মত শারীরিক আক্ষেপ। ফলে সে বাড়ি থেকে বেরলেই লিউব্‌কা পিছু নেয়; সে কোন বাড়িতে ঢুকলে বাড়ির সামনে রাস্তায় অপেক্ষা করে; বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করে; আর ফিরে এলেই ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বক্‌বক্‌ করতে থাকে। ক্রমে সে লিখোনিন-এর চিঠিপত্র হাতাতে লাগল; কিন্তু তখনও ভাল করে পড়তে পারে না বলে এবং সাহায্যের জন্য সলোভিয়েভ বা নিঝেরাদ্‌জি-র কাছে যেতে সাহস পায় না বলে সব চিঠিপত্র সে কাবার্ডে চিনি, চা, লেবুর মধ্যে লুকিয়ে রাখে। অবশেষে সে এমন একটা

অবস্থায় গিয়ে পৌঁছল যখন সে লিখোনিনকে বিয়ের ভয় দেখাতে লাগল।

ছাড়া পাবার একটা নারকীয় পরিকল্পনার কথা চিন্তা করতে করতে এক সময় লিখোনিন মনে মনেই বলল, "সে চুলোয় যাক! তাদের মধ্যে যদি কোন ব্যাপার নাই থাকে তাতেই বা কি। আমি এমনিতেই একটা হৈ-চৈ, ভয়ংকর হৈ-চৈ শুরু করে দেব, দু'জনের ঘাড়েই দোষ চাপাব।"

তখন সে কি কি বলবে তার মহলা দিত:

"ও হো, তাহলে এই ব্যাপ্যার! তোমাকে বুকে তুলে নিয়েছি, আর এ কী দেখছি! জঘন্য কৃতঘ্নতা! আর তুমি আমার পরম বন্ধু, তুমিও আমার একমাত্র সুখের মধ্যে নাক গলিয়েছ। না, না, তোমাদের আলাদা করতে আমি চাই না। চোখের জল নিয়েই আমি চলে যাব। এখানে কেউ আমাকে চায় না…তোমাদের ভালবাসার পথে কাঁটা হতে আমি চাই না…" ইত্যাদি ইত্যাদি।

তার এই সব আশা, এই সব গোপন পরিকল্পনা ঘটনাচক্রে একদিন আকস্মিকভাবেই পূর্ণ হল। সেই মারাত্মক দিনটিতে সাইমানভ্স্কি যখন এসে হাজির হল তখন লিউব্কার মন হতাশায় ক্ষত-বিক্ষত। এই পণ্ডিতম্মন্য শিক্ষক ও মারমুখী পুরুষটিও ইদানীং তার প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে উঠেছে।

সে ভাবল, আইন, অধিকার, সম্মান, শয়তানি বলে কিছু নেই, কারণ মানুষ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা, কোন মানুষ বা বস্তুর উপর সে নির্ভরশীল নয়।

"মানুষ ঈশ্বর হতে পারে, আবার ক্রিমি-কীটও হতে পারে—তাতে কিছু তফাৎ হয় না।"

প্রেম-ভালবাসার উপরে বক্তৃতা করতেই সে যাচ্ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সে তখন এতই অধৈর্য হয়ে উঠেছে যে লিউব্কাকে জড়িয়ে ধরে নানাভাবে তার দেহটাকে মর্দন করতে লাগল! সে ভাবল, "এর ফলে সে উত্তেজিত হয়ে উঠবে ও নিজেকে ছেড়ে দেবে।" সে লিউব্কার মুখটা চেপে ধরতে চেষ্টা করল, কিন্তু লিউব্কা অনবরত চেঁচাতে ও আঁচড়াতে-কামড়াতে লাগল। ভদ্র ব্যবহারের সব পালিশ তখন খসে পড়েছে।

"বেরিয়ে যা ঘেয়ো শয়তান, মাথামোটা শুয়োর, পচা কুত্তা, তোর নোংরা নাক আমি ভেঙে গুঁড়ো করে দেব!"

তার মুখে পতিতালয়ের বকুনির খৈ ফুটতে লাগল। সাইমানভ্স্কির পিঁস্-নে খুলে গেছে, মুখ বিকৃত হয়ে উঠেছে, তবু মুখে যা এল সে তাই বলতে লাগল।

"সোনা আমার…সব ঠিক আছে…একটি আনন্দময় মুহূর্ত…সেই আনন্দে আমরা এক হয়ে যাব…কেউ জানবে না…তুমি আমার হও।…"

ঠিক সেই মুহূর্তে লিখোনিন ঘরে ঢুকল।

অবশ্য সে যে একটা শয়তানি কাণ্ড করতেই চলেছে একথা সে নিজেও

স্বীকার করবে না। একান্ত নিরপেক্ষভাবে তার মনে হল, তার মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠেছে, আর তার কথাগুলি হবে শোচনীয় ও অর্থপূর্ণ।

নাটকের চতুর্থ অংকের অভিনেতার মত হাত দুটো ঝুলিয়ে, মাথাটাকে বুকের উপর নামিয়ে একঘেয়ে স্বরে সে বলতে লাগল, "সত্যি, এটা ছাড়া আর সব কিছুই আমি আশা করেছিলাম।···তোমাকে ক্ষমা করলাম লিউব্‌কা··· তুমি একটি আদিম জীব···কিন্তু তুমি সাইমানভ্‌স্কি···সব সময় মনে করেছি··· এমন কি এখনও তোমাকে সৎ লোক বলেই মনে করি···কিন্তু এখন দেখছি··· কামনা সব যুক্তি-বিচার অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। এই পঞ্চাশটা রুবল···এটা লিউব্‌কাকে দিলাম।···তুমিই পরে ফেরৎ দিও। সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। ওর জন্য কিছু করো। তুমি বুদ্ধিমান, দয়ালু, সৎ লোক, আর আমি (একটা শয়তান! সহসা তার মাথার ভিতর থেকে কে যেন স্পষ্ট ভাষায় বলে উঠল), আমি চলে যাচ্ছি, কারণ এ যন্ত্রণা আমি আর সইতে পারছি না। সুখী হও··"

পকেট থেকে টাকার থলিটা বের করে নাটকীয় ভঙ্গীতে সেটাকে টেবিলের উপর ছুঁড়ে দিল।

তার পক্ষে নিষ্কৃতির এটাই প্রকৃষ্ট পথ। আর যে রকমটা সে কল্পনা করেছিল এ-দৃশ্যে তার অভিনয় ঠিক সেই রকমই হয়েছে।

তৃতীয় খণ্ড

১

জেনির কাঁধে মুখ রেখে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে লিউব্‌কা ছাড়া-ছাড়া-ভাবে এই কাহিনী বলে ভাল। স্বাভাবিকভাবেই তার মুখে বলা এই শোচনীয় অথচ হাস্যকর কাহিনী আসলে যা ঘটেছিল তার থেকে বেশ কিছুটা অন্য রকমই হল।

তার বক্তব্য অনুযায়ী, তাকে প্রলোভিত করে, ফুঁস্‌লিয়ে, যতদিন ইচ্ছা তার বোকামিকে কাজে লাগিয়ে তারপর তাকে তাড়িয়ে দিতেই লিখোনিন তাকে নিয়ে গিয়েছিল। আর সেও এমনি বোকা যে তাকে ভালবেসে চামড়ার বেল্ট পরা এলোচুল মেয়েগুলোকে ঈর্ষার চোখে দেখেছিল; তারপর লিখোনিন অত্যন্ত ইতরের মত কাজ করল—ইচ্ছা করে সে একটি বন্ধুকে পাঠাল তাকে আলিঙ্গন করতে, চুমো খেতে, আর সে যখন তাকে টানাটানি শুরু করল তখনই ভাস্কা সেখানে ঢুকে একটা ভয়ানক হৈ-চৈ পাকিয়ে তুলল এবং তাকে, লিউব্‌কাকে, পথে ছুঁড়ে দিল।

তার বৃত্তান্তে মিথ্যা এবং সত্য সমানভাবেই মিশেছিল, কিন্তু সে তো সমস্ত ব্যাপারটাকে এইভাবেই দেখেছিল।

সে বিস্তারিতভাবে আরও জানাল যে, হঠাৎ সে বড়ই নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ল; কোন পুরুষ মানুষের অথবা বাইরের অন্য কারও কোন সহায়তা সে পেল না; তাই শহরের একেবারে শেষ প্রান্তে সস্তা হোটেলের ছোট একটা ঘর সে ভাড়া নিল; সেইদিনই সেই হোটেলের কর্মচারী একটা ধূর্ত শয়তান তাকে না জানিয়েই তার জন্য খদ্দের ধরবার চেষ্টা করতে লাগল; সুতরাং পরের দিনই সে একটা সুসজ্জিত ঘরে উঠে গেল; কিন্তু সেখানেও একজন পুরনো কোটনা তাকে দেখে ফেলল—যে সব বাড়িতে গরীব মানুষরা ভাড়া থাকে সেখানে এ ধরনের কোটনা অনেক থাকে।

সুতরাং লিউব্‌কা বুঝতে পেরেছে যে, সে যতই শান্তভাবে অন্যের অগোচরে বাস করতে চেষ্টা করুক না কেন, তার চোখে-মুখে, তার কথাবার্তায়, তার চাল-চলনে এমন কিছু বিশেষত্ব আছে যা সাধারণ মানুষের দৃষ্টিকে এড়িয়ে গেলেও এই ব্যবসার লোকদের কাছে নির্ভুলভাবে ধরা পড়বেই।

কিন্তু লিখোনিন-এর প্রতি তার ঐকান্তিক ভালবাসা যতই ক্ষণস্থায়ী ও আকস্মিক হোক না কেন, সেই ভালবাসাই দ্বিতীয় পতনের অনিবার্যতাকে প্রতিরোধ করবার শক্তি তাকে দিয়েছে—যে শক্তি তার মধ্যে আছে বলে সে নিজেই বিশ্বাস করত না। সেই শক্তির জোরেই সে দাসীর কাজ পাবার আশায় সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনও দিয়েছিল। কিন্তু তার কাছে কোন প্রশংসাপত্র ছিল না; তাছাড়া এ-ব্যাপারে তাকে কেবলমাত্র মেয়েদের সঙ্গেই দেখা করতে হয়েছে, আর তারাও নির্ভুলভাবে তার মধ্যে দেখতে পেয়েছে তাদের চিরকালের সেই শত্রুকে যে তাদের স্বামীকে, বাবাকে, ভাইকে ও ছেলেকে বিপথে টেনে নামিয়েছে।

শহর থেকে মাইল পনেরো দূরে অবস্থিত তার গাঁয়ে ফিরে যাবারও কোন মানে হয় না, বা তাতে লাভও কিছু নেই। সে যে পতিতালয়ে থাকত সে খবর অনেকদিন আগেই গ্রামেও রটে গিয়েছে। তার আগেকার প্রতিবেশী যারা দ্বিতীয় শ্রেণীর হোটেল বা রেস্তোরাঁয় কাজ করে, যারা গাড়ি চালায় বা ঐ ধরনের কাজ করে তাদেরই কেউ বা চিঠি লিখে, কেউ বা মুখে মুখে জানিয়ে দিয়েছে যে লিউব্‌কার সঙ্গে শহরের পথে তাদের দেখা হয়েছে, অথবা আন্না মার্কভ্‌নার বাড়িতে তাকে দেখেছে। সে জানত, বাড়ি ফিরে গেলে তার কপালে যা আছে তার চাইতে মৃত্যু শতগুণে ভাল!

টাকা-পয়সার ব্যাপারে লিউব্‌কা একটা পাঁচ বছরের মেয়ের মতই বেহিসেবী ও বাস্তববুদ্ধিহীন। কাজেই শীঘ্রই সে নিঃসম্বল হয়ে পড়ল। পতিতালয়ে ফিরে যাবার চিন্তা তার কাছে যেমন ভয়াবহ তেমনি লজ্জাজনক। অথচ শহরের পথে হেঁটে বেড়ালেও প্রলোভন পদে পদে। সন্ধ্যার পর বড় রাস্তায়

বের হলেই পুরনো ঝানু পথচারিণীরা কেমন করে তার যেন পুরনো ব্যবসাটা ধরে ফেলে। প্রায়ই কেউ না কেউ লিউব্‌কার পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে মিষ্টি করে ইনিয়ে-বিনিয়ে কথা বলতে শুরু করে।

"একা একা হাঁটছ কেন গো মেয়ে? এস দু'জন বন্ধুর মত একসঙ্গে হাঁটি; সেটা অনেক ভাল। পুরুষরা যখনই মেয়েদের সঙ্গে ফূর্তি করে সময় কাটাতে চায়, তারা সব সময়ই চারজনের দল পছন্দ করে।"

আর সেই ধূর্ত কুট্‌নি প্রথমে আভাষে-ইঙ্গিতে ও তারপরে খোলাখুলিভাবেই তার বাড়িউলির জীবন-যাত্রার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুরু করে দেয়। সেখানে ভাল, সুস্বাদু খাবার দেয়, বাইরে যাবার ব্যাপারে কোন বাধা-নিষেধ নেই, নির্দিষ্ট মজুরির বাইরে যেটা বাড়তি উপার্জন হয় সেটা বাড়িউলির কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা যায়। সেই সঙ্গে বিভিন্ন পতিতালয়ের মেয়েদের সম্বন্ধে নানারকম ঈর্ষা-প্রসূত খারাপ মন্তব্য করে, তাদের "সরকারের গুপ্তচর" "সরকারের দাসী", "শান্তশিষ্ট ভদ্রমহিলা!" বলেও উল্লেখ করে। এই সব বাজে কথার কি দাম লিউবা তা জানে, কারণ পতিতালয়ের মেয়েরাও পথচারিণীদের বলে থাকে "বাউণ্ডুলে" ও "যৌন রোগিনী"।

স্বভাবতই শেষ পর্যন্ত যা অনিবার্য তাই ঘটল। দিনের পর দিন অনাহারে কাটিয়ে এবং তারপরেও অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আতংককে প্রত্যক্ষ করে লিউব্‌কা একটি পরিচ্ছন্ন, পাকাচুল বৃদ্ধের সৌজন্যপূর্ণ আমন্ত্রণ গ্রহণ করল; লোকটির ভারিক্কী চেহারা, পোষাক-পরিচ্ছদ সুন্দর, আচরণ ভদ্র। এই পতনের জন্য লিউব্‌কা পেল এক রুবল মাত্র। সে প্রতিবাদ করতে সাহস করল না,—পতিতালয়ের জীবন তার উদ্যম, উৎসাহ ও মনোবলকে সম্পূর্ণ নষ্ট করে দিয়েছে। পরবর্তী বার কয়েক বৃদ্ধ লোকটি তাকে কিছুই দিল না।

রেশমের শার্ট ও চওড়া টুপি পরা একটি সুদর্শন চটপটে যুবক একদিন লিউবাকে হোটেলের ঘরে নিয়ে গেল। মদ ও খাবারের হুকুম করে সে সগর্বে জানাল যে, সে কোন কাউন্টের জারজ সন্তান, শহরের সেরা বিলিয়ার্ড খেলোয়াড়, মেয়েরা তাকে নিয়ে পাগল, লিউব্‌কাকে সে একটি প্রথম শ্রেণীর কুমারীতে রূপান্তরিত করে দেবে। তারপর সে বেরিয়ে গেল, যেন অন্য কোন পুরুষদের ঘরে গেল, এবং চিরদিনের মত হাওয়া হয়ে গেল। ট্যারা-চোখ রুক্ষ দরোয়ানটা নিঃশব্দে লিউব্‌কাকে মারধোর করল এবং শেষ পর্যন্ত তার মুখটা চেপে ধরল। তারপর যখন সে বুঝতে পারল যে দোষ অতিথির, মেয়েটির নয়, তখন একটি রুবল ও কিছু ভাঙানিসহ তার টাকার থলিটি, তার সস্তা টুপি ও জ্যাকেটটি "জামিন" স্বরূপ রেখে তাকে ছেড়ে দিল।

আর একটি লোক, বয়স পঁয়তাল্লিশ বছর, বেশ সুসজ্জিতও বটে, দুই ঘণ্টা ধরে লিউব্‌কাকে জ্বালাতন করে দিল শুধু ঘরভাড়াটা, আর তাকে দিল আশি কোপেক। লিউব্‌কা আপত্তি করায় লোকটি হিংস্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে তার নাকের

উপর লাল লোমে ঢাকা হাতের মস্তবড় একটা ঘুসি পাকিয়ে কঠোর গলায় বলল :

"আর একবার চেঁচিয়ে দেখ…আমিও চেঁচাব…পুলিশকে ডেকে বলব আমি যখন ঘুমিয়ে ছিলাম তখন তুমি আমার টাকা-পয়সা লুঠ করেছ। তখন কি হবে? কতদিন আগে শেষবারের মত থানায় গিয়েছিলে?"

তারপর সে চলে গেল।

এরকম অনেক ঘটনা ঘটেছে।

যেদিন তার বাড়িওলা ও বাড়িউলি—এক মাঝি ও তার বউ—জানিয়ে দিল যে সে আর তাদের ঘরে থাকতে পারবে না, এবং তার জিনিসপত্র সব উঠোনে ছুঁড়ে ফেলে দিল, যেদিন পুলিশের নজর এড়িয়ে বৃষ্টির মধ্যে সে পথে পথে সারাটা রাত ঘুরে বেড়াল,…সেইদিন লজ্জায় ও বিরক্তিতে শেষ পর্যন্ত সে লিখোনিন-এর সাহায্য নেওয়াই স্থির করল। কিন্তু লিখোনিন তখন শহরে ছিল না; যেদিন সে লিউব্‌কার প্রতি অন্যায় করেছিল, তাকে অপমান করেছিল সেদিনই সে তার বাসা থেকে পালিয়ে গেছে। সুতরাং সেদিন সকালে সব জায়গা থেকে বিতাড়িত হয়ে বেপরোয়াভাবে সে স্থির করল, পতিতালয়ে ফিরে গিয়ে ক্ষমা-ভিক্ষা করা ছাড়া তার আর অন্য গতি নেই।

২

"জেনেচ্‌কা, তুমি এত বুদ্ধিমতী, এত সাহসী, এত ভাল। দয়া করে এম্মা এডোয়ার্ডভ্‌নাকে বল আমাকে ফিরিয়ে নিতে—সে তোমার কথা শুনবে," জেনির খোলা কাঁধকে চোখের জলে ভিজিয়ে সেখানে চুমো খেতে খেতে লিউব্‌কা বলল।

জেংকা গম্ভীর মুখে বলল, "সে কারও কথা শুনবে না। ওই বোকা অকর্মা লোকটার মধ্যে তুমি কি পেয়েছিলে যে তার কাছে চলে গেলে?"

"জেনেচ্‌কা, তুমি নিজেই তো আমাকে পরামর্শ দিয়েছিলে…" লিউব্‌কা ভয়ে-ভয়ে বলল।

"আমি? আমি তোমাকে পরামর্শ দিয়েছিলাম?…আমি কক্ষনও তোমাকে পরামর্শ দেই নি…কেন সব মিছে কথা বলছ…আচ্ছা, ঠিক আছে… চল যাই।"

লিউব্‌কার ফিরে আসার কথা ইতিমধ্যেই এম্মা এডোয়ার্ডভ্‌নাকে জানানো হয়েছিল। মেয়েটা যখন ভয়ে ভয়ে চারদিকে তাকাতে তাকাতে উঠোন পার হচ্ছিল তখনই সে তাকে দেখেছে। আসলে লিউব্‌কাকে ফিরিয়ে নিতে তার কোন আপত্তিও নেই। আসলে টাকার লোভেই সে লিউব্‌কাকে যেতে দিয়েছিল, আর সে টাকার অর্ধেকটা সে নিজেই মেরে দিয়েছিল। অবশ্য সে আশা করেছিল যে মরসুমের নতুন বেশ্যার আমদানী হলেই সে লিউব্‌কার

শূন্যস্থান পূর্ণ করে নিতে পারবে। এ ব্যাপারে সে একটু ভুলই করেছিল। কারণ মরসুমটা হঠাৎই বন্ধ হয়ে গেল। যাই হোক, বাড়িউলি মেয়েটিকে ফেরৎ নিতেই রাজী। তবে প্রতিষ্ঠানের সুনাম বজায় রাখতে ও তার নিজের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে লিউব্‌কাকে আগে আচ্ছা করে সমঝে দিতে হবে।

লিউব্‌কার আবোল-তাবোল কথায় কান না দিয়েই সে হুংকার দিয়ে উঠল, "কী-ই-ই? তোমাকে ফিরিয়ে নেব? শয়তানই জানে কার সঙ্গে কোন্‌ রাস্তায়, কোন্‌ বেড়ার ধারে, তুমি গড়াগড়ি খাচ্ছিলে; আর হতচ্ছাড়ি নোংরা মেয়ে, এখন তুমি এসেছ একটা সম্রান্ত ভদ্র প্রতিষ্ঠানে আবার পথ করে নিতে? ধিক, রুশ শুয়োরী…বেরিয়ে যাও!"

লিউব্‌কা চুমো খাবার জন্য তার হাত দুটো জড়িয়ে ধরতে চেষ্টা করল, কিন্তু বাড়িউলি কঠোরভাবে হাতটা টেনে নিল। তারপর হঠাৎ বিকৃত ক্যাকাশে মুখে কাঁপা ঠোঁটকে দাঁতে চেপে ধরে এম্মা এডোয়ার্ডভ্‌না বেশ মাপা হাতে লিউব্‌কার গালে প্রচণ্ড আঘাত করল, ধাক্কা দিয়ে তাকে মাটিতে ফেলে দিল। কিন্তু লিউব্‌কা তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ফোঁপাতে ফোঁপাতে রুদ্ধকণ্ঠে কথা বলতে লাগল।

"আমাকে মেরো না…ওগো, দয়া করে…আমাকে মেরো না…"

এই নিয়মিত নিষ্ঠুর প্রহার প্রায় দু'মিনিট ধরে চলল। তার স্বাভাবিক বিক্ষুব্ধ ঘৃণিত দৃষ্টিতে জেংকা নীরবে সবই দেখছিল; হঠাৎ দৃশ্যটা তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠল। ভীষণভাবে চিৎকার করে উঠে সে বাড়িউলির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, তার চুল টেনে ধরল, বেণী খুলে দিল এবং মৃগিরোগগ্রস্তের মত বলে উঠল:

"বোকার ডিম…খুনে…নীচ কুট্‌নি…চোর!"

তিনটি নারী একসঙ্গে চেঁচাতে লাগল; আর সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি ঘর ও করিডর থেকে যেন তারই জবাবে সকলে একসঙ্গে তারস্বরে চিৎকার শুরু করে দিল। সকলেই যেন মৃগিরোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। এ ধরনের উত্তেজনা অনেক সময় কারাগারের কয়েদীদের পেয়ে বসে; এটা সেই মৌলিক উন্মত্ততারই সমগোত্রীয় যা একটা মহামারীর মতই অপ্রত্যাশিতভাবে কোন উন্মাদ আশ্রমের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে; যা দেখে অভিজ্ঞ মনোরোগ-চিকিৎসকদের মুখও ভয়ে সাদা হয়ে যায়।

দুইজন সহকারীসহ সাইমিয়ন পুরো একটি ঘণ্টা চেষ্টা করে তবে অবস্থা আয়ত্তে আনল। তেরোটি মেয়েকেই কঠোর শাস্তি দেওয়া হল, কিন্তু জেংকার শাস্তি হল সকলের চেয়ে বেশী, কারণ সে-ই হৈ-চৈ করেছিল সব চাইতে বেশী। অনেক মার খেয়েও যতক্ষণ তাকে ফিরিয়ে নেওয়া না হল ততক্ষণ পর্যন্ত লিউব্‌কা বাড়িউলির সামনে মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি খেল। সে জানত, আগে হোক, পরে হোক জেংকার এই প্রতিবাদের ফল তাকে ভোগ করতেই হবে। জেংকা

নিজে সন্ধ্যা পর্যন্ত দুই হাঁটু ভেঙে বিছানায় বসে রইল; খাবার খেল না; কেউ কাছে গেলেই তাকে তাড়া করল। তার চোখের নীচে কালসিটে পড়েছিল; তার উপর সে একটা তামার পয়সা চাপা দিয়েছে। তার ছেঁড়া শার্টের নীচে গলা পর্যন্ত দড়ির মত একটা লম্বা গভীর লাল দাগ ফুটে উঠেছে। ধ্বস্তাধ্বস্তির সময় সাইমিয়নের আঘাতের ফলেই দাগটা হয়েছে। সে একলা বসে আছে; তার মুখ নড়ছে, অন্ধকারে তার চোখ দুটি বন্য পশুর মত জ্বলছে, নাসারন্ধ্র স্ফুরিত হচ্ছে; ক্রুদ্ধ চাপা গলায় সে বলতে লাগল:

"অপেক্ষা কর···চোখ মেলে দেখ···ধিক।···আমি দেখে নেব···তখন বুঝবে ···উ-উ-উ, যত সব নরমাংস খাদকের দল!"

কিন্তু বসবার ঘরে যখন আলো জ্বলে উঠল, দ্বিতীয় বাড়িউলি জোসিয়া যখন দরজায় টোকা দিয়ে বলল, "সাজগোজের সময় হয়েছে মেয়ে···বের হবার সময় হয়েছে", তখন জেনি তাড়াতাড়ি হাত-মুখ ধুয়ে নিল, পোষাক পরল, কালসিটে পড়া চোখে পাউডার লাগাল, গোলাপি পাউডার দিয়ে মোটা দাগটা ঢেকে নিল এবং করুণ অথচ সগর্ব ভঙ্গীতে বসবার ঘরে গিয়ে ঢুকল; আঘাত সত্ত্বেও ভয়ংকর ক্রোধে ও অপার্থিব সৌন্দর্যে তার আহত চোখ দুটি জ্বলছে।

৩

কোলিয়া গ্লাডিশেভ ছেলেটি ভারী সুন্দর; গোল মাথা, গোলাপি গাল। উপরের ঠোঁটে নতুন-ওঠা গোঁফের নীচে একটা অদ্ভুত সাদা বাঁকা রেখা দেখা দিয়েছে। নীল চোখ দুটি বুদ্ধিদীপ্ত; মাথার চুল এত ছোট করে ছাঁটা যে হৃষ্টপুষ্ট একটা ইয়র্কশায়ারী শূকর-ছানার মত তার বাদামী চুলের ফাঁকে মাথার গোলাপি চামড়া স্পষ্ট চোখে পড়ে। ছোট মেয়ে যে রকম পুতুল নিয়ে খেলে ঠিক সেই রকম গত শীতকালে জেনিও তাকে নিয়েই ফূর্তি করে কাটিয়েছে; না কি সে যখন লজ্জায় মাথা নীচু করে সেই কুখ্যাত বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিল তখন মাতৃস্নেহ বশতই সে তাকে একটা আপেল অথবা কয়েক টুকরো মিছরি দিয়েছিল?

বেশ কয়েক মাস শিবিরে কাটিয়ে এবার যখন ফিরে এল তখন তার মধ্যে অনেক পরিবর্তন দেখা দিয়েছে; বালক যুবকে রূপান্তরিত হয়েছে। সে সামরিক বিদ্যালয় থেকে গ্র্যাজুয়েট হয়েছে, এবং একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও এখনও শিক্ষানবীশের পোষাক পরতে হলেও সে সগর্বে নিজেকে একজন অফিসার বলে মনে করে। সে আরও লম্বা হয়েছে, ফলে শরীরটা একটু বেঁকে গেছে, সরুও হয়েছে। শিবির-জীবনের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে। সে এখন ভারী গলায় কথা বলে এবং গর্ব ও আনন্দের সঙ্গে সে বুঝতে পারছে যে গত কয়েক মাসেই তার বুকের বাঁট দুটি শক্ত হয়ে উঠেছে। সে জানে, এটাই যৌবনের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ ও অনস্বীকার্য লক্ষণ। বর্তমানে কঠোর বিধি-নিষেধে

পরিচালিত মিলিটারি অ্যাকাডেমিতে ঢুকবার আগে পর্যন্ত সে অনেকটা স্বাধীনভাবেই চলাফেরা করছে। বাড়িতে এখন তাকে বড়দের সামনেই ধূমপান করতে দেওয়া হয়; এমন কি বাবা তাকে তার নামের আদ্য অক্ষর আঁকা একটা চামড়ার সিগারেট-কেস উপহার দিয়েছে এবং একটা পারিবারিক আনন্দের মুহূর্তে তার জন্য মাসিক পনেরো রুবলের একটা ভাতাও মঞ্জুর করেছে।

ঠিক এইখানে, এই আন্না মার্কভ্‌নার বাড়িতেই কোলিয়া প্রথম কোন নারীর সঙ্গে পরিচিত হয়—আর সে নারী জেংকা।

মানুষ যতটা মনে করে তার চাইতে অনেক বেশী ক্ষেত্রেই নিষ্পাপ ছেলেদের প্রথম পতন ঘটে পতিতালয়ে অথবা পথচারিণীদের কাছে। এই স্পর্শকাতর বিষয়টি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে শুধু কাঁচা বয়সের যুবকরাই নয়, প্রায় ঠাকুর্দার বয়সী পঞ্চাশ বছরের পুরুষরাও সেই একই বাঁধা-ধরা পুরনো মিথ্যা কথাটাই বলে যে কোন দাসী বা গৃহ-শিক্ষিকাই তাদের পাপের পথে টেনে নামিয়েছে। কয়েক দশক ধরে প্রচলিত এই দীর্ঘস্থায়ী বিচিত্র মিথ্যাটা বৃত্তিগত পর্যবেক্ষকরাও কদাচিৎ লক্ষ্য করেছে বা তার বিবরণ উপস্থাপিত করেছে।

নয় বা সাড়ে নয় বছর বয়সেই কোলিয়া গতানুগতিক যৌন উত্তেজনা অনুভব করলেও অভিসার ও ভালবাসার চরম পরিণতি যে আসলে কি বস্তু সে বিষয়ে তার তিলমাত্র ধারণাও ছিল না; অথচ কেউ যখন সত্যি সত্যি সে ঘটনার মুখোমুখি হয়, অথবা ঠাণ্ডা মাথায় সেটাকে দেখে, অথবা ব্যাপারটাকে যখন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাকে বুঝিয়ে দেওয়া হয় তখন সেটাকে কত ভয়ংকরই না মনে হয়। ছেলেটির দুর্ভাগ্যবশত সে সময় আজকের দিনের মত এমন কোন প্রগতিশীলা নারী ছিল না যে উপকথার বকপাখির গলাটা মুচড়ে দিয়ে অথবা বাঁধাকপির পাতাগুলো ছিঁড়ে ফেলে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে ছবির মত করে বক্তৃতা দিয়ে, উপমা দিয়ে, তুলনা দিয়ে ছেলেমেয়েদের ভালবাসা ও গর্ভসঞ্চারের পরম রহস্যকে বুঝিয়ে দিতে পারে।

এ-কথা বলতেই হবে যে, তার বয়সের অধিকাংশ ছেলের মতই কোলিয়াও এমন অনেক কিছুর সংস্পর্শে এসেছে যা সে বুঝতে পারে না। একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে বাবার পড়ার ঘরে ঢুকে সে দেখতে পেয়েছিল, তাদের সর্বদা ফূর্তিবাজ, ইস্পাতের মত শক্ত পা-ওয়ালা গোলাপি-গাল দাসী ফ্রসিয়া এপ্রনে মুখ ঢেকে দ্রুত পালিয়ে গেল। সে আরও দেখেছিল, তার বাবার মুখটা লাল হয়ে উঠেছে, আর তার গাঢ় নীল নাকটা লম্বা হয়ে গেছে। কোলিয়া সেদিন ভেবেছিল, "বাবাকে মোরগের মত দেখাচ্ছে।" আর একদিন একঘেয়েমি কাটাবার জন্য এবং কিছু ছেলের স্বাভাবিক দুষ্টুমিবশত কোলিয়া বাবার টেবিলের তালা-না-লাগানো দেরাজটা খুলে এমন কতকগুলি ফটোগ্রাফ দেখতে পেয়েছিল যাকে কেউ বলে প্রেমের পরিণতি, আবার কেউ বলে অপার্থিব অনুভূতি।

সে আরও লক্ষ্য করেছে, যখনই গায়ে গন্ধ মেখে ও মুখে পাউডার ঘসে

পার্ভেল এডোয়ার্ডভিচ্ (দূতাবাসের যে বোকা-বোকা লোকটির সঙ্গে মা নীপারের নদীর ওপারে সূর্যাস্ত দেখতে যায়) এ-বাড়িতে আসে তখনই মার বুকটা উঁচু-নীচু হতে থাকে, তার পাউডার-লাগানো গাল দুটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, আর পার্ভেল এডোয়ার্ডভিচ-এর সঙ্গে কথা বলার সময় তার গলার স্বর কেমন ভেলভেটের মত মসৃণ হয়ে ওঠে ; অথচ বাড়ির লোকজন বা চাকরদের সঙ্গে কথা বলার সময় তার গলা কত কর্কশ শোনায়। হায়, আমরা অভিজ্ঞজনরা যদি জানতাম, আমাদের চারপাশের ছেলেমেয়েরা কত কিছু জানে, কত বেশী জানে ; অথচ সেই সব ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে আমরা সচরাচরই বলে থাকি :

"কিছু ভেব না ভলোদয়া—বা পেতিয়া, বা কাতিয়া—ওরা ছোট, ওরা কিছু বোঝে না।"

তার বড় ভাইয়ের কাহিনীটিও কোলিয়া গ্লাডিশেভ-এর উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। তার দাদা তখন মিলিটারি অ্যাকাডেমি থেকে পাশ করে সবে একটি সেরা পদাতিক বাহিনীতে যোগ দিতে যাবে। কাজে যোগ দিতে যাবার আগে লম্বা ছুটি নিয়ে সে পারিবারিক বাসভবনেই দুটো আলাদা ঘরে বাস করছিল। সেই সময় তাদের একটি দাসী ছিল। নাম নিউশা। অনেক সময়ই তারা ঠাট্টা করে তাকে সিনরিতা অনিতা বলে ডাকত। মেয়েটি সুন্দরী, মাথাভর্তি কালো চুল। তেমনভাবে সাজগোজ করলে তাকে অনায়াসে কোন অভিনেত্রী, এমন কি রাজকন্যা বলেও মনে করা যেত। এই মেয়েটির সঙ্গে তার দাদার ভাব-সাবকে তার মা প্রকাশ্যেই সমর্থন করত। এ ব্যাপারে মায়ের স্বাভাবিক বুদ্ধির দ্বারাই সে পরিচালিত হয়েছিল। বোরেংকার যদি চারিত্রিক স্খলন ঘটেই তাহলে কোন পতিতার কাছে যাওয়া বা কোন শিকারী নারীর খপ্পড়ে পড়ার চাইতে সে যদি একটি নিষ্পাপ মেয়ের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে সেটা অনেক ভাল। কোলিয়া সে সময় জঙ্গলের গল্প, দক্ষিণ আমেরিকার বৃক্ষহীন প্রান্তরের গল্প, পর্যটকদের কাহিনী এবং "কালো চিতা" নামক এক ভারতীয় নায়কের কাহিনীতে ডুবে থাকত। তথাপি দাদার এই প্রেমের ব্যাপারেও তার খুবই আগ্রহ ছিল ; অনেক সময়ই সে অদ্ভুত সব সিদ্ধান্ত করে বসত। ছ'মাস পরে দরজার বাইরে থেকে সে একটা বিরক্তিকর দৃশ্যের সাক্ষী হয়েছিল, বরং বলা যায় আড়ি পেতে সব কিছু সে শুনেছিল। তার মা এমনিতে খুব সংযত মহিলা হলেও সেদিন তার শোবার ঘরে সিনরিতা অনিতাকে বকাবকি করছিল, মাটিতে পা ঠুকছিল আর ট্রাক-চালকদের মত ভাষায় গালাগালি করছিল। সিনরিতা তখন পাঁচ মাস গর্ভবতী। মেয়েটি যদি চেঁচামেচি না করত তাহলে হয় তো তার মুখ বন্ধ করবার জন্য কিছু টাকা দিয়ে তাকে সরিয়ে দেওয়া হত ; কিন্তু তরুণ মনিবকে ভালবাসার দরুণ সে কিছুই চাইল না, শুধু উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে লাগল ; ফলে পুলিশ এসে তাকে নিয়ে গেল।

পঞ্চম বা ষষ্ঠ স্তরের ছাত্র হিসাবে কোলিয়ার স্কুলের বন্ধুদের অনেকেই

ইতিমধ্যেই সেই পাপ-বৃক্ষের ফল খেয়েছে। যে সব কথা উচ্চারণ করা উচিত নয় সেই সব কথা সগর্বে ঘোষণা করাই সে সময় সামরিক বিদ্যালয়গুলিতে চালাক-চতুর চরিত্রের লক্ষণ বলে গণ্য করা হত। আর্কাশা স্কারিন-এর একটা রোগ হয়েছিল। গুরুতর রকমের কিছু না হলেও সব উপরের শ্রেণীর ছাত্রদের কাছে সে পূজনীয় হয়ে উঠল। অনেক ছেলেই পতিতালয়ে যেত এবং নানা রকম রং চড়িয়ে নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করত—কারণ এ ধরনের অভিযানকে সাহসিকতা ও পৌরুষের চরম বলে মনে করা হত।

আর একদিন হল কি, কোলিয়া আন্না মার্কভ্‌নার বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়েছিল। তাকে যে অন্য কেউ ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তা নয়। প্রলোভনকে জয় করবার ক্ষমতা তার এতই কম ছিল যে সে নিজেই অগ্রণী হয়ে তাদের দলে ভিড়েছিল। সেই সন্ধ্যার কথা সে সব সময়ই বিরক্তির সঙ্গে, লজ্জার সঙ্গে মাতালের অস্পষ্ট দুঃস্বপ্নের মত মনে করত। তার মনে পড়ে, মনে সাহস আনবার জন্য ড্রশ্‌কি-তে বসে বসেই ছারপোকার গন্ধওয়ালা মদ পর্যন্ত গিলেছিল। তার মনে পড়ে, মস্ত বড় বসবার ঘরটাতে যখন তারা ঢুকল তখন ঝাড়-লণ্ঠনের আলোগুলি চাকার মত ঘুরছিল আর মেয়েগুলো সব লাল, নীল ও বেগুনি আলোর ঝলকের মত ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তাদের গলা, বুক ও হাতের সাদা রং সেই উজ্জ্বলতায় ঝলমল করছিল। এই রহস্যময়ীদের একজনকে ডেকে তার এক বন্ধু মেয়েটির কানে কানে কি যেন বলল আর সে তার কাছে এসে বলে উঠল :

"মিষ্টি ছেলে, শোন···তোমার বন্ধু বলছে তুমি আনকোরা···চলে এস··· আমি তোমাকে শিখিয়ে দেব।"

কথাগুলি মিষ্টি ; আন্না মার্কভ্‌নার পতিতালয়ের দেয়াল হাজার হাজার বার এই একই কথা কান পেতে শুনেছে। তারপর যা ঘটেছিল তার স্মৃতি এতই কঠোর ও বেদনাদায়ক যে সে কথা মনে হতেই কোলিয়া এতদূর ক্লান্তি বোধ করে যে সে জোর করে অন্য কথা ভাবতে শুরু করে দেয়। অস্পষ্টভাবে তার শুধু মনে পড়ে, আলোগুলো যেন আবছা হয়ে ঘুরতে লাগল, অবিশ্রাম চুমো খাওয়া চলল, আর দৈহিক সংযোগ ঘটতেই সে যেন কেমন দিশেহারা হয়ে গেল ; তারপর হঠাৎ একটা তীব্র যন্ত্রণায় তার ইচ্ছা হল সত্রাশে সে কেঁদে উঠবে, পরমানন্দে সে মরে যাবে···আর তারও পরে সে সবিস্ময়ে দেখল কম্পিত হাতে সে বোতামগুলি নাড়াচাড়া করছে···

অবশ্য যৌন-সম্ভোগপরবর্তী এই আদিম অভিজ্ঞতা সব পুরুষেরই হয়ে থাকে, কিন্তু অর্থপূর্ণ ও গভীর এই তীব্র নৈতিক যন্ত্রণা অতি দ্রুত দূর হয়ে যায়; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পড়ে থাকে একটা একঘেঁয়ে অদ্ভুত অনুভূতি। কোলিয়া খুব তাড়াতাড়ি এসব ব্যাপারে অভ্যস্ত হয়ে পড়ল। তার সাহস বেড়ে গেল, মেয়েদের সাহচর্যে সে আর বিব্রত বোধ করে না ; কাজেই পতিতালয়ে ঢুকতেই

মেয়েরা, বিশেষ করে ভার্কা যখন চেঁচিয়ে বলে উঠল, "জেনেচ্কা, তোমার নাগর এসেছে," তখন তার বেশ ভালই লাগল।

কল্পিত গোঁফে চাড়া দিতে দিতে সতীর্থদের কাছে এ কথা বলতে তার ভালই লাগল।

৪

অগাস্টের একটি বর্ষণমুখর সন্ধ্যা। প্রায় ন'টা বাজে। আন্না মার্কভ্নার পতিতালয়ের আলোকিত বসবার ঘরটা প্রায় ফাঁকা। চেয়ারের নীচে পাদুটোকে অদ্ভুতভাবে গুটিয়ে তার বিভাগের তরুণ করণিকটি শুধু দরজার কাছে বসেছিল। কোয়াড্রিল নাচের সময় সমাজে যে ধরনের কথাবার্তা চলে সেই রকম বিনম্র ভঙ্গীতে সে মোটা কাতিয়ার সঙ্গে আলাপ জমাবার চেষ্টা করছিল। ওদিকে লম্বা-ঠ্যাং বুড়ো রলি-পলি ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছিল; কখনও এ-মেয়ের কাছে, কখনও বা সে-মেয়ের কাছে থেমে নানা ধরনের কথায় তাদের খুশি করার চেষ্টা করছিল।

কোলিয়া গ্লাডিশেভ যখন বাইরের বারান্দায় ঢুকল তখনই জকির পোষাক পরা গোল-চোখ ভার্কা তাকে দেখতে পেয়ে হাততালি দিতে দিতে চারদিক ঘুরে চেঁচিয়ে উঠল:

"জেংকা, জেংকা, শিগ্‌গির এস, তোমার তরুণ নাগর সেই শিক্ষানবীশটি এসেছে। কী সুন্দর ছেলেটি!"

কিন্তু জেংকা সেখানে ছিল না; একটা ধুম্‌সো রেলের কণ্ডাক্টার তখন তাকে পাকড়াও করেছিল।

এই মাঝ-বয়সী শান্ত, গম্ভীর লোকটি খদ্দের হিসাবে খুবই ভাল, ট্রেনটা হারাবার ভয়ে সে কখনও চল্লিশ মিনিটের বেশী সময় থাকে না, আর সারাক্ষণই ঘড়ি দেখতে থাকে। এইটুকু সময়ের মধ্যেই সে চার বোতল বীয়ার খায়, আর যাবার সময় মিছরি খাবার জন্য মেয়েটিকে দিয়ে যায় পঞ্চাশ কোপেক এবং সাইমিয়নকে বকশিস দেয় কুড়ি কোপেক।

কোলিয়া গ্লাডিশেভ তার সতীর্থ পেত্রভকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। ছেলেটি এর আগে কখনও পতিতালয়ে আসে নি; কোলিয়ার মুখে মন-মাতানো সব গল্প শুনে আজ লোভে পড়ে এসেছে। আগের বছর প্রথম দিনটিতে কোলিয়ার যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল হয় তো প্রথম কয়েকটা মিনিট পেত্রভও সেই একই তীব্র জ্বর-জ্বর উত্তেজনা অনুভব করছিল; তার পা কাঁপছে, মুখ শুকিয়ে উঠছে, মনে হচ্ছে ঘরের সবগুলো আলো চক্রাকারে ঘুরছে।

সাইমিয়ন তাদের ওভারকোট দুটো নিয়ে এমনভাবে দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখল যাতে তাদের সামরিক বিভাগীয় বোতাম ও প্রতীকগুলি চোখে না পড়ে। এখানে বলা দরকার যে এই গম্ভীর, কড়া লোকটি ছাত্রদের সহজ চাল-চলন ও

দুর্বোধ্য কথাবার্তার জন্য তাদের পছন্দ করত না ; কাজেই সামরিক পোষাক পরা এই দুটি ছেলেকে এখানে আসতে দেখে তার ভাল লাগে নি।

সহকর্মী অন্য দরোয়ানকে সে প্রায়ই বলত, "এটা কি ভাল ? এই না-চাটা বাছুর যে এখানে আসে, যদি কোন উর্দ্ধতন অফিসারের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে যায় তখন কি হবে ? বুম্! পতিতালয় বন্ধ হয়ে গেল! তিন বছর আগে লিওপান্দিখার বেলায় এই রকমটাই ঘটেছিল। অবশ্য বন্ধ হয়ে গেল বলে যে কিছু এসে গেল তা নয়, কারণ সঙ্গে সঙ্গেই অন্য নামে সে ব্যবসা খুলে বসল। তবে তার দেড় মাসের জেল হয়েছিল, আর সেই জেল এড়াতে তাকে বেশ কিছু খরচ করতে হয়েছিল। এক কের্বেশ্‌কেই তো দিতে হয়েছিল চারশ' রুবল! আরও একটা ব্যাপার ঘটতে পারে। ঐ ধরনের বোকা ছেলে কোন জায়গা থেকে এক রোগ বাধিয়ে বসে তারপর নাকি কান্না শুরু করে দিতে পারে : "ওরে বাবা! ওরে মা! আমি মারা গেছি!" "এ রোগ কোত্থেকে জোটালে হাবা-গঙ্গারাম ?" "ওইতো ওখানে—।" বাস, এখন তুমি তার জবাবদিহি কর!"

"ভিতরে যাও", ছাত্র দুটিকে সে বলল।

উজ্জ্বল আলো থেকে চোখকে আড়াল করে ছেলে দুটি বসবার ঘরে ঢুকল। মনে সাহস আনবার জন্য পেত্রভ একটু মদ খেয়েছিল। ফলে তার পা টলছিল। "বয়ার্সের ভোজ" নামক ছবিটার নীচে তারা বসল। সঙ্গে সঙ্গে দুটি মেয়ে ভার্কা ও তামারা গিয়ে তাদের সঙ্গে ভিড়ল।

"সুন্দর, একটু ধূমপান করাও," পেত্রভ্‌কে এই কথা বলে যেন হঠাৎ লেগে গেছে এই ভাবে ভার্কা তার সাদা জাসি-মোড়া গরম উরু দিয়ে তার পা-টা চেপে ধরল। "তুমি খুব মিষ্টি।"

গ্লাডিশেভ জিজ্ঞাসা করল, "জেনি কোথায় ? সে কি কারও সঙ্গে আছে ?"

তামারা এমনভাবে তার দিকে তাকাল যে ছেলেটা ঘাবড়ে গিয়ে মুখটা ঘুরিয়ে নিল।

"কারও সঙ্গে ? না, না, তা কেন থাকবে ? তার খুব মাথা ধরেছে, দিনভরই ধরে আছে। হয়েছে কি, সে করিডর দিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ বাড়িওয়ালা আচমকা দরজাটা খুলতেই—দুম্! লাগল তার চোখে। তার থেকেই মাথার যন্ত্রণা। বেচারি কপালে জল-পটি লাগিয়ে বিছানায় শুয়ে আছে। অপেক্ষা কর। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে এসে পড়বে। তাকে তোমার খুব ভাল লাগবে।"

ভার্কা পেত্রভ্‌কে জ্বালাতন করতে লাগল।

"মিষ্টি দেবদূত আমার, পাতিহাঁসটি আমার! কালো চুল আর ফ্যাকাসে মুখ যার তাকে আমি বড় ভালবাসি। তারা খুব ঈর্ষাকাতর, আর ভয়ানকভাবে ভালবাসতে পারে।"

সে গান গেয়ে উঠল। তারপর বলল, "মধুর হাড়ি আমার, তোমার নামটি কি?"

গম্ভীর মোটা গলায় পেত্রভ জবাব দিল, "জর্জ।"

"জর্জিক, জরোচ্‌কা, ওঃ, চমৎকার।"

হঠাৎ তার কানের কাছে মুখটা নিয়ে চোখে ধূর্ত হাসি ফুটিয়ে সে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, "জরোচ্‌কা, আমার সঙ্গে এস।"

পেত্রভ চোখ নামাল; বিষণ্ণ গলায় বলল:

"আমি জানি না। আমার বন্ধুরা যা বলেছে……"

ভার্কা জোরে হেসে উঠল।

"ভারী মজা তো, ভারী মজা। কী শিশুর মত ভঙ্গীই করছ! জান জরোচ্‌কা, আমাদের গাঁয়ে তোমার মত ছেলে সংসার-ধর্ম করে, আর তুমি কিনা বলছ, 'আমার বন্ধুরা যা বলেছে!' শোন গো তামারা, ওকে আমার সঙ্গে শুতে বলছি, আর ও জবাব দিচ্ছে, 'আমার বন্ধুরা যা বলেছে'। তুমি কি গো বন্ধুবর," সে কোলিয়াকে শুধাল, "গুরু, না কি?"

লড়াই করতে উদ্যত ছোট ছেলের মত পেত্রভ ক্রুদ্ধস্বরে বলে উঠল, "আমার সঙ্গে আর মস্করা করতে হবে না শয়তানী।"

লম্বা রলি-পলি আরও বুড়ো হয়েছে; হাত-পা ঢিলে হয়ে গেছে। ছাত্র দুটির কাছে এগিয়ে এসে শীর্ণ মাথাটা একদিকে হেলিয়ে মুখে একটা স্বর্গীয় ভাব ফুটিয়ে সে কথা বলতে শুরু করল।

"ছাত্রবাবুরা, উচ্চশিক্ষিত যুবকরা, আমাদের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে আপনারাই পুষ্পস্বরূপ, আপনারাই ভাবী ফিল্ড মার্শাল, দয়া করে এই পাপপুরীর আদি অধিবাসী এই বুড়োকে একটি ভাল সিগারেট দান করুন। আমি সর্বহারা।"

একটা সিগারেট দিতেই সে একখানা "পোজ" নিয়ে কাঁপা-কাঁপা ভাঙা গলায় গান গেয়ে উঠল। শিক্ষার্থীরা প্রত্যেকেই তাকে কুড়ি কোপেক করে দিল। সেগুলিকে হাতের তেলোয় রেখে অপর হাত দিয়ে সেগুলিকে শূন্যে উড়িয়ে দেবার ভঙ্গীতে সে বলে উঠল, "লাগ—লাগ—লাগ ভেল্কি লাগ," তারপর আঙুলগুলো মটকাতেই কোপেকগুলো হাওয়া হয়ে গেল।

তখন সে তিরস্কারের সুরে বলে উঠল, "তামারোচ্‌কা, এ কাজটা ঠিক হয় নি। একটি বৃদ্ধ, অবসরপ্রাপ্ত বন-রক্ষকের কাছ থেকে তার শেষ কপর্দকটি নিতে তোমার লজ্জা করল না? সেগুলোকে এখানেই বা লুকিয়ে রেখেছ কেন?"

পুনরায় আঙুলগুলি মটকে সে তামারার কানের পিছন থেকে মুদ্রাগুলি বের করে নিল।

তারপর বেশ জোর দিয়েই সে বলল, "শিগ্‌গিরই আমি ফিরে আসব। আশা করি আমি চলে গেলে আপনারা দুঃখিত হবেন না। অবশ্য আপনারা

যদি আমার জন্য অপেক্ষা না করেন তাহলেও আমি কিছু মনে করব না। সানন্দে আপনাদের জানাচ্ছি সান্ধ্য অভিবাদন।”

সে দরজার দিকে এগিয়ে যেতেই সাদা মাংকা চেঁচিয়ে বলল, “রলি-পলি, আমার জন্য কুড়ি কোপেকের মিছরি কিনে এনো···আর কিছু রঙিন মেঠাই। এই নাও, ধর!”

রলি-পলি সুন্দরভাবে মুদ্রাটা ধরে নিয়ে সকৌতুকে অভিবাদন জানিয়ে টুপিটা এক কানের উপর ঝুলিয়ে দিয়ে চলে গেল।

লম্বা, বুড়োটে হেনরিয়েটাও শিক্ষার্থীদের কাছে এগিয়ে গিয়ে একটা সিগারেট চেয়ে হাই তুলে বলল, “একটা নাচের বাজনার হুকুম করুন মশাইরা। দেখছেন না, চুপচাপ বসে বসে মেয়েগুলো কেমন গজড়াচ্ছে।”

“সেটা ভাল কথা,” কোলিয়া তার কথায় সায় দিয়ে বাজনাদারদের বলল, “দয়া করে একটা ‘ভাল্‌স্‌’ বাজাতে শুরু করে দিন।”

শিল্পীরা বাজনা শুরু করে দিল। পিঠ সোজা করে, মুখ নামিয়ে মেয়েরা প্রথামত একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে ঘুরতে লাগল।

গ্লাডিশেভ নাচতে ভালবাসে। লোভ সামলাতে না পেরে সে তামারার সঙ্গে ‘ভাল্‌স্‌’ নাচবার প্রস্তাব করল। গত বছর থেকেই সে জানে, অন্যের চাইতে তামারা ভাল নাচতে জানে। তারা যখন নাচের আসরে নামল তখন রেলের কণ্ডাক্টরটি কায়দা করে নাচিয়ে দুটির মাঝখান দিয়ে গলে বাইরে চলে গেল। কোলিয়ার সেদিকে নজরই পড়ল না।

ভার্কা নানাভাবে পেত্রভকে জ্বালাতন করলেও তাকে একচুলও নড়াতে পারল না। তার যৎসামান্য নেশা অনেকক্ষণই কেটে গেছে। ফলে এখানে সে কেন এসেছে সে কথা ভাবতেই সমস্ত ব্যাপারটা তার কাছে আরও ভয়ংকর, অবাস্তব ও কুৎসিত মনে হতে লাগল। অবশ্য সে মাথা ধরার ভাণ করতে পারে, অথবা বলতে পারে যে কোন মেয়েকেই তার পছন্দ হচ্ছে না, কিন্তু সে জানে যে চলে যেতে চাইলেই গ্লাডিশেভ তাকে যেতে দেবে না। কিন্তু আসল কারণ হল, সে তখনও দাঁড়াতেই পারছিল না, বা নিজে নিজে পা ফেলতেও পারছিল না। তাছাড়া, সে বোঝে যে, এ ব্যাপারে কোলিয়ার সঙ্গে একটা হেস্তনেস্ত করার সাহস তার নেই।

নাচ শেষ হয়ে গেলে গ্লাডিশেভ ও তামারা আবার গিয়ে পাশাপাশি বসল।

কোলিয়া অধৈর্য হয়ে বলে উঠল, “জেনির ব্যাপার কি? সে যে এখনও এল না?”

তামারা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ভার্কার দিকে তাকাল, আর অলক্ষ্যেই সেও চোখের পাতা নামাল।. তার অর্থ, অতিথি বিদায় হয়েছে।

তামারা বলল, “আমি তাকে ডেকে আনছি।”

হেনরিয়েটা বলল, “সব সময় ওর কাছেই বা যাবে কেন জেংকা? আমাকে

কেন নাও না ?"

"ঠিক আছে, অন্য সময় হবে," বলে কোলিয়া একটা সিগারেট ধরাল

জেংকা তখনও সাজতেই আরম্ভ করে নি। আয়নার সামনে বসে মুখে পাউডার ঘসছে।

"তুমি কি চাও তামারচ্‌কা ?" সে প্রশ্ন করল।

"তোমার ছাত্রবাবু দেখা করতে এসেছে। অপেক্ষা করে আছে।"

"আঃ, গত বছরের সেই খোকাটি! চুলোয় যাক সে।"

"বেশ, তাহলে আমি আছি। সে কিন্তু অনেকটা বড় হয়েছে। বেশ স্বাস্থ্যবান, সুন্দর ছেলেটি। দেখলেও ভাল লাগে। বেশ, তুমি যদি না চাও, আমি রাজী আছি।"

তামারা আয়নায় দেখল, জেংকার চোখে ভ্রূকুটি।

"না দাঁড়াও। না তামারা, তা করো না। তাকে এখানে পাঠিয়ে দাও। তাকে বল, আমার শরীর ভাল নেই, মাথা ধরেছে।"

"সে কথা তো তাকে বলেছি। বলেছি, জোসিয়া আচমকা একটা দরজা খুলতেই তোমার মুখে ধাক্কা লেগেছে এবং তুমি মাথায় জল-পটি দিয়ে শুয়ে আছ। তাকে এখানে ডাকা কি ভাল হবে জেনেচ্‌কা ?"

"ভাল হবে কি না সেটা তোমাকে ভাবতে হবে না তামারা," জেংকা রূঢ়ভাবে জবাব দিল।

"তোমার কি মোটেই দুঃখ হয় না, এতটুকু দুঃখ হয় না ?"

গলার লম্বা লাল দাগটার উপর হাত বুলিয়ে জেংকা পাল্টা প্রশ্ন করল, "আর আমার জন্য তোমার দুঃখ হয় না ? অভাগী লিউব্‌কার জন্য দুঃখ হয় না ? পাশ্‌কার জন্য ? তুমি তো ঠাণ্ডা মাছ, মানুষ নও।"

তামারা উদ্ধতভাবে দুষ্টুমির হাসি হাসল।

"না ভাই, আসল কাজের বেলায় কিন্তু আমি মোটেই ঠাণ্ডা মাছ নই। শীঘ্রই তার প্রমাণ পাবে জেনেচ্‌কা। কিন্তু ঝগড়া থাক। জীবনটা তো চড়ুই-ভাতি নয়। ঠিক আছে,আমি গিয়ে তাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

সে চলে গেলে জেনি ঝোলানো নীল লণ্ঠনের আলোটা কমিয়ে দিয়ে শোবার পোষাক পরে বিছানায় এলিয়ে পড়ল। এক মিনিট পরেই গ্লাডিশেভ ঘরে ঢুকল; পেত্রভকে টানতে টানতে তামারাও তার পিছু পিছুই এল; পেত্রভ মাথাটা নীচু করে তাকে বাধা দিচ্ছে। তার পিছনে টেঁরা-চোখ বাড়িউলি জোসিয়ার গোলাপি, ধূর্ত মুখটাকে উঁকি মারতে দেখা গেল।

জোসিয়া বলল, "এই তো ভাল। দুটি সুন্দর ছেলে আর দুটি সুন্দরী মেয়ে—দেখলেও চোখ জুড়োয়। ঠিক যেন ফুলের তোড়া। তোমাদের কি হুকুম গো বাবু ? বীয়ার, না মদ ?"

গ্লাডিশেভ-এর পকেটে অনেক টাকা—পঁচিশ রুবল ; এতটাকা সে জীবনে কখনও পায় নি ; তাই সকলকে দেখিয়ে সেটা খরচ করতে চায়। সে বীয়ার খায় লোককে দেখাবার জন্য ; আসলে বীয়ারের তেতো স্বাদ তার ভাল লাগে না ; সে তো ভেবেই পায় না অন্যরা ওটা কেন খায়। তাই ঠোঁট উল্টে খুঁতখুঁতে স্বরে সে বলল :

"তোমাদের এখানকার মাল হয়তো খুবই বাজে।"

"ও কথা বলছ কেন সুন্দর মানুষ ? আমাদের সব বড় বড় খদ্দের আমাদের মদ ভালবাসে। 'মাস্ক্যাটেল', 'টোকে', 'চার্চ-ওয়াইন' প্রভৃতি মিষ্টি মদ আমাদের কাছে পাবে, আর ফরাসি মদের মধ্যে আছে 'লাফিতে' ও 'পোর্ট'। মেয়েরা তো লেমনেড দিয়ে 'লাফিতে' খুব পছন্দ করে।"

"দাম কত ?"

"মোটেই বেশী না। যে কোন ভাল বাড়িতেই এক বোতল 'লাফিতে'র দাম পাঁচ রুবল, আর এক বোতল লেমনেড-এর দাম পঞ্চাশ কোপেক। তাহলে চার বোতল লেমনেড-এর দাম হল দুই রুবল আর মদ নিয়ে সাত রুবল।"

জেংকা তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "থাম তো জোনিয়া ; ছেলেগুলোর পকেট লুঠ করতে তোমার লজ্জা করে না ? ও সব কিছুর দাম পাঁচ রুবলই যথেষ্ট। দেখতে পাচ্ছ না, এরা ভাল মানুষ, যে-সে নয়।"

গ্লাডিশেভ লাল হয়ে উঠে একটা দশ রুবলের বিল টেবিলের উপর ছুঁড়ে দিল।

"বাজে কথা থাক্। নিয়ে এস।"

"এখানকার দর্শনীর টাকাও এর থেকেই কেটে রাখব। ছাত্রবাবুরা কি শুধু দেখা করবে, না রাতটা থাকবে ? এখানকার দাম জান তো, শুধু দেখা করলে দুই রুবল, আর রাত কাটালে পাঁচ।"

জেনি আবার বাধা দিল, "ঠিক আছে, ঠিক আছে। এরা শুধু দেখাই করবে ; এ ব্যাপারে আমাদের উপরেই ভরসা করতে পার।"

মদ এল। তামারা কিছুটা পেস্ট্রিও আনাল। সকলের অনুমতি নিয়ে জেংকা সাদা মাংকাকে ডেকে আনল। জেংকা বিছানা থেকেও উঠল না, মদও খেল না। ঘরটা বেশ গরম, তবু সে একটা পশমি শাল গলায় জড়িয়ে রাখল। সে এক দৃষ্টিতে কোলিয়া গ্লাডিশেভ-এর সুন্দর, তামাটে, পুরুষোচিত মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, একটি বারও চোখ সরাল না।

বিছানায় জেংকার পাশে বসে তার হাতে টোকা দিতে দিতে কোলিয়া বলল, "ব্যাপার কি গো ?"

"কিছু না। মাথাটা একটু ধরেছে। একটা ধাক্কা খেয়েছি।"

"তাহলে আর এদিকে মনোযোগ দিতে চেষ্টা করো না।"

"আরে না, তোমরা আসায় এখন অনেকটা ভাল লাগছে। এতদিন আমাদের দেখতে আস নি কেন?"

"বেরুতেই পারি নি। শিবিরে ছিলাম তো। দৈনিক পনেরো থেকে বিশ মাইল হাঁটতে হয়েছে। কুচকাওয়াজেই দিন কেটেছে—বাইরের কাজ, পংক্তি গঠন, সৈন্যশিবিরের কাজ, সঙ্গে একটা ভারী বোঝা। এত পরিশ্রান্ত লাগত যে রাতে একেবারে মরার মত পড়ে থাকতাম। তাছাড়া যুদ্ধের মহড়ায়ও যোগ দিতে হত; সেটা কিছু মজার ব্যাপার নয়।"

সাদা মাংকা হঠাৎ দুঃখের সঙ্গে চেঁচিয়ে বলে উঠল, "আহা বেচারিরা! হায় দেবদূতেরা, তারা তোমাদের এত কষ্ট দিত কেন? তোমাদের মত একটি ভাই যদি আমার থাকত, বা একটি ছেলে, তাহলে তার জন্য আমার হৃদয় রক্তাক্ত হয়ে যেত। তোমার স্বাস্থ্য পান করছি ছাত্রবাবু।" তাদের গ্লাসে-গ্লাসে ঠোকাঠুকি হল। জেংকা তেমনি একদৃষ্টিতে কোলিয়াকে দেখতে লাগল।

তার দিকে একটা গ্লাস এগিয়ে ধরে কোলিয়া বলল, "তোমার কি হয়েছে জেনেচ্কা?"

সে আলস্যের সঙ্গে জবাব দিল, "আমি ও সব চাই না। আচ্ছা মেয়েরা, পান-টান তো হল, কথাবার্তাও হল, এবার তোমরা এস।"

তারা চলে গেলে সে গ্লাডিশেভকে জিজ্ঞাসা করল, "সারা রাত থাকবে তো? যথেষ্ট টাকা যদি না থাকে তার জন্য ভেব না, আমি বাকিটা দিয়ে দেব। তুমি এত সুন্দর হয়ে উঠেছ যে কোন মেয়েই টাকার কথা ভাববে না।" সে হেসে উঠল।

কোলিয়া হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে তার মুখোমুখি হল। জেংকার গলার স্বরে এমন কিছু ছিল যা তার নিস্পৃহ কানেও লেগেছে আবেগ, বিষণ্ণতা, কোমলতা ও বিদ্রূপের একটা বিচিত্র মিশ্রণ।

"নাগো মনের মানুষ, ইচ্ছা থাকলেও থাকা হবে না। কথা দিয়ে এসেছি, দশটায় বাড়ি ফিরব।"

"তাতে কিছু যায়-আসে না; তারা অপেক্ষা করবে; তুমি এখন বড় হয়েছ। সে যাই হোক, তোমার যেমন ইচ্ছা তাই কর। বাতিটা নিভিয়ে দেব কি, না যেমন আছে থাকবে? তুমি কোন্ দিকে শুতে চাও—দেয়ালের দিকে?"

"একদিক হলেই হল," কাঁপা-কাঁপা গলায় কথাগুলি বলে দুই হাতে তার গরম, শুকনো শরীরটা জড়িয়ে ধরে কোলিয়া তার মুখে চুমো খেতে চেষ্টা করল। সে ওকে একটু ঠেলে দিল।

"থাম, ধৈর্য ধর, চুমো খাবার অনেক সময় পাবে। এইভাবে একটু শুয়ে থাক তো। নড়াচড়া করো না, চুপচাপ শুয়ে থাক।"

তার আবেগমধুর আদেশ যেন ছেলেটিকে সম্মোহিত করল। তার কথামত

সে মাথার নীচে দুই হাত রেখে চিৎ হয়ে শুয়ে রইল। কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে নিজেকে একটু তুলে ধরে হাতের উপর মাথাটা রেখে ঘরের আবছা আলোয় জেনি নীরবে গ্লাডিশেভ-এর দেহটা দেখতে লাগল; ফর্সা, শক্তিমান, পেশীবহুল, উঁচু চওড়া বুক, নরম বুকের হাড়, ছোট দাবনা, ও সুস্পষ্ট শক্তিশালী উরু। ঘাড় ও বুকের ধপধপে ফর্সা রঙের তুলনায় গলা ও মুখের রং বেশ গাঢ় তামাটে।

মুহূর্তের জন্য গ্লাডিশেভ চোখ বুজল। মেয়েটা এত তীক্ষ্ণভাবে তার মুখ ও দেহের উপর চোখ বুলাতে লাগল যে মনে হল সে দৃষ্টি বুঝি তাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে।

তারপরেই চোখ খুলে একটি স্ত্রীলোকের বড় বড় দুটি রহস্যময় কালো চোখকে বড় কাছাকাছি দেখেও তার মনে হল, সে যেন কত অপরিচিত।

নীচু গলায় সে জিজ্ঞাসা করল, "অমন করে কি দেখছ জেনি? কি ভাবছ?"

"মিষ্টি ছোট ছেলেটি, তোমার নাম তো কোলিয়া?"

"হ্যা।"

"আমার উপর রাগ করো না, এই একটি বার আমার কথা শোন—আবার চোখ দুটি বন্ধ কর, না, ভাল করে বন্ধ কর, খুব জোরে বন্ধ কর। আলোটা বাড়িয়ে দিচ্ছি; তোমাকে ভাল করে দেখব। হয়েছে, ঠিক হয়েছে। এখন—এই মুহূর্তে তুমি যে কত সুন্দর তা যদি জানতে। পরে হয় তো তুমি কর্কশ হয়ে উঠবে, পচে যাবে, কিন্তু এখন তোমার গায়ে পশম ও দুধের ঘ্রাণ, বুনো ফুলের ঘ্রাণ। চোখ দুটি বন্ধ কর, দোহাই তোমার।"

বাতিটা উস্কে দিয়ে জেংকা তার জায়গায় চলে গেল; পায়ের উপর পা রেখে তার নিজস্ব ভঙ্গীতে বসল। দু'জনই চুপচাপ। দূরে কয়েকটা ঘর পরে কোথায় যেন ভাঙা পিয়ানোর টুং-টাং আওয়াজ হল; উচ্ছ্বসিত গলায় কে যেন হাসল; বিপরীৎ দিক থেকে ভেসে এল গান ও মজাদার কথার রেশ, তার কোন কথা বোঝা গেল না। দূরে কোথায় যেন একটা দ্রুশ্‌কি ঘড়-ঘড় শব্দ করে চলে গেল।

"আর এখনই অন্য আরও অনেকের মত এর দেহেও আমি বিষ ছড়িয়ে দেব," জেংকা ভাবল; তার দুটি চোখের একাগ্র দৃষ্টি তখনও দেখছে ছেলেটির সুন্দর দু'খানি পা, ভাবী ক্রীড়াবিদের সুন্দর দেহ-সুষমা, মাথার নীচে রাখা দুটি হাতের কনুইয়ের কাছে ঠেলে-ওঠা দড়ির মত শক্ত মাংসপেশী। "ওর জন্য আমার এত কষ্ট হচ্ছে কেন? ও সুন্দর বলেই কি? না, অনেক দিন তো আমার মনে এ রকম ভাব জাগে নি। অথবা, ও এখনও ছেলেমানুষ বলে কি? এই তো গেল বছরই ও যখন রাতে আমার কাছ থেকে চলে যেত তখন ওর পকেটে আপেল আর মিছরি ভরে দিতাম। তাহলে আজ যা বলতে সাহস হচ্ছে সে কথা সেদিন বলি নি কেন? সে তখন আমার কথা বিশ্বাস করত না

বলেই কি? না কি সে আমার উপর রেগে যেত? অন্য মেয়ের কাছে চলে যেত? আগে হোক পরে হোক, সব পুরুষের বেলায়ই তো এটা ঘটে। না কি সে আমাকে টাকা দিয়ে কিনেছে বলেই তাকে চিরকাল ক্ষমা করতে হবে? অথবা অন্য সকলের মতই কোন কিছু না ভেবে অন্ধের মতই সেও কাজ করেছে?"

সে নরম গলায় বলল, "কোলিয়া, চোখ খোল।"

কথা মত চোখ খুলে সে জেনির দিকে পাশ ফিরল; গলা জড়িয়ে ধরে তাকে কাছে টেনে জ্যাকেটের খোলা জায়গায় তার বুকে চুমো খাবার চেষ্টা করল। এবারও সে ধীরে কিন্তু স্থির প্রতিজ্ঞায় তাকে সরিয়ে দিল।

"না, সবুর কর, সবুর কর, আগে আমার কথা শোন। একটু ক্ষণ। বল তো প্রিয়, আমাদের মত মেয়েদের কাছে তুমি কেন আস?"

কোলিয়া শান্ত অথচ কর্কশ গলায় হেসে উঠল।

"তুমি কি বোকা। আরে, অন্য সবাই কেন আসে। আমি এখন মানুষ হয়েছি। আমার মনে হয়, আমি সেই বয়সে পৌঁচেছি যখন···মানে···প্রয়োজন ···একটি মেয়েকে প্রয়োজন হয়। তুমি কি চাও যে আমি সেই সব নোংরা অভ্যাসগুলি করি?"

"প্রয়োজন? শুধুই প্রয়োজন? তুমি কি বলতে চাও, আমার বিছানার নীচে যে কমোডটা আছে সেটার মতই প্রয়োজন?"

"না, তা ঠিক নয়," মৃদু হেসে কোলিয়া জবাব দিল। "প্রথম দিন থেকেই তোমাকে আমার ভাল লেগেছে···বলতে পারি, তোমার সঙ্গে একটুখানি ভালবাসাও হয়েছে; অন্তত আর কারও কাছে আমি কখনও যাই নি!"

"বেশ, ঠিক আছে। কিন্তু সেই প্রথম দিন, সেদিনও কি শুধু প্রয়োজনটাই ছিল?"

সে ইতস্তত করে বলল, "ঠিক তা বলব না। তবে যে ভাবেই হোক অস্পষ্ট ভাবেই একটি মেয়ে মানুষের প্রয়োজন আমি বোধ করেছিলাম। কমরেডরা আমাকে আসতে বলল। তুমি তো জান, তারা অনেকেই আগেও এখানে এসেছে। তাই আমিও চলে এলাম।"

"সেই প্রথম দিন তুমি লজ্জা বোধ কর নি?"

কোলিয়া বিচলিত বোধ করল—প্রশ্নটা বড়ই অপ্রীতিকর, কিছুটা আক্রমণাত্মকও বটে। সে বুঝতে পারল, এটা কোন অলস, অর্থহীন আলোচনা নয়; অল্প দিনের অভিজ্ঞতা হলেও সে ধরনের কথাবার্তায় সে অভ্যস্ত, কিন্তু এ কথাগুলো যেন একটু অন্য ধরনের, গুরুতর কিছু।

"দেখ, ঠিক লজ্জা বোধ করি নি, কেমন যেন একটু বেখাপ্পা লেগেছিল, কিছুটা অস্বস্তি আর কি। সাহস ফিরে পাবার জন্য মদ খেতে হয়েছিল।"

জেনি আবার কনুইতে ভর দিয়ে শুয়ে পড়ল; গভীর মনোযোগের সঙ্গে এক

দৃষ্টিতে তাকে দেখতে লাগল।

"একটা কথা আমাকে বল মিষ্টি," জেনি এত নীচু গলায় কথা বলতে লাগল যে সে কথাগুলি ঠিক ধরতে পারছিল না, "একটি কথা বল : সেই যে টাকাগুলো খরচ করেছিলে, রুবলগুলি ছুঁড়ে দিয়েছিলে ভালবাসার জন্য : আমার চুমো, আমার আদর, আমার শরীরটার জন্য, তখন তোমার কেমন লেগেছিল ? সেজন্য কি তুমি লজ্জাবোধ কর নি ? সত্যি কর নি ?"

"হায় প্রভু ! কি অদ্ভুত সব প্রশ্ন তুমি আজ করছ। কেন, এ জন্য সকলেই তো টাকা দেয়। যদি আমি না দিতাম, অন্য কেউ দিত। তাতে তোমার কি আসে-যায় ?"

"তুমি কি কখনও প্রেমে পড়েছ কোলিয়া ? আমাকে বল। আসল প্রেমের কথা বলছি না, এক ধরনের মোহ আর কি। কোন মেয়েকে কি কখনও ফুল উপহার দিয়েছ ? চাঁদনি রাতে হাতে হাত ধরে বেড়িয়েছ ? বল।"

গভীর স্বরে গম্ভীরভাবে কোলিয়া বলল, "হ্যাঁ, তা করেছি ; যৌবনকালে ও রকম বোকা-বোকা কাজ সকলেই করে। এটা তো খুবই সোজা কথা, তাই না কি ?"

"কিন্তু তাকে কখনও স্পর্শ কর নি ? তাকে রেহাই দিতেও রাজী হতে, হতে না কি ? কিন্তু দেখ, সে যদি তোমাকে বলত : 'আমাকে নাও, শুধু দুটো রুবল দাও'। তাহলে তুমি তাকে কি বলতে ?"

কোলিয়া হঠাৎ রেগে গেল, "তোমার কথাবার্তা কিছু বুঝতে পারছি না জেংকা। আজ তোমার কি হয়েছে ? তুমি এ রকম ভনিতা করছ কেন ? কেন নাটক করছ ? সাজগোজ করে আমাকে যেতে হবে।"

"দাঁড়াও কোলিয়া, দয়া করে একটু অপেক্ষা কর। তোমাকে আরও একটা প্রশ্ন করতে চাই। এই আমার শেষ প্রশ্ন।"

"ঠিক আছে," সে বিরক্ত গলায় বলল।

"তুমি কি কখনও ভেবেছ, কখনও কল্পনা করেছ, মুহূর্তের জন্যও কল্পনা করেছ যে তোমার পরিবার হয় তো হঠাৎ খুব গরীব হয়ে পড়ল, সব কিছু খুইয়ে বসল। ধর, তখন হয় তো তোমাকে পাণ্ডুলিপি নকল করে, বা ছুতোরের কাজ করে, বা ওই রকম আর কিছু করে জীবিকা অর্জন করতে হল। আর তোমার বোন আমাদের মতই বেপথে চলে গেল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার নিজের বোন কোন শয়তানের পাল্লায় পড়ে শেষ পর্যন্ত মানুষের দরজায় ঘুরে বেড়াতে লাগল। তখন তুমি কি বলবে ?"

কোলিয়া রূঢ়ভাবে তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠল, "রাবিশ ! যত সব বাজে কথা ! সেরকমটা কখনও ঘটবে না ! যথেষ্ট হয়েছে, আমি যাচ্ছি।"

"সোজা চলে যাও, দূরে চলে যাও, দোহাই তোমার, চলে যাও। দেখ, ওই খালি মিছরির বাক্সে দশ রুবল আছে, সেগুলি নিয়ে যাও। ওগুলো আমার

আর দরকার নেই। তোমার মায়ের জন্য একটা উপহার, এবং তোমার কোন ছোট বোন থাকলে তার জন্য একটা পুতুল কিনে দিও। তাকে বলো, একটি মৃত কুমারীর এটি স্মৃতি-চিহ্ন। এবার চলে যাও ছেলে।"

এক ঝটকায় শরীরটাকে তুলে নিয়ে রাগে গড়গড় করতে করতে কোলিয়া লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে গেল। বিছানার সামনেকার মোটা কম্বলটার উপর দাঁড়াল; খালি গা, সুঠাম, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল তরুণ দেহ স্বমহিমায় ভাস্বর।

অস্পষ্ট নরম গলায় জেংকা ডাকল, "কোলিয়া—কোলেচ্কা;"

তার ডাক শুনে সে ফিরে দাঁড়াল; যেন রুদ্ধশ্বাস অবস্থায় সে বাতাস থেকে নিঃশ্বাস টানতে চাইছে। জেংকার অশ্রু-ভরা দুটি চোখে কোমলতা, বিষাদ ও নীরব ভর্ৎসনার এমন সুন্দর প্রকাশ সে দেখতে পেল যা জীবনে আর কখনও দেখে নি,—কোন ছবিতেও নয়। বিছানার একপাশে বসে পড়ে সে জেনির খোলা ঘাড়টা জড়িয়ে ধরল।

শান্ত গলায় বলল, "ঝগড়া রাখ জেনেচ্কা।"

জেনি কোলিয়াকে কাছে টেনে নিল। দুই হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরল, তার মাথাটা নিজের বুকের উপর রাখল। এইভাবে তারা কয়েক মিনিট নীরবে দাঁড়িয়ে রইল।

হঠাৎ জেংকা বেসুরো গলায় বলল, "কোলিয়া, রোগ সংক্রামণের ভয় কি কখনও পেয়েছ?"

কোলিয়া কেঁপে উঠল। একটা ঠাণ্ডা ভয় যেন তার বুকের মধ্যে উথলে উঠল, একটা ঠাণ্ডা স্রোত নামতে লাগল শিরদাঁড়া বেয়ে। সঙ্গে সঙ্গেই সে জবাব দিতে পারল না।

শেষ পর্যন্ত বলল, "অবশ্য সেটা ভয়ংকর কথা, সত্যি ভয়ংকর! ঈশ্বর যেন আমাকে করুণা করেন। কিন্তু আমি তো তোমার কাছেই এসেছি, শুধুই তোমার কাছে। সে রকম হলে তো তুমিই আমাকে বলতে; বলতে না?"

"হ্যাঁ, আমি তোমাকে বলতাম," সে চিন্তিতভাবে বলল। যেন নিজের কথার পুরো অর্থটা বোধগম্য হওয়াতে সে সঙ্গে সঙ্গেই আবার বলে উঠল, "তোমাকে অবশ্য বলতাম। আচ্ছা, উপদংশ রোগের কথা তুমি কখনও শুনেছ কি?"

"নিশ্চয় শুনেছি। নাকের মধ্যে গর্ত হয়ে যায়।"

"না কোলিয়া, শুধু নাক নয়। সারা শরীরটাই রুগ্ন হয়ে পড়ে,—হাড়, পেশী, মস্তিষ্ক। কোন কোন ডাক্তার বলে এ রোগ সারানো যায়, কিন্তু সে কথা ঠিক নয়। কখনও সারে না। হয়তো ভবিষ্যতে সে ব্যবস্থা হবে। কিন্তু এখন নেই। এ রোগ যার হয় সে দশ, বিশ, ত্রিশ বছর ধরে ভোগে। যে কোন সময় হঠাৎ তার একটা অঙ্গ পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে যায়। যেমন ধর, ডান মুখ,

ডান হাত, ডান পাটা অকেজো হয়ে যাবে. ফলে মানুষটার অর্ধাংশ শুধু বেঁচে থাকবে! সে আর পুরো মানুষ নয়—সে তখন অর্ধেক মানুষ, অর্ধেক শব। তাদের বেশীর ভাগই পাগল হয়ে যায়। রোগাক্রান্ত প্রত্যেকটি লোক বুঝতে পারে যে সে খেতে, পান করতে চুমো খেতে বা শুধু নিঃশ্বাস নিতেই তার কোন না কোন প্রিয়জনের শরীরে—বোন, স্ত্রী বা ছেলের শরীরে সেই রোগের বিষ ঢুকিয়ে দিতে পারে। উপদংশরোগগ্রস্তদের ছেলেমেয়েরা বিকৃতগঠন, মৃত অবস্থায় জাত, গলগণ্ড-রোগাক্রান্ত অথবা ক্ষয় রোগগ্রস্ত হয়ে থাকে। এ রোগের অর্থই তাই কোলিয়া!" হঠাৎ জেংকা সোজা হয়েদাঁড়িয়ে কোলিয়ার খোলা ঘাড়-দুটি চেপে ধরে তার মুখটাকে এমনভাবে নিজের মুখের দিকে ফেরাল যে তার অত্যাশ্চর্য দুটি কালো চোখের উজ্জ্বল দৃষ্টিতে কোলিয়ার চোখ যেন ধাঁধিয়ে গেল।" "এবার তোমাকে বলছি কোলিয়া, গত এক মাসের বেশী হল আমি এই রোগে ভুগছি। তাই তোমাকে চুমো খেতে দেই নি।"

বিরক্ত, ভীত ও বিচলিত হয়ে গ্লাডিশেভ বলল, "তুমি আমাকে ছেলেমানুষের মত ভোলাচ্ছ। ইচ্ছা করে তুমি আমাকে জ্বালাতন করছ।"

কোলিয়াকে দাঁড় করিয়ে একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে সে বলল :

"তাহলে আমি যা দেখাচ্ছি সেটা ভাল করে মনোযোগ দিয়ে দেখ।"

হাঁ করে মুখটা খুলে এমনভাবে সে দেশলাইয়ের কাঠিটা ধরল যাতে তার মুখের ভিতরে আলোটা পড়ে। সেদিকে তাকিয়ে কোলিয়া চোখ ফেরাল।

"সাদা সাদা দাগগুলো দেখতে পেলে? ওটাই উপদংশ কোলিয়া! বুঝতে পারলে তো! উপদংশের অত্যন্ত গুরুতর, ভয়ংকর রূপ। এবার ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এখান থেকে বিদায় হও।"

জেংকার দিকে একেবারেই না তাকিয়ে কোলিয়া নীরবে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি কোন রকমে পোষাক পরতে লাগল; তার হাত কাঁপছে, দাঁতে দাঁত লেগে খটখট করছে। মাথা নীচু করে জেংকা বলেই চলল :

"শোন কোলিয়া, তোমার কপাল ভাল যে একজন ভাল মেয়ে মানুষের কাছে তুমি এসেছিলে; আর কেউ হলে তোমাকে রেহাই দিত না। আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? আমাদের মত মেয়েরা, যাদের তোমরা ভুলিয়ে ঘর থেকে বের করে এনে তারপরে বাড়ি থেকে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দাও, এবং পরে দুই রুবল হাতে নিয়ে তাদের কাছেই ফিরে আস। সেই আমরা, বুঝতে পারছ, চিরকাল তোমাদের ঘৃণা করি, তোমাদের জন্যে আমাদের মনে এতটুকু করুণা জাগে না!"

অর্ধেক পোষাক-পরা কোলিয়া হঠাৎ পোষাক ফেলে দিয়ে বিছানায় জেংকার পাশে বসে পড়ল; দুই হাতে মুখ ঢেকে ছোট ছেলের মত সত্যি সত্যি কেঁদে ফেলল।

নীচু গলায় থেমে থেমে বলতে লাগল, "হে ভগবান! হে ভগবান! এই

তো প্রকৃত সত্য! কী নীচতা, কী ভয়ংকরতা! আমাদের বাড়িতেও নিউশা নামে একটা দাসী ছিল। সে এতই সুন্দরী ছিল যে আমরা তাকে সিনরিতা অনিতা বলে ডাকতাম। আমার সামরিক কর্মচারী দাদা তার সঙ্গে থাকত; দাদা যখন রেজিমেণ্টে ফিরে গেল তখন দেখা গেল সে গর্ভবতী, আর আমার মা তাকে ছেঁড়া কাঁথার মত বাড়ি থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিল। আমার বাবাও একটা দা-দাসীর সঙ্গে……"

আর জেনি, যে জেনি ঈশ্বরকে মানে না, যে বিদ্রোহী, সামান্য কারণেই যে খিস্তি-খেউড় করে, সেই জেনি এগিয়ে গিয়ে ধীরে ধীরে গম্ভীরভাবে তার মাথার উপর ক্রুশ-চিহ্ন আঁকল।

গভীর মমতায় ও কৃতজ্ঞতায় সে বলল, "ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন!"

তারপর ছুটে দরজার কাছে গিয়ে ডাকল, "বাড়িউলি ভাই।"

জোসিয়া সাড়া দিল।

"বাড়িউলি ভাই, গিয়ে দেখ তো তামারা ও সাদা মাংকার মধ্যে কার হাত ফাঁকা আছে, তাকে এখানে আসতে বল।"

কোলিয়া আস্তে আস্তে কি যেন বলল, কিন্তু সে তাতে কান দিল না।

জোসিয়াকে দেখে জেংকা আবার বলল, "একটু তাড়াতাড়ি ভাই।"

"এখুনি—এখুনি ডেকে দিচ্ছি গো মেয়ে।"

গ্লাডিশেভ দুঃখিত মনে জিজ্ঞাসা করল, "এ সব করছ কেন জেনি? কিসের জন্য? তুমি কি ওদের সব জানাতে চাও?"

"একটু সবুর কর। এটা তোমার কোন ব্যাপার নয়। তোমার খারাপ হতে পারে এমন কিছুই আমি করব না।"

এক মিনিট পরেই সাদা মাংকা ঘরে ঢুকল। সে ইচ্ছা করেই স্কুলের মেয়েদের মত বাদামী রংয়ের আটো-সাটো জামা পরে এসেছে।

"আমাকে ডেকেছ কেন জেনি? তোমাদের কি ঝগড়া হয়েছে?"

"না, ঝগড়া হয় নি মানেচ্‌কা," জেংকা জবাব দিল, "কিন্তু আমার এমন ভীষণ মাথা ধরেছে যে বন্ধুটির ডাকে আমি সাড়া দিতে পারছি না। লক্ষ্মী মেয়ে, আমার বদলে তুমি ওর সঙ্গে থাক।"

ব্যথিত হৃদয়ে গ্লাডিশেভ বলল, "প্রিয় জেনি, যথেষ্ট হয়েছে; আমি সব বুঝতে পেরেছি; এ সবের এখন আর কোন দরকার নেই। আমাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করো না।"

বিস্ময়ে হাত উল্টে সরল মাংকা বলল, "তোমাদের ব্যাপার-স্যাপার কিছু বুঝি না বাপু।"

জেনি শান্তভাবে বলল, "আরে, আমরা একটু তামাসা করছিলাম। ঠিক আছে, তুমি যাও, আমি একটু পরেই আসছি।"

ভালভাবে পোষাক পরে জেনি ও কোলিয়া করিডরের দরজায় নিঃশব্দে

দাঁড়িয়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। গ্লাডিশেভ জানল না, বুঝলও না যে সেই মুহূর্তে এমন একটি সংকটের ভিতর দিয়ে সে চলেছে যা মানুষের সমস্ত জীবনের উপর একটা স্থায়ী ছাপ রেখে যায়।

শেষ পর্যন্ত জেনির হাতটা ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে সে বলল :

"আমাকে ক্ষমা কর। জেনি, তুমি কি আমাকে ক্ষমা করতে পারবে?"

"হ্যাঁগো ছেলে, পারব। পারব প্রিয়তম। পারব, পারব।"

মায়ের মনের মাধুরী মিশিয়ে সে কোলিয়ার ছোট করে চুল-ছাটা মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে আস্তে তাকে করিডরের দিকে ঠেলে দিল।

দরজাটা সম্পূর্ণ খুলে তাকে ডেকে বলল, "এখন তুমি কোথায় যাবে?"

"বাড়ি। বন্ধুকে নিয়ে বাড়ি চলে যাব।"

"বিদায়, প্রিয়।"

ফিরে এসে জেংকার হাত দুটি ধরে কোলিয়া বলল, "ক্ষমা কর, ক্ষমা কর।"

"সোনা আমার, বলেছি তো ক্ষমা করেছি। তুমিও আমাকে ক্ষমা করো। আর কোন দিন আমাদের দেখা হবে না।"

সে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

পেত্রভ তামারাকে নিয়ে কোন্ ঘরে গেছে না জানায় গ্লাডিশেভ করিডরে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করতে লাগল। বাড়িউলি জোসিয়া তাকে বলে দিল। খুব তাড়াতাড়ি থাকায় সেও কথা বলতে বলতে ছুটে চলে গেল; তার চোখে-মুখে উদ্বেগ ও আতঙ্কের আভাষ।

সে বলল, "আমার মোটে সময় নেই। বাঁদিকের তৃতীয় দরজা।"

কোলিয়া সেই দরজায় গিয়ে টোকা দিল। সে শুনতে পেল, ভিতরে কেউ চলাফেরা করছে। ফিসফিস করে কথা বলছে। সে আবার টোকা দিল।

"কেরকোভিয়ুস, দরজা খোল, আমি—সলিত্তেরভ।"

শিক্ষার্থীদের মধ্যে এটাই প্রচলিত নিয়ম যে, পতিতালয়ে গেলে তারা পরস্পরকে ছদ্মনামে ডাকে।

তামারা চেঁচিয়ে বলল, "তুমি আসতে পারবে না, আমরা ব্যস্ত আছি।"

পেত্রভ তৎক্ষণাৎ গম্ভীর গলায় সে কথাব প্রতিবাদ করল।

"বাজে কথা। মিথ্যে কথা। ভিতরে এস, ঠিক আছে।"

কোলিয়া দরজা খুলল।

পেত্রভ চেয়ারে বসে আছে। পুরো পোষাক পরা। কিন্তু সে যেন চিংড়ি মাছের মত লাল হয়ে আছে; চোখ দুটি নামানো, ঠোঁট ছেলেমানুষের মত ওল্টানো।

রাগে ধিক্কার দিতে দিতে তামারা বলতে লাগল, "আচ্ছা বন্ধু জুটিয়েছিলে আমাকে; হাঁা, তোমাকে বলছি। ভেবেছিলাম সে একটি সত্যিকারের পুরুষ,

এখন দেখছি সে একটি ছোট মেয়ে ছাড়া কিছু না। কি রকম মনে কর—ওর ভয় পাচ্ছে ওর কৌমার্য নষ্ট হয়। কী রত্ন-ভাণ্ডাররে! এই নাও তোমার দুই রুবল," হঠাৎ পেত্রভের দিকে ফিরে চিৎকার করে টাকাটা টেবিলের উপর ছুঁড়ে দিল। কোন দাসীকে ওটা দিয়ে দিও। আর না হয় তো, ওহে কাঠবেড়ালি, এই টাকায় একজোড়া দস্তানা কিনো।"

চোখ না তুলেই পেত্রভ বলল, "চেঁচাচ্ছ কেন? আমি তো চেঁচাই নি, তাহলে তুমি চেঁচাবে কেন? ইচ্ছা মত কাজ করবার অধিকার আমার অবশ্যই আছে। তোমার সঙ্গে কিছুটা সময় কাটিয়েছি, তাই ও টাকাটা তোমার। কিন্তু আমি চাই নি যে কেউ জোর করে··· । আর তুমিও কাজটা ভাল কর নি গ্লাডিশেভ, মানে সলিতেরভ। আমি ভেবেছিলাম সে খুব ভাল মেয়ে; কিন্তু আমাকে চুমোর পর চুমো খাচ্ছে, আর কী যে করছে তা ভগবান জানে।"

রাগ ভুলে তামারা এবার হো-হো করে হেসে উঠল।

"কী বোকা ছেলেরে বাবা! ঠিক আছে, রাগ করো না, এই নিচ্ছি তোমার টাকা। শুধু মনে রেখ, আজ রাতে তুমি দুঃখ পাবে, খুব দুঃখ পাবে। আরে বাবা, রাগ করো না সোনা। এস মিটিয়ে ফেলি। হাত দাও!"

কোলিয়া বলল, "চলে এস কেরকোভিয়ুস। শুভ রাত, তামারা।"

অন্য সবাই যে রকম করে থাকে তামারাও টাকাটা মোজার মধ্যে গুঁজে নিয়ে তাদের বিদায় দিতে তাদের সঙ্গে সঙ্গে চলল।

করিডর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বসবার ঘরের একটা অদ্ভুত চাপা গোলমাল কোলিয়ার কানে এল; অনেক পায়ের শব্দ, আর চাপা গলার কথাবার্তা।

এখানে ঢুকেই যে জায়গায় তারা দু'জন বসেছিল সেখানে তখন আন্না মার্কভনার এই বাড়ির সব লোকজন ও কিছু উটকো লোক এসে জমেছে। সকলেই মাথা নীচু করে ভীড় করে দাঁড়িয়েছে। কৌতূহলী হয়ে কোলিয়া সেদিকে এগিয়ে সকলের ভিতর দিয়ে ·মাথাটা গলিয়ে নীচের দিকে তাকাল: অসম্ভব রকমের তালগোল পাকিয়ে রলি-পলি মেঝেতে পড়ে আছে। তার মুখটা নীল হয়ে গেছে; প্রায় কালোই বলা যায়। সে একটুও নড়ছে না। পা দুটো ভেঙে রাখায় তাকে অদ্ভুত ছোট দেখাচ্ছে। একটা হাত বুকের উপরে চেপে রেখেছে, অন্য হাতটা পিছনের দিকে ছড়ানো।

গ্লাডিশেভ জিজ্ঞাসা করল, "ওর কি হয়েছে?"

ফিস্‌ফিস্ করে থেমে থেমে নিউরা বলল, "এইমাত্র এখানে ঢুকল। মাংকাকে মিছরিটা দিয়ে আমাদের আর্মানি ধাঁধা বলতে শুরু করল। 'নীল রঙের কোন্ জিনিস বৈঠকখানায় ঝুলতে ঝুলতে শিস্ দেয়?' আমরা বলতে না পারায় সেই বলে দিল, 'হেরিং মাছ।' তারপরই হঠাৎ হাসতে হাসতে, কাশতে কাশতে, কাঁপতে কাঁপতে সে মেঝেয় পড়ে নিশ্চল হয়ে গেল। পুলিশ ডাকা হয়েছে। হে ভগবান! কী ভীষণ! মরা দেখলে আমার বড় ভয় করে।"

তাকে বাধা দিয়ে কোলিয়া বলল, "দাঁড়াও ; ভাল করে দেখি ; এখনও বেঁচে থাকতে পারে।"

সে এগিয়ে যেতেই সাইমিয়ন-এর লোহার সাঁড়াশির মত আঙুলগুলো তার কনুইটা চেপে ধরে তাকে পিছনে টেনে নিল।

কর্কশ গলায় সাইমিয়ন বলল, "দেখার কিছু নেই। এখান থেকে চলে যাও বাবু। কেউ যেন এখানে তোমাদের দেখতে না পায়। পুলিশ আসবে, তোমাদের সাক্ষী মানবে, বাস, তাহলেই সামরিক স্কুল থেকে তোমাদের ছাঁটাই করে দেবে। চলে যাও, কারণ তাতেই তোমাদের মঙ্গল।"

ছেলেদের সঙ্গে করে সে বারান্দায় গেল, তাদের ওভারকোটগুলো হাতে দিয়ে দিল, তারপর আরও কর্কশ গলায় বলল, "যাও, এবার ছুটে চলে যাও। পালাও! আর যদি কখনও এখানে আস, ঢুকতেও পাবে না। বুঝলে? খুব চালাক ছেলে। বুড়োটাকে মদ গিলতে টাকা দিয়েছ আর সেও ব্যাঙের ডাক ডেকেছে!"

গ্লাডিশেভ ফোঁড়ন কাটল, "এখন অত ভালমানুষ সেজ না!"

"কি বললে? ভালমানুষ সাজছি?" সাইমিয়ন রাগে এমনভাবে চেঁচিয়ে উঠল, তার লোমহীন, ভুরুহীন কালো চোখে এমন ভয়ংকর দৃষ্টি ফুটে উঠল, যে ছেলে দুটি কুঁকড়ে সরে গেল। "গুঁতিয়ে এমনভাবে মুখ ভেঙে দেব যে আর কোন দিন কথা বলতে পারবে না! এখনি ছুটে পালাও, নইলে চামড়া তুলে নেব।"

ছেলে দুটি যখন দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে নামছে তখন দুটো লোক উঠে এল ; একজনের পরনে লাল শার্ট, অন্য জনের নীল। বোঝা গেল, তারাও দরোয়ান।

ফূর্তি-ভরা গলায় সাইমিয়নকে ডেকে লাল-কুর্তা বলল, "তাহলে রলি-পলি পটল তুলল?"

"হ্যাঁ, সে গেল। চল হে, তাকে রাস্তায় ফেলে দিয়ে আসি, নইলে ভূত হয়ে আমাদের তাড়া করবে। যত সব! লোকে ভাববে, মাতাল হয়ে রাস্তায় পড়ে মরেছে।"

লোকটি আবার বলল, 'হয়েছিল কি? তুমি দু'ঘা লাগাও নি তো?"

"আমি? পাগল হয়েছ? তার কোন দরকারই হয় নি। লোকটা তো ছিল ভেড়ার মত নিরীহ। কারও কোন ক্ষতি করত না। সময় হয়েছিল, তাই আর কি।"

"আহা, মরবার আর জায়গা পেল না! এর চাইতে খারাপ জায়গা কি আর আছে!" লাল-কুর্তা বলল।

অপরজন সায় দিল, "ঠিক বলেছ। ঠিক আছে, তাহলে চল।"

তিনজন বসবার ঘরে গিয়ে ঢুকল।

শিক্ষার্থী দুটি প্রাণপণে দৌড়তে লাগল। এখন অন্ধকারে রলি-পলির

দলা-পাকানো নিশ্চল দেহটা যেন আরও ভয়ংকর মনে হতে লাগল। বিশেষ করে অন্ধকারে মরা মানুষের কথা মনে হলে ছেলেদের কাছে সেটা সব সময়ই ভয়ংকর বলে মনে হয়।

৫

সকাল থেকে ঝির্ ঝির্ করে বৃষ্টি হচ্ছে ; ধূলোর মত বৃষ্টি ; অনবরত, একঘেয়ে। প্লাতনভ বন্দরে তরমুজ খালাসের কাজ করছিল। কারখানার যে কাজটার জন্য গ্রীষ্মকাল থেকে অপেক্ষা করেছিল সেটা তার কপালে টেকে নি ; সেখানে কাজে যাওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যেই ফোরম্যান-এর সঙ্গে তার ঝগড়া, এমন কি লড়াই পর্যন্ত হয়ে গেছে। ফোরম্যানটি মজুরদের সঙ্গে খুবই খারাপ ব্যবহার করে।

গত এক মাস যাবৎ সেবুগে আইভানিচ শহরের বাইরে কোন জায়গায় কোনক্রমে খেয়ে-পরে বেঁচে আছে। এর মধ্যে কখনও-সখনও কোন রাস্তার দুর্ঘটনার সংবাদ, অথবা আদালতের কোন হাসির ঘটনার খবর "একো"-র সম্পাদককে সরবরাহ করেছে। কিন্তু এই সংবাদপত্রের কাজ তার আর ভাল লাগছে না। সে ভালবাসে সাহসের কাজ, খোলা আকাশের নীচে দৈহিক শ্রমের কাজ, যে জীবনে তিলমাত্র আয়েস নেই, ভবঘুরের নিশ্চিন্ত জীবন, যেখানে কোন বিধি-নিষেধ মানতে হয় না, যেখানে কাল কি কপালে আছে সে খোঁজ কেউ রাখে না। সেই জন্য নীপার নদীর নিম্নাঞ্চল থেকে তরমুজ-বোঝাই বড় বড় নৌকো যখন ভিড়তে শুরু করল তখন সে স্বেচ্ছায় গত বছরের পরিচিত একটি মজুর-সংঘে যোগ দিল ; তার হাসি-খুশি মেজাজ, বন্ধুত্বের মনোভাব ও হিসাব-নিকাশের ব্যাপারে দক্ষতার জন্য তারাও তাকে সাদরে ডেকে নিল।

কাজটা বেশ ভালভাবেই চলছিল। প্রতিটি নৌকাতে পাঁচজনের একটা দল কাজ করছিল। প্রথম লোকটি নৌকা থেকে তরমুজ তুলে নৌকার পাশে দাঁড়ানো দ্বিতীয় লোকটির হাতে দিচ্ছিল ; সে আবার সেগুলো দিচ্ছিল জেটিতে দাঁড়ানো তৃতীয় লোকটিকে ; সে ছুঁড়ে দিচ্ছিল চতুর্থ লোককে এবং সে দিচ্ছিল গাড়িতে দাঁড়ানো পঞ্চম লোকটিকে। কাজটা বেশ মজার, আর বেশ দ্রুতগতিতেই এগিয়ে চলছিল। একদল ভাল মজুর যখন কাজটা করতে থাকে তখন কামানের গোলার মত দ্রুতগতিতে তরমুজগুলোকে হাতে হাতে লুফে নিয়ে গাড়ি বোঝাই করার দৃশ্যটি দেখতে ভারি ভাল লাগে।

আজকের এই বৃষ্টির দিনে কাজটা ছিল বিশেষভাবে লাভজনক। মজুর-সংঘের চল্লিশ জন লোক ঠিক করে নিয়েছিল যে এ কাজটা তারা গাড়ি হিসাবে করবে, দৈনিক হিসাবে নয়। মালিক যুবকটির এ সব কাজের বিশেষ কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। তাই জাভরৎনি নামক বিশাল-দেহ ইউক্রেনীয় ফোরম্যানটি বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাকে এই ব্যবস্থায় রাজী করিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে

সব কিছু বুঝতে পেরে সে ঐ চুক্তি প্রত্যাহার করে নিতে চাইল। তখন অন্য সব নৌকোর অভিজ্ঞ মালিকরা তাকে বোঝাল যে যা চলছে তাই চলুক, কারণ অন্য কিছু করতে গেলে তার জীবন-সংশয় হতে পারে। ফলে মজুর-সংঘের প্রত্যেক সদস্যই আশা করছিল যে দৈনিক চার রুবল পর্যন্ত উপার্জন করতে পারবে। কাজেই সকলেই খুব উৎসাহের সঙ্গে কাজ করতে লাগল।

কিন্তু জাভরৎনি তাতেও সন্তুষ্ট নয়। সে অনবরত সকলকে তাড়া দিতে লাগল। সে চাইছিল, একজন মজুরের দৈনিক উপার্জন পাঁচ রুবল-এ উঠুক। ফলে কাঁচা ও পাকা তরমুজগুলো মনের সুখে শূন্যে ভাসতে ভাসতে নৌকো থেকে গাড়িতে গিয়ে পড়তে লাগল।

এমন সময় বন্দরের একটি যন্ত্র থেকে একটা দীর্ঘ আওয়াজ উঠল; তারপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হল নদীর বুকে; তারপর তীরে আরও কয়েকবার আওয়াজ হল এবং বেশ কিছুক্ষণ ধরে সে আওয়াজ সমবেত সঙ্গীতের মত বাতাসে গর্জন করতে লাগল।

"কা—জ ব—ন্ধ ক—র!" একটা যান্ত্রিক শব্দের মতই জাভরৎনির কর্কশ কণ্ঠ যেন আর্তনাদ করে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে কাজ বন্ধ হয়ে গেল। খুশিতে প্লাতনভ পিঠটা টান-টান করে একটু পিছনে বাঁকাল; তারপর ধরে-যাওয়া হাত দুটো ছড়িয়ে দিল। মাংসপেশীর ব্যথার হাত থেকে শেষ পর্যন্ত রেহাই পাওয়ায় মনে মনে সে খুশি হল। যে কোন দৈহিক পরিশ্রমের প্রথম দিনগুলিতে এ ধরনের ব্যথা হয়েই থাকে। আজ পর্যন্ত প্রতিটি দিনই শহরের বাইরের আস্তানায় কারখানার বাঁশির শব্দে ঘুম ভাঙতেই তার মনে হয়েছে যে তার সারা শরীরে এমন সাংঘাতিক ব্যথা হয়েছে যে কোন অলৌকিক শক্তির সাহায্য ছাড়া তার পক্ষে বিছানা থেকে ওঠা বা এক পাও হাঁটা সম্ভব নয়।

জাভরৎনি আবার হাঁক ছাড়ল, "খেতে যা—ও!"

লোকগুলো নদীর ধারে গিয়ে কাঠের পাটাতনের উপর হাঁটু গেড়ে বা উপুড় হয়ে শুয়ে দুই হাতে জল তুলে গরম হাতে ও মুখে ছিটিয়ে দিতে লাগল। নদীর তীরেই একটু দূরে কিছু ঘাসে-ঢাকা জায়গা ছিল। তারা খাবার নিয়ে সেখানেই জড়ো হল। প্রায় দশটা তরমুজ, কিছু কালো রুটি ও কিছু শুঁটকি মাছ তারা গোল করে সাজিয়ে রাখল। একজন ছুটে গেল কাছাকাছি দোকান থেকে ভদ্‌কা কিনতে; হাতে একটা আধা-গ্যালনের খালি জগ নিয়ে সে সৈনিকদের খাওয়ার গান গাইতে গাইতে চলল:

"হাতা নাও, থালা নাও, গেলাস নাও;
রুটি যদি না পাও তো তা ছাড়াই খাও।"

খালি-পা নোংরা একটা ছেলে ছুটতে ছুটতে সেখানে হাজির হল। তার পরনে এতই ছেঁড়া পোষাক যে তাতে তার শরীর যত না ঢেকেছে খোলা রয়েছে

তার চাইতে বেশী।

সকলের দিকে তাকাতে তাকাতে সে বলল, "তোমাদের মধ্যে প্লাতনভ কে?"

সেরগে আইভানিচ এগিয়ে এসে বলল, "আমি প্লাতনভ; তোমার নাম কি?"

"হুই ওখানে, গীর্জাটার পিছনে একটি মেয়ে তোমার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। তোমার জন্য একটা চিঠিও দিয়েছে।"

লোকগুলো হো-হো করে হেসে উঠল।

"হাসি বন্ধ কর, বোকার দল," প্লাতনভ শান্তভাবেই বলল। "কই, দেখি চিঠিটা।"

জেংকার চিঠি। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে, এঁকে বেঁকে, ছেলেমানুষী হাতে লেখা; কয়েকটা বানান ভুলও আছে।

"সেরগে আইভানিচ, তোমাকে কষ্ট দিচ্ছি বলে ক্ষমা করো। খুব দরকারী না হলে তোমাকে বিরক্ত করতাম না। দশ মিনিটের বেশী লাগবে না। তোমার পরিচিত আন্না মার্কভ্‌না-র জেংকা।"

প্লাতনভ জাভরৎনিকে বলল, "আমাকে একটু যেতে হচ্ছে; কাজ আরম্ভ হবার সময় ঠিক হাজির হয়ে যাব।"

ফোরম্যান ঘৃণার স্বরে আলস্যভরে বলল, "সেই কাজ তো; ও কাজের জন্য তো রাতটাই পড়ে আছে। ঠিক আছে, যাও, কেউ তো তোমাকে ধরে রাখছে না। শুধু মনে রেখ, কাজ শুরু হবার মধ্যে যদি হাজির না হও, তাহলে আজকের মজুরি কাটা যাবে। তোমার জায়গায় একটা পথের লোককে নিয়ে নেব। আর সে যদি ভুল করে, তোমাকেই তার খেসারত দিতে হবে। দেখ প্লাতনভ, তুমিও যে এই রকম ফুর্তিবাজ মানুষ তা জানতাম না।"

কয়েকটা শুকিয়ে-আসা পপলার গাছওয়ালা একটা ছোট পার্কে জেংকা অপেক্ষা করছিল। একটা গীর্জা ও জাহাজ-ঘাটার মাঝখানে পার্কটা অবস্থিত। তার পরনে রাস্তায় বেরুবার একটা চকচকে পোষাক; মাথায় কালো ফিতে-আটা সাদাসিদে একটা খড়ের টুপি। দূর থেকে তাকে দেখেই প্লাতনভ ভাবল, "খুবই সাধারণ পোষাক পরলেও তার পাশ দিয়ে যে হেঁটে যাবে সেই পিছন ফিরে দু'তিনবার তাকে দেখবে, কারণ তার চাল-চলনের একটা বিশেষ ভঙ্গী আছে।"

তার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে প্লাতনভ সাদরে বলল, "কেমন আছ জেনি? তোমাকে দেখে খুব ভাল লাগল। আমি তো আশাই করতে পারি নি।"

জেনি চুপ করে রইল। দেখেই বোঝা যায়, সে একটা অস্বস্তি ভোগ করছে। প্লাতনভ সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা বুঝতে পারল।

বলল, "কিছু মনে করো না জেনেচ্‌কা, আমার খাবার সময় হয়ে গেছে। কাজেই তোমার যদি আপত্তি না থাকে তো চল একটা সরাইখানায় ঢুকে পড়ি।

এ সময় ওটা ফাঁকাই থাকে ; তাছাড়া, একটা পিছনের ঘরও আছে, সেখানে বেশ আরাম করে বসা যাবে। তুমিও হয়তো কিছু খেয়ে নিতে পারবে।"

কর্কশ গলায় সে জবাব দিল, "ধন্যবাদ, আমি খেতে চাই না। তোমাকে বেশীক্ষণ আটকাব না, কয়েক মিনিট মাত্র। তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে। আমার পরামর্শ দরকার অথচ তা দেবার মত কেউ নেই।"

"বেশ তো, চল। যতটুকু করা সম্ভব আমি সানন্দেই করব। তোমাকে আমার খুব ভাল লাগে জেনি।"

বিষণ্ণ অথচ সকৃতজ্ঞ চোখে জেনি তার দিকে তাকাল।

"আমি জানি সেরগে আইভানিচ, তাই তো তোমার কাছে এসেছি।"

"তোমার কি টাকার দরকার আছে? আমাকে খোলাখুলি বল। এখন সঙ্গে বেশী কিছু নেই, তবে চাইলে ফোরম্যান আগাম দেবে।"

"ধন্যবাদ ; না, তা নয়। সরাইখানায় গিয়ে তোমাকে সবই বলব।"

নীচু সিলিংয়ের আবছা অন্ধকার সরাইখানাটা সাধারণত ছিঁচকে চোরদের আড্ডাখানা। এখন ফাঁকা, কারণ তাদের কাজ-কারবার চলে রাতের বেলা। প্লাতনভ জেনিকে নিয়ে আধো-অন্ধকার পিছনের ছোট ঘরটায় ঢুকল।

চাকর এলে তাকে বলল, "কিছু সিদ্ধ গো-মাংস, শশা, একটা বড় গ্লাস ভদ্‌কা আর কিছু রুটি দাও।"

চাকর ছোকরাটার নাকটা চ্যাপ্টা, মুখটা নোংরা ; এমন চক্‌চক করছে যে দেখলে মনে হয় এইমাত্র আস্তাকুড় থেকে টেনে বের করা হয়েছে। ঠোঁট মুছে সে কর্কশ গলায় জিজ্ঞাসা করল :

"কত দামের রুটি দেব?"

প্লাতনভ হেসে বলল, "যা হয় দাও। বেশ খানিকটা এনো, দাম পরে হিসাব করা যাবে। আর এক গ্লাস কৃবাসও এনো।"

"তারপর জেনি, এবার বল তোমার কি গোলমাল। তোমার মুখ দেখেই বুঝতে পেরেছি কিছু গোলমাল হয়েছে, বা অপ্রীতিকর কিছু। বলে ফেল।"

জেনি রুমালটা জড়াতে লাগল। পায়ের আঙুলের দিকে তাকিয়ে যেন কথা বলবার মত সাহস সঞ্চয় করতে চেষ্টা করল। কিন্তু ভীরুতা তাকে চেপে ধরল। তার মুখে কথা জোগাল না। প্লাতনভ তার সাহায্যে এগিয়ে গেল।

"বিচলিত হয়ো না জেনেচ্‌কা। আমাকে সব কথা বল। তুমি তো জান, আমি তোমার পরিবারের একজনের মত। আমি তোমাকে কখনও ত্যাগ করব না। এবং হয় তো কিছু ভাল পরামর্শও তোমাকে দিতে পারব। নাও, শুরু করে দাও, বল।"

জেংকা ইতস্তত গলায় বলল, "ঠিক তাই। কি ভাবে শুরু করব জানি না। দেখ সেরগে আইভানিচ,···আমি রুগ্ন। বুঝতে পেরেছ? আমার খারাপ রোগ হয়েছে, অতি খারাপ রোগ, তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছ?"

মাথা নেড়ে প্লাতনভ বলল, "বলে যাও।"

"বেশ কিছুদিন হল রোগে ধরেছে। এক মাসের বেশী, বোধ হয় ছয় সপ্তাহ, হ্যাঁ, এক মাসের বেশীই হবে, কারণ ত্রিমূর্তি রবিবারে প্রথম আমি বুঝতে পারি।"

প্লাতনভ দ্রুত হাতে কপালটা মুছল।

"দাঁড়াও, মনে পড়ছে। ছাত্রদের নিয়ে যেদিন সেখানে গিয়েছিলাম, সেই দিন তো? কি বল?"

ঠিক বলেছ সেরগে আইভানিচ, সেই দিন।"

প্লাতনভ মাথা নাড়তে নাড়তে যুগপৎ ঘৃণা ও করুণার দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল। "আং জেংকা, তুমি কি জান তার পরেই দুটি ছাত্র অসুস্থ হয়ে পড়ে? তোমার কাছ থেকেই কি?"

ক্রোধ ও ঘৃণায় জেংকার চোখ জ্বলে উঠল।

"হয়তো আমার কাছ থেকেই। কি করে জানব? অনেকেই তো এসেছিল। মনে পড়ছে, একজন তোমার সঙ্গে ঝগড়া বাধাবার চেষ্টা করছিল। লম্বা, সুশ্রী, চোখে পিঁস-নে।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। সেই তো সোবাশ্‌নিকভ্‌। শুনেছি তারও ওই রোগ হয়েছিল। দেখ, তার জন্য আমি দুঃখিত নই। সে একজন উদ্ধত 'ফতো বাবু'। কিন্তু অন্য ছাত্রটির জন্য আমার খুব কষ্ট হয়। তার নামটাও সঠিক জানতে পারি নি। বন্ধুরা তাকে রাম্‌সেস্‌ বলে ডাকত। বেশ কয়েকজন ডাক্তারকে সে দেখিয়েছিল। তারা যখন বলল যে তার উপদংশ রোগ সম্পর্কে কোন সন্দেহই নেই তখন সে দেশে চলে গেল এবং সেখানেই গুলি করে আত্মহত্যা করল। মৃত্যুকালীন চিঠিতে সে অদ্ভুত সব কথা লিখে গেছে। তাতে এই রকম লেখা ছিল: 'আমি সব সময় বিশ্বাস করেছি যে, হৃদয়, সৌন্দর্য ও কল্যাণের জয়ই জীবনের মূল কথা। এই রোগে আক্রান্ত হবার পরে আমি আর মানুষ নই—আমি একখণ্ড পচা মাংস, একটা গলিত শব, ক্রমিক পক্ষাঘাতের শিকার। আমার মানবিক মর্যাদাকে এর সঙ্গে খাপ খাওয়ানো যায় না। যা কিছু ঘটেছে তার জন্য একমাত্র আমিই দায়ী; আমার মৃত্যুর জন্যও; কারণ একটি সাময়িক পাশবিক প্রবৃত্তির টানে আমি ভালবাসা ছাড়াই শুধু টাকার বিনিময়ে একটি মেয়েকে গ্রহণ করেছি। সুতরাং নিজের প্রতি যে শাস্তির বিধান আমি করছি তাই আমার প্রাপ্য।"

একটু চুপ করে থেকে প্লাতনভ আবার বলল, "তার জন্য আমার বড় দুঃখ হয়।"

জেংকার নাসারন্ধ্র ফুলতে লাগল।

"আর আমি মোটেই দুঃখিত নই, তিলমাত্র না।"

"তুমি ভুল করছ।" তারপর চাকরটির দিকে ফিরে সে বলল, "তুমি এখন

যাও ; দরকার হলে আমি ডাকব। তুমি ভুল করছ জেনেচ্‌কা। সে ছিল একটি অসাধারণ বিশিষ্ট মানুষ। হাজারে ও রকম একটি মেলে। আত্মহত্যার প্রতি আমার শ্রদ্ধা নেই। ছোট শিশুরা যেমন একটুকরো মিছরি না পেলেই রাগে দেয়ালে মাথা ঠুকতে থাকে, তেমনি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঐ সব ছেলে-মেয়েরা তুচ্ছ বিষয় নিয়ে নিজেদের উপর গুলি চালায় এবং গলায় ফাঁসি দেয়। কিন্তু তার এই সাহসিকতাপূর্ণ কাজের সামনে আমি একান্ত দুঃখে ও শ্রদ্ধায় মাথা নত করি। সে ছিল খুবই বুদ্ধিমান। সে ছিল উদার, দয়ালু, সকলের প্রতি মমতাশীল, কিন্তু দেখতেই পাচ্ছ নিজের প্রতি সে ছিল অত্যন্ত কঠোর।"

জেনি তবু একগুঁয়ে ভাবেই পাল্টা জবাব দিল, "আমার কাছে তাতে কোন তফাৎ নেই ; বোকা হোক আর বুদ্ধিমান হোক, যুবক হোক বা বৃদ্ধ হোক, সৎ হোক বা দুষ্ট হোক, এখন আমি তাদের সব্বাইকে ঘৃণা করি। কেন ? আমার দিকে তাকাও, ভাল করে তাকাও, আমি কি হয়েছি ? একটা প্রকাশ্য পিকদানি, একটা আস্তাকুড়, একটা শৌচাগার ছাড়া কিছু নয় ! ভাব, ভেবে দেখ প্লাতনভ। শত শত মানুষ আমাকে ভোগ করেছে, আমাকে জড়িয়ে ধরেছে, আমাকে নিয়ে নাক ডাকিয়েছে, ঘোঁত্‌-ঘোঁত্‌ করেছে, সাঁই-সাঁই শব্দ করেছে। যারা আমার বিছানায় শুয়েছে এবং এখনও শোবে তাদের সকলের কথা ভাব। উঃ তাদের আমি কত ঘৃণা করি ! আমার যদি ক্ষমতা থাকত তাদের সব্বাইকে এই শাস্তি দিতাম যেন তাদের আগুনে পোড়ানো হয় আর লোহারশিকলে বেঁধে রাখা হয়। আমি আদেশ দিতাম···।"

প্লাতনভ নীচু গলায় বলল, "জেনি, তুমি নির্মম, নিষ্ঠুর, দাম্ভিক।"

"আমি তো নিষ্ঠুর ছিলাম না, দাম্ভিক ছিলাম না ; আজ হয়েছি। আমার যখন দশ বছর বয়সও হয় নি, তখন আমার মা আমাকে বেঁচে দিয়েছিল। সেই থেকে আমি মানুষের হাতে হাতে ফিরেছি। একটি মানুষও যদি আমার সঙ্গে মানুষের মত ব্যবহার করত ! কিন্তু না ! তাদের কাছে আমি ছিলাম একটা ক্রিমি-কীট, একটা আবর্জনা ; একটা ভিখারীরও অধম, চোরেরও বাড়া, খুনীর চেয়েও খারাপ। তুমি কি জান, একটা ফাঁসির জল্লাদও—হ্যাঁ, সে রকম লোকও আমাদের কাছে আসে—আমাকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে। আমি তো একটা শূন্য ! একটা সাধারণ মেয়ে। তুমি তো জান, ওই 'সাধারণ' কথাটা কী ভয়ংকর। ওটার অর্থ, আমি সকলের, অথচ কারও নই : মায়ের না, বাবার না, রাশিয়ারও না। আমি শুধু সর্বসাধারণের। কেউ আমার দিকে তাকিয়ে একবারও ভাবে নি : সে কি, সেও তো একটা মানুষ। তারও তো মন আছে, হৃদয় আছে। সে তো কাঠ, বা খড়, বা ধুলো বা ছোবড়ার তৈরি নয় ; তারও চিন্তা আছে, অনুভূতি আছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত একমাত্র আমিই এ সত্য উপলব্ধি করেছি। আর হয় তো আমাদের অবস্থার এই ভয়াবহতার কথাও একমাত্র আমিই বুঝি। যে গর্তের মধ্যে আমাদের ঠেলে ফেলে দেওয়া

হয়েছে সেটা যে কতখানি অন্ধকার, পচা, আর নোংরা সেটা কে বোঝে? যে সব মেয়েকে আমি দেখেছি, যাদের সঙ্গে একত্র বাস করেছি, তারা এ সব বোঝে না! প্লাতনভ, দয়া করে আমাকে বুঝতে চেষ্টা কর। তারা সব কথা-বলা, হেঁটে-বেড়ানো মাংসের টুকরো মাত্র! আমার এত রাগের চাইতেও যে সেটা খারাপ।"

প্লাতনভ শান্তভাবে জবাব দিল, "তুমি ঠিকই বলেছ। এটা এমনই একটা সমস্যা যার সমাধান খুঁজতে বৃথাই তুমি পাথরের দেয়ালে মাথা কুটে মরবে। কেউ তোমাকে সাহায্য করতে পারবে না।"

জেনি আবেগে চিৎকার করে বলল, কেউ না, কেউ না! "সেই ছাত্রবাবুটি যখন আমাদের লিউব্‌কাকে নিয়ে গেল, তখন কি তুমি সেখানে ছিলে? সে কথা কি তোমার মনে আছে?"

"হ্যাঁ, খুব ভালই মনে আছে। তারপর কি হয়েছিল?"

"কি হয়েছিল? যা হয়ে থাকে। গতকাল সে ফিরে এসেছে; নোংরা চেহারা আর চোখের জল নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এসেছে। সেই বদমাশটা তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। দয়া দেখাতে এসেছিল। বলেছিল, 'তুমি আমার বোনের মত থাকবে। আমি তোমাকে উদ্ধার করব। তোমাকে মানুষ করে তুলব'; আর তারপরেই বলল, 'নিকাল হিয়াসে।"

"তাও কি সম্ভব?"

"এটাই ঘটনা। কোন গোপন অভিসন্ধি নেই এমন একটিমাত্র দয়ালু ও সমঝদার লোক আমি দেখেছি—সে তুমি সেরগে আইভানিচ। কিন্তু তুমিও একটু আলাদা ধরনের মানুষ। তুমি একটু অদ্ভুত। কি যেন তুমি খুঁজে বেড়াচ্ছ। তুমি আমাকে ক্ষমা কর সেরগে আভানিচ, কিন্তু তোমাকেই যেন আমি কিছুটা বুঝতে পারি। তাই তোমার কাছে এসেছি।"

"বল জেনেচ্‌কা।"

"দেখ, প্রথম যখন রোগের কথা জানতে পারলাম, রাগে আমি যেন পাগলা হয়ে গেলাম। রাগে দম বন্ধ হয়ে এল। মনে হল, এবার সব শেষ!" আর তো দুশ্চিন্তারও কিছু নেই, আশা করবারও কিছু নেই! শেষ যবনিকা পড়ে গেছে। কিন্তু যত কষ্ট আমি পেয়েছি, তার কোন ক্ষতিপূরণ কি হবে না? এও কি সম্ভব যে জগতে ন্যায়-বিচার বলে কিছু নেই? অন্তত প্রতিশোধ নিয়েও কি আমি নিজেকে সন্তুষ্ট করতে পারি না? পরিবার কি, ভালবাসা কি, তাতো কোন দিন জানি নি! আমার সঙ্গে সকলেই পোষা কুকুরের মত ব্যবহার করেছে, আগে আদর করেছে, তারপর লাথি মেরেছে। অন্য সকলের মত আমিও তো মানুষই ছিলাম, আমারও বুদ্ধি-বিবেচনা ছিল; কিন্তু আজ আমাকে বানিয়ে তুলেছে ঘর-মোছার ন্যাকড়া, সকলের নোংরা ফূর্তির নর্দমার নল। উঃ! তবু কি এই রোগকে আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বরণ করে নেব?

আমি কি একটা ক্রীতদাসী? একটা ঘোটকি? তাই তো স্থির করেছি প্লাতনভ, সকলের মধ্যেই এই রোগের বিষ ঢুকিয়ে দেব—ধনী-দরিদ্র, যুবক-বৃদ্ধ, সুন্দর-কুৎসিত—সব, সব, সব!"

প্লাতনভের খাওয়া অনেকক্ষণ শেষ হয়ে গিয়েছিল। সবিস্ময়ে সে জেনির দিকে তাকিয়ে ছিল; বুঝিবা বিস্ময়ের চাইতেও এক রকম ভয় তাকে অভিভূত করে ফেলেছিল। বেদানাদায়ক, নোংরা, এমন কি রক্তাক্ত অনেক কিছুই সে দেখেছে, কিন্তু অবরুদ্ধ ঘৃণার এই সুতীব্র প্রকাশ দেখে একটা জান্তব শংকায় তার মন ভরে গেছে। নিজের মনকে একটা ঝাঁকি দিয়ে সে বলল:

"একজন বড় ফরাসি লেখক এ ধরনের একটি ঘটনার কথা লিখেছেন। প্রাশিয়ানরা যখন ফরাসিদের পরাজিত করেছিল তখন তারা ফরাসি লোকদের সর্বপ্রকারে উৎপীড়ন-নির্যাতন করেছিল। তারা পুরুষদের উপর গুলি চালিয়েছিল, মেয়েদের ধর্ষণ করেছিল, ঘরবাড়ি ধূলিসাৎ করে দিয়েছিল, ফসলে আগুন জ্বালিয়েছিল। জনৈক জার্মান একটি সুন্দরী ফরাসি স্ত্রীলোকের দেহে ঐ রোগ সংক্রামিত করেছিল, আর সেও প্রতিহিংসাবশত যে তাকে ভালবাসত তার দেহেই ওই রোগ ছড়িয়ে দিত। তারপর হাসপাতালে যখন তার মরণ ঘনিয়ে এল তখনও সে ঐ কথা ভেবে আনন্দ ও গর্ব বোধ করল। কিন্তু তারা ছিল শত্রু, বিজেতা, অত্যাচারী। কিন্তু তুমি, তুমি জেনেচ্‌কা?"

"দেখ, আমার কাছে কোন তফাৎ নেই। আচ্ছা সেরগে আইভানিচ, মন খুলে আমাকে একটা কথা বল তো। তুমি যদি দেখ, রাস্তায় একটা শিশুকে গালাগালি করা হচ্ছে, তারপর নির্যাতন হচ্ছে, তার চোখ উপড়ে নেওয়া হয়েছে, বা কান কেটে দেওয়া হয়েছে, আর যে লোক এ সব কাজ করেছে সে তোমার পাশ দিয়েই হেঁটে যাচ্ছে, এবং একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া—স্বর্গে যদি ঈশ্বর বলে কেউ থাকে—আর কেউ তোমাকে দেখতে পাচ্ছে না, তাহলে তখন তুমি কি করতে আমাকে বল।"

চোখ না তুলেই প্লাতনভ জবাব দিল, "জানি না।" তার মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠেছে, টেবিলের নীচে তার হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়েছে। "হয় তো তাকে হত্যা করতাম।"

"না, 'হয়তো' নয়, তুমি নিশ্চয় তাকে খুন করতে। আমি তোমাকে জানি, তোমাকে বুঝি। এবার ভাব: আমাদের সকলকেই ছোট শিশুর মত ভুলিয়ে এনে নোংরা করে তুলেছে। ছোট শিশু!" আবেগের সঙ্গে কথাগুলি বলে জেনি হাত দিয়ে মুখটা ঢাকল। "যতদূর মনে পড়ে, সেই ত্রিমূর্তি দিবসের সন্ধ্যায় এই কথা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম। হ্যাঁ, আমরা ছোট শিশুর দল, বোকা, নির্ভরশীল, অন্ধ, ব্যগ্র। অথচ তোমাদের জোয়াল আমরা ফেলে দিতে পারি না। কোথায় যাব? কি করব? সেরগে আইভানিচ, দয়া করে মনে করো না যে, যারা ব্যক্তিগতভাবে আমার ক্ষতি করেছে শুধু তাদের

বিরুদ্ধেই আমার রাগ। না, আমার রাগ সব খদ্দেরের বিরুদ্ধে। সব নাগরের বিরুদ্ধে, তা সে যেই হোক। তাই স্থির করেছি, আমার বা আমার অভাগিনী সখীদের বিরুদ্ধে যত অন্যায় করা হয়েছে তার প্রতিশোধ আমি নেব। সেটা কি ভাল, না মন্দ ?"

"জেনেচ্‌কা, সত্যি আমি জানি না। আমি বলতে পারি না···। কোন কথা বলার সাহস আমার নেই। সত্যি আমি বুঝতে পারি না।"

"যাকগে, সেটা আসল কথা নয়। আসল কথা হল, সকলের শরীরে আমি বিষ ঢুকিয়ে দিচ্ছি, আর সে জন্য আমার কোন ভাবান্তর নেই,—করুণা নয়, অনুশোচনা নয়, মানুষ বা ঈশ্বরের কাছে কোন পাপ-বোধও নয়। ক্ষুধার্ত নেকড়ে শিকার ধরবার পরে যে রকম খুশি হয় আমিও সেই রকম খুশি। কিন্তু গতকাল এমন কিছু ঘটেছে যেটা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। একটি শিক্ষার্থী কাল আমার কাছে এসেছিল ; ছেলেটি তরুণ, বোকা, হল্‌দে-ঠোঁট মুরগী-ছানার মত। গত বছর থেকেই সে আমার কাছে আসে। এবার কিন্তু হঠাৎ তার উপর আমার করুণা হল। সে দেখতে সুন্দর, তার বয়স অল্প, সব সময়েই সে খুব ভদ্র, আমার প্রতি সে সত্যি দরদী,—কিন্তু সে সব কারণে নয় ; না, সে রকম লোক আগে আরও অনেক এসেছে, তাদের কাউকে আমি রেহাই দেই নি। বরং গরু-মোষের পিঠে যেমন গরম লোহা দিয়ে ছাপ এঁকে দেয়, তেমনি তাদের শরীরে বিষ ঢুকিয়ে দিয়ে আমি অশেষ আনন্দ পেয়েছি। তবু এই ছেলেটিকে আমি ছেড়ে দিয়েছি। কেন যে দিয়েছি আমি নিজেই বুঝতে পারছি না। এ যেন অনেকটা কোন জড়-বুদ্ধি বোকা লোকের টাকা চুরি করার মত, অথবা কোন অন্ধকে আঘাত করা, বা ঘুমন্ত লোকের গলা কাটার মত। সে যদি কোন দুর্বল, বিকলাঙ্গ, বা বিরক্তিকর কামুক বৃদ্ধ হত, তাহলে আমি ছেড়ে কথা কইতাম না। কিন্তু সে একটি স্বাস্থ্যবান ছেলে, শক্তিমান, পাথরের মূর্তির মত তার বুক ও ঘাড়। তাই তার কোন ক্ষতি করতে আমি পারলাম না। তার টাকা ফেরৎ দিয়ে আমার রোগের কথা জানিয়ে দিলাম। এক কথায়, একটি ভাবপ্রবণ বোকার মত কাজ আমি করেছি। সে কাঁদতে কাঁদতে আমাকে ছেড়ে চলে গেল। আর কাল রাত থেকে আমি ঘুমুতে পারি নি ; যেন কুয়াসার ভিতর দিয়ে হেঁটে চলেছি। এখন ভাবছি, এখন আমার মনে হচ্ছে, তাদের সকলের—তাদের বাবা, মা, বোন, প্রিয়া, সমস্ত জগতের লোকের দেহে বিষ ঢুকিয়ে দেবার যে কথা আমি এতদিন ভেবে এসেছি, যে স্বপ্ন এতদিন দেখে এসেছি সেটা বোকামি ছাড়া, একটা ফাঁকা ব্যর্থ কল্পনা ছাড়া আর কিছুই না, কারণ অন্তত একটিবার হলেও সে কাজ আমি করতে পারি নি। তোমাকে বলছি, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। তুমি তো বুদ্ধিমান লোক সেরগে আইভানিচ, জীবনে অনেক কিছু তুমি দেখেছ, নিজেকে বুঝতে তুমি আমাকে সাহায্য কর।"

প্লাতনভ চিন্তিতভাবে বলল, "আমি জানি না জেনেচ্‌কা। আমি যে ভয়ে কিছু বলছি না, বা তোমাকে পরামর্শ দিচ্ছি না তা কিন্তু নয়। সত্যি, আমি কিছু জানি না। এটা আমার বুদ্ধির অতীত। আমার মন ব্যাপারটাকে ধরতে পারছে না, তাই আমার বিবেকও কোন রায় দিতে পারছে না।"

জেনি আঙুলের ভিতরে আঙুল ঢুকিয়ে মটকাতে লাগল।

"আমিও কিছুই বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে, আমার সব ধারণাই ভুল। কাজেই এখন আমার আর একটি মাত্র করণীয় আছে······আজ সকালেই সে চিন্তাটা আমার মাথায় এসেছে···।"

"এ কাজ করো না, এ কাজ করো না জেনেচ্‌কা, জেনি!" প্লাতনভ তাকে বাধা দিল।

"·····একমাত্র করণীয়·····ফাঁসিতে ঝোলা!"

"না, না জেনি! ওটা ছাড়া আর যা ইচ্ছা কর! বিশ্বাস কর, পরিস্থিতি সে রকম হলে আমিই বলতাম, 'জেনি, দোকান বন্ধ করার সময় হয়েছে।' কিন্তু ওটার কোন দরকার নেই। তুমি যদি চাও, আমি একটা পথের কথা বলতে পারি; সে পথও এমনি নির্মম ও নিষ্ঠুর, কিন্তু তাতে তোমার ক্রোধ শতগুণ বেশী প্রশমিত হবে।"

জেনি যেন বড় শ্রান্ত বোধ করছে এমনিভাবে বলল, "সেটা কি?"

"এই। তুমি এখনও যুবতী, সুন্দরী। ইচ্ছা করলেই তুমি নিজেকে মোহময়ী করে তুলতে পার। সে মোহ পরম সৌন্দর্যের চাইতেও বড়। তোমার রূপের যে কত ক্ষমতা তা তুমি পরীক্ষা করে দেখ নি; তোমার মত নারী যে কত প্রলোভনময়ী ও মনোহারিণী হতে পারে তা তুমি জান না; তোমার মত রূপ দিয়ে মানুষকে শিকলে বেঁধে ক্রীতদাসে পরিণত করা যায়, এমন কি পশুতেও পরিণত করা যায়। জেনি, তুমি গর্বিত, সাহসী, স্বাধীন ও কৌশলী! আমি জানি বাজে জিনিস হলেও অনেক বই তুমি পড়েছ, আর তাই অন্য সকলের চাইতে আলাদা-ভাবে তুমি নিজেকে প্রকাশ করতে পার। ভাগ্য প্রসন্ন হলে রোগ নিরাময় হবার পরে তুমি চিরদিনের মত এ অঞ্চল ছেড়ে চলে যেতে পার! তুমি যদি চাও, তখন পুরুষদের পায়ের নীচে দলিত করো! চাবুক হাতে নিয়ে তাদের শাসন করো। তাদের সর্বনাশ করো। তাদের পাগল করে দিও, যতদিন শ্রান্তি না আসে তাদের নিয়ে যা খুশি করো। ভেবে দেখ প্রিয় জেনি, আজকের দিনে জগৎটাকে চালায় কারা—নারীরা! কাল যে ছিল দাসী, ধোবানি, গানের মেয়ে, আজ সে লক্ষ লক্ষ লোককে নিয়ে খোলামকুচির মত খেলছে। যে নারী নিজের নামটাও লিখতে পারে না, পুরুষের সাহায্যে সেই একটা রাজ্য চালনা করছে। যুবরাজরা বিয়ে করছে একদিনের ভবঘুরে বা রক্ষিতা রমণীদের। জেনেচ্‌কা, এইভাবে তোমার বল্গাহীন প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র তুমি পাবে, আর দূর থেকে আমি তোমায় প্রশংসা করব।"

জেনি ম্লান হেসে বলল, "না ; একথা আমিও ভেবেছি। কিন্তু আমার ভিতরটা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। সেটা আমার প্রাণ-শক্তি। আমার মধ্যে আর কোন শক্তি নেই, বাসনা নেই, ইচ্ছা-শক্তিও। মনে হয়, আমার ভিতরটা ফাঁকা, পচা কাঠে ভর্তি। জীবন আমাকে ছেড়ে গেছে, রেখে গেছে শুধু ঘৃণা। কিন্তু সে ঘৃণাও আজ শিথিল, কারণ আমি নিজেই শিথিল হয়ে গেছি। হয়তো আবার কোন যুবক আমার কাছে আসবে, আমি তাকে করুণা করব, আর আবার দুঃখ পাব! উঃ! যা হবার তাই হোক!"

সে চুপ করল। প্লাতনভও জানে না কি বলবে। দু'জনে অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত জেংকা উঠে দাঁড়িয়ে প্লাতনভের দিকে না তাকিয়েই নিজের ঠাণ্ডা হাতটা তার দিকে বাড়িয়ে দিল।

"বিদায় সেরগে আইভানিচ। তোমার এতখানি সময় নিলাম বলে ক্ষমা কর। আমি বুঝি, পারলে তুমি আমাকে সাহায্য করতে। কিন্তু মনে হচ্ছে করবার কিছু নেই। বিদায়।"

"আমার মিনতি জেনেচ্‌কা, কোন বোকামীর কাজ করো না।"

"ঠিক আছে," শ্রান্তভাবে সে হাতটা নাড়ল।

সরাইখানা থেকে বেরিয়ে তারা বিদায় নিল। কিন্তু কয়েক পা গিয়েই জেংকা প্লাতনভকে ডাকল।

"সেরগে আইভানিচ, হেই সেরগে আইভানিচ।"

প্লাতনভ থামল। তার দিকে এগিয়ে গেল।

"গতকাল বসবার ঘরেই রলি-পলি অক্কা পেয়েছে। এখানে-সেখানে লাফিয়ে বেড়াচ্ছিল, হঠাৎ বাল্‌তি উল্টে গেল। তবু, বেশ সহজ মৃত্যু। হ্যাঁ, আর একটা প্রশ্ন আছে, আমার শেষ প্রশ্ন। সেরগে আইভানিচ, তোমার কাছে জানতে চাই, ঈশ্বর কি আছে, না নেই?"

প্লাতনভ ভ্রূকুটি করল।

"তোমাকে কি জবাব দেব? আমি নিজেই জানি না। আমি মনে করি, ঈশ্বর একজন আছে, তবে আমরা তাঁকে যে ভাবে কল্পনা করি তেমনটি নয়। ঈশ্বর পরম শক্তিমান, জ্ঞানী, ন্যায়বান।"

"আর ভবিষ্যৎ জীবন, মানে কবরের ওপারে? লোকে বলে, স্বর্গ আছে, নরক আছে। তা কি সত্যি? সত্যি কি কিছু আছে? না কি মহাশূন্য? স্বপ্নহীন ঘুম? অন্ধকার?"

প্লাতনভ নীরব। জেংকার দিকে চাইতেও পারছে না। তার মনের উপর চাপা পড়েছে। সে ভয় পেয়েছে।

অনেক চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত বলল, "আমি জানি না। তোমার কাছে মিথ্যা বলতে চাই না।"

জেংকা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাসল ; করুণ, বাঁকা হাসি।

"ধন্যবাদ বন্ধু। এ জন্যও তোমাকে ধন্যবাদ। তোমার সুখ কামনা করি। সমস্ত অন্তর দিয়ে। বিদায়।"

সে চলে গেল। ধীর, কম্পিত পদক্ষেপে পাহাড় বেয়ে উঠতে লাগল।

প্লাতনভ যথাসময়েই কাজে ফিরে গেল। মজুররা হাই তুলে, গা চুলকে, হাত-পা টান করে যার যার জায়গায় দাঁড়াতে শুরু করেছে। জাভরৎনির তীক্ষ্ণ চোখ দূর থেকেই প্লাতনভকে দেখতে পেল। সে এত জোরে চেঁচিয়ে উঠল যে জাহাজ-ঘাটার সকলেই তা শুনতে পেল।

"নীচু-কাঁধ শয়তান, তুমি দেখছি ঠিক সময়েই হাজির হয়েছ। আমি তোমার লেজ ধরে প্রায় ছুঁড়ে ফেলতেই যাচ্ছিলাম। ঠিক আছে, ঠিক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়।"

৬

শনিবারটা সাপ্তাহিক ডাক্তারি পরীক্ষার দিন। উঁচু সমাজের স্ত্রীলোকরা যেমন কোন বিশেষজ্ঞের কাছে যাবার সময় ভয়ে ভয়ে তৈরি হয়, তেমনি এখানকার মেয়েরাও এই দিনটির জন্য ভয়ে ভয়েই অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে তৈরি হয়। আগাগোড়া শরীরটা ধুয়ে-মুছে সব চাইতে ভাল নতুন তলবাস পরে। আন্না মার্কভ্‌নার বাড়িটার রাস্তার দিককার সব জানালা বন্ধ, খড়খড়ি টেনে-দেওয়া। একটা জানালায় শক্ত বালিশসহ একটা টেবিল রাখা হয়েছে।

মেয়েরা খুবই উত্তেজিত। নিজেদের অজ্ঞাতেই যদি তাদের মধ্যে রোগ সংক্রামিত হয়ে থাকে তাহলে কি হবে? একদিকে লজ্জা, অন্যদিকে হাসপাতালের একঘেয়ে জীবন, খারাপ খাবার। সেখানে অনেক দিন ধরে নানা রকম চিকিৎসা।

শুধু বড় মাংকা,—তাকে সকলে কুমীর মাংকা বলেও ডাকে—, জোয়া ও হেনরিয়েটা সার্কাসের মোটা সাদা ঘোড়ার মত নিরুদ্বেগ ও শান্ত। তাদের ত্রিশ বছর বয়স হয়েছে; সুতরাং ইয়াম্‌স্কায়ার মাপকাঠিতে তারা প্রবীণা পতিতা; তারা অনেক দেখেছে, অনেক ভুগেছে এবং কর্মস্থানের ওঠা-নামার ব্যাপারে উদাসীন হয়ে গেছে। কুমীর মাংকা তো নিজেই বলে: "নরকেও গেছি, বানের জলেও ভেসেছি। এখন আর আমার গায়ে কিচ্ছুটি লাগবে না।"

সকাল থেকেই জেংকাকে বিষণ্ণ ও চিন্তান্বিত দেখাচ্ছে। সাদা মাংকাকে সে উপহার দিয়েছে একটি সোনার ব্রেসলেট, ভিতরে নিজের ছবি লাগানো লকেটসমেত একটি সরু হার; আর গলার উপরে লাগাবার একটি রূপোর ক্রুশ। স্মৃতি-চিহ্ন স্বরূপ দুটো আংটি দিয়েছে তামারাকে: একটা তিন-পেঁচি রূপোর আংটি—তার মাঝখানটার উপরে একটা জোড়া-হাত বসানো, অন্যটা মাঝারি দামের পাথর বসানো একটা সরু সোনার আংটি।

"তামারচ্‌কা, আমার এই তলবাসটা দাসী আনিয়ুতাকে দিও। তাকে বলো, ভাল করে ধুয়ে নিয়ে সে যেন আমাকে মনে করে এটা পরে।"

মেয়ে দুটি তামারার ঘরেই ছিল। জেংকা সকালেই খানিকটা "কগনাক" আনিয়েছিল; এখন সে ধীরে ধীরে বেশ রসিয়ে রসিয়ে গ্লাসের পর গ্লাস সেই মদ খাচ্ছে আর মাঝে মাঝে লেবু ও মিছরিতে কামড় দিচ্ছে। তামারা বিস্মিত হয়ে তাকে দেখছিল, কারণ জেংকা মদ খেতে ভালবাসে না, এবং খদ্দেররা পীড়াপীড়ি না করলে মদ খায় না।

তামারা জিজ্ঞাসা করল, "আজ তোমার হয়েছে কি? সব জিনিসপত্র বিলিয়ে দিচ্ছ, যেন মরতে যাচ্ছ, বা সন্ন্যাসিনী হতে যাচ্ছ।"

জেংকা আপন মনেই বলল, "ওই রকমই একটা কিছু হতে পারে। কিছুই ভাল লাগছে না তামারা।"

"আরে, ভাল তো আমাদের কারোরই লাগে না।"

"ঠিক তা নয়। ঠিক যে একঘেয়ে লাগছে তা নয়, কিন্তু কেমন যেন কিছুই আর ভাল লাগছে না। এই যে তোমাদের দেখছি, টেবিল ও বোতল দেখছি, আমার হাত-পা দেখছি, আর মনে হচ্ছেঃ আরে, এ সবই তো অর্থহীন। কোন কিছুরই কোন অর্থ নেই! দেখ, রাস্তা দিয়ে একজন সৈনিক যাচ্ছে, কিন্তু তাতে আমার কি, আমার তো মনে হচ্ছে একটা দম-দেওয়া পুতুল নড়ে-চড়ে বেড়াচ্ছে। সে বৃষ্টিতে ভিজছে, তাতেও আমার কিছু যায় আসে না। আর এই যে আসল সত্য যে সে মরবে, আমি মরব, তোমরা মরবে, তাতেও আমার ভয় বা বিস্ময় কিছুই নেই। এই তো অবস্থা—সবই সরল ও একঘেয়ে।"

এক মুহূর্ত জেংকা চুপ করে রইল। তারপর আর এক গ্লাস "কগনাক" খেল, মিছরিটা চুষল। রাস্তার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলঃ

"তামারা, দয়া করে একটা কথা আমাকে বল। আগে কখনও তোমাকে জিজ্ঞাসা করি নি। তুমি কোথা থেকে এসেছ? এ বাড়িতে ঢুকলে কেমন করে? তুমি তো মোটেই আমাদের মত নও। তুমি এত সব জান। সব কথা ঠিক ঠিক বলতে পার। সেদিন কী সুন্দর ফরাসি ভাষায় কথা বললে। এখানকার কেউ তোমার সম্পর্কে কিছু জানে না। তুমি কে?"

"প্রিয় জেনেচ্‌কা, সেকথা বলবার মত কিছু নয়। আমার জীবনও অন্য সকলের মতই। একটা বোর্ডিং-স্কুলে ছিলাম; শিক্ষয়িত্রীর কাজ করেছি; গানের দলে গেয়েছি; একটা প্রদর্শনী-পার্কে বন্দুক চালানোর আসর চালিয়েছি এবং উইন্‌চেস্টার রাইফেল কেমন করে চালাতে হয় তাও শিখেছি। তারপর এক বদমাশের পাল্লায় পড়লাম; মার্কিন সাহসিনীর ভূমিকা নিয়ে কয়েকটা সার্কাস দলের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে বন্দুক চালানোও দেখিয়েছি। যেভাবেই হোক একটা সন্ন্যাসিনীদের আড্ডায়ও ঢুকেছিলাম। সেখানে দু'বছর ছিলাম। জীবনে অনেক কিছু করেছি। তার সব কথা মনেও নেই। এমন কি চুরি

পর্যন্ত করেছি।"

"তুমি খুব দুঃসাহসিক জীবন কাটিয়েছ। অনেক কিছু দেখেছ।"

"আমি তো খুকিটি নই। আমার বয়স কত হবে বল তো?"

"বাইশ—চব্বিশ।"

"না সোনা। গত সপ্তাহে বত্রিশ হয়েছে। আন্না মার্কভ্‌নার এই বাড়ির আমিই বোধ হয় সবার চাইতে বয়সে বড়। কোন কিছুকেই আমি আঁকড়ে ধরি না, কিছুতেই মন খারাপ করি না, কখনও অবাক হই না। তোমরা জান, আমি মদ খাই না। শরীরের খুব যত্ন নেই। এবং সব চাইতে বড় কথা, হ্যাঁ সব চাইতে বড় কথা হল, আমি কখনও প্রেমে পড়ি না।"

"তোমার সেংকার ব্যাপারটা কি?"

"সেংকা, ওটা একটা আলাদা ব্যাপার। কি জান, মেয়েমানুষের মনটাই বোকা. ভালবাসা ছাড়া বাঁচতে পারে না। তাহলেও, তাকে আমি ঠিক ভালবাসি না, সেটা অনেকটা…নিজেকে ঠকানো। তাছাড়া, শীঘ্রই তাকে আমার খুব বেশী দরকার হবে।"

জেংকা হঠাৎ খুব চঞ্চল হয়ে সাগ্রহে বন্ধুর দিকে তাকাল।

"কিন্তু এই নরকের গর্তে তুমি ঢুকলে কেমন করে? তুমি এত বুদ্ধিমতী, সুন্দরী, সুন্দর চাল-চলনে অভ্যস্ত।"

"সে এক দীর্ঘ কাহিনী। অত কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। তবে ভালবাসার দায়েই এখানে এসে পড়েছিলাম। একটি যুবককে ভালবেসে দু'জনে বিপ্লব শুরু করে দিলাম। মেয়েদের স্বভাবই ওই রকম! প্রেমিক যা দেখে আমরা তাই দেখি, সে যা চায় তাই চাই। তার কাজকর্মে আমার ঠিক বিশ্বাস ছিল না, কিন্তু তার পিছনে রইলাম। কে ভাল স্তাবক, বুদ্ধিমান, ভাল কথা বলতে জানে, আর খুব সুন্দর। কিন্তু দেখলাম, সে একটি ইতর, বিশ্বাসঘাতক। এদিকে বিপ্লব করে, আবার সহকর্মীদের সৈনিকদের হাতে ধরিয়ে দেয়। সে ছিল শত্রুপক্ষের গুপ্তচর। সে যখন খুন হল, তার বিশ্বাসঘাতকতা ধরা পড়ে গেল, তখন আমিও সামলে নিলাম। কিন্তু আমার তখন লুকিয়ে পড়া দরকার, আর সেজন্য চাই একটা জাল পাসপোর্ট। সকলে বলল, লোকচক্ষুর আড়ালে যাওয়ার সহজতম পথ একটা হলুদ টিকেট জোগাড় করা, আর তাই আমি করলাম। কিন্তু এখানেও আমি শুধু দিন গুণছি। সঠিক মুহূর্তটি এলেই সরে পড়ব।"

"কোথায়?" জেংকা অধৈর্যভাবে বলল।

"পৃথিবীটা অনেক বড়। আর জীবনকে আমি ভালবাসি! মঠেও ঠিক এইভাবেই ছিলাম। সেখানে আছি তো আছি, স্তোত্র পাঠ করছি; তারপর চঞ্চল হয়ে উঠলাম, একঘেয়ে লাগতে লাগল, আর তখনই এক লাফ, একেবারে ক্যাবারে নাচের আসরে! একটি মাত্র লাফ। এখানেও তাই হবে। রঙ্গমঞ্চে

চলে যাব, নয়তো সার্কাসে, আর না হয় কোন ব্যালে নাচের দলে। কিন্তু সব চাইতে কিসে আমাকে বেশী টানে জান কি জেনেচ্‌কা? চোর হওয়া! চুরি করতে আমার ভাল লাগে, কারণ তাতে সাহস আছে, বিপদ আছে, ভয় আছে, কিছুটা নেশাও আছে! বিনয়ী, শালীন, শিক্ষিত—আমার এই বাইরেটা দেখে আমার বিচার করো না। আসলে আমি আলাদা মানুষ, সম্পূর্ণ আলাদা!"

হঠাৎ তার চোখ দুটো জ্বল্ জ্বল্ করে উঠল। "আমার মধ্যে একটা শয়তান আছে!"

শ্রান্ত ও চিন্তিতভাবে জেংকা বলল, "তোমার ভাগ্য ভাল, জীবনের কাছে এখনও তোমার প্রত্যাশা আছে; কিন্তু আমি, আমার ভিতরটা তো মরে গেছে। মাত্র কুড়ি বছর আমার বয়স, কিন্তু আমার মনটা যেন কোন বৃদ্ধার মন, শুকিয়ে কুঁকড়ে গেছে, তার গায়ে কবরের গন্ধ। যদি আর একটু ভালভাবে বাঁচতে চেষ্টা করতাম! উঃ! আমার জীবনে তো ছাই আর কাদা ছাড়া কিছুই ছিল না!"

"থাম জেংকা, তুমি বাজে কথা বলছ। তুমি বুদ্ধিমতী, তোমার মৌলিকতা আছে, যে শক্তি পুরুষকে পা চাটতে বাধ্য করে সে শক্তিও তোমার আছে। তোমাকেও এখান থেকে চলে যেতে হবে। অবশ্য, আমার সঙ্গে নয়। আমি সর্বদাই একা। নিজের পথেই চলে যাবে।"

জেংকা মাথা নেড়ে ধীরে ধীরে দুই হাতে মুখ ঢাকল।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "না, সে পথ আমার জন্য নয়। জীবন আমাকে চিবিয়ে ছোব্‌ড়া করে দিয়েছে। আমি এখন মানুষ নই, নোংরা ছোব্‌ড়া মাত্র! আঃ!" তার মুখে নৈরাশ্য ফুটে উঠল। নিজেকেই বলে উঠল, "এস জেনেচ্‌কা, আরও কিছু 'কগনাক' খাও, লেবু খাও। ফুঃ! কী বিষাক্ত মাল! আনুশ্‌কা যে এসব কোত্থেকে জোটায় জানি না। এর কিছুটা কুকুরের গায়ে ঢেলে দিলে তার লোমের রং পাল্টে যাবে! অথচ আনুশ্‌কা সব সময় আমার কাছ থেকে পঞ্চাশ কোপেক করে বেশী দাম নিয়ে থাকে। একবার তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'তুমি এত টাকা বাঁচাও কেন?' সে জবাব দিয়েছিল, 'আমার বিয়ের জন্য; তুমি কি মনে কর শুধু আমার কুমারীত্বটুকু পেলেই আমার স্বামী খুশি হবে? তার সঙ্গে অন্তত কয়েকশ' রুবল আমাকে যোগ করতেই হবে।' সে তো ভাগ্যবতী! তামারা, আমার আয়নার নীচেকার দেরাজে কিছু টাকা আছে, সেটা তাকে দিও।"

তামারা তীক্ষ্ণ গলায় তিরস্কারের সুরে বলল, "তুমি কিসের জন্য তৈরি হচ্ছ বোকা মেয়ে—মরবার জন্য?"

"না, ধর যদি কিছু হয়। টাকাটা নিয়ে নাও। আমাকে হয় তো হাসপাতালে যেতে হবে, আর সেখানে কি হবে কে জানে। যদি দরকার হয়,

কিছু খুচরো আমার সঙ্গে আছে। কিন্তু তামারচ্‌কা, ধর আমি যদি কিছু একটা করতে চাই, তুমি কি আমাকে বাধা দেবে?"

তামারা এক দৃষ্টিতে তীক্ষ্ণভাবে তাকে দেখতে লাগল। জেংকার চোখ দুটি বিষণ্ণ, কিছুটা ফাঁকা। চোখের সে আগুন এখন নেই, কিছুটা ক্ষীণদৃষ্টি, নিষ্প্রভ, সাদা অংশটা যেন মুক্তোর মত দেখাচ্ছে।

অবশেষে নীচু কঠিন গলায় সে বলল, "না। যদি ভালবাসার জন্য কিছু করতে চাইতে, আমি অবশ্য বাধা দিতাম; যদি টাকার জন্য হত, তোমাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বিরত করতাম। কিন্তু এমন অবস্থাও আছে যেখানে হস্তক্ষেপ করা অসম্ভব। আমি তোমাকে সাহায্য করব না, কিন্তু তোমাকে আটকে রাখতে বা বাধা দিতেও চেষ্টা করব না।"

ঠিক সেই সময়ে বাড়িউলি জোসিয়া করিডর দিয়ে যেতে যেতে হাঁক দিয়ে বলল:

"মেয়েরা, সাজ-পোষাক করে নাও। ডাক্তার এসেছে। মেয়েরা, তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও।"

"তামারা, তুমি যাও," জেংকা উঠে দাঁড়িয়ে শান্তভাবে বলল। "এক মিনিটের জন্য আমি ঘরে যাচ্ছি। এখনও আমার কাপড় ছাড়া হয় নি, অবশ্য তাতে কিছু যায় আসে না। যখন আমার নাম ডাকবে, তখন যদি আমি হাজির না থাকি তাহলে আমাকে ডেকো, বা এখানে এস।"

ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় যেন হঠাৎই সে তামারার গলা জড়িয়ে ধরে আস্তে আস্তে চাপড়ে দিল।

শহর-চিকিৎসক ডাক্তার ক্লিমেংকো পরীক্ষার জিনিসপত্র তৈরি করছিল; পচন-নিরোধক ওষুধ, ভ্যাসেলিন ও টুকিটাকি জিনিস ছোট টেবিলটায় সাজিয়ে রাখছিল। পাসপোর্টের বদলে মেয়েদের সাদা কাগজ এবং তাদের নামের অক্ষরানুক্রমিক একটা তালিকাও টেবিলের উপর ছিল। কেবলমাত্র নাইটগাউন, মোজা ও চটি পরা মেয়েগুলি কিছুটা দূরে বসে-দাঁড়িয়ে আছে। টেবিলের বেশ কাছে মালকিন আন্না মার্কভ্‌না ও তার কিছুটা পিছনে দুই বাড়িউলি এম্মা এডোয়ার্ডভ্‌না ও জোসিয়া দাঁড়িয়ে।

বুড়ো ডাক্তারটি কিছুটা নোংরা এবং সব ব্যাপারেই উদাসীন। বাঁকা করে চশমা পরে তালিকাটায় চোখ বুলিয়ে সে হাঁক দিল:

"আলেকজান্দ্রা বুদ্‌জিন্‌স্কায়া।"

চ্যাপ্টা-নাক বাচ্চা নিংকা চোখ কুঁচকে এগিয়ে গেল। জোরে জোরে শ্বাস টানতে টানতে সে কোন রকমে টেবিলের উপর উঠল। ডাক্তার চশমার ভিতর দিয়ে চোখ পিটপিট করে তাকে পরীক্ষা করতে লাগল।

"যাও, তোমার সব ঠিক আছে।"

তার সাদা কাগজের উল্টো দিকে ডাক্তার তারিখ বসাল "২৮শে অগাস্ট",

"স্বাস্থ্যবতী" কথাটা লিখল ও তার নীচে একটা দাগ কেটে দিল। লিখতে লিখতেই আবার হাঁক দিল:

"ভস্তচেংকোভা আইরিনা।"

এবার লিউব্‌কার পালা। গত ছ'টা সপ্তাহ বাইরে কাটাবার ফলে এই সাপ্তাহিক পরীক্ষার অভ্যাসটা সে ভুলে গিয়েছিল। তাই ডাক্তার যখন তার গাউনটা টেনে বুক পর্যন্ত তুলে দিল, তখন সে হঠাৎ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল, তার গলায় ও পিঠে সে রক্তিমাভা ছড়িয়ে পড়ল।

তারপর জোয়া, তামারা, সাদা মাংকা ও নিউর্কা। শেষের মেয়েটির প্রমেহ রোগ থাকায় তাকে হাসপাতালে যাবার নির্দেশ দেওয়া হল।

ডাক্তার অত্যন্ত দ্রুত পরীক্ষা শেষ করল। বিশ বছর ধরে সে এই কাজ করছে। প্রতি সপ্তাহের শনিবারে কয়েক শ' মেয়েকে পরীক্ষা করে করে এমন একটা স্বাভাবিক কুশলতা, গতি ও উদাসীনমনোবৃত্তি তার মধ্যে গড়ে উঠেছে যে সমস্ত কাজটাই সে যান্ত্রিকভাবে করতে পারে। তার কি কখনও এ কথা মনে হয় যে, সে মানুষ নিয়ে কাজ করছে, এবং নিয়ন্ত্রিত পতিতাবৃত্তিতে ভয়ংকর শৃংখলটির মধ্যে সেই ছিল প্রধান যোগসূত্র? হয় তো হয় না, যদি হয়েও থাকে, তবে তা হত তার ডাক্তারি জীবনের একেবারে গোড়ার দিকে। এখন সে যা পরীক্ষা করে সে তো শুধুই পাকস্থলী, পিঠ ও মুখ। শনিবার সকালের এই নিরীহ মেষপালের একটিকেও পরে রাস্তায় দেখলে সে চিনতেও পারবে না। তার একমাত্র লক্ষ্যই হল, তাড়াতাড়ি একটা বাড়ির পরীক্ষার কাজ শেষ করা, যাতে দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং বিংশতিতম বাড়িতে যাবার সময় পাওয়া যায়।

"সুসান্না রাইত্‌জিনা," সে আবার হাঁক দিল।

কেউ এগিয়ে গেল না। মেয়েরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে ফিস্‌ ফিস্‌ করে বলতে লাগল "জেংকা কোথায়?"

সে ঘরে ছিল না।

ডাক্তার এইমাত্র তামারাকে ছেড়েছে। সে এগিয়ে গিয়ে বলল, "সে এখানে নেই। সম্ভবত পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছে। অনুমতি করুন ডাক্তার, আমি গিয়ে তাকে ডেকে আনছি।"

'সে করিডর ধরে দৌড় দিল, কিন্তু ফিরে এল না। তারপর গেল এম্মা এডোয়ার্ডভ্‌না, তারপর জোসিয়া ও আরও কয়েকটি মেয়ে, আর শেষ পর্যন্ত আন্না মার্কভ্‌না স্বয়ং।

করিডরে এম্মা এডোয়ার্ডভ্‌নার ক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "ধিক! কী লজ্জা! আর সেই এক জেংকা। সর্বদাই জেংকা। আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে।"

জেংকাকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। সে তার ঘরে নেই, তামারার ঘরেও নেই। এখানে-ওখানে সব জায়গায় খোঁজা হল—জেংকা নেই।

জোসিয়া বলল, "একবার শৌচাগারটা দেখা যাক, সেখানে থাকতে পারে।"

সেখানে পৌঁছে দেখা গেল, দরজা বন্ধ, ভিতর থেকে হুড়কো দেওয়া। এম্মা এডোয়ার্ডভ্‌না সজোরে দরজায় ঘুসি মারতে লাগল।

"জেনি বেরিয়ে এস। এটা কি ধরনের বোকামি?"

তারপর সে গলা চড়াল। অধৈর্য্য হয়ে ভয় দেখিয়ে বলল: "শুনতে পাচ্ছিস্ না শুয়োরের বাচ্চা! ডাক্তার যে অপেক্ষা করছে।"

কোন সাড়া নেই।

সকলে সভয়ে এ-ওর মুখের দিকে চাইতে লাগল। সকলের মনে একই চিন্তা।

দরজার পেতলের হাতলটা ধরে এম্মা এডোয়ার্ডভ্‌না সজোরে ঝাঁকুনি দিল। কিন্তু দরজা খুলল না।

আন্না মার্কভ্‌না হুকুম দিল, "সাইমিয়নকে ডাক।"

সাইমিয়ন এল। যথারীতি ঘুমে ঢুলু-ঢুলু ভাব। কিন্তু মেয়েদের ও বাড়িউলিদের চিন্তিত মুখ দেখেই সে বুঝে ফেলল যে, এমন কিছু ঘটেছে যাতে তার শক্তি ও নিষ্ঠুরতা দেখানো দরকার। সব কিছু শুনে সে নীরবে তার হনুমানের মত হাত দিয়ে দরজার হাতলটা চেপে ধরল এবং দেয়ালে পিঠ লাগিয়ে সমস্ত শক্তি দিয়ে টান দিল।

হাতলটা তার হাতে খুলে এল; তাল সামলাতে না পেরে সে সটান চিৎ হয়ে মেঝেতে পড়ে গেল।

"মলো যা!" সে ঝাঁঝিয়ে উঠল। "তরকারী-কাটা ছুরিটা আন তো।"

ছুরিটা দরজার ফাঁক দিয়ে ঢুকিয়ে দিয়ে সে হুড়কোটা কোথায় আছে বুঝে নিল। তারপর চাপ দিয়ে ফাঁকটা একটু বড় করে ছুরির ফলাটা ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে হুড়কোটাকে ঠেলা দিতে লাগল। প্রায় শ্বাস রোধ করে নিশ্চল হয়ে সকলে তার কাজের দিকই তাকিয়ে আছে। একমাত্র শব্দ হচ্ছে লোহায় লোহায় ঘসা লেগে।

শেষ পর্যন্ত দরজাটা খুলে গেল।

কল-ঘরের মাঝখানে বাতির হুকের সঙ্গে কর্সেটের ফিতেটা জড়িয়ে জেনি ঝুলে রয়েছে। ক্ষণিক যন্ত্রণার পরে তার দেহটা ততক্ষণে শক্ত হয়ে গেছে। বাতাসে ডান দিক থেকে বাঁ দিকে ঈষৎ দুলছে। মুখটা লালচে-নীল হয়ে গেছে। দুই পাটি দাঁতের ফাঁকে চেপে ধরা জিভের ডগাটা বেরিয়ে এসেছে।

হুক থেকে খুলে নিয়ে বাতিটাকে নীচে নামিয়ে রাখা হয়েছে।

একটি মেয়ে মৃগি রোগীর মত চিৎকার করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ার্ত মেষপালের মত সকলেই ধাক্কাধাক্কি করে সরু করিডর ধরে দৌড়তে লাগল। সকলেই কাঁদছে, আর্তনাদ করছে।

চিৎকার শুনে ডাক্তার এল। শান্ত পায়ে হেঁটে এল, সব দেখল, কিন্তু বিস্মিতও হল না, দুঃখিতও হল না: শহরের ডাক্তার হিসাবে দীর্ঘ চিকিৎসক-

জীবনে মানুষের যন্ত্রণা, আঘাত, মৃত্যু সে এত দেখেছে যে ওতে তার মনে কোন রকম দাগ পড়ে না। সাইমিয়নকে দেহটা একটু তুলে ধরতে বলে সে নিজেই দড়িটা কেটে দিল। নেহাৎ নিয়ম রক্ষার জন্য তার কথা মত সাইমিয়ন মৃতদেহটা জেংকার ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে ডাক্তার কৃত্রিম উপায়ে তার শ্বাস-প্রশ্বাস ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করল। কিন্তু পাঁচ মিনিট পরে সব আশা ছেড়ে দিয়ে বাঁকা চশমা জোড়া সোজা করে নিয়ে বলল: "পুলিশকে ডাক।"

সুতরাং কের্বেশ আবার এল। আবার মালকিনের ঘরে বসে অনেকক্ষণ তার সঙ্গে ফিস-ফিস করল। আর আবার একটা একশ' রুবলের বিল তার পকেটে খসখস শব্দ তুলল।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে পুলিশ-রিপোর্ট তৈরি হয়ে গেল। তারপর মরবার সময় যে আধা-পোষাক জেংকার পরনে ছিল সেই অবস্থায়ই দুটো খড়ের মাদুরে তাকে জড়িয়ে গাড়িতে চাপিয়ে মর্গে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

রাতের টেবিলে জেংকা যে চিঠিটা রেখে গিয়েছিল, 'এম্মা এডোয়ার্ডভ্‌নাই সেটা প্রথম আবিষ্কার করল। হিসাবের বই থেকে একটা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে গোল গোল ছেলেমানুষি হাতে পেন্সিল দিয়ে সে চিঠিটা লিখেছে। দেখলেই বোঝা যায়, আত্মহত্যা করবার শেষ কয়েক মিনিট আগেও সে কত শান্ত অবস্থায় ছিল। সে লিখেছে:

"আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। আমি মরতে চলেছি কারণ আমাকে রোগে ধরেছে। আরও কারণ মানুষগুলি সব ঠক আর ভণ্ড—জীবন আমার কাছে দুর্বহ। আমার জিনিসপত্রের কি হবে তামারা জানে। সব তাকে খুলে বলেছি।"

অন্য মেয়েদের সঙ্গে তামারা পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। তার দিকে ঘুরে তীব্র, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে এম্মা এডোয়ার্ডভ্‌না হিস-হিস করে বলে উঠল:

"বিশ্বাসঘাতিনী, তুই—তুই তাহলে জানতি ও কি করতে যাচ্ছে। ছুঁচো কোথাকার! সব জেনেও তুই মুখ খুলিস নি……।"

অভ্যাস মত হাতটা দুলিয়ে দুলিয়ে সে নির্মমভাবে তামারাকে আঘাত করতে উদ্যত হল। তারপরই হঠাৎ বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে সে হাঁ করে চেয়ে রইল; তার উদ্যত হাত থেমে গেল। মনে হল, তামারাকে সে যেন এই প্রথম দেখছে: মেয়েটি তীব্র, ক্রুদ্ধ, ঘৃণিত দৃষ্টি মেলে তার দিকে তাকিয়ে আছে; ধীরে, অত্যন্ত ধীরে একটা ছোট চকচকে ধাতব পদার্থ তুলতে তুলতে সে একেবারে বাড়িউলির মুখের সামনে মেলে ধরল।

৭

সেইদিন সন্ধ্যায় আন্না মার্কভ্‌নার বাড়িতে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটল। জমি, বাড়ি, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি, এমন কি মেয়েগুলি পর্যন্ত—সব এম্মা এডোয়ার্ডভ্‌নার হাতে চলে গেল।

কিছুদিন যাবৎই এ-ধরনের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছিল, কিন্তু জেংকার মৃত্যুর ঠিক পরেই সে রটনা ঘটনায় পরিণত হওয়ায় মেয়েদের বিস্ময় ও আতংকের আর সীমা রইল না। নিজেদের পিঠের উপর এই জার্মান স্ত্রীলোকটির শাসনের অভিজ্ঞতা তাদের আছে; সে নিষ্ঠুর, পণ্ডিতম্মন্য, লোভী, উদ্ধত, বিকৃতরুচি, জবরদস্তিপ্রবণ; তার উপর বর্তমান নাগরের প্রতি সে বিরক্তিকরভাবে আসক্ত। এই পতিতালয়টি কিনে নিতে এম্মা এডোয়ার্ডভ্‌নাকে যে ষাট হাজার রুবল দিতে হয়েছে তার তিন ভাগের এক ভাগ যে এসেছে কের্বেশ-এর কাছ থেকে সেটাও কারও অজানা নয়। বাড়িউলির সঙ্গে তার আধা-ব্যবসায়িক ও আধা-বন্ধুত্বের সম্পর্ক তো বহুদিনের। এই দুটি নিষ্ঠুর, নির্মম, লোভী মানুষের হাত মেলানোটা মেয়েদের পক্ষে সমূহ বিপদের কারণ ছাড়া আর কি হতে পারে।

আন্না মার্কভ্‌নার কিছু কিছু গোপন কার্যকলাপের খবর কের্বেশ জানত। তাই যে কোন সময়ে তাকে ধরে কের্বেশ তাকে শেষ করে দিতে পারত। কিন্তু আন্না মার্কভ্‌না যে এত সস্তায় বাড়িটা বেচে দিল তার কারণ শুধু এটাই নয়। কের্বেশ তো অনায়াসেই সে কাজ করতে পারত, কারণ তার হাতে এমন সব মাল-মশলা ছিল যার সাহায্যে পতিতালয়টি বন্ধ করা তো তুচ্ছ, স্ত্রীলোকটিকে আদালতের কাঠগড়ায় পর্যন্ত ঠেলে নেওয়া যেত।

আন্না মার্কভ্‌না বাইরে যতই উল্টো ভাব দেখাক, তার দারিদ্র্য, অসুস্থতা ও নিঃসঙ্গতা নিয়ে ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদুনি গেয়ে যতই চোখের জল ফেলুক, মনে মনে সে বাড়িটা বেচে দিতে পেরে বেশ খুশিই হয়েছে। একথা ঠিক যে, কিছুদিন যাবৎই বৃদ্ধ বয়সের নানাবিধ ভোগ-ভোগান্তির আভাষ সে পাচ্ছিল, আর সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত বিশ্রামের জন্য উৎকণ্ঠা বোধ করছিল। নিয়মিত পতিতার জীবন যাপনের সময় যে সব জিনিসের স্বপ্ন দেখতেও সে সাহস পায় নি, সে সবই আজ তার হাতের কাছে এসেছে—সম্মানজনক বার্ধক্য, শহরের কেন্দ্রস্থলে সব চাইতে সুন্দর রাজপথের উপর একটি আরামদায়ক বাড়ি, প্রচুর অর্থ ও তার আদরের মেয়ে বার্থা; এখন যে কোন দিন মেয়েটি একজন শাঁসালো নাগরিক—কোন ইঞ্জিনীয়ার, বাড়ির মালিক, বা শহর-পরিষদের সদস্যকে বিয়ে করবে, তাকে প্রচুর বর-পণ ও মূল্যবান অলংকারাদি দেওয়া হবে। তখন আন্না মার্কভ্‌না বিশ্রাম নেবে; ভাল ভাল খাবার খাবে, নৈশ ভোজনের পরে ঘরে তৈরি সুস্বাদু চেরি-মদ পান করবে; পয়েন্ট-প্রতি এক পেনি বাজি ধরে পরিচিত সম্মানিত মহিলাদের সঙ্গে তাস খেলবে; যদিও সে মহিলারা তার আসল ব্যবসার খবর

সবই জানে তবু ঘুণাক্ষরেও সে কথা তারা প্রকাশ করবে না, বরং তার ব্যবসায়িক দক্ষতার ভূয়সী প্রশংসাই করবে। আন্না মার্কভ্‌নার শান্তিপূর্ণ বৃদ্ধ বয়সের আনন্দ ও সান্ত্বনাস্বরূপ এই সব প্রিয় পরিচিত জনরা হল : প্রথম, একজন ঋণ-প্রতিষ্ঠানের মালিক ; দ্বিতীয়, রেলরাস্তার ধারে একটি ছোট হোটেলের মালিক ; তৃতীয়, ছোট একটি অলংকারের দোকানের মালিক, যে দোকানটির আড়ালে চোরাই গয়নার ঢালাও ব্যবসা চলে। আন্না মার্কভ্‌না যা কিছু জানার সবই জানে, কিন্তু তাদের আড্ডায় কেউ কারও আয়-উপার্জনের উৎসের খোঁজ করে না ; সকলেই প্রশংসা করে ব্যবসায়ে দক্ষতা, সাহসিকতা ও সাফল্যের ও কৌশলের।

আন্না মার্কভ্‌নার বুদ্ধি যতই কম হোক, তার লেখাপড়া যতই সামান্য হোক, তার অন্তর্দৃষ্টি ছিল অসাধারণ। সারাটা জীবন সেই অন্তর্দৃষ্টিই তাকে সব রকম গোলযোগ থেকে দূরে রেখেছে এবং সতর্কভাবে পথ চলতে তাকে সাহায্য করেছে। এই দৃষ্টির অভাব তার কখনও হয় নি। রলি-পলির আকস্মিক মৃত্যু এবং তার পরদিনই জেংকার আত্মহত্যার ফলে সে যেন মনে মনে বুঝতে পারল, যে-ভাগ্য এতদিন তার পতিতালয়টিকে বাঁচিয়ে রেখেছে, তাকে সৌভাগ্য এনে দিয়েছে, সব রকম বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করেছে। সেই ভাগ্য এবার তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। কাজেই সেই প্রথম সেখান থেকে বেরিয়ে গেল।

লোকে বলে, কোন বাড়িতে আগুন লাগাবর আগে বা কোন জাহাজ ডুবে যাবার আগে ইঁদুররা সেখান থেকে সরে পড়ে। আন্না মার্কভ্‌নাও সেই ইঁদুর-সুলভ জান্তব অন্তর্দৃষ্টির দ্বারাই পরিচালিত হল। সে ঠিকই করেছিল। যে পতিতালয়টি আগে ছিল আন্না মার্কভ্‌না শাইবেস-এর আর এখন হয়েছে এম্মা এডোয়ার্ডভ্‌না তিজ্‌নার-এর জেংকার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই সেই বাড়ির উপর নেমে এল অভিশাপ: শেক্সপীয়রীয় বিয়োগান্ত নাটকের রক্তাক্ত ঘটনাবলীর মতই মৃত্যু, দুর্ভাগ্য ও বিবাদ অতি দ্রুত পর পর সেই বাড়ির মাথায় নেমে আসতে লাগল। অবশ্য ইয়াম্‌স্কায়ার অন্য বাড়িগুলোর উপরেও সেই একই দুর্ভাগ্য নেমে এল।

ব্যবসা গুটিয়ে ফেলার এক সপ্তাহ পরেই প্রথম মারা গেল আন্না মার্কভ্‌না নিজে। 'অবশ্য বছরের পর বছর রুটিন-বাঁধা জীবন চালাবার পরে হঠাৎ হাত-পা গুটিয়ে বসলে অনেকেরই এরকমটা হয়ে থাকে। তবে আশ্চর্যের ব্যাপার, তার মৃত্যু হল একজন ধর্মপ্রাণা মানুষেরই মত। তাস খেলতে খেলতে সে অসুস্থ বোধ করে এবং বন্ধুদের অপেক্ষা করতে বলে মিনিট খানেকের জন্য শুয়ে পড়ে। বিছানায় শোবার সঙ্গে সঙ্গে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়েই সে পরলোকে চলে গেল ; তার মুখ শান্ত, ঠোঁটের উপর শান্তিপূর্ণ হাসির রেখা। সারা জীবনের বিশ্বস্ত সঙ্গী ইসাইয়া সাব্বিচও আর মাত্র একটি মাস বেঁচে ছিল।

বার্থাই একমাত্র উত্তরাধিকারিণী। বেশ ভাল দামেই শহরের উপকণ্ঠস্থ

কিছু জমি সহ সব সম্পত্তি সে বেচে দিল। তার মায়ের আশাও পূর্ণ হল, তার বেশ ভাল বিয়ে হল। তার মনের একান্ত ধারণা, ওডেসা ও নভরোসিস্ক্-এর ভিতর দিয়ে এসিয়া মাইনর-এ গম রপ্তানীকারী একটি বড় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্তা ছিল তার বাবা।

যেদিন সন্ধ্যায় জেংকাকে মর্গে নিয়ে গেল, যেদিন ইয়াম্স্কায়া স্ট্রীটে ভুল করেও কোন খদ্দের এল না, সেদিন এম্মা এডোয়ার্ডভ্‌নার পীড়াপীড়িতে সব মেয়েরাই বসবার ঘরে জমায়েত হল। মেয়েরা তখনও জেংকার মৃত্যুর আঘাত কাটিয়ে উঠতে পারে নি। কিন্তু তাদের উপর আদেশ জারী করা হয়েছে, সব চাইতে ভাল পোষাক পরে তাদের কাজে নামতে হবে; নাচতে হবে, গাইতে হবে, অর্ধ-উলঙ্গ দেহ দেখিয়ে বৃদ্ধ কামুকদের ভোলাতে হবে। তবু কেউ কোন রকম আপত্তি জানাতে সাহস করে নি।

শেষটায় এম্মা এডোয়ার্ডভ্‌না নিজেই বসবার ঘরে এসে হাজির হল। সে আজ আগের চাইতেও জমকালো সাজে সেজেছে। কালো রেশমের পোষাক পরেছে; তার প্রচণ্ড বুক গম্বুজের মত ঠেলে উঠেছে। দুটো ফোলা-ফোলা থুতনি ঝুলে পড়েছে। একটা মোটা সোনার হার তিন প্যাঁচ করে গলায় পড়েছে; তার থেকে ঝুলন্ত একটা ভারী লকেট পেটের উপর নেমে এসেছে। দুই হাতে কালো রেশমের আঙুল-ঢাকা দস্তানা।

সে কথা শুরু করে দিল। "ছোট মেয়েরা, আমি বলতে চাই—। উঠে দাঁড়াও!" হঠাৎ সে হুকুমের ভঙ্গীতে চেঁচিয়ে উঠল। "আমি যখন কথা বলব, তখন সকলে উঠে দাঁড়িয়ে আমার কথা শুনবে।"

মেয়েরা বিমূঢ় হয়ে চোখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। এ পতিতালয়ে এ রকম হুকুম কখনও ছিল না। যাহোক, কিছুটা ইতস্তত করে একে একে তারা উঠে দাঁড়াল। তাদের চোখে-মুখে স্পষ্ট বিস্ময়।

এম্মা এডোয়ার্ডভ্‌না জোর গলায় বেশ গুরুত্বের সঙ্গে বলতে লাগল, "আজ থেকে তোমরা আমাকে মালকিনের মত সম্মান করে চলবে। আজকের তারিখ থেকে এই বাড়ি আমাদের প্রিয় আন্না মার্কভ্‌না শাইবেস-এর হাত থেকে আইনগতভাবে আমি এম্মা এডোয়ার্ডভ্‌নার হাতে এসেছে। আমি আশা করি তোমরা ঝগড়া করবে না; বুদ্ধিমতী, অনুগত ও ভাল মেয়েদের মতই ব্যবহার করবে। আমি তোমাদের মায়ের মত হব, কিন্তু তোমাদের সাবধান করে দিচ্ছি, কোন রকম আলস্য বা বাজে ধারণা আমি সহ্য করব না, আর কোন রকম গোলমালও বরদাস্ত করব না। আমি বলতে বাধ্য যে দয়ালু-হৃদয় মাদাম শাইবেস তোমাদের বড় বেশী স্বাধীনতা দিয়েছিল। আমি আরও কড়া হব। সকলের আগে চাই শৃংখলা। বড়ই দুঃখের কথা, অলস, নোংরা বোকা রুশরা শৃংখলার মর্ম বোঝে না; কিন্তু তোমরা ভেবনা মেয়েরা,

তোমাদের ভালর জন্যই তোমাদের আমি শৃংখলা শিক্ষা দেব। তোমাদের ভালর জন্য বলছি এই জন্য যে ত্রেপ্পেল-এর প্রতিযোগিতাকে ধ্বংস করাই আমার প্রধান লক্ষ্য! আমি চাই, আমার মক্কেলরা হবে মর্যাদাসম্পন্ন লোক, কোন রকম বাজে লোক, ভবঘুরে, ছাত্র বা অভিনেতা আমি চাই না। আমি চাই, আমার মেয়েরা হবে শহরের সেরা সুন্দরী, চাল-চলনে ভদ্র, স্বাস্থ্যবতী ও হাসি-খুশি। যথাসম্ভব ভাল আসবাব কেনার ব্যাপারে আমি কৃপণতা করব না; তোমাদের ঘরের সব চেয়ার রেশমে মুড়ে দেব, সুন্দর আসল কম্বল দেব। তোমাদের খদ্দেররা বীয়ার খেতে চাইবে না, তারা হুকুম করবে ভাল বার্গাণ্ডি ও বোর্দ্ মদ এবং শ্যাম্পেন। স্মরণ রেখ, একজন ধনী বয়স্ক লোক কখনও সাধারণ মানুষের মত আদিম ভালবাসা চায় না। তারা চায় তার সঙ্গে কিছু লংকাগুঁড়ো মেশাতে; শিক্ষণবীশ দিয়ে তার কাজ চলে না, সে চায় শিল্পী, আর অদূর ভবিষ্যতে তোমাদের সেই শিল্পী হতে হবে। ত্রেপ্পল-এর রেট হল শুধু দেখা করার জন্য তিন রুবল, আর প্রতি রাতের জন্য দশ। আমি নেব দেখা করার জন্য পাঁচ রুবল, আর রাতের জন্য পঁচিশ। তোমরা সব সোনা ও হীরের উপহার পাবে। এমন ব্যবস্থা করে দেব যে তোমাদের আর কখনও কোন ছোট বাড়িতে ঢুকতে হবে না।···সৈনিকদের সে সব আড্ডাখানা ধ্বংস হোক। প্রতি মাসে কিছু কিছু টাকা বাঁচিয়ে তোমরা আমাকে দেবে, আর আমি তা ব্যাংকে রেখে দেব; সেখানে তোমাদের টাকা চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়তে থাকবে। কাজেই তোমাদের মধ্যে কেউ যদি ক্লান্তি বোধ করে অথবা কোন সম্মানিত লোককে বিয়ে করতে চায় তাহলে সব সময়ই তার হাতে একটা ছোটখাট সংরক্ষিত তহবিল থাকবে। রিগায় এবং বিদেশের সব বড় বড় পতিতালয়ে এই রকম ব্যবস্থাই করা হয়। কেউ যেন না বলতে পারে যে এম্মা এডোওয়ার্ডভ্না একটা মাকড়শা, একটা ঝগড়াটি, একটা রক্তচোষা জোঁক। কিন্তু কেউ যদি আলস্যপরায়ণ হয়, কথা না শোনে, বাজে ধারণা পোষণ করে, বা না জানিয়ে গোপনে প্রেম করে তাহলে তাকে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে; তাকে শিকড়শুদ্ধ উপড়ে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দেব, বা আরও খারাপ কিছু করব।···বাস, আমার যা কিছু বলার ছিল বলা হল। নিংকা এখানে এস; পরে তোমরা সকলেই একের পর এক আসবে।

ইতস্তত করে নিংকা এম্মা এডোয়ার্ডভ্নার দিকে এগিয়ে গিয়েই বিস্ময়ে থমকে দাঁড়াল—এম্মা এডোয়ার্ডভ্না তার ডান হাতটা বাড়িয়ে ধীরে ধীরে মেয়েটির ঠোঁটের কাছে তুলে ধরল।

"চুমো খাও!" প্রাক্তন বাড়িউলি দৃঢ়কণ্ঠে হুকুম করল। মাথাটা পিছনে হেলিয়ে চোখ দুটো কুঁচকে সে এমন ভাব করল যেন কোন মহারাণী রাজকীয় ভঙ্গিমায় সিংহাসনে আরোহণ করছে।

নিংকা এতখানি বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল যে ক্রুশ-চিহ্ন আঁকতেই তার ডান

হাতটা কাঁপতে লাগল। যা হোক, যথাসময়ে আত্মসম্বরণ করে সে প্রসারিত হাতের উপর সশব্দে চুমো খেয়ে একপাশে সরে গেল। তারপর জোয়া, হেনরিয়েটা, ভান্দা ও অন্যরা এল। তামারা কিন্তু দেয়ালের আয়নার দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়েই রইল। ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে এই আয়নাটায়ই মুখ দেখতে জেংকা খুব ভালবাসত।

এম্মা এডোয়ার্ডভ্না বৃহৎ অজগরের মত স্থির, অচঞ্চল, সম্মোহনী দৃষ্টি মেলে তার দিকে তাকাল, কিন্তু তামারা তাতে ঘাবড়াল না। চোখ না ফিরিয়ে হাতটা ভাবলেশহীন অবিচলিত দৃষ্টিতে সেও পাল্টা তাকাল। তখন নতুন মালকিন হাতটা নামিয়ে হাসতে গিয়েও মুখটা বিকৃত করে কর্কশ গলায় বলল, "তামারা, তোমার সঙ্গে গোপনে মুখোমুখি কথা বলতে চাই। এস।"

তামারা শান্ত গলায় বলল, "চল, এম্মা এডোয়ার্ডভ্না।"

যে ঘরে বসে আন্না মার্কভ্না পুরু মাখন দেওয়া কফি খেত এম্মা এডোয়ার্ডভ্না সেই ঘরে ঢুকে একটা সোফায় বসে তামারাকে একটা চেয়ার দেখিয়ে দিল। পরস্পরের প্রতি জিজ্ঞাসা ও অবিশ্বাসের দৃষ্টিপাত করে দুই নারী কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল।

অবশেষে কথা বলল এম্মা এডোয়ার্ডভ্না,"তুমি ঠিক কাজটি করেছ তামারা। ওই ভেড়াগুলোর মত তুমি আমার হাত চাটতে আস নি। আর তোমাকে তা করতেও আমি দিতাম না। সকলের সামনে তোমার সঙ্গে কর-মর্দন করতে এবং খুবই ভাল শর্তে তোমাকে আমার প্রধান বাড়িউলি, মানে বুঝতেই পারছ, আমার প্রধান সহকারিণীর পদে নিযুক্ত করতেই আমি চেয়েছিলাম।"

"ধন্যবাদ।"

"থাম। আমাকে বাধা দিও না। আগে আমার কথা শেষ করি, তারপর তোমার যা বলার তা বলো। কিন্তু তার আগে দয়া করে বল তো, আজ সকালে যখন বন্দুকটা আমার দিকে তাক করেছিলে তখন তোমার মনে কি ছিল। তুমি কি সত্যি আমাকে খুন করতে চেয়েছিলে?"

তামারা বিনীতভাবে পাল্টা জবাব দিল, "ঠিক উল্টো; আমি ভেবেছিলাম যে তুমি আমাকে আঘাত করবে।"

"বাজে কথা! তুমি কি বলছ তামারচ্কা। তুমি কি লক্ষ্য কর নি, যত দিন আমাদের পরিচয় হয়েছে তার মধ্যে একটি দিনও তোমাকে আমি কড়া কথাটি পর্যন্ত বলি নি, আঘাত করা তো দূরের কথা। তোমার কি হয়েছে তামারা? ওই সব ফাজিল রুশ মেয়েদের সঙ্গে আমি তোমার তুলনা করব না। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, অনেক অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে, আমি মানুষ চিনি। আমি জানি, তোমার শিক্ষা-দীক্ষা আছে, আমার চাইতেও ভালভাবেই আছে। তোমার রুচি আছে, বুদ্ধি আছে। বিদেশী ভাষাও তুমি জান। এমন কি আমার দৃঢ়

বিশ্বাস, তুমি সঙ্গীতও জান এবং বোঝ। আর শেষ কথা···আমি স্বীকার করি···ঠিক কি ভাবে যে বলব···মানে, তোমাকে আমার ভাল লাগে···বুঝি তোমাকে একটু ভালোই বেসেছি। আর তুমি, তুমি কি না আমাকে গুলি করতে চেয়েছিলে! অথচ আমি তো তোমার সত্যিকারের বন্ধুই হতে পারতাম। এ বিষয়ে তোমার কি বলার আছে ?"

তামারা নরম গলায় বলল, "দেখ এম্মা এডোয়ার্ডভ্না, ব্যাপারটা খুবই সাধারণ। জেংকার বালিশের নীচে একটা রিভলবার পেয়ে সেটা তোমার কাছেই নিয়ে যাচ্ছিলাম। তুমি যতক্ষণ চিঠিটা পড়ছিলে তখন তোমাকে বাধা দিতে চাই নি। কিন্তু তুমি যখন আমার দিকে ফিরলে তখন আমি ওটা তোমার হাতে দিয়ে বলতে চেয়েছিলাম: আমি কি পেয়েছি চেয়ে দেখ এম্মা এডো-ওয়ার্ডভ্না; কারণ তুমি তো বুঝতেই পার, একটা বন্দুক থাকতেও তা দিয়ে নিজেকে গুলি না করে গলায় ফাঁস লাগাবার মত ভয়ংকর মৃত্যুকে সে বেছে নিল কেন সে কথা ভেবে আমি ভীষণ বিস্মিত হয়েছিলাম। বাস, এই তো কথা।"

মালকিনের ঘন, হিংস্র ভুরু দুটো উপরের দিকে উঠল। চোখ দুটো বড় বড় হল, তার জলহস্তীর মত গালে সত্যিকারের হাসি ফুটে উঠল। তামারার দিকে দুই হাত সে বাড়িয়ে দিল।

"তাহলে এই কথা? হায় কপাল, আমি আরও ভেবেছিলাম···ঈশ্বর জানেন আমি কি ভেবেছিলাম। হাত বাড়াও তামারা, তোমার দু'খানি সুন্দর সাদা হাত বাড়াও; এস, তোমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে চুমো খাই।"

সে চুমো এত দীর্ঘস্থায়ী হল যে তামারা বিরক্ত হয়ে অনেক কষ্টে নিজেকে আলিঙ্গনমুক্ত করল।

"এবার কাজের কথা হোক। আমার দিক থেকে এই শর্ত: তুমি বাড়ি-উলি হবে এবং মোট আদায়ের ১৫% পাবে। ভেবে দেখ তামারা ১৫%! তা ছাড়া পাবে যৎসামান্য মাইনে, ধর ত্রিশ, চল্লিশ, এমনকি পঞ্চাশ রুবল প্রতি মাসে। খুবই ভাল শর্ত—তাই নয় কি? আমি একান্তভাবে বিশ্বাস করি, আমাদের এই প্রতিষ্ঠানটিকে যথাসম্ভব উঁচুতে তুলতে, শুধু এই শহর নয়, সমস্ত দক্ষিণ রাশিয়ার মধ্যে এটাকে শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তুলতে তুমি ছাড়া আর কেউ আমাকে সাহায্য করতে পারবে না। তোমার রুচি আছে, সব ব্যাপারেই তুমি ভাল বোঝ। তাছাড়া একটি অত্যন্ত বেয়ারা খদ্দেরকেও কেমন করে বাগ মানাতে হয়, খুশি করতে পারা যায় সেটা তুমি খুব ভালই জান। আর যদি এমনটি ঘটে যে কোন ধনী 'দুঁধে' লোক তোমার প্রেমে পড়ে যায়—কারণ তুমি তো খুবই সুন্দরী তামারচ্কা—দেখ, সেক্ষেত্রেও তুমি যদি দু'দিন তার সঙ্গে একটু মজা কর তাহলেও আমি আপত্তি করব না; তবে সব সময়ই তাকে বুঝিয়ে দেবে যে এ বাড়ির নিয়মের বিরুদ্ধেই তুমি সে সব করছ এবং বাড়িউলি হিসাবে এখানে তোমার অনেক কাজ, অনেক দায়িত্ব ইত্যাদি।

"তাছাড়া এইমাত্র যে প্রেমিকের কথা বলছিলাম। সে সুখ থেকে তোমাকে বঞ্চিত করবার কোন অধিকার আমার নেই। কিন্তু সবদিক বিবেচনা করে আমাদের চলতে হবে। তাকে এখানে আসতে দিও না। অন্তত ঘন ঘন তো নয়ই। মাঝে মাঝে একদিন ছুটি নিতে পার, আর সেই ছুটির দিনই তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পার। কিন্তু সব চাইতে ভাল হয় যদি তাকে ছাড়াই চলতে পার। তাতে তোমারই সুবিধা। একজন স্থায়ী ভালবাসার মানুষ একটা জোয়ালের মত, কাঁধের উপর একটা বোঝার মত। অভিজ্ঞতা থেকেই আমি বলছি। তিন-চারটে বছর যদি সবুর কর ততদিনে ব্যবসাটা অনেক বড় হবে, তুমিও অনেকটা মূলধন জমিয়ে ফেলতে পারবে, আর তখন তোমাকে পুরোপুরি অংশীদার করে নেব। আজ থেকে দশ বছর পরেও তুমি সুন্দরী যুবতীই থাকবে, তখন যত ইচ্ছা পুরুষ মানুষ কিনতে পারবে। ততদিনে তোমার মাথায়ও এই সব রোম্যান্টিক ভাবালুতা থাকবে না; তখন পুরুষের বদলে তুমিই তোমার সঙ্গী বেছে নিতে পারবে। আমি জানি, জহুরি যে রকম মূল্যবান মণি-মুক্তো বেছে নিতে জানে তুমিও সেই রকম বুদ্ধির সঙ্গে, বিবেচনার সঙ্গে প্রকৃত সঙ্গী বেছে নিতে পারবে। তুমি তাহলে রাজী?"

তামারা চোখ নীচু করে ঈষৎ হাসল।

"এম্মা এডোয়ার্ডভ্‌না, তোমার কথাগুলি সোনার মত দামী। জেংকাকে আমি ছেড়ে দেব, তবে এক্ষুণি নয়, প্রায় সপ্তাহ দুই সময় লাগবে। তাকে এখানে আসতেও নিষেধ করে দেব। হ্যাঁ, তোমার প্রস্তাবে আমি রাজী।"

উঠে দাঁড়িয়ে নতুন মালকিন বলল, "চমৎকার। এস, একটি লম্বা মিষ্টি চুমো খেয়ে চুক্তিটা সম্পন্ন করি।"

আবার তামারাকে জড়িয়ে ধরে সে একটানা চুমো খেতে লাগল। তামারা তখন যেন ছোট মেয়েটি হয়ে গেল; চোখ দুটি নেমে এল, মুখখানি তাজা-তাজা দেখাতে লাগল। শেষ পর্যন্ত নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সে বলল:

"তোমার সব কথায় আমি রাজী এম্মা এডোয়ার্ডভ্‌না, কিন্তু আমার একটা অনুরোধ আছে, অবশ্য সে অনুরোধ রাখতে তোমার কোন খরচ নেই। আমাকে এবং অন্য সব মেয়েদের জেনির শেষকৃত্যে যাবার অনুমতি দেবে কি?"

এম্মা এডোয়ার্ডভ্‌না মুখটা বাঁকাল।

"অবশ্য, অবশ্য, তোমাদের যদি ইচ্ছা হয় তো যাবে। তোমার এ খেয়ালটাও আমি মেনে নেব। শুধু জিজ্ঞাসা করি, কেন সেখানে যাবে? তাতে জেনির তো কোন লাভ হচ্ছে না। সে তো আর ফিরবে না। এটা তো নিছক ভাবালুতা ছাড়া আর কিছু না। যাহোক, আমার দিক থেকে কোন আপত্তি নেই। শুধু মনে রেখ, যারা আত্মহত্যা করে, আইন অনুসারে কোন সমাধিক্ষেত্রে তাদের কবর দেওয়া হয় না, পাশের কোন গর্তে তাদের ফেলে দেওয়া হয়।"

"দয়া করে এ ব্যাপারে আমার ইচ্ছামত আমাকে চলতে দাও। হোক

খেয়াল, তবু প্রিয়, মিষ্টি এম্মা এভোয়ার্ডভ্‌না, এ খেয়াল মঞ্জুর কর। আমার দিক থেকে কথা দিচ্ছি, তোমার কাছে এটাই আমার শেষ অনুরোধ। একজন প্রতিভাধর সেনাপতির অধীনস্থ একজন সৎ ও বিশ্বস্ত সৈনিকের মত আমাকে আচরণ করতে দাও।"

"ঠিক আছে", একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে এম্মা এভোয়ার্ডভ্‌না সম্মতি দিল। "দেখ মেয়ে, তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নেই। তোমার হাতটা দাও। এস, এস, সকলের কল্যাণে আমরা একযোগে কাজ করি।"

দরজা খুলে সে হাঁক দিল, "সাইমিয়ন!" সাইমিয়ন দরজায় হাজির হলে সে গম্ভীর গলায় বলল, "এক বোতল বিদেশী ঠাণ্ডা শ্যাম্পেন এনে দাও।" সাইমিয়ন বিস্ময়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে দেখে বলল, তাড়াতাড়ি কর। তামারা, আমাদের ব্যবসায়ের সাফল্য ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করে আমরা এখন পান করব!"

কথায় বলে, মৃত মানুষ সৌভাগ্য বয়ে আনে। এই কুসংস্কারের মধ্যে যদি কোন সত্য থাকে তো সেই শনিবারে সেটা প্রমাণ হয়ে গেল, কারণ শনিবারে সাধারণত যতটা খদ্দেরের ভিড় হয়ে থাকে, সেই শনিবারের ভিড় তাকে ছাড়িয়ে গেল। একথা ঠিক যে জেনির ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় মেয়েরা একটু দ্রুত পা চালাল, ভীরু, বাঁকা চোখে সেদিকে তাকাল, এমন কি ক্রুশ-চিহ্নও করল। যাহোক, রাত হয়ে এলে সে ভয়টা কমতে কমতে একসময় চলে গেল। পতিতালয়ের সব ঘরে লোক ঢুকল; বসবার ঘরে একজন নতুন বেহালাদার মহা উৎসাহে বাজাতে লাগল—বর্তমান বেহালাদার এই চটপটে, পরিস্কার-কামানো যুবকটিকে কোত্থেকে যেন ধরে নিয়ে এসেছে।

তামারার বাড়িউলি হওয়ার ব্যাপারটাকে সকলেই নিস্পৃহ বিমূঢ়তা ও অপ্রসন্ন নীরবতার সঙ্গেই গ্রহণ করেছে। তামারা এক ফাঁকে সাদা মাংকার কানে কানে বলল: "শোন মানিয়া, মেয়েদের বলে দিও, আমার বাড়িউলি হওয়া নিয়ে তারা যেন মাথা না ঘামায়। ওটার দরকার ছিল। তারা যেমন চলছিল তেমনি চলতে পারবে, শুধু বলে দিও যেন আমাকে না ডোবায়। আমি এখনও তাদের বন্ধুই আছি, তাদের ভালই দেখব। দেখা যাক, এরপর কি করা যায়!"

৮

পরদিন তামারার হাতে অনেক কাজ। সে মনে মনে একান্তভাবে স্থির করেছিল, গীর্জায় অনুষ্ঠিত শেষকৃত্যের মত গাম্ভীর্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ খৃস্টীয় প্রথায় প্রিয়তম আত্মীয়ের মতই বন্ধুর কবরের ব্যবস্থা সে করবে।

তার প্রকৃতিই এমন যে একটি নীরব, কর্মবিমুখ, শান্ত বহিরাবরণের অন্তরালে লুকিয়ে থাকে প্রচণ্ড সুপ্ত কর্ম-শক্তি। সে শক্তি সযত্নে লুকোনই থাকে, কিন্তু

প্রয়োজনের মুহূর্তে সব বিঘ্ন-বাধা অতিক্রম করে সবলে আত্মপ্রকাশ কর।

দুপুরে একটা দ্রুশ্‌কি নিয়ে সে পুরনো শহরে গেল; সেখানকার বাজারে পৌঁছে একটা নোংরামত সরাইখানার সামনে গাড়োয়ানকে দাঁড়াতে বলে নেমে গেল। ভিতরে ঢুকে একটা লাল-চুল ছোকরাকে জিজ্ঞাসা করল, জেংকা সেখানে আছে কিনা। ছেলেটার বিনীত ভাব দেখে মনে হল, তামারাকে সে অনেক দিন থেকে চেনে। সে চটপট জবাব দিল, সাইমিয়ন ইগ্‌নাতিচ্‌ তখনও আসে নি এবং সম্ভবত শিগ্‌গির আসবেও না, কারণ গত রাতে "রেঁস্তোরা ট্রান্সভাল"-এ সে অনেক হৈ-হল্লা করেছে, সকাল ছ'টা পর্যন্ত বিলিয়ার্ড খেলেছে, এবং সম্ভবত তখনও হোটেলের ঘরেই ঘুমুচ্ছে; তবে মহিলা যদি বলেন তো সে ছুটে গিয়ে দেখে আসতে পারে।

একটুকরো কাগজ ও পেন্সিল চেয়ে নিয়ে তামারা একটি ছোট চিঠি লিখল। তারপর সেই চিঠি ও পঞ্চাশ কোপেক বকশিস দিয়ে সেখান থেকে চলে গেল।

তারপর সে গেল গায়িকা এলেনা রোভিন্‌স্কায়ার কাছে। তামারা জানত, শহরের সেরা হোটেল "ইওরোপা"তে একটা স্যুট নিয়ে সে থাকে। তার সঙ্গে দেখা করতে তামারাকে কিছুটা বেগ পেতে হল। নীচে দরোয়ান জানাল, সে বোধ হয় বেরিয়ে গেছে; দরজায় টোকা দিতে তার নিজের দাসী জানাল, ম্যাডামের মাথা ধরেছে, তাই কারও সঙ্গে দেখা করতে পারবে না। তামারাকে আবার একটা চিরকুট লিখতে হল।

"এখানে নাম উল্লেখ করব না এমন একটা পতিতালয়ে আপনি একদা দার্গোমিঝ্‌স্কি-র সুন্দর গাথাটি এত ভাল গেয়েছিলেন যে একটি মেয়ে আপনার পায়ের উপর পড়ে প্রচণ্ডভাবে কেঁদেছিল। সেই মেয়েটির কাছ থেকে আমি আপনার কাছে এসেছি। আপনিও তাকে আশ্চর্য-ভালচোখে দেখেছিলেন। আপনার কি মনে পড়ে? তার আজ আর কোন সাহায্যের দরকার নেই, কারণ গতকাল সে মারা গেছে। কিন্তু নিজের কোন অসুবিধা না করে আপনি একটি ভাল কাজ করতে পারেন। আমি সেই লোক যে বারনেস্‌টি-কে কিছু অপ্রীতিকর সত্য কথা শুনিয়েছিল; সেজন্য আমি দুঃখিত এবং ক্ষমাপ্রার্থিনী।"

"ম্যাডাম রোভিন্‌স্কায়াকে এই চিঠিটা দাও," সে দাসীকে বলল।

দু'মিনিট পরে সে ফিরে এল।

"ম্যাডাম আপনার সঙ্গে দেখা করবেন", এই কথা বলে দাসী তামারাকে নিয়ে একটা দরজার কাছে গেল; সেটা খুলে ভিতরে ঢুকে আবার নিঃশব্দে বন্ধ করে দিল।

গায়িকা একটি বড় "অটোমান"-এর উপর শুয়েছিল। একটা সুন্দর প্রাচ্য-দেশীয় কম্বলে বিছানাটা ঢাকা, তার উপর অনেকগুলি রেশমী কুশন ও ফিতে-

লাগানো তাকিয়া ছড়ানো। নরম, রূপোলি ফারের একটা কম্বল দিয়ে তার পা দুটো ঢাকা। তার আঙুলে যথারীতি অনেকগুলি আংটি, কয়েকটিতে মরকত মণি বসানো।

শিল্পীর পক্ষে দিনটি বড়ই খারাপ। আগের দিন সকালে অপেরা-কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তার একটু ভুল-বোঝাবুঝি হয়েছিল, আর সন্ধ্যায় শ্রোতারা তাকে আশানুরূপ উচ্ছ্বসিতভাবে অভ্যর্থনা জানায় নি; হয় তো তার সে রকমটা মনে হয়েছিল। আবার পরদিন প্রাতঃকালীন সংবাদপত্রের সঙ্গীত-সমালোচক একটা দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে তার প্রতিদ্বন্দ্বী তিতানোভার ভূয়সী প্রশংসা করেছে; অথচ একটা গরুর যতটা সৌর-বিজ্ঞানের জ্ঞান সেই সমালোচকের শিল্প-জ্ঞান তার চাইতে বেশী নয়। সুতরাং এলেনা ভিক্তরভ্না নিজেকে বোঝাল যে তার মাথা ধরেছে, তার কপালের শিরা দপ্ দপ্ করছে, আর মাঝে মাঝেই তার হৃদপিণ্ডটা যেন থেমে যাচ্ছে।

"কেমন আছ ভাই", দুর্বল ও ঈষৎ নাকি স্বরে সে থেমে থেমে কথা ক'টি বলল; ঠিক যেন রঙ্গমঞ্চের উপরে কোন নায়িকা প্রেমে বা ক্ষয়রোগে মুমূর্ষু অবস্থায় সংলাপ বলছে।

"এখানে বস। তোমাকে দেখে খুব ভাল লাগল। কিন্তু আমাকে ক্ষমা কর। আধ-কপালি মাথা ব্যথায় মারা যাচ্ছি; তার উপর হৃদপিণ্ডটাও বেকায়দায় ফেলেছে। কথাই বলতে পারছি না। সম্ভবত অত্যধিক গান গেয়ে গেয়ে গলাই ধরে গেছে।"

সে রাতের অশান্ত দুরন্তপনার কথা এবং তামারার অস্বাভাবিক মুখের কথা নিশ্চয় রোভিন্স্কায়ার মনে পড়েছে। কিন্তু এখন তার মনের এই বিষণ্ণ মুহূর্তে এবং একঘেয়ে হেমন্ত দিনের পড়ন্ত আলোয়, সেদিনের সেই অভিযানকে অপ্রয়োজন বাহাদুরি, কিছুটা বা কৃত্রিম ও লজ্জাজনক বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু সেদিনকার সেই বিস্ময়কর সন্ধ্যায় সে কিন্তু খুবই ঐকান্তিকতার সঙ্গে গান গেয়েছিল এবং তার প্রতিভার গুণে দাম্ভিক জেংকাকে তার পায়ের নীচে টেনে আনতে পেরেছিল। অনেক বড় শিল্পীর মতই সর্বত্রই সে তার প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে পারে। কখনও সে নিজের মধ্যে আবদ্ধ থাকে না; তার কথা, তার চলন, তার কাজ, সব কিছুকেই সে দূর থেকে দেখে, দেখে শ্রোতাদের দৃষ্টি ও আবেগ দিয়ে।

ধীরে ধীরে সরু, সুন্দর হাতটা তুলে সে কপালে ছোঁয়াল; উজ্জ্বল আলোয় আংটির মরকত মণিগুলো জীবন্ত হয়ে ঝলমলিয়ে উঠল।

"এই মাত্র তোমার চিঠিটা পড়লাম। বেচারি···আমি দুঃখিত, তার নামটা মনে করতে পারছি না।"

"জেনি।"

"ওঃ, হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে। সে মারা গেল। কেমন করে?"

"সে গলায় ফাঁস দিয়েছিল। গতকাল সকালে যখন ডাক্তারি পরীক্ষা চলছিল।"

গায়িকার যে চোখ দুটি এতক্ষণ একঘেয়ে ও ম্লান দেখাচ্ছিল, এবার হঠাৎ সেই চোখ বড় বড় হয়ে যেন আশ্চর্য রকমের জীবন্ত হয়ে উঠল; মরকত মণির মতই একটা সবুজ আলো ঝকঝক করে উঠল। সে আলোয় প্রতিফলিত হল কৌতুহল, আতংক ও ন্যক্কার।

"হে ঈশ্বর! মেয়েটি এত ভাল ছিল, এত মৌলিক, এত সুন্দর, এত ভয়ংকর! আহা বেচারি! এ কাজ সে কেন করল?"

"আপনি তো জানেন। তার রোগ হয়েছিল। সে আপনাকে বলেছিল।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ মনে পড়ছে। কিন্তু তাই বলে গলায় ফাঁস দিল? কী ভীষণ! আমি তাকে চিকিৎসার পরামর্শ দিয়েছিলাম। আজকাল ওষুধে অলৌকিক সব কাজ হয়। আমি নিজে কয়েকজনের কথা জানি যারা সম্পূর্ণ, হ্যাঁ সম্পূর্ণ ভাল হয়ে গেছে। সমাজে সকলেই একথা জানে, তবু সকলেই তাদের কাছে ডাকে। আহা, বেচারি মেয়েটি!"

"তাই আমি আপনার কাছে এসেছি এলেনা ভিক্তরভ্না। আপনাকে বিরক্ত করবার সাহস আমার হত না, কিন্তু আমি যেন দিশেহারা হয়ে পড়েছি। এমন কেউ নেই যার কাছে যেতে পারি। সেদিন সন্ধ্যায় আপনি খুবই দয়া ও বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করেছিলেন, বিবেচনা ও সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন। তাই শুধু আপনার পরামর্শই আমি চাই। হয় তো আপনার প্রভাব, আপনার পরিচয়কে আপনি কাজে লাগাতে পারবেন।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়, আমার যা করার আছে তা আমি করব। কিন্তু আমার এই মাথাটা! তার উপর এই ভয়ংকর সংবাদ! বল, কি ভাবে আমি সাহায্য করতে পারি।"

তামারা জবাব দিল, "সত্যি কথা বলতে কি সেটা আমি নিজেও জানি না। দেখুন, তাকে মর্গে নিয়ে গেছে। কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে এবং এ ব্যাপারে একটা প্রতিবেদন তৈরি করতে কিছুটা সময় গেছে; তাকে নিয়ে যেতেও কিছুটা সময় লেগেছে। তাই মনে হয়, এখনও হয় তো ময়না তদন্তটা হয় নি। যদি সম্ভব হয়, আমি চাই না তারা ওকে কাটা-ছেঁড়া করুক। আজ রবিবার, তাই মনে হয় আগামীকালের আগে তারা কিছু করবে না। তাই হয়তো ইতিমধ্যে একটা কিছু করা যেতে পারে।"

"কি যে করা যায় বুঝতে পারছি না। দাঁড়াও, ডাক্তারি বিভাগের কোন সরকারী লোক, বা কোন ডাক্তারের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে কি? দাঁড়াও, ঠিকানার বইটা খুঁজে দেখছি। হয় তো কিছু করা যাবে।"

তামারা বলল, "আর একটা কথা। আমার খরচে তার কবরের ব্যবস্থা করতে চাই। তাকে আমি খুবই ভালবাসতাম।"

"তোমাকে সাহায্য করতে পারলে আমি খুশি হব।"

"না, না। আপনাকে হাজার ধন্যবাদ। ও কাজটা আমি নিজেই করব। আপনার সাহায্য নিতে আমি কোন রকম সংকোচ করতাম না, কিন্তু কি জানেন, প্রিয় বন্ধুকে স্মরণ করে আমি একটা প্রতিজ্ঞাই করেছি। প্রধান সমস্যা হচ্ছে, গীর্জার প্রচলিত রীতি-নীতি অনুযায়ী তাকে কবর দেবার ব্যবস্থা কেমন করে করা যাবে। আমি জানি সে ছিল নাস্তিক। অন্তত ধর্মভীরু সে ছিল না। আমিও খুব একটা ধর্মবিশ্বাসী নই। তবুও শেষ বাণী উচ্চারিত হবে না, সঙ্গীত হবে না, কবরখানার চৌহদ্দির বাইরে কোন এক জায়গায় একটা কুকুরের মত তাকে কবর দেওয়া হবে—এ আমি চাই না। পুরোহিত ও গায়কদলকে নিয়ে যথাযথভাবে কবর দেবার অনুমতি পাব কিনা আমি জানি না। তাই আপনার কাছে এসেছি সাহায্যের জন্য, পরামর্শের জন্য। অন্তত, আমি এ ব্যাপারে কার সঙ্গে দেখা করব সেটা আপনি আমাকে বলে দিতে পারবেন।"

রোভিন্স্কায়ার আগ্রহ ক্রমেই বাড়ছিল। মাথা ধরা, ক্লান্তি, চতুর্থ অংকে নায়িকার মৃত্যু—সব সে ভুলে গেল। একটি পতিতা স্ত্রীলোকের প্রতি করুণা-পরবশ একজন প্রকৃত দেবদূত, একজন মহৎ শিল্পীর ভূমিকায় সে ইতিমধ্যেই নিজেকে কল্পনা করে নিয়েছে। দৃশ্যটি মৌলিক, জাঁকজমকপূর্ণ এবং নাটকীয়তায় সমৃদ্ধ!

একটু চুপ করে থেকে সে বলল, "এই মুহূর্তেই কিছু মনে করতে পারছি না। কিন্তু আমি জানি, কেউ যদি জোর দিয়ে কিছু চায় তাহলে অবশ্য তা পায়। তোমাকে সাহায্য করতে আমি ইচ্ছুক। দাঁড়াও, দাঁড়াও, একটা চমৎকার ধারণা মাথায় এসেছে। আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে, সেদিন সন্ধ্যায় ব্যারনেস ও আমি ছাড়া সেখানে আরও ছিল…"

তামারা সঙ্গে সঙ্গে বলল, "তাদের আমি চিনি না। কিন্তু একজন ছিল যে জেনির হাতে চুমো খেয়ে বলেছিল, কখনও কোন দরকার পড়লে সে সর্বদাই তা করতে প্রস্তুত। নিজের কার্ডটাও সে জেনিকে দিয়েছিল, কিন্তু কাউকে না দেখাতে বলেছিল। যে করেই হোক সে কথা ভুলে গিয়েছিলাম; তাকে লোকটির কথাও জিজ্ঞাসা করা হয় নি। কাল তার ঘরে কার্ডটা অনেক খুঁজলাম, কিন্তু পেলাম না।"

"এক মিনিট, ঠিক এক মিনিট; আমার মনে পড়েছে!" গায়িকাটি সোৎসাহে বলে উঠল। অটোমান থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সে বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, তার নাম রিয়াসানভ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, উকিল। এরাস্ত্ আন্দ্রীভিচ রিয়াসানভ। সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। ভাগ্যিস কথাটা মনে এসেছিল।"

ছোট টেবিলের উপর টেলিফোনটা ছিল। সেদিকে সরে গিয়ে সে রিসিভার তুলল।

"১৩—১৫ নম্বরটা দিন তো। ধন্যবাদ। হেল্লো, আমি এরাস্ত আন্দ্রীভিচ-এর সঙ্গে কথা বলতে চাই। আমি ম্যাডাম রোভিন্স্কায়া। হেল্লো, কে এরাস্ত আন্দ্রীভিচ? ভাল, ভাল, আমার হাতের কথা থাক। তোমার কি সময় হবে? বাজে কথা রাখ। এটা গুরুতর ব্যাপার। কয়েক মিনিটের জন্য আমার এখানে একবার আসতে পারবে কি? না, না। হ্যাঁ। একটা দয়ালু, চালাক লোক। নিজেকে ছোট করছ। হ্যাঁ, খুব ভাল। আমার পোষাক বদলানো হয় নি। তা হোক, আমার একটা অজুহাত আছে—ভয়ংকর মাথার ব্যথা। না, একটি মহিলা, তরুণী, এলেই দেখতে পাবে। যত তাড়াতাড়ি পার চলে এস। ধন্যবাদ। গুড্‌বাই।"

রিসিভারটা রেখে সে বলল, "সে এখনই এসে পড়বে। খুব ভাল মানুষ, আর বেশ চালাক-চতুর। সে সব কিছু করতে পারে, এমন কি অন্যের পক্ষে যা অসম্ভব তাও করতে পারে। ইতিমধ্যে···মাফ কর, তোমার নামটা কি?"

তামারা এক মুহূর্ত ইতস্তত করল, তারপর নিজেই সেজন্য একটু হাসল।

"এলেনা ভিক্তরভ্‌না, আমার নাম নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। আমার ডাকনাম তামারা, আর আসল নাম আনাস্তাসিয়া নিকলেভ্‌না। তা হোক, আমাকে তামারা বলেই ডাকবেন। তাতেই আমি অভ্যস্ত।"

"তামারা। সুন্দর নাম। তাহলে মাদ্‌মেয়জেল তামারা, আমার সঙ্গেই এ বেলার খাবারটা খেয়ে নাও। হয় তো রিয়াসানভও আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে।"

"আমি দুঃখিত, আমার হাতে সময় নেই।"

"দুঃখের কথা। তাহলে অন্য সময় হবে। ধূমপান কর তো?" মরকত মণিতে একটা বড় "ই" অক্ষর বসানো সোনার সিগারেট-কেসটা সে এগিয়ে দিল।

একটু পরেই রিয়াসানভ হাজির হল।

তাদের পতিতালয়ে যেদিন সকলে এসেছিল সেদিন তামারা লোকটিকে ভাল করে দেখে নি, কিন্তু আজ তার চেহারা দেখে মুগ্ধ হল। বেশ শক্ত গড়নের লম্বা শরীর, বিঠোভেন-এর মত চওড়া কপাল, রূপোলি ছোঁয়া লাগা কালো চুল শিল্পীসুলভ ঔদাসিন্যের সঙ্গে আঁচড়ানো; অগ্নিবর্ষী বক্তার মত মাংসল বড় মুখ; বুদ্ধিদীপ্ত ভাবময় চোখ; যে কোন ভিড়ের মধ্যে সহজেই চোখে পড়বার মত; উচ্চাকাংখা আছে, জীবনকে ভালবাসে, তবু জীবনে ক্লান্তি আসে নি; বহু হৃদয় জয় করেও এখনও ভালবাসায় উন্মুখ; যে কোন দুঃসাহসিক অভিযানে ঝাঁপিয়ে পড়তে তিলমাত্র ইতস্তত করে না। খুশিমনে তার দিকে তাকিয়ে তামারা ভাবল, "জীবন যদি আমাকে এমনভাবে ভেঙে টুকরো টুকরো করে না দিত তাহলে এই মানুষের পায়েই নিজেকে সমর্পণ করে দিতাম—আনন্দের সঙ্গে, হাসতে হাসতে, ঠিক যে ভাবে মানুষ তার প্রিয়জনের দিকে একটি গোলাপ ফুল

ছুঁড়ে দেয়।

রিয়াসানভ রোভিন্স্কায়ার হাতে চুমো খেল; তামারাকে সাধারণভাবে সম্ভাষণ জানাল।

"সেই হট্টগোলের রাত থেকেই তো আমাদের পরিচয়। তোমার ফরাসি ভাষার জ্ঞান দেখে সেদিন আমরা বিস্মিত হয়েছিলাম। তোমার কথাগুলি ছিল—নিজেদের মধ্যে বলছি—আত্ম-বিরোধী, কিন্তু কী জোরের সঙ্গেই না সেগুলি বলা হয়েছিল! তোমার সেদিনের ভাবময়, উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বর আমার আজও মনে পড়ে।" তারপর নায়িকার দিকে ফিরে সে বলল, "তারপর, এলেনা ভিক্তরভ্না, তোমার জন্য কি করতে পারি? তোমার সেবায় আমি

রোভিন্স্কায়া অলস ভঙ্গীতে কপালে আঙুল ছোঁয়াল।

ইচ্ছা করেই চোখ দুটোকে ফাঁকা রেখে সে বলল, "প্রিয় রিয়াসানভ, আমি বড়ই ভেঙ্গে পড়েছি; এই মাথার যন্ত্রণাটা···দয়া করে টেবিল থেকে মাথা ধরার গুঁড়ো ওষুধটা দাও তো। মাদ্‌ময়জেল তামারাই তার কাহিনী বলুক। আমি পারব না। সে বড় ভয়ানক।"

সংক্ষেপে, সরল ভাষায় তামারা জেনির মৃত্যুর কথা এবং উকিল তাকে যে কার্ড দিয়েছিল তার কথা বলল। সে যে দরকার হলে জেনিকে সাহায্য করবে বলে কথা দিয়েছিল, প্রসঙ্গত সে কথাটাও তামারা উল্লেখ করল।

"নিশ্চয়, নিশ্চয়," রিয়াসানভ চেঁচিয়ে বলে উঠল। অভ্যাসমত সুন্দর চুলগুলোকে এলোমেলো করে দিয়ে বড় বড় পা ফেলে সে ঘরময় পায়চারি করতে লাগল। "তুমি তো বন্ধুর কাজই করছ—মহৎ, আন্তরিক কাজ। চমৎকার। আমি আছি তোমার সঙ্গে। তুমি বলছ, কবর দেবার একটা অনুমতি চাই। হুম্। ভেবে দেখি।"

সে কপাল ঘসতে লাগল।

"হুম্·· হুম্···যদি আমার ভুল না হয়ে থাকে, গীর্জার কানুনের একশ'··· একশ' আটাত্তর ধারায় বলা হয়েছে, আত্মহত্যার ক্ষেত্রে কোন লোক যদি উন্মাদ অবস্থায় আত্মনাশ না করে থাকে তাহলে তাকে বিধিসঙ্গত প্রথায় কবর দেওয়া যায় না। হ্যাঁ, ঠিক তাই; আলেকজান্দ্রিয়ার টিমোথির লেখা থেকে এটা নেওয়া হয়েছে। আচ্ছা, তুমি তো বললে, তোমাদের ডাক্তার তাকে ফাঁস থেকে নামিয়েছিল। তার নাম কি?"

"ক্লিমেংকো।"

"মনে হচ্ছে আগেও তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। ঠিক আছে। তোমাদের জেলার পুলিশ-অফিসার কে?"

"কের্বেশ।"

"আহা-হা! তাকে তো চিনি। বেশ শক্ত-পোক্ত পুরুষোচিত চেহারা,

পাখার মত দেখতে লাল দাড়ি, সেই তো ?"

"হ্যাঁ, সেই।"

"চমৎকার। তাকে চিনি। অনেক আগেই তার সশ্রম কারাদণ্ড হওয়া উচিত ছিল। প্রায় দশবার তাকে গেঁথেছি, কিন্তু সে শয়তানটা প্রতিবারই ফস্কে গেছে। বাইন মাছের মত পিচ্ছিল লোক। মনে হচ্ছে, তার হাতে একটু তেল লাগাতে হবে। আচ্ছা, তারপর মর্গ। কবরটা কখন দিতে চাও ?"

"জানি না। যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভাল। এমন কি আজ হলেই ভাল হয়।"

"হুম্। আজ। আমি কথা দিতে পারছি না। না, আজ ততটা সময় পাওয়া যাবে না। দেখ, এটা আমার ঠিকানার বই ; এতে 'টি'—তামারা— অক্ষরের নীচে তোমার নাম ও ঠিকানা লিখে দাও। দু'ঘণ্টার মধ্যে আমি তোমাকে জানিয়ে দেব। ঠিক আছে ? কিন্তু আবার বলছি, সৎকারের ব্যাপারটা হয় তো আগামী কাল পর্যন্ত স্থগিত রাখতে হবে। আর, আমার খোলাখুলি কথার জন্য ক্ষমা করো—কোন টাকার দরকার হবে কি ?"

"ধন্যবাদ। টাকা আছে। আপনার সাহায্য ও আগ্রহের জন্য আবার ধন্যবাদ জানাই। এবার আমাকে যেতে হবে। এলেনা ভিক্তরভ্না, আপনাকেও আন্তরিক ধন্যবাদ।"

তামারাকে দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে রিয়াসানভ আবার বলল, "দু' ঘণ্টার মধ্যেই আমার বক্তব্য জানতে পারবে।'

তামারা তখনই বাড়ি ফিরল না। রাস্তার পাশে একটা ছোট কফির দোকানে ঢুকল। সেখানে সেংকা তার জন্য অপেক্ষা করছিল। হাসি-খুশি সুদর্শন ছেলেটি, জিপসিদের মত মুখ, নীলাভ কালো চুল, কালো চোখ, সাদা অংশটা ঈষৎ হলুদ। সে কাজ করে দৃঢ় সংকল্পে ও সাহসের সঙ্গে। স্থানীয় চোরদের মধ্যে তার নাম-ডাক আছে ; তাকে নিয়ে তারা গর্ববোধ করে। সেই তাদের প্রেরণা ও নেতা।

না উঠেই সে তামারাকে অভ্যর্থনা জানাল ; কিন্তু সযত্নে অথচ জোর করে যে ভাবে সে তাকে বসতে সাহায্য করল তাতেই তার সৎ স্বভাব ও প্রচুর ভালবাসা প্রকাশ পেল।

"আরে তামারা যে ; অনেকদিন তোমাকে দেখি নি। কফি চলবে ?"

"না। আগে কাজের কথা। কাল জেংকাকে কবর দেওয়া হবে। সে গলায় ফাঁস লাগিয়েছে।"

উপেক্ষার ভঙ্গীতে সেংকা দাঁতের ফাঁক দিয়ে বলল, "হ্যাঁ, কাগজে দেখছি। তাতে বয়েই গেল।"

"আমাকে এখনই পঞ্চাশ রুবল দাও।"

"তামারচ্কা, সোনা। আমার হাতে একটা পেনিও নেই।"

একটুও না রেগে আদেশের ভঙ্গীতে তামারা বলল, "আমি তো বলেছিলাম টাকাটা জোগার করে রাখতে।"

"হা ভগবান! তোমাকে কথা দিয়েছিলাম, তাই তোমার টাকা আমি ছুঁইও নি। কিন্তু আজ রবিবার। সেভিংস ব্যাংকগুলো বন্ধ।"

"বেশ তো। ব্যাংকের বইটা তোমার দাবনায় লুকিয়ে রাখ। কিন্তু টাকার ব্যবস্থা তোমাকে করতেই হবে।"

"কিন্তু টাকাটা তোমার কেন দরকার হচ্ছে মধুমিতা?"

"কেন দরকার তাতে তোমার কি? সৎকাজের জন্য।"

"ওঃ, আচ্ছা, ঠিক আছে।" সেংকা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। "তাহলে বরং টাকাটা নিয়ে সন্ধ্যায় তোমার কাছে যাব। কি বল তামারচ্‌কা? তোমাকে না দেখলে বড় একলা লাগে। ওঃ, প্রিয়তমা, তোমাকে একটার পর একটা চুমো খেয়ে যাব, সারা রাত তুমি চোখ বুঁজতে পারবে না। যাব তো?"

"না, না। আমি যা বলছি তাই কর সেনেচ্‌কা। আমার কথা শোন। তুমি আর আমাকে দেখতে যেও না। আমি এখন বাড়িউলি।"

"সে কাজের তুমি জান কি!" সবিস্ময়ে কথাটা বলে সেংকা শিস্ দিতে লাগল।

"যাই হোক, আপাতত আমার সঙ্গে দেখা করতে যেও না। পরে তুমি যা বলবে তাই করব। অচিরেই সব শেষ হয়ে যাবে।"

"আঃ, আমাকে কেন কষ্ট দিচ্ছ? যত তাড়াতাড়ি পার ও পাট চুকিয়ে দাও।"

"চিন্তা করো না। শিগগিরই সব চুকিয়ে দেব। আর একটা সপ্তাহ অপেক্ষা কর সোনা। গুঁড়োটা পেয়েছ কি?"

সেংকা অসন্তুষ্টভাবে জবাব দিল, "গুঁড়োটা কোন কাজের নয়; তাছাড়া ওটা গুঁড়ো নয়, বড়ি।"

"তুমি ঠিক জান, জলে দিলেই সেটা গুলে যাবে?"

"নিশ্চয় যাবে। আমি নিজের চোখে দেখেছি।"

"সে মারা যাবে না তো? শোন সেংকা, তুমি ঠিক জান সে মারা যাবে না?"

"তার কিছুই হবে না। শুধু কিছুক্ষণ অঘোরে ঘুমোবে। আঃ, তামারচ্‌কা। উচ্ছ্বসিত অথচ অস্পষ্ট গলায় কথাটা বলে সহসা অদম্য কামনায় সে এমনভাবে শরীরটাকে টান করল যে তার সন্ধিগুলো কট্‌-কট্‌ করে উঠল। "ঈশ্বরের দোহাই, তাড়াতাড়ি কাজটা শেষ করে ফেল। কাজ শেষ করেই আমরা সরে পড়ব। তুমি যেখানে যেতে চাইবে সেখানেই চলে যাব। আমি তোমার হাতের পুতুল। তুমি যদি চাও, আমরা ওডেসা যেতে পারি, অথবা বিদেশেও যেতে পারি। শুধু জলদি কাজটা শেষ কর।"

"অচিরেই শেষ করব ; হ্যাঁ, দেখে নিও।"

"তুমি শুধু একবার চোখটা টিপবে, আর সঙ্গে সঙ্গে আমি বড়ি, যন্ত্রপাতি ও পাশপোর্ট নিয়ে তৈরি হব। আর তারপরই···আমরা হাওয়া। তামারচ্‌কা, পরী আমার, মানিক আমার, বুকের রতন আমার।"

সেংকা সব সময়ই বাইরে খুব সংযত, কিন্তু এবার স্থান-কাল ভুলে তামারাকে জড়িয়ে ধরতে গেল।

বিড়ালের মত দ্রুত গতিতে তামারা চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠল। "না, না। পরে সেনেচ্‌কা, পরে। আমি একান্তভাবেই তোমার হব, বাধা দেব না। তিরস্কার করব না। দেখ, তখন তুমিই ক্লান্তিবোধ করবে। বোকা সোনা আমার, এখন বিদায়।"

কালো চুলে ঢেউ তুলে দ্রুত পায়ে সে বেরিয়ে গেল।

৯

পরদিন সকাল দশটা নাগাদ যে পতিতালয়টি আগে ছিল আন্না মার্কভ্‌না শাইবেস-এর আর এখন হয়েছে এম্মা এডোয়ার্ডভ্‌না তিজ্‌নার-এর সম্পত্তি, সেখানকার অধিকাংশ মেয়ে দ্রুশ্‌কি-তে চেপে শহরের মাঝখানে মর্গে গিয়ে হাজির হল। গেল না শুধু হেনরিয়েটা, নিংকা ও পাশ্‌কা ; হেনরিয়েটা জীবনে অনেক কিছু দেখেছে, নিংকা ভীরু ও নির্লিপ্ত ; পাশ্‌কার মনটা বড়ই নরম। আজ দু'দিন হল পাশ্‌কা বিছানায়ই পড়ে আছে ; কোন কথা বলছে না ; কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে খুশি-খুশি, বোকা-বোকা হাসির সঙ্গে পশুর মত কিছু দুর্বোধ্য শব্দ করছে। খেতে না দিলে খেতেও চাইছে না, কিন্তু খাবার পেলে হাত দিয়েই গল্‌-গল্‌ করে খেয়ে ফেলছে। সে এমন নোংরা হয়ে উঠেছে এবং সব কিছু এমন ভুলে যাচ্ছে যে দৈনন্দিন প্রয়োজনের কথাও তাকে মনে করিয়ে দিতে হচ্ছে। স্থায়ী খদ্দেররা রোজ এসে তাকে চাইলেও এম্মা এডোয়ার্ডভ্‌না এখন আর পাশ্‌কাকে তাদের কাছে পাঠাচ্ছে না। এর আগেও পাশ্‌কার এ ধরনের স্মৃতি-বিলোপ ঘটেছে, তবে সে অবস্থা কখনও দীর্ঘস্থায়ী হয় নি, আর এম্মা এডোয়ার্ডভ্‌নাও অপেক্ষা করে দেখছে—একদিকে পাশ্‌কা যেমন এ-বাড়ির একটি রত্ন-ভাণ্ডারবিশেষ, অপর দিকে এখন সেই আবার এ বাড়ির একটি শোচনীয় শিকারে পরিণত হয়েছে।

একটা লম্বা একতলা বাড়িতে মর্গটা অবস্থিত। বাড়িটার দরজায়-জানালায় সাদা দাগ টানা। দেখলেই কেমন যেন অদ্ভুত মনে হয়। মেয়েরা একে একে সদরের কাছে থেমে ভীরু পায়ে উঠোনটা পেরিয়ে ছোট গীর্জাটায় গিয়ে পৌঁচুচ্ছে। গীর্জার জানালা-দরজায়ও সাদা দাগ টানা।

দরজায় তালা ঝুলছে। তামারা পাহারাদারের খোঁজে গিয়ে শেষ পর্যন্ত তাকে পেল। একটি ছোটখাট টাক-মাথা বুড়ো মানুষ ; সারা মুখে খোঁচা খোঁচা

দাড়ি গজিয়েছে। ছোট চোখ ছুটো সর্দি-ভারাক্রান্ত, নাকটা বেশ বড়, লাল ও চ্যাপ্টা।

সে বড় তালাটা খুলল, হুড়কোটা নামাল এবং মর্চে-ধরা কব্জার কর্-কর্ শব্দ করে দরজাটা খুলে দিল।

ভিজে পাথর, ধূপ ও পচা মাংসের গন্ধ নিয়ে একটা ভিজে ঠাণ্ডা বাতাস এসে মেয়েদের নাকে লাগল। তারা ভিড় করে সরে দাঁড়াল। শুধু তামারা পাহারাদারের পিছন পিছন ভিতরে ঢুকল।

গীর্জার ভিতরটা বেশ অন্ধকার। শুধুমাত্র কারাগারের মত গরাদে-দেওয়া একটা ছোট জানালা দিয়ে হেমন্তের কিছুটা আলো সেখানে ঢুকছে। ছু'তিনটি কালো, অস্পষ্ট, অনাড়ম্বর দেব-মূর্তি দেয়ালের গায়ে ঝুলছে। মেঝের উপর রয়েছে কয়েকটি সাদাসিদে কাঠের শবাধার। মাঝখানেরটা খালি।

নস্যি নিতে নিতে পাহারাদার কর্কশ গলায় বলল, "তোমাদের কোন্‌টা? তার মুখটা চেন তো?"

"হ্যা, আমি চিনি।"

"তাহলে এসে দেখ। সবগুলোই দেখাচ্ছি। এটা কি?" একটা শবাধারের ডালা খুলে সে দেখাল। তখনও সেটায় পেরেক মারা হয় নি।

"এটা নয় বলছ? তাহলে এগুলো দেখ।" একটার পর একটা ডালা তুলে সে মৃতদেহগুলি দেখাতে লাগল। সবগুলিই কপর্দকহীন, রাস্তা থেকে তুলে আনা শব; কতকগুলি মাতাল; কিছু বা গাড়ি চাপা পড়েছে; সব মৃতদেহ-গুলিই কোন না কোন ভাবে বিকৃত ও বিকলাঙ্গ; পচন শুরু হয়ে গেছে। তাদের তীব্র গন্ধ এতই ঘন ও চটচটে যে তামারার মনে হল সে গন্ধ বুঝি আঠার মত তার শরীরের প্রতিটি লোমকূপের উপর ছড়িয়ে পড়েছে।

সে হঠাৎ প্রশ্ন করল, "শোন পাহারাদার, পায়ের নীচে খুট্ খুট্ আওয়াজ হচ্ছে কিসের?"

মাথা চুলকে পাহারাদার বলল, "খুটখুট শব্দ! নির্ঘাৎ ইঁদুর হবে। মরাগুলোকে তো একেবারে ছেঁকে ধরেছে। তোমরা কাকে খুঁজছ?"

"একটি স্ত্রীলোক।"

"এগুলোর মধ্যে নেই?"

"না। এর কাউকেই আমি চিনি না।"

"দেখ, তাহলে তো মর্গে যেতে হবে। তাকে কখন এনেছে?"

থলেটা খুলে বুড়োটাকে কিছু বকশিস দিয়ে তামারা বলল, "শনিবার, শনিবার বিকেলে। এটা নাও, তোমাকে তামাক খেতে দিলাম।"

"বলছ শনিবার। তাহলে নির্ঘাৎ ছু'শ' সতেরো নম্বর হবে। নাম কি?"

"সুসান্না রাইজিনা।"

"আমি গিয়ে দেখছি। হয়তো সেখানেই আছে। আচ্ছা, মেয়েরা

দরজায় দাঁড়িয়ে যে মেয়েগুলো ভিড় করেছিল তাদের দিকে ফিরে সে বলল, "আমাদের সঙ্গে যাবার মত সাহস কার আছে? যদি শনিবারে তোমাদের বন্ধুকে এখানে এনে থাকে, তাহলে এতক্ষণে সে জন্মদিনের পোষাকে আছে, কাজেই দৃশ্যটা খুব সুখকর নয়। তাকে পোষাক পরাবার জন্য তোমাদের দু'জনকে দরকার হবে।"

"তুমি চল মাংকা," হুকুমের ভঙ্গীতে তামারা সাদা মাংকাকে বলল। শুনেই ভয়ে তার মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল; সে কাঁপতে লাগল; হাঁ করে শবাধারগুলির দিকে তাকিয়ে রইল। "ভয়ের কি আছে বোকা মেয়ে, আমি তো সঙ্গে থাকছি। তুমি ছাড়া আর কে যাবে? সে তোমাকে ভালবাসত।"

কোনরকমে ঠোঁট নেড়ে সাদা মাংকা আমতা-আমতা করে বলল, "আমি··· আমি···ভয় করি না। চল। আমি ভয় করি না।"

মর্গটা গীর্জার পিছন দিকে অবস্থিত। একটা নীচু, অন্ধকার ঘর, সেখানে ঢুকতে ছ'টা সিঁড়ি নীচে নামতে হয়।

পাহারাদার কোথায় যেন গেল। একটা মোমবাতি ও একটা ছেঁড়া বই নিয়ে ফিরে এল। মোমবাতিটা জ্বালাতেই মেয়ে দুটি দেখতে পেল, পাথরের মেঝেতে অনেকগুলি মৃতদেহ সারি দিয়ে সাজানো রয়েছে; টান-টান, হলদে শরীর, মৃত্যুযন্ত্রণায় মুখগুলি বিকৃত, মাথার খুলিগুলো খোলা, দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়েছে।

লেখাগুলোর উপর আঙুল বুলোতে বুলোতে পাহারাদার বলতে লাগল, "এক মিনিট, মাত্র এক মিনিট। পরশুর আগের দিন···তার মানে শনিবার, শনিবার। কি নাম?"

"সুসান্না রাইজিনা।"

"সুসান্না রাইজিনা, সুসান্না রাইজিনা," পাহারাদার মন্ত্রের মত আবৃত্তি করতে লাগল, সুসান্না রাইজিনা। ঠিক বলেছি, দু'শ' সতেরো!"

মোমবাতির আলো ফেলে মরাগুলির উপর ঝুঁকে পড়ে সে সারি ধরে এগিয়ে চলল। শেষ পর্যন্ত একটা মৃতদেহের কাছে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার পায়ের উপর কালি দিয়ে বেশ বড় বড় করে দু'শ' সতেরো লেখা।

"এই যে পেয়েছি। আগে করিডরে বয়ে নিয়ে যাই, তারপর জিনিসপত্র নিয়ে আসব। এক মিনিট সবুর কর।"

তার বয়সের পক্ষে বিস্ময়কর রকমের সহজভাবে ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করতে করতে জেংকার পা দুটো ধরে তাকে কাঁধের উপর ফেলে নিয়ে চলল। ঠিক যেমন করে লোকে একটা মরা গরু বা আলুর বস্তা বয়ে নিয়ে যায়।

করিডরে আলো কিছুটা বেশী। সেখানে গিয়ে পাহারাদার যখন কাঁধের ভীষণ বোঝাটা নামিয়ে রাখল, তখন তামারা দুই হাতে মুখ ঢাকল, আর মাংকা মাথাটা ঘুরিয়ে কেঁদে উঠল।

পাহারাদার বলল, "তোমাদের যদি কিছু দরকার থাকে তো বল। মৃত-দেহটাকে যদি উপযুক্তভাবে সাজাতে চাও তাহলে সেজন্য প্রয়োজনীয় সব কিছুই আমাদের কাছে আছে। সোনালি কাপড়, ছোট মালা, ছোট দেবমূর্ত্তি, শবাচ্ছাদক রেশমি ওড়না। এখানে আমরা সব রাখি। দু' একটা পোষাকও কিনতে পার। যেমন ধর, চটিজোড়া।"

তাকে কিছু টাকা দিয়ে আগে আগে মাংকাকে নিয়ে তামারা খোলা হাওয়ায় বেরিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে দুটো মালা এল: একটা তামারার কাছ থেকে, অ্যাস্টার ও ডালিয়ার মালা, সাদা ফিতের উপর কালো হরফে লেখা: "জনৈক বন্ধুর কাছ থেকে জেনিকে" দ্বিতীয় মালাটি রিয়াসানভ-এর কাছ থেকে, লাল ফুলের মালা, লাল ফিতের উপর সোনালি হরফে লেখা: "দুঃখের ভিতর দিয়েই সে পবিত্র হয়ে উঠবে।" তাছাড়াও একটা চিরকুট লিখে সে সহানুভূতি প্রকাশ করেছে এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক সভা থাকার জন্য উপস্থিত থাকতে না পারার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছে।

তারপর এল গায়কদল। তামারাই ভাড়া করেছে। শহরের শ্রেষ্ঠ গীর্জা-গায়কদলের পনেরো জন এল।

গায়ক দলের যে প্রধান তার মুখে সামরিক বিভাগের লোকদের মত লম্বা, সোজা গোঁফ, পরনে ধূসর ওভারকোট ও ধূসর টুপি; তাকে এত ধূসর দেখাচ্ছে যেন তার শরীরে ধুঁলো ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ভার্কাকে চিনতে পেরে সে অবাক হয়ে তাকাল; তারপর ঈষৎ হেসে ভার্কাকে চোখ টিপল। কিছু গীর্জার লোক, তার মত গায়ক-দলের কিছু প্রধান ও কিছু মন্ত্র-পাঠককে সঙ্গে নিয়ে প্রতি মাসে দু'তিনবার বা তারও বেশীবার সে ইয়াম্স্কায়া স্ট্রীটে ঢুঁ মেরে থাকে। সাধারণতঃ সবগুলো বাড়ি ছুঁয়ে একেবারে শেষে তারা আন্না মার্কভ্নার বাড়িতে যায় এবং সেখানে সব সময়ই ভার্কাকে বেছে নেয়।

সে খুব ফূর্তিবাজ চটপটে লোক, মহা উৎসাহের সঙ্গে প্রায় পাগলের মত উদ্দামভাবে নাচে, নাচতে নাচতে এমন সব অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গী করে যে সমবেত সকলে হেসে গড়িয়ে পড়ে।

গায়কদলের পরেই তামারার ভাড়া করা শব-শকট এসে হাজির হল। গাড়িটা দুটো ঘোড়ায় টানে, রং কালো, সাদা পালক দিয়ে সাজানো। সেই সঙ্গে এল পাঁচজন মশালবাহী। তাদের সঙ্গে এল সাদা ব্রোকেড-এ ঢাকা শবাধার এবং কালো ক্যালিকো কাপড়ে ঢাকা একটি শবাধার-আসন। ধীরে-সুস্থে হলেও অভ্যস্ত তৎপরতার সঙ্গে লোকগুলো জেনির দেহটা শবাধারে স্থাপন করল, তার মুখটা রেশমি ওড়নায় ও শরীরটা সোনালি কাপড়ে ঢেকে দিল, এবং মাথার কাছে একটা ও পায়ের কাছে দুটো মোমবাতি জ্বালিয়ে দিল।

মোমবাতির কাঁপা-কাঁপা আলোয় জেনির মুখটা আরও পরিষ্কার দেখা গেল। জায়গায় জায়গায় কালসিটে ছোপ পড়েছে। কাগজের মত সাদা গলায় দুটো কালো দাগ কলারে ঢাকা পড়েনি; একটা দড়ির দাগ, আরেকটা লাইমিয়নের সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তির সময়কার আঘাতের দাগ; দেখে মনে হয়, সে যেন গলায় দুটো হার পড়েছে। তামারা ঝুঁকে পড়ে একটা সেফ্‌টিপিন দিয়ে কলারটাকে থুত্‌নির কাছে আটকে দিল।

তারপর এল পাদরি। দেখতে ছোটখাট, মাথায় পাকা চুল, সোনার ফ্রেমের চশমা, উঁচু টুপি। এল লম্বা, ঢ্যাঙা ডিয়েকন; মাথার চুল পাতলা, রোগাটে গড়ন, অদ্ভুত গাঢ় হলুদ রঙের মুখ, যেন মাটির তৈরি মূর্তি। আর এল একজন মন্ত্র-পাঠক; পরনে লম্বা জামা।

তামারা পাদরির কাছে এগিয়ে গেল।

জিজ্ঞাসা করল, "ফাদার, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াটা কি ভাবে করবেন? সকলের জন্য একসঙ্গে, না প্রত্যেকের জন্য আলাদা ভাবে?"

পাদরি জবাব দিল, "সাধারণত এক সঙ্গেই করা হয়ে থাকে। তবে বিশেষ অনুরোধ এলে বিশেষ ব্যবস্থা হিসাবে আলাদা ভাবেও করা যায়। মৃতের কি ভাবে মৃত্যু হয়েছিল?"

"ও আত্মহত্যা করেছিল ফাদার।"

"হুম্‌। আত্মহত্যা? আচ্ছা মেয়ে, তুমি কি জান না যে গীর্জার নিয়মানুসারে এ ধরনের অন্ত্যেষ্টি করা যায় না? অবশ্য কিছু কিছু ব্যতিক্রম আছে।"

"পুলিশের সার্টিফিকেট ও ডাক্তারের সার্টিফিকেট আমার কাছে আছে ফাদার। ও তখন মানসিক দিক থেকে সুস্থ ছিল না; ওকে পাগলামিতে পেয়েছিল।"

আগের দিন রাতে রিয়াসানভ তাকে যে দুটি কাগজ পাঠিয়েছিল সেগুলো সে পুরোহিতের হাতে দিল। তার উপরে দশ রুবলের তিনখানা বিলও রেখে দিল।

মিনতির সুরে বলল, "ফাদার, দয়া করে যথারীতি সব অনুষ্ঠানই পালন করুন। মেয়েটি বড় ভাল ছিল। জীবনে অনেক কষ্ট সে পেয়েছে। আমার ইচ্ছা, সমাধিক্ষেত্রে গিয়ে আপনি নিজে প্রার্থনা-সঙ্গীতে যোগদান করুন।"

"সমাধিক্ষেত্রে আমি যেতে পারি, কিন্তু সেখানে সৎকার-পরিচালনার অধিকার আমার নেই, যেহেতু তাদের নিজস্ব পাদরি সেখানে আছেন। কাজেই বুঝতেই তো পারছ মেয়ে, যেহেতু বাকি কাজের জন্য আবার আমাকে এখানে ফিরে আসতে হবে, তাই আরও দশ রুবল কি দেওয়া উচিত নয়?"

টাকাটা পকেটে পুরে পুরোহিত মন্ত্র-পাঠকের কাছ থেকে ধুনোচিটা নিয়ে সেটাকে মন্ত্রপূত করল; তারপর সেটাকে ধীরে ধীরে দোলাতে দোলাতে

শবাধারটি প্রদক্ষিণ করে তার মাথার সামনে গিয়ে দাঁড়াল এবং গলায় তীক্ষ্ণ বিষণ্ণতার সুর ফুটিয়ে তুলে আবৃত্তি করল :

"যে প্রভু ভগবান ছিলেন, আছেন ও চিরদিন থাকবেন তাঁর জয় হোক।"

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শুরু হল। মন্ত্র-পাঠক সকলের হাতে হাতে মোমবাতি বিলিয়ে দিল। অন্ধকার, ভারী বাতাসে যখন মোমবাতিগুলি জ্বালানো হল তখন তার আলোয় প্রার্থনারত মেয়েদের মুখগুলি উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

পাদরি, ডিয়েকন ও মন্ত্র-পাঠক প্রার্থনা করল, গায়কদল এক সুরে গান ধরল, তাদের বিষণ্ণ সুর-লহরী আর্ত দেবদূতের দীর্ঘশ্বাসের মত ঝরে পড়তে লাগল।

তামারা মন দিয়ে পরিচিত অথচ দীর্ঘদিন অশ্রুত শব্দগুলি শুনল; তার ঠোঁটে তিক্ত হাসি ফুটে উঠল। অসহ্য হতাশা ও অবিশ্বাসে পূর্ণ জেংকার আবেগভরা কথাগুলি তার মনে পড়ল। যে অন্যায়, উচ্ছৃংখল, তিক্ত জীবন সে যাপন করেছে সেজন্য সর্বকরুণাময়, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর কি তাকে ক্ষমা করবেন? এই করুণ বিদ্রোহী, অনিচ্ছাকৃত পতিতা, ঈশ্বরের অমর্যাদাকারী অবুঝ শিশুকে সর্বজ্ঞ ঈশ্বর কি প্রত্যাখ্যান করবেন! হে ঈশ্বর, তুমি আমাদের একমাত্র সান্ত্বনা!

একটা গভীর চাপা কান্না হঠাৎ তীব্র আর্তনাদে ফেটে পড়ল: "হায় জেনেচ্‌কা!" সাদা মাংকা হাঁটু গেড়ে বসে মুখে একটা রুমাল গুঁজে দিয়ে কাঁদতে লাগল। অন্য মেয়েরা নতজানু হয়ে বসেছিল; দীর্ঘশ্বাস ও চাপা কান্নায় গীর্জার বাতাস ভারী হয়ে উঠল।

অবশেষে "তার স্মৃতি চিরদিন বেঁচে থাক" এই শেষ মন্ত্র উচ্চারিত হল, মোমবাতিগুলি নিভিয়ে দেওয়া হল, পুরোহিত বিদায়কালীন প্রার্থনা উচ্চারণ করল। চারদিকের স্তব্ধতার মধ্যে একটা ছোট বেল্‌চাতে করে কিছুটা বালি তুলে পুরোহিত শবাধারের ভিতরে ওড়নার উপরে এপাশ-ওপাশ করে ছড়িয়ে দিল।

বন্ধুর মৃতদেহ নিয়ে মেয়েরা সমাধিক্ষেত্রে গেল। আকাশ পরিষ্কার হয়েছে। শীতের আকাশে নীল এনামেলের মত উজ্জ্বল শীতের সূর্য কিরণ ছড়াচ্ছে। খোলা কবরের পাশে একটি সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান হল; শবাধারের উপর মাটি ছড়িয়ে দেওয়া হল; তারপর গড়ে উঠল একটি নতুন ঢিবি।

অন্য সকলে চলে গেলে তামারা বলল, "এই তো পরিণাম। জেংকাকে হারানো যে আমার কাছে কতখানি তা যদি তোমরা জানতে। তার মত আর একটি মানুষ কোনদিন পাব না। তবু বলছি মেয়েরা, আমাদের কবরে আমরা যেমন আছি ঐ কবরে সে তার চাইতে ভাল আছে। এস, শেষবারের মত ক্রুশ-চিহ্ন এঁকে আমরা বাড়ি চলে যাই।"

বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে তামারা হঠাৎ নীচের অদ্ভুত, অশুভ কথাগুলি

বলল :

"আজ থেকে অনেকদিন আমরা আর একত্র হব না। বাতাস আমাদের ছড়িয়ে দেবে দূরে দূরান্তরে। জীবন কত সুন্দর! দেখ, ওই সূর্য আর নীল আকাশ! বাতাস কত পবিত্র! চারদিকে মাকড়শার জাল উড়ে বেড়াচ্ছে—একেই বলে ভারতীয় গ্রীষ্মকাল! এ জগৎ বিস্ময়কর! শুধু আমরা, এই মেয়েরাই যেন পথের আবর্জনা!"

১০

তামারার কথাগুলি যেন ভবিষ্যদ্বাণীর মত ফলে গেল। জেংকার মৃত্যুর পরে মাত্র দুটি সপ্তাহের মধ্যে এম্মা এডোয়ার্ডভ্‌নার পতিতালয়ে যত অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটল ততটা বুঝি বিগত পাঁচ বছরেও ঘটে নি।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ঠিক পরদিনই হতভাগিনী পাশ্‌কাকে পাগ্‌লা গারদে পাঠাতে হল। ডাক্তাররা বলল, তার সেরে উঠবার আর কোন আশা নেই। সেখানে মেঝেতে একটা খড়ের মাদুরে তাকে শুইয়ে রাখা হল। সেখানেই সে ধীরে ধীরে চিরস্তব্ধতার অন্তহীন অন্ধকারে তলিয়ে যেতে লাগল। শয্যাক্ষত ও রক্তে বিষ-সংক্রমণের ফলে ছ'মাস পরে সে মারা গেল।

তারপর একদিন তামারাও অদৃশ্য হয়ে গেল।

দু' সপ্তাহ ধরে সে বাড়িউলির সব কাজই খুব উৎসাহের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে করে গেল; তবু তাকে দেখলেই মনে হত, ভিতরে ভিতরে একটা গুপ্ত উত্তেজনা তার মধ্যে কাজ করছে। তারপর একদিন সন্ধ্যাবেলা সে পতিতালয় থেকে নিখোঁজ হয়ে গেল; আর ফিরে এল না।

ঘটনাটা এই। অনেকদিন ধরেই একজন মাঝ-বয়সী, ধনী, অথচ অত্যন্ত অর্থগৃধ্নু, লেখ্য প্রামাণিক উকিলের সঙ্গে তার একটা প্রণয়ঘটিত ব্যাপার চলছিল। গত বছর নীপার নদীর উজানে কোন একটা মঠে যাবার পথে একটা স্টীমারে সহযাত্রী হিসাবে তাদের দু'জনের দেখা হয়। চটপটে, সুন্দরী তামারাকে দেখে লোকটি মুগ্ধ হয়; তামারার রহস্যময় কামনার দৃষ্টি, তার মনমুগ্ধকর কথাবার্তা ও তার সরল চালচলন তার মনকে টানে। সেই সুযোগে ভাল পরিবারের শিক্ষিত ও সদাচারী এই পাকাচুল উকিলটিকে তামারা তার শিকার হিসাবে চিহ্নিত করে। তার কাছে নিজেকে রহস্যময়ী করে তুলবার জন্য নিজের বৃত্তির কথা সে তাকে কিছুই জানায় না। অল্প কথায় অস্পষ্টভাবে সে তাকে বোঝায় যে, কোন মধ্যবিত্ত পরিবারের বিবাহিতা স্ত্রীলোক; তার স্বামী একজন জুয়ারি, বাড়িতে অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারী, তাই বিবাহিত জীবনে সে অসুখী; তাছাড়া সন্তানবতী হবার সৌভাগ্য থেকেও ভাগ্য তাকে বঞ্চিত করেছে। সেদিন বিদায় নেবার সময় সে তার সঙ্গে সন্ধ্যাটা কাটাতে অস্বীকার করল এবং এ কথাও জানাল যে তার সঙ্গে আর কখনও সে দেখা করবে না;

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ডাক-ঘরের প্রযত্নে তাকে চিঠি লেখার অনুমতি দিয়ে তাকে একটি ছদ্মনাম বলে দিল। উভয়ের মধ্যে পত্রালাপ চলল; উকিলমশায় আলংকারিক ভাষায় তার আবেগ প্রকাশ করে চলল, আর তামারা আগের মতই চাপা, রহস্যময় ভাবটা বজায় রেখেই চলতে লাগল।

কিছুদিন পরে সেই ভদ্রলোকের অনুরোধেই একটি সাধারণ পার্কে সে তার সঙ্গে দেখা করতে রাজী হল। সে তখনও মনোরমা, বুদ্ধিমতী ও কিছুটা নিস্তেজ। কিন্তু লোকটির সঙ্গে কোথাও যেতে সে রাজী হল না।

এইভাবে প্রেমিককে যন্ত্রণাবিদ্ধ করে সুকৌশলে তার মনে একজন প্রবীণ মানুষের সেই আবেগকে জ্বালিয়ে তুলল যা প্রথম প্রেমের চাইতেও মারাত্মক। শেষ পর্যন্ত গ্রীষ্মকালে যখন সেই লোকটির পরিবারবর্গ বাইরে চলে গেল তখন সে তার সঙ্গে দেখা করবে স্থির করল। এই প্রথম সে চোখের জলে নিজের ব্যথাকে প্রকাশ করে নিজেকে তার হাতে সমর্পণ করে দিল; আর এতখানি আবেগ ও আদরের সঙ্গে এ কাজটি সে করল যে সে বেচারির মুণ্ডুটা একেবারেই ঘুরে গেল; বৃদ্ধ বয়সের যে অনুরাগ কোন যুক্তি মানে না, সীমা মানে না, এমন কি বিদ্রূপের ভয়কেও ভুলিয়ে দেয়, সেই অনুরাগ তাকে গ্রাস করল।

কিন্তু পরবর্তী কালে তার বাড়িতে গিয়ে তার সঙ্গে পুনরায় মিলিত হতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় তার ধৈর্যহারা বন্ধুটি আবেগে একেবারে পাগল হয়ে উঠল। সে বেশ খুশি মনেই ফুলের তোড়া গ্রহণ করত, বা তার সঙ্গে শহরের বাইরে কোন রেস্তোরাঁতেও যেত; কিন্তু কোন দামী উপহার দিতে গেলেই সে ক্ষুব্ধ হয়ে আপত্তি জানাত, এবং এমন কৌশলে ও সূক্ষ্মভাবে তার সঙ্গে কথাবার্তা বলত যে উকিলমশায় কখনও তাকে টাকা দেবার প্রস্তাব করতেই সাহস পেত না। একবার কথাপ্রসঙ্গে খুব ইতস্তত করেই সে একটি আরামদায়ক আলাদা বাসার কথা বলেছিল। কিন্তু তামারা তখন এমনভাবে তার দিকে তাকিয়েছিল, তার দৃষ্টি ছিল এতই তীব্র, তীক্ষ্ণ ও উদ্ধত যে ভদ্রলোকের পাকা চুলের গোড়া পর্যন্ত সমস্ত মুখখানা একটি বালকের মত লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছিল; তার হাত দু'খানিতে বার বার চুমো খেতে খেতে অসংলগ্ন ভাষায় সে ক্ষমা চাইতে লাগল।

তামারা এই খেলা চালিয়ে যেতে লাগল। ক্রমে সে বুঝতে পারল, তার পায়ের নীচে মাটি বেশ শক্ত হয়ে এসেছে। সে ইতিমধ্যেই জেনে নিয়েছে, কোন্ কোন্ দিনে ভদ্রলোকের সিন্দুকে মোটা টাকা থাকে। কিন্তু সে কোন রকম তাড়াহুড়া করতে চায় না; সময় আসার আগেই কোন রকমে কাজে নেমে সব কিছু নষ্ট করতে সে ভয় পায়।

অবশেষ দীর্ঘ-প্রতীক্ষিত দিনটি এল: কণ্ট্রাক্টরদের একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন সবে শেষ হয়েছে এবং লেখ্য প্রামাণিক উকিলদের সবগুলি আপিসে বেশ মোটা রকমের টাকার লেন-দেন সবে সম্পূর্ণ হয়েছে। তামারা জানে, তার

উকিল সাধারণত শনিবারেই সব টাকা সিন্দুক থেকে বের করে ব্যাংকে নিয়ে যায়, যাতে রবিবারটা সে বেশ নিশ্চিন্ত থাকতে পারে; সুতরাং শুক্রবার অপরাহ্নে উকিলমশায় তামারার কাছ থেকে নিম্নলিখিত চিঠিখানি পেল :

"আমার প্রিয়, আমার আদরের রাজা সলোমন! তোমার সালুমিচ, তোমার দ্রাক্ষাকুঞ্জের আদরিণী অগ্নিময়ী চুম্বন দিয়ে তোমাকে অভিবাদন জানাচ্ছে। সোনা আমার, আজ আমার ছুটির দিন, তাই আমি এত খুশি যে ভাষায় বলতে পারছি না। হাতেও কোন কাজ নেই। কর্ম-উপলক্ষ্যে সে বাইরে গেছে; রবিবারের আগে ফিরবে না। তাই সারাটা সন্ধ্যা তোমার সঙ্গে কাটাতে চাই এবং সারাটা রাতও। ওঃ, প্রিয় আমার, সারাটা জীবনই যদি তোমার সঙ্গে কাটাতে পারতাম তাহলে কী সুখীই না হতাম! কোথাও যেতে ভাল লাগছে না। ক্যাবারে ও নাইট-ক্লাব দেখে-দেখে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আমি শুধু চাই তোমাকে…তোমাকে…একমাত্র তোমাকে! আমার হৃদয়ের আনন্দ, সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ আমাকে পাবে। তুমি যদি কিছু খাদ্য ও পানীয়ের ব্যবস্থা করে রাখতে পার তাহলে খুব ভাল হয়। কামনায় আমি জ্বলছি, আমি মরে যাচ্ছি। তোমাকে একেবারে শেষ করে দেব। আমার বিলম্ব সইছে না। মাথা ঘুরছে, মুখ জ্বলছে, হাত দুটো বরফের মত ঠাণ্ডা। তোমাকে আলিঙ্গন করছি। তোমারই ভ্যালেন্টিনা।"

সেদিন সন্ধ্যায় বেশ কায়দা করে সদ্য-সমাপ্ত ব্যবসায়িক লেনদেনের আলোচনাটাকে সে এমনভাবে ঘুরিয়ে দিল এবং উকিলমশায়ের দক্ষতার প্রশংসা করতে লাগল যে সে তাকে সঙ্গে নিয়ে আপিসে ঢুকে সিন্দুকটা খুলে দেখাল। তড়িৎ দৃষ্টিতে সিন্দুকের তাক ও টানাগুলোকেও দেখে নিয়েই তামারা ঘুরে দাঁড়িয়ে হাই তুলে বলে উঠল :

"ওঃ, বড়ই একঘেয়ে লাগছে!"

তারপরই তার গলা জড়িয়ে ধরে মুখের কাছে মুখটা এগিয়ে দিল। তার ঠোঁটের উপর তামারার গরম নিঃশ্বাস পড়তে লাগল। ফিসফিস করে তামারা বলল :

"বন্ধ কর সোনা, এ সব বাজে জিনিস বন্ধ কর। এস, চলে এস!"

তার আগে আগেই সে খাবার ঘরে গিয়ে ঢুকল।

তাকে ডেকে বলল, "এস ভলোদ্য়া, দেরী করছ কেন? আমি চাই মদ, আর তারপর ভালবাসা, ভালবাসা, ভালবাসা!' নাও," একটা গ্লাস উকিল-মশায়ের দিকে এগিয়ে দিল, "এক চুমুকে সবটা খেয়ে ফেল! এই একই ভাবে আজ রাতে আমাদের ভালবাসার পাত্রে আমরা চুমুক দেব!"

গ্লাসে-গ্লাসে ঠোকাঠুকি করে উকিলমশায় এক চুমুকে সবটা শেষ করল। কিন্তু একটু পরেই বলে উঠল :

"আশ্চর্য তো…মদের স্বাদটা তেতো।"

"সত্যি তাই", তামারা তার কথায় সায় দিয়ে মনোযোগ সহকারে তার দিকে তাকাল। "এই মদটা একটু তেতোই হয়; রাইন মদটা এই রকমই তো হয়।"

সে বলল, "কিন্তু এটা খুব বেশী তেতো লাগল। না সোনা, আমি আর চাই না।"

পাঁচ মিনিট পরেই সে হাতল-চেয়ারে ঘুমিয়ে পড়ল; মাথাটা পিছনে হেলে রয়েছে, নীচের চোয়ালটা ঝুলে পড়েছে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে তামারা উকিলকে জাগাতে চেষ্টা করল। সে নিশ্চল, গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। তখন সে একটা জ্বলন্ত মোমবাতি নিয়ে জানালার গোবরাটে রেখে বাইরের রাস্তাটা দেখে নিল। তারপর বারান্দায় গিয়ে কান পাতল। সিঁড়িতে হাল্কা পায়ের শব্দ শোনা গেল। প্রায় নিঃশব্দে দরজা খুলতেই সেংকা ঘরে ঢুকল। সে বেশ ভদ্রলোকের মত পোষাক পরে এসেছে; হাতে একটা আন্‌কোরা নতুন স্যুটকেস।

"ঠিক আছে?" চোর চুপি-চুপি জিজ্ঞাসা করল।

তামারাও ফিস্‌ফিস্ করে জবাব দিল, "সে ঘুমিয়ে পড়েছে। এই চাবির তাড়া।"

দু'জনে আপিসে গিয়ে ঢুকল। সিন্দুকটা সেখানেই ছিল। টর্চের আলোয় তালাটা ভাল করে দেখে সেংকা নীচু গলায় খিস্তি করে উঠল: "তুই নরকে যা, ব্যাটা বুড়ো শকুন! আমি জানতাম এটা কম্বিনেশন-তালাই হবে। বিস্ফোরক গুঁড়ো দিয়েই এর ব্যবস্থা করতে হবে। কতক্ষণ যে লাগবে তা শয়তানই বলতে পারে।"

তামারা তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "তার দরকার হবে না। কম্বিনেশনটা আমি জানি। সেটা z—e—n—i—t."

দশ মিনিট পরেই দু'জনে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল এবং তারপরে ইচ্ছা করেই বেশ কয়েকটি রাস্তা পারাপার করল। পুরনো শহরে পৌঁছে তারা একটা দ্রুশ্‌কি নিল এবং স্টেশনে পৌঁছে শহর ছেড়ে গেল। তাদের জাল পাশপোর্টে দেখা গেল, তারা সম্ভ্রান্ত জমিদার স্তাভিত্‌স্কি দম্পতি। তারপর দীর্ঘকাল তাদের সম্পর্কে কিছুই জানা গেল না। এক বছর পরে মস্কোর একটা বড় ডাকাতির ব্যাপারে সেংকা ধরা পড়ল; প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের সময়ই সে তামারাকেও ধরিয়ে দিল। বিচারে দু'জনেরই কারাদণ্ড হল।

তামারার পরে এবার সরল, বিশ্বাসী, প্রেমিকা ভার্কার পালা। কিছুদিন হল সমর বিভাগের একজন পদস্থ কর্মচারীর সঙ্গে সে প্রেমে পড়েছিল। তার নাম দিলেক্‌তরস্কি। ভার্কা সে লোকটিকে পুজো করত, আর সেও এক মহান দেবমূর্তির মত একান্ত করুণায় সে পুজা গ্রহণ করত। কিন্তু গ্রীষ্মকাল শেষ হতেই ভার্কা বুঝতে পারল যে তার প্রেমিক ক্রমেই উদাসীন হয়ে উঠছে, এবং

তাকে উপেক্ষা করে চলেছে। তার কষ্ট হল, ঈর্ষা তাকে যন্ত্রণা দিতে লাগল; আর সেও প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলল। কিন্তু প্রেমিকের জবাবগুলো কিছুটা ভাসা-ভাসা; তাতে আসন্ন বিপদের অশুভ ইঙ্গিত।

সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে শেষ পর্যন্ত সে নিজেই স্বীকার করল যে সে প্রায় তিন হাজার রুবলের মত সরকারী তহবিল তছরূপ করেছে, দিন পাঁচেকের মধ্যেই হিসাবপত্র পরীক্ষা করা হবে এবং তার মাথায় নেমে আসবে অসম্মান, বিচার ও কঠোর দণ্ড। সমর বিভাগের পদস্থ কর্মচারীটি কান্নায় ভেঙে পড়ল; দুই হাতে মাথা চেপে ধরে চেঁচিয়ে বলে উঠল:

"আমার বেচারি মা! তার কি হবে! এই অসম্মানের কথা শুনলে তার বুক ভেঙে যাবে! না! একটি নির্দোষ মানুষের এই যন্ত্রণার চাইতে মৃত্যু হাজার গুণে শ্রেয়।"

যদিও সব সময়ই সে সস্তা উপন্যাসের ভাষায়ই কথা বলত—আর তাই করেই সে ভার্কার সরল বিশ্বাসী হৃদয়কে জয় করেছিল—তথাপি আত্মহত্যার এই নাটকীয় ভাবনা একবার মনে উদয় হবার পরে আর বুঝি তাকে ছেড়ে গেল না।

একদিন সে ও ভার্কা একটা পার্কে অনেকক্ষণ ধরে বেড়াল। হেমন্তের পাতা ঝরানোর কাজ এর মধ্যেই শুরু হয়ে গেছে, যদিও কিছু কিছু গাছে লাল হলুদ ও কমলা রঙের ছোপ লাগা পাতা এখনও রয়েছে; বাতাসে যেন পুরনো মদের গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে। তথাপি ঝোপ-ঝাড়, ঘাস ও গাছের বুক ছুঁয়ে মৃত্যুর শীতল বাতাস ধীরে ধীরে বয়ে চলেছে।

দিলেক্তরস্কি ক্রমেই নরম, ভগ্নহৃদয় ও দুঃখিত হয়ে উঠল। সে কাঁদতে লাগল। তার সঙ্গে ভার্কাও কাঁদতে লাগল।

সে বলে উঠল, "আজ আমি আত্মহত্যা করব! সব শেষ হয়ে যাক!"

"তা করো না প্রিয় আমার। সোনা আমার; তা করো না।"

দিলেক্তরস্কি অন্ধকার গলায় বলল, "করতেই হবে! অভিশপ্ত টাকা! কিসের মূল্য বেশী—"সম্মানের, না টাকার?"

"প্রিয়তম···"

"কথা বলো না, কথা বলো না আনেত্তে! (যে কারণেই হোক সে তাকে ভার্কা না বলে আনেত্তে বলে ডাকত) কথা বলো না। আমি সংকল্পে অটল।"

ভার্কা দুঃখের সঙ্গে বলল, "আমি যদি তোমাকে সাহায্য করতে পারতাম! তোমার জন্য আমি জীবন দিতেও রাজী! আমার প্রতিটি রক্তবিন্দু ঢেলে দিতে পারি!"

উকিল বিষণ্ণ কণ্ঠে বলল, "জীবন কি! বিদায় আনেত্তে। চিরদিনের মত বিদায়।"

মেয়েটি অসহায়ভাবে মাথা নাড়তে লাগল।

আমি বিদায় উচ্চারণ করব না। কিছুতেই না! না, না! আমাকে

তোমার সঙ্গে নাও! তোমার সঙ্গে আমিও মরব!"

দিলেক্তরস্কি ব্যয়-বহুল হোটেলে একটা ঘর নিল। সে জানে, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে, বা তারও আগে সে ও ভার্কা মারা যাবে। যদিও তার পকেটে ছিল মাত্র বারো কোপেক, সে দামী খাবার, ফল, কফি ও দু'বোতল শ্যাম্পেনের অর্ডার দিল। সে যে নিজেকে গুলি করবে সে বিষয়ে তার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, বরং এই বিয়োগান্ত ভূমিকাটি সে উপভোগ করছে; তার আত্মীয়জনের হতাশা ও সহকর্মীদের বিস্ময়ের চিন্তাকেও সে উপভোগ করছে। আর ভার্কা, যে মুহূর্তে সে বলেছে তার প্রেমিকের জন্য মৃত্যু বরণ করবে, সেই মুহূর্তে সে হৃদয়ে পেয়েছে শক্তি, জয় করেছে ভয়কে। মৃত্যু আর তার কাছে ভয়ংকর নয়। সে ভাবল, "একটা বেড়ার নীচে পড়ে মরার চাইতে এই তো ভাল। প্রিয়তমের সঙ্গে এই মৃত্যু তো মধুর।" গভীর আবেগে সে তার পুরুষকে চুমো খেল; তাকে দেখতে আরও সুন্দর লাগছে,—এলোমেলো চুল, চোখ দুটি ঝল্‌মল্‌ করছে।

অবশেষে সেই চরম গম্ভীর মুহূর্তটি এল।

"নিজেদের আমরা ভোগ করেছি আনন্দে, তুমি এবং আমি। নিঃশেষ করেছি জীবনের পাত্র, এবার তাকে ভেঙে ফেল! এ সিদ্ধান্তের জন্য তোমার দুঃখ হচ্ছে না তো মিষ্টি?"

"না, না, না!"

"তুমি প্রস্তুত?"

"হ্যাঁ," ফিস্‌ ফিস্‌ করে বলে সে হাসল।

"তাহলে দেয়ালের দিকে এগিয়ে যাও, চোখ বন্ধ কর।"

"না, না, প্রিয়তম। ও ভাবে নয়। আমার কাছে এস। এখানে! কাছে এস, আরও কাছে। আমার দিকে তাকাও, তোমার চোখে আমি চোখ রাখতে চাই। তোমার ঠোঁট দুটি এগিয়ে দাও, তাতে আমি চুমো খাব। আমি ভয় পাচ্ছি না। তুমিও সাহসী হও। আরও জোরে আমাকে চুমো খাও!"

সে ভার্কাকে হত্যা করল। কিন্তু তার কৃতকর্মের দিকে দৃষ্টি পড়তেই ভয় তাকে পেয়ে বসল,—এক অশুভ, ঘৃণ্য, নীচ ভয়। তার পা কাঁপতে লাগল, কিন্তু তার মন এক প্রবঞ্চক, এক ভীরু, এক পাষণ্ডের মন—তখনও সজাগ। বুকের পাশের চামড়ায় ছুঁইয়ে ঘোড়াটা টিপবার মত সাহস তার ছিল। ব্যথায়, ভয়ে ও গুলির জোর শব্দে আর্তনাদ করে সে যখন পড়ে গেল তখন ভার্কার দেহটা শেষ বারের মত নড়ে উঠল।

ভার্কার মৃত্যুর দুই সপ্তাহের মধ্যেই একটা হট্টগোলের মধ্যে ভীরু সাদা মাংকা, হাস্যময়ী মাংকা, কুটনি মাংকাও মারা গেল। একদিন ইয়াম্‌স্কায়াতে যখন সর্বসাধারণের মেলামেশার লগ্ন চলছিল তখন একটা ভারী বোতল দিয়ে

একজন তার মাথায় আঘাত করে। খুনী ধরা পড়ে নি।

এম্মা এডোয়ার্ডভ্‌নার বাড়িতে পরপর এত দুর্ঘটনা দ্রুত গতিতে ঘটতে লাগল যে সে বাড়ির প্রায় কোন অধিবাসীই রক্তাক্ত, শোচনীয় বা লজ্জাজনক পরিণতির হাত থেকে রেহাই পেল না।

কিন্তু সব চাইতে শোচনীয় বিপর্যয়, সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ বিপর্যয়, সর্বাপেক্ষা রক্তাক্ত বিপর্যয় ঘটল যখন সৈন্যরা ইয়াম্‌স্কায়াতে ধ্বংসের তাণ্ডব শুরু করে দিল।

টাকা-পয়সা নিয়ে গোলমাল হওয়ায় একটা রুবল—পতিতালয়ে দু'জন অশ্বারোহী সৈন্যকে মারধোর করে রাস্তায় বের করে দেওয়া হয়। ছেঁড়া পোষাকে রক্তাক্ত দেহে তারা সেনা-বারিকে ফিরে গেল। তাদের বন্ধুরা তখন রেজিমেণ্টের বার্ষিক উৎসবে মত্ত ছিল। আধ ঘণ্টা পরেই শ'খানেক সৈন্য ছুটতে ছুটতে ইয়াম্‌স্কায়াতে এসে একটার পর একটা বাড়িতে আক্রমণ চালাতে লাগল। কোথা থেকে কে জানে একদল ভবঘুরে ও গুণ্ডাপ্রকৃতির লোক এসে তাদের সঙ্গে যোগ দিল। তারা জানালার কাঁচ ভাঙল, পিয়ানোগুলো ভেঙে তচ্‌নচ্‌ করল। পালকের বিছানাগুলোকে এ-ফোঁড়-ও-ফোঁড় করে কেটে সব পালক ছড়িয়ে দিল; বেশ কয়েকদিন ধরে সে সব পালক বরফের টুকরোর মত ইয়াম্‌স্কায়ার বাতাসে উড়তে লাগল। মেয়েগুলোকে খালি মাথায় খালি গায়ে রাস্তায় বের করে দিল। তিনজন দরোয়ানকে পিটিয়ে মেরে ফেলল। ত্রেপ্পেল-এর জাঁকজমকপূর্ণ রেশমে মোড়া আসবাবপত্র ভেঙেচুরে টুকরো টুকরো করে ফেলল। উন্মত্ত জনতা আশপাশের প্রত্যেকটি বীয়ারের দোকানে ও সরাইখানায়ও তাণ্ডবলীলা চালাতে লাগল।

তিন ঘণ্টা ধরে এই রক্তাক্ত, নির্দয়, মদোন্মত্ত দাঙ্গা চলল। শেষ পর্যন্ত একদল সৈন্য ও অগ্নিনির্বাপক এসে সেই উত্তেজিত জনতাকে হটিয়ে দিল। দুটো আধ-রুবল পতিতালয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল; তাও দ্রুত নিভিয়ে ফেলা হল। কিন্তু পরদিন আবার শহরের ভিতরে ও উপকণ্ঠে দাঙ্গা বেঁধে গেল। অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে সেই দাঙ্গা ক্রমে ইহুদি হত্যা-তাণ্ডবের রূপ গ্রহণ করল; তার যত কিছু দুঃখ, কষ্ট, ও সন্ত্রাসসহ সেই দাঙ্গা তিনদিন ধরে চলতে থাকল।

এক সপ্তাহ পরে বড়লাট সাহেব এই মর্মে এক আদেশ জারী করল যে, ইয়াম্‌স্কায়াসহ শহরের সর্বত্র সব পতিতালয় অবিলম্বে বন্ধ করে দিতে হবে। ব্যবসাপত্র গুটিয়ে নেবার জন্য পতিতালয়ের মালকিনদের মাত্র এক সপ্তাহ সময় দেওয়া হল।

চূর্ণিত, লুণ্ঠিত, দলিত, বিশুষ্ক বৃদ্ধা মাল্‌কিনের দল এবং পেট-মোটা, কর্কশকণ্ঠি বাড়িউলির দল তাদের পূর্বেকার জাঁকজমক ও জৌলুষ হারিয়ে হাস্যাস্পদ ও সকরুণ মূর্তিতে দ্রুত জিনিসপত্র বাঁধাছাদা শুরু করে দিল। একদিন যে খুশিভরা ইয়াম্‌স্কায়া ও তার পতিতালয়গুলিতে জীবন ছিল উচ্ছল,

কুৎসাময় ও ভয়ংকর, মাত্র একটি মাস পরে তার স্মৃতি হিসাবে পড়ে রইল শুধু একটি রাস্তার নাম।

আর যত হেনরিয়েটা, কাত্‌কা ও লাস্‌কার দল—যারা ছিল সরল ও নির্বোধ, অনেক সময়ই যাদের ভাল লাগত, যারা আনন্দ দিত, যারা প্রায় সকলেই ছিল বঞ্চিত ও অপরের হাতের শিকার—সারা শহরময় ছড়িয়ে পড়ল, মিশে গেল, আর পথচারিণীদের সংখ্যা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ফুলে-ফেঁপে উঠতে লাগল।

আর যে কুখ্যাত নরককুণ্ড একদিন ইয়ামা নামে পরিচিত ছিল তার দাঙ্গা-বিক্ষুব্ধ উচ্ছৃংখল দিনগুলিকে মানুষের স্মৃতি থেকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলতে শীঘ্রই তার নামটাও পাল্টে ফেলা হল।

অনুবাদ: **মণীন্দ্র দত্ত**

॥ দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত ॥